বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ভূমি বিরোধের রাজনীতি, ১৮৮৫-১৯৭১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

এস. এম. রেজাউল করিম

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নং ও শিক্ষাবর্ষ ১৪০/২০১৬-২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. প্রদীপ চাঁন দুগার

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩০ জুন, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ভূমি বিরোধের রাজনীতি, ১৮৮৫-১৯৭১

(Emergence of Bangladesh and Politics of Land Conflict, 1885-1971)

পিএইচ.ডি গবেষক

এস. এম. রেজাউল করিম

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নং ও শিক্ষাবর্ষ ১৪০/২০১৬-২০১৭

সারসংক্ষেপ (Abstract)

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কারণ সম্পর্কে বর্তমানে যে কয়েকটি চিন্তাধারা (school of thoughts) প্রতিষ্ঠিত আছে তার সঙ্গে একটি নতুন চিন্তাধারার অবতারণা করা। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে তিনটি চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থিত এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো বাংলা ভাষার ভিত্তিতে গড়ে উঠা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। অন্য আরেকটি চিন্তাধারা হলো পাকিস্তান শাসনামলের বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অপর চিন্তাধারাটি হলো স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে সৃষ্ট পরিস্থিতির চূড়ান্ত ফলস্বরূপ বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে (এ সম্পর্কে প্রকাশনা পর্যালোচনায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। এসব চিন্তাধারাসমূহ একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কিত। আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রচলিত চিন্তাধারাগুলোর বাইরে গিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কারণ অনুসন্ধান। এটা করতে গিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে ভূমি বিরোধের রাজনীতি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য, ভূমি বিরোধের সঙ্গে বিভিন্ন পক্ষের (অংশীজনের) সংশ্লিষ্টতা থাকলেও আলোচ্য গবেষণায় তিনটি পক্ষের মধ্যকার ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বকে আলোচনায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় আরও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব কীভাবে রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে ও রাজনীতির কারণে কীভাবে এই দ্বন্দ্ব প্রভাবিত হয়েছে। অর্থাৎ ভূমি বিরোধ ও রাজনীতি কীভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব কীভাবে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তা কীভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করেছে তা নিয়েই এই গবেষণায় বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকাল হতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল পর্যন্ত ভূমির ওপর রাজা বা রাষ্ট্রের মালিকানাস্বত্ব ও স্বত্বাধিকারস্বত্ব বহাল ছিল এবং একইসঙ্গে ভূমিতে কৃষকেরও প্রথাগত অধিকার বজায় থাকায় ভূমি বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে একদিকে কৃষক তার প্রথাগত অধিকার হারিয়ে ফেলে এবং অন্যদিকে জমিদার ভূমির ওপর মালিকানাস্বত্ব ও স্বত্বাধিকারস্বত্ব লাভ করার ফলে ভূমি বিরোধের সূচনা হয়। এই পর্যায়ের ভূমি বিরোধ ছিল জমিদার ও কৃষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ১৮১৯ সালের পত্তনি প্রথা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগী তথা জোতদারি ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে কৃষকের ওপর শোষণ ও নিপীড়নের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এই পত্তনিপ্রথার প্রবর্তনের ফলে ভূমি বিরোধ ত্রিপক্ষীয় রূপ ধারণ করে এবং তা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়। ত্রিপক্ষীয় এই ভূমি বিরোধে প্রধানত কৃষকের ওপর জমিদার ও জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়নের কারণে বাংলায় বহু সংখ্যক কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। ভূমি বিরোধ হ্রাস করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে শাসনকর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়ন করলেও সর্বপ্রথম ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের কিছুটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমেই কৃষকরা সর্বপ্রথম ভূমিতে কিছু অধিকার পায় যা পরবর্তীকালে প্রণীত ভূমি সংস্কার আইনে এই অধিকার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। উল্লেখ্য, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হলেও বিশ শতকের বিশের দশকের পূর্ব পর্যন্ত রাজনীতিতে কৃষকদের সংশ্লিষ্টতা ছিল না। তখন পর্যন্ত ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে একচেটিয়া প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য ছিল কেবল জমিদার ও জোতদারদের। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে ভূমিতে কৃষকের কিছুটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও জাতীয় রাজনীতিতে কৃষকদের সংশ্লিষ্টতা না থাকায় ভূমিস্বত্বের ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং শোষণ ও নিপীড়ন হতে অব্যাহতি পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। অন্যদিকে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় কোনোরূপ ভূমিকা পালন করেননি। ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ ভোট রাজনীতির সূচনা হলে রাজনীতিতে কৃষকদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এরপর থেকেই দেখা যায় যে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে বিভিন্ন কৃষক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু হয়। কৃষক সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং কৃষকদের সংগঠিত করে শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে এবং অধিকার আদায়ে আইন পরিষদের ভিতরে ও বাইরে রাজনীতিবিদরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৮ সালের সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের সময় আইন পরিষদের ভিতরে কৃষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় মুসলমান জমিদার এবং জোতদার শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কৃষকদের স্বার্থের পক্ষে এবং জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস ও স্বরাজ দলের নেতৃবৃন্দ কৃষকদের স্বার্থের বিপক্ষে অবস্থান নেন। উল্লেখ্য, ১৯১৯ সালের আইনে ভোট রাজনীতির সূচনা হলেও নির্বাচকমণ্ডলীতে স্বল্প সংখ্যক কৃষকের অন্তর্ভুক্তির কারণে ১৯২০, ১৯২৩, ১৯২৬, ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালের নির্বাচনে কৃষকের গুরুত্ব কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকদের স্বার্থ পূরণের জন্য তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি ছিল না। কিন্তু ১৯৩২ সালের স্যার র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ভিত্তিতে প্রণীত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বিপুল সংখ্যক কৃষকের নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে রাজনীতিতে কৃষকদের গুরুত্ব আরও অনেক বৃদ্ধি পায়। এই আইনের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক কৃষকের ভোটাধিকার লাভের ফল ছিল বাংলার বিশেষ করে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রাধ্যান্য প্রতিষ্ঠা। জয়া চ্যাটার্জীর মতে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু জমিদারদের প্রাধান্যের অবসান হয়ে মুসলিম জোতদারদের প্রাধ্যান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জমিদার ছিল হিন্দু এবং অধিকাংশ কৃষক

Dhaka University Institutional Repository

ছিল মুসলমান। আর অগ্রসরমান মুসলমান কৃষক বা জোতদাররা বিশ শতকের বিশ হতে চল্লিশের দশকে রাজনীতিতে নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এ কারণে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ভিত্তিতে অগ্রসারমান মুসলমান জোতদাররা রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ শুরু করেন বলে চ্যাটার্জী অভিমত দেন। মুসলমান জোতদারদের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের সুদূরপ্রসারী ফলস্বরূপ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিজয়ী হয় ও বাংলায় মুসলমানদের প্রাধান্য আরও বেশি বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মূল নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে মুসলমান জোতদাররা তথা সচ্ছল কৃষক। ১৯৪৬ নির্বাচনের ফলস্বরূপ দেশভাগের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং বাংলা ভাগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা পায়, যাকে চ্যাটার্জী জোতদার রাজ প্রতিষ্ঠা বলে উল্লেখ করেন। সুতরাং ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের ফল।

উল্লেখ্য, ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কৃষকদের সমর্থনে বিজয়ী প্রতিনিধিদের একটি বড় অংশ ছিল মুসলিম জোতদার এবং অল্প সংখ্যক মুসলমান জমিদার। এই জোতদার এবং জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সরকার কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অনেকগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে ১৯৩৮ সালের সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালের ভূমি রাজস্ব কমিশন বা ফ্লাউড কমিশন গঠন, ১৯৩৯ সালের সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন, ১৯৫০ সালের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন প্রভৃতি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ভূমি বিরোধের রাজনীতির ফলেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কৃষকদের স্বার্থে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উল্লেখ্য, বিশ শতকের বিশের দশক হতে ভূমি বিরোধের রাজনীতির ফলে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান হয়েছিল তার তীব্রতা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পর অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল। তবে যদিও কৃষকদের স্বার্থে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জোতদারি ব্যবস্থা বহাল থাকায় শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে কৃষকরা চূড়ান্তভাবে মুক্তি পায়নি। অবশ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে (যাদের অধিকাংশ সচ্ছল কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসেছিল) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ তথা আওয়ামী লীগ গঠনের পর থেকে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে জমিদার ও জোতদার শ্রেণির প্রাধান্য হ্রাস পেতে শুরু করে। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তুলনামূলকভাবে সাধারণ কৃষকের ঘর থেকে উঠে আসা রাজনৈতিক নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে। উপরন্তু, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ২১ বছর বয়স্ক ব্যক্তিরা ভোটাধিকার লাভ করায় ভোটের রাজনীতিতে কৃষকরা মূল নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে কৃষকদের ক্ষমতায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ এই সাধারণ কৃষকরা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের কারণে নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার কৃষকদের স্বার্থে তেমন কিছু করতে সক্ষম হয়নি। উপরন্তু, জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে ভূমির ঊর্ধ্ব সীমা বর্ধিত করে ১৯৬১ সালের প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ ও মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে জোতদাররা ভূমিস্বত্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং রাজনীতিতে শক্তিশালী হয়ে উঠায় পুনরায় ভূমি বিরোধ তথা জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়। আইয়ুব সরকারের আমলে ইতোপূর্বে রাজনীতিতে নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ কৃষকরা অপসারিত হয় এবং রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে জোতদারদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতনের পর জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণের অল্প সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানে পুনরায় রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

দলগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে এবং তিনি দেশে এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ২১ বছর প্রাপ্তবয়স্কদের যৌথ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকরা ছিল জয় পরাজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি। এর ফলে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কৃষকের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগের সৃষ্টি হয়। এই নির্বাচনে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের বিবেচনায় কৃষকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিশ্রুতিমূলক ইশতেহার প্রদান করে। তবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তুলনায় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারই ছিল কৃষি ও কৃষক বান্ধব। লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করা হয় যে তারা বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের সুযোগ পেলে কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠা করবে এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমির মালিক কৃষককে খাজনা বা রাজস্ব দিতে হবে না। অর্থাৎ যে কর-খাজনার জন্য কৃষককে এতোদিন শোষিত ও নিপীড়িত হতে হয়েছে তার থেকে তারা চিরস্থায়ীভাবে মুক্তি পাবে। এছাড়াও তারা আইন প্রণয়ন করে ভূমির ঊর্ধ্ব সীমা ১০০ বিঘা কার্যকর করবে। অর্থাৎ দেশে জোতদার শ্রেণির অবসান হবে। উপরন্তু, লীগ বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে রাষ্ট্র কৃষকদের স্বার্থে কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করবে এবং ভূমিহীন কৃষকদেরকে রাষ্ট্র বিনামূল্যে ভূমি প্রদান করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ প্রদান করবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে লীগের এই কৃষি ও কৃষক বান্ধব নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের আকৃষ্ট করা। লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিতে আকৃষ্ট হয়ে কৃষকরা তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠা, ভূমিস্বত্বের ওপর তাদের অধিকার অর্জন প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তির আশায় আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে সমর্থন দিয়ে বিজয়ী করে। কিন্তু নির্বাচনে বিজয়ী হলেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের কারণে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয়। এমনকি ইয়াহিয়া খান সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেও ১ মার্চ (১৯৭১) এক ঘোষণা জারির মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশন স্থগিত করেন। এর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত মার্চ মাসের (১৯৭১) অসহযোগ আন্দোলনে পূর্ব বাংলার কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। কৃষকরা এই প্রত্যাশায় বঙ্গবন্ধুর দলকে নির্বাচনে সমর্থন করেছিল যে আওয়ামী লীগ নতুন সরকার গঠনের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ তৈরি করবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রে কৃষকদের এই আশা ভঙ্গ হলে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। অতঃপর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চ লাইটে নিরীহ কৃষক এবং কৃষকের সন্তানদের (অপারেশন সার্চ লাইটে নিহত শিক্ষার্থীদের প্রায় সবাই ছিল কৃষকের সন্তান) নির্মম হত্যাযজ্ঞে ক্ষুব্ধ হয়ে এবং ২৬ মার্চ (১৯৭১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় উৎসাহী হয়ে কৃষকরা শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তি এবং কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতাযুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। উল্লেখ্য, এই স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় একদিকে ছিল কৃষক ও কৃষকের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং অন্যদিকে ছিল শাসনকর্তৃপক্ষ ও তাদের অনুগত জোতদার শ্রেণি।

বস্তুতপক্ষে, প্রত্যক্ষ ভোটের রাজনীতির কারণে বিশ শতকের ত্রিশের দশকের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ অগ্রসরমান মুসলমান জোতদাররা দীর্ঘদিনের প্রতিপত্তি ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণকারী সংখ্যালঘিষ্ট জমিদারদের পরাজিত করে রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল এবং তাদের নেতৃত্বেই দেশভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং বাংলা বিভক্তির মাধ্যমে পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যাকে জয়া চ্যাটার্জী জোতদার রাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন। ঠিক একইভাবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও সংখ্যাগরিষ্ঠ অগ্রসরমান সাধারণ কৃষকরা রাজনীতির মূল নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদিনের প্রভাবশালী এবং রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণী সংখ্যালঘিষ্ঠ জোতদারদের পরাজিত করে নির্বাচন পরবর্তী রাজনীতি ও অন্যান্য ঘটনায় যেমন ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলন ও দীর্ঘ নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মূল কারণ ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

"বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ভূমি বিরোধের রাজনীতি, ১৮৮৫-১৯৭১" (Emergence of Bangladesh and Politics of Land Conflict, 1885-1971) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করছি। আমি ঘোষণা করছি যে এই অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব রচনা এবং এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতিপূর্বে এই শিরোনামে কোনো গবেষণা হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোনো অংশ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি অথবা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

(এস. এম. রেজাউল করিম)
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং ও শিক্ষাবর্ষ ১৪০/২০১৬-২০১৭
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩০ জুন, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, "বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ভূমি বিরোধের রাজনীতি, ১৮৮৫-১৯৭১" (Emergence of Bangladesh and Politics of Land Conflict, 1885-1971) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির গবেষণার কাজ আমার দিকনির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও পিএইচ.ডি গবেষক এস. এম. রেজাউল করিম কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি তাঁর গবেষণালব্ধ মৌলিক রচনা। পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে এই অভিসন্দর্ভ কখনও এই বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমার জন্য ইতোপূর্বে পেশ করা হয়নি।

আরো প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব এস. এম. রেজাউল করিম রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ ১৪০/২০১৬-২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করেছেন।

(ড. প্রদীপ চাঁন দুগার)
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঘোষণাপত্র	i
প্রত্যায়নপত্র	ii
সূচিপত্র	iii
সারণি তালিকা	viii
শব্দ পরিচিতি (Glossary)	xi
শব্দ সংক্ষেপ	xviii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	xix
সারসংক্ষেপ (Abstract)	xxi
মানচিত্র	xxv
প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা	
১.১ সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান	১
১.২ ভৌগোলিক সীমারেখা	৩
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য	৩
১.৪ গবেষণার পরিধি	৩
১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা	৪
১.৬ প্রকাশনা পর্যালোচনা	৪
১.৭ গবেষণা পদ্ধতি	৯
১.৮ তাত্ত্বিক কাঠামো	৯
১.৯ অধ্যায় বিভাজন	১৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : সরকারি নীতি কৌশল ও ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন (১৮৮৫-১৯৪৭)

২.১ ভূমিকা ১৯

২.২ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন ও ভূমি বিরোধের সূচনা ১৯

২.৩ ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ও ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন ২৬

২.৪ ১৯০৭ সালের ভূমি আইন ও সরকারের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল করার কৌশল ২৯

২.৫ ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন ও ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন ৩২

২.৬ ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন ও ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন ৩৫

২.৭ ১৯৩৮ সালে গঠিত ভূমি রাজস্ব কমিশনের ভূমিস্বত্বের আমূল পরিবর্তনমূলক সুপারিশ ৩৮

২.৮ ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন ও ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন ৪৩

২.৯ উপসংহার ৪৩

তৃতীয় অধ্যায় : ভূমি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের পরিবর্তন ও ভূমি বিরোধ (১৮৮৫-১৯৪৭)

৩.১ ভূমিকা ৪৫

৩.২. ৩.২ আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিতে জমিদার শ্রেণির পরিবর্তন ৪৫

৩.২.১ জমিদারদের ভূমিস্বত্বাধিকারী লাভ ও ভূমি বিরোধের সূচনা ৪৫

৩.২.২ ভূম্যধিকারী সমাজ প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ রক্ষা ৪৮

৩.২.৩ কৃষকদের ওপর জমিদারদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ৫২

৩.২.৪ ভোট রাজনীতির প্রবর্তন ও হিন্দু-মুসলিম জমিদারদের সামপ্রদায়িক রাজনীতির পরিণতি ৫৮

৩.৩ আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিতে জোতদার শ্রেণির পরিবর্তন ৬৭

৩.৩.১ জোতদার শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ ৬৭

৩.৩.২ জোতদার ও জমিদার শ্রেণির সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিণতি ৭২

৩.৪ আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিতে কৃষক শ্রেণির পরিবর্তন ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪.১ কৃষক শ্রেণির ওপর ভূস্বামীদের শোষণ ও নিপীড়ন ৭৮

৩.৪.২ কৃষক আন্দোলন ৮৮

৩.৪.৩ কৃষকদের বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠন ৯৬

৩.৪.৩.১ কৃষক প্রজা পার্টি ৯৮

৩.৪.৩.২ স্বরাজ পার্টি ১০১

৩.৪.৩.৩ কমিউনিস্ট পার্টি ১০২

৩.৪.৩.৪ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ১০৩

৩.৪.৩.৫ কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ১০৬

৩.৪.৪ ১৯২০ সালের রাজনৈতিক দলহীন নির্বাচনে কৃষকের গুরুত্ব ও স্বার্থ উপেক্ষিত ১০৭

৩.৪.৫ ১৯২৩ সালের নির্বাচনে কৃষকের গুরুত্ব ও স্বার্থ উপেক্ষিত ১০৭

৩.৪.৬ ১৯২৬ সালের নির্বাচনে কৃষকের স্বার্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি ১০৭

৩.৪.৭ ১৯২৯ সালের নির্বাচন ও নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকের স্বার্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি ১০৮

৩.৪.৮ ১৯৩০ সালের উপ-নির্বাচন ও নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকের স্বার্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি ১০৯

৩.৪.৯ ১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও কৃষক সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা ১০৯

৩.৪.৯.১ কংগ্রেসের নির্বাচনী রাজনীতি ও কৃষক সমাজের প্রতিক্রিয়া ১১১

৩.৪.৯.২ মুসলিম লীগের নির্বাচনী রাজনীতি ও কৃষক সমাজের প্রতিক্রিয়া ১১৬

৩.৪.৯.৩ কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী রাজনীতি ও কৃষক সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ১১৮

৩.৪.১০ ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও কৃষক সমাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি ১২২

৩.৫. উপসংহার ১২৭

চতুর্থ অধ্যায় : পূর্ব বাংলায় ভূমি নীতি ও কৌশলে পরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১)

৪.১ ভূমিকা ১২৯

৪.২ ১৯৪৮ সালের ভূমি হস্তান্তর অর্ডিন্যান্স ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ ১৯৪৯ সালের পূর্ব বাংলা অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব আইন ১২৯

৪.৪ ১৯৪৯ সালের ভূমি রাজস্ব, খাজনা ও সেস আইন ১৩০

৪.৫ ১৯৪৯ সালের পূর্ব বাংলা পতিত ভূমি অধিগ্রহণ আইন ১৩১

৪.৬ ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৩২

৪.৭ ১৯৫১ সালের পূর্ব বাংলা অস্থায়ী অর্ডিন্যান্স বিধিবদ্ধ ও পুনঃবিধিবদ্ধকৃত আইন ১৪৯

৪.৮ ১৯৫১ সালের কোর্ট অব ওয়ার্ডস (পূর্ব বাংলা সংশোধন) আইন ১৫১

৪.৯ ১৯৫১ সালের পূর্ব বাংলা স্থানান্তরিত ব্যক্তির (স্থাবর সম্পত্তি প্রশাসন) আইন ১৫৩

৪.১০ ১৯৫১ সালের পূর্ব বাংলা কৃষি ভূমি হস্তান্তর আইন ১৫৪

৪.১১ ১৯৫২ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন ১৬৪

৪.১২ ১৯৫৩ সালের বঙ্গীয় চরাঞ্চল ভূমি (পূর্ব বাংলা সংশোধন) আইন ১৬৫

৪.১৩ ১৯৫৩ সালের পূর্ব বাংলা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর (শিথিলকরণ) আইন ১৬৮

৪.১৪ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৯৫৬ সালের ভূমি সংস্কার ১৭৩

৪.১৫ ১৯৬১ সালের পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ ১৭৩

৪.১৬ ১৯৬৪ সালের অর্ডিন্যান্স ও ১৯৬৫ সালের শত্রু সম্পত্তি আইন ১৮৩

৪.১৭ উপসংহার ১৮৫

পঞ্চম অধ্যায় : ভূমি বিরোধের রাজনীতি (১৯৪৭-১৯৭১)

৫.১ ভূমিকা ১৮৬

৫.২ পূর্ব বাংলায় জমিদার শ্রেণির পতন ১৮৬

৫.২.১ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন ও জমিদারদের অস্তিত্ব রক্ষায় কৌশল ১৮৬

৫.২.২ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জমিদারদের প্রভাব হ্রাস ১৯১

৫.২.৩ ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও জমিদারদের বিলুপ্তি ১৯২

৫.৩ জোতদার শ্রেণির পতন ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.১ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন ও চুয়ান্নর নির্বাচনের পর জোতদারদের প্রাধান্য হ্রাস ১৯৩

৫.৩.২ মৌলিক গণতন্ত্র ও ১৯৬১ সালের ভূমি আইনে জোতদারদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ১৯৫

৫.৩.৩ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর জোতদারদের প্রাধান্য হ্রাস ২০৭

৫.৩.৪ স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং জোতদারদের পতন ২০৮

৫.৪. কৃষক সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা ২০৮

৫.৪.১ পাকিস্তান শাসনামলে কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন ২০৮

৫.৪.২ পাকিস্তান শাসনামলে কৃষক আন্দোলন ২১৯

৫.৪.৩ ভাষা আন্দোলন ও কৃষক সমাজ ২২৫

৫.৪.৪ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও কৃষক সমাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি ২৩০

৫.৪.৫ ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও কৃষক সমাজের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ২৩৬

৫.৪.৬ ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে কৃষক সমাজ ২৬২

৫.৪.৭ কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠায় স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় ২৬৭

৫.৫ উপসংহার ২৭৩

ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার ২৭৫

পরিশিষ্ট : সারণি ১-৫০ ২৮৫

গ্রন্থপঞ্জী ৩৭০

Dhaka University Institutional Repository

সারণি তালিকা

সারণি নম্বর	বিষয়
সারণি ১	জিডিপি ও জিএনপি'র হার ১৯৪৯-৫০ হতে ১৯৬৯-৭০ (ক এবং খ)
সারণি ২	ভূমি রাজস্ব কমিশনের প্রেরিত প্রশ্ন সম্বলিত পত্র গ্রহণ, সাক্ষাৎকার ও মতামত প্রদানকারী বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা
সারণি ৩	জমিদারদের সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত লাঠিয়াল, দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের তালিকা
সারণি ৪	১৮৮৫-১৯১২ সালে কংগ্রেসের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মুসলমান জমিদারদের তালিকা
সারণি ৫	বিভিন্ন জেলার স্থায়ী লিজের ত্রি-বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৮৭০-১৮৯৯
সারণি ৬	ভূমি হস্তান্তর, ১৯১৩-১৯৪৩
সারণি ৭	১৮৮৫-১৯১২ সালে কংগ্রেসের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মুসলমান জোতদারদের তালিকা
সারণি ৮	ভূমি রাজস্বের চাহিদা ও আদায়, ১৯২৪-২৫ থেকে ১৯৩৭-৩৮
সারণি ৯	জমিদারদের খাজনা আদায়, ১৯১৪-১৫ থেকে ১৯৩৮-৩৯
সারণি ১০	প্রতি একরে রাজস্ব, খাজনা ও মুনাফা, ১৯৩৬-৩৭
সারণি ১১	প্রতি একরে গড় খাজনা, ১৯৪০'র দশক
সারণি ১২	প্রতি একরে গড় খাজনা, ১৯৩৮
সারণি ১৩	বিভিন্ন শ্রেণির জমির উপর উঠবন্দি রায়তের খাজনার হার
সারণি ১৪	ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ব্রিটিশ ভারতে ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা
সারণি ১৫	ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্বের তুলনা
সারণি ১৬	রাস্তা ও গণপূর্ত কাজের উপর কর (cesses) চাহিদা ও আদায়, ১৯২৪-২৫ থেকে ১৯৩৭-৩৮
সারণি ১৭	আবওয়াব আদায়ের তালিকা
সারণি ১৮	১৯১৩ সালের আইনে ভূমি রাজস্ব সম্পর্কিত মামলা, ১৯২৪-২৫ থেকে ১৯৩৭-৩৮
সারণি ১৯	প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের অধিবেশন, ১৯৩৭-১৯৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ২০ ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় আইনসভার ২৫০টি আসনের ফলাফল

সারণি ২১ ১৯৩২ সালের সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের ভিত্তিতে বঙ্গীয় আইনসভার আসন বণ্টন (ক এবং খ)

সারণি ২২ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় আইনসভার ২৫০টি আসনের ফলাফল

সারণি ২৩ ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের অধীনে জমিদারি ও জমিদারি এস্টেটসমূহ অধিগ্রহণ

সারণি ২৪ ১৯৪৯-৫০ সালে ত্রিপুরা জেলায় সরকারের ক্রয়কৃত ১৮৩টি এস্টেট

সারণি ২৫ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ মামলা শুনানীর জন্য আইনজীবীদের সরকারি রাজস্ব থেকে অর্থ প্রদান

সারণি ২৬ ১৯৫৬-৫৭ সালে অধিগ্রহণকৃত জমিদারি এস্টেটের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দকৃত সরকারি অনুদানের পরিমাণ

সারণি ২৭ ১৯৫১ সালের ঢাকা জেলা জুরি বোর্ডের বিশেষ ও সাধারণ সদস্য তালিকা, ঢাকা দেওয়ানি আদালত, ১৯৫১

সারণি ২৮ ১৯৫৩ সালে ঢাকা জেলার জুরি বোর্ডের বিশেষ ও সাধারণ সদস্য তালিকা, ঢাকা দেওয়ানি আদালত, ১৯৫৩

সারণি ২৯ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের ফলাফল

সারণি ৩০ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের অবস্থান

সারণি ৩১ নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের পেশাগত অবস্থান (শতকরা হার)

সারণি ৩২ মৌলিক গণতন্ত্রীদের অধীনে জমির পরিমাণ (১৯৬০-৬৫)

সারণি ৩৩ ইউনিয়ন বোর্ড ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের আর্থিক অবস্থান (শতকরা হার)

সারণি ৩৪ ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের আর্থিক অবস্থান

সারণি ৩৫ ইউনিয়ন বোর্ড ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের শিক্ষাগত অবস্থান (শতকরা হার)

সারণি ৩৬ ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের শিক্ষাগত অবস্থান (শতকরা হার)

সারণি ৩৭ জেলাভিত্তিক সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান হতে ধান-চাল সংগ্রহ, ১৯৬৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৩৮ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সেকশন ৪(১১)/৪(১২) অনুযায়ী বিভিন্ন বছরে মোট অর্থ জড়িত ও সার্টিফিকেট মামলার মাধ্যমে আদায়ের পরিমাণ

সারণি ৩৯ পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সেকশন ৪(৩) অনুযায়ী ১৯৫৯-৬০ হতে ১৯৬৭-৬৮ সময়ে বিভিন্ন বছরে ভূমি রাজস্ব দাবি ও সংগ্রহ

সারণি ৪০ ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭ সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য কর আদায়

সারণি ৪১ পাকিস্তান শাসনামলে খাস জমির পরিমাণ (অক্টোবর, ১৯৬২)

সারণি ৪২ সেকশন ৬(৪) ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন বছরে দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম

সারণি ৪৩ ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্প্রদায় ভিত্তিক জনসংখ্যা

সারণি ৪৪ ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্প্রদায় ভিত্তিক জনসংখ্যা

সারণি ৪৫ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আইন কাঠামো অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসন বণ্টন

সারণি ৪৬ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী প্রতিক, প্রার্থী সংখ্যা, প্রাপ্ত আসন, প্রাপ্ত ভোট ও প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ

সারণি ৪৭ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের ফলাফল

সারণি ৪৮ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের ফলাফল

সারণি ৪৯ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান হতে জাতীয় পরিষদের ১৬২ জন নির্বাচিত সদস্যের পেশা

সারণি ৫০ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ জন নির্বাচিত সদস্যের পেশা

দ্রষ্টব্য : সারণি (১-৫০) পরিশিষ্ট অংশে দেখুন।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ পরিচিতি (Glossary)

আবওয়াব	জমিদার/রাজস্ব কমকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক কৃষক/প্রজার নিকট হতে আদায়কৃত আইনত/ নির্ধারিত প্রাপ্য খাজনার অতিরিক্ত কর। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে এ অতিরিক্ত কর/আবওয়াব আদায় করা হতো যা আইনত নিষিদ্ধ ছিল। অর্থাৎ আবওয়াব হলো একপ্রকার অবৈধ কর।
ইজারা/ইজারাদার	এক ধরনের জমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত। রাষ্ট্র বা জমির মালিক কর্তৃক কোনো ব্যক্তির নিকট একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত খাজনা বা অর্থ অগ্রিম প্রদানের শর্তে জমি বন্দোবস্ত দেওয়াকে ইজারা বলা হয়। ইজারা অস্থায়ী বন্দোবস্ত। মেয়াদ শেষে নবায়ন করতে হয়। ইজারা বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ইজারাদার বলা হয়।
ইশতিমারারী	চিরস্থায়ী।
ইস্তেহার	ঘোষণা (Proclamation).
এজমালী	যৌথ বা অবিভক্ত (Joint, undivided).
ওয়াকফ	কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে ধর্মীয় কাজের জন্য কোনো ভূমি দান করাকে ওয়াকফ বলা হয়। ওয়াকফ দু'ধরনের যথা (১) ওয়াকফ লিল্লাহ-আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে যে সম্পত্তি দান করা হয় এবং (২) ওয়াকফে আওলাদ-বৈধ উত্তরাধিকারীগণের উপকারার্থে যে দান করা হয়।
কট্ কবলা	মর্টগেজ, শর্তসাপেক্ষ বিক্রয় (Mortgage, conditional sale).
কবুলিয়ত ও পাট্টা	ভূমির মালিক বরাবরে খাজনা দেওয়া ও অন্যান্য শর্ত মেনে চলার স্বীকারোক্তি করে কৃষক বা প্রজা কর্তৃক সম্পাদিত দলিলকে কবুলিয়ত বলা হয়। সাধারণত রাষ্ট্র বা জমিদার খাস জমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতাকে সরকার/জমিদার বরাবরে ইজারার শর্তাবলি মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করে কবুলিয়ত দলিল সম্পাদন করে দিতে হয়। সুলতানি ও মুঘল আমলে এবং ব্রিটিশ শাসনামলে জমিদার বরাবরে কৃষক/প্রজাকে জমির নির্ধারিত খাজনা প্রদানের অঙ্গীকার করে এই ধরনের কবুলিয়ত দলিল দিতে হতো। অন্যদিকে জমিদারও কৃষক/প্রজাকে দেয় সুযোগ-সুবিধা বর্ণনাপূর্বক তার স্বাক্ষরযুক্ত অনুরূপ একটি দলিল সম্পাদন করে কৃষক/প্রজাকে দিতেন। এটাকে পাট্টা দলিল বলা হতো। সম্রাট শেরশাহ সর্বপ্রথম রায়তের স্বার্থরক্ষায় কবুলিয়ত ও পাট্টার প্রবর্তন করেন।[১]
কাইমি (স্থিতিবান)	বন্দোবস্তকৃত (Settled).
কাছারি	অফিস, কার্যালয়, আদালত। প্রচলিত অর্থে বিচার আদালত এবং জমিদারদের খাজনা সংগ্রহের কার্যালয়কে বুঝানো হয় (An office from where revenue collections were made and general administrations were conducted).

---

[১] আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন* (ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ ও সংস্করণ, ২০০১), পৃ. ২০০-২০১ ও ২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

কায়েমি	চিরস্থায়ী।
কোর্ট অব ওয়ার্ডস	মহিলা, নাবালক, উন্মাদ বা অন্য কোনোভাবে অযোগ্য জমিদারদের জমিদারি পরিচালনার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত কর্তৃপক্ষ। কোর্ট অব ওয়ার্ডস পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের মূল দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল বোর্ড অব রেভেনিউ। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন জেলা কালেক্টর। বস্তুত, জেলা কালেক্টরই কোর্ট অব ওয়ার্ডস হিসেবে কাজ করতো।
কোর্ফা	অধীনস্থ। কোর্ফা রায়ত বলতে অধীনস্থ রায়ত (Under-raiyat) বা কৃষককে বুঝানো হয়। সাধারণত জমিতে তাদের স্বত্ব বা অধিকার ছিল না।
কিস্তওয়ার	ক্যাডাস্ট্রাল, জরিপ (Cadastral, survey).
কিস্তোয়ার জরিপ	ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে (Cadastral Survey) সংক্ষেপে সি.এস জরিপ।
খাইখালাসী	মর্টগেজ (Mortgage/Usufructuary).
খাজনা	কর (Rent).
খারিজা	পৃথক/স্বাধীন।
খারিজা তালুক	১৭৯৩ সালের ৮ নং রেগুলেশন বলে মূল জমিদারি হতে পৃথক করা জমিদারির অংশ বা তালুককে খারিজা তালুক বলা হতো। এভাবে সৃষ্ট খারিজা তালুকের রাজস্ব জমিদারের স্থলে সরাসরি সরকারি কোষাগারে প্রদান করতে হতো। খারিজা তালুকের আলাদা তৌজি নম্বর ছিল। খারিজা তালুকদারগণ জমিদারের ন্যায় তালুকের মালিকানাস্বত্ব ও স্বত্বাধিকারীস্বত্ব প্রাপ্ত হন।
খালসা জমি	সরকারি খাস জমি। খালসা জমির রাজস্ব সরাসরি সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হতো।
খাসখামার	নিজস্ব চাষাধীন জমি (Own cultivation of a land).
খাস জমি	সরকারের অধীনস্থ জমি (The Property of government).
খতিয়ান	স্বত্বলিপি (Record of rights).
খোদকাশ্‌ত রায়ত	স্থায়ী আবাসিক রায়ত/কৃষক। তারা নিজ গ্রামে নিজের জমি চাষ করে। জমিতে তাদের অধিকার স্থায়ী। খোদকাশ্‌ত রায়তগণ প্রথাগত হারে জমিদারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা প্রদানের অধিকারী ছিল। তাদেরকে উচ্ছেদের অধিকার জমিদারের ছিল না।
গোমস্তা	জমিদারি সেরেস্তায় কর্মরত অধস্তন কর্মচারী।
চর	নদী বা সাগর তীরবর্তী জমি (Alluvial land).

Dhaka University Institutional Repository

চাকরান ভূমি	জমিদার তার পারিবারিক কাজকর্মে নিয়োজিত কর্মচারীদের জীবন-যাপনের জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে অর্থের বদলে যে ভূমি দান করতেন তা চাকরান ভূমি বলে পরিচিত। চাকরান ভূমির জন্য তাদের কোনো খাজনা দিতে হতো না। চাকরান ভূমিতে জমিদারের ইচ্ছায় কেবল তাদের ভোগদখলের অধিকার থাকতো। চাকরান ভূমিতে তাদের কোনোরূপ স্বত্ব জন্মাতো না বা উত্তরাধিকারের বিষয় ছিল না।
চাকলা	একাধিক পরগণা নিয়ে গঠিত বৃহৎ রাজস্ব প্রশাসনিক ইউনিট। মুর্শিদকুলী খান চাকলা প্রথা চালু করেন। চাকলা ইউনিটের প্রধান চাকলাদার হিসেবে পরিচিত ছিল।
তফসিল	কোনো দলিলের শেষাংশে লিখিত সম্পত্তির বিবরণীকে তফসিল বলা হয়।
তহশিল	তৃণমূল পর্যায়ে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ইউনিট।
তহুরি	জমিদার কর্তৃক কৃষকের ওপর আরোপিত এক প্রকার আবওয়াব।
তাকাবি	মুঘল আমলে হতে সরকার/জমিদার কর্তৃক কৃষককে প্রদত্ত ঋণ।
তৌজি	রাজস্ব এলাকা (মহল/এস্টেট) সমূহের তালিকা ও রাজস্ব হিসেব সংরক্ষণের জন্য কালেক্টর কর্তৃক সংরক্ষিত রেজিস্ট্রার।
দখলিস্বত্ত্ব	ভোগদখলি কৃষক (Occupancy raiyat).
দরপত্তনিদার	পত্তনিদারের অধীনস্থ মধ্যস্বত্বভোগী।
দাখিল খারিজ	মিউটেশন (Mutation).
দাখিলা	খাজনার রশিদ বা খাজনা জমা স্লিপ (Receipt of rent).
দাগ	প্লট (Plot).
দিয়ারা	নব উত্থিত চর ভূমি (Alluvial formation).
দেওয়ান	মুঘল রাজস্ব প্রশাসনে কেন্দ্র এবং সুবার (প্রদেশের) সর্বোচ্চ রাজস্ব কর্মকর্তাকে দেওয়ান বলা হতো। ফারসি শব্দ 'দেওয়ান' অর্থ রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় রাজকার্যের তত্ত্বাবধায়ক। মুঘল আমলে সরকারি আয়-ব্যয়, বেতন-ভাতাদিসহ যাবতীয় রাজস্ব সংক্রান্ত বিবরণ রেজিস্ট্রারে সংরক্ষণ করা হতো এবং যিনি এর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার প্রধান ছিলেন তাকে দেওয়ান বলা হতো।
দেবোত্তর ভূমি	হিন্দু ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বরাবরে দানকৃত নিষ্কর ভূমিকে দেবোত্তর ভূমি বলা হয়।

ধান্যকরারী	নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান দ্বারা পরিশোধিত ভূমি খাজনা। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে ধান্যকরারী প্রথার প্রচলন থাকলেও ময়মনসিংহের সুসঙ্গ পরগণায় এর আধিক্য ছিল।
নজরানা	এক প্রকার আবওয়াব। মুঘল আমলে সুবাদারের সঙ্গে বার্ষিক সাক্ষাতের সময় জমিদারকে বা জমিদারের সঙ্গে কৃষকরা সাক্ষাত করলে বা জমিদার বা তার নায়েব গোমস্তারা গ্রাম পরিদর্শনে আগমন করলে কৃষকদেরকে এক প্রকার সেলামি/কর/অর্থ প্রদান করতে হতো। এটাই নজরানা হিসেবে পরিচিত।
নানকার ভূমি	জমিদারদের কাজের বিনিময়ে রায়ত/কৃষককে দানকৃত নিষ্কর ভূমিকে নানকার ভূমি বলা হয়। ময়মনসিংহ, সিলেট ও আসাম অঞ্চলে নানকার ভূমি ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। নানকার শ্রেণির কৃষককে উত্তরাধিকারী সূত্রে জমিদারের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজ করতে হতো। অবশ্য মুঘল আমলে সরকার কর্তৃক জমিদারকে রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রদত্ত ভাতা বাবদ বরাদ্দকৃত ভূমিকেও নানকার ভূমি বলা হয়।
নামখারিজ	নামে দাখিল খারিজ করা (Mutation of names).
নামজারী	জমির নিবন্ধন (Land registraion).
নাল জমি	চাষ উপযোগী জমি (Cultivating land).
নায়েব	জমিদারের কর্মচারী।
নিরিখ	প্রথানুযায়ী বা রেওয়াজ অনুযায়ী বা প্রচলিত ভূমি করের হার বা খাজনার হার (Customary rate of rent). পরগণার বা মৌজার নির্ধারিত বিঘা/একর প্রতি ভূমির খাজনার হারকে নিরিখ বলা হয়। পরগণার ভূমির মান, পরিমাপ এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে নিরিখ নির্ধারণ করা হতো। পরবর্তী নিরিখ ধার্যের পূর্ব পর্যন্ত আগের নিরিখ কার্যকর থাকতো। খোদকাশ্‌ত রায়তরা পরগণা নিরিখ অনুযায়ী খাজনা দেওয়ার অধিকারী ছিল।
নিষ্কর	খাজনা বিহীন (Rent free).
পত্তন	বন্দোবস্ত (Settlement).
পত্তনি	জমিদারি খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে ভূমি করের বন্দোবস্ত। সিরাজুল ইসলাম তাঁর গ্রন্থে এইচ.এইচ. উইলসনের উল্লেখপূর্বক পত্তনির সংজ্ঞায় বলেন, "A tenure by which the occupant holds of a zamindar a portion of the zamindari in perpetuity, with the right of hereditary succession, and of letting or selling the whole or part as long as the stipulated amount of rent is paid to the zamindar, who retains the power of

sale for arrears, and is entitled to a regulated fee or fine upon any transfer."[2] ১৮১৯ সালের অষ্টম আইনে পত্তনিপ্রথার প্রবর্তন করা হয়।

পরগণা ও সরকার — কতকগুলো গ্রাম সমন্বয়ে ভূমিরাজস্ব ইউনিট পরগণা গঠিত হয়। আর কয়েকটি পরগণার সমন্বয়ে গঠিত হয় সরকার। সম্রাট শেরশাহ তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যকে ৪৭টি ভাগে বিভক্ত করেন; এর প্রত্যেকটি ভাগকে সরকার বলা হতো। প্রত্যেক সরকার আবার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক পরগণায় কতকগুলো গ্রাম ছিল। মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালে সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবায় বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক সুবা কয়েকটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকার আবার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করা হয়।[৩]

পয়স্তি — নদীগর্ভে বিলীন হওয়া জমি পুনরায় জেগে উঠা (Alluvion).

পাইক — জমিদারের কাছারির নিরাপত্তা রক্ষী।

পাইকাশ্‌ত রায়ত — অস্থায়ী অনাবাসিক রায়ত/কৃষক। তারা অন্য গ্রামে জমি চাষ করে। ফসল তোলার পর নিজ গ্রামে ফিরে আসে। জমিতে তাদের কোনো স্থায়ী অধিকার ছিল না।

পাটোয়ারি — গ্রামের কৃষি সংক্রান্ত হিসাব রক্ষক। পাটোয়ারিকে গ্রামের পরিবার প্রধান, ভূমির পরিমাণ, উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ, খাজনার পরিমাণ, বকেয়ার পরিমাণ প্রভৃতির হিসেব সংরক্ষণ করতে হয়।

পার্বণী — এক প্রকার আবওয়াব/কর। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে জমিদার কর্তৃক কৃষকের ওপর আরোপিত আবওয়াব/কর।

পীরোত্তর ভূমি — ইসলাম ধর্মের অনুসারী পীরদের বরাবরে দানকৃত নিষ্কর ভূমিকে পীরোত্তর ভূমি বলা হয়।

পুণ্যাহ উৎসব — নবাব কর্তৃক জমিদারদের উপস্থিতিতে বা জমিদার কর্তৃক কৃষকদের উপস্থিতিতে বাংলা সনের প্রথম তারিখ ১ বৈশাখে বিগত বছরের রাজস্ব/খাজনা আদায় এবং পরবর্তী বছরে রাজস্ব/ খাজনা ধার্যের অনুষ্ঠান।

পেয়াদা — জমিদারের সশস্ত্র বার্তাবাহক।

ফরমান — নির্দেশনামা। সম্রাট কর্তৃক নবাবকে বা নবাব কর্তৃক জমিদারকে বা জমিদার কর্তৃক কৃষককে সীলমোহরকৃত বার্তা প্রেরণ।

বকেয়া — বাকি বা অপরিশোধিত।

বন্দোবস্ত — বার্ষিক রাজস্ব/খাজনা প্রদানের শর্তে জমি বরাদ্দ প্রদান কার্যক্রম।

---

[২] Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal : A Study of Its Operation 1790-1819* (Dacca : Bangla Academy, 1979), p. 71; Sirajul Islam, *Bengal Land Tenure : The Origin and Growth of Intermediate Interests in the 19th Century*, CASP13 (Rotterdam : Erasmus University, Netherlands, 1985), p. 11.

[৩] করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, পৃ. ১৯৯ ও ২৫৮-২৫৯।

বাটোয়ারা	ভাগাভাগি (Partition).
বোর্ড অব রেভেনিউ	ঔপনিবেশিক শাসনামলে রাজস্ব বিভাগের সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সংস্থা ছিল বোর্ড অব রেভেনিউ। ক্ষমতা ও গুরুত্বে গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের পরেই ছিল এর স্থান। বোর্ডের দায়িত্ব ছিল ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত ও ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ কেন্দ্রীয়ভাবে তত্ত্বাবধান ও অন্যান্য রাজস্ব বিষয়েও তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা।
মণ্ডল	গ্রাম প্রধান।
মফস্বল তালুক বা মাজকুরী তালুক	দশসনা বন্দোবস্তের সময় দু'ধরনের তালুক ছিল যথা মফস্বল তালুক এবং হুজরী তালুক। মফস্বল তালুকের আরেক নাম মাজকুরী তালুক। যে তালুকের রাজস্ব সরাসরি জমিদারকে প্রদান করতে হয় তাকে মফস্বল তালুক বলা হয়। অর্থাৎ যে তালুকের রাজস্ব জমিদারের মাধ্যমে সরকারকে দিতে হয় তাকে মফস্বল তালুক বলা হয়।
মহাল	রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্ধারিত এলাকা। মহাল ও পরগনা একই ধরনের। মহাল আরবি শব্দ। মহালের সংস্কৃত প্রতিশব্দ প্রতিগণা বা পরগনা। কতকগুলো গ্রাম সমন্বয়ে ভূমিরাজস্ব ইউনিট মহাল গঠিত হয়।
মহাজন	গ্রামীণ অর্থ লগ্নিকারী। গ্রামীণ সুদ ব্যবসায়ী।
মুকাদ্দম	গ্রামের মাতব্বর/মোড়ল।
মেয়াদি	কয়েক বছরের জন্য।
মোকাররারি	স্থায়ী অপরিবর্তনীয় খাজনা বিশিষ্ট। খাজনা বৃদ্ধির অযোগ্য (At fixed rent).
মোকাররারি জোত	নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে ভোগদখলি জমি।
মৌজা	সর্বনিম্ন রাজস্ব ইউনিট। রাজস্ব ব্যবস্থার একক হলো মৌজা বা গ্রাম। হালি বা আবাদি, বাস্তু, নালা, পুকুর, বাগিচা ও পতিত প্রভৃতি জমি নিয়ে একটি মৌজা বা রাজস্ব গ্রাম গঠিত হয়। প্রতিটি মৌজা বা গ্রামের সীমানা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে।
রসুম	রাজস্ব কর্মকর্তাদের জন্য খাজনার অতিরিক্ত প্রথাসিদ্ধ প্রদত্ত আবওয়াব/কর। জমিদার রাজস্ব আদায়ের জন্য যে অর্থ পেতো তাও রসুম নামে অভিহিত ছিল।
রায়তওয়ারি ব্যবস্থা	সরকার কর্তৃক সরাসরি রায়ত/কৃষকের নিকট হতে খাজনা আদায় করার রীতি রায়তওয়ারি ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত।
লাখেরাজ ভূমি	নিষ্কর ভূমি।
সাজোয়াল	রাজস্ব দিতে অপারগ জমিদারদের জমিদারি পরিচালনা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য নিয়োগকৃত সরকারি কর্মকর্তা।

সামিল জমা	অন্য জমার সাথে একই জমাভুক্ত।
সায়ের	জলকর। জেলেদের মাছ ধরার জন্য জমিদারদের সায়ের নামে এক প্রকার কর দিতে হতো।
সূর্যাস্ত আইন	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব দেওয়ার বাধ্য-বাধকতার আইন। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে (১৭৯৩ সালের রেগুলেশন ১৪ এবং পরবর্তীকালে প্রণীত ১৭৯৫ সালের রেগুলেশন ৬, ১৭৯৯ সালের রেগুলেশন ৭, ১৮০১ সালের রেগুলেশন ১ ও ১৮০৩ সালের রেগুলেশন ২৬) বলা হয় যে, যে-কোনো কারণেই হোক যদি রাজস্ব বাকি পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ জমি নিলামে বিক্রি করে বকেয়া রাজস্ব সংগ্রহ করা যাবে। এসব আইনের সাধারণ নাম Regulations for the Sale of Revenue Lands, সাধারণভাবে এগুলো সূর্যাস্ত আইন নামে পরিচিত ছিল।[৪] অর্থাৎ রাজস্ব প্রদান বা বকেয়া রাজস্বের জন্য জমি নিলামে বিক্রির তারিখ অপরিবর্তনযোগ্য ছিল। এই অনড় আইনের রূপক নাম ছিল সূর্যাস্ত আইন।
সেলামি	উপরস্থকে নিম্নপদস্থের প্রদত্ত সম্মানসূচক কর/উপঢৌকন। নবাবকে জমিদার বা জমিদারকে জোতদার বা কৃষকদের এই ধরনের কর দিতে হতো। আবার কোনো জমিদারের অধীনস্থ কৃষককে জমি হস্তান্তর বা জমিদারি এলাকায় ঘর তোলা বা গাছ কাটার জন্য জমিদারকে কৃষকদের সেলামি প্রদান করতে হতো।
সেরেস্তা	অফিস/দপ্তর।
সিকস্তি	নদীগত বা নদীগর্ভে বিলীন হওয়া (Diluvion).
স্থিতিবান	স্থায়ী বা নির্দিষ্ট (Settled).
স্থিতিবান রায়ত	স্থায়ী স্বত্বের অধিকারী রায়ত/কৃষক।
হস্তবুদ	ভূমি ও রাজস্বের অতীত ও বর্তমানের বিস্তৃত হিসেব (Rent Roll).
হুজরী তালুক	যে সব তালুক সরাসরি সরকারকে রাজস্ব দিতো তাদেরকে বলা হয় হুজরী তালুক।

[৪] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৯), পৃ. ১৪২।

শব্দসংক্ষেপ (Abbreviation)

AICC	All India Congress Committee
AIML	All India Muslim League
AL	Awami League
BD Member	Basic Democratic Member
BPCC	Bengal Provincial Congress Committee
BR	Board of Revenue
BTA	Bengal Tenancy Act
CA	Constituent Assembly
GDP	Gross Domestic Product
GNP	Gross National Product
KPP	Krishak Praja Party
MLA	Member of the Legislative Assembly
MNA	Member of the National Assembly
MP	Member of the Parliament
MPA	Member of the Provincial Assembly
NAB	National Archives of Bangladesh
PPP	Pakistan Peoples Party
SDIB	Secret Documents of Intelligence Branch
SRD	Secret Report Document
SSR	Survey and Settlement Report

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই অভিসন্দর্ভটির কাজ সুষ্ঠ্যভাবে সম্পন্ন করার তৌফিক দেওয়ার জন্য আমি পরম করুণাময় মহান আল্লাহু রাব্বুল আলামিন-এর দরবারে শোকর আদায় করছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এই অভিসন্দর্ভটির কাজ যার সর্বাত্মক সহযোগিতা ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না, তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. প্রদীপ চাঁন দুগার। এই অভিসন্দর্ভটি রচনার সময় নানা ধরনের প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছি। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর আন্তরিক এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণার কাজ শেষ করা সম্ভব হতো না। তাঁর অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা, সুচিন্তিত পরামর্শ ও সঠিক দিক নির্দেশনার ফলে আমি আমার গবেষণার কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। এ কারণে আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশেষত বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. এম. মোফাখখারুল ইসলামের পরামর্শ গ্রহণ করি। তাঁর দিক নির্দেশনা এবং পরামর্শক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী "বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ১৯৫০-১৯৮৪" শীর্ষক বিষয়ের ওপর একটি রূপরেখাও (Synopsis) প্রণয়ন করি। কিন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি শেষে অবসারে যাওয়ার কারণে বিধি অনুযায়ী পিএইচ.ডি গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হতে না পারায় তাঁর পরামর্শক্রমে বিভাগের অধ্যাপক ড. ঈশানী চক্রবর্তীকে উক্ত বিষয়ের ওপর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি সানন্দে রাজি হন। অতঃপর উক্ত বিষয়ের ওপর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হন অধ্যাপক চক্রবর্তী ও যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক হন অধ্যাপক ইসলাম। পরবর্তীকালে তাঁদের সুপারিশের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক "বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ভূমি বিরোধের রাজনীতি, ১৮৮৫-১৯৭১" শীর্ষক বিষয় নিয়ে নতুন করে কাজ শুরু করি। আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

গবেষণার শুরুতে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার ওপর একটি ব্যাখ্যামূলক অভিসন্দর্ভ রচনার ইচ্ছে থাকলেও পরবর্তীকালে ইতিহাস বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল, অধ্যাপক ড. প্রদীপ চাঁন দুগার ও ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এম. এ. কাউসার, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মনিরুল ইসলাম, একই বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. খায়রুল ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ড. মো. জাহিদ উল আরেফিন চৌধুরীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পণ্ডিত শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে বাংলাদেশের অভ্যুয়ের সঙ্গে ভূমি বিরোধের রাজনীতির সম্পর্ক নিরূপণে মৌলিক চিন্তাধারার ওপর গবেষণামূলক কাজ করতে মনস্থির করি। বর্তমান গবেষণার শিরোনামের ওপর কাজ করতে উৎসাহ এবং সুপরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য আমি তাঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে সহকর্মী ও সুহৃদ এম. এ. কাউসার বাংলাদেশের অভ্যুয়ের সঙ্গে ভূমি বিরোধের সম্পর্ক নিরূপণে কাজ করতে নিরন্তর উৎসাহ ও নানা ধরনের পরামর্শদান এবং এর মাধ্যমে নতুন ধরনের মৌলিক চিন্তাধারার অবতারণা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করে এই গবেষণায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল বাংলাদেশের অভ্যুয়ের সঙ্গে ভূমি বিরোধের সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ তত্ত্ব প্রয়োগের সুচিন্তিত সুপরামর্শদানপূর্বক অভিসন্দর্ভ রচনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করায় আমি তাঁর প্রতি চিরঋণী।

এছাড়াও গবেষণায় উৎসাহ, সুপরামর্শদান ও নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক ড. আহমেদ কামাল, অধ্যাপক ড. রতন লাল চক্রবর্তী, অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমীন, অধ্যাপক ড. নুরুল হুদা আবুল মনসুর, অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. রাণা রাজ্জাক, অধ্যাপক ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী, অধ্যাপক ড. আশা ইসলাম নাঈম, অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন, শহীদুল হাসান ও মিঠুন কুমার সাহা-সহ বিভাগের অন্য শিক্ষকগণ। আমি তাঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

ইতিহাস বিভাগ সেমিনার গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার এবং সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আমার গবেষণাকর্মে সার্বিক সহযোগিতা করায় তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়াও আমার ছাত্র তানভীর আহমেদ অপু এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের স্টাফ সোহেল আহমেদ গবেষণাকর্মে সহযোগিতা করার জন্য তাঁদের দু'জনকেই বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও আমি আমার সকল শুভাকাঙ্খীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার স্ত্রী মিসেস রেফায়েত সুলতানা (যুথী) এবং আমার সন্তান এস. এম. মামনুন রেয়ান আমার গবেষণার কাজে নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছে। এজন্য আমি তাঁদের দু'জনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও আমার পাঁচ বোন মিসেস ছবিরুন্নেছা, মিসেস সালমা বেগম, মিসেস ফিরোজা বেগম, মিসেস রেবেকা খানম ও শেখ আফরিন আফসারী এবং ভগ্নীপতিগণ-যাঁরা আমার গবেষণার কাজে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের সবাইকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বশেষ আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি আমার পিতা শেখ মোঃ আফছার উদ্দিন এবং আমার মমতাময়ী মা শেখ ফাতেমা আফছারীর নাম, তাঁরা ছিলেন আমার উচ্চ শিক্ষার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার উৎসস্থল। ১৯৯৫ সালের ১ জুলাই পিতার মৃত্যুর পর থেকে আমার মা একাই পিতা-মাতা উভয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু গবেষণারত অবস্থায় ২০১৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর আমার মমতাময়ী মা মৃত্যুবরণ করেন। সৃষ্টিকর্তা পরম দয়ালু মহান আল্লাহু রাব্বুল আলামিন-এর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার পিতা-মাতা উভয়কেই জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন। এই অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম।

সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও অভিসন্দর্ভে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

(এস. এম. রেজাউল করিম)
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩০ জুন, ২০২১

সারসংক্ষেপ (Abstract)

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কারণ সম্পর্কে বর্তমানে যে কয়েকটি চিন্তাধারা (school of thoughts) প্রতিষ্ঠিত আছে তার সঙ্গে একটি নতুন চিন্তাধারার অবতারণা করা। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে তিনটি চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থিত এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো বাংলা ভাষার ভিত্তিতে গড়ে উঠা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। অন্য আরেকটি চিন্তাধারা হলো পাকিস্তান শাসনামলের বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অপর চিন্তাধারাটি হলো স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে সৃষ্ট পরিস্থিতির চূড়ান্ত ফলস্বরূপ বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে (এ সম্পর্কে প্রকাশনা পর্যালোচনায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। এসব চিন্তাধারাসমূহ একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কিত। আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রচলিত চিন্তাধারাগুলোর বাইরে গিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কারণ অনুসন্ধান। এটা করতে গিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে ভূমি বিরোধের রাজনীতি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য, ভূমি বিরোধের সঙ্গে বিভিন্ন পক্ষের (অংশীজনের) সংশ্লিষ্টতা থাকলেও আলোচ্য গবেষণায় তিনটি পক্ষের মধ্যকার ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বকে আলোচনায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় আরও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব কীভাবে রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে ও রাজনীতির কারণে কীভাবে এই দ্বন্দ্ব প্রভাবিত হয়েছে। অর্থাৎ ভূমি বিরোধ ও রাজনীতি কীভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব কীভাবে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তা কীভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করেছে তা নিয়েই এই গবেষণায় বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকাল হতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল পর্যন্ত ভূমির ওপর রাজা বা রাষ্ট্রের মালিকানাস্বত্ব ও স্বত্বাধিকারস্বত্ব বহাল ছিল এবং একইসঙ্গে ভূমিতে কৃষকেরও প্রথাগত অধিকার বজায় থাকায় ভূমি বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে একদিকে কৃষক তার প্রথাগত অধিকার হারিয়ে ফেলে এবং অন্যদিকে জমিদার ভূমির ওপর মালিকানাস্বত্ব ও স্বত্বাধিকারস্বত্ব লাভ করার ফলে ভূমি বিরোধের সূচনা হয়। এই পর্যায়ের ভূমি বিরোধ ছিল জমিদার ও কৃষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ১৮১৯ সালের পত্তনি প্রথা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগী তথা জোতদারি ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে কৃষকের ওপর শোষণ ও নিপীড়নের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এই পত্তনিপ্রথার প্রবর্তনের ফলে ভূমি বিরোধ ত্রিপক্ষীয় রূপ ধারণ করে এবং তা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়। ত্রিপক্ষীয় এই ভূমি বিরোধে প্রধানত কৃষকের ওপর জমিদার ও জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়নের কারণে বাংলায় বহু সংখ্যক কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। ভূমি বিরোধ হ্রাস করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে শাসনকর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়ন করলেও সর্বপ্রথম ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের কিছুটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমেই কৃষকরা সর্বপ্রথম ভূমিতে কিছু অধিকার পায় যা পরবর্তীকালে প্রণীত ভূমি সংস্কার আইনে এই অধিকার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। উল্লেখ্য, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হলেও বিশ শতকের বিশের দশকের পূর্ব পর্যন্ত রাজনীতিতে কৃষকদের সংশ্লিষ্টতা ছিল না। তখন পর্যন্ত ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে একচেটিয়া প্রভাব-প্রতিপত্তি ও

প্রাধান্য ছিল কেবল জমিদার ও জোতদারদের। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে ভূমিতে কৃষকের কিছুটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও জাতীয় রাজনীতিতে কৃষকদের সংশ্লিষ্টতা না থাকায় ভূমিস্বত্বের ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং শোষণ ও নিপীড়ন হতে অব্যাহতি পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। অন্যদিকে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় কোনোরূপ ভূমিকা পালন করেননি। ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ ভোট রাজনীতির সূচনা হলে রাজনীতিতে কৃষকদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এরপর থেকেই দেখা যায় যে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে বিভিন্ন কৃষক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু হয়। কৃষক সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং কৃষকদের সংগঠিত করে শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে এবং অধিকার আদায়ে আইন পরিষদের ভিতরে ও বাইরে রাজনীতিবিদরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৮ সালের সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের সময় আইন পরিষদের ভিতরে কৃষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় মুসলমান জমিদার এবং জোতদার শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কৃষকদের স্বার্থের পক্ষে এবং জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস ও স্বরাজ দলের নেতৃবৃন্দ কৃষকদের স্বার্থের বিপক্ষে অবস্থান নেন। উল্লেখ্য, ১৯১৯ সালের আইনে ভোট রাজনীতির সূচনা হলেও নির্বাচকমণ্ডলীতে স্বল্প সংখ্যক কৃষকের অন্তর্ভুক্তির কারণে ১৯২০, ১৯২৩, ১৯২৬, ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালের নির্বাচনে কৃষকের গুরুত্ব কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকদের স্বার্থ পূরণের জন্য তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি ছিল না। কিন্তু ১৯৩২ সালের স্যার র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ভিত্তিতে প্রণীত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বিপুল সংখ্যক কৃষকের নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে রাজনীতিতে কৃষকদের গুরুত্ব আরও অনেক বৃদ্ধি পায়। এই আইনের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক কৃষকের ভোটাধিকার লাভের ফল ছিল বাংলার বিশেষ করে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রাধ্যান্য প্রতিষ্ঠা। জয়া চ্যাটার্জীর মতে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু জমিদারদের প্রাধান্যের অবসান হয়ে মুসলিম জোতদারদের প্রাধ্যান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জমিদার ছিল হিন্দু এবং অধিকাংশ কৃষক ছিল মুসলমান। আর অগ্রসরমান মুসলমান কৃষক বা জোতদাররা বিশ শতকের বিশ হতে চল্লিশের দশকে রাজনীতিতে নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এ কারণে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ভিত্তিতে অগ্রসারমান মুসলমান জোতদাররা রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ শুরু করেন বলে চ্যাটার্জী অভিমত দেন। মুসলমান জোতদারদের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের সুদূরপ্রসারী ফলস্বরূপ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিজয়ী হয় ও বাংলায় মুসলমানদের প্রাধান্য আরও বেশি বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মূল নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে মুসলমান জোতদাররা তথা সচ্ছল কৃষক। ১৯৪৬ নির্বাচনের ফলস্বরূপ দেশভাগের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং বাংলা ভাগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা পায়, যাকে চ্যাটার্জী জোতদার রাজ প্রতিষ্ঠা বলে উল্লেখ করেন। সুতরাং ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের ফল।

উল্লেখ্য, ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কৃষকদের সমর্থনে বিজয়ী প্রতিনিধিদের একটি বড় অংশ ছিল মুসলিম জোতদার এবং অল্প সংখ্যক মুসলমান জমিদার। এই জোতদার এবং জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সরকার কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অনেকগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে ১৯৩৮ সালের সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালের ভূমি রাজস্ব কমিশন বা ফ্লাউড কমিশন গঠন, ১৯৩৯ সালের সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন, ১৯৫০

সালের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন প্রভৃতি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ভূমি বিরোধের রাজনীতির ফলেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কৃষকদের স্বার্থে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উল্লেখ্য, বিশ শতকের বিশের দশক হতে ভূমি বিরোধের রাজনীতির ফলে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান হয়েছিল তার তীব্রতা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পর অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল। তবে যদিও কৃষকদের স্বার্থে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জোতদারি ব্যবস্থা বহাল থাকায় শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে কৃষকরা চূড়ান্তভাবে মুক্তি পায়নি। অবশ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে (যাদের অধিকাংশ সচ্ছল কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসেছিল) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ তথা আওয়ামী লীগ গঠনের পর থেকে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে জমিদার ও জোতদার শ্রেণির প্রাধান্য হ্রাস পেতে শুরু করে। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তুলনামূলকভাবে সাধারণ কৃষকের ঘর থেকে উঠে আসা রাজনৈতিক নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে। উপরন্তু, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ২১ বছর বয়স্ক ব্যক্তিরা ভোটাধিকার লাভ করায় ভোটের রাজনীতিতে কৃষকরা মূল নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে কৃষকদের ক্ষমতায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ এই সাধারণ কৃষকরা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের কারণে নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার কৃষকদের স্বার্থে তেমন কিছু করতে সক্ষম হয়নি। উপরন্তু, জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে ভূমির ঊর্ধ্ব সীমা বর্ধিত করে ১৯৬১ সালের প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ ও মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে জোতদাররা ভূমিস্বত্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং রাজনীতিতে শক্তিশালী হয়ে উঠায় পুনরায় ভূমি বিরোধ তথা জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়। আইয়ুব সরকারের আমলে ইতোপূর্বে রাজনীতিতে নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ কৃষকরা অপসারিত হয় এবং রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে জোতদারদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতনের পর জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণের অল্প সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানে পুনরায় রাজনৈতিক দলগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে এবং তিনি দেশে এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ২১ বছর প্রাপ্তবয়স্কদের যৌথ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকরা ছিল জয় পরাজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি। এর ফলে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কৃষকের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগের সৃষ্টি হয়। এই নির্বাচনে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের বিবেচনায় কৃষকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিশ্রুতিমূলক ইশতেহার প্রদান করে। তবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তুলনায় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারই ছিল কৃষি ও কৃষক বান্ধব। লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করা হয় যে তারা বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের সুযোগ পেলে কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠা করবে এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমির মালিক কৃষককে খাজনা বা রাজস্ব দিতে হবে না। অর্থাৎ যে কর-খাজনার জন্য কৃষককে এতোদিন শোষিত ও নিপীড়িত হতে হয়েছে তার থেকে তারা চিরস্থায়ীভাবে মুক্তি পাবে। এছাড়াও তারা আইন প্রণয়ন করে ভূমির ঊর্ধ্ব সীমা ১০০ বিঘা কার্যকর করবে। অর্থাৎ দেশে জোতদার শ্রেণির অবসান হবে। উপরন্তু, লীগ বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে রাষ্ট্র কৃষকদের স্বার্থে কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করবে এবং ভূমিহীন কৃষকদেরকে রাষ্ট্র বিনামূল্যে ভূমি প্রদান করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ প্রদান করবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে লীগের এই কৃষি ও কৃষক বান্ধব নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের আকৃষ্ট করা। লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিতে

আকৃষ্ট হয়ে কৃষকরা তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠা, ভূমিস্বত্বের ওপর তাদের অধিকার অর্জন প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তির আশায় আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে সমর্থন দিয়ে বিজয়ী করে। কিন্তু নির্বাচনে বিজয়ী হলেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের কারণে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয়। এমনকি ইয়াহিয়া খান সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেও ১ মার্চ (১৯৭১) এক ঘোষণা জারির মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশন স্থগিত করেন। এর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত মার্চ মাসের (১৯৭১) অসহযোগ আন্দোলনে পূর্ব বাংলার কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। কৃষকরা এই প্রত্যাশায় বঙ্গবন্ধুর দলকে নির্বাচনে সমর্থন করেছিল যে আওয়ামী লীগ নতুন সরকার গঠনের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ তৈরি করবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রে কৃষকদের এই আশা ভঙ্গ হলে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। অতঃপর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চ লাইটে নিরীহ কৃষক এবং কৃষকের সন্তানদের (অপারেশন সার্চ লাইটে নিহত শিক্ষার্থীদের প্রায় সবাই ছিল কৃষকের সন্তান) নির্মম হত্যাযজ্ঞে ক্ষুব্ধ হয়ে এবং ২৬ মার্চ (১৯৭১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় উৎসাহী হয়ে কৃষকরা শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তি এবং কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতাযুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। উল্লেখ্য, এই স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় একদিকে ছিল কৃষক ও কৃষকের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং অন্যদিকে ছিল শাসনকর্তৃপক্ষ ও তাদের অনুগত জোতদার শ্রেণি।

বস্তুতপক্ষে, প্রত্যক্ষ ভোটের রাজনীতির কারণে বিশ শতকের ত্রিশের দশকের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ অগ্রসরমান মুসলমান জোতদাররা দীর্ঘদিনের প্রতিপত্তি ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণকারী সংখ্যালঘিষ্ট জমিদারদের পরাজিত করে রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল এবং তাদের নেতৃত্বেই দেশভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং বাংলা বিভক্তির মাধ্যমে পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যাকে জয়া চ্যাটার্জী জোতদার রাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন। ঠিক একইভাবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও সংখ্যাগরিষ্ঠ অগ্রসরমান সাধারণ কৃষকরা রাজনীতির মূল নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দীর্ঘদিনের প্রভাবশালী এবং রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণী সংখ্যালঘিষ্ঠ জোতদারদের পরাজিত করে নির্বাচন পরবর্তী রাজনীতি ও অন্যান্য ঘটনায় যেমন ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলন, দীর্ঘ নয় মাসের স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মূল কারণ ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান

ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ। ভূমি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, শিল্পপণ্য, ভোগ বিলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণসহ মানুষের মৌলিক এবং নানামুখী চাহিদার প্রধান উৎস। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি হচ্ছে এদেশের অধিকাংশ মানুষের আয়ের প্রধান উৎস এবং ভূমি হচ্ছে মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। এমনকি, অভিসন্দর্ভের প্রস্তাবিত সময়ে (১৮৮৫-১৯৭১) রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয়ভারের প্রধান উৎস ছিল ভূমি নির্ভর আয় তথা কৃষি অর্থনীতি। আমিনুর রহিমের মতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাকিস্তানের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি অর্থনীতি। তিনি বলেন যে ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৯৪.৮% মানুষ গ্রামে বসবাস করতো এবং ৮৫% মানুষ ভূমি তথা কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল।[১] ১৯৬৯-৭০ সালের জি.ডি.পি এবং ১৯৪৯-৫০ হতে ১৯৬৯-৭০ সালের জি.এন.পি প্রমাণ করে যে পাকিস্তান শাসনামলে ভূমি তথা কৃষিই ছিল অর্থনীতির মূল ভিত্তি (সারণি* ১ এর ক এবং খ)।[২] সারণি ১ (ক) থেকে দেখা যায় যে ১৯৬৯-৭০ সালে জি.ডি.পি-তে কৃষি খাতের অবদান ছিল ৬২.৪২%। অন্যদিকে সারণি ১ (খ) থেকে দেখা যায় যে ১৯৪৯-৫০ হতে ১৯৬৯-৭০ সালে জি.এন.পি-তে কৃষি খাতের অবদান ছিল সর্বোচ্চ, ১৯৪৯-৫০ সালে ৬০%, ১৯৫৪-৫৫ সালে ৫৬.১%, ১৯৫৯-৬০ সালে ৫৩.৩%, ১৯৬৪-৬৫ সালে ৪৭.৮% এবং ১৯৬৯-৭০ সালে ৪৬.৩%। অর্থাৎ এককভাবে কৃষি খাতের ওপর দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকের জীবন-জীবিকা ও রাষ্ট্র পরিচালনা নির্ভরশীল ছিল। এই এলাকায় ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ভূমির পরিমাণ সীমিত। একারণে এই অঞ্চলের ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও ভূমির প্রভাব অনস্বীকার্য। ভূমির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলো কৃষক। ভূমি আলোচনায় কৃষি বাদ দিলে এবং কৃষি আলোচনায় কৃষক বাদ দিলে আলোচনা অর্থহীন। অর্থাৎ ভূমি-কৃষি-কৃষক একে অপরের পরিপূরক অথবা ভূমি-কৃষি-কৃষক একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভূমিকে কেন্দ্র করেই মানুষের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। মানুষের এই সার্বিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অন্যতম। মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য অনেক সময় মানুষ রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। মানুষ নিপীড়িত ও নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামের পথে ধাবিত হয় এবং সংগ্রামের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে মানুষ তার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে চেষ্টা করে।

বাংলাদেশের ভূমি কেন্দ্রিক রাজনীতির ইতিহাস প্রাচীন হলেও ১৮৮৫ সালে কৃষক শ্রেণি ভূমিতে সর্বপ্রথম যে অধিকার লাভ করে তার ফলে তারা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে যে পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হলে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। দীর্ঘ দিনের অব্যাহত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে কৃষকের সেই মুক্তির স্বপ্ন পূরণ হয়। প্রসঙ্গত বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জাতীয়তাবাদী,

---

[১] Aminur Rahim, *Politics and National Formation in Bangladesh* (Dhaka : The University Press Limited, 1997), pp. 207 and 227.

* সারণি (১-৫০) পরিশিষ্ট অংশে দেখুন।

[২] *Bangladesh Economic Survey 1980-81*, Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1981), P. 2; Sawdesh R. Bose, "The Pakistan Economy since Independence 1947-70", Dharma Kumar (ed.), *The Cambridge Economic History of India,* Volume 2 : c. 1757-c. 1970 (Cambridge : Cambridge University Press, Reprinted 1989), p. 1000.

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা হলেও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভূমি বিরোধের রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে মৌলিক গবেষণার অভাব রয়েছে। এ কারণেই বর্তমান গবেষণার অবতারণা। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের আলোকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কারণ অনুসন্ধান।

প্রাচীনকাল হতে বাংলার ভূমি হলো মানুষের আয় এবং সরকারি রাজস্বের অন্যতম প্রধান উৎস। প্রাচীন আমল হতে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ভূমি ব্যবস্থায় কৃষক কেবলমাত্র ভূমির মালিকানাস্বত্ব ভোগ করতো। এটিই ছিল তখনকার ভূমি ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে কৃষক ভূমিতে ফসল উৎপাদন করতে পারতো ঠিকই কিন্তু ভূমি হস্তান্তর করতে পারতো না। সংক্ষেপে বলতে গেলে ১৭৯৩ সালের পূর্বে ভূমি বিরোধের বা জমিদার-কৃষক দ্বন্দ্বের উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনার নজির পাওয়া যায় না। কিন্তু ১৭৯৩ সালের পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের ঘটনা ছিল ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাসে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদার একই সঙ্গে ভূমির মালিকানা ও স্বত্বাধিকার লাভ করে এবং কৃষক জমিদারের অধীনস্থ ভূমিদাসে পরিণত হয়। শুরু হয় কৃষকের ওপর জমিদারের শোষণ ও নিপীড়ন। এই শোষণ ও নিপীড়ন জমিদার-কৃষক দ্বন্দ্বকে আরও জটিল পর্যায়ে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ১৮১৯ সালের আইনে জোতদারি প্রথার প্রবর্তন হয়। এরপর কৃষকের ওপর জমিদার ও জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়নের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যদিও ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে ভূমি বিরোধ হ্রাস করতে এবং ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে কিন্তু ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের পূর্ব পর্যন্ত কৃষক সত্যিকার অর্থে ভূমিস্বত্বের ওপর কোনোরূপ অধিকার পায়নি। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমেই কৃষক সর্বপ্রথম ভূমিস্বত্বের ওপর স্বীকৃতি পায় যা ছিল ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাসে মাইল ফলক। অবশ্য ততোদিনে কৃষক এত বেশি দরিদ্র হয়ে পড়ে যে এই অধিকার ধরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মূলত দারিদ্র্যতার কারণে কৃষক বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে প্রাপ্ত ভূমির অধিকার হস্তান্তর করতে শুরু করে। এই ভূমি হস্তান্তরের ফলে পুনরায় অধিকার প্রাপ্ত কৃষক ভূমিহীনে পরিণত হতে থাকে। তারপরও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ছিল কৃষকের ভূমি মালিকানাস্বত্বের ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ। কারণ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের পর হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে ধীরে ধীরে কৃষকের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষণীয়ভাবে প্রকট হয়। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক আমলের শেষ দিকে ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভোটের রাজনীতির সূচনা হওয়ায় কৃষি ও কৃষকের গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। এমনকি, ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও দলের নেতৃবৃন্দ জমিদারি প্রথার অবসান এবং ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জোর প্রচারণা শুরু করে। ভোট রাজনীতির কারণে ঔপনিবেশিক শাসনের পর ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কৃষকের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ভোট রাজনীতির কারণেই ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জড়িয়ে পড়ে। কৃষকের ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রতিনিধিরা পরিষদের ভিতরে ও বাইরে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং শোষণ ও নিপীড়ন হতে কৃষককে রক্ষায় সোচ্চার হয়ে উঠে। এই ভূমি বিরোধের রাজনীতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে ভূমিকা পালন করেছে কিনা তা এই গবেষণায় অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ কারণেই ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত সময়কালকে গবেষণার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

১.২ ভৌগোলিক সীমারেখা

এই গবেষণার প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভূমি বিরোধের রাজনীতির সম্পর্ক নিরূপণ করা। উল্লেখ্য, ভূমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ বা ভূমির বিভিন্ন অংশীজন থাকলেও এই গবেষণায় ভূমির অংশীজন হিসেবে সরকার, জমিদার, জোতদার ও কৃষকের পরিবর্তন এবং এর পরিণতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটা করতে গিয়ে সরকারের নীতি কৌশলে পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন ভূমি আইন প্রণয়ন, ভূমি বিরোধের পক্ষ হিসেবে জমিদার, জোতদার এবং কৃষকের পরিবর্তন, তাদের ওপর এর প্রভাব ও পরিণতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভে ১৯৪৭ সালের পূর্বে প্রাচীন বাংলা বা অবিভক্ত বাংলা এবং ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব বাংলা সম্পর্কিত প্রণীত আইনের প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি আলোচনাকালে প্রধানত ১৯৭১ সালে অভ্যুদয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখাকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, কখনও কখনও প্রাচীন আমলের বাংলার ভূমি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় এসেছে। বঙ্গভঙ্গ পূর্ববর্তী বাংলা বা এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমারেখা নিয়ে ভিন্নমত থাকলেও এটি গবেষণায় এসেছে তুলনামূলক আলোচনার জন্য। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো ১৯৭১ সালে অভ্যুদয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যকার ভূমি বিরোধের রাজনীতি আলোচনা করা। সুতরাং এই গবেষণায় বর্তমান বাংলাদেশের (মানচিত্র : পৃ. xxv) ভৌগোলিক সীমারেখার ভূমি বিরোধের রাজনীতি আলোচনাই হলো মুখ্য বিষয়।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভূমি বিরোধের রাজনীতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। ভিন্ন কথায় এই গবেষণার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভূমি বিরোধের তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের সম্পর্ক নিরূপণ করা। বঞ্চনার স্বীকার হয়ে কৃষকরা কিভাবে ভূমি বিরোধের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হলো এবং কিভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার পক্ষে জনযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো সেই প্রশ্নগুলোর সমাধান করাই এ গবেষণার মৌল উদ্দেশ্য। উপরিউক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত কতিপয় প্রশ্নের ভিত্তিতে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে :

১. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের ভূমি সংস্কারের ফলাফল কী ছিল?

২. অবিভক্ত বাংলায় ভূমি বিরোধের পরিণতি কী হয়েছিল?

৩. পাকিস্তান আমলের ভূমি সংস্কারের ফল কী ছিল?

৪. পূর্ব বাংলায় ভূমি বিরোধের রাজনৈতিক অর্জন কী ছিল?

১.৪ গবেষণার পরিধি

'বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ভূমি বিরোধের রাজনীতি, ১৮৮৫-১৯৭১' শীর্ষক গবেষণাকর্মের পরিধি ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের সময় থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত সময়কালকে নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনেই সর্বপ্রথম ভূমিস্বত্বের ওপর জমিদারদের অধিকার কিছুটা হ্রাস করে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের (কৃষকদেরকে স্বত্বাধিকারী, স্থায়ী ও অধীনস্থ-এই তিন ভাগে বিভক্ত করে প্রথম দু'ধরনের কৃষককে) স্থায়ী এবং উত্তরাধিকারসহ বিভিন্ন ধরনের অধিকার প্রদান করা হয়েছিল।[৩] অর্থাৎ এই আইনেই

[৩] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Report of the Land Revenue Commission, Bengal*, Vol. I, With Minutes Dissent, (Alipore : Government of Bengal, Bengal Government Press, 1940), pp. 26-27; Nurul Islam Khan (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers :*

সর্বপ্রথম ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের আংশিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও এই আইনে কৃষকের উচ্ছেদ নিষিদ্ধ এবং কৃষককে ভূমিস্বত্বের হস্তান্তরের আইনগত অধিকার প্রদান করা হয়।[৪] অর্থাৎ ১৮৮৫ সাল হলো কৃষক-জমিদার এবং ভূমি সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যমূলক মাইল ফলক। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তি এবং ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের অংশগ্রহণে দীর্ঘ নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। অর্থাৎ এই গবেষণায় ১৮৮৫-১৯৭১ সময়কালে ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব কিভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করেছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু গবেষণা হলেও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভূমি বিরোধের সম্পর্ক আছে কিনা তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো গবেষণাই হয়নি। অর্থাৎ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভূমি বিরোধের রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো গবেষণা করা হয়নি। বর্তমান গবেষণার বৃহত্তর প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাসঙ্গিকতা এখানেই। অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা নিয়ে কিছু গবেষণাকর্ম এবং বিভিন্ন জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করার সময় বিচ্ছিন্নভাবে এবিষয়ে যৎসামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভূমি বিরোধের রাজনীতির সম্পর্ক নিরূপণে সুনির্দিষ্ট কোনো গবেষণা করা হয়নি। এ কারণে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভূমি বিরোধের রাজনীতির সম্পর্ক নিরূপণে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণার অবতারণা করা হয়েছে এবং গবেষণার জন্য ১৮৮৫-১৯৭১ সময়কালকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই গবেষণা এদেশের ভূমি বিরোধের রাজনীতির ইতিহাসে এক বিশেষ শূন্যস্থানকে পূরণ করবে ও নতুন তথ্য-উপাত্তের আলোকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস পুর্নমূল্যায়ন করবে।

১.৬ প্রকাশনা পর্যালোচনা (Literature Review)

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ভূমি বিরোধের রাজনীতি সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কোনো গবেষণা করা হয়নি। অর্থাৎ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভূমি বিরোধের রাজনীতির সম্পর্ক আছে কিনা তা নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট গবেষণা করা হয়নি। এই কারণেই এই বিষয়ে গবেষণার অবতারণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে তিনটি চিন্তাধারা (School of thoughts) প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই চিন্তাধারার প্রবর্তন এবং প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন দেশের প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ। তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন রচনায় উক্ত চিন্তাধারা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এসব পণ্ডিতের মধ্যে আনিসুজ্জামান তাঁর *স্বরূপের সন্ধানে*[৫], মমতাজুর রহমান তরফদার তাঁর "*বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা*"[৬], সাঈদ-উর রহমান

Rangpur, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, (Dacca : Bangladesh Government Press, 1977), p. 275; S. N. H Rizvi (General Editor), *East Pakistan District Gazetteers : Dacca,* Services and General Administration Department, Government of East Pakistan (Dacca : East Pakistan Government Press, 1969), p. 367.

[8] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. I, pp. 26-27; Nurul Islam Khan (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Pabna*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dacca : Bangladesh Government Press, 1978), p. 256; আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী (অনুবাদক : মুহম্মদ হাবিবুর রহমান ও মোহাম্মদ ইমদাদুল হক), *বাংলাদেশের একটি গ্রাম : সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি সমীক্ষা*, (ঢাকা : মৌলি প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ৫৪; নোমান রাজা, 'কৃষক আন্দোলনের পটভূমি', *দৈনিক বাংলা*, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৪।

[৫] আনিসুজ্জামান, *স্বরূপের সন্ধানে* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯)।

[৬] মমতাজুর রহমান তরফদার তাঁর "বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা", মোঃ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত) *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭)।

তাঁর *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*[৭], সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ তাঁর *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*[৮], ওয়াকিল আহমদ তাঁর *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা*[৯] ও মোহাম্মদ শাহ তাঁর *"বাঙালি জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি"*[১০] প্রভৃতি রচনায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব এবং বিকাশ কিভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভূমিকা পালন করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। একইভাবে রওনক জাহান তাঁর *Pakistan : Failure in National Integration*[11], রেহমান সোবহান তাঁর *"বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি"*[১২], আহমেদ কামাল তাঁর *State Against the Nation : The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-54*[13], আমিনুর রহিম তাঁর *Politics and National Formation in Bangladesh*[14], বদরুদ্দীন উমর তাঁর *The Emergence of Bangladesh : Class Struggle in East Pakistan, 1947-58*[15], শেখ মাকসুদ আলী তাঁর *From East Bengal to Bangladesh : Dynamics and Perspective*[16], এ. এম. এ. মুহিত তাঁর *Bangladesh : Emergence of a Nation*[17] এবং মোঃ হাবিবুল্লাহ বাহার তাঁর *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য ১৯৪৭-১৯৬৯ : পার্লামেন্টের ভাষ্য*[১৮] প্রভৃতি রচনায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি কিভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভূমিকা পালন করেছে সে সম্পর্কে তাঁরা বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। অন্যদিকে মওদুদ আহমদ তাঁর *বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*[১৯], কামাল উদ্দিন আহমেদ তাঁর *"স্বায়ত্তশাসনের সন্ধানে"*[২০], তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) তাঁর *পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর*[২১], কামরুদ্দীন আহ্‌মদ তাঁর *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*[২২], তালুকদার মনিরুজ্জামান তাঁর *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*[23], খালিদ বিন সাঈদ তাঁর *Politics in Pakistan : The Nature and Direction of Change*[24], জি. ডব্লিউ. চৌধুরী তাঁর *Democracy in Pakistan*[25], এম. মাহফুজুল হক তাঁর *Electoral Problems in Pakistan*[26], আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর *Sociology of Bengal Politics and Other essays*[27] প্রভৃতি রচনায় পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে সৃষ্ট পরিস্থিতি কিভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভূমিকা পালন করেছে সে সম্পর্কে তাঁরা

---

[৭] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩)।

[৮] সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ, *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২)।

[৯] ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩)।

[১০] মোহাম্মদ শাহ, "বাঙালি জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি" সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ -১৯৭১*, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

[১১] Rounaq Jahan, *Pakistan : Failure in National Integration* (London : Columbia University Press, 1972).

[১২] রেহমান সোবহান, "বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ -১৯৭১*, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

[১৩] Ahmed Kamal, *State Against the Nation : The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-54* (Dhaka : The University Press Limited, 2009).

[১৪] Aminur Rahim, *Politics and National Formation in Bangladesh* (Dhaka : The University Press Limited, 1997).

[১৫] Badruddin Umar, *The Emergence of Bangladesh : Class Struggle in East Pakistan, 1947-58* (Oxford : Oxford University, 2004).

[১৬] Shaikh Maqsood Ali, *From East Bengal to Bangladesh : Dynamics and Perspectives* (Dhaka : The University Press Limited, 2009).

[১৭] A. M. A. Muhith, *Bangladesh : Emergence of a Nation* (Dhaka : The University Press Limited, 1978).

[১৮] মোঃ হাবিবুল্লাহ বাহার, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য ১৯৪৭-১৯৬৯ : পার্লামেন্টের ভাষ্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৭)।

[১৯] মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৩)।

[২০] কামাল উদ্দিন আহমেদ, "স্বায়ত্তশাসনের সন্ধানে", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

[২১] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর* (ঢাকা : বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল ১৯৮১)।

[২২] কামরুদ্দীন আহ্‌মদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা : ইনসাইড লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ-সংশোধিত, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ)।

[২৩] Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh* (Dhaka : Bangladesh Books International, 1975).

[২৪] Khalid Bin Sayeed, *Politics in Pakistan : The Nature and Direction of Change* (New York : Praeger Publications, 1980).

[২৫] G. W. Choudhury, Democracy in Pakistan (Dacca : Green Book House, 1963).

[২৬] M. Mahfuzul Huq, *Electoral Problems in Pakistan* (Dacca : Asiatic Society of Pakistan Publication, 1966).

[২৭] Abu Jafar Shamsuddin, *Sociology of Bengal Politics and Other essays* (Dacca : Bangla Academy, 1973).

বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সুতরাং এসব গবেষকের মতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলস্বরূপ বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে।

তবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভূমি বিরোধের সম্পর্ক নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট গবেষণা করা না হলেও উক্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের উক্ত তিনটি ধারণা বা চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করার সময় স্বল্প পরিসরে এবং বিচ্ছিন্নভাবে দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে জমিদার, জোতদার ও কৃষকের দ্বন্দ্ব তথা ভূমি বিরোধ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এর মধ্যে আনিসুজ্জামান তাঁর *স্বরূপের সন্ধানে* গ্রন্থে উনিশ শতকে কৃষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও কৃষক বিদ্রোহ এবং বিশ শতকে মুসলমান জমিদারদের কৃষকের পক্ষাবলম্বন, মুসলমান সাধারণ পরিবার তথা কৃষকের সন্তানরা শিক্ষিত হয়ে সরকারি চাকরি লাভের উচ্চাভিলাষ হিন্দুর প্রতিপত্তির অন্তরায়, পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে কবি সাহিত্যিকদের লিখনী, বাংলা তথা পূর্ব বাংলার মুসলমান জমিদার, জোতদার ও কৃষকদের মধ্যকার সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তাঁর লেখায় ভূমি বিরোধের খণ্ড চিত্র ফুটে উঠেছিল। সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ তাঁর *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* গ্রন্থে হিন্দু ও মুসলিম জমিদারদের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্যতা, পাকিস্তান আন্দোলনে জমিদার ও কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন ও অংশগ্রহণ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলায় ভূ-ভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, জমিদার ও কৃষকের মধ্যকার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেছেন। এসব আলোচনায়ও বিচ্ছিন্নভাবে ভূমি বিরোধের চিত্র পাওয়া যায়। মোহাম্মদ শাহ তাঁর "*বাঙালি জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি*" প্রবন্ধে জমিদারি প্রথা প্রবর্তনের পর কলকাতায় বসবাসরত অনুপস্থিত হিন্দু জমিদাররা পূর্ব বাংলায় অবস্থিত জমিদারিতে তাদের নিয়োগকৃত নায়েব-গোমস্তাদের মাধ্যমে মুসলমান কৃষকদের নিকট থেকে জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে নির্ধারিত খাজনার বাইরেও অতিরিক্ত আদায় এবং নজরানা, সেলামিসহ বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত আদায় করায় জমিদার ও কৃষকের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, বিশ শতকের বিশের দশকে কৃষকদের তীব্র অসন্তোষ, বিশ শতকের বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি প্রভৃতির মাধ্যমে ভূমি বিরোধের বিক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেছেন। একইভাবে রেহমান সোবহান তাঁর "*বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি*" প্রবন্ধে পূর্ব বাংলার জমিদারিতে হিন্দু প্রাধান্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম কৃষকদের সাথে তাদের সম্পর্ক, বাঙালি তথা কৃষকদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা, মুসলমান কৃষকদের জমিদারদের অধীনস্থতা, জমিদার কর্তৃক কৃষক শোষণ ও নিপীড়ন, জোতদার শ্রেণির বিকাশ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে ভূমি বিরোধ নিয়ে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন। আহমেদ কামাল তাঁর *State Against the Nation : The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-54* গ্রন্থে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে জমিদার ও জোতদার শ্রেণির প্রতি লীগের সমর্থন, লেভি প্রথার প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষকদের হয়রানিসহ পূর্ব বাংলায় জমিদার, জোতদার ও কৃষকদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন যার মাধ্যমে ভূমি বিরোধের আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে। বদরুদ্দীন উমর তাঁর *The Emergence of Bangladesh : Class Struggle in East Pakistan, 1947-58* গ্রন্থে মূলত বাংলায় বামপন্থী ঘরনার রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর আলোচনায় কৃষক সভা, কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি, ১৯৪৭-৫৮ সময়কালে সংঘটিত বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে ভূমি বিরোধের কিছু ধারণা তুলে

ধরেছেন। কিন্তু তাঁর এ আলোচনা প্রথমত, ১৯৪৭-৫৮ সময়কালের মধ্যে হওয়ায় এর পূর্বপর আলোচনার ধারাবাহিকতা নেই। ফলে ভূমি বিরোধের প্রকৃত চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, তাঁর আলোচনায় প্রধানত বামপন্থী ঘরনার রাজনীতির চিত্র ফুটে উঠেছে। শেখ মাকসুদ আলী তাঁর *From East Bengal to Bangladesh : Dynamics and Perspective* গ্রন্থে জমিদারি প্রথার উদ্ভব, বিকাশ ও পতন, মুসলমানদের পাকিস্তান আন্দোলন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য, নির্বাচনী রাজনীতি আলোচনাকালে বিচ্ছিন্নভাবে ভূমি বিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মওদুদ আহমদ তাঁর *বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা* গ্রন্থে পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো আলোচনায় হিন্দু জমিদার শ্রেণির প্রাধান্য ও তাদের শোষণ, মুসলমান কৃষকদের মধ্য থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব এবং রাজনীতিতে তাদের প্রাধান্য বিস্তার, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে বিখ্যাত ২১ দফা কর্মসূচির বিশ্লেষণ, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ও পরবর্তী ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ভূমি বিরোধের কিছু তথ্য উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও আরও কয়েকজন প্রখ্যাত গবেষক তাঁদের রচনায় বিচ্ছিন্নভাবে হলেও ভূমি বিরোধের খণ্ড চিত্র তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে সিরাজুল ইসলামের *The Permanent Settlement in Bengal : a Study of its Operation 1770-1819*[28] এবং *Bengal Land Tenure : The Origin and Growth of Intermediate Interests in the 19th Century*[29] গ্রন্থ দুটিতে বাংলার ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রন্থদ্বয়ের আলোচনায় ভূমি বিরোধের উদ্ভব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলেও এর পরিণতি সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। নূরুল হোসেন চৌধুরী তাঁর *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal : The Faraizi, Indigo and Pabna Movements*[30] গ্রন্থে উনিশ শতকে সংঘটিত ফরায়েজি আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ এবং পাবনার কৃষক বিদ্রোহ আলোচনাকালে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে একটি চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাঁর এই আলোচনাও একইভাবে প্রধানত উনিশ শতকের নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের *বঙ্গদেশের কৃষক*[৩১] গ্রন্থে ভূমি বিরোধের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠলেও গ্রন্থটি সাহিত্যকর্ম, ইতিহাস নয়। তাছাড়া সময়কাল বিচারেও প্রাসঙ্গিকভাবেই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে তাঁর আলোচনার কোনো সম্পর্ক নেই। নারিয়াকি নাকাজাতো'র রচিত *পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্থা ১৮৭০-১৯১০*[৩২] গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবে ভূমি বিরোধের বক্তব্য থাকলেও এর আলোচনার সময়কাল ছিল উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এবং প্রধানত তাঁর গবেষণা ঢাকা বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। হারুন-অর-রশিদের *The Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947*[33] গ্রন্থে মুসলিম রাজনীতি, কৃষক প্রজা পার্টির উত্থান ও পতন, মুসলিম লীগের রাজনীতি, ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলমানদের বিজয় প্রভৃতি আলোচনাকালে বিচ্ছিন্নভাবে ভূমি বিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থটির আলোচনার সময়কাল ১৯৩৬ হতে ১৯৪৭ সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায়

---

২৮ Islam, *The Permanent Settlement in Bengal*.

২৯ Islam, *Bengal Land Tenure*.

৩০ Nurul H. Choudhury, *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal : The Faraizi, Indigo and Pabna Movements* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 2001).

৩১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়, *বঙ্গদেশের কৃষক*, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৮৪)।

৩২ নারিয়াকি নাকাজাতো (অনুবাদ : স্বরোচিষ সরকার), *পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্থা ১৮৭০-১৯১০* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৪)।

৩৩ Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muskim Politics 1936-1947* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1987).

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে তাঁর এই গবেষণাকর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞার তাঁর *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব ১৮৫৪-১৯৬০*[৩৪] শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভে বিচ্ছিন্নভাবে ভূমি বিরোধের চিত্র তুলে ধরলেও সময়কাল এবং একটি নির্দিষ্ট জেলায় এর আলোচনা সীমাবদ্ধ রয়েছে। নুরুল ইসলাম তাঁর *ঔপনিবেশিক শাসনকালে চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থা : ভূমি বন্দোবস্ত ও ভূমি জরীপের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৭৬১-১৮৪৮)*[৩৫] শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভে বিচ্ছিন্নভাবে ভূমি বিরোধের চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু এখানেও একইভাবে সময়কাল ও একটি নির্দিষ্ট বিভাগের মধ্যে এর আলোচনা সীমাবদ্ধ রয়েছে। কামাল সিদ্দিকী তাঁর *বাংলাদেশে ভূমি-সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*[৩৬] গ্রন্থে ভূমি সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে জমিদার, জোতদার এবং কৃষকের মধ্যকার দ্বন্দ্ব তথা ভূমি বিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, গ্রন্থের সূচনায় ভূমি বিরোধ সম্পর্কে তাঁর মূল বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, বাংলার বিশেষত পূর্ব বাংলার কৃষকের জমির ওপর ও উৎপন্ন ফসলের ওপর অধিকারহীনতা, এবং দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাবে কৃষি ও কৃষকের অপরিবর্তিত অবস্থার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে ভূমি বিরোধের খণ্ড চিত্র থাকলেও তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। প্রধানত ভূমি সংস্কারের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কাবেদুল ইসলাম *বাংলাদেশের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা*[৩৭] বিষয়ে ৩ খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থার কিছু নির্দিষ্ট বিষয় যেমন-ভূমির মালিকানাস্বত্ব, ভূমির প্রকারভেদ, ভূমির চাহিদা, হস্তান্তর, মূল্য এবং ভূমির পরিমাপ তথা জরিপ প্রভৃতি আলোচনাকালে কখনো কখনো ভূমি বিরোধের বিচ্ছিন্ন চিত্রও তাঁর লেখনীতে ধরা পড়েছে। এছাড়াও তাজ-উল ইসলাম হাশমীর *Peasant Utopia : The Communalization of Class Politics in East Bengal 1920-1947*[38]; পার্থ চ্যাটার্জীর Bengal 1920-1947 : The Land Question[39]; জয়া চ্যাটার্জীর *Bengal divided : Hindu communalism and partition, 1932-1947*[40]; লুৎফুল কবীরের *The Rights and Liabilities of the Raiyats under the Bengal Tenancy Act, 1885 and the State Acquisition and Tenancy Act, 1950*[41]; মুহিউদ্দিন খান আলমগীর রচিত *Land Reform in Bangladesh*[42] এবং তাঁর সম্পাদিত *Land System Bangladesh : Crisis and Solution*[43]; টি. হোসেনের *Land Rights in Bangladesh : Problems of Management*[44]; এ. আলীমের *Land Reforms in Bangladesh : Social Changes, Agricultural Development and Eradication of Poverty*[45]; নওয়াজ আলির *বাংলাদেশের*

---

[৩৪] মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব ১৮৫৪-১৯৬০*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (ঢাকা : ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯)।

[৩৫] নুরুল ইসলাম, *ঔপনিবেশিক শাসনকালে চট্টগ্রামের ভূমিব্যবস্থা ঃ ভূমি বন্দোবস্ত ও ভূমি জরীপের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৭৬১-১৮৪৮)*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (কলকাতা : ইতিহাস বিভাগ, ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস, ২০১৮)।

[৩৬] কামাল সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি* (ঢাকা : শোভা প্রকাশ, ২০০২)।

[৩৭] কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা (প্রাচীন যুগ থেকে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১); কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ১৭৬৫ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২); কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ১৯৪৭ থেকে ২০০০*, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩)।

[৩৮] Taj ul-Islam Hashmi, *Peasant Utopia : The Communalization of Class Politics in East Bengal 1920-1947* (Dhaka : University Press Limited, 1994).

[৩৯] Partha Chatterjee, *Bengal 1920-1947 : The Land Question*, Volume One, CSSSC Monograph 4 (Calcutta : K P Bagchi & Company, 1984).

[৪০] Joya Chatterji, *Bengal divided : Hindu communalism and partion, 1932-1947*, Cambridge South Asian Studies no. 57 (Cambridge : Cambridge University Press, 1994).

[৪১] Lutful Kabir, *The Rights and Liabilities of the Raiyats under the Bengal Tenancy Act, 1885 and the State Acquisition and Tenancy Act, 1950* with amendment (Dacca : Law House Publication, 1972).

[৪২] Muhiuddin Khan Alamgir, *Land Reform in Bangladesh* (Dacca : Centre for Social Studies-CSS, 1981).

[৪৩] Muhiuddin Khan Alamgir (ed.), *Land System Bangladesh : Crisis and Solution* (Dacca : Centre for Social Studies-CSS, 1981).

[৪৪] T. Hussain, *Land Rights in Bangladesh : Problems of Management* (Dhaka : University Press Limited, 1995).

[৪৫] A. Alim, *Land Reforms in Bangladesh : Social Changes, Agricultural Development and Eradication of Poverty* (Dacca : Associated Printers Limited, 1979).

ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি সংস্কার, ঐতিহাসিক পর্যালোচনা; অজয় রায়ের বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা : সংকট ও সমাধান[৪৬]; নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথের *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা*[৪৭]; মোঃ আবদুল কাদের মিয়ার *ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা*[৪৮] এবং জনেন্দ্র নাথ সরকারের *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি আইন*[৪৯] প্রভৃতি গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও ভূমি বিরোধের চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু উপরিউক্ত পণ্ডিতগণ তাঁদের রচনায় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেননি এবং তাঁদের রচনায় বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভূমি বিরোধের সম্পর্ক নিরূপণের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যও ছিল না। একথা সত্যি যে বাংলা তথা পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবেই ভূমি বিরোধের চিত্র ফুটে উঠে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ভূমি বিরোধের রাজনীতি নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট গবেষণা করা হয়নি। এ কারণেই এ গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৮ গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

এই গবেষণা গুণগত পদ্ধতির (Qualitative Method) ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে, যার অধীনে দলিলাদি ও অন্যান্য উৎস থেকে আহরিত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি (Historical Research Method) অনুসরণ করে উক্ত উৎসসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি প্রধানত বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা। গবেষণায় বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত দলিলপত্র, সংসদীয় কার্যবিবরণী, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সরকারি রিপোর্ট, পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট প্রভৃতি প্রাথমিক উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি গবেষণার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ এবং রচিত প্রবন্ধসমূহ দ্বৈতীয়িক উৎস হতেও তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৯ তাত্ত্বিক কাঠামো (Theoretical framework)

জটিল এবং নানামুখী ঘটনার সমন্বয়ে সংঘটিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এতদঞ্চলের জনগণের যে বৃহৎ অংশটি ঔপনিবেশিক শাসনামলের শেষ দিকে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সর্বতোভাবে সমর্থন এবং সহযোগিতা করেছিল, তারাই আবার মাত্র সিকি শতাব্দীরও কম সময়ের ব্যবধানে নবগঠিত রাষ্ট্রটির বিরোধিতা করে নিজেদের জন্য একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রশ্ন হলো, তাদের এই বিরোধিতার কারণ কি শুধুমাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি তাদের মোহভঙ্গ, নাকি এই রাষ্ট্রের অধীনে তারা যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তার জন্য, অথবা এই উভয়েরই সম্মিলিত ফল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গবেষকগণ বহু পুস্তক এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন গবেষকের মতে পাকিস্তানের দু'টি অংশের মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পার্থক্যের কারণেই পূর্ব বাংলার জনগণ স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছে, যা ইতোপূর্বে প্রকাশনা পর্যালোচনায় আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ গবেষকদের মতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে উদ্ভূত রাজনৈতিক

[৪৬] নওয়াজ আলি, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি সংস্কার, ঐতিহাসিক পর্যালোচনা* (ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ২০১৪)।
[৪৭] নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা*, (ঢাকা ঃ সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০)।
[৪৮] মোঃ আবদুল কাদের মিয়া, *ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা* (ঢাকা ঃ এ. কে. প্রকাশনী, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৩)।
[৪৯] জনেন্দ্র নাথ সরকার, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি আইন* (ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৫)।

পরিস্থিতি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কারণ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ এবং তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ একটি স্বীকৃত ব্যাখ্যা হলেও বিষয়টির গভীরে গিয়ে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। বিশেষ করে যারা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে অর্থনৈতিক শোষণ এবং বৈষম্যকে সামনে নিয়ে এসেছেন তারাও পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ভূমি কেন্দ্রিক সমস্যা, যা ছিল এই অঞ্চলের অর্থনীতির মূল ভিত্তি, বিশেষত ভূমি বিরোধ বা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব, এর সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের সংশ্লিষ্টতা এবং এর ফলাফল সম্পর্কে তেমন আলোকপাত করেননি।

এক্ষেত্রে, তাত্ত্বিক বিবেচনায় কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ তত্ত্বটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। এই তত্ত্বটি মার্কস তাঁর বিখ্যাত *A Contribution to the Critique of Political Economy*, *The Communist Manifesto* এবং অন্যান্য গ্রন্থে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কসের তত্ত্ব অনুযায়ী সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি হলো অর্থনীতি, যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে রাজনীতি, ধর্ম, বিচার, দর্শন ও আদর্শবাদের মতো অন্যান্য উপরিকাঠামো। সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে পারস্পারিক সম্পর্ক গড়ে উঠে তা ব্যক্তি মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে না। বস্তুত, উৎপাদন কেন্দ্রিক সম্পর্ক যে অর্থনৈতিক কাঠামো নির্মাণ করে তার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে আইনগত ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামোসমূহ এবং সামাজিক সচেতনতা। উপরন্তু, এই উৎপাদন পদ্ধতি সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তি মানুষের সচেতনতা তার সত্ত্বাকে নির্ধারণ করে না, বরং সামাজিক সত্ত্বা তাদের সচেতনতাকে নির্ধারণ করে। উন্নয়নের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সমাজের বস্তুতাত্ত্বিক উৎপাদনের শক্তিসমূহের সাথে বিদ্যমান উৎপাদন-কেন্দ্রিক সম্পর্কসমূহের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। উৎপাদক শক্তিসমূহের উন্নয়নের সাথে সাথে এই দ্বন্দ্ব-মুখর সম্পর্কটি আরো প্রকট হয়ে উঠে। আর তখনই সামাজিক বিপ্লব তথা সামাজিক সংগ্রামের পটভূমি রচিত হয়। অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তনের ফলে গোটা উপরিকাঠামো ধীরে ধীরে অথবা অতি দ্রুত রূপান্তরিত হয়। শোষিত মানুষ ক্রমশ এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন এবং সংগ্রামী হয়ে উঠে। বস্তুতপক্ষে, সামাজিক শৃঙ্খলা কখনো বিনষ্ট হয়ে যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না উৎপাদনের শক্তিসমূহ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় এবং উৎপাদনের নতুন উচ্চতর সম্পর্ক কখনো পুরাতন সম্পর্ককে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরাতন সমাজের গর্ভে বস্তুতাত্ত্বিক অবস্থা পরিপূর্ণতা পায়। মানবজাতি তাই অবধারিতভাবেই এমন কর্মপন্থা নির্ধারণ করে যা তারা সম্পন্ন করতে সক্ষম। কেননা নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবসময়ই এটা প্রমাণ করবে যে এই কর্মপন্থার তখনই উদয় হয়, যখন বস্তুতাত্ত্বিক রূপান্তর সম্পন্ন করার মতো উপযোগী অবস্থা বিদ্যমান থাকে অথবা ন্যূনপক্ষে প্রক্রিয়াধীন থাকে। মোটামুটিভাবে এশীয়, সামন্তবাদী ও আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতিকে আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রগতির যুগ বলা যেতে পারে। মার্কসের মতে বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্কসমূহ সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সর্বশেষ দ্বান্দ্বিকরূপ-দ্বান্দ্বিক এই অর্থে ব্যক্তিগত বৈরিতা নয়, বরং এই বৈরিতা সৃষ্টি হয় সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তরে যুগপদভাবে বেড়ে উঠা উৎপাদক শক্তিসমূহ দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নিরসনের বস্তুতাত্ত্বিক অবস্থা সৃষ্টি করে। এই সামাজিক গঠনের সাথে প্রাগৈতিহাসিক সমাজের মিল পাওয়া যায়।[৫০]

---

[৫০] Karl Marx, *Capital : The Communist Manifesto and other writings* (New York : Carlton House, 1932), pp. 10-11; Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy* (Moscow : Progress Publishers, Second printing, 1977), pp. 20-21.

অর্থাৎ কার্ল মার্কসের মতে প্রথমত, অর্থনীতি হলো সব কিছুর নিয়ামক বা ভিত্তি, আর বাকি সমস্ত কিছু উপরিকাঠামো। বলার অপেক্ষা রাখে না যে পূর্ব বাংলায় এই অর্থনীতির মূলে (গবেষণার সময়কালে) ছিল ভূমি অর্থনীতি তথা কৃষি অর্থনীতি। প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৬৯-৭০ সালে জি.ডি.পি-তে ভূমি অর্থনীতির তথা কৃষি খাতের অবদান ছিল ৬২.৪২% (সারণি ১ এর ক)।[৫১] দ্বিতীয়ত, সামাজিক বিপ্লব বা সামাজিক সংগ্রামের সূত্রপাত হয় সমাজের উৎপাদক শক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে। উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে এ্যান্থনী গ্রামসি বা স্যামুয়েল বাউলসের মতো নব্য মার্কসবাদীরা মার্কসের অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ তত্ত্বটিতে কিছুটা পরিবর্তন আনেন। এছাড়াও পরবর্তীকালে আর. জে. আরনিওসো, জে. সি. স্কোট, জন. ই. রোমার, জি. এ. কোহেন প্রভৃতি রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিকরা তত্ত্বটির সার্বজনীন প্রয়োগ নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।[৫২] কিন্তু তা সত্ত্বেও উত্তম বিকল্প না থাকায় মার্কসের তত্ত্বটিকে এককথায় প্রত্যাখ্যান করা যায় না। উপরন্তু, তত্ত্বটির সার্বজনীনতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও অর্থনৈতিক সম্পর্ক, উৎপাদন পদ্ধতি, সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদির ব্যাখ্যায় এর গুরুত্বকেও কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুত, সমাজের বিভিন্ন দল ও শ্রেণির মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয় যখন তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হয়। নিরবছিন্নভাবে এই ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলতে থাকলে তা একসময় তীব্র আকার ধারণ করে, যা বিপ্লব বা জনযুদ্ধে রূপ নেয়।[৫৩] মূলত মার্কসের এই তত্ত্বের আলোকে বর্তমান অভিসন্দর্ভে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমাভুক্ত অঞ্চলেও একইরকমভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত জনযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল।

ঐতিহাসিকভাবে বিশ্বের এই অঞ্চলটি (বর্তমান বাংলাদেশ) অত্যন্ত উর্বর ভূমি হিসেবে পরিচিত। ফলে এই অঞ্চলের মানুষ কৃষিকে তাদের জীবন ধারণের অন্যতম অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে। অর্থনীতির ভিত্তি এই কৃষির ওপর নির্ভরশীল মানুষ কোনো না কোনোভাবে বিভিন্ন সামাজিক দল বা শ্রেণিতে বিভাজিত ছিল। এসব সামাজিক শ্রেণির (যেমন জমিদার, জোতদার ও কৃষকদের) মধ্যে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়া হতো এবং পরিণামে তা অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বে রূপ নিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনামলে এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কখনো কখনো শাসকগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতাও পাওয়া যায়। জনবহুল গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে ক্ষমতা রক্ষার বা ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার্থে শাসকগোষ্ঠীর এই সংশ্লিষ্টতা ছিল সুস্পষ্ট। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে জমিদারদের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যেমন, ঔপনিবেশিক স্বার্থে (নিয়মিত রাজস্ব প্রাপ্তিতে) জমিদারি এবং জমিদারদের নিজেদের নিরাপত্তায় শাসনকর্তৃপক্ষ প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র, দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিয়াল রাখার বৈধ অনুমোদন প্রদান করেছিল।[৫৪] ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের মতোই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ করে ভূমি অর্থনীতিতে শোষণ ও নিপীড়ন করার উদ্দেশ্যে বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে তাদের ক্ষমতার প্রাধান্য বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনামলে যেমন জমিদাররা ছিলেন ব্রিটিশদের শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকার ভিত্তি, ঠিক একইভাবে আইয়ুব সরকারের আমলেও মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা ছিলেন তাঁর শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকার মূল নিয়ামক শক্তি। এ কারণে আইয়ুব খানের আমলে মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা স্থানীয় উন্নয়নমূলক

---

[৫১] *Bangladesh Economic Survey 1980-81*, P. 2.

[৫২] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Andrew Reeve (ed.), *Modern Theories of Exploitation*, SAGE Modern Politics Series, Volume 14, ECPR (London : SAGE Publicatins, 1987), pp. 1-297.

[৫৩] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Choudhury, *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal*, pp. 1-10.

[৫৪] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *List of Zamindars exempted under clause (6) (c) of Schedule of the Indian Arms Rules, 1924 in the Presidency of Bengal* (Corrected up to the 31st December, 1934), Police Department, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1936), pp. 1-21.

কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল।[৫৫] এটা ছিল ঔপনিবেশিক শাসনামলের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কৌশল। বর্তমান অভিসন্দর্ভে ভূমি বিরোধের অন্তর্নিহিত সত্য উদঘাটন করে তা কীভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে একটি সর্বব্যাপী জনযুদ্ধের তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, কার্ল মার্কসের তত্ত্ব এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত? এর উত্তরে বলা যায় যে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার, জোতদার ও কৃষকের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত একসময় তীব্র আকার ধারণ করে জনযুদ্ধে পরিণত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভূমি বিরোধের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের আশির দশকে রংপুর কৃষক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এবং তা পূর্ণতা পেয়েছিল বিশ শতকের সত্তরের দশকের গোড়াতে জনযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, কৃষক আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ বা গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন ১৮৫৯-৬০ সালে নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘটিত কৃষকদের বিক্ষোভকে রমেশচন্দ্র মজুমদার, এইচ.সি. রায়চৌধুরী, কালিকিঙ্কর দত্ত ও উইলেম ভেন স্যান্ডেল 'বিদ্রোহ' (Revolt) হিসেবে উল্লেখ করলেও মোঃ রেজাউল করিম সেটাকে 'আন্দোলন' (Movement) বলে অভিহিতি করেছেন।[৫৬] আবার লেনিন আজাদের মতে আন্দোলন এবং গণঅভ্যুত্থান ভিন্ন বিষয়। তাঁর মতে কোনো সমাজের অন্তর্নিহিত মৌল সামাজিক সম্পর্ক বা মৌল নীতি থেকে উত্থিত কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদই হলো আন্দোলন। যে কোনো আন্দোলনেরই একটি রাজনৈতিক চরিত্র থাকে এবং তা মূর্ত হয়ে উঠে শ্রেণিস্বার্থের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে কোনো আন্দোলনে যখন সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ঘটে তখনই তা অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। তাঁর মতে আধুনিক বিশ্বে যে সকল আন্দোলন দৃষ্টিগোচর হয় তার প্রতিপক্ষ থাকে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণিস্বার্থ সংরক্ষণের রাজনৈতিক হাতিয়ার। বস্তুতপক্ষে, সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণি (যেমন বাংলা/পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তানের জমিদার ও জোতদার) ব্যাপক জনসাধারণকে (যারা শোষিত-নিপীড়িত শ্রেণি হিসেবে পরিচিত, যেমন পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক) করায়ত্ত করার একটি যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রকে গড়ে তোলে। অন্যদিকে আবার রাষ্ট্রও অনেক সময় ঐ প্রভাবশালী শ্রেণির সহায়তায় জনসাধারণকে করায়ত্ত করার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই রাষ্ট্র এবং প্রভাবশালী শ্রেণির অবদমনের বিরুদ্ধে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণির ব্যাপক জনসাধারণ যে আন্দোলন গড়ে তোলে তা মূলত কর্তৃত্ববান শ্রেণির (রাষ্ট্র বা সরকার এবং জমিদার ও জোতদার) বিরুদ্ধে বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গড়ে উঠে।[৫৭] এই অর্থে উনিশ শতকে ভূমি বিরোধের ফলশ্রুতিতে বাংলা তথা পূর্ব বাংলার সংগঠিত কৃষকদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংঘটিত সকল বিক্ষোভই ছিল কৃষক আন্দোলন বা কৃষক সংগ্রাম।

---

[৫৫] Nurul Islam Khan (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Noakhali*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dacca : Bangladesh Government Press, 1977), p. 300-302; রেহমান সোবহান, *উতল রোমন্থন : পূর্ণতার সেই বছরগুলো* (Untranquil Recollections : The Years of Fulfillment, Bengali Translator : Amitava Sengupta) (New Delhi : SAGE Publications India Pvt Ltd, 2018), পৃ. ২৩৬-২৩৭; শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৮), পৃ. ৮৩।

[৫৬] R.C. Majumdar, H.C. Raychaudhuri and Kalikinkar Datta, *An Advanced History of India* (London : Macmillan & co. Ltd., 1963), p. 775; Willem Van Schendel, *A History of Bangladesh* (New Delhi : Cambridge University Press, 2009), p. 77; মোঃ রেজাউল করিম, *যশোর জেলায় নীল আন্দোলন, ১৮৫৯-৬২ ঃ একটি সমীক্ষা*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (রাজশাহী : ইতিহাস ভিগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১), পৃ. ৯।

[৫৭] লেনিন আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭), পৃ. ১৫ ও ১৭।

অবশ্য সুপ্রকাশ রায় উনিশ ও বিশ শতকের সকল কৃষক সংগ্রামকে বিদ্রোহ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে গ্রামাঞ্চলই যে ভারতবর্ষের গণ-শাসনের মূল ভিত্তি তাও এই কৃষক বিদ্রোহ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিল। তিনি বলেন যে উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এটাই ছিল গণ-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াস। তবে রায়ের বিশ্লেষণে ফরাসি বিপ্লবের ন্যায় ভারতবর্ষেও বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে কৃষক শক্তির দ্বারা বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর মতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করে সমাজের অগ্রগতির পথ বাধামুক্ত করা। কৃষিব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই ভারতবর্ষে সামন্ত প্রথা গড়ে উঠেছিল। কৃষি-ভূমি ও কৃষি-ব্যবস্থাই সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি। কৃষকই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হয়ে দাঁড়ায়। তাই সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস সাধন করে সমাজের অগ্রগতির পথ বাধামুক্ত করার কাজে কৃষকই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। কৃষকের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা মানব-ইতিহাসের যুগান্তকারী বিল্পবে তথা ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবে সর্বপ্রথম স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক বিপ্লবে কৃষক শক্তিকে সংগঠিত ও পরিচালিত করেছিল সামন্তপ্রথার গর্ভ হতে উদ্ভূত ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণি। সেই বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণি ছিল নায়ক, আর কৃষক ছিল প্রধান বাহিনী। শ্রেণিগত দুর্বলতাবশত, সেই বিপ্লবে কৃষক শক্তি নেতৃত্বলাভে বঞ্চিত হলেও বিপ্লবের বাহিনী হিসেবে তার ভূমিকা ছিল চূড়ান্ত এবং ইতিহাসের অগ্রগতির দিক হতে অসাধারণ গুরুত্বসম্পন্ন। ভারতবর্ষ তথা বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সম্প্রদায়কে সেই একই ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষ তথা বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় কৃষক শক্তিকে নেতৃত্বদানের উপযুক্ত কোনো শ্রেণি উনিশ শতকের সমাজে দেখা দেয়নি বলে কৃষক শক্তি নেতৃত্ব-বিহীন হয়েই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছিল। সুপ্রকাশ রায়ের মতে বৈদেশিক ব্রিটিশ শক্তি বাংলায় রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করে তাৎক্ষণিকভাবেই নিজেদের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনে প্রাচীন গ্রাম-সমাজের অচলায়তন ভেঙ্গে কৃষককে মুক্তি দান করেছিল। কিন্তু নিজেদের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনেই আবার ইউরোপের অনুকরণে নতুন এক সামন্তপ্রথার বন্ধনজালে কৃষককে আবদ্ধ করে ফেলে। এই নতুন সামন্তপ্রথার বন্ধন ছিন্ন করার জন্যে অষ্টাদশ শতক হতে কৃষক বিদ্রোহের সূচনা হয়। ইউরোপে বুর্জোয়া শ্রেণি নিজ প্রয়োজনে, অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের বাধা চূর্ণ করে নিজেদের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সামন্ত-বিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আয়োজন করেছিল এবং সেই সামন্তপ্রথার শোষণজালে আবদ্ধ বিদ্রোহী কৃষককে প্রধান বাহিনীরূপে গ্রহণ করেছিল। উনিশ শতকে বাংলায় সেইরূপ কোনো বুর্জোয়া শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না এবং শ্রমিক শ্রেণির মতো কোনো বৈপ্লবিক শ্রেণি তখনও সমাজে ছিল না। বাংলায় যে ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণিটি ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব হতে ছিল, তা ঔপনিবেশিক বণিক-শাসনের প্রথম আঘাতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। জমিদার ও জোতদার শ্রেণি ইংরেজসৃষ্ট নতুন সামন্ত্রতন্ত্রেরই সৃষ্টি। এই দু'টি শ্রেণিকে ভিত্তি করেই নতুন সামন্তপ্রথা গঠিত। ফলে তাদের পক্ষে সামন্ত্রতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে কৃষককে নেতৃত্ব দান সম্ভব ছিল না। উনিশ শতকের শেষভাগে বস্ত্রশিল্পের মাধ্যমে একটি দুর্বল মূলধনীশ্রেণির আবির্ভাবের পর তাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ শুরু হলেও তারা ছিল আপসপন্থী, ইউরোপের শিল্প বুর্জোয়াশ্রেণির মতো সামন্ত্রতন্ত্র-বিরোধী নয়। এমনকি জমিদার এবং ব্যবসায়ী শ্রেণির নেতৃত্বে সৃষ্ট জাতীয় কংগ্রেস প্রথম থেকেই বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় সামন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে আপস করে চলার নীতি গ্রহণ করে। তাই শ্রেণি ও সম্প্রদায়গত দুর্বলতা সত্ত্বেও এককভাবে কৃষকশক্তিকেই ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন এবং এর দ্বারা সৃষ্ট ও এর সমগ্র শক্তিদ্বারা সুরক্ষিত নতুন সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল।[৫৮]

[৫৮] সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* (কলকাতা : র‌্যাডিক্যাল, প্রথম র‌্যাডিক্যাল সংস্করণ, ২০১২), পৃ. মুখবন্ধ, কুড়ি-সাতাশ।

কিন্তু বিশ শতকের বিশের দশকে এসে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। প্রথমত, বিশ শতকের বিশের দশকে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী মনোভাবাপন্ন কতিপয় মুসলিম জমিদার ও জোতদার শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে বিভিন্ন কৃষক সংগঠন গড়ে উঠে। এর ফলে একদিকে বিপ্লবের জন্য কৃষকরা নেতৃত্ব সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয় এবং অন্যদিকে তারা আরো বেশি সচেতন ও সংগঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। দ্বিতীয়ত, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের সীমিত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে এসে ভূমিস্বত্বের ওপর (১৯২৮, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালের সংশোধিত ভূমি আইনে) তাদের আরো বেশি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয়ত, বিশ শতকের বিশের দশকের সূচনায় প্রত্যক্ষ ভোট রাজনীতির প্রবর্তনের ফলে কৃষকরা ক্ষমতায়নের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের সম্প্রসারিত ভোটাধিকারের ফলে কৃষকদের ক্ষমতায়ন আরো বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিশ শতকের পঞ্চাশ হতে সত্তরের দশকের মধ্যে পরিস্থিতি অনেকাংশে কৃষকদের অনুকূলে চলে যায়। প্রথমত, বিশ শতকের চল্লিশের দশকের শেষ দিকে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে (প্রধানত নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণি এবং অল্প কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী শ্রেণি হতে উদ্ভূত যারা ছিলেন ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণির অনুরূপ) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ তথা আওয়ামী লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দলের নেতৃবৃন্দ তথা বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রথম থেকেই বৈদেশিক তথা পাকিস্তানি সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। অর্থাৎ এই দলের নেতৃবৃন্দ ছিলেন সামন্ত প্রথার গর্ভ হতে উদ্ভূত ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণির অনুরূপ একটি শ্রেণি এবং এরা সাধারণভাবে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে পরিচিত ছিল। এরাই ঐতিহাসিক জনযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে কৃষক শক্তিকে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে এই শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল নায়ক, আর কৃষক ছিল প্রধান বাহিনী। দ্বিতীয়ত, ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নে আইনগতভাবে সামন্ত প্রথার প্রধান প্রতিভূ জমিদারদের বিলুপ্তি হলে সামন্ত প্রথার বন্ধনজাল হতে কৃষকরা অনেকটাই মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সামন্ত প্রথার দ্বিতীয় প্রতিভূ জোতদাররা আইয়ুব খানের শাসনামলে ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকতর অধিকার ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করায় এবং মৌলিক গণতন্ত্রের ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠায় কৃষকরা পুনরায় সামন্ত প্রথার বন্ধনজালে আবদ্ধ হয়ে যায়। তৃতীয়ত, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ২১ বছর প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিক নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কৃষকরা আরো অনেক বেশি অধিকার সচেতন এবং ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে। যদিও আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের শাসনে কৃষকরা ভোটাধিকার হারিয়ে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খানের 'এক ব্যক্তির এক ভোট' (এর মূল কথা ছিল জনসংখ্যার ভিত্তিতে আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব দান) প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে কৃষকরা তাদের ক্ষমতা ফিরে পায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কৃষকরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিল। ১৯৭১ সালে কৃষক শ্রেণি এবং শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের নেতৃত্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং কৃষকরা সম্মিলিতভাবে কর্তৃত্ববাদী শোষক ও নিপীড়ক সরকার এবং জোতদারদের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধে বা মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।[৫৯]

[৫৯] বিস্তারিতভাবে দেখুন, আতিউর রহমান, *জনমানুষের মুক্তিযুদ্ধ*, অখণ্ড সংস্করণ (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৮), পৃ. ৪৩৩-৪৪৩।

পরিশেষে কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে বলা যায় যে পাকিস্তানি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকদের মুক্তির জন্য পরিচালিত হলেও এটা ছিল পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রাম। পূর্ব বাংলার কৃষকদের এই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম এবং জাতীয় স্বাধীনতা, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম ছিল এক ও অভিন্ন। কারণ কৃষকরাই ছিল পূর্ব বাংলার সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ জন।[৬০] এছাড়াও পূর্ব বাংলার বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, রাজনীতিবিদ এবং এমনকি তৎকালীন সীমিত সংখ্যক শ্রমিক শ্রেণিরও জন্ম হয়েছিল এই কৃষক সম্প্রদায় হতেই। ঔপনিবেশিক শাসনামলের সূচনা হতে বিশ শতকের বিশের দশক পর্যন্ত এই কৃষকরা একাকী সংগ্রাম পরিচালনা করে বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার সমগ্র সমাজের মুক্তি ও অগ্রগতির পথ প্রস্তুত করেছিল। আর বিশ শতকের বিশের দশক হতে সত্তরের দশকের সূচনা পর্যন্ত কৃষকদের পাশে থেকে ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণির ন্যায় বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিই নেতৃত্ব দিয়ে জনযুদ্ধ তথা স্বাধীনতাযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ প্রস্তুত করেছিল। এই গবেষণায় ভূমি বিরোধ কীভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে একটি জনযুদ্ধ তথা স্বাধীনতাযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করেছিল তা গভীরভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজের বস্তুতাত্ত্বিক উৎপাদনের শক্তিসমূহের সঙ্গে উৎপাদন কেন্দ্রিক সম্পর্কসমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘাত হতে উদ্ভূত সামাজিক সংগ্রাম তথা জনযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে কিভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে তা নিম্নের ছকটির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

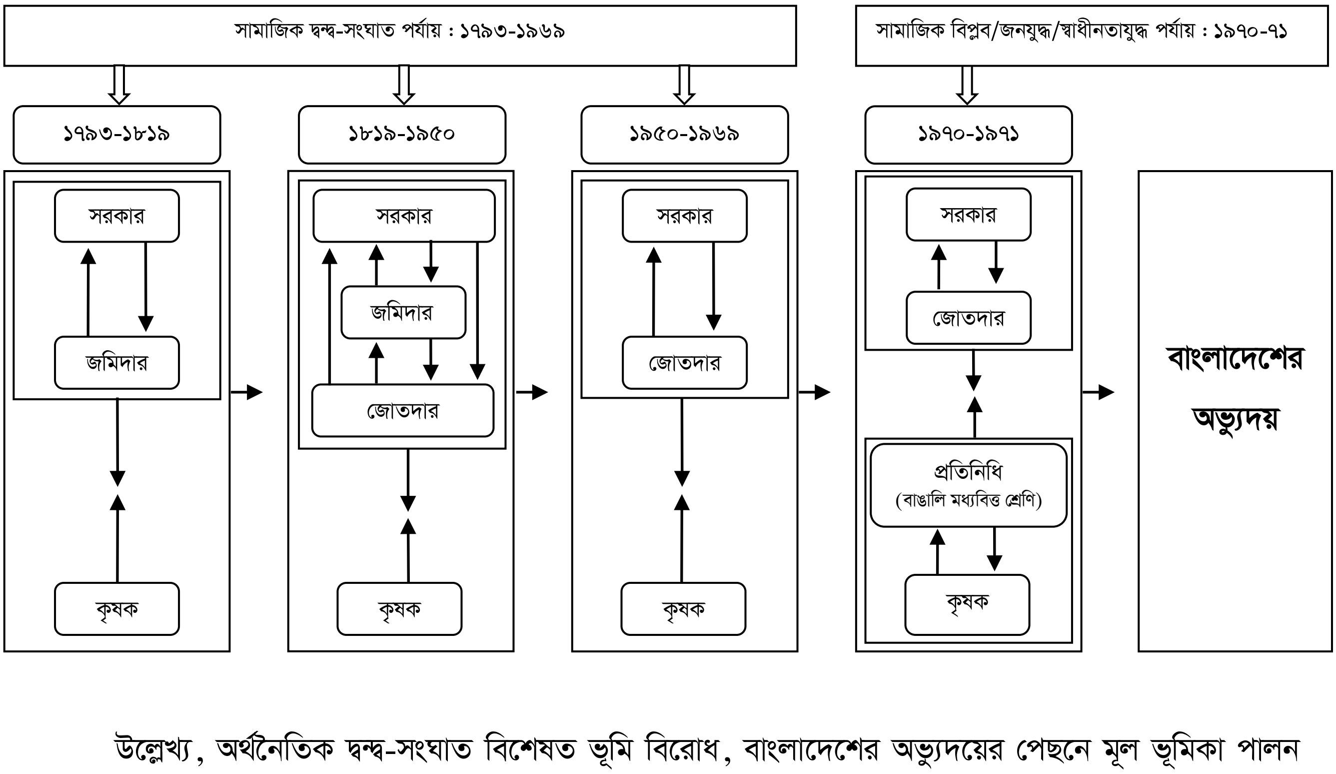

উল্লেখ্য, অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিশেষত ভূমি বিরোধ, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে মূল ভূমিকা পালন করলেও অন্যান্য বিষয়ের যেমন সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বৈষম্য এবং শোষণ, পাকিস্তানি শাসকদের ঔপনিবেশিক নীতি ইত্যাদির গুরুত্বকেও খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তবে মার্কসীয় তত্ত্ব ও পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায় যে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থানের পেছনে উপরিকাঠামোর রাজনীতি, আদর্শ, সংস্কৃতি ইত্যাদির তুলনায়

---

[৬০] Rahim, *Politics and National Formation in Bangladesh*, pp. 207 and 227; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ নভেম্বর, ১৯৭০।

অনেক বেশি অবদান রেখেছিল অর্থনৈতিক বিষয়াদি-বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিরাজমান ভূমি ব্যবস্থার অসংগতিসমূহ তথা ভূমি বিরোধ।

১.১০ অধ্যায় বিভাজন (Chapter Design)

এই অভিসন্দর্ভটি নিম্নরূপ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায় : সরকারি নীতি কৌশল ও ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন (১৮৮৫-১৯৪৭)

তৃতীয় অধ্যায় : ভূমি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের পরিবর্তন ও ভূমি বিরোধ (১৮৮৫-১৯৪৭)

চতুর্থ অধ্যায় : পূর্ব বাংলায় ভূমি নীতি ও কৌশলে পরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১)

পঞ্চম অধ্যায় : ভূমি বিরোধের রাজনীতি (১৯৪৭-১৯৭১)

ষষ্ট অধ্যায় : উপসংহার

উপরিউক্ত ছয়টি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা আলোচনায় প্রধানত অভিসন্দর্ভটির রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের রূপরেখা আলোচনায় গবেষণা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান; ভৌগোলিক সীমারেখা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার পরিধি, গবেষণার যৌক্তিকতা, প্রকাশনা পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি, তাত্ত্বিক কাঠামো এবং অধ্যায় বিভাজন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সরকারি নীতি কৌশল ও ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন (১৮৮৫-১৯৪৭) সম্পর্কিত আলোচনায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সরকারি রাজস্ব আয় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শাসনকর্তৃপক্ষের বিভিন্ন আইন প্রণয়নের ফলে যে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়েছিল সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই বিরোধ তথা দ্বন্দ্ব হ্রাসে সরকারের ভূমি নীতি কৌশলেও বার বার পরিবর্তন হয়েছিল। শাসনকর্তৃপক্ষের ভূমি নীতি কৌশলের এই পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রণীত ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। এই আইনেই সর্বপ্রথম ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছিল। অর্থাৎ ভূমি বিরোধের মধ্য দিয়ে সরকারের নীতি কৌশলের পরিবর্তনের ফলে কীভাবে অধিকারহীন থেকে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদারদের অধিকার কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু বিশ শতকের সূচনায় প্রধানত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৯০৭ সালের আইনে জমিদারদেরকে অতিরিক্ত খাজনা ও বিভিন্ন কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করায় একদিকে কৃষকদের অধিকার পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছিল এবং অন্যদিকে জমিদারদের অধিকার বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে কৃষক আন্দোলন ও ভোট রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত ১৯২৮, ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালের সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখ্য, বিশ শতকের বিশ হতে চল্লিশের দশক পর্যন্ত ভোট রাজনীতির প্রয়োজনে ভূমি সংস্কার করার পরিণামে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি কীভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশেষ করে নির্বাচনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল সে সম্পর্কেও এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া ভূমি সংস্কার ও রাজনীতি

কীভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করেছিল এবং তা কীভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করেছিল তাও এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে অবিভক্ত বাংলায় ভূমি বিরোধের ফলে ভূমি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ বিশেষ করে জমিদার, জোতদার ও কৃষকের কী পরিবর্তন হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভূমির বিভিন্ন অংশীজন বা ভূমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ থাকলেও এই অভিসন্দর্ভে ভূমির অংশীজন হিসেবে সরকার, জমিদার, জোতদার ও কৃষকের পরিবর্তন এবং পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে এই অধ্যায়ে ভূমির অংশীজন হিসেবে জমিদার, জোতদার এবং কৃষকের পরিবর্তন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশ শতকের বিশ হতে চল্লিশের দশক পর্যন্ত ভোট রাজনীতির প্রবর্তনের কারণে হিন্দু ও মুসলমান জমিদার, জোতদার ও কৃষকদের মধ্যে সম্প্রীতি অথবা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে যে নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি হয়েছিল এবং এর ফলে যে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের পূর্বের চেয়ে অধিকতর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সম্পর্কেও এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। একইসঙ্গে এ অধ্যায়ে অবিভক্ত বাংলায় ভূমি বিরোধের রাজনীতি ও ভোট রাজনীতির ফলস্বরূপ কৃষকের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি এবং ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে হিন্দু এবং মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মেরুকরণের ফলস্বরূপ দেশভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও বাংলা ভাগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সে বিষয়েও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে যে তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করেছিল তাও এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ১৯৪৭-১৯৭১ সময়কালে সরকারি নীতি কৌশলের পরিবর্তনের ফলে ভূমিস্বত্বের ওপর জমিদার, জোতদার ও কৃষকের অধিকার হ্রাস বৃদ্ধিতে কি প্রভাব পড়েছিল সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ে পাকিস্তান শাসনামলে কৃষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যেমন ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন এবং ১৯৬১ সালের প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশসহ বিভিন্ন ভূমি সংক্রান্ত আইন প্রণয়নকালে পরিষদের ভিতরে এবং বাইরে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তীব্র প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমি বিরোধের যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল সে বিষয়ও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। উপরন্তু, কৃষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও রাজনীতি কীভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করেছিল এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলায় সরকারের ভূমি নীতি কৌশলের পরিবর্তনের ফলে ভূমি বিরোধ হ্রাস না পেয়ে বরং তা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল সে সম্পর্কেও এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও পাকিস্তান আমলে ভূমি বিরোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথকে কীভাবে প্রশস্ত করেছিল সে বিষয়টিও এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে পাকিস্তান শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭১) ভূমি বিরোধের রাজনীতির কারণে জমিদার, জোতদার ও কৃষকের কী পরিবর্তন হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে জমিদারদের পতন এবং ১৯৬১ সালের প্রণীত ভূমি আইনের ফলে জোতদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চিত্র এই অধ্যায়ে তুলে ধরার প্রয়াস হয়েছে। এছাড়াও পূর্ব বাংলার ভূমি বিরোধের রাজনীতির কারণে ভোট রাজনীতি বিশেষ করে ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে কৃষকের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা স্থান পেয়েছে এই অধ্যায়ে। উপরন্তু, ভূমি বিরোধের রাজনীতি কীভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের

পথকে প্রশস্ত করেছিল অর্থাৎ সার্বিকভাবে ভূমি বিরোধের রাজনৈতিক অর্জন কী ছিল সে সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপসংহারে সার্বিকভাবে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের বিশ্লেষণের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে যে গবেষণার মূল যুক্তি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব কীভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভূমিকা পালন করেছে সে সম্পর্কে উপসংহারে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সরকারি নীতি কৌশল ও ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন (১৮৮৫-১৯৪৭)

২.১ ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সরকারি নীতি কৌশল ও ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন (১৮৮৫-১৯৪৭) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভূমি বিরোধের সূচনা হয়েছিল মূলত শাসনকর্তৃপক্ষের ভূমিস্বত্ব সম্পর্কিত নীতি কৌশলের পরিবর্তন ও তা কার্যকরের মাধ্যমে। সুতরাং ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত সরকারি নীতি কৌশলের পরিবর্তনের সঙ্গে ভূমিস্বত্বের পরিবর্তনের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার ভূমিস্বত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে ভূমি বিরোধের রাজনীতিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সূচনায় ভূমি বিরোধ ছিল দ্বিপক্ষীয়। দ্বিপক্ষীয় ভূমি বিরোধের প্রথম পক্ষ ছিল ভূস্বামী বা জমিদার এবং দ্বিতীয় পক্ষ ছিল কৃষক। কিন্তু পরবর্তীকালে ভূমি বিরোধের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয় ভূস্বামী শ্রেণির নিম্নস্থ অংশ সাধারণভাবে যারা জোতদার হিসেবে পরিচিত। সুতরাং চূড়ান্ত বিচারে ভূমি বিরোধ ছিল ত্রিপক্ষীয়, প্রথম পক্ষ ছিল ভূস্বামী শ্রেণির উপরস্থ অংশ জমিদার, দ্বিতীয় পক্ষ ছিল ভূস্বামী শ্রেণির নিম্নস্থ অংশ জোতদার এবং তৃতীয় পক্ষ ছিল কৃষক। এখানে প্রধানত সরকারি নীতি কৌশলে পরিবর্তনের ফলস্বরূপ ভূমিস্বত্বের যে পরিবর্তন হয় তা ভূমি বিরোধের পক্ষত্রয়ের ওপর কী প্রভাব পড়েছিল এবং তার পরিণতি কী হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

২.২ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন ও ভূমি বিরোধের সূচনা

১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্ত ঘোষণা করেন এবং ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষণা করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে ভূমিস্বত্বের ওপর জমিদারদের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা ছিল ভূমিস্বত্বের আইন পরিবর্তনের ইতিহাসে বৈপ্লবিক ঘটনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্র বা রাজা ছিলেন ভূমির মালিক। ফ্রায়ার জে. জেভিয়ারসহ কৃষি-ইতিহাসের প্রামাণ্য ব্যাখ্যাকারদের মত অনুযায়ী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ভূমির মালিকানা শুধু রাজার হাতেই ন্যাস্ত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত ভূমিতে চিরাচরিত ও প্রথাগত নিয়মানুযায়ী কৃষকদের বংশানুক্রমিক দখলীস্বত্ব অথবা ভোগদখলীয় অধিকার ছিল, যদিও তারা সেই অধিকারবলে জমি বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারতো না। ইরফান হাবিবের মতে মালিক হবে স্বাধীন এবং তারই থাকবে ইচ্ছেমতো জমি হাতবদলের অধিকার। তাঁর মতে প্রাচীনকাল থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত কৃষকরা আইনগতভাবে কোনো জমিই কোনো কারণে হস্তান্তর বা হাতবদল করতে পারতো না।[২] ভূমিদান বা হস্তান্তরের অধিকার ছিল কেবলমাত্র রাজা বা রাষ্ট্রের। এমনকি, কৃষক নিয়মানুযায়ী চাষাবাদ করতে ব্যর্থ হলে রাজা বা রাষ্ট্র তাদেরকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে দিতে পারতেন।[৩] ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে, "He had certain powers

---

[১] *Report of the Land Revenue Commission, Bengal*, Vol. II, Appendices (I to IX) and Indian Land System Ancient, Mediaeval and Modern, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1940), pp. 222-223; Islam, *Permanent Settlement*, pp. 7-8; F. D. Ascoli, *Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report, 1812* (Oxford : At the Clarendon Press, 1917), pp. 70-71; Majumdar, Raychaudhuri and Datta, *An Advanced History of India*, p. 794.

[২] বিস্তারিতভাবে দেখুন, ইরফান হাবিব, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, ১৫৫৬-১৭০৭* (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৫), পৃ. ১২০-১২৭।

[৩] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৭৪।

to dispose of the waste, and to eject cultivators who were not doing their duty to the community by cultivating properly."[4] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকার বা রাষ্ট্র ভূমির মালিকানাস্বত্ব ও স্বত্বাধিকার জমিদারদেরকে প্রদান করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারি রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণ; বৃহৎ জমিদারিগুলো খণ্ডিতকরণ; প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন এবং কৃষিবিপ্লব আনয়ন।[৫] সিরাজুল ইসলাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম দু'টি উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন,

> There were strong political and economic motives behind the Permanent Settlement. Politically, it was considered that the confirmation of the hereditary rent collecting agents as the sole proprietors of land and perpetually fixed government demands on them would bind the landholders to the government which had granted, and which alone would maintain, so great a privilege. Economically, it was expected that the permanent settlement would encourage the investment of capital in land and, therefore, the growth of a middle class; that it would lead to more lenient and considerate treatment of the tenants by the landlords, and would thus promote general prosperity. That, an increase of commercial and agricultural wealth would lead to the increased ability of the population to contribute to general taxations which would compensate the government's sacrifice of a prospective increase of land revenue.[6]

অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান দু'টি দিক ছিল, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। প্রথমত, অর্থনৈতিক দিক, যার উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব প্রদানকারী জমিদার শ্রেণিকে একটি নির্দিষ্ট ভিত্তি বা বুনিয়াদ দেওয়া এবং রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করা; এবং দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দিক, যার উদ্দেশ্য ছিল জমিদার শ্রেণি ও ঔপনিবেশিক শাসকদের মধ্যে মৈত্রী গড়ে তোলা।[৭] অর্থাৎ জমিদার শ্রেণিকে শাসনকর্তৃপক্ষের অনুগত শ্রেণি হিসেবে গড়ে তোলা। ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ঐতিহাসিকরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অর্থনৈতিক গুরুত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[৮] ঔপনিবেশিকবাদী ঐতিহাসিকদের অভিমত হলো লর্ড কর্নওয়ালিস আশা করেছিলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদাররা কৃষি উন্নয়নে মনোযোগী হবে এবং এর ফলে দেশ সমৃদ্ধি লাভ করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি এবং কর্নওয়ালিসের স্বপ্নও পূরণ হয়নি। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদেরকে ঔপনিবেশিক

---

[৪] *Report of the Land Revenue Commission,* Vol. I, p. 7.

[৫] বিস্তারিতভাবে দেখুন, ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১৩০-১৪১।

[৬] Islam, *Permanent Settlement,* p. xi.

[৭] সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৩ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৩৬৬।

[৮] ভারত তথা বাংলার ইতিহাস বিনির্মাণের ক্ষেত্রে দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত, যারা প্রধানত দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে ব্রিটিশ শাসনই এদেশের জন্য মঙ্গল বয়ে এনেছে এবং এদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল ইতিবাচক পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে ব্রিটিশ শাসন তথা ইউরোপিয়ানদের ভূমিকা। ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন W.W. Hunter, P.E. Roberts, J.C. Jack, James Tailor, W. Hamilton, Willem Van Schendel, H. Beverly, W.B. Bayley, B.B. Kling, P.J. Marshal, J.E. Gastrel, Paul Greenough, C.J. Baker, W.H. Moreland, Edward Thompson, G.T. Garrat, George Blyn, S.C. Hill, William Bolts, James Rennel, Alexander Dow, F.D. Ascoli, B.C. Allen, C.H. Philips, B.H. Baden-Powell, L.S.S. O'Malley, Dietmar Rothermund প্রমুখ ইউরোপিয়ান ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতগণ। দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত, যারা প্রধানত দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে ব্রিটিশ শাসন এদেশের জন্য মঙ্গলের বদলে বরং ক্ষতিই করেছে বেশি। এদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল ইতিবাচক পরিবর্তনের পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে এদেশেরই মানুষ। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন Dadabhai Naoroji, Romesh Dutt, R.C. Majumdar, N.K. Sinha, K.N. Chaudhuri, Rajat Ray, Rajat Kanta Ray, Sushil Chaudhuri, Benoy Bhushan Chaudhuri, Irfan Habib, A.S.M. Akhtar Hussain, Hem Chandra Kar, Sugata Bose, Rounaq Jahan, Sirajul Islam. M. Mufakkharu Islam, Ahmed Kamal, Sirajul Islam Chowdhury, Akbar Ali Khan, sunil Sen, S.N. Gupta, G.N. Gupta, Anisuzzaman, Iftikhar-ul-Awwal, Tajul Islam Hashmi, Shila Sen, Partha Chatterjee, Joya Chatterji, Shyamoli Ghosh, B.P. Sitaramayya, S.N. Banerjee, Kalikinkar Datta, Ratnalekha Ray, J.N. Sarker, Rehman Sobhan, Mushirul Hasan প্রমুখ ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতগণ। অবশ্য এর মধ্যে W.W. Hunter বা Romesh Dutt-সহ উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন পণ্ডিত একইসঙ্গে উভয়পক্ষে ইতিবাচক ভূমিকারও উল্লেখ করেছেন। এসব ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থ এবং তাঁদের চিন্তাধারা সম্পর্কে দেখুন, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭), পৃ. ১-৫৭৮; সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭), পৃ. ১-৫৭৯; *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭), পৃ. ১-৫৯১।

শাসকদের একটি অনুগত শ্রেণি হিসেবে তৈরি করার প্রয়াস হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অংশত সফল হয়েছিল যার প্রমাণ মেলে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময়। এ সময় পূর্ববঙ্গের জমিদারগণ ইংরেজদের সর্বোতভাবে সাহায্য করেছিলেন।[৯] রতন লাল চক্রবর্তীর মতে কোম্পানি সরকার সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছিল যে স্থানীয় ভূস্বামীরা তাদের সমর্থন করবে, কেননা সরকারও ভূস্বামীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট ভূস্বামীগণ ছিলেন ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণের সহযোগী। এ কারণে বাংলার ভূস্বামীগণ সিপাহী বিদ্রোহ দমনে সরকারকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছিলেন। বিদ্রোহ দমনে সরকারের সহযোগী হিসেবে বাংলার ভূস্বামীদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন ঢাকার খাজা আবদুল গণি, জগবন্ধু সেন, আগা গোলাম আহমেদ; ভাওয়াল পরগণার কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী; চট্টগ্রামের কালিন্দী রানি; যশোরের রাজা বরদাকান্ত রায়; রংপুরের রানি স্বর্ণময়ী; নোয়াখালীর যশোদা কুমার পাইন এবং পাবনার বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী ও সৈয়দ আমীর আলী, গোরাঙ্গ চন্দ্র রায়, খোদা বক্স শাহ্, খেদমত শাহ্ ফকির ও ইয়াসিন শাহ্ ফকির।[১০] সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আরেকটি দিক ছিল যা ইসলাম এবং চক্রবর্তী উল্লেখ করেননি তা হলো একটি শ্রেণি বিভাজিত সমাজ তৈরি করা, যার ফলে একটা টানাপোড়েন সৃষ্টি করে সমাজকে শাসন ও শোষণ করা সহজ হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমিস্বত্বের মালিক হিসেবে জমিদার শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে, মেহনতী কৃষকদের ভূমির ওপর অধিকার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, পুরোনো গ্রাম সমাজ ভেঙ্গে পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে জমিদারদের শোষণের স্বার্থে জোতদার শ্রেণির জন্ম হয়।[১১] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকার ভূমির মালিকানাস্বত্ব ও স্বত্বাধিকার প্রদানের মাধ্যমে ভূমিস্বত্বের ওপর জমিদারদের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার দেয়। ১৭৯৩ সালে সরকারের নীতি কৌশলে পরিবর্তনের কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে একদিকে রাজস্ব সংগ্রাহক থেকে জমিদাররা ভূমির মালিক হিসেবে আবির্ভূত হন এবং অন্যদিকে ইতিপূর্বে ভূমিতে কৃষকদের যে প্রথাগত ভোগদখলীয় অধিকার ছিল তারও বিলুপ্তি হয়ে তার জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজায় পরিণত হয়। এ সম্পর্কে উইলেম ভেন স্যান্ডেল মন্তব্য করেন,

> The new system, modelled on the situation of the English landed gentry, was premised on a serious misinterpretation of property relations in rural Bengal. The traditional revenue collectors (*zamindars*) suddenly found themselves *owners* of the land, whereas before their rights had been much more limited. The cultivators, on the other hand, lost their traditional occupancy rights and were supposed to become tenants-at-will to the newly-created zamindari 'gentry'. There is, however, a controversy over the extent to which this legal chainge led to an actual short-run deterioration in the economic position of the cultivators.[12]

তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নীতি কৌশলে পরিবর্তন হলেও সরকার জমিদার ও কৃষকের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের অর্থনৈতিক ভিত্তি দাঁড় করাতে চেষ্টা করে।[১৩] কিন্তু বাস্তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদার ও কৃষকের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে এবং এর ফলে বাংলায় তীব্র কৃষক অসন্তোষের উদ্ভব ঘটে। জমিদার ও কৃষকের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি এবং কৃষক অসন্তোষের ফলস্বরূপ ভূমি বিরোধ বা জমিদার-কৃষক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়।

---

[৯] বিস্তারিতভাবে দেখুন, এম. এ. কাউসার, "সিপাহী বিদ্রোহে পূর্ববঙ্গের জমিদারদের সরকার পক্ষাবলম্বনের কারণ অনুসন্ধান-একটি পর্যালোচনা", *কলা অনুষদ পত্রিকা*, খণ্ড ৩, সংখ্যা ৪ ও ৫, জুলাই ২০০৮-জুন ২০১০ (ঢাকা : কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০), পৃ. ৪১-৪৮।

[১০] রতন লাল চক্রবর্তী, *সিপাহী* যুদ্ধ ও *বাংলাদেশ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ১২৩-১২৪ ও ১২৬।

[১১] *সংবাদ*, ১৯ এপ্রিল, ১৯৭৫।

[১২] Willem Van Schendel, *Peasant Mobility : The odds of life in rural Bangladesh* (New Delhi : Manohar Publications, 1982), p. 32.

[১৩] বিস্তারিতভাবে দেখুন, ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১০৪-১০৫।

ঔপনিবেশিক সরকারের ভূমি ব্যবস্থায় পুনরায় নীতি কৌশলে পরিবর্তন ঘটে ১৭৯৫ সালের আইন (The Regulation XXXV of 1795) প্রণয়নের মাধ্যমে। সরকারের এই নীতি কৌশলে পরিবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা। বিভিন্ন জেলার কালেক্টরগণ রাজস্ব বোর্ডকে জানান যে জমিদারদের রাজস্ব বাকয়ার প্রধান কারণ হলো বল প্রয়োগের ক্ষমতা না থাকায় তারা কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হচ্ছিল। কালেক্টরদের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার জন্য খাজনা আদায়ে জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ১৭৯৫ সালের আইন প্রণয়ন করা হয়।[১৪] এই আইনে জমিদারদের খাজনা আদায়ের জন্য কৃষকদের ওপর প্রয়োগের জন্য কিছু সংক্ষিপ্ত ক্ষমতা (summary powers) প্রদান করা হয়।[১৫] এই আইন কৃষকদের ওপর জমিদারদের প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই আইনের পর জমিদার ও কৃষকের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে এবং ভূমি বিরোধ বা জমিদার-কৃষক দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়।

তবে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-কৃষক দ্বন্দ্ব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ১৭৯৯ সালের সপ্তম আইন (The Regulation VII of 1799)। রাজস্ব আদায় নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে প্রণীত আইনসমূহে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল তা সপ্তম আইন দ্বারা প্রত্যাহার করে কৃষকদের ওপর জমিদারদের স্বৈরতন্ত্রী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সপ্তম আইনে মোট ১৫টি ধারা এবং বিভিন্ন উপধারা ছিল যার মধ্যে কৃষক শোষণ ও নিপীড়ন সম্পর্কিত ধারা-উপধারাগুলো ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সপ্তম আইনের কৃষক শোষণ ও নিপীড়ন সম্পর্কিত প্রধান ধারা-উপধারাগুলো ছিল নিম্নরূপ : (১) এই আইনের ১৫ নং ধারার ১ নং উপধারায় বলা হয় যে জমিদার সরকারি অনুমতি ছাড়াই কৃষককে বন্দি করতে পারবে। (২) এর ১৫ নং ধারার ৬ নং উপধারায় বলা হয় যে জমিদার বকেয়া খাজনা উদ্ধারকল্পে কৃষকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। এই বাজেয়াপ্তি বিষয়ে কৃষক আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। (৩) এর ১৫ নং ধারার ৭ নং উপধারায় বলা হয় যে জমিদার বকেয়া খাজনা উদ্ধারকল্পে এমনকি কৃষককে তার বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করতে পারবে। (৪) এর ১৫ নং ধারার ৮ নং উপধারায় বলা হয় যে জমিদার কৃষককে কাছারিতে আসতে বাধ্য করতে পারবে। সেজন্য দৈহিক নির্যাতনের অভিযোগে কৃষক কোনো ফৌজদারি মামলা রজু করতে পারবে না।[১৬] সুতরাং শাসনকর্তৃপক্ষ সপ্তম আইনে জমিদারদেরকে কৃষকদের শোষণ ও নিপীড়নের বৈধ অধিকার প্রদান করে। এই আইনে কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়নের যে বৈধ অধিকার লাভ করে তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জমিদাররাও বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। এর ফলে কৃষকদের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে।[১৭] আর কৃষকদের অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জমিদার ও কৃষকের সম্পর্কেরও অবনতি ঘটে। ক্রমেই ভূমি বিরোধ বা জমিদার-কৃষক দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। অবশ্য সরকার ১৮১২ সালে পঞ্চম আইন (Regulation V of 1812) প্রণয়ন করে জমিদারদের কৃষক গ্রেফতারের ক্ষমতা বাতিল করলেও কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন করার অন্য সকল ক্ষমতা অপরিবর্তিত ছিল।[১৮] পার্থ চ্যাটার্জীর মতে নিয়মিত খাজনা আদায়ের জন্য প্রণীত পঞ্চম আইনেও জমিদারদের হাতে কৃষক শোষণ ও নিপীড়নের সুযোগ রয়ে যায়।[১৯] এ কারণে বলা হয় যে সপ্তম আইন ছিল

---

[১৪] Islam, *Permanent Settlement*, p. 42.

[১৫] Islam, *Bengal Land Tenure*, p. 15.

[১৬] এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. I, p. 21; Islam, *Permanent Settlement*, pp. 64-66; Islam, *Bengal Land Tenure*, p. 16; ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১১৪।

[১৭] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থা মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট*, ৩১ জুলাই ১৯৮৯, ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ১৯৮৯), পৃ. ৬-৭।

[১৮] করিম, *যশোর জেলায় নীল আন্দোলন*, পৃ. ৪৫।

[১৯] Chatterjee, *Bengal*, p. 15.

সমস্ত কৃষকের নিকট একটি ত্রাস ও আতঙ্কের বিষয় এবং পঞ্চম আইন ছিল তারই সহযোগী ও দোসর।[২০] পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে পঞ্চম আইনে জমিদারদের গ্রেফতার করার ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হলেও বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য ক্রোক করার ক্ষমতা বহাল রাখা হয়। তিনি যথার্থই বলেছেন যে ক্রোক করার ক্ষমতা থাকলে গ্রেফতার করার ক্ষমতা থাকা-না-থাকার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। ফলে পঞ্চম আইনেও কৃষকদের কাছে জমিদার ভীতি অপরিবর্তিত রয়ে যায়।[২১] কেননা এই আইনের পরও কৃষকের ওপর জমিদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন থাকে এবং জমিদাররা কৃষক নিপীড়ন অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়। এ কারণে পঞ্চম আইন প্রণয়নের পরও ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-কৃষক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল।

উপরন্তু, ১৮১৯ সালের অষ্টম আইনে[২২] (Regulation VIII of 1819) পত্তনি প্রথার প্রবর্তনের ফলে ভূমিস্বত্বের আমূল পরিবর্তনের কারণে ভূমি বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। ১৮১৯ সালে সরকারের নীতি কৌশলে পরিবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আয় নিশ্চিত করা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট অচলাবস্থার অবসান ঘটানো।[২৩] উল্লেখ্য, অষ্টম আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পত্তনিদার নামে জমিদার ও কৃষকের মাঝখানে একটি মধ্যস্বত্বভোগী[২৪] শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এই আইনে সব শ্রেণির পত্তনিকে স্থায়ী, উত্তরাধিকার ও হস্তান্তরযোগ্য করার কারণে ভূমি সংশ্লিষ্ট মধ্যবর্তী (পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, সে-পত্তনিদার ইত্যাদি) মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব হয়।[২৫] এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিবর্তন করা হলেও ভূমি রাজস্ব আদায় এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় সরকার যথেষ্ট লাভবান হয়। এ কারণে সরকার খাস মহলেও পত্তনি প্রথা কার্যকর করে।[২৬] এই আইনে ভূমি রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত উপার্জন ও সাশ্রয়ের সুযোগ থাকায় পত্তনি প্রথা প্রায় সকল জমিদারিতে দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। ফলে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তবে এই আইনের মাধ্যমে ভূমিতে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির সমান্তরালে শোষণ ও নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কৃষক অসন্তোষ তথা ভূমি বিরোধ তীব্র হয়ে উঠে। এটি ছিল অষ্টম আইনের অন্যতম নেতিবাচক একটি দিক। উল্লেখ্য, ১৮১৯ সালের পত্তনি আইনের পূর্ব পর্যন্ত ভূমি বিরোধ ছিল দ্বিপক্ষীয় বিষয় তথা জমিদার ও কৃষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই আইন প্রণয়নে পর ভূমি বিরাধ ত্রিপক্ষীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এই আইনের ফলস্বরূপ ভূমি বিরোধের রাজনীতি ত্রিপক্ষীয় তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করে এবং এই দ্বন্দ্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বস্তুতপক্ষে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের নীতি কৌশলে পরিবর্তনের ফলে ১৭৯৩ হতে ১৮৫৯ পর্যন্ত প্রণীত আইনসমূহের মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাদের খাজনা আদায় নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় নিশ্চিত করা। কিন্তু এসব আইনের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় কিছুটা নিশ্চিত হলেও কৃষকের ওপর জমিদারের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ ও নিপীড়নের পরিণামে ধীরে ধীরে কৃষক অসন্তোষ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠে যা ঔপনিবেশিক স্বার্থের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে বাংলা

---

[২০] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Report of the Land Revenue Commission,* Vol. I, p. 22; ইসলাম, *ঔপনিবেশিক শাসনকালে চট্টগ্রামের ভূমিব্যবস্থা*, পৃ. ৯৩।

[২১] পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভূমি ও ভূমি সংস্কার : সেকাল একাল* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭), পৃ. ৫৫।

[২২] ১৮১৯ সালে অষ্টম আইন সাধারণভাবে ১৮১৯ সালের পত্তনি আইন বা পত্তনি প্রথা হিসেবে সমধিক পরিচিত।

[২৩] Islam, *Permanent Settlement*, pp. 60-61; ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১১৩; *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. ৬-৭।

[২৪] মধ্যস্বত্বভোগী ছিল ভূস্বামী বা ভূম্যধিকারী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ। ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে ভূস্বামী বা ভূম্যধিকারী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত জমিদার ব্যতীত অপর অংশ ছিল এই মধ্যস্বত্বভোগী বা মধ্যস্বত্বাধিকারী, যারা পরবর্তীকালে জোতদার হিসেবেই সমধিক পরিচিতি লাভ করে। এরপর থেকে এই গবেষণায় জোতদার, মধ্যস্বত্বভোগী ও মধ্যস্বত্বাধিকারী বললে একই অর্থ বহন করবে এবং তা এই গবেষণায় জোতদার হিসেবেই বিবেচিত হবে।

[২৫] Islam, *Permanent Settlement*, pp. xiii-xiv.

[২৬] Islam, *Bengal Land Tenure*, pp. 26-27.

বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় অনেকগুলো কৃষক বিদ্রোহ (তৃতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে) সংঘটিত হয়। উপরন্তু, ১৮৫৭ সালের সর্বভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহ সরকারকে নতুন করে ভাবিয়ে তোলে। কারণ সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাংলা তথা পূর্ব বাংলার ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা ও যশোর জেলায় উত্তেজনা দেখা দেয়। যদিও সিপাহী বিদ্রোহের সময় পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তথা কৃষকরা বিদ্রোহী সিপাহীদের সমর্থন এবং সহযোগিতা করেনি, কিন্তু তারপরও সরকার উপলবদ্ধি করে যে সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার সঙ্গে কৃষক অসন্তোষ তথা ভূমি বিরোধ সংযুক্ত হলে সরকারের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটবে।[২৭] সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ পূর্ব বাংলার জমিদার এবং জোতদার শ্রেণির সহযোগিতা ও আনুগত্য লাভ করলেও সার্বিকভাবে কৃষক অসন্তোষ বা ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছিল।[২৮] উইলেম ভেন সেন্ডেলের মতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পূর্ব বাংলার জমিদার, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও কৃষকরা বিদ্রোহী সিপাহীদের সমর্থন ও সহযোগিতা না করলেও এই বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষ ঔপনিবেশিক স্বার্থ রাক্ষার্থে অতি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, কারণ উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং কৃষকরা জমিদার, ইউরোপিয়ান উদ্যোক্তা বিশেষত ইউরোপিয়ান নীলকর ও ভূম্যধিকারী এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।[২৯]

উল্লেখ্য, বাংলায় ইউরোপিয়ানদের ভূমির স্বত্বাধিকার লাভ ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে কোনো বিদেশীর পক্ষে বাংলায় ভূমিস্বত্বাধিকার লাভের সুযোগ ছিল না। সর্বপ্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে কলকাতা শহর এলাকায় ইউরোপিয়ানরা ভূমিস্বত্বাধিকার লাভের সুযোগ পেয়েছিল। অবশ্য এই আইনে ইউরোপিয়ানদের কলকাতা শহরের বাইরে ভূমি ক্রয়ের অনুমতি ছিল না।[৩০] কিন্তু ১৮২৪ সালের আইনে পত্তনি গ্রহণের অধিকার দেওয়ার কারণে ইউরোপিয়ানদের বাংলার সর্বত্র ভূমি স্বত্বাধিকার লাভের পথ উন্মুক্ত হয়। ১৮৩০ সালে লর্ড বেন্টিঙ্কের অধ্যাদেশের বিধানে ইউরোপিয়ান নীলকরদের ৯৯ বছর মেয়াদে পত্তনি গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও ১৮৩৭ সালের আইনে কোম্পানি রাজত্বের যে কোনো স্থানে ইউরোপিয়ানদের ইচ্ছেমতো সময়ের জন্য ভূমি ক্রয়ের অধিকার দেওয়ায় বাংলা তথা পূর্ব বাংলায় ইউরোপিয়ান জমিদার শ্রেণির উত্থান ঘটে। ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের এসব পদক্ষেপ কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়নের মাত্রাকে আরও জোরদার করেছিল। একদিকে এদেশীয় জমিদার এবং অন্যদিকে ইউরোপিয়ান জমিদার-উভয়ের শোষণ ও নিপীড়নে কৃষকরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। উপরন্তু, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শাসনকর্তৃপক্ষ নীলকরদের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ শুরু করে। বাংলার প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফ্রেডারিক হ্যালিডের সুপারিশের ভিত্তিতে ভারত সরকার ১৮৫৭ সালের ১ আগস্ট হতে ১৮৫৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৯ জন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করে।[৩১] তারা সরকারের নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগে কৃষকদের ওপর তাদের নির্মম শোষণ ও নিপীড়ন মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। এর ফলে এদেশীয় ও ইউরোপিয়ান জমিদার এবং নীলকরদের ত্রিপক্ষীয় শোষণ ও নিপীড়নে বাংলার কৃষককূল অতিষ্ঠ হয়ে উঠে।[৩২] পরিণামে ভূমি বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের কারণে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের জন্য এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রির বাজার হিসেবে ভারতীয় উপনিবেশ বিশেষভাবে বিবেচিত ছিল।

---

[২৭] Schendel, *A History of Bangladesh*, p. 77; চক্রবর্তী, *সিপাহী* যুদ্ধ ও *বাংলাদেশ*, পৃ. ১২১।

[২৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, কাউসার, *"সিপাহী বিদ্রোহে পূর্ববঙ্গের জমিদারদের সরকার পক্ষাবলম্বনের কারণ অনুসন্ধান"*, পৃ. ৪১-৪৮; সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ১০ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১৭৮।

[২৯] Schendel, *History of Bangladesh*, p. 77.

[৩০] করিম, *যশোর জেলায় নীল আন্দোলন*, পৃ. ১৪০।

[৩১] পুলক চন্দ, *নীল বিদ্রোহ* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫), পৃ. ৬৮।

[৩২] বিস্তারিতভাবে দেখুন, রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ*, পৃ. ৩৮২-৩৮৫; চন্দ, *নীল বিদ্রোহ*, পৃ. ৪০-৫২।

শাসনকর্তৃপক্ষের ধারণা হয়েছিল যে কৃষকদেরকে ভূমিতে অধিকার দিলে একদিকে কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং তারা সচ্ছলতা লাভ করবে। আর কৃষকরা সচ্ছল হলে ব্রিটিশ পণ্য ক্রয় করতে পারবে। উপরন্তু, ১৮৫৭ সালে সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক এ. স্কোর কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে খোলা চিঠি লেখেন তা দ্বারা বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে অনুপ্রাণিত হন যা তিনি ভারতের বড়লাটকে জানিয়ে ভূমি নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখেন।[৩৩] সার্বিক বিচারে সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং সিপাহী বিদ্রোহে ভূস্বামীদের রাজভক্তিতে খুশি হয়েও তাদের শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে বড়লাট লর্ড ক্যানিং নতুন করে ভূমি আইন প্রণয়নে মনোস্থির করেন।[৩৪] এভাবে সরকারের ভূমি নীতি কৌশলে পরিবর্তনমূলক মনোভাবের ফলে ১৮৫৯ সালের ২৯ এপ্রিল গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে অনুমোদনের পর দশম খাজনা আইন (Rent Act X of 1859) প্রণীত হয়। এই আইনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় আংশিকভাবে পরিবর্তন ঘটে। ক্যানিংয়ের ভাষায় কৃষক এই আইনের ফলে ফিরে পেল তার হৃত অধিকার, লাভ করল এক অভূতপূর্ব স্বাধীনতা, যা ইতিপূর্বে কখনোই তারা ভোগ করেনি।[৩৫] কিন্তু খাজনা আইনে বড়লাট কর্তৃক কৃষকের বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে ভূমি হস্তান্তরসহ ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকের তেমন কোনো অধিকারই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হতে ধারাবাহিকভাবে যে সকল ভূমি আইন প্রণীত হয়েছিল খাজনা আইন ছিল অনুরূপ একটি আইন মাত্র। তবে একথাও ঠিক যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর খাজনা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার সর্বপ্রথম ভূস্বামীদের কর্মকাণ্ডের ওপর হস্তক্ষেপ করে এবং ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের বিধিবদ্ধ অধিকারের (Statutory right) সূচনা হয়।[৩৬]

যাহোক, ১৯৫৯ সালের খাজনা আইনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ব্রিটিশ শাসনামলে সৃষ্ট জটিল ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে শাসনকর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগের ফলে ভূস্বামী কর্তৃক কৃষকের ওপর শোষণ ও নিপীড়নের অবসান না হলেও শাসনকর্তৃপক্ষের ভূমি বিরোধ হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। উপরন্তু, এর মাধ্যমে ভূমি বিরোধ ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু খাজনা আইনে জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়ায় কৃষকদের খাজনা সম্পর্কিত তেমন কোনো লাভ হয়নি। আইনের দুর্বলতার সুযোগে জমিদাররা ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, ১৮৬২ সালে কলকাতা হাইকোর্টে জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম দায়েরকৃত মামলার (Hills vs. Ishwar Ghose case) রায় জমিদারদের পক্ষে যায়। রায়ে কৃষকের চিরাচরিত অধিকারকে গ্রহণ না করে বরং জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির জন্য "Doctrine of political economy of Indian land rent" মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করে।[৩৭] হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার বেরেন্স পিকক পরগণা নিরিখ অনুযায়ী খাজনা নির্ধারণের নীতি গ্রহণে অস্বীকার করেন। তিনি রাজনৈতিক অর্থনীতির বাস্তবতার নিরিখে ম্যালথাসের নীতির ভিত্তিতে ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের লাভের একটি অংশ হিসেবে খাজনা বৃদ্ধির যুক্তিকে গ্রহণ করেন।[৩৮] কেবলমাত্র কলকাতা হাইকোর্টের উক্ত মামলার বিচারকরাই নন বরং ম্যালথাসের অনুসারী বাংলার বিভিন্ন জেলায় নিয়োজিত ব্রিটিশ রাজস্ব কর্মকর্তারাও জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির পক্ষে

[৩৩] M. Mufakharul Islam, *An Economic History of Bengal 1757-1947* (Dhaka : Adorn Publication, 2012), pp. 162-163.

[৩৪] এখানে ভূস্বামী বলতে জমিদার ও জোতদারদের বুঝানো হয়েছে।

[৩৫] সিরাজুল ইসলাম "Resolution of the Governor General in Council, 29 April, 1859"-এর কার্যবিবরণী থেকে লর্ড ক্যানিংয়ের বক্তব্য উদ্ধৃতি হিসেবে তুলে ধরেছেন। দেখুন, ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১১৫-১১৬।

[৩৬] Khan, *District Gazetteers : Noakhali*, p. 263.

[৩৭] ম্যালথাসের মতবাদ অনুযায়ী ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের লভ্যাংশের বা মুনাফার একটি অংশ জমির মালিক হিসেবে জমিদারদের প্রাপ্য ছিল। দেখুন, Nilmani Mukherjee, *A Bengal Zamindar : Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and his times 1808-1888* (Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1975), p. 229.

[৩৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Islam, *Bengal Land Tenure*, p. 79.

প্রকাশ্যে সমর্থন করেন।[৩৯] একই সাথে ব্রিটিশ রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদরাও খাজনা বৃদ্ধির পক্ষে সহমত প্রকাশ করেন। তাঁদের যুক্তি ছিল ফসলের মূল্য বৃদ্ধির একটি অংশ জমিদারদেরও প্রাপ্য এবং একারণে তাঁরা জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির অধিকারকে যৌক্তিক মনে করেন।[৪০] সুতরাং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমে ভূমি বিরোধ হ্রাস করা ছিল খাজনা আইনের মৌল্য উদ্দেশ্য যা ব্যর্থ হয়। এই আইন কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব আরও বেশি বৃদ্ধি পায় যার ফলে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়।[৪১]

২.৩ ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ও ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন

কৃষক অসন্তোষ তথা ভূমি বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭৬ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার টেম্পল কৃষকদের ভূমিস্বত্বের ওপর ভোগদখলীয় অধিকার সম্পর্কিত একটি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করেন। একই সময়ে বাংলার আইন সভার সিলেক্ট কমিটিও সুপারিশ করে যে ভূমি রাজস্ব সম্পর্কিত সকল আইনেরই পরিবর্তন প্রয়োজন। ইতোমধ্যে বিহারের কৃষকদের অবর্ণনীয় দুর্দশার পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় এবং কমিটি তাদের প্রতিবেদনে প্রচলিত রাজস্ব আইনে এতো বেশি পরিবর্তনের সুপারিশ করেছিল যা সামগ্রিক রাজস্ব আইনের পুনঃপ্রণয়নের সামিল।[৪২] এই অবস্থায় সার্বিকভাবে কৃষকদের সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখার জন্য এবং সকল রাজস্ব আইন পর্যালোচনা করে একটি নতুন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সুপারিশমালা প্রদানের জন্য ভারত সরকার ১৮৭৯ সালের এপ্রিল মাসে লেফট্যানেন্ট গভর্নর ও রাজস্ব বোর্ডের সদস্য এইচ. ডব্লিউ. ডামপিয়েরকে প্রধান করে ৮ সদস্য[৪৩] বিশিষ্ট খাজনা আইন কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ১৮৮০ সালের জুন মাসে একটি আইনের খসড়াসহ সরকারের নিকট তার প্রতিবেদন দাখিল করেন। এই খসড়া আইনের আংশিক পরিবর্তন করে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল নামে ১৮৮৩ সালের ২ মার্চ গভর্নর জেনারেলের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে পেশ করা হয় যা বিখ্যাত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল হিসেবে পরিচিত। বিলটি দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ১৮৮৫ সালের ১১ মার্চ ভারতীয় আইন সভায় পাশ হয় এবং এটি ১৮৮৫ সালের ১৪ মার্চ গভর্নর জেনারেলের সম্মতির পর বঙ্গীয় প্রজাস্বত আইনে পরিণত হয়।[৪৪]

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের ভূমি সংস্কারের ইতিহাসে বৈপ্লবিক ঘটনা। এই আইনেই সর্বপ্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় পরিবর্তন করে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের সীমিত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমত, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষকদেরকে স্বত্বাধিকারী, স্থায়ী ও অধীনস্থ-এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করে প্রথম দুই ধরনের কৃষকের (স্বত্বাধিকারী ও স্থায়ী) মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে ভূমিস্বত্বের ওপর তাদের স্থায়ী ও উত্তরাধিকারসহ বিভিন্ন ধরনের অধিকার প্রদান করা হয়।[৪৫] এই আইনের বিধান অনুযায়ী ১২ বছর বা তার অধিককালের দখলিস্বত্ব সম্পন্ন রায়তকে জমির মালিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এখানে স্পষ্ট করে বলা হলো যে কোনো ভোগদখলীয় কৃষক নিরবচ্ছিন্নভাবে ১২ বছর ধরে জমি চাষ করলে তাকে উচ্ছেদ করা যাবে না।[৪৬] উল্লেখিত আইনে আরও সংযুক্ত হয় যে যদি কৃষককে উচ্ছেদ করতে হয় তবে তা অবশ্যই আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে করতে

---

[৩৯] Islam, *Bengal Land Tenure,* pp. 78-81.
[৪০] Islam, *Bengal Land Tenure,* pp. 78-79.
[৪১] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Mukherjee, *Bengal Zamindar,* p. 226-229.
[৪২] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. ১১।
[৪৩] আট সদস্যের মধ্যে ৩ জন ছিলেন ভারতীয়-মোহিনী মোহন রায়, পিয়ারী মোহন মুখার্জী এবং ব্রোজেন্দ্র কুমার শীল।
[৪৪] Islam, *Economic History,* pp. 165-166; *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. ১১।
[৪৫] চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম*, পৃ. ৫৪।
[৪৬] *Report of the Land Revenue Commission,* Vol. I, pp. 26-27; Khan, *District Gazetteers : Rangpur,* p. 275.

হবে।[৪৭] এখানেই সর্বপ্রথম উচ্ছেদ বিষয়ে কৃষকের পক্ষে এধরনের রক্ষাকবচের মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিকার প্রদান করা হয়।[৪৮] পাশাপাশি এও বলা হয় যে জমিদারের পরিবর্তনের পরও জমির মালিকানা কৃষকের হাতেই থাকবে।[৪৯] বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়,

> This Act stated the statutory development of rights to tenants, which ultimately culminated in the passing of the (Bengal) Tenancy Act, 1885 which classified the tenants as Tenure-holders, raiyats and under-raiyats, and defined settled and occupancy raiyats who had greater privileges in the enjoyment of rights. The incidents of tenancies were clearly laid down; and the mutual rights and obligations of the tenants and landlords were given in detail. Valuable rights were conferred on various grades of tenants in the matter of permanency, heritability and transfer of their interests, and protection from arbitrary enhancement of rent, and ejectment from tenancies.[50]

এভাবে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে সর্বপ্রথম ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের আংশিক স্বত্ব অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়।[৫১] সিরাজুল ইসলামের মতে যদিও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের প্রথাগত অধিকার স্বীকৃত হয় যা ছিল কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলনের এক বড় অর্জন। কিন্তু আইনে নিম্নশ্রেণির কৃষকের অধিকার সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।[৫২] ফলে এই আইন কার্যকর করার পরও কোর্ফা, বর্গাদার, চাকরান, নানকার, কর্ষা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির কৃষকরা ভূস্বামীদের ইচ্ছাধীন প্রজারূপেই রয়ে যায়।[৫৩]

দ্বিতীয়ত, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের বিধানে উক্ত দু'ধরনের কৃষককে জমি বিক্রি, বন্ধক বা ইজারা বা মর্টগেজ দেওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়।[৫৪] তবে কৃষকের ভূমিস্বত্ব হস্তান্তরের অধিকার ছিল শর্ত সাপেক্ষ : (ক) ভূস্বামীকে সেলামি প্রদান সাপেক্ষে কৃষক তার ভূমিস্বত্ব বিক্রি বা হস্তান্তর করার অধিকার পাবে; এবং (খ) ভূমিস্বত্ব বন্ধক বা ইজারা বা মর্টগেজ দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষককে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের বিধানে বলা হয়, "The right of a raiyat was protected in the event of his superior landlord's interest being sold up he was given the right of mortgaging his holding and of subletting it for a period of not more than 9 years."[55] যদিও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে অধীনস্থ কৃষকের ভূমিস্বত্ব হস্তান্তরের অধিকার সম্পর্কে কোনো কিছুই বলা হয়নি তারপরও এই আইনে বিশেষ শ্রেণির কৃষককে ভূমিস্বত্ব হস্তান্তরের মতো অধিকার দেওয়ার বিধান ছিল যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

---

৪৭ *Report of the Land Revenue Commission,* Vol. I, pp. 26-27.
৪৮ চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম*, পৃ. ৫৪।
৪৯ নোমান রাজা, 'কৃষক আন্দোলনের পটভূমি', *দৈনিক বাংলা*, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৪।
৫০ Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers : Dacca*, p. 367.
৫১ *সংবাদ*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭৫।
৫২ উইলেম ভেন স্যান্ডেল কৃষকদেরকে ধনী কৃষক, মধ্য কৃষক ও গরীব কৃষক-এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। দেখুন, Schendel, *Peasant Mobility,* p. 6.
৫৩ সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৬ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২১২।
৫৪ Khan, *District Gazetteers : Pabna*, p. 256; চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম*, পৃ. ৫৪; নোমান রাজা, 'কৃষক আন্দোলনের পটভূমি', *দৈনিক বাংলা*, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৪।
৫৫ *Report of the Land Revenue Commission,* Vol. I, pp. 26-27.

তৃতীয়ত, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষকের অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভূমি জরিপ করে প্রত্যেককে যার যার অধিকার সম্বলিত খতিয়ান প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়।[৫৬] গ্রামের নকশা ও পর্চা প্রস্তুত করার বিধানও এই আইনে ছিল। আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় জরিপকাজ সম্পন্ন করা হয় এবং নকশা ও দলিল-পত্রাদি প্রস্তুত করা হয়।[৫৭] জরিপের সময় নতুন আবাদি বা বন্দোবস্তকৃত জমির খাজনা একই শ্রেণির পারিপার্শ্বিক জমির জন্য নির্ধারিত হারে বা উৎপাদিকা শক্তির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার অধিকার সেটেলমেন্ট অফিসারের ওপর অর্পণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে নতুন আবাদি জমির বা খাজনা সম্পর্কিত বিরোধের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত খাজনার হার ও পরিমাণ নির্ধারণ করার এক্তিয়ার হতেই জরিপ কার্যক্রম 'সেটেলমেন্ট অপারেশন' নামে পরিচিত লাভ করে। উল্লেখ্য যে, এই আইনের পূর্বে ভূমিতে কৃষকের স্বত্ব বা অধিকার উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণপত্র দেওয়া হতো না। যাহোক, এই আইনে কৃষকের অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জরিপপূর্বক ভূমির খতিয়ান তথা রেকর্ড অব রাইট প্রণয়ন করার বিধান ছিল একটি উল্লেখযোগ্য এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ কারণে এটি কৃষকের নিকট 'মেগনাকার্টা' হিসেবে অভিহিত।[৫৮] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় এদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে কোনো আদর্শ বা লক্ষ্যও সরকারের ছিল না। নির্দিষ্ট তারিখে নির্ধারিত রাজস্ব পরিশোধ সাপেক্ষে ভূমিতে কৃষকের অধিকার তথা ভূমিস্বত্ব এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব জমিদারগণের ওপর অর্পণ করে সরকার সন্তুষ্ট ছিলেন। ভূমিতে কৃষকের অধিকার তথা ভূমিস্বত্ব আদায়ের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে সর্বপ্রথম কৃষককে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণির কৃষকের স্বত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয় এবং প্রতি খণ্ড জমি জরিপ করে কৃষকের নাম ও শ্রেণি এবং জমির পরিমাণ ও শ্রেণি, খাজনার পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত খতিয়ান প্রণয়নের আইনগত বিধান রাখা হয়। কৃষক জমিতে তার অধিকার সংরক্ষণ ও ভোগের অধিকারের জন্য জরিপে প্রণীত এই খতিয়ানের ওপর নির্ভরশীল ছিল।[৫৯]

চতুর্থত, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে বলা হয় যে কোনো কৃষক নিরবচ্ছিন্নভাবে ১২ বছর ধরে একই ভূমিতে চাষ করলে তার খাজনা বৃদ্ধি করা যাবে না।[৬০] অর্থাৎ খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার এই আইনে কৃষকদের প্রদান করা হয়। জমিদাররা খাজনা বৃদ্ধির পূর্বে আদালতের রায় নিতে বাধ্য হবে বলেও আইনের বিধানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়।[৬১] এই আইন অনুযায়ী জমিদাররা ১২.৫% হারে খাজনা বৃদ্ধির সুযোগ পায় এবং এই সুযোগ ১৫ বছরের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ১৫ বছর পর পুনরায় ফসলের মূল্য বৃদ্ধি সাপেক্ষে ভূস্বামীরা খাজনা বৃদ্ধি করতে পারবে বলেও আইনে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ এই আইনে শর্ত সাপেক্ষে খাজনা বৃদ্ধি করার বিধান করা হয়। অবশ্য ডায়েটমর রদারমুন্ডের মতে ভূস্বামীরা এই আইনের মধ্যে থেকেই খাজনা বৃদ্ধি করে তাঁদের ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছিল। উপরন্তু, ভূস্বামীরা কৃষকের ভূমি হস্তান্তরের ফি পাওয়ার কারণে আরও বেশি লাভবান হয়েছিল।[৬২] যদিও আইনটিতে ভূস্বামীদের খাজনা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবতা ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বহাল রেখে কোনো শর্তেই ভূস্বামীদেরকে খাজনা বৃদ্ধি থেকে বিরত রাখা সম্ভব

---

[৫৬] ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের অধীনে ভূমি জরিপ ও বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৮৮৮ সাল থেকে। ১৯২৫ সাল নাগাদ বাংলার প্রায় সব জেলার জরিপ ও বন্দোবস্ত কর্ম শেষ হয়। ভূমি জরিপ ও বন্দোবস্ত কার্য সম্পন্ন করা ছিল বাংলার গ্রামীণ ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ, মামলা-মোকদ্দমা বহুলাংশে কমে যায়। ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১১৬।

[৫৭] চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম*, পৃ. ৫৪।

[৫৮] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. ১১-১২।

[৫৯] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. মুখবন্ধ গ-ঘ।

[৬০] Khan, *District Gazetteers : Rangpur*, p. 275.

[৬১] Khan, *District Gazetteers : Rangpur*, p. 275; চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম*, পৃ. ৫৪।

[৬২] Dietmar Rothermund, *"The Indian Peasant in the Great Depression, 1929-1939"*, Bisheshwar Prasad Memorial Lecture 1988 (Bhagalpur : University of Bhagalpur, 1988), pp. 68-69.

ছিল না। শুধু তাই নয়, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে আবওয়াব নেওয়া সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও বাস্তবে ভূস্বামীরা নিয়মিতভাবে আবওয়াব আদায় অব্যাহত রেখেছিল। এ সম্পর্কে এফ. এ. সাচি মন্তব্য করেন,

> It may be interesting to summarise here the chief sections of the Tenancy Act (1885) which are constantly ignored in the district of Mymensingh. (1) Section 74. Some or all of the following *abwabs* are realised in nearly every village. (a) *gramkharcha*, or collection expenses, to the *amla* at 1 anna, 2 annas or 8 annas of the rent. In some cases a large percentage goes to the zamindar himself. (b) *Ijaradari,* in cases where collections are made by temporary lease-holders, from 8 annas to 4 annas in the rupee may be added to the rent. (c) *abwabs* in the shape of contributions to schools and dispensaries maintained by the landlords are common in the Tangail subdivision.[63]

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল আইনটি প্রণয়নকালে নিজ স্বার্থেই সরকার ভূস্বামীদের সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়েছিল।[৬৪] কারণ তখনও পর্যন্ত ভূস্বামীরাই ছিলেন প্রভাবশালী এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থে তাঁদেরকে রক্ষা করাও প্রয়োজন ছিল। ঔপনিবেশিক স্বার্থে একদিকে ভূস্বামীদের আস্থায় রাখার প্রয়াস এবং অন্যদিকে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদেরকে কিছুটা অধিকার দিয়ে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব হ্রাস করতে উদ্যোগ গ্রহণ ছিল এই আইনের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উপরন্তু, এর মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষ ভূমি ব্যবস্থায় একটি দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করেন। এই আইন প্রণয়নের ফলেই কৃষক ভূমিস্বত্বাধিকারী হিসেবে ভূস্বামীদের সঙ্গে ভূমির ওপর অধিকার প্রশ্নেও প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ লাভ করে। সুতরাং ভূমি ব্যবস্থায় ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষেরই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সার্বিকভাবে বলা যায় যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সূচনা হয় তা পরবর্তীকালে প্রণীত আইনে ক্রমপ্রসারমান হতে থাকে।

২.৪ ১৯০৭ সালের ভূমি আইন ও সরকারের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল করার কৌশল

বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গের সময় পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকদের মধ্যে জমিদার ও জোতদারদের খাজনা না দেওয়ার চেতনা ক্রমবর্ধিত হচ্ছিল। এমনকি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে কৃষকরা জমিদার ও জোতদারদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টাও করেছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় কৃষকরা তাদের বিরুদ্ধে রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে ১৯০৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে হিন্দু জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের বিদ্রোহ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে একই সময়ে ময়মনসিংহের কৃষক বিদ্রোহের মতোই খুলনার বাগেরহাট অঞ্চলের নমঃশূদ্র ভাগ চাষিরাও মুসলমান জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিল। সমকালীন কৃষক বিদ্রোহের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে সুপ্রকাশ রায় বলেন যে অনাবৃষ্টির ফলে বাগেরহাট অঞ্চলের নমঃশূদ্র ভাগ চাষিদের ব্যাপক ফসলহানী হয়। দরিদ্র চাষিদের খাদ্যাভাবের সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে জমিদার এবং জোতদার শ্রেণির নির্মম শোষণ ও নিপীড়ন। যে জমিদার ও জোতদাররা পূর্বে ভাগচাষিদের আধাআধি ভাগে জমি চাষ করতে দিতো, অজন্মার বছরে তারাই কৃষকদের কাছে অর্ধেকের বেশি ফসল দাবি করতে থাকে। ভাগচাষিরা এই দাবি মানতে অস্বীকার করে। ভাগচাষিরা নিজেরাই সভা-সমিতি করে স্থির করে যে তারা জমিদার ও জোতদারদের জমি আর চাষ করবে না। দীর্ঘদিন ধর্মঘট চলার পর জমিদার ও জোতদাররা

---

৬৩ F. A. Sachse, *Bengal District Gazetteers : Mymensingh* (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1917), p. 108.

৬৪ দেখুন, Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal 1884-1912* (Dhaka : The University Press Limited, 1996), pp. 86-87.

ভাগচাষিদের দাবি মেনে নেওয়ার ফলে কৃষকদের ধর্মঘটেরও অবসান হয়।[৬৫] ফলে আংশিকভাবে হলেও বঙ্গভঙ্গের সময় কৃষকরা তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সফল হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গের সময় একদিকে কৃষক বিদ্রোহ এবং অন্যদিকে জমিদারদের নেতৃত্বে ও অংশগ্রহণে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের কারণে ঔপনিবেশিক স্বার্থহানীর আশঙ্কায় শাসনকর্তৃপক্ষ ১৯০৭ সালে ভূমি নীতি কৌশলে পরিবর্তন করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠা তীব্র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনকে দুর্বল করা। উল্লেখ্য, উনিশ শতকে গড়ে উঠা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিশ শতকের শুরুতে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত হয়। এটি ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। এ কারণে লর্ড কার্জন উপনিবেশিক স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল কেন্দ্রস্থল তথা কলকাতা এবং কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে দুর্বল ও শক্তিহীন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, একদিকে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জমিদার, মহাজন, ডাক্তার, আইনজীবী, চাকুরিজীবী, পত্রিকার মালিকসহ অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণির ব্যক্তি ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের, অন্যদিকে প্রধানত মুসলমানরা ছিলেন কৃষক শ্রেণির। বঙ্গভঙ্গের পর জমিদার প্রভাবিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দসহ জমিদার, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী শ্রেণি তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। জমিদারদের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয় এবং পরবর্তী সময়ে জমিদার, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী শ্রেণির নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।[৬৬] জমিদারদের বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করার প্রধান কারণ ছিল ভূমি সম্পর্কিত। বঙ্গভঙ্গের ফলে জমিদারি প্রথা বিলোপ হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় হিন্দু জমিদারেরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের আশঙ্কার মূলে ছিল পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা ধর্মগতভাবে সংখ্যালঘু শ্রেণি বা জনগোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ায় তাঁদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে। তাই তাঁরা ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না।[৬৭] অবশ্য অমিতাভ চক্রবর্তী বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে ভূমি বিরোধের রাজনীতির উল্লেখ করলেও তাঁর ব্যাখ্যা ছিল ভিন্ন ধরনের। তাঁর মতে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম কারণ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি সংশোধন। প্রথমত, লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় জমির খাজনা ছিল নির্দিষ্ট, খাজনা বৃদ্ধির আর কোনো উপায় ইংরেজ শাসকদের ছিল না। তাই কার্জন বাংলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে পূর্ববাংলা ও আসামকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা দিয়ে পর্যাপ্ত খাজনা বৃদ্ধির সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, লর্ড কার্জন কৃষক আন্দোলন ধ্বংসের পরিকল্পনা করেছিলেন, কেননা বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই ব্রিটিশ শক্তি বিস্তার সর্বাধিক বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান কৃষক আন্দোলনে ইংরেজ শাসকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, তাই বাংলাকে দ্বিবিভাজিত করে কৃষক সংগ্রামকে তারা ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছিল। তৃতীয়ত, সিপাহী বিদ্রোহ এবং ওয়াহাবি আন্দোলনের সময় থেকেই ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষ 'ভাগ করে শাসন কর' (Divide and Rule) এই রোমান নীতিকে অবলম্বন করে আসছিল। তারপরও বলা যায় যে বঙ্গভঙ্গের একটি উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা। ইংরেজরা নবজাত অল্পসংখ্যক মুসলমান বুর্জোয়াদের বোঝালো যে নতুন পূর্ববঙ্গ প্রদেশটি হবে মুসলমানদের নিজস্ব প্রদেশ। তারা আরও বোঝালো যে হিন্দু জমিদার ও হিন্দু বুর্জোয়ারাই তাদের বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়। তবে সাম্প্রদায়িকতা যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মূল কারণ এবং বঙ্গভঙ্গের কারণেই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ঘটেছিল, একথা কিন্তু সঠিক নয়।

---

[৬৫] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ১৮৩।

[৬৬] মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন ১৭০৭-১৯৪৭* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৫), পৃ. ১২০-১৪০; হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০* (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০১), ৬৫-৭১; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, পৃ. ২০২-২০৮।

[৬৭] অমলেন্দু দে, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১), পৃ. ২৬৪।

বস্তুতপক্ষে, পূর্ব থেকেই শ্রেণিবিভক্ত ও জমিদার প্রভাবিত সমাজে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপিত ছিল। কেননা সংঘাতরত দুই শ্রেণির (মুসলিম কৃষক ও হিন্দু জমিদার) ধর্ম পৃথক থাকায় সাম্প্রদায়িকতার বীজ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই রোপিত ছিল। সেই সঙ্গে বিলাতি পণ্য বর্জনের জারিজুরিতে সেই বীজ থেকে জন্মানো বিষবৃক্ষের রূপ আরও প্রকটিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই বীজকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করার জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজন ছিল চাষির হাতে জমি দেওয়া যা সরকার সফলভাবে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে করতে সক্ষম হয়েছিল।[৬৮] সুতরাং বঙ্গভঙ্গ ছিল ভূমি বিরোধের ইস্যুকে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টির প্রতিফলন।

যাহোক, বিশ শতকের শুরুতে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মোকাবেলায় 'ভাগ করে শাসন কর' নীতি কার্যকর করার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনকে দুর্বল করতে সরকার যে নীতি কৌশলে পরিবর্তন এনেছিল তার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, ঢাকার জমিদার পরিবারের প্রভাবশালী সদস্য নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, টাঙ্গাইলের করটিয়ার জমিদার আবদুল হালিম গজনভী, টাঙ্গাইলের ধনবাড়ির জমিদার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীসহ পূর্ব বাংলার মুসলমান জমিদারদের নানাভাবে প্রভাবিত করে সরকার তাদের পক্ষে নিয়ে আসে।[৬৯] এ কারণে দেখা যায় যে প্রথম দিকে মুসলমান জমিদারসহ অনেকেই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলেও লর্ড কার্জনের পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহে সফরের পর পূর্ববঙ্গের জমিদার ও মুসলমান নেতাসহ শিক্ষিত সমাজের সুর পাল্টে যায়। ঢাকার জমিদার নবাব সলিমুল্লাহ, ময়মনসিংহের জমিদার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, বরিশালের জমিদার মীর মোতাহার হোসেন, বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য চট্টগ্রামের সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং পূর্ববঙ্গের মুসলমান কর্তৃক পরিচালিত '*মোসলেম ক্রনিকাল*', '*মুসলিম ইনস্টিটিউট*', '*সুধাকর*' পত্রিকাসমূহ ও সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনসহ পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা, এমনকি কলকাতার মুসলমানরাও বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জানায়।[৭০] অধিকন্তু, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় হিন্দু জমিদারদের পাশে পেতে সরকার ১৯০৭ সালে একটি আইন জারি করে জমিদারদেরকে অতিরিক্ত খাজনা ও কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করে। অর্থাৎ ১৯০৭ সালে সরকার জমিদারদের ক্ষোভ দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে ভূমি আইন সংশোধন করে পূর্বের ন্যায় জমিদারকে বাড়তি খাজনা ও কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করে। এর ফলে বাংলার হিন্দু জমিদাররাও আন্দোলনকে প্রত্যাখান করে সরকারকে সমর্থন করেন। অর্থাৎ প্রথমদিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও ভূমি আইন সংশোধনের পর জমিদাররা আন্দোলন থেকে নিজেদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। এ কারণে ১৯০৭ সালের ৬ এপ্রিল '*টাইমস অফ ইন্ডিয়া*' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় যে বাংলার আইন সভার তৎকালীন একজন ব্রিটিশ সদস্য[৭১] ১৯০৭ সালের এই নতুন সংশোধনী ভূমি আইনকে সরকারের পক্ষ থেকে জমিদারদের উৎকোচ প্রদান বলে অভিহিত করেন। ১৯০৮ সালের ৩১ অক্টোবর কাশিমবাজারের মহারাজা, স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যয়, রাজা প্যারীমোহন মুখার্জী, দ্বারভাঙ্গা, বর্ধমান, দিনাজপুর, ময়মনসিংহের জমিদারসহ বাংলার প্রায় ২০০ জন হিন্দু জমিদার ১৯০৭ সালের আইনের জন্য এক যুক্ত বিবৃতিতে ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অকুণ্ঠ আনুগত্য জ্ঞাপন করেন।[৭২] অবশ্য

---

[৬৮] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ১৭৬-১৭৭।

[৬৯] বিস্তারিতভাবে দেখুন, জন আর. ম্যাকলেন, "বঙ্গবিভাগ, ১৯০৫ : রাজনৈতিক বিশ্লেষণ", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭), পৃ. ১২৩-১৫০।

[৭০] বিস্তারিতভাবে দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ* (ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৬), পৃ. ২১১; ম্যাকলেন, "*বঙ্গবিভাগ, ১৯০৫*", পৃ. ১২৮; *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, পৃ.২০২-২০৮; হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ১৩০-১৪২; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ.৬৮-৭০; সমর কুমার মল্লিক, *আধুনিক ভারতের রূপান্তর : রাজ থেকে স্বরাজ, ১৮৫৭-১৯৪৭* (কলিকাতা : ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ষষ্ঠ প্রকাশ, ২০০৬-২০০৭), পৃ. ৩৪৬-৩৫৫।

[৭১] উক্ত সদস্যের নাম মি. বাট্টাম বলে জানা যায়। দেখুন, অমিতাভ চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক কালে কালোত্তরে* (কোলকাতা : উবুদশ, ২০১৪), পৃ. ১৮৩।

[৭২] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ১৮৩।

বিচ্ছিন্নভাবেও শাসনকর্তৃপক্ষের প্রতি জমিদাররা আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। যেমন বাকেরগঞ্জের আরাকান্দিতে জমিদার রাজেন্দ্র নাথ মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নমশূদ্র কৃষকদের একটি সভায় বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করা হয়।[৭৩] সুতরাং বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় জমিদার প্রভাবিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের একাংশ প্রধানত জমিদাররা সরকারকে সমর্থন করেন, যারা কংগ্রেসের উদারপন্থী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯০৭ সালের সুরাট অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কঠোর অবস্থানের পক্ষে বিপক্ষে উদারপন্থী ও চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দেয় এবং এর ফলে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত (সুরাট বিচ্ছেদ) হয়ে যায়।[৭৪] দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেস কিছুটা হলেও দুর্বল হয়ে যায়। এর ফলে বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গড়ে উঠা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও আংশিকভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং বঙ্গভঙ্গের ফলে গড়ে উঠা আন্দোলন শক্তিহীন করার উদ্দেশ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

২.৫ ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন ও ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন

বিশ শতকের বিশের দশকে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।[৭৫] অন্যদিকে ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনে প্রত্যক্ষ ভোট রাজনীতির সূচনায় জমিদার ও জোতদার শ্রেণি ব্যতীত পূর্ব বাংলার সচ্ছল মুসলমান কৃষকরা নির্বাচকমন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রধানত মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভোট রাজনীতিতে পাশে পাওয়ার আশায় জমিদারদের শোষণ ও নিপীড়ন হতে কৃষকদের রক্ষায় এবং ভূমির ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেন। সিরাজুল ইসলামের মতে ১৯১৯ সালের আইনের অধীনে নির্বাচনী রাজনীতিতে মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গ্রামাঞ্চলের জনগণের সমর্থন লাভের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন। এ কারণে মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমান কৃষকদের সংগঠিত করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সমিতি গঠন ও পুনর্গঠন করেন।[৭৬] এইসব কৃষক সংগঠন এবং প্রধানত মুসলিম নেতৃবৃন্দ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদের ভিতরে ও বাইরে জমিদারদের শোষণ ও নির্যাতন থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনে সরকারকে অব্যাহতভাবে চাপ দিতে থাকে। এছাড়াও এ সময়ে বাংলায় বিশেষত পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় কৃষক আন্দোলনও জোরদার হয়ে উঠে। উক্ত কারণে ব্রিটিশ সরকারের ভূমি নীতি কৌশলেও পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে ভূমিস্বত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। যাহোক, ১৯২৩ সালে সরকার বর্গাদারদের ভূমিতে অধিকার প্রদান করার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস ও স্বরাজ দলের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।[৭৭] এরপর সরকার ভূমি বিরোধ হ্রাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিল উত্থাপন করেন। পরে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সিলেক্ট কমিটি বর্গাদারদের রায়তি স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করায় বিলটি পুনরায় বিশেষ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বিশেষ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিলটি পুনরায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদে উত্থাপন করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিল আলোচনাকালে বর্গাদার ও অধীনস্থ রায়ত সম্পর্কিত

---

[৭৩] মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন, *পূর্ববঙেগর সমাজ জীবনের কয়েকটি দিক : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৮৫৭-১৯০৫)*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (ঢাকা : ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২), পৃ. ২৩২; মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

[৭৪] বিস্তারিতভাবে দেখুন, মল্লিক, *আধুনিক ভারতের রূপান্তর*, পৃ. ৩২৮-৩৫৫।

[৭৫] বিস্তারিতভাবে দেখুন, সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭* (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃ.১৯৬-২২৮; হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ২২২-২২৩; মোজাম্মেল হক, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ১৮৫৭-১৯৪৭* (ঢাকা : বুক হাউস, ১৯৭৬), পৃ. ৩৪০-৩৫৫।

[৭৬] বিস্তারিতভাবে দেখুন, ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, পৃ. ২১৪।

[৭৭] বিস্তারিতভাবে দেখুন, চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭৮; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৫৫; মল্লিক, *আধুনিক ভারতের রূপান্তর*, পৃ. ৬০৯।

বির্তক শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম বিতর্কে রূপ নেয়। অর্থাৎ বিশ শতকের বিশের দশকে বাংলার ভূমি বিরোধের রাজনীতি সাম্প্রদায়িক রূপ লাভ করে। সুতরাং ভূমি বিরোধ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকেও প্রভাবিত করেছিল। যাহোক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদে মুসলমান সদস্যরা বর্গাদারদের রায়তি স্বত্বের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সংশোধনী প্রস্তাব দিলেও জমিদার প্রভাবিত স্বরাজ ও কংগ্রেস দলের সদস্যরা সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এছাড়াও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদের সদস্য শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক অধীনস্থ রায়তের খাজনা হ্রাস করার জন্য প্রস্তাব করলে স্বরাজ ও কংগ্রেস দলের সদস্যরা এরও বিরোধিতা করেন এবং শেষ পর্যন্ত হকের প্রস্তাবটি ২৭-৩৯ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষকদের স্বার্থ সম্পর্কিত প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে জমিদার প্রভাবিত স্বরাজ ও কংগ্রেস দলীয় সদস্য এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের অবস্থান গ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, এসময় সরকারি ব্লক ও এর সহযোগী সদস্যরা (The Government bloc with allies) নিরব ভূমিকা পালন করেন। আরও উল্লেখ্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিল অনুমোদনকালে মুসলিম ব্লক ও এর সহযোগী সদস্য (The Muhammadan bloc and allies) সংখ্যা ছিল ২১ জন, স্বরাজ ব্লক ও এর সহযোগী সদস্য (The Swarajya bloc and allies) সদস্য সংখ্যা ছিল ৪২ জন এবং সরকারি ও ইউরোপিয়ান ব্লক ও তাদের সহযোগী সদস্য (The official and European bloc with allies) সংখ্যা ছিল ৩৭ জন।[৭৮] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদে এই তিন গ্রুপের বিভক্তির চিত্র থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তখন কোনো বিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের ভূমিকা ছিল নগন্য। বস্তুতপক্ষে, বিশ শতকের বিশের দশকে ভূমি বিরোধের রাজনীতি প্রধানত হিন্দু জমিদার শ্রেণি এবং মুসলমান জোতদার ও সচ্ছল কৃষকদের বিরোধ বা দ্বন্দ্ব গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রম করছিল। এই পর্যায়ের দ্বন্দ্বে হিন্দু জমিদাররা বিজয়ী হয়। উল্লেখ্য, এই পর্যায়ের ভূমি বিরোধের রাজনীতি ছিল মূলত হিন্দু জমিদার এবং মুসলমান জোতদার ও সচ্ছল কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যাহোক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিলটি সংশোধনী প্রস্তাবসহ পাশ হয় এবং আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনে পরিণত হয়।

১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনে ভূমিস্বত্বের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভূমির ওপর কৃষকদের পূর্বের তুলনায় অধিকতর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমত, এর ফলে স্থিতিবান ভোগদখলীয় কৃষকরা তাদের প্রয়োজনে ভূমি বিক্রি বা দান করার এবং নিজেদের জোত বন্দোবস্ত দেওয়ার অধিকার লাভ করে। তবে শর্ত ছিল যে কৃষক তার ভূমিস্বত্ব বিক্রি করলে বিক্রীত মূল্যের ২০% সেলামি হিসেবে ভূমির মালিক তথা জমিদারকে প্রদান করতে হবে এবং অসমর্থ হলে হস্তান্তরের রেজিস্ট্রি রহিত হবে। উল্লেখ্য, এই আইনের পূর্বে সেলামির হার ছিল বিক্রীত মূল্যের ২৫% এবং এই আইনের পর তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২০%।[৭৯] সুগত বোসের মতে কৃষকের ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই সেলামি ছিল জমিদারদের হকশোফা অধিকার।[৮০] এ আইনের বিধান অনুযায়ী কৃষকের প্রত্যাশিত ভূমি মূল্যের ১০% অতিরিক্ত দিয়ে জমিদার নিজেই উক্ত ভূমি ক্রয় করতে পারতেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই ব্যবস্থা প্রধানত জমিদারদের স্বার্থেই করা হয়েছিল।[৮১]

---

[৭৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Chatterjee, *Bengal*, pp. 82-95.

[৭৯] Khan, *District Gazetteers : Rangpur*, pp. 275-276; সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস ১৯০০-১৯৪৭*, বিংশ শতাব্দী (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১১), পৃ. ৫০-৫১।

[৮০] হকশোফা অধিকার (pre-emptive right) হলো জমিদারের এক ধরনের অগ্রাধিকার। হকশোফা অধিকার অনুযায়ী কৃষকের বিক্রিত ভূমি মূল্যের অতিরিক্ত কিছু ফি দিয়ে জমিদার নিজেই উক্ত ভূমি ক্রয় করতে পারতেন।

[৮১] Sugata Bose, *Agrarian Bengal : Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947* (Cambridge : Cambridge University Press, 1986), pp. 150-151; মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫০-৫১।

দ্বিতীয়ত, এই আইনে জমিদারকে শর্ত সাপেক্ষে কৃষকের খাজনা বৃদ্ধির অধিকার প্রদান করা হয়। আইনের বিধান অনুযায়ী যদি জমিদার ভূমি উন্নয়নে অর্থ ব্যয় করতো তবেই তিনি খাজনা বৃদ্ধির প্রশ্ন তুলতে পারতেন। অন্যদিকে ভূমির মূল্যস্তর হ্রাস পেলে তা আদালতের স্বীকৃতি নিয়ে কৃষক খাজনা হ্রাসের দাবি করতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে ভূমির মূল্যস্তর হ্রাসের বিষয়টি প্রমাণ করা কৃষকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ সরকারিভাবে ভূমির মূল্যস্তর অথবা ভূমির উৎপাদিত পণ্যের মূল্যস্তরের কোনো তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং কৃষকের ভূমির খাজনা হ্রাসের অধিকার শুধু কাগজপত্রেই থেকে যায়।[৮২]

তৃতীয়ত, ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনেই সর্বপ্রথম অধীনস্থ কৃষকরা পূর্ণ ভোগদখলীয় অধিকারসহ বেশ কিছু অধিকার পায়। ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন, এমনকি ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনেও অধীনস্থ কৃষকেরা ছিল অবহেলিত। খাজনা আইন ও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে অধীনস্থ কৃষক সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু এই আইনে অধীনস্থ কৃষকদের শ্রেণিবিভাগ করে তাদের সুস্পষ্ট অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টে এই আইনে দেওয়া অধীনস্থ কৃষকদের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়,

> The Act of 1928 considerably strengthened the rights of under-raiyats. It divided them into three classes. Under-raiyats who had already obtained rights of occupancy by custom were given the full rights of occupancy raiyats, except transferability and the right to be deemed protected interests against the superior landlord of the raiyat. The second class consisted of under-raiyats who had a homestead on their land, or had occupied it for 12 years continuously, or had been admitted in a document by their landlords to have a permanent and heritable right. This class could be ejected if they failed to pay their rent, or if they misused the land. The third class of under-raiyats could also be ejected on the additional ground that the raiyat wanted the land for his own cultivation. The initial rent of under-raiyats was left to contract, subject to the provision that it could not exceed one-third of the estimated value of the gross produce. But once their rent had been fixed, it could only be enhanced under a registered contract by 4 annas in the rupee.[83]

তবে ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনে অধীনস্থ কৃষকদের শ্রেণিভিত্তিক কিছু সুবিধা প্রদান করা হলেও তাদেরকে ভূমি হস্তান্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিকার প্রদান করা হয় নি। এছাড়াও বর্গাদার ও কোর্ফা কৃষকসহ অন্যান্য কৃষকের অধিকারও এই আইনে স্বীকৃতি পায়নি। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে এই আইনে যে সংশোধনী করা হয়েছিল তাতে কৃষকের সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হয়েছিল বেশি।[৮৪] পূর্ণাঙ্গার্থে মুখোপাধ্যায়ের অভিমতটি প্রাসঙ্গিক নয়। যদিও জমিদার প্রভাবিত স্বরাজ ও কংগ্রেস দলের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদের সদস্যদের বিরোধিতার কারণে কৃষকদের খুব বেশি সুবিধা পাওয়ার সুযোগ ছিল না। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে এই আইনে পূর্বের তুলনায় ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের আংশিকভাবে হলেও সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে প্রথমবারের মতো কোনো ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়নকালে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষকরা প্রধানত মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমর্থন পেয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ভূমিস্বত্বের ওপর তাদের অধিকার বৃদ্ধিতে তাদের এই সমর্থন অব্যাহত ছিল। সুতরাং সার্বিকভাবে বলা যায় যে বিশ শতকের বিশের দশকে প্রধানত ভোট রাজনীতির কারণে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের কিছু সুবিধা বৃদ্ধি এবং মুসলিম

[৮২] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫০-৫১।
[৮৩] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. I, pp. 29-30.
[৮৪] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫০-৫১।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভ ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। তবে তখনও পর্যন্ত সরকারের জমিদার সমর্থন নীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

২.৬ ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন ও ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন

বিশ শতকের ত্রিশের দশকের সরকারের নীতি কৌশলের পরিবর্তন ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। এ সময়ের সরকারি নীতি কৌশলের পরিবর্তনের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক নীতিতেও পরিবর্তন ঘটে। এর ফলস্বরূপ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়। এই আইনের অধীনে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইনসভার নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি রাজনৈতিক দল হিসেবে ৩৬টি আসন পেয়ে তৃতীয় অবস্থান লাভ করে।[৮৫] নির্বাচনের পর ঐ বছরের এপ্রিল মাসে কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক গভর্নরের আমন্ত্রণে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। উল্লেখ্য, হক প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অনীহার কারণে তা সফল হয়নি।[৮৬] পরে হক মুসলিম লীগ, তফশিলি হিন্দু এবং অ-কংগ্রেসী বর্ণ হিন্দুদের সমন্বয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন।[৮৭]

উল্লেখ্য, ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নকালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জমিদার প্রভাবিত স্বরাজ ও কংগ্রেসের হিন্দু সদস্যদের কারণে মুসলমান নেতৃবৃন্দ মুসলমান কৃষকদের পর্যাপ্ত সুবিধা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু বিশ শতকের ত্রিশের দশকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশেষ করে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদ ঘোষণা এবং পরে তা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কার্যকর করার কারণে মুসলমানরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। উপরন্তু, ভোটার হওয়ার শর্ত শিথিল করায় অধিক সংখ্যক মুসলমান কৃষকরা ভোটার হওয়ার সুযোগ লাভের পর থেকে মুসলমানরা রাজনীতিতে তাদের অবস্থান আরও বেশি শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি নির্বাচনী ইশতেহারে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদসহ কৃষকদের কল্যাণার্থে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। নির্বাচনের পর কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নবগঠিত ফজলুল হকের সরকার কৃষকদের কল্যাণার্থে বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করে। এর ফলে ভূমিস্বত্বের ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমূল পরিবর্তন ঘটে।[৮৮] হকের সরকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিল উত্থাপন করে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিল পাশের সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে সরকারি ব্লকের সদস্য (The Government bloc with allies) সংখ্যা ছিল ৮৫ জন এবং সরকার বিরোধী ব্লকের সদস্য (The Anti-Government bloc with allies) সংখ্যা ছিল ৩৩ জন। সরকার বিরোধী ব্লক ও সহযোগীরা ছিলেন কংগ্রেস দলীয় পরিষদ সদস্য, যারা ছিলেন প্রধানত হিন্দু জমিদার-জোতদার ও ব্যবসায়ী। সরকারি ব্লক ও সহযোগীরা ছিলেন কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের সদস্য। এই দু'টি দলের সদস্যদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছিলেন মুসলমান জমিদার (মুসলিম লীগের মনোনীত সদস্যদের বেশির ভাগ সদস্য ছিলেন জমিদার, তবে তাঁদের

---

[৮৫] Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh*, p. 74; Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal, 1937-1947* (New Delhi : Impex India, 1976), p. 88.

[৮৬] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Farzana Shaikh, "Muslims and Political Representation in Colonial India : The Making of Pakistan", Mushirul Hasan (ed.), *India's Partition : Process, Strategy and Mobilization* (Delhi : Oxford University Press, Second Impression 1996), p. 90; Chatterji, *Bengal divided*, P. 92-93; সুনীতি কুমার ঘোষ, *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১২), পৃ. ১৯৯; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১১০-১১১।

[৮৭] বিস্তারিতভাবে দেখুন, হক, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, পৃ. ৫৪১; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১১০-১১১।

[৮৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Assembly Proceedings*, Official Report, Bengal Legislative Assembly, Vol. LVI, No. 4, Seventh Session, 1940, The 13th, 14th, 15th, 18th, 19th, and 20th March, 1940 (Alipore : Bengal Government Press, 1940), pp. 199-201.

সংখ্যা খুব বেশি ছিল না) এবং বেশির ভাগ সদস্য ছিলেন মুসলমান জোতদার (কৃষক প্রজা পার্টির মনোনীত সদস্যদের বেশির ভাগ ছিলেন জোতদার)। সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কারণে মুসলমান কৃষকদের স্বার্থের পক্ষে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিল পাশ করা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়েছিল।[৮৯] এই বিল পাশের মধ্য দিয়ে হিন্দু জমিদার, জোতদার ও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছিল এবং মুসলমান জোতদারদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যাহোক, বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আইনগত দিক সম্পন্ন শেষে বিলটি ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনে পরিণত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন ছিল ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনেরই সংশোধিত বিধি-বিধান। ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনে ইতোপূর্বে প্রণীত ভূমি আইনের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয় যা কৃষকের অনুকূলে যায়। এর ফলে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ দিনের যৌক্তিক দাবি অনেকাংশে পূরণ হয়েছিল। এক কথায় বাস্তবে না হলেও আইনের বিধান মতে স্বত্বাধিকারী কৃষক অনেকটা তার আপন ভাগ্য নিয়ন্তায় পরিণত হয়েছিল।

১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনের গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই আইনের বিধানে বলা হয় : (১) আদালতের নির্দেশ ভিন্ন কৃষককে উচ্ছেদ করা যাবে না। অর্থাৎ আদালতের নির্দেশ ভিন্ন জমিদার কৃষককে উচ্ছেদ করার অধিকার হারায়।[৯০] এ সম্পর্কে আইনের বিধানে বলা হয়, “They could not be ejected from their lands except through court proceedings.”[91] সুতরাং এখানে জমিদারদের কৃষক উচ্ছেদের ক্ষমতা আরও কঠোরভাবে সীমিত করা হয়েছিল। জমিদার যেন আপন স্বার্থে কৃষক উচ্ছেদ করতে না পারে এই আইনে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৯২] (২) জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির যাবতীয় অধিকার স্থগিত রাখা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালের ২৭ আগস্ট সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারি করে জমির আয়তন বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনো কারণে খাজনা বৃদ্ধি ১০ বছরের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রদান করেছিল।[৯৩] ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনে বলা হয়, “The enhancement of rent even within permissible limits was suspended for ten years in 1938.”[94] অর্থাৎ অনুমোদিত সীমার মধ্যেও খাজনা বৃদ্ধি দশ বছর স্থগিত রাখা হয়েছিল। এর বিধান অনুযায়ী জমিদার তার ইচ্ছেমতো কৃষকের খাজনা বৃদ্ধি করতে পারবেনা।[৯৫] এই আইনে বকেয়া খাজনার ডিগ্রি বলবৎ করে অস্থাবর সম্পত্তি দখল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আইনের বিধানে কেবলমাত্র অনাদায়ী বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য সম-পরিমাণ ভূমি বিক্রির উল্লেখ করা হয়েছিল।[৯৬] সার্টিফিকেট জারি করে জমিদারদের খাজনা আদায়ের অধিকারও বাতিল করা হয়েছিল। তবে সরকারি খাসমহল ও কোর্ট অব ওয়ার্ডস এস্টেটের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট প্রথা বজায় ছিল। এর বিধানে সিভিল কোর্টে দ্রুত খাজনা মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাকেয়া খাজনার দায়ে কৃষকের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা ও কৃষককে গ্রেফতার করে কারাদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থাও বাতিল করা হয়েছিল। বাকেয়া খাজনার সুদের হার হ্রাস করে ১২.৫০ শতাংশ থেকে ৬.৭৫ শতাংশ করা হয়েছিল। (৩) এই আইনে কৃষকের জমি বিক্রির জন্য জমিদারকে

---

[৮৯] দেখুন, Chatterjee, *Bengal*, pp. 172-182.

[৯০] A. B. M. Azizul Islam, “Land Reform in Bangladesh-A Skeptical View”, Muhiuddin Khan Alamgir (ed.), *Land Reform in Bangladesh* (Dacca : Centre For Social Studies-CSS,1981), p. 126; চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম*, পৃ. ৫৪।

[৯১] K. G. M. Latiful Bari (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Khulna,* Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People’s Republic of Bangladesh (Dacca : Bangladesh Government Press, 1978), p. 316.

[৯২] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫২।

[৯৩] *Report of the Land Revenue Commission,* Vol. I, p. 29.

[৯৪] Khan, *Bangladesh District Gazetteers : Noakhali*, p. 263-264.

[৯৫] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫২।

[৯৬] চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম*, পৃ. ৫৪।

দেওয়া সেলামি ফি তুলে দেওয়া হয় এবং হকশোফা অধিকার জমিদারের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কৃষকের শরিককে প্রদান করা হয়।[৯৭] এর বিধানে উল্লেখ করা হয়, "The 1938 amendment of the Tenancy Act abolished the landlord's fee and gave the right of pre-emption to co-sharer tenants instead of the landlord."[98] এখানে বাস্তুভিটাকে সংরক্ষিত স্বত্ব (Protected interest) ঘোষণা করা হয়েছিল এবং হস্তান্তরের ক্ষেত্রে জমিদারের মাশুল রদ করা হয়েছিল। এছাড়াও এই আইনে জমিদারের অগ্রক্রয়াধিকারকে কৃষকের নিকট হস্তান্তর করে উপস্বত্ব সৃষ্টি কিংবা যুক্ত মালিকানা পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে জমিদারের সম্মতি নিষ্প্রয়োজনীয় ঘোষণা করা হয়েছিল। (৪) খাইখালাসি বন্ধকি সম্বন্ধে চুক্তি যাই হোক না কেন ১৫ বছর পরে কৃষকের দেনা শোধ ও বন্ধকের মেয়াদ শেষ হবেও বলে ঘোষণা করা হয়।[৯৯] (৫) দখলিস্বত্ববান কৃষকেরা[১০০] জমি বিক্রি, উপহার, দান, বিনিময় বা ভাড়া হিসেবে হস্তান্তরের অধিকার লাভ করে। অর্থাৎ এই আইনে দখলিস্বত্ববান কৃষক তার ভূমিস্বত্ব প্রয়োজনমতো ব্যবহার করারও সুযোগ পেয়েছিল।[১০১] উল্লেখ্য, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন কয়েকবার সংশোধন করে দখলিস্বত্ববান কৃষকের অধিকার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল। উক্ত আইনে দখলিস্বত্ববান কৃষকদের যে সীমিত পরিমাণে অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা পরবর্তীকালে সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইনে অনেক প্রসারিত হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের আইনে দখলিস্বত্ববান কৃষকের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়, "The Tenancy Act of 1885 was amended in 1928 and 1938. As a result of the amendments, the tenants, as a whole, enjoyed greater rights and privileges and the occupancy raiyats virtually became masters of their own destiny. They could then use their lands in any manner they chose."[102] (৬) আবওয়াব আদায় করাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়।[১০৩] এই আইনের বিধানে আবওয়াব ধার্য ও আদায় সম্পর্কে বলা হয়, "The realisation of all illegal imposition, known as abwabs, was made punishable."[104]

কৃষক প্রজা পার্টির মন্ত্রিসভা যেভাবে ১৯৩৮ সালে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন করেছিল তাতে নিঃসন্দেহে বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কৃষকেরা অনেক সুবিধা পেয়েছিল। যদিও ভাগচাষি ও উঠবন্দি কৃষক বা ক্ষেতমজুরদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা এই আইনে ছিল না, তবুও বলা যায় যে জমিদারদের অধিকার খর্ব করে কৃষককে রক্ষা করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এই আইনে। তারপরও আইন সভার সদস্য, রাজনৈতিক দল, আইন সভার ইউরোপীয় সদস্যগণ এই আইনের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল যে একদিকে এই আইনে জমির প্রকৃত মালিক কৃষকদের অধিকার স্বীকার করা হয়নি এবং অন্যদিকে তাদের ওপর করের বোঝাও হ্রাস পায়নি। ফলে এর দ্বারা কৃষকদের কোনো লাভ হয়নি। তবে এর দ্বারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল জোতদাররা। তবে এটাও সত্যি যে উক্ত আইন প্রয়োগে

---

[৯৭] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫২।

[৯৮] Bose, *Agrarian Bengal*, pp. 151-152.

[৯৯] চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম*, পৃ. ৫৪।

[১০০] The different varities of these tenures are as follows : (i) patni taluk, (2) Dar-patni taluk, (3) Sikimi taluk, (4) Istimrari or Mukarrari, (5) Maurusi, (6) Nagani Jama taluk, (7) Ijahari taluk, (8) Dikhli taluk, (9) Mistakh, (10) Mirash, (11) Maurusi ijara, (12) Ijara, (13) Daisudhi ijara, (14) Dar-ijara, (15) Katkabala, (16) chak, (17) Jot, (18) Nij-jot or khamar. Seen, Nurul Islam Khan (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Mymensingh*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dacca: Bangladesh Government Press, 1978), pp. 287-290.

[১০১] Islam, "*Land Reform in Bangladesh-A Skeptical View*", p. 126; Khan, *District Gazetteers : Noakhali*, p. 263-264; মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫২।

[১০২] Bari, *District Gazetteers : Khulna*, p. 316.

[১০৩] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫২।

[১০৪] Khan, *District Gazetteers : Noakhali*, p. 263-264.

মধ্যস্বত্বভোগী জমিদাররা সেলামি পাওয়ার অধিকার হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অর্থাৎ এর দ্বারা জমিদারের আয় যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এটি কার্যকরের ফলে জমিদাররা কৃষি অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। জমিদারদের সংগঠন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মতে সামগ্রিকভাবে ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনে জমিদারদের অধিকার খর্ব করা হয়েছিল। জমি যে এখন থেকে আর স্থায়ী সম্পত্তি নয় সে বিষয়ে জমিদারদের আর সন্দেহ ছিল না।[১০৫] এরপরও বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য মকবুল হোসেন (কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য) অভিযোগ করেন যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল তিন বার সংশোধিত হলেও কৃষকের বিশেষ কোনো উপকার হয়নি। তাঁর মতে এই বিলের যে সংশোধন হয়েছিল তা কৃষক প্রজা পার্টির প্রচণ্ড চাপেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি বলেন যে এই বিলে শুরুতে খাজনার দ্বিগুণ নজর সেলামি রাখার বিধান রাখা হয়েছিল। কিন্তু কৃষক প্রজা পার্টির সদস্যদের চাপে পরবর্তী সময়ে নজর সেলামি এবং অগ্র-ক্রয়ের প্রথা বাতিল করা হয়। এ কারণে বাংলার কৃষক নজর সেলামি এবং অগ্র-ক্রয় প্রথা হতে অব্যাহতি পায়। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন যে তাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষকের খাজনা হ্রাস করা সম্ভব হয়নি।[১০৬] অবশ্য সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নের পর জমিদারদের প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার অনেকাংশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর ফলে ভূমি বিরোধও বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। এই আইনের পর কৃষকদের লক্ষ্য ছিল ভূমিস্বত্বের ওপর তাদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্যে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও অংশগ্রহণ করেছিল।

২.৭ ১৯৩৮ সালে গঠিত ভূমি রাজস্ব কমিশনের ভূমিস্বত্বের আমূল পরিবর্তনমূলক সুপারিশ

ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকরা অধিকারহীন হয়ে শোষণ ও নিপীড়নের কারণে যে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের সূচনা হয় তা হ্রাস করার জন্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে সরকার বেশ কয়েকবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এসব উদ্যোগের পরও ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উপরন্তু, কৃষকদের মৌলিক দাবি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি সাধন।

বস্তুতপক্ষে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির কোনো সুযোগ না থাকায় ভূমি ও কৃষি উন্নয়নে ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে জমিদাররাও ভূমি ও কৃষি উন্নয়নে কোনো নজর দেয়নি। আবার জমিদারদের অধিকৃত ভূমিতে কৃষকদের নিরবচ্ছিন্নভাবে চাষ করার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। ফলে কৃষকদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে চরম অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। বিশ শতকের বিশের দশকে এই অবস্থায় কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ায় প্রধানত মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। ভোট রাজনীতির সূচনায় সচ্ছল কৃষকরা নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুবাধে সামগ্রিকভাবে কৃষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ক্রমেই রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই প্রেক্ষাপটে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে জোতদার প্রভাবিত ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে দলের নির্বাচনী ইশতেহারে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কর্মসূচি ঘোষণা করে। নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির ইশতেহারের প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল যে তারা বিজয়ী হলে কৃষকদের মূল দাবি তথা চিরস্থায়ী

---

[১০৫] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫২।

[১০৬] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Assembly Proceedings*, Vol. LVI, No. 4, 1940, pp. 199-201.

বন্দোবস্ত বা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হবে। নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনে সমর্থ হয়। উল্লেখ্য, কৃষকরা ভোটারদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় নির্বাচনে তারাই ছিল নির্বাচনী বিজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি।[১০৭] স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের ভিতরে ও বাইরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ নিয়ে কৃষক প্রজা পার্টি প্রচণ্ড চাপে থাকে। এমনকি, কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কারণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে দায়বদ্ধতাও অনুভব করে। এ কারণে ফজলুল হকের সরকার বাংলার জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালের ৫ নভেম্বর এক আদেশে (Government Resolution No. 22716-L.R. of the 5th November 1938) স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে প্রধান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ভূমি রাজস্ব কমিশন গঠন করে। এই কমিশন ঐতিহাসিক ভূমি রাজস্ব কমিশন বা ফ্লাউড কমিশন হিসেবে পরিচিত।[১০৮] ভূমি রাজস্ব কমিশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ সালের ১৯ নভেম্বর।[১০৯] ভূমি রাজস্ব কমিশনের সদস্যগণ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ২৪ পরগণা, বাকেরগঞ্জসহ বাংলার বিভিন্ন জেলার ভূমি বন্দোবস্ত ও ভূমি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরিদর্শন করেন। কমিশন সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী, জমিদার, কৃষক, আইনজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রশ্নপত্র প্রেরণ করেও তাদের মতামত গ্রহণ করেন। এছাড়াও সামগ্রিক পর্যালোচনার জন্য কমিশন পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশ সফর করেন। ভূমি ব্যবস্থার ওপর দুই বছর ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার পর ১৯৪০ সালের ২১ মার্চ সরকারের নিকট সুপারিশসহ কমিশন তার রিপোর্ট প্রদান করেন।[১১০]

উল্লেখ্য, ভূমি রাজস্ব কমিশন বিভিন্ন জমিদার সমিতি, কৃষক সমিতি, আইনজীবী সমিতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ অন্যান্য সমিতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ করে ভূমি সংশ্লিষ্ট পক্ষের বা ভূমির অংশীজনের মতামতও গ্রহণ করে। সব মিলে ভূমি রাজস্ব কমিশন প্রেরিত প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর প্রদানকারী সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা এবং প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর না দেওয়া সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকার মোট সংখ্যা ছিল ১৬১ (সারণি ২)।[১১১] সারণি ২ থেকে দেখা যায় যে ভূম্যধিকারী সমিতি, কৃষক সমিতি, আঞ্জুমান সমিতি, রাজনৈতিক দল, সরকারি ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করা হলেও তাদের অনেকেই সে প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর ফেরত পাঠায়নি। মতামত গ্রহণকারী এসব সমিতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভা, ঢাকা জেলা মুসলিম ফেডারেশন, রাজশাহী মুসলমান এসোসিয়েশন, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, পাবনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, খুলনা, নদীয়া, মালদাসহ ১৬টি বার এসোসিয়েশন, ময়মনসিংহ, নদীয়া ও হুগলী আঞ্জুমান এসোসিয়েশন, বাকেরগঞ্জ কৃষক প্রজা পার্টিসহ অনেকগুলো সমিতি, রাজনৈতিক দল এবং

---

[১০৭] ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, পৃ. ১৭৯।

[১০৮] ভূমি রাজস্ব কমিশনের প্রধান ছিলেন Sir Francis Floud, K.C.M.G; কমিশনের সদস্য ছিলেন Sir Bijay Chand Mahtab, G.C.I.E., K.C.S.I., I.O.M., Maharajadhiraja Bahadur of Burdwan; Khan Bahadur Maulvi Hashem Ali Khan, M.L.A; Mr. S. M. Masih, Barrister-at-Law; Khan Bahadur M. A. Momin, C.I.E; Sir Manmatha Nath Mookerjee, Kt; Dr. Radha Kumud Mookerjee, M.A., P.R.S., Ph.D., M.L.C; Mr. Brajendra Kishore Roy Choudhury; Sir F. A. Sachse Kt., C.S.I., C.I.E; এবং Mr. M. O. Carter, M.C., I.C.S., Member-Secretary. ১১ সদস্য বিশিষ্ট ভূমি রাজস্ব কমিশনের মধ্যে এস. এম. মাসিহ কমিশনে যোগদান করেননি এবং কমিশনের সদস্য স্যার মন্মথ নাথ মুখার্জী ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে পদত্যাগ করেন। অতঃপর ১৯৩৯ সালের ১৭ নভেম্বর ভূমি রাজস্ব কমিশনে ৩ জন অতিরিক্ত সদস্য নিযুক্ত হন। তাঁরা হলেন Mr. Abdul Quasem, M.A., B.L.; Mr. Nuruddin Ahmed, B.L. এবং Mr. Anukul Chandra Das, M.L.A. অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের ১৭ নভেম্বর হতে ভূমি রাজস্ব কমিশনের চেয়ারম্যানসহ মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ জন। দেখুন, *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. I, p. 2; সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, উনবিংশ শতাব্দী (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০), পৃ. ২৭।

[১০৯] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. I, pp. i and 1-2.

[১১০] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. I, p. 2; মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, উনবিংশ শতাব্দী, পৃ. ২৭।

[১১১] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. II, pp. 14-18.

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভার সদস্য বঙ্কিম মুখার্জী, রেবাতি বর্মন, এম. এ. রসুল ও ভবানী সেনসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্তি তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে মতামত প্রদান করেছিলেন।[১১২] অন্যদিকে বঙ্গীয় ভূম্যধিকারী সমিতিসহ বিভিন্ন জমিদার সমিতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা, ময়মনসিংহ মিডল ক্লাস পিপল্‌স অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা পিপলস অ্যাসোসিয়েশন, খুলনা পিপলস অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্যার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রায়বাহাদুর জে. এন. গুপ্ত, রায়বাহাদুর কে. পি. মৈত্র, রায়বাহাদুর জে. এন. সরকার প্রমুখ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্তি তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের বিপক্ষে মতামত প্রদান করেন।[১১৩] মূলত জমিদারি প্রথা সমর্থনকারী এসব সংগঠন ও ব্যক্তি ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বার্থভোগী। এ কারণে তারা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষের এসব সংগঠন ও ব্যক্তি আশঙ্কা করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান হলে আধুনিক বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়বে। ১৯৩১ সালের আদমশুমারির উল্লেখপূর্বক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকরা একথাও বলেন যে জমিদারি প্রথার অবসান হলে ছোট বড় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ জমির মালিক ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যা ছিল সমগ্র জনসংখ্যার ৩০% (মোট জনসংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি)। তাঁদের মতে এই অবস্থা বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বুনিয়াদকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবে। সুতরাং সমগ্র প্রদেশের পক্ষেই এই অবস্থা ভীষণ ক্ষতিকারক হবে।[১১৪] ১৯৪০ সালে রাজস্ব কমিশনের অন্যতম সদস্য ও বর্ধমানের মহারাজা স্যার বিজয় চাঁদ মাহতাব এবং বিশিষ্ট জমিদার নেতা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কমিশনের নিকট প্রেরিত এক বিশেষ পত্রে অভিমত দেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার উচ্ছেদ হলে এই প্রদেশের মেরুদণ্ড এবং আধুনিক বাংলার স্রষ্টা তথা সমকালীন সমাজে বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিগণিত মধ্যস্বত্বভোগী অবলুপ্ত হবে। এর ফলে দেশকে এক বিশৃঙ্খলা অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।[১১৫] তাঁরা কমিশনের নিকট প্রেরিত তাঁদের পত্রের নোটে মন্তব্য করেন,

> To make extinct the great landholders in the Province may not be difficult, although they might deserve greater consideration as they and their ancestors contributed in no small measure in the past to the establishment of many of the charitable and educational institutions to be found in the Province to-day. But with the disappearance of all intermediary landlords, who have formed the backbone of the Province, and the intelligentsia and are the creators of modern social and political Bengal, we shall be running the definite risk of a social upheaval of magnitude which requires very careful thought, for with an undeveloped Proja Party and Raiyats' Associations we might easily usher in communism which would become a menace to the State itself. The Province is not ready for such a revolutionary step and that is why we consider the proposal of State-purchase as unsound in practice, premature, and inopportune.[116]

---

[১১২] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Report of the Land Revenue Commission*, Bengal, Vol. V, Replies to the Commission's questionnaire by Government Officers and their oral evidence, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1941), pp. 587; *Report of the Land Revenue Commission*, Bengal, Vol. VI, Replies to the Commission's questionnaire by the Associations concerned with tenants, Bar Associations, etc., and their oral evidence, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1941), pp. 3-590.

[১১৩] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Report of the Land Revenue Commission, Bengal*, Vol. III, Landholders' replies to the questionnaire issued by the Land Revenue Commission, and their oral evidence, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1940), pp. 1-546; *Report of the Land Revenue Commission, Bengal*, Vol. IV, Landholders' replies to the questionnaire issued by the Land Revenue Commission, and their oral evidence, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1940), pp. 1-512; *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. V, pp. 587.

[১১৪] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. I, pp. 227, 231, 319, 337-341; চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৫৫৮।

[১১৫] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. I, p. 233; চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৫৫৯।

[১১৬] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. I, p. 233.

যাহোক, ভূমি রাজস্ব কমিশন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ভূমি সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরীকৃত রিপোর্টে উল্লেখ করে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা জাতীয় স্বার্থে ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, "The majority members of the Commission recommended that the Permanent Settlement was no longer suitable to the condition of the present time and the zamindari system had ceased to serve any national interest."[117] ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বাংলায় মোট জমিদারি বা এস্টেটের সংখ্যা ছিল ১,৫৩,২০০টি; এর মধ্যে ১,০২,০৩১টি জমিদারি বা এস্টেট সরকারকে রাজস্ব দিত, বাকি ৫১,১৬৯টি জমিদারি বা এস্টেট ছিল নিষ্কর। এই জমিদারির সবকটির মালিকানা আবার বেসরকারি হাতে ছিল না। এর মধ্যে বেশ কয়েকটির মালিকানা ছিল সরকারের। সরকারি মালিকানাধীন জমিদারি বা এস্টেটসমূহ 'খাসমহল' হিসেবে পরিচিত ছিল। বেশির ভাগ খাসমহলের অবস্থান ছিল চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে, যশোর, খুলনা, সুন্দরবন অঞ্চল, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মেদেনীপুর, ২৪ পরগণার উপকূলবর্তী অঞ্চলে।[১১৮] কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে বাংলায় তদানীন্তন ভূমি ব্যবস্থাপনায় ও কৃষি অর্থনীতিতে শক্তিশালী সামাজিক শক্তি ছিল মধ্যস্বত্বভোগীর দল। জমিদারগণ অনার্জিত আয়ের উদ্দেশ্যে জমিদারি খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে পত্তনি দেওয়ার ফলে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়েছে। ভূমি রাজস্ব কমিশনের মতে বাংলার যে সমস্ত অঞ্চলে সরকারকে প্রদানকৃত রাজস্ব এবং জমিদারের পাওনা খাজনার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল কেবল সে সমস্ত অঞ্চলেই অধিক সংখ্যক মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি হয়েছে। কমিশনের মতে মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাবের কারণে কর্নওয়ালিশের পরিকল্পিত কল্যাণধর্মী জমিদারি ব্যবস্থা বাংলায় চালু করা সম্ভব হয়নি। জমিদার ও কৃষকের মাঝে মধ্যস্বত্বভোগীর দল ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। জমিদাররা ভূমির উন্নতিতে আগ্রহ হারিয়ে পরগাছায় পরিণত হয়েছে। মধ্যস্বত্বভোগীরাও বাংলার কৃষি উন্নতিতে মনোযোগ দেয়নি। এদের বেশির ভাগ ছিল শহরবাসী বা পেশাদার মানুষ। কৃষি উন্নতিতে বিনিয়োগ করার মতো এদের উৎসাহও ছিল না, পুঁজিও ছিল না।[১১৯] প্রদেশে জমিদারি প্রথার প্রভাব সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়,

> The evil effect of the system was felt in all spheres of administration and the economy of the province. There was no increase in the income of the Government from the revenue receipts, as the amount of revenue payable by the zamindars was permanently fixed, although the zamindars and other intermediaries realized rent from the raiyats several times more than what they paid to the Government.[120]

১৯৩৮ সালের ভূমি রাজস্ব কমিশনের সুপারিশসমূহ ছিল ঐতিহাসিক, বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী। ভূমি রাজস্ব কমিশনের সুপারিশসমূহ ছিল নিম্নরূপ : (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বিলুপ্তি তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করতে হবে এবং সকল পর্যায়ের খাজনা-আদায়কারীর স্বত্ব বিলোপ করতে হবে।[১২১] কমিশনের সুপারিশে বলা হয়, "It is recommended that the government should legislate to acquire interests of all rent receivers, down to the actual cultivator."[122] সরকার সমস্ত জমিদারি ও সকল প্রকার মধ্যস্বত্ব প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করে জমিদারি ও

---

[১১৭] Ashraf Siddiqui (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Kushtia*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dacca : Bangladesh Government Press, 1976), p. 199-200.

[১১৮] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, উনবিংশ শতাব্দী, পৃ. ২৭।

[১১৯] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ২৭।

[১২০] Siddiqui, *District Gazetteers : Kushtia*, pp. 199-200.

[১২১] Ashraf Siddiqui (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Dinajpur*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dacca : Bangladesh Government Press, 1972), p. 257; ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৩-৬৪; মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫৩।

[১২২] Mrs. Z. N. Ahmed, "Land Tenure Problems and Reform", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950), p. 6.

মধ্যস্বত্ব ক্রয় করে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে এবং কৃষককে সরাসরি সরকারের অধীনে নিয়ে আসতে হবে।[১২৩] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি দূর করে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য কমিশনের সুপারিশে উল্লেখ করা হয়,

> Whatever may have been the justification for the Permanent Settlement in 1793, it is no longer suitable to the conditions of the present time; and that the zamindari system has developed so many defeats that it has ceased to serve any national interest. The present system should be replaced by one which will bring the actual cultivators into the position of tenants holding directly under Government by acquiring the interests of all classes of rent receivers.[124]

(২) কমিশনের সুপারিশে জমিদারি ও মধ্যস্বত্বসমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে অধিগ্রহণ করে জমিদার ও খাজনাভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। কমিশনের সুপারিশে বলা হয় যে ক্ষতিপূরণের হার হবে বর্তমান খাজনার দশগুণ।[১২৫] এখানে বলা হয়, "The zamindars should be compensated at the rate of 10 times the annual net profit on the land holding."[126] কমিশনের সুপারিশে এও যুক্ত করা হয় যে দেবোত্তর ও ওয়াকফ সম্পত্তির বেলায় ক্ষতিপূরণের হার হবে পঁচিশগুণ। বকেয়া খাজনার অর্ধেক খাজনাভোগীদের ক্ষতিপূরণের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়। (৩) সকল শ্রেণির জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী এবং বর্গাদারী স্বত্বের বিলি করে জমির কৃষক মালিককে খাজনাভোগী হিসেবে গণ্য করতে হবে। (৪) সমস্ত বর্গাদারকে সরাসরি সরকারের কৃষক বলে গণ্য করতে হবে। তবে বর্গাদাররা দখলিস্বত্ববান কৃষকের সমস্ত অধিকার পাবে না। বর্গাদারদের জমির উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খাজনা ধার্য করতে হবে। (৫) ভবিষ্যতে জমি যেন অকৃষকের হাতে না যায় সেদিকে সরকারকে লক্ষ রাখতে হবে। (৬) দু'টি কারণে সরকার কৃষকের খাজনা হ্রাস করবেন-যদি (ক) বর্তমান খাজনা প্রচলিত খাজনা হারের চেয়ে বেশি হয় এবং (খ) জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস পায়। এই দু'টি ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তারা খাজনা হ্রাসের অধিকার পাবেন। (৭) সরকার জমিদারদের খাস মহালগুলো অধিগ্রহণ করবেন। (৮) রাজস্ব আদালতে খাজনা মামলার নিষ্পত্তি হবে। (৯) ফসল জামিন রেখে কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলো কৃষককে কৃষিঋণ দেবে এবং এজন্য জমি বন্ধক রাখার প্রয়োজন নেই। (১০) রাজস্ব আদালতে খাজনা মামলার নিষ্পত্তি হবে।[১২৭] (১১) জমিদাররা তাদের খাস জমি চাষের ক্ষেত্রে শ্রমিক ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। কমিশনের সুপারিশে বলা হয়, "In the opinion of the Commission, the homesteads and khas land cultivated by the zamindars with aid of labourers should be allowed to remain in the possession of the zamindars."[128] এবং (১৩) ভূমি ও রাজস্ব সম্পর্কিত আইনগুলো নথিবদ্ধ করতে হবে ও প্রতি ত্রিশ বছর অন্তর ভূমি ও রাজস্বের নতুন মূল্যায়ন ও বন্দোবস্ত করতে হবে।[১২৯]

সুতরাং ১৯৩৮ সালে গঠিত ভূমি রাজস্ব কমিশনের প্রধান সুপারিশ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বাতিল তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে প্রকৃত কৃষকদের হাতে জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। ১৯৪৪ সালে গঠিত প্রশাসনিক তদন্ত কমিটির সুপারিশেও ভূমি রাজস্ব কমিশনের প্রধান সুপারিশকে জোরালোভাবে সমর্থন করা হয়। কিন্তু ভূমি রাজস্ব কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার প্রাদেশিক সরকার খুব বেশি দূর

---

[১২৩] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৩-৬৪; মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫৩।
[১২৪] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. I, p. 174.
[১২৫] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৩-৬৪; মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, উনবিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫৩।
[১২৬] Ahmed, *"Land Tenure Problems and Reform"*, p. 6.
[১২৭] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৩-৬৪; মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, উনবিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫৩।
[১২৮] Ahmed, *"Land Tenure Problems and Reform"*, p. 6.
[১২৯] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৩-৬৪; মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, উনবিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫৩।

অগ্রসর হতে পারেনি। মূলত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা, ভারত ভাগের সৃষ্ট রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি প্রভৃতিই ছিল ভূমি রাজস্ব কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রধান অন্তরায়।[১৩০] উক্ত কারণে কমিশনের সুপারিশ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।[১৩১]

২.৮ ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন ও ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের সর্বশেষ এবং ফজলুল হক সরকারের প্রণীত সর্বশেষ ভূমিস্বত্বের পরিবর্তনকারী আইন ছিল ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন। ইতোপূর্বে প্রণীত ভূমি আইন অনুযায়ী জমিদারের অনুমোদন ব্যতীত নতুন ঘরবাড়ি নির্মাণ, পুকুর খনন, বৃক্ষ কর্তন প্রভৃতি ছিল কৃষকের জন্য নিষিদ্ধ। জমিদারিতে অবস্থিত উক্ত বিষয়ের ওপর একমাত্র অধিকার ছিল জমিদারের। সেলামি প্রদান সাপেক্ষে জমিদার কৃষককে এসব কাজের জন্য অনুমতি প্রদান করতেন। কিন্তু এই আইনে কৃষককে বিনা সেলামিতে নতুন ঘরবাড়ি নির্মাণ, পুকুর খনন, বৃক্ষ কর্তন প্রভৃতি কাজে ভূমি ব্যবহার এবং ভূমি হস্তান্তর করার অধিকার প্রদান করা হয়।[১৩২] তবে এই আইনের মাধ্যমে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের উক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব সত্যিকারার্থে হ্রাস পায়নি বরং ভূমিস্বত্বের ওপর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংগ্রামের জন্য কৃষকরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

২.৯ উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে সরকারের নীতি কৌশলে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমিস্বত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। এর ফলস্বরূপ ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-কৃষক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল। ১৮১৯ সালে পত্তনি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ ত্রিপক্ষীয় অর্থাৎ জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত প্রণীত আইনসমূহের কারণে উদ্ভূত কৃষক বিদ্রোহসহ যে কৃষি অসন্তোষ দেখা দেয় তা নিশ্চিতভাবে ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষায় ছিল হুমকিস্বরূপ। এ কারণে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভূমি বিরোধ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সরকারের নীতি কৌশলে পরিবর্তন সূচিত হয়। এর ফলে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয়। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষকদেরকে স্বত্বাধিকারী, স্থায়ী ও অধীনস্থ-এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় এবং প্রথম দু' শ্রেণির কৃষকের (স্বত্বাধিকারী ও স্থায়ী) ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরবর্তীকালে প্রণীত ভূমি আইনে আরও সম্প্রসারিত হয়। অন্যদিকে এই আইনে জমিদার শ্রেণির একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব-প্রতিপত্তির পতন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল। ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন জমিদারদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাসে আরও সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। তবে ১৯৩৮ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকটাই অটুট থাকে। কিন্তু ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালের ভূমি আইনে জমিদারদের অধিকার হ্রাস করে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের ভূমি আইন প্রণয়নের ফলে কৃষকদের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এর ফলে তারা শোষক-নিপীড়ক জমিদার ও জোতদারের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলারও সহাস পেয়েছিল। এমনকি, তারা অধিকার আদায়ের কৌশলও রপ্ত করেছিল। বস্তুত, দীর্ঘ দিন ধরে কৃষকরা

---

[১৩০] ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, পৃ. ১৭৯।

[১৩১] Ashraf Siddiqui (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Rajshahi*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dacca : Bangladesh Government Press, 1976), p. 276.

[১৩২] ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১১৬।

শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তির জন্য যে আন্দোলন ও সংগ্রাম করেছিল তা থেকে তারা বাস্তবমুখী শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। এছাড়াও তারা রাজনৈতিকভাবেও সচেতনতা অর্জন করেছিল। সুতরাং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সরকারি নীতি কৌশলে পরিবর্তনের সঙ্গে ভূমিস্বত্ব ও ভূমি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভূমি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের পরিবর্তন ও ভূমি বিরোধ (১৮৮৫-১৯৪৭)

৩.১ ভূমিকা

তৃতীয় অধ্যায়ে ভূমি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের পরিবর্তন ও ভূমি বিরোধ (১৮৮৫-১৯৪৭) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ভূমি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ বলতে ভূমির বিভিন্ন অংশীজনকে (স্টেকহোল্ডার) বুঝানো হয়েছে। তবে ভূমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ বা ভূমির বিভিন্ন অংশীজন থাকলেও এ গবেষণায় ভূমির অংশীজন হিসেবে সরকার, জমিদার, জোতদার ও কৃষকের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সরকারের পরিবর্তন তথা সরকারি নীতি কৌশলে পরিবর্তনের ফলে কীভাবে ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের প্রভাবে জমিদার, জোতদার ও কৃষক সমাজের কী পরিবর্তন হয়েছিল এবং এই পরিবর্তনের ফলস্বরূপ ভূমি বিরোধের পরিণতি কী হয়েছিল সে সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.২ আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিতে জমিদার শ্রেণির পরিবর্তন

৩.২.১ জমিদারদের ভূমিস্বত্বাধিকারী লাভ ও ভূমি বিরোধের সূচনা

সরকারি নীতি কৌশলে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিস্বত্বেরও ক্রমাগত পরিবর্তন হয়েছিল। এর ফলে জমিদার শ্রেণিরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষকদের ভূমিস্বত্বের ওপর আংশিক অধিকারস্বত্বসহ কিছু সুবিধা প্রদান করার ফলে জমিদার শ্রেণির প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু তারপরও বিশ শতকের ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রধানত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের স্বার্থ রক্ষামূলক কৌশলী ভূমিকার কারণে জমিদার শ্রেণির প্রতিপত্তি বহাল ছিল।

জমিদারি প্রথা থেকেই জমিদারদের উদ্ভব। জমিদার শ্রেণির উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ধ্রুপদী মার্কসবাদীদের মতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনই জমিদারি প্রথার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলায় জমিদারি প্রথার ইতিহাস অনেক প্রাচীন।[১] তৃতীয় শতকের গুপ্ত আমলের যে কয়েকটি লিপি বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় পাওয়া গেছে তার প্রত্যেকটিতেই ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে রাজা ভূমি দান করেছিলেন।[২] পঞ্চম শতকেও এই অঞ্চলে রাজা প্রচুর ভূমিদান করেছিলেন।[৩] এমনকি, অষ্টম শতকের খড়্গবংশীয় রাজা দেবখড়্গের আশ্রাফপুর পট্টোলীতেও দেখা যায় যে রাজা দেবখড়্গ বৌদ্ধ আচার্য সংঘমিত্রের বিহারে ভূমি দান করেছেন। অষ্টম শতক পরবর্তী পাল ও সেন আমলের প্রায় সব লিপিই সমগ্র গ্রামদানের পট্টোলী পাওয়া যায়। অষ্টম শতক পরবর্তী পাল এবং সেন আমলে রাজা একসঙ্গে কয়েকটি গ্রাম দান করেছেন। রাজা গ্রামগুলি গ্রামবাসীর ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি সমেতই দান করেছিলেন।[৪] অষ্টম শতক হতে এই দানকৃত ভূসম্পত্তির ফলে সমাজে ভূম্যধিকারীর শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল। ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টে অষ্টম শতকের ভূমিদানের ফলস্বরূপ জমিদার শ্রেণির আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয়, “These land-grants of the King

[১] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪১-৪৪।
[২] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৭৪।
[৩] রামশরণ শর্মা (অনুবাদ : অঞ্জন গোস্বামী), *প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস* (কলকাতা : ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ৪৯।
[৪] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২০৩-২০৪।

created the landlords."[5] সুতরাং প্রাচীনকালে রাজা বা রাষ্ট্রের ভূমিদানের মধ্য দিয়ে ভূম্যধিকারী বা ভূস্বামী বা জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। তবে প্রাচীনকালে ভূম্যধিকারী বা জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হলেও তখন ভূমি বিরোধের রাজনীতির সূচনা হয়নি। কারণ প্রাচীনকালে ভূমিতে কৃষকের স্বত্ব যাই থাকুক না কেন রাজা কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। রাজার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার মাধ্যমে কৃষক যাতে জমির মালিকানা এবং ফসল ভোগ করার নিরূপদ্রব এবং নিরঙ্কুশ অধিকার ভোগ করতে পারে তার জন্য রাজা উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে কৃষকের নিকট দাবি করতেন মাত্র।[৬] উপরন্তু, প্রাচীনকালে ভূমির খাজনা আদায়কারী গ্রামপতি[৭] ভিন্ন কোনো মধ্যবর্তী শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি, মুঘল শাসনামলেও বিভিন্ন ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পরগনা, সরকার, চাকলা ও জায়গিরদারি প্রথার প্রবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হলেও প্রকৃত অর্থে ঔপনিবেশিক শাসনামলের ন্যায় শোষক ও নিপীড়নকারী কোনো জমিদার শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না। তবে এটাও ঠিক যে মুঘল আমলের ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে অসংখ্য জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল। উপরন্তু, মুঘল আমলে সৃষ্ট এই সব জমিদাররা অনেক প্রতিপত্তিশালীও ছিলেন। এ সম্পর্কে নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিনহা মন্তব্য করেন, "Todar Mal's settlement in Bengal was made with the zamindars who were described by Abul Fazl as 'rich, powerful and numerous."[8] মুঘল আমলে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সমগ্র বঙ্গদেশকে বিভিন্ন পরগনা, সরকার, চাকলায় বিভক্ত করা হয়েছিল। আবদুল করিমের মতে মুঘল শাসনামলে সুবাহ বাংলায় ২৪টি সরকার ও ৭৮৭টি মহল বিদ্যমান ছিল।[৯] ১৫৮২ সালে সম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী রাজা টোডরমলের প্রথম মুঘল বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় প্রাচীনকালের রাজস্ব ও প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে পরগনা ব্যবস্থা এবং পরগনার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও রাজস্ব সংগ্রহকারী হিসেবে চৌধুরী বা জমিদারকে বহাল রেখেও নতুন করে প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে সরকার ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে প্রথম মুঘল বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় পরগনা এবং সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো পার্থক্য ছিল না। রাজা টোডরমলের প্রথম মুঘল বন্দোবস্তে নতুন করে সৃষ্ট সরকার ব্যবস্থায় জায়গির প্রথার উদ্ভব হয়।[১০] শ্রীআনন্দনাথ রায়ের মতে বারভূঁইয়াদের পতনের পর তাঁদের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে বহু সংখ্যক জমিদারের অভ্যুদয় হয়েছিল।[১১] ১৬৫৮ সালে বাংলার ভাইসরয় শাহ সুজার দ্বিতীয় মুঘল বন্দোবস্তের সময় পূর্বের পরগনা ও সরকারের সংখ্যা আরও অনেক বেশি সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হয়।[১২] দ্বিতীয় মুঘল বন্দোবস্তের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল ভূমি রাজস্ব ছাড়াও সায়ের নামক একটি পৃথক রাজস্ব ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। সায়ের রাজস্ব সম্পর্কে বি. এইচ. ব্যাডেন-পাওয়েল মন্তব্য করেন, "These were taxes on pilgrims, excise, transit and customs duties, taxes tolls, &c. They amounted usually to about one-tenth of the land-revenue; they also included charges on the use of the products of the jungle (*ban-kar*), on fishing (*jal-kar*, produce of water), and on orchards and fruit-trees (*phal-kar*)."[13] উল্লেখ্য,

---

[৫] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. II, p. 132.

[৬] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. ৫।

[৭] গ্রামপতি বলতে গোত্র অথবা গোষ্ঠী প্রধানকে বুঝানো হয়েছে। তিনিই ছিলেন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। তিনি উক্ত গ্রামের যে কোনো নীতি নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করতেন। প্রাচীনকালে এই গোত্র অথবা গোষ্ঠী প্রধান তথা গ্রামপতি উক্ত গ্রামের সকলের খাজনা সংগ্রহের জন্য রাজা বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক নিয়োজিত হতেন। তিনি গ্রামের সকলের ভূমির খাজনা আদায় করে রাজার প্রতিনিধির নিকট জমা দিতেন। দেখুন, Narendra Krishna Sinha, *The Economic History of Bengal : From Plassey to the Permanent Settlement*, Volume II (Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1968), pp. 1.

[৮] Sinha, *Economic History of Bengal*, pp. 1-2.

[৯] আবদুল করিম, "মুগল রাজস্ব ব্যবস্থা", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭), পৃ. ১৪১।

[১০] Ascoli, *Early Revenue History of Bengal*, pp. 22-23.

[১১] শ্রী আনন্দনাথ রায়, *ফরিদপুরের ইতিহাস : ভৌগোলিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা : শ্রী ভূতনাথ পালিত, ১৩১৬ সন), পৃ. ৫৯।

[১২] Ascoli, *Early Revenue History of Bengal*, pp. 23-25.

[১৩] B. H. Baden-Powell, *The Land Systems of British India* (Oxford : At the Clarendon Press, 1892), p. 420.

মুর্শিদ কুলী খাঁ ১৭২২ সালে সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি চাকলাকে ২৫টি জমিদারি ও ১৩টি জায়গিরদারিতে বন্দোবস্ত করেন।[১৪] এভাবে মুঘল শাসনামলে ধীরে ধীরে পরগনা, সরকার, চাকলা, জায়গির ও সায়েরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭২৮ সালে এসে দেখা যায় যে আরও বেশি সংখ্যক জায়গির স্বত্বাধিকারের সৃষ্টি হয়েছে।[১৫] উল্লেখ্য, মুঘল আমলে জমিদার ভূমির মালিক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন না। জমিদার ছিলেন ঐতিহ্যগতভাবে রাজস্ব সংগ্রাহক মাত্র।[১৬] ভূমিস্বত্বের ওপর জমিদারদের অধিকার প্রসঙ্গে এন. কে. সিনহা মন্তব্য করেন, "Zamindaris, in the Mughal period, were much more than mere 'customary hereditary occupancy."[17]

বস্তুতপক্ষে, মুসলমান আমলের জমিদারগণ সম্রাট বা প্রাদেশিক সুবাদার কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছিলেন শুধুমাত্র রাজস্ব বা খাজনা আদায়কারী হিসেবে। অনেক ক্ষেত্রে তারা পুরুষানুক্রমেও রাজস্ব বা খাজনা আদায়কারী জমিদার ছিলেন বটে, কিন্তু ভূমিস্বত্বের মালিকানাস্বত্ব তাদের ছিল না। রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারগণ আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ কমিশন পেতেন বা কোনো একটি এলাকার রাজস্ব (নানকার) জমিদারের পারিশ্রমিক হিসাবে নির্ধারিত ছিল। রাজস্ব আদায় এবং তা নিয়মিতভাবে রাজ কোষাগারে জমা দিতে পারলেই জমিদারগণ নির্বিবাদে পুরুষানুক্রমে জমিদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। কৃষকের নিকট থেকে খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হলে জমিদাররা তাদের জমিদারি হারাতেন। মুর্শিদ কুলী খাঁর শাসনামলে রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে অনেক পুরাতন জমিদার তাদের জমিদারিস্বত্ব হারিয়েছিল এবং সেখানে নতুন জমিদার নিয়োজিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে রাজশাহীর নাটোরের জমিদারি এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুঘল আমলের জমিদারগণ ছিলেন কমিশন বা নানকারভোগী রাজস্ব সংগ্রাহক মাত্র।[১৮] তারপরও মুঘল শাসনামলে তথা নবাবী আমলের আর্থিক এবং প্রশাসনিক ভিত্তি ছিল জমিদাররা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে মুঘল যুগে সৃষ্ট পরগনা, সরকার, চাকলা, জায়গির এবং সায়েরের স্বত্বাধিকারীরাই বড় বড় জমিদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। মুঘল আমলের জমিদারি ব্যবস্থা ইংরেজ শাসনে এসে আরও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার এদেশে জমিদারদের প্রভাব দেখে বিস্মিত হয়েছিল। কোম্পানি সরকার বুঝেছিল যে গ্রামীণ সমাজে জমিদারদের যে অসীম প্রতাপ ও প্রভাব গড়ে উঠেছিল তা ভেঙ্গে চৌচির করে দিতে না পারলে কোম্পানির শাসন ও প্রভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে জমিদারি প্রথা প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরেই।[১৯] মুঘল আমলে রাজস্ব বা খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য জমিদারি প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল সত্য, কিন্তু তা লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় সৃষ্ট জমিদার হতে পৃথক ধরনের ছিল।[২০] লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে শেখ মাকসুদ আলী বলেন যে লর্ড কর্নওয়ালিস চেয়েছিলেন ব্রিটেনের উইগ অভিজাত শ্রেণির ন্যায় এদেশীয় একটি প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার শ্রেণি সৃষ্টি করতে, যারা একইসঙ্গে ঔপনিবেশিক স্বার্থে এবং কৃষির উন্নতি ও স্থানীয় নিরাপত্তায় ভূমিকা পালন করবে।[২১] এই লক্ষ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণার মাধ্যমে জমিদারদের ভূমির মালিকানা ও স্বত্বাধিকার প্রদান করা হয়েছিল। এটাই ছিল জমিদার শ্রেণির পক্ষে প্রথম ও যুগান্তকারী পরিবর্তন। এই

---

[১৪] শ্রী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস : নবাবী আমল*, অষ্টাদশ শতাব্দী (কলিকাতা : শ্রী ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৫ সন), পৃ. ৪৮৬।

[১৫] Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers : Dacca*, p. 360.

[১৬] Schendel, *Peasant Mobility*, p. 32.

[১৭] Sinha, *Economic History of Bengal*, pp. 9-10.

[১৮] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. ৫-৬।

[১৯] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪১-৪৪।

[২০] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. II, pp. 222-223; Ascoli, *Early Revenue History of Bengal*, pp. 70-71.

[২১] Ali, *From East Bengal to Bangladesh*, p. 58.

পরিবর্তনের ফলে একদিকে জমিদাররা চিরস্থায়ীভাবে ভূমির মালিকানা ও স্বত্বাধিকারী হয়েছিল এবং অন্যদিকে ইতিপূর্বে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের যে প্রথাগত ভোগদখলীয় অধিকার ছিল তারও বিলুপ্তি ঘটেছিল। এর ফলস্বরূপ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভূমি বিরোধের সূচনা হয়েছিল। এই ভূমি বিরোধের এক পর্যায়ে কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল এবং এই চেতনা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।

৩.২.২ ভূম্যধিকারী সমাজ প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ রক্ষা

১৭৯০ সালে দশসালা বন্দোবস্ত ঘোষণার সময় বাংলায় জমিদারের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। এসময় বাংলার মোট রাজস্বের অর্ধেক পরিশোধ করতেন মাত্র ৮টি জমিদার পরিবার।[২২] কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী সময়কালে জমিদারের সংখ্যা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। এসময় বিভিন্ন ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে অসংখ্য জমিদারের সৃষ্টি হয়। ১৮৭২-৭৩ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে বাংলায় দেড় লক্ষেরও বেশি জমিদারি ছিল এবং ছোট বড় মিলে সর্বমোট জমিদারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩,৯৫,৪৮৩ জন। এদের বেশির ভাগ ছিল ছোট জমিদার। উক্ত রিপোর্টে আরও দেখা যায় যে উক্ত জমিদারদের মধ্যে বড় জমিদার ছিলেন মাত্র ৫৩৩ জন, যাদের জমির পরিমাণ ছিল ৬০,০০০ বিঘার ওপরে। এছাড়াও ৬০,০০০ হতে ১,৫০০ বিঘার জমির মালিকানাধীন জমিদারের সংখ্যা ছিল ১৫,৭৪৭ জন এবং ১,৫০০ বিঘার কম জমির মালিকানাধীন জমিদারের সংখ্যা ছিল ১৩,৭৯,২০৩ জন।[২৩] পরবর্তী সময়ে ছোট-বড় জমিদারের সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পর প্রস্তুতকৃত ক্ষতিপূরণ তালিকা থেকে জানা যায় যে পূর্ব বাংলায় জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ।[২৪] স্থানীয় পর্যায়ের জমিদারি ও জমিদারদের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র দেখলে তা আরও স্পষ্ট হয়। যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বগুড়া জেলায় জমিদারির সংখ্যা ছিল মাত্র ৩টি, অথচ ১৮৭২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯৬টিতে।[২৫] ১৮৮৫ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বগুড়া জেলায় ৬৯৯টি জমিদারি ছিল।[২৬] আবার ১৭৯৩ সালে যশোর জেলায় মাত্র ১২২টি জমিদারি এস্টেট থাকলেও ১৮৭৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮৫৬টিতে (বড় ৫৭০টি ও ছোট ২২৮৬টি)।[২৭] সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারদের সংখ্যা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী সময়ে জমিদারদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে একদিকে ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষের নিকট তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অন্যদিকে জমিদাররা একটি শক্তিশালী সমাজ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতেও সক্ষম হয়েছিল। জমিদারদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলস্বরূপ ১৮৩৭ সালের ১২ নভেম্বর কলকাতা হিন্দু কলেজে জমিদারদের সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলার বিশিষ্ট জমিদার শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীচরণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এই সভায় জমিদার সমাজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সভায় বলা হয় যে দেশের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি ভূমি

---

[২২] ৮টি জমিদার পরিবার ছিল : (১) বর্ধমান রাজ, (২) রাজশাহী রাজ, (৩) দিনাজপুর রাজ, (৪) নদীয়া রাজ, (৫) বীরভূম রাজ, (৬) বিষ্ণুপুর রাজ, (৭) যশোরের ইউসুফপুর জমিদারি ও (৮) ঢাকার রাজনগর জমিদারি। দেখুন, ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১৩০।

[২৩] শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, আধুনিক যুগ, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮১), পৃ. ৩৮৬।

[২৪] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৭-৬৯।

[২৫] W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Rajshahi and Bogra*, Volume VIII (London : Trubner & Co., 1876), p. 302; প্রভাত সেন, *বগুড়ার ইতিহাস* (বগুড়া : বগুড়া কমার্শিয়াল সিন্ডিকেট লিমিটেড, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৮৪।

[২৬] সেন, *বগুড়ার ইতিহাস*, পৃ. ৩৮০।

[২৭] W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : District of Nadia and Jessore*, Volume II (London : Trubner & co., 1877), pp. 262-263.

সম্পর্কীয় হলেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে জমিদার সভার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।[২৮] ১৮৩৮ সালের মার্চ মাসে উক্ত প্রস্তাবানুসারে "শিষ্ঠবিশিষ্ট মান্য জমিদারদের" একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট জমিদার শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। এই বৈঠকে উপস্থিত অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন বাঙালি হিন্দু। এর বাইরে সভায় উপস্থিত ছিলেন মুসলিম জমিদার মুন্সী আমীর এবং তিনজন ইংরেজ জমিদার মি. ডিকিল, মি. প্রিন্সেপ ও মি. হেয়ার। উক্ত বৈঠকের সভাপতি রাধাকান্ত দেব জমিদার সভা গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন, "আমাদের এক সমাজ স্থাপন করা উচিত। এইরূপ সমাজের দ্বারা উপকার কেবল কলিকাতার মধ্যে হইবে এমত নহে কিন্তু তাবৎ দেশেরই হইবেক যেহেতুক দেশের নানা জিলার সঙ্গে এই সমাজের লিখন পঠন চলিতে পারিবে। এই সমাজের দ্বারা যাহার যে অনিষ্ট বিষয় অনায়াসে গভর্ণমেন্টের নিকট জ্ঞাপন করা যাইতে পারে।"[২৯] উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১২ সদস্য বিশিষ্ট 'জমিদারি সভা' (Zamindary Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ভূম্যধিকারী সমাজ' (Landholders' Society)। বাংলার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য 'রাজনীতিক সমাজ' (Political Association) হিসেবে ১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ভূম্যধিকারী সমাজ তথা জমিদার সভা আধুনিক যুগের রাজনীতির ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। জমিদারদের স্বার্থে এর প্রতিষ্ঠা হলেও এর বিধানে বলা হয়েছিল যে এই সমাজ জাতি, স্থান বা বর্ণ বিভেদ না করে সকল মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো। দেশের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি ভূমি সম্পর্কীয় হলেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু কার্যত এখানে 'ভূমি সম্পর্কীয়' বলতে জমিদারকে বুঝানো হয়েছিল, কৃষককে নয়। জমিদার সভার প্রত্যেক সদস্যকে ৫ টাকা প্রবেশিকা এবং বার্ষিক ২০ টাকা চাঁদা দিতে হতো। সে সময়ে এই টাকা দিয়ে কোনো সাধারণ কৃষকের পক্ষে এর সদস্য হওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং যারা সাধারণ কৃষক হিসেবে পরিচিত ছিল তারা এর সঙ্গে ছিল না। এমনকি, এই সভা প্রধানত জমিদারদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়েই ভূমিকা পালন করেছিল। জমিদার সভা গঠিত হওয়ার পর শাসনকর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিত দাবি উপস্থাপন করা হয় : (১) নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করণের ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে; (২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্রিটিশ ভারতীয় রাজ্যের সর্বত্র চালু করতে হবে; (৩) পতিত জমিসমূহ সুবিধাজনক শর্তে ইজারা দিতে হবে; এবং (৪) সর্বসাধারণের সুখ, সুবিধা ও আত্মরক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে বিচার, পুলিশ ও রাজস্ব বিভাগের সংস্কার করতে হবে।[৩০]

উল্লেখ্য, জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় গঠিত এই সভা ছিল সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক সংগঠন। এই সভার কার্যপদ্ধতি গণতন্ত্র পদ্ধতিতেই পরিচালিত হতো। প্রত্যেক জেলায় জমিদার সভার শাখা স্থাপন করা হয়। ভারতে তথা বাংলায় 'রাজনীতিক সভা' যে প্রণালীতে গঠিত ও পরিচালিত হয় 'ভূম্যধিকারী সমাজ' ছিল তার পথপ্রদর্শক। ১৮৬৮ সালে বিশিষ্ট জমিদার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এর রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন যে জমিদার সভাই সর্বপ্রথম জনসাধারণকে বিধিসঙ্গত উপায়ে নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণ ও ন্যায্য অধিকারের দাবি করা এবং এই বিষয়ে প্রকাশ্যে স্বাধীন মত প্রকাশের পথ প্রদর্শন করে। বাহ্যত, জমিদারদের স্বার্থের দিকেই এই সমাজের দৃষ্টি ছিল, কিন্তু জমিদার ও প্রজার স্বার্থ এমনভাবে বিজড়িত ছিল যে এই সমাজের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রজাদেরও স্বার্থ রক্ষা হতো। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে মিত্রের বক্তব্য সত্য বলে মেনে না নিলেও ভূম্যধিকারী সমাজের প্রতিষ্ঠাকে এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার ফলে যে মুক্তিসংগ্রামের উদ্ভব হয়েছিল তার অগ্রদূত বলা যেতে পারে। তাঁর মতে এই সমাজ দ্বারা যে শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও আদর্শ অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং জমিদার সমাজ

---

[২৮] মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, পৃ. ৫১০।
[২৯] মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, পৃ. ৫১১।
[৩০] মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, পৃ. ৫১১-৫১৪।

ভারতের তথা বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল। উল্লেখ্য, ১৮৩৯ সালে ইংল্যান্ডে অ্যাডাম ও জর্জ থমসন মিলে ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভূম্যধিকারী সমাজের প্রাণপুরুষ হিসেবে পরিচিত বিশিষ্ট জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় জমিদার সভার সঙ্গে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৮৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে জর্জ থমসন ভারতে আগমন করেন এবং ১৮৪৩ সালের ৬ এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি একটি নতুন রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৮৪৩ সালে ২০ এপ্রিল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে বাংলার বিশিষ্ট জমিদাররা ছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্রসহ তৎকালীন জমিদার ও অভিজাত শ্রেণির সৃষ্ট পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু বাস্তবে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটির নেতৃত্বে ছিলেন জমিদাররা।[৩১] এরপর থেকে উনিশ শতকের বিভিন্ন সভা-সমিতি, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ১৮৮৫ সালের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ১৯০৬ সালের মুসলিম লীগ এবং বিশ শতকের শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল উৎস ছিল ১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত জমিদার সভা।

জমিদার সভার সদস্যরা ইংরেজদের সহায়তাকারী হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এবং তারাও বিভিন্ন পদ-পদবি লাভ করেছিল। এই সভার মাধ্যমে সরকার ও জমিদার উভয়ের স্বার্থরক্ষা হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একদিকে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা হয়েছিল এবং অন্যদিকে শাসনকর্তৃপক্ষের আস্থা অর্জন করে এটি একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানেও পরিণত হয়েছিল। এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সংগঠিত জমিদাররা যেমন মনে করেছিলেন যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের আস্থা অর্জন করতে পারলে তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, তেমনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষও আশ্বস্ত হয়েছিল যে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমে তাদের সহযোগিতায় দীর্ঘস্থায়ী, নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিতভাবে ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষা করা সহজ হবে। পরবর্তী সময়ের ঘটনা প্রবাহও তাই প্রমাণ করে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাংলা তথা পূর্ব বাংলার জমিদার সমাজ সরকারকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছিল। বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জমিদাররা প্রকাশ্যেই সিপাহী বিদ্রোহের নিন্দা করে বিভিন্নভাবে ব্রিটিশদের সহযোগিতা করেছিলেন। ঢাকার জমিদার নবাব খাজা আব্দুল গণিসহ পূর্ব বাংলার জমিদারদের সহানুভূতি ও সমর্থন পুরোপুরি ইংরেজদের পক্ষে ছিল। ঢাকার তৎকালীন কমিশনার তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে তাঁর বিভাগের নেটিভ জমিদাররা তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। এই সাহায্যের কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশের জমিদাররা সরকারের সমর্থক ও সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এমনকি, বাংলার জমিদারদের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ১৮৫৭ সালের ২২ মে সিপাহীদের আচরণের নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।[৩২] বিদ্রোহের সময় জমিদাররা ও তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের বিপদের সময় সমর্থনকারী ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে জমিদার ও তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠনসমূহের কর্মকাণ্ড ব্রিটিশদের আস্থা অর্জন করায় জমিদাররাও বিভিন্ন পদ-পদবিসহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা এবং উপাধি লাভ করেছিলেন। যেমন ব্রিটিশদের আস্থাভাজন হিসেবে জমিদাররা বিভিন্ন সময়ে মহারাজাধিরাজ; মহামান্য, মহারাজা, রাজা, নবাব বাহাদুর, খান বাহাদুর, বাহাদুর, নবাব, নাইট, খান, চৌধুরী, জি.সি.আই.ই.,

---

[৩১] বিস্তারিতভাবে দেখুন, মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, পৃ. ৫১১-৫১৭।

[৩২] বিস্তারিতভাবে দেখুন, চক্রবর্তী, *সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, পৃ, ১২৩-১২৬; কাউসার, *"সিপাহী বিদ্রোহে পূর্ববঙ্গের জমিদারদের সরকার পক্ষাবলম্বনের কারণ অনুসন্ধান"*, পৃ. ৪১-৪২।

কে.সি.এস.আই, সি.আই.ই, আই.ও.এম, কে.এস.আই, কে.সি.ভি.ও, এম.বি.ই প্রভৃতি উপাধি লাভ করেছিলেন।[৩৩] এমনকি, ব্রিটিশদের আস্থাভাজন হলে উপাধি লাভ ছাড়াও সরকারি বিভিন্ন ধরনের লোভনীয় পদ-পদবি পাওয়াও সহজ হতো। উল্লেখ্য, ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিকাশের প্রথম পর্বে (১৭৭৩-১৮৬১) ভারতীয়দের প্রধান দাবি ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি। ভারতীয়দের এই দাবি শাসনতান্ত্রিক বিকাশের দ্বিতীয় পর্বে (১৮৬১-১৯১৯) কার্যকর করা হয়েছিল এবং এই দাবি কার্যকর করে ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন অনুযায়ী বারানসীর মহারাজা বাহাদুর স্যার ঈশ্বরী প্রাসাদ নারায়ণ সিংহ, পাতিয়ালার মহারাজা মহিন্দ্র সিংহ ও রাজা স্যার দিনকর রাওকে সর্বপ্রথম গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।[৩৪] ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে ৪৫ জন ভারতীয়[৩৫] সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এর মধ্যে ২৫ জন ছিলেন জমিদার এবং ৭ জন ছিলেন দেশীয় রাজ্যের (princely states) শাসক এবং বাকি মাত্র ১৩ জন সদস্য ছিলেন প্রধানত পেশাজীবী শ্রেণির, যেমন আইনজীবী, ম্যাজিস্ট্রেট, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী। সুতরাং জমিদার সভার প্রতিষ্ঠার ফলে জমিদারদের বিভিন্ন ধরনের লোভনীয় পদ-পদবি পাওয়া সহজ হয়েছিল।

এছাড়াও জমিদার সভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংগঠিত জমিদাররা ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রণীত ভূমি আইনে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায়ও সক্ষম হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, কৃষক অসন্তোষ এবং বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ ভূমি বিরোধ নিরসনের উদ্দেশ্যে ১৮৮৩ সালের ২ মার্চ গভর্নর জেনারেলের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল উত্থাপন করেন।[৩৬] এই বিল উত্থাপনের পর কাউন্সিলের ভিতরে এবং বাইরে সংগঠিত জমিদাররা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় সফল হয়েছিলেন। কাউন্সিলের ভিতরে জমিদার সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে সুফিয়া আহমেদ মন্তব্য করেন, "The Zamindars are strongly represented in the Bengal Council, while the Ryots are not all, except in so far as the official men protect them."[37] অন্যদিকে কাউন্সিলের বাইরে জমিদার সভা এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন জমিদারদের পক্ষে সভা-সমাবেশের আয়োজন করে বিলের বিরুদ্ধে

---

[৩৩] জমিদারদের উপাধিগুলি বিস্তারিতভাবে দেখুন, *List of Zamindars exempted*, pp. 1-20; *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. I, pp. p. i and 1-2; এস. এম. রেজাউল করিম, *বাংলায় পাট চাষ ১৮৫৫-১৯৪৭*, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ (ঢাকা : ইতিহাস ভিাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫), পৃ. ৮৪।

[৩৪] বিস্তারিতভাবে দেখুন, হক, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, পৃ. ৩২-৫৭; https://en.wikipedia.org/wiki/Mahendra_Singh_of_Patiala; https://en.wikipedia.org/wiki/Benares_State; https://en.wikipedia.org/wiki/Dinkar_Rao, Accessed on 28 June 2019.

[৩৫] ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে ৪৫ জন ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেন : (1) Maharaja Bahadur Sir Ishwari Prasad Narayan Singh of Benaras (January 1862-1866); (2) Maharaja Mahendra Singh of Patiala (January 1862-1864); (3) Raja Sir Dinkar Rao (January 1862-1864); (4) Yusef Ali Khan, Nawab of Rampur (September 1863-1864); (5) Maharaja Sir Mirza Gajapati Viziaram, Raj Bahadur of Vizianagram (January 1864-1866 and April 1872-1876); (6) Raja Sir Shahib Dayal of Kishen Kot (January 1864-1866); (7) Mahtab Chand Bahadur, Raja of Burdwan (November 1864-1866); (8) Khwaja Abdul Ghani, Nawab of Dacca (December 1867-1869); (9) Prasanna Coomar Tagore (December 1867-1873); (10) Dheoraj Singh of Kashipur (January 1868-1870); (11) Sawai Ram Singh II, Maharaja of Jaipur (August 1868-1870 and August 1871-1875); (12) Digvijay Singh, Raja of Balrampur (October 1868-1870); (13) Ramanath Tagore (February 1873-1875); (14) Raja Shamsher Parkash of Sirmur; (15) Sir Ishwari Prasad Narayan Singh, Maharaja of Benaras (1876); (16) Sir Narendra Krishna Deb (1876); (17) Nawab Faiz Ali Khan, Nawab Bahadur of Pahasu (1877); (18) Kalb Ali Khan, Nawab of Rampur (1878-1887); (19) Sir Syed Ahmed Khan (1878-1882); (20) Jatindramohan Tagore, Bengal Zamindars (1880-1881); (21) Raghubir Singh of Jind (1880); (22) Raja Shiva Prasad of Benaras; (23) Durga Charan Laha, Maharaja of Shyampukur, Calcutta Merchants, (1882); (24) Kristo Das Pal (1883); (25) Syed Ameer Ali (1883); (26) Vishvanath Narayan Mandlik, Bombay Lawyear (1884-1887); (27) Sir Shankar Bakhas Singh (1886); (28) Peary Mohan Mukherjea; (29) Dinshaw Maneckji Petit (1886); (30) Khwaja Ahsanullah; (31) Sir Romesh Chandra Mitra, Bengal; (32) Krishan‡jvi Lakshman Nulkar, Bombay (1890-1891); (33) Rashbihari Ghosh (1892). Seen, https://en.wikipedia.org/wiki/Mahendra_Singh_of_Patiala; https://en.wikipedia.org/wiki/Benares_State; https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Legislative_Council; https://en.wikipedia.org/wiki/Dinkar_Rao, Accessed on 28 June 2019; হক, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, পৃ. ৩২-৫৭;

[৩৬] Islam, *Economic History of Bengal*, pp. 165-166; *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. ১১।

[৩৭] Ahmed, *Muslim Community in Bengal*, p. 87.

তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এমনকি, সংগঠিত জমিদাররা গভর্নর জেনারেলের নিকট বিলের বিরুদ্ধে স্মারক লিপি প্রদানের মাধ্যমেও তাঁদের স্বার্থ অটুট রাখার চেষ্টা করেন। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল কাউন্সিলে উত্থাপনের পর থেকে বিলটি গৃহীত হওয়া পর্যন্ত কাউন্সিলের ভিতরে ও বাইরে জমিদারদের প্রচণ্ড চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত সরকার জমিদারদের স্বার্থের খুব বেশি বাইরে যেতে পারেননি। কাউন্সিল পরিষদের জমিদার সদস্যরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টাই করেছিলেন। এ কারণে উত্থাপিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিলে প্রস্তাবিত কৃষক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বাদ দিয়ে সরকার জমিদারদের সঙ্গে অনেকটা বাধ্য হয়েই সমঝোতা করে উত্থাপিত বিলটি সংশোধন করে পাশ করেন।[৩৮] এ কারণে জমিদারদের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে গৃহীত সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল আইনে পরিণত হওয়ায় ভূমির ওপর জমিদারদের প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল। এভাবে বিশ শতকের ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জমিদাররা ভূমিস্বত্বের ওপর তাঁদের স্বার্থ অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩.২.৩ কৃষকদের ওপর জমিদারদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সরকারের রাজস্ব আয় নিশ্চিত করা। কিন্তু বন্দোবস্তের পরেও রাজস্ব আয় পূর্বের ন্যায় অনিশ্চিত রয়ে যায়। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সরকারের রাজস্ব আয় নিশ্চিত না হওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনি দুর্বলতার কারণে জমিদাররা কৃষকদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় তারাও সরকারকে সঠিক সময়ে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। অর্থাৎ সরকারের রাজস্ব আয় অনিশ্চিতার পেছনে মূল কারণ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনি দুর্বলতা। যদিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধানে কৃষকদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি, তবে বিধানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে জমিদার কৃষককে খাজনা বকেয়ার জন্য দৈহিক নির্যাতন করতে পারবে না। দৈহিক নির্যাতন করলে জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকের ফৌজদারি মামলা করার অধিকার থাকবে। উক্ত আইনে আরও বলা হয়েছিল যে জমিদার কৃষকের জমি অথবা অন্য কোনো সম্পত্তি, লাঙ্গল-গরু অথবা অন্য কোনো কৃষিযন্ত্র ক্রোক করতে পারবে না। জমিদারেরও যদি ন্যায্য অভিযোগ থাকে তবে সম্পত্তি ক্রোক না করেও জমিদার কৃষকের বিরুদ্ধে দেওয়ানি আদালতে মামলা করতে পারবে।[৩৯] জমিদারদের অভিযোগ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের দুর্বলতার কারণে বিশেষ করে নির্যাতনের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় কৃষকরা সঠিক সময়ে খাজনা প্রদানে আগ্রহী ছিল না। ফলে সঠিক সময়ে তারাও সরকারি রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে। জমিদারদের আরও অভিযোগ ছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে সরকারের বাকি রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা থাকলেও আইনের পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য কৃষকের নিকট থেকে তাঁরা তাদের বকেয়া খাজনা আদায় করতে পারছে না। এর ফলে জমিদাররাই মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।[৪০] বর্ধমান ও নদীয়ার রাজাসহ বিভিন্ন জমিদাররা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনি দুর্বলতার কথা জানিয়ে সরকারের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ করেন যে অতিরিক্ত খাজনা ধার্য ও খাজনা আদায়ে জমিদারদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকায় তারা নিয়মিতভাবে সরকারকে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এমনকি, বিষ্ণুপুরের কমিশনার, বর্ধমান জেলার কালেক্টর এস. ডেভিসসহ বিভিন্ন জেলার কালেক্টরগণও রাজস্ব বোর্ডকে লিখিতভাবে জানান যে জমিদারদের রাজস্ব বাকি পড়ার প্রধান কারণ হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনি দুর্বলতা। অর্থাৎ জমিদার এবং সরকারি কর্মকর্তারা আইনি দুর্বলতার কথা জানিয়ে কৃষকের নিকট হতে খাজনা আদায়ে জমিদারের ক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে রাজস্ব বোর্ড **১৭৯৫**

---

[৩৮] Ahmed, *Muslim Community in Bengal*, pp. 86-88.

[৩৯] ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১০৪-১০৫।

[৪০] এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, Islam, *Permanent Settelment*, pp. 48-52.

সালের ২৭ মার্চ গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের নিকট রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার জন্য খাজনা আদায়ে জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ করে। রাজস্ব বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৭৯৫ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সরকার ১৭৯৫ সালের পঞ্চম আইন (The Regulation XXXV of 1795) জারি করেন।[৪১] এই আইনে রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে জমিদারদেরকে কিছু সীমিত ক্ষমতা (summary powers) প্রদান করা হয়। কিন্তু এরপরও অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি।[৪২] এই আইন কৃষকদের ওপর জমিদারদের প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল সত্যি, কিন্তু এটি জমিদারদের খুশি করতে পারেনি। কারণ জমিদারদের দাবি ছিল জমিদার ও কৃষকের মধ্যে সরকারি হস্তক্ষেপ অনুচিত। তাঁরা নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে কৃষকদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য জোরালো দাবি করতে থাকেন।[৪৩] এই আইনে জমিদাররা কৃষকদের সম্পত্তি ক্রোক করার অধিকার পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু ক্রোককৃত সম্পত্তি নিজেরা বিক্রি করার ক্ষমতা পায়নি। আবার জমিদার কৃষককে বন্দি করার ক্ষমতা লাভ করেছিল ঠিকই কিন্তু এজন্য জেলা জজের পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন ছিল। এছাড়াও এর বিধানে কৃষককে জমিদার কর্তৃক বন্দি করার বৈধতা আদালতে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এ কারণে কৃষকদের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেওয়ার পক্ষে জমিদাররা সরকারের নিকট জোরালো দাবি করতে থাকেন। জমিদার ও কৃষকের মধ্যকার সম্পর্কে সরকারের কোনো রকম হস্তক্ষেপকে জমিদাররা অনভিপ্রেত বলে মনে করেন। জমিদারদের যুক্তি ছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তাদেরকে জমির একমাত্র মালিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে তাদের জমি কি শর্তে কৃষকরা চাষাবাদ করবে এবং কৃষকের সঙ্গে তারা কি সম্পর্ক বজায় রাখবে সেসব বিষয় তাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, সরকারের নয়। ১৭৯৫ সালে প্রণীত আইনের পর থেকে জমিদাররা কৃষকের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কৃষকের নামে হাজার হাজার মিথ্যা মামলা দায়ের করে আদালতে অচলাবস্তা সৃষ্টি করেছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে রাজস্ব বাকি রেখে নিলামে নিজের জমি বেনামে ক্রয় করেছিল, অনেক সময় বেনামে ক্রয়ে ব্যর্থ হলে নিলামে বিক্রিত জমির দখলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, নিলাম ক্রয়কারী নতুন জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষককে উসকিয়ে দেওয়া, এমনকি ডাকাত-দস্যুদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে আইনশৃঙ্খলার পতন ঘটানো প্রভৃতি উপায়ে জমিদাররা সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। ফলে সরকারের রাজস্ব আদায় আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং শাসনক্ষেত্রে একরূপ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।[৪৪] উল্লেখ্য, একদিকে আঠারো শতকের শেষ দিকে লর্ড ওয়েলেসলির সরকার ভারতের দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতানের সঙ্গে ঈঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে কোম্পানি সরকারের অর্থের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। সঙ্গত কারণেই সরকার বাকি খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।[৪৫] বিশেষত যুদ্ধের কারণে রাজকীয় কোষাগারে অর্থাগমনে কোনো প্রতিবন্ধকতা মেনে নিতে বড়লাট রাজি ছিলেন না। তিনি জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নিয়মিত রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অন্যদিকে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যকার সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে নেপোলিয়নের প্রভাব বিস্তারের ভয়ে লর্ড ওয়েলেসলী জমিদারদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভেও প্রয়াসী হয়েছিলেন। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সরকার একটি নতুন আইন প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে ১৭৯৯ সালের জুলাই মাসে নিজামত আদালতের রেজিস্ট্রার জে. এইচ. হ্যারিংটনকে প্রধান করে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন যা হ্যারিংটন কমিটি হিসেবে পরিচিত। উল্লেখ্য, হ্যারিংটন কমিটি গঠন পর্যন্ত সরকারের রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার জন্য জমিদারদের ওপর নিপীড়ন করা ছিল সরকারি নীতি ও কৌশলের

[৪১] Islam, *Permanent Settlement*, p. 42.
[৪২] Islam, *Bengal Land Tenure*, p. 15.
[৪৩] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. ৬-৭।
[৪৪] ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১১৩।
[৪৫] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. ৬-৭।

অংশ। এ কারণে হ্যারিংটন কমিটির সদস্য এবং রাজস্ব বোর্ডের সভাপতি গ্রাহাম রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ জমিদারদের কারান্তরীণ করার সুপারিশ করেন। কমিটির অপর দু'জন সদস্য বুলার এবং হাচও এই সুপারিশকে সমর্থন করেন। চূড়ান্তভাবে হ্যারিংটন কমিটির রিপোর্টে সুপারিশ করা হয় যে রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারদের কারান্তরীণসহ শাস্তির বিধান করতে হবে। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে হ্যারিংটন কমিটির রিপোর্টের সুপারিশসমূহ বিস্তারিত আলোচনা শেষে কাউন্সিল জমিদারদের কারান্তরীণসহ শাস্তির অংশটুকু বাদ দিয়ে অন্যান্য সুপারিশের ভিত্তিতে ১৭৯৯ সালের সপ্তম আইন (The Regulation VII of 1799) জারি করেন, যা সাধারণ কৃষক তথা জনসাধারণের নিকট কুখ্যাত হফতম বা সপ্তম আইন হিসেবে পরিচিত ছিল।[৪৬] এই আইনে জমিদারকে বাকি খাজনার জন্য আদালত বা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের আদেশ ব্যতিরেকেই কৃষককে গ্রেপ্তার, তার জমির ফসল, লাঙ্গল-গরু এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার অধিকার প্রদান করা হয়েছিল।[৪৭] অর্থাৎ এর মাধ্যমে জমিদারকে কৃষকের ওপর শোষণ ও নিপীড়নের বৈধ অধিকার প্রদান করা হয়েছিল এবং জমিদারকে সরকারি নিপীড়নের হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।[৪৮] সুতরাং এই আইনে একদিকে জমিদাররা সরকারের নিপীড়ন নির্যাতন হতে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি পেয়েছিল এবং অন্যদিকে তারা কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়নের বৈধ অধিকার লাভ করেছিল।

---

[৪৬] এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, Islam, *Permanent Settelment*, pp. 64-66.

[৪৭] Islam, *Bengal Land Tenure*, p. 16.

[৪৮] উল্লেখ্য, মুঘল শাসনামল হতে ১৭৯৯ সালের সপ্তম আইন জারি পর্যন্ত রাজস্ব বাকির কারণে জমিদাররা সরকারের নিপীড়ন-নির্যাতনের স্বীকার হতো। মুঘল আমলে রাজস্ব বাকির কারণে জমিদারকে জরিমানা করা হতো, জমিদারদের জমিদারি কেড়ে নেওয়া হতো, জমিদারদের জমিদারিচ্যুত করা হতো, আবার কখনোওবা জমিদারদের ওপর শুরু হতো নির্মম নির্যাতন, এমনকি তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হতো। [বিস্তারিতভাবে দেখুন, J. N. Roy, *The Law of Revenue Sales*, Part II, The Revenue Sale Law being Act XI of 1859 and Act VII (B.C.) of 1868 as modified up-to-date with notes (Calcutta : Thacker, Spink & co., 1917), pp. xxxvii- xxxviii; James Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Vol. II (Calcutta : Mann, Military Orphan Press, 1940), p. 286; বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, পৃ. ৪৮৩-৪৮৫; সেন, *বগুড়ার ইতিহাস*, পৃ. ৩৮২-৩৮৩।] মোহাম্মদ মোহর আলীর মতে মুর্শিদ কুলী খাঁনের রাজত্বকালে রাজস্ব বকেয়ার কারণে জমিদাররা বর্বরোচিত শাস্তির সম্মুখীন হতেন। এন. কে. সিনহা বলেন যে মুর্শিদ কুলী খাঁন রাজস্ব বাকির কারণে জমিদারদেরকে রাজধানীতে নজরবন্দি করতেন, কারাবন্দি করে রাখতেন, এমনকি জমিদারকে সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণেও বাধ্য করতেন। (বিস্তারিতভাবে দেখুন, Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Muslim Rule in Bengal (600-1170/1203-1757), Volume I A (Riyadh : Department of Culture and Publication, Imam Muhammad IBN Sa'ud Islamic University, 1985), pp. 551-552; Sinha, *The Economic History of Bengal*, Volume II, pp. 3 and 21.) শ্রী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে নবাব সুজাউদ্দীন, নবাব আলিবর্দি খাঁন ও নবাব মীর জাফর আলী খানের সময়েও বাকি রাজস্বের জন্য জমিদারগণের কারাবাস ঘটেছিল। [বিস্তারিতভাবে দেখুন, বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, পৃ. ৮৭-৮৯)।] জে. এন. রায়ের মতে নবাবী শাসনের অবসানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের প্রথম দিকেও দেওয়ান রেজা খানের সময়ে রাজস্ব বাকির কারণে জমিদারদের ওপর নির্মম নির্যাতন করা হতো। তাঁর সময়ে রাজস্ব বাকির কারণে জমিদারদের ওপর যে নিপীড়ন ও নির্যাতন হতো সে সম্পর্কে জে. এন. রায় মন্তব্য করেন, "The zamindars or amils who failed in their payments, after undergoing the severities before described, were ducked in this pit. He also used to oblige them to wear leather long drawers, filled with live cats. He would force them to drink buffalo's milk, mixed with salt, till he brought them to death's door by diarrhoea. By these means he used to collect the revenues to the uttermost dam." [Roy, *The Law of Revenue Sales*, pp. xxxvii.] রেজা খানের পরবর্তী সময়েও রাজস্ব বাকি থাকার কারণে জমিদারদের ওপর পূর্বের ন্যায় নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন অব্যাহত ছিল। এমনকি, ইংরেজ কালেক্টররা রাজস্ব আদায়ের জন্য স্থানীয় জমিদারদেরকে কারান্তরীণ করে রাখতে দ্বিধাবোধ করেননি। [বিস্তারিতভাবে দেখুন, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *সিলেট বিভাগের ইতিহাস* (ঢাকা : সৈয়দা তাহেরা বেগম, ২০০৬), পৃ. ১৩১।] ১৭৮৯ সালে রংপুরের জেলা কালেক্টর গুডল্যান্ডের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে জমিদারদের নিকট থেকে বকেয়া রাজস্ব আদায় করার জন্য তিনি দৈহিক শাস্তি ব্যতীত সমস্ত ব্যবস্থাই প্রয়োগ করেন এবং বকেয়া আদায় করার জন্য জমিদারি বিক্রি করার অনুমতি চেয়ে তিনি রাজস্ব বোর্ডকেও চিঠি লিখেন। [দেখুন, নুরুল ইসলাম খান (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : রংপুর-বর্তমান রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার গেজেটীয়ারবদ্ধ বিবরণ*, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯০), পৃ. ৩৪৩।] এন. কে. সিনহার মতে ১৭৮৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বীরভূম জেলার বিষ্ণুপুরের জমিদার রাজা চৈতন সিংকে ৩১,৩৩৩ টাকা ৮ আনা ১৮ পয়সা রাজস্ব বাকির কারণে জেলে প্রেরণ করা হয়েছিল। [দেখুন, Sinha, *The Economic History of Bengal*, p. 246.] কাজী মোহাম্মদ মিছেরের মতে ১৭৯৩ সালের ৬ মার্চ রাজশাহীতে অত্যাচার অবিচারের যে তান্ডবলীলা চলেছিল, রাজশাহীর জমিদার রামকৃষ্ণও তার থেকে রেহাই পাননি। রাজস্ব বাকির কারণে জমিদার রামকৃষ্ণ কারাবন্দি হন। ১৭৯৩ সালের ১৮ মার্চ ১২ দিন কারান্তরীণ থাকার পর বাকি রাজস্ব প্রদানের 'অঙ্গীকার পত্র' লিখে দিয়ে তিনি মুক্তি লাভ করেন। পরে রাজস্ব পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর কয়েকটি পরগনা ও ডিহি নিলামে বিক্রি করা হয়। [দেখুন, কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (ঢাকা ঃ সৈয়দা হোসনে আরা বেগম, ১৯৬৫), পৃ.২৯৮।] মোঃ রেজাউল করিম বলেন যে ১৭৯৩ সালের আইনের ২ নং ধারায় জমিদারদের অধীনস্থ কৃষকদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ের জন্য নায়েব, গোমস্তা এবং অন্যান্য এজেন্ট নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই আইনে বলা হয়েছিল যে রাজস্ব বাকি থাকলে জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্য ভূম্যধিকারীর ফসল, গবাদিপশু ও অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে এবং তাঁদেরকে বাকি রাজস্বের জন্য কারান্তরীণ করা যাবে। [বিস্তারিতভাবে দেখুন, করিম, *যশোর জেলায় নীল আন্দোলন*, পৃ. ৪৪-৪৫।] এমনকি ১৭৯৪ সালে প্রণীত আইনে জমিদারদের কারান্তরীণ হতে অব্যাহতি দেওয়ার কথা বলা হলেও উক্ত আইনে স্পষ্ট করে বলা হয় যে অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জমিদারের গোটা জমিদারি বিক্রি করার পরও যদি বকেয়া রাজস্ব পুরোটা উসুল না হয় তাহলে তাকে কয়েদ করে রাখা যাবে। [দেখুন, Roy, *The Law of Revenue Sales*, p. xxxix; ইসলাম, *ঔপনিবেশিক শাসনকালে চট্টগ্রামের ভূমিব্যবস্থা*, পৃ. ৯১।] সুতরাং জমিদাররা চূড়ান্তভাবে সরকারের নিপীড়ন-নির্যাতন হতে অব্যাহতি পেয়েছিল ১৭৯৯ সালের সপ্তম আইনে।

অর্থাৎ ১৭৯৯ সালের সপ্তম আইনে জমিদার বকেয়া খাজনার দায়ে কৃষকের ওপর শোষণ ও নির্যাতনের বৈধ অধিকার লাভ করেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনমালের প্রথম 'কালাকানুন' ছিল এই আইন। প্রধানত কৃষক নির্যাতনের বিধি এতে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে এটি 'কালাকানুন' সপ্তম (সাধারণের কাছে ভয়ংকার হফতম) আইন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। খোদ ইংরেজ লেখকদের রচনা এবং বিভিন্ন সরকারি রিপোর্টেও এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এই আইনে কৃষক সম্পর্কে যেসব বিধিনিষেধ ইতোপূর্বে জমিদারের ওপর আরোপ করা হয়েছিল তা প্রত্যাহৃত হয়ে কৃষকদের ওপর জমিদারদের স্বৈরতন্ত্রী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় (এই আইনের কৃষক শোষণ ও নিপীড়ন সম্পর্কিত ধারা-উপধারাগুলো দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। এই আইনে জমিদার ও কৃষকের মধ্যেকার ইতোপূর্বে বিদ্যমান সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এর দ্বারা অনাদায়ী খাজনার জন্য আদালত বা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের আদেশ ব্যতিরেকেই কৃষককে গ্রেপ্তার, তার জমির ফসল, লাঙ্গল-গরু এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার অধিকার জমিদাররা অর্জন করেছিল। সিরাজুল ইসলাম সহমত পোষণ করে মন্তব্য করেন, "Under Regulation 7 of 1799, zamindars were empowered to arrest and confine defaulting tenants and to distrain their property without waiting for the court's permission."[49] এর মাধ্যমে জমিদাররা কৃষকদের শোষণ ও নিপীড়নের যে বৈধ অধিকার পেয়েছিল তা প্রয়োগে তারা বিশেষ পারদর্শিতাও প্রদর্শন করেছিল। এভাবে বাকি খাজনার দায়ে কৃষককে উচ্ছেদ, গ্রেপ্তার এবং সম্পত্তি ক্রোকের ক্ষমতার ব্যাপক ও যথেচ্ছ প্রয়োগের ফলে কৃষকের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটেছিল।[৫০] এমনকি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধানে খোদকাশ্‌ত্‌ কৃষকের স্থায়ী ও উত্তরাধিকারীসহ ভূমিতে শাশ্বত অধিকার স্বীকৃত হলেও এই আইনে তাদের অধিকার সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করায় খোদকাশ্‌ত-পায়কাশ্‌ত-কোরফা[৫১] ও বর্গাদারসহ সকল কৃষক জমিদারের ইচ্ছাধীন কৃষকে পরিণত হয়েছিল।[৫২] ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়,

> The situation that developed led to the passing of the notorious 'Haptam' (Regulation VII of 1799) by which the zamindars were vested with wide and arbitrary powers of distraint. To the Government of that time, it was an administrative necessity to have a stringent law of distraint in order to safeguard their revenue; but it is generally agreed that it was a mistake to arm the zamindars with such drastic powers without first enquiring into the root cause of the trouble, which was, that the rights of the khudkasht raiyats had been left undefined.[53]

নিঃসন্দেহে এই আইনের বিধান বলে জমিদাররা কৃষকের ওপর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে খাজনা আদায় করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এর ফলে একদিকে সরকারের রাজস্ব আদায় নিশ্চিত হয়েছিল এবং

---

[৪৯] Islam, *Bengal Land Tenure*, p. 16.

[৫০] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. ৬-৭।

[৫১] প্রাচীনকালে স্থায়ী ও অস্থায়ী রায়ত বা কৃষকের শ্রেণি বিভাজন থাকলেও মুগল আমল হতে বাংলার কৃষকরা ছিল প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত : (১) খোদকাশ্‌ত্‌ কৃষক (permanent, residential and hereditary occupancy raiyat) এবং (২) পায়কাশ্‌ত কৃষক (non-residential or temporary raiyat, tenants-at-will)। খোদকাশ্‌ত্‌ কৃষক হলো যে কৃষক চিরকাল আপন পূর্ব পুরুষের বসত ভিটায় বাস করে উত্তরাধিকারক্রমে নিজ দখলিস্বত্ব জমিতে চাষ আবাদ করে। খোদকাশ্‌ত্‌ কৃষকেরা পুরুষ পরম্পরায় এক স্থানে বাস করে উত্তরাধিকারক্রমে আপন জমিতে দখলিস্বত্ব ভোগ করে; এদের সমষ্টিই প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ গঠিত হয়েছিল। দেশাচার অনুসারে এটা চির ব্যবহার সিদ্ধ ব্যবস্থা দাঁড়ায় যে খোদকাশ্‌ত্‌ কৃষকেরা আপন দখলিস্বত্ব জমি ত্যাগ করতে পারবে না; আবাদ বিষয়ে প্রথানুরূপ না চলে অন্য প্রকার শস্যের চাষ করলে তাদের স্বত্ব বিনষ্ট হবে; কিন্তু সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে তাদের উচ্ছেদ করা যাবে না; জমিদারেরা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য কিছু বেশি গ্রহণ করবেন। এই দখলিস্বত্ব প্রজাগণের উত্তরাধিকারীতেও বর্তাবে। খোদকাশ্‌ত্‌ প্রজার স্বত্ব দখলের সঙ্গে সঙ্গে জমি আবাদ করবারও বাধ্যবাধকতা ছিল। অন্যদিকে, পায়কাশ্‌ত বা অস্থায়ী কৃষক হলো যে কৃষকের ঐরূপ স্বত্ব দখল ছিল না; অন্য স্থান হতে এসে চাষ আবাদের জন্য জমি গ্রহণ করে এবং চাষাবাদের মৌসুম শেষে নিজের এলায় ফিরে যায়। খোদকাশ্‌ত্‌ ও পায়কাশ্‌ত কৃষকের অধীন থেকে যারা চাষ করতো তারা কোরফা প্রজা হিসেবে পরিচিত ছিল। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. I, p. 11; Islam, *Permanent Settlement*, pp. 5; W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Dacca, Bakarganj, Faridpur, and Maimansinh*, Volume V (London : Trubner & Co., 1873), pp. 99-100; ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১১৫ ও ১২৬; বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃ. ৫২৫-৫২৬; শর্মা, প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, পৃ. ১৬২-১৬৩।

[৫২] এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, Islam, *Permanent Settlement*, pp. 64-66.

[৫৩] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. I, p. 21.

অন্যদিকে জমিদারি হস্তান্তরও হ্রাস পেয়েছিল।[৫৪] এটি প্রণয়নের পর থেকে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের পূর্ব পর্যন্ত জমিদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ছিল অপ্রতিরোধ্য। এমনকি, ১৮৫৯ সালের খাজনা আইনও তাদের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস করতে ব্যর্থ হয়েছিল। উল্লেখ্য, যদিও খাজনা আইন কৃষকের জন্য ম্যাগনাকার্টা[৫৫] হিসেবে পরিচিত ছিল এবং খাজনা আইনে দখলিস্বত্ববান কৃষকের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন ব্যতীত খাজনা বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে জমিদাররা খাজনা বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছিল।[৫৬] বস্তুত, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখার উদ্দেশ্যে জমিদারদেরকে খাজনা বৃদ্ধির ক্ষমতাদান এবং শাসকের নৈতিক সমর্থন অর্জনের কারণে জমিদাররা প্রচণ্ড শক্তিশালী ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল। এর ফলে খাজনা আইনের পর থেকে একদিকে জমিদাররা স্বৈরাচারী হয়ে উঠে এবং অন্যদিকে কৃষকরা জমিদারদের শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যায়। তবে জমিদারদের শোষণ ও নিপীড়ন মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ শুরু করেছিল। ঔপনিবেশিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে অনেকটা বাধ্য হয়েই সরকার ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করেছিল। এই আইনে জমিদার ও কৃষকের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমি বিরোধ হ্রাস করে কৃষক অসন্তোষ নিরসনের উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক, আইনগত ও বিচার বিষয়ক বিধিসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল।[৫৭] উপরন্তু, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে প্রথমবারের মতো ভূমিস্বত্বের ওপর স্বত্বাধিকারী ও স্থায়ী কৃষককে সীমিত অধিকার প্রদান করা হলেও জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা খুব বেশি হ্রাস পায়নি। অর্থাৎ এই আইনের পরও ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন থাকে। উল্লেখ্য, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকের খুব সামান্যই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ কারণে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পর কৃষকরা খুশি না হলেও প্রধানত জমিদার ও হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রচার করে যে এর মাধ্যমে জমিদার ও কৃষক উভয় পক্ষই লাভবান হয়েছে। শুধু তাই নয়, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে আবওয়াব আদায় সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে জমিদাররা নিয়মিতভাবে আবওয়াব নেওয়া অব্যাহত রেখেছিল।[৫৮] সুফিয়া আহমেদের মতে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদারদের সঙ্গে সরকার বাধ্য হয়ে সমঝোতা করতে গিয়ে কৃষকদের খুব বেশি সুবিধা দিতে পারেনি, শুধুমাত্র চলতি আইনের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল।[৫৯] তবে একথাও ঠিক যে এটি প্রয়োগে পূর্বের ন্যায় শোষিত ও নিপীড়িত কৃষকের নিকট হতে বলপূর্বক খাজনা আদায়ের পথ অংশত রুদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এরপরই সরকার বিশ শতকের প্রথম দশকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় জমিদারদের পাশে পেতে ১৯০৭ সালে নতুন করে একটি আইন জারির মাধ্যমে জমিদারদেরকে অতিরিক্ত খাজনা-কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করে। এ কারণে বাংলার জমিদারগোষ্ঠী প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন জানালেও পরবর্তীকালে তারা আন্দোলন থেকে নিজেদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়।[৬০] এমনকি, ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণীত হলেও জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির অধিকার ও তাদের আধিপত্য হ্রাস পায়নি।[৬১] বস্তুতপক্ষে, বিশ শতকের ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একদিকে শাসনকর্তৃপক্ষ প্রধানত ঔপনিবেশিক স্বার্থে জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রেখে তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিল এবং অন্যদিকে জমিদাররাও সরকারি সমর্থন অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ ও প্রভাব-

---

[৫৪] করিম, *যশোর জেলায় নীল আন্দোলন*, পৃ. ৪৫।
[৫৫] নীলমনি মুখার্জী ১৮৫৯ সালের আইনকে 'ম্যাগনা কার্টা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিতভাবে দেখুন, Mukherjee, *Bengal Zamindar,* p. 226.
[৫৬] ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১১৫-১১৬।
[৫৭] চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম*, পৃ. ৫৪।
[৫৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Sachse, *Bengal District Gazetteers : Mymensingh,* p. 108.
[৫৯] Ahmed, *Muslim Community,* p. 87.
[৬০] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ১৮৩।
[৬১] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫০-৫১।

প্রতিপত্তি অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় জমিদাররা প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ জমিদারদেরকে শুধুমাত্র সরকারি নিপীড়ন হতেই নিষ্কৃতি দেয়নি, বরং কৃষকের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন করে খাজনা আদায়, জমিদারি রক্ষা ও নিজেদের আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যাপক সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র, দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিয়াল রাখার বৈধ অনুমোদনও প্রদান করেছিল (সারণি ৩)।[৬২] সারণি ৩ থেকে দেখা যায় যে ১৮৮৮ সালের ২১ ডিসেম্বর হতে ১৯৩৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত জমিদাররা বিপুল সংখ্যক অস্ত্র ও লাঠিয়াল রাখার বৈধ অনুমোদন লাভ করে। জমিদাররা নিজেদের আত্মরক্ষার এবং জমিদারি রক্ষায় এত অধিক পরিমাণ অস্ত্র ও লাঠিয়াল রাখার অনুমতি পাওয়ায় স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে উক্ত সময়ে জমিদাররা খুবই প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে জমিদাররা এসব অস্ত্র এবং লাঠিয়ালদের নিজেদের আত্মরক্ষায় ও জমিদারি রক্ষায় ব্যবহার করেছিল। শুধু তাই নয়, এসব অস্ত্র এবং লাঠিয়াল দ্বারা জমিদাররা কৃষকের ওপর শোষণ ও নিপীড়নও চালিয়েছিল। জমিদাররা এসব অস্ত্র ব্যবহার করে কৃষককে হত্যা করতেও দ্বিধা করতো না। দৃষ্টান্ত হিসেবে তৎকালীন ময়মনসিংহের জামালপুর ও কিশোরগঞ্জের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। ১৯০৭ সালে জামালপুরের জমিদাররা মেলায় গরু প্রতি চৌদ্দ আনা বিক্রয় কর ধার্য করলে কৃষকরা প্রতিবাদ করে এবং তাদের অক্ষমতাবশত কর দিতে অস্বীকার করে। জমিদাররা ক্ষিপ্ত হয়ে কৃষকদের সমস্ত গরু আটক করে এবং তাদের ওপর লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে নির্যাতন শুরু করে। এর ফলে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয়। এই সংঘর্ষের সময় জমিদারের লাঠিয়ালরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করেছিল। এমনকি, জামালপুরের উক্ত হিন্দু জমিদাররা 'হিন্দুদের রক্ষার নামে' সাহায্যের আবেদন করলে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রধান নায়ক অরবিন্দু ঘোষ কর্তৃক কয়েকজন চরমপন্থীকে 'কালি মায়ের বোমা' খ্যাত তিনটি বোমা এবং কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ জামালপুরে পাঠানো হয়। এসব চরমপন্থীরা গুলি ও বোমা বর্ষণ করে অসংখ্য কৃষককে হতাহত করে।[৬৩] একইভাবে ১৯৩০ সালে কিশোরগঞ্জের জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র কৃষকদের ওপর আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা অনেক কৃষককে হতাহত করেছিল।[৬৪] সুতরাং প্রথমত, জমিদাররা সরকারের নিকট থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত বৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করে কৃষকদের হতাহত করতো এবং দ্বিতীয়ত, এই বৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি প্রয়োজনে ভাড়া করা আগ্নেয়াস্ত্র, এমনকি বোমার ব্যবহার করেও জমিদাররা নিরস্ত্র কৃষকদের হতাহত করে নিজেদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রশ্ন হলো ঔপনিবেশিক শাসনামলে কৃষকদের ওপর এতো শোষণ ও নিপীড়নের পরও বাংলায় বিশেষত পূর্ব বাংলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়নি কেন? সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে প্রধানত জমিদারদের নিকট বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র মজুত থাকায় কৃষকদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত শোষণ ও নিপীড়ন হলেও তারা জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহস পায়নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে ঢাকার ভাগ্যকূলের জমিদার রাজা জানকী নাথ রায়ের নিকট ১১টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১২ জন লাঠিয়াল, ঢাকার জমিদার নবাব খাজা হাবিবুল্লাহর নিকট ২১টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২৫ জন লাঠিয়াল, ময়মনসিংহের জমিদার রাজা জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরীর নিকট ২৮টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৮ জন লাঠিয়াল, ময়মনসিংহের জমিদার বাবু ব্রোজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর নিকট ৩৩টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৫ জন লাঠিয়াল, রাজশাহীর জমিদার মহারাজা জগীন্দ্র নাথ রায়ের নিকট ৪৩টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৮৩টি দেশীয় অস্ত্র ও ৫০ জন লাঠিয়াল, রাজশাহীর দীঘাপাতিয়ার জমিদার কুমার প্রতীভা নাথ রায়ের নিকট ৬৩টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৫৬টি দেশীয় অস্ত্র ও

[৬২] *List of Zamindars exempted*, pp. 1-21.
[৬৩] বিস্তারিতভাবে দেখুন, চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ১৮০-১৮৩।
[৬৪] Chatterji, *Bengal divided*, PP. 92-93.

৫০ জন লাঠিয়াল, দিনাজপুরের জমিদার মহারাজা জগদীশ নাথ রায়ের নিকট ৭৩টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৩২টি দেশীয় অস্ত্র ও ২৯ জন লাঠিয়াল, রাজশাহীর প্রতিসরের জমিদার বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের নিকট ২৫টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১২৩টি দেশীয় অস্ত্র ও ১৫ জন লাঠিয়াল ছিল। এভাবে দেখা যায় যে পূর্ব বাংলার ৪৫ জন জমিদার বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র, দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিয়াল রাখার বৈধ অনুমোদন লাভ করেছিলেন (সারণি ৩)।[৬৫] জমিদারদের এই বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র, দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিয়ালের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো শক্তি-সাহস ও ক্ষমতা কোনোটিই কৃষকদের ছিল না। বস্তুতপক্ষে, ইংরেজ রাজত্বকালে জমিদারিতে কৃষক অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তা দমন এবং জমিদারি রক্ষায় উক্ত অস্ত্র ও লাঠিয়ালদের ব্যবহার করা হতো। এ কারণে বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় জমিদাররা কৃষকদের ওপর অত্যাধিক মাত্রায় শোষণ ও নিপীড়ন করলেও সেই তুলনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষক বিদ্রোহ বা কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয় নি।

৩.২.৪ ভোট রাজনীতির প্রবর্তন ও হিন্দু-মুসলিম জমিদারদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিণতি

ভারতীয় উপমহাদেশে একজন ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলেও জমিদারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে জমিদার হিসেবে তার পরিচয় মুখ্য ছিল। এ কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর একজন জমিদারের নিকট ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের সমর্থক ও সহযোগী। স্বাভাবিকভাবেই সিপাহী বিদ্রোহের সময় পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জমিদাররা মূলত ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্রিটিশ সরকারকে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন।[৬৬] ১৮৮৫ সালে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯০৬ সালে জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, এমনকি, ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের অধীনে ভোট রাজনীতি প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের জমিদারদের মধ্যে মূলত ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থগত কারণে সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। এসময়ে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় ধর্মের জমিদাররা অভিন্ন স্বার্থগত কারণে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। সুফিয়া আহমেদ কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে মুসলমানদের সম্পৃক্ততা দেখাতে গিয়ে বলেন যে ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বাংলার মোট ৩,২৯৮ জন সদস্য কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। এর মধ্যে মুসলমান সদস্য ছিলেন মাত্র ১৫৬ জন। এর মধ্যে জমিদার ছিলেন ৫৮ জন এবং পূর্ব বাংলার মুসলমান জমিদার ছিলেন ১৬ জন (সারণি ৪)।[৬৭] তবে যদিও এই ১৬ জন জমিদার পূর্ব বাংলা থেকে কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু তারা মূলত ছিলেন কলকাতার অধিবাসী। এরা ছিলেন পূর্ব বাংলার অনুপস্থিত মুসলিম জমিদার। উল্লেখ্য, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর শুধুমাত্র বর্ধমান জেলার একজন মুসলিম জমিদার ব্যতীত অন্য কেউ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেননি। এসময় বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলমান জমিদারদের কংগ্রেস বিমুখিতা পরিলক্ষিত হলেও হিন্দু-মুসলিম জমিদারদের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক বহাল ছিল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় সরকারের নীতি কৌশলের কারণে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের জমিদাররা প্রধানত ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষকে সমর্থন করে। একদিকে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের কল্যাণ এবং উন্নতির কথা চিন্তা করে ঢাকার জমিদার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের জমিদার এ কে গজনভী, টাঙ্গাইলের ধনবাড়ির জমিদার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, বরিশালের জমিদার মীর

[৬৫] *List of Zamindars exempted*, pp. 1-21.

[৬৬] বিস্তারিতভাবে দেখুন, চক্রবর্তী, *সিপাহিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, পৃ. ১২৩-১২৬; কাউসার, "*সিপাহী বিদ্রোহে পূর্ববঙ্গের জমিদারদের সরকার পক্ষাবলম্বনের কারণ অনুসন্ধান*", পৃ. ৪১-৪৫।

[৬৭] Ahmed, *Muslim Community in Bengal*, pp. 299-319.

মোতাহার হোসেন প্রমুখ মুসলমান জমিদাররা লর্ড কার্জনের পূর্ববঙ্গ সফরের পর বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জানান।[৬৮] অন্যদিকে প্রাথমিক পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনকে হিন্দু জমিদাররা সমর্থন করলেও ১৯০৭ সালে সরকার নতুন ভূমি আইন জারি করে জমিদারদেরকে অতিরিক্ত খাজনা-কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করায় তারা আন্দোলন থেকে নিজেদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন এবং ২০০ জন হিন্দু জমিদার আনুগত্য জ্ঞাপনপূর্বক সরকারকে সমর্থন জানান।[৬৯] অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষ বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করে 'ভাগ করে শাসন কর' নীতি কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও প্রধানত ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থে উভয় ধর্মের জমিদাররা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ।

উল্লেখ্য, ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনে সর্বপ্রথম সম্প্রদায়গত প্রতিনিধি নির্বাচন বা মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনী নীতি গৃহীত হয়েছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার এই পৃথক নির্বাচনী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দল সরকারের এই নীতির তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়, এর বিরোধিতা করে এবং তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।[৭০] কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদগুলোতে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের স্বীকৃতি প্রদান করেন। লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় ধর্মের জমিদার নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন রচিত হয়েছিল।[৭১] এছাড়াও বিশ শতকের বিশের দশকে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার নেতৃবৃন্দের মধ্যেকার সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল গান্ধীর নেতৃত্বে পারিচালিত খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে একসঙ্গে অংশগ্রহণ এবং উভয়ের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে বেঙ্গল প্যাক্ট নামে চুক্তি সম্পাদন করা।[৭২] সুতরাং বলা যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার পর থেকে বিশ শতকের বিশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রধানত ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের জমিদারদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় ছিল। ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে এই সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির সম্পর্কের প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। এর ফলে একদিকে উভয় ধর্মের জমিদাররাই ভূমিস্বত্বের ওপর নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বহাল রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যদিকে ইংরেজ রাজত্বকালে বিভিন্ন সময় সরকারের ভূমিস্বত্ব নীতি কৌশলে পরিবর্তন সত্ত্বেও উভয় ধর্মের জমিদাররা সরকারের আস্থাভাজন হিসেবে বিভিন্ন পদ-পদবি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে বাংলা তথা ভারতে সর্বপ্রথম ভোট রাজনীতির প্রবর্তন ও প্রদেশে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভোট রাজনীতির সূচনায় জমিদারদের মানসিকতায়ও পরিবর্তন ঘটেছিল। বস্তুতপক্ষে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে ভোটের রাজনীতির প্রবর্তন পর্যন্ত ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থে হিন্দু ও মুসলিম জমিদারদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলেও ভোট রাজনীতির সূচনায় প্রধানত রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যকার

---

[৬৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, ম্যাকলেন, *"বঙ্গবিভাগ, ১৯০৫"*, পৃ. ১২৩-১২৮; মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, পৃ. ২১১; ইসলাম, হক, *ভারতের মুসলমান*, পৃ. ১৩০-১৪২; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ.৬৮-৭০; মল্লিক, *আধুনিক ভারতের রূপান্তর*, পৃ. ৩৪৬-৩৫৫।

[৬৯] বিস্তারিতভাবে দেখুন, চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ১৮৩; মামুন, *পূর্ববঙ্গের সমাজ জীবনের কয়েকটি দিক*, পৃ. ২৩২; হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ১৩৮-১৩৯; মল্লিক, *আধুনিক ভারতের রূপান্তর*, পৃ. ৩২৮-৩৩২; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ৪৯-৫০।

[৭০] বিস্তারিতভাবে দেখুন, হক, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

[৭১] বিস্তারিতভাবে দেখুন, রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ৭২-৭৫; হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ১৫৯-১৬৭।

[৭২] বিস্তারিতভাবে দেখুন, হক, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, পৃ. ২৩৬-৩৫১; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ৭৫-৮৫; হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ১৭২-১৮৩ ও ২২৩-২২৫।

সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। বিশ শতকের বিশের দশক থেকে উভয় সম্প্রদায়ের জমিদারদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরবর্তীতে তা চরম পর্যায়ে পৌঁছে সাম্প্রদায়িক বিভেদের চূড়ান্ত ফলস্বরূপ অসংখ্য দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

উল্লেখ্য, বিশ শতকের বিশের দশকে এবং ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে প্রধানত দু'টি কারণে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। প্রথমত, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯২৭ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) বিল নিয়ে দু'পক্ষের পরস্পরবিরোধী অবস্থান। সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে হিন্দু জমিদাররা প্রভাব বিস্তার করে বিলে হক শোফা অধিকার (pre-emptive right) ও সেলামি নামে হস্তান্তর ফি বহাল রাখতে সক্ষম হয়।[৭৩] উল্লেখ্য, হক শোফা অধিকার উভয় ধর্মের জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় প্রযোজ্য হলেও বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জমিদার হিন্দু সম্প্রদায়ের হওয়ায় এখানে তাদের স্বার্থ রক্ষাই ছিল মুখ্য। দ্বিতীয়ত, ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠিত হলে বাংলার পক্ষ হতে কমিশনকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে ১৯২৮ সালের ৩ আগস্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল এ কে ফজলুল হক, আবদুর রহিম, আবদুল করিম, কে জি এম ফারুকী, নসিপুরের মহারাজা, ময়মনসিংহের মহারাজা এবং ডব্লিউ. এল. ট্রোভার্সকে নিয়োগ করে। কমিশনের সদস্য হিসেবে ফজলুল হক যৌথ নির্বাচনের বদলে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের সুপারিশ করেন। এছাড়াও তৎকালীন বিশিষ্ট মুসলিম নেতা সোহরাওয়ার্দীও কমিশনের নিকট একই ধরনের সুপারিশ করে বলেন, "Joint electorates cannot compose religious differences. Moslems are not prepared to give up their religion for the sake of nationalism."[74] মুসলিম নেতৃবৃন্দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত সাইমন কমিশন মুসলমানসহ সকল সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের সুপারিশ করে।[৭৫] কিন্তু নেহরু রিপোর্টের প্রস্তাবে দেখা যায় যে ভারতের সর্বত্র যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী নীতি গৃহীত হলেও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন দেওয়া হয় একমাত্র কেন্দ্রে এবং সেইসব প্রদেশে (বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ ব্যতীত) যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু ছিল। উল্লেখ্য, বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্যে আসন সংরক্ষণের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন হিন্দু জমিদার নেতৃবৃন্দ। ১৯২৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় সর্বদলীয় কনভেনশন সভায় নেহরু রিপোর্টের ওপর মুসলিম লীগের পক্ষে কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা হলেও তা সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সদস্যদের ভোটে বাতিল হয়ে যায়। উপরন্তু, হিন্দু মহাসভার প্রধান নেতা মালবীয়র উত্থাপিত জমিদারি স্বার্থ রক্ষার প্রস্তাব নেহরু রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উক্ত সভায় যুক্ত প্রদেশের কিষাণ সভার সদস্য বাবু রামচন্দ্র এবং বাংলার দু'জন প্রতিনিধি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নেহরু রিপোর্ট থেকে তা প্রত্যাহারের সুপারিশ করেন। উক্ত সভায় তাঁরা প্রস্তাব করেন, "নতুন রাজ্য বাংলার অন্যতম প্রধান কর্তব্য হবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ করা।" কিন্তু হিন্দু মহাসভার শক্তিশালী নেতা মালবীয় এবং এম. আর. জয়করসহ হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের আপত্তি এবং হুমকির মুখে শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র, সেনগুপ্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমিদারি সংক্রান্ত প্রস্তাব নাচক করে দেওয়া হয়। এর পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন বাংলার হিন্দু জমিদার নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য, উক্ত সভায় মুসলিম লীগের সংশোধনী প্রস্তাবও নাকচ করে দেওয়া হয়। এ কারণে মুসলমান নেতৃবৃন্দ সর্বদলীয় সভা ত্যাগ করেন। অতঃপর সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সদস্যদের ভোটে নেহরু রিপোর্ট

[৭৩] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Bose, *Agrarian Bengal*, pp. 150-151; মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৫০-৫১; হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ২২৫।

[৭৪] Sen, *Muslim Politics in Bengal*, p. 62.

[৭৫] Sen, *Muslim Politics in Bengal*, p. 62.

গৃহীত হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ১৯২৯ সালের ১ জানুয়ারি দিল্লিতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে জিন্নাহ মুসলমানদের পক্ষ থেকে চৌদ্দ দফা দাবি উত্থাপন করেন এবং তা কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত হয়।[৭৬] এর ফলে হিন্দু ও মুসলিম জমিদারদের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির স্থলে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ কৃষক ছিলেন মুসলমান এবং অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু। একটি হিসেব থেকে দেখা যায় যে সরকার পূর্ব বাংলার যে ৪৫ জন জমিদারের নামে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দিয়েছিলেন তারমধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন মুসলমান জমিদার (সারণি ৩)।[৭৭] উল্লেখ্য, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনেপ্রত্যক্ষ ভোটের রাজনীতির সূচনায় বাংলার রাজনীতি ক্রমশ কৃষক নির্ভর হয়ে উঠেছিল। এই পর্যায়ে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলের হিন্দু নেতারা হয়ে উঠেছিলেন হিন্দু জমিদারদের পৃষ্ঠপোষক এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ হয়ে উঠেছিলেন কৃষক সমর্থক। অবশ্য বিশ শতকের ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে পূর্বের ন্যায় উভয় ধর্মের জমিদারদের গুরুত্ব এবং গ্রহণযোগ্যতা পূর্ববৎ ছিল। এ কারণে ১৯৩০ সালে জমিদার প্রভাবিত স্বরাজ পার্টি সরকারি দলের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভা থেকে বেরিয়ে এলেও সরকার প্রজা সমিতি এবং জোতদার নেতা ফজলুল হককে বাদ দিয়ে সরকারপন্থী মুসলিম জমিদার খাজা নাজিমুদ্দিন ও কে. জি. এম. ফারুকী এবং রাজশাহীর হিন্দু জমিদার কুমার শিব শাকারেশ্বর রায়কে মন্ত্রী পদে মনোনয়ন দিয়েছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচন পর্যন্ত এই জমিদার নেতৃবৃন্দই মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[৭৮] অর্থাৎ বিশ শতকের বিশের দশকে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের জমিদারদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটন হলেও ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষের নিকট উভয় ধর্মের জমিদাররা আনুকূল্য লাভ করেছিল।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও এ আইনে ভোটাধিকারও সম্প্রসারিত হয়েছিল। এ আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন (এ সম্পর্কে এই অধ্যায়ের পরের দিকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ফজলুল হক কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। উল্লেখ্য, প্রথমে হিন্দু জমিদার প্রভাবিত কংগ্রের দলের সঙ্গে হকের দল কোয়ালিশন সরকার গঠনের উদ্যোগ নিলেও প্রধানত কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরোধিতার কারণে সে উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। পরে হকের কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে।[৭৯] কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভা কার্যত জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় পরিণত হয়েছিল।[৮০] তাঁর এই কোয়ালিশন সরকার গঠনেও মুসলমান ও হিন্দু জমিদারদের দূরত্ব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। তবে হিন্দু জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দল অংশগ্রহণ না করলেও তফসিলি হিন্দু বা সিডিউল কাস্ট এবং অ-কংগ্রেসী বর্ণ হিন্দুদের প্রতিনিধিসহ স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত একাধিক হিন্দু জমিদার সদস্য হকের কোয়ালিশন সরকারে যোগদান করেছিলেন।[৮১] ফজলুল হক সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার ১১ সদস্যের মধ্যে ৬ জন ছিলেন মুসলমান এবং ৫

[৭৬] বিস্তারিতভাবে দেখুন, ঘোষ, *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি*, পৃ. ১২০-১২২; হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ১৯২-১৯৪; সরকার, *আধুনিক ভারত*, পৃ. ২৬৬-২৬৯।

[৭৭] দেখুন, *List of Zamindars exempted*, pp. 1-21.

[৭৮] Bazlur Rahman Khan, *Politics in Bengal, 1927-1936* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1987), p. 29; হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ২২৫-২২৭।

[৭৯] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Shaikh, "*Muslims and Political Representation in Colonial India* ", p. 90; Chatterji, *Bengal divided*, P. 92-93; ঘোষ, *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি*, পৃ. ১৯৯; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১১০-১১১; হক, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, পৃ. ৫৪১; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৫৮।

[৮০] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, দশম সংস্করণ, ২০০২), পৃ. ১৪৭।

[৮১] বিস্তারিতভাবে দেখুন, হক, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, পৃ. ৫৪১; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১১০-১১১।

জন ছিলেন হিন্দু সদস্য (৩ জন বর্ণ হিন্দু এবং ২ জন তফসিলি হিন্দু)। এই মন্ত্রিসভার মধ্যে ৬ জন ছিলেন জমিদার, ১ জন পুঁজিপতি ও ৪ জন ছিলেন আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ।[৮২] হক সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার ৬ জন জমিদার সদস্যের পাশাপাশি সরকারি দলের হুইপ হিসেবেও নিয়োগ পেয়েছিলেন জমিদার খাজা শাহাবুদ্দিন।[৮৩] এমনকি ফজলুল হক সরকারের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায়ও নবাব খাজা হাবিবুল্লাহর মতো বিখ্যাত জমিদার সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ছিল।[৮৪] উল্লেখ্য, মুসলিম লীগের মনোনীত ও নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে বেশির ভাগ সদস্য ছিলেন জমিদার। এমনকি জোতদার প্রভাবিত কৃষক প্রজা পার্টির মনোনীত ও নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যেও দু'এক জন জমিদার সদস্য ছিলেন। জয়া চ্যাটার্জীর মতে জোতদারদের নেতৃত্বে গঠিত সরকারে জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের জমিদার সদস্যদের যোগদান ছিল লাভ জনক। ঢাকার নওয়াবদের মতো উচ্চ শ্রেণির মুসলমানদেরকে তাদের এস্টেটের আর্থিকক্ষতিপূরণ হিসেবে পুরস্কার স্বরূপ বিভিন্ন পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের রাজনৈতিক সুবিধা না থাকায় হিন্দু জমিদাররা আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করেছিলেন। তাঁর মতে মুসলমান জমিদাররা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পদ-পদবি পেলেও হিন্দু জমিদাররা সবদিক থেকেই বঞ্চিত হয়েছিলেন।[৮৫] উল্লেখ্য, ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃত্বে গঠিত কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভার ৬ জন জমিদার সদস্যের মধ্যে হিন্দু জমিদার সদস্য মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী[৮৬] ছিলেন অন্যতম।[৮৭] কিন্তু জয়া চ্যাটার্জী তাঁর বক্তব্যে এটা স্পষ্ট করে বলেননি যে মুসলমান জমিদারদের ন্যায় হিন্দু জমিদার সদস্যদেরও কোয়ালিশন সরকারে যোগদানের কারণ ছিল একই। অর্থাৎ পদ-পদবি, পদমর্যাদা, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত প্রাপ্তি। সুতরাং মুসলমান জমিদাররা যেভাবে ক্ষতিপূরণ হিসেবে পদ-পদবি পেয়ে লাভবান হয়েছিলেন সেই একইভাবে হিন্দু জমিদাররাও পদ-পদবি পেয়ে লাভবান হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ও ব্যক্তিগত অর্জনের হিসেব থেকেই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার সদস্যরা সরকারে যোগদান করেছিলেন। হকের সরকারে যোগদান করায় ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নের সময় হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের জমিদাররা যতটুকু ছাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল তা তাঁরা দিয়েছিলেন তাদের রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত প্রাপ্তির হিসেব থেকেই। আবুল মনসুর আহমেদের মতে ফজলুল হক সরকারের জমিদার সদস্যরা ঐক্যমত পোষণ করে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার শর্তে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন।[৮৮] একইকারণে তারা ভূমি রাজস্ব কমিশন বা ফ্লাউড কমিশন গঠনকেও সমর্থন করেন। ১৯৩৯ সালের কৃষিজাত পণ্যের জন্য সরকারি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাট প্রতিষ্ঠার জন্য লাইসেন্স প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিল মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়। এগুলো ছিল জমিদারদের আয়ের একটি অন্যতম উৎস।[৮৯] এছাড়াও ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মহাজনী আইনে অর্থলগ্নী ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিদের লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয় এবং সর্বোচ্চ সুদের হার শতকরা ৮ ভাগ নির্ধারণ করা হয়। সুদ ব্যবসার কর্তৃত্ব ছিল প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের। এ কারণে ১৯৪০ সালের আইনে মহাজনী ব্যবসায় নিয়োজিত হিন্দুদেরকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। সুদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রণীত আইনে অল্প কিছু সংখ্যক

---

[৮২] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *রশিদ*, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১১১-১১২।
[৮৩] ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ১০, পৃ. ২৭২।
[৮৪] *রশিদ*, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১১৪-১১৫।
[৮৫] Chatterji, *Bengal divided*, pp. 105-107.
[৮৬] মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী ছিলেন কাশিম বাজারের মহারাজা স্যার মাহিন্দ্র চন্দ্র নন্দীর পুত্র। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি ছিলেন কাশিম বাজারের জমিদার। রাজনীতির শুরুতে তিনি হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের আগে ও পরে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হন ও হকের সরকারে যোগদান করেন। দেখুন, https://en.wikipedia.org/wiki/Srish_Chandra_Nandy, Accessed on 12 June 2019.
[৮৭] রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১১১-১১২।
[৮৮] আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ১৪৮।
[৮৯] জয়া চ্যাটার্জী (অনুবাদ : আবু জাফর), *দেশ ভাগের অর্জন : বাঙলা ও ভারত ১৯৪৭-১৯৬৭*, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৬), পৃ. ১২৫।

মুসলিম জমিদারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মহাজনী আইন প্রণয়নে বাধা দিতে মন্ত্রিসভার জমিদার সদস্যরা ব্যর্থ হয়েছিলেন মূলত ঐ প্রাপ্তি থেকেই।[৯০] উপরন্তু, ভোট রাজনীতির কথা চিন্তা করেও জমিদার সদস্যরা কৃষক-প্রজার স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ের বিরুদ্ধে বাঁধা হয়ে দাঁড়াননি। আয়েশা জালালের মতে একদিকে হক-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা অনেকগুলো আইন প্রণয়ন করার ফলে কৃষকদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় এবং অন্যদিকে এসকল আইন প্রণয়নের দ্বারা জমিদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেকটাই হ্রাস পায়।[৯১] ফজলুল হক সরকারের গৃহীত কর্মকাণ্ডে জমিদারদের সমর্থন দানের পশ্চাতে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত প্রাপ্তির হিসেব থাকলেও একথাও সত্যি যে প্রধানত ভোট রাজনীতির কারণেই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জমিদারদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছিল।

উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ঐ বছরের এপ্রিল মাসে গঠিত ফজলুল হক সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভায় প্রধানত গভর্নরের বিরোধিতার কারণে কৃষক প্রজা পার্টির সম্পাদক শামসুদ্দীনকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। গভর্নর কৃষক প্রজা পার্টির অন্য একজন প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তিরও বিরোধিতা করেছিলেন। হকের প্রথম মন্ত্রিসভার ৯ সদস্যের মধ্যে ২ জন ছিলেন কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য (ফজলুল হক ও সৈয়দ নওশের আলী), ৪ জন ছিলেন মুসলিম লীগের এবং ৫ জন ছিলেন তফসিলি হিন্দু ও অ-কংগ্রেসী বর্ণ হিন্দু প্রতিনিধি, যারা ছিলেন স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত হিন্দু জমিদার সদস্য। কৃষক প্রজা পার্টির মন্ত্রিসভা গঠনের সময় গভর্নরের নেতিবাচক ভূমিকার জন্য জমিদারি প্রথা উচ্ছেদসহ প্রগতিবাদী কর্মসূচি বাস্তবায়নে হকের কৃষক প্রজা পার্টির সরকার বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯৩৭ সালের ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশনে ভোট গ্রহণের সময় শামসুদ্দীনের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টির বেশ কয়েকজন সদস্য কংগ্রেসের পক্ষ সমর্থন করেন। কিছুদিন পর ফজলুল হক কর্তৃক নির্বাচনী অঙ্গীকার ভঙ্গের অজুহাতে শামসুদ্দীনের নেতৃত্বে ২১ জন কৃষক প্রজা পার্টির প্রগতিবাদী সদস্য কোয়ালিশন সরকার থেকে পদত্যাগ করেন। তারা মুসলিম লীগের প্ররোচনায় দল থেকে পদত্যাগ করলে হক উক্ত দলত্যাগীদের ইসলামের স্বার্থের বিরোধী বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কার্যত হক জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। এই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে নতুন করে সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের দ্বারস্থ হলেও মূলত কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনীহার কারণে তা সফল হয়নি। এতে করে হক মুসলিম লীগের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ফলে হকের দল লীগের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যান। ১৯৩৭ সালের ১৫ অক্টোবর লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে ফজলুল হক লীগের মতবাদ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে লীগে যোগদান করেন। এমনকি তিনি কোয়ালিশন সরকারের সকল মুসলিম সদস্যকে লীগে যোগদান এবং লীগের পতাকাতলে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। ১৯৩৮ সালের ১৫ মার্চ তমিজউদ্দীন খানের নেতৃত্বে পুনরায় কৃষক প্রজা পার্টির ১৩ জন সদস্য কোয়ালিশন সরকার সমর্থন প্রত্যাহার করেন।[৯২] উপরন্তু, ১৯৩৮ সালের ১৮ মার্চ গান্ধী ও শরৎ বসুর প্ররোচনায় তফসিলি সম্প্রদায়ের ১৫ জন সদস্য সরকারি দল ত্যাগ করলে মুসলিম লীগের ওপর হকের নির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৮ সালের ২২ জুন আইনসভায় কৃষক প্রজা পার্টির উপনেতা ও মন্ত্রী সৈয়দ নওশের আলী কোয়ালিশন থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর এক সময়ের জোতদার প্রভাবিত কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃত্বে গঠিত ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বাস্তবে মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভার চরিত্র ধারণ করে এবং হকের মন্ত্রিসভা একতরফাভাবে

---

[৯০] আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ১৪৮।

[৯১] Ayesha Jalal, *The Sole Spokesman : Jinnah, the Muslim League and the demand for Pakistan*, (Cambridge : Cambridge Ubiversity Press,1994), p. 152.

[৯২] ১৯৩৭ সালের ২৯ জুলাই মাসে তমিজউদ্দিন খানের নেতৃত্বে ২১ জন কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য কোয়ালিশন সরকার থেকে পদত্যাগ করলে ১৯৩৭ সালের ১৫ অক্টোবর লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে ফজলুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগে যোগদান করার পর খানসহ পদত্যাগী সদস্যরা হকের কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেন।

জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের স্বার্থে আত্মপ্রকাশ করে।[৯৩] এই অবস্থায় ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে সিন্ধুতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভায় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। জিন্নাহর সভাপতিত্বে গৃহীত দ্বিজাতি প্রস্তাবে বলা হয় যে বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশের শান্তির স্বার্থে এবং প্রবাহমান সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার স্বার্থে হিন্দু ও মুসলিম-এই দু'জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য ভারতকে দু'টি ফেডারেশনে বিভক্ত করতে হবে। এর মধ্যে একটি হলো মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ফেডারেশন এবং অপরটি হলো অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ফেডারেশন। এভাবে জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের সৃষ্টি হয়।[৯৪] ১৯৪০ সালে জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রচারণা শুরু করেন।[৯৫] উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের বক্তব্যের ৫৬ বছর পূর্বে সর্বপ্রথম সৈয়দ আমীর আলী দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণার অবতারণা করেছিলেন।[৯৬] মুহাম্মদ ইনাম-উল হকের মতে সৈয়দ আমীর আলীর বক্তব্য বিশ শতকের চল্লিশের দশকে জিন্নাহর উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই তাঁর মতে সৈয়দ আমীর আলীই প্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলমানদেরকে একটি জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সৈয়দ আমীর আলীই ছিলেন দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবর্তক।[৯৭] যাহোক, ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জিন্নাহ বলেন যে ভারতের শাসনতান্ত্রিক জটিলতা সমাধানের একমাত্র পথ এই স্বীকৃতির মধ্যে যে ভারতে একটি নয় বরং দু'টি জাতি বিদ্যমান এবং মুসলমানেরা কোনো একতরফা সিদ্ধান্তের নিকট নতিস্বীকার করবে না, তারা নিজেরাই নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে। তিনি ক্রমশ মুসলিম মানসকে তাঁর মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রয়াস পান যার অর্থ হলো মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সুখী হতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ জিন্নাহর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগপন্থী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হয়। এটিই ছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। যদিও এই প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' কথাটি ছিল না তবুও এই প্রস্তাব পরবর্তীকালে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[৯৮] উল্লেখ্য, লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের পরপরই গান্ধীসহ হিন্দু নেতৃবৃন্দ এবং হিন্দুদের পরিচালিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী লাহোর প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে অভিহিত করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। এই প্রস্তাবে গান্ধী মর্মাহত হন এবং তিনি এটিকে ভারত বিভক্তির প্রস্তাব বলে নিন্দা করেন। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে *হরিজন* পত্রিকায় গান্ধী বলেন যে ভারত বিভক্তির কোনো প্রস্তাবনায় তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তিনি বলেন যে মুসলমানেরা সত্যিই যদি এটাই চায় তবে অহিংসের একজন প্রবক্তা হিসেবে জোরপূর্বক তিনি এর বিরোধিতা করবেন না। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই এক জাতিভুক্তির নিদর্শনস্বরূপ কংগ্রেস মাওলানা আজাদকে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করে।[৯৯] উল্লেখ্য, প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালি বর্ণ হিন্দুরা

---

[৯৩] বিস্তারিতভাবে দেখুন, সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ২ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৫৮-৬২।

[৯৪] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Mushirul Hasan (ed.), India's Partition : Process, Strategy and Mobilization (Delhi : Oxford University Press, Second Impression 1996), pp. 26-27; হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ২১৩।

[৯৫] সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৮ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৩৯৩।

[৯৬] ১৮৮২ সালে তিনিই সর্বপ্রথম লন্ডনের 'নাইনটিনথ সেঞ্চুরী' সাময়িকীতে উল্লেখ করেন যে পাঁচ কোটি জনগোষ্ঠী সম্বলিত অতি উঁচু স্তরের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম জাতি ভারতের প্রশাসনের সর্বদা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে হবে। ১৯০৮ সালে লন্ডনে মুসলিম লীগের এক সভায় তিনি বলেন যে হিন্দু ও মুসলিম দু'টি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঠিক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সরকারের উচিত প্রশাসনিক সংস্কারে অগ্রসর হওয়া। ১৯১২ সালে লন্ডনে এক ব্রিটিশ সমাবেশে তিনি উল্লেখ করেন যে জাতীয় কাজকর্মে হিন্দু-মুসলিম এই দুই মহান জাতির আন্তরিক সহযোগিতার মধ্যে আধুনিক ভারতের উন্নতি নির্ভরশীল। দেখুন, হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ১১৮-১১৯।

[৯৭] হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ১১৮-১১৯।

[৯৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Asim Roy, "The High Politics of India's Partition : The Revisionist Perspective", Mushirul Hasan (ed.), *India's Partition : Process, Strategy and Mobilization* (Delhi : Oxford University Press, Second Impression 1996), pp. 109-116; Shaikh, "*Muslims and Political Representation in Colonial India*", pp. 92-93; আহ্মদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ. ৪৩-৪৯; হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ২১৫-২২০; *বাংলাদেশ*, পৃ. ১২২-১২৭; আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ১৪৭।

[৯৯] হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ২১৮-২১৯।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর থেকে বাংলার নেতৃত্ব হারিয়ে ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এ কারণে তারা বাংলার মুসলিম মন্ত্রিসভার সুনামহানির জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টাও করতে থাকেন। বস্তুতপক্ষে, ভূমি ও পুঁজিতে বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়েছিল। তারা মনে করেছিল যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন বাংলার অর্থ হবে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও তাদের সম্পত্তির জাতীয়করণ। কাজেই লাহোর প্রস্তাব তাদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এ কারণে গান্ধীর বক্তব্য তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। এমনকি শ্রীরাজা গোপালাচারী এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু পাকিস্তান প্রস্তাবের যে বিশ্লেষণ করেছিলেন তাও তাদের মনোপুত হয়নি। ভারতের অন্যান্য অংশের হিন্দুদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের জমিদার নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবটিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ আছে বলেও দাবি করেন।[১০০] অন্যদিকে, পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা নতুন দিগন্তের দিকে আকৃষ্ট হয়। এই প্রস্তাবই মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক আদর্শকে গোটা ভারতের রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। মুসলিম লীগ আর ভারতের স্বাধীনতা বিরোধী থাকে না, হয়ে উঠে স্বাধীনতার দাবিদার। আবুল মনসুর আহমদের মতে একদিকে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা মুসলিম লীগের চরিত্র ধারণ করায় এই মন্ত্রিসভার গৃহীত কার্যাবলি বাংলা তথা পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণির মুসলমানদের জন্য ইতিবাচক হিসেবে দেখা হয় এবং অন্যদিকে লাহোর প্রস্তাব তথা পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় মুসলিম জনমত সম্পূর্ণরূপে মুসলিম লীগের পক্ষে চলে যায়।[১০১] আনিসুজ্জামানের মতে লাহোর প্রস্তাবের পর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সময় দু'টি সাহিত্য সংগঠন অর্থাৎ ঢাকায় *পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ* ও কলকাতায় *পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি*-সকল শ্রেণি-পেশার মুসলমানদের সম্প্রীতির বন্ধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।[১০২] অর্থাৎ সাংস্কৃতিকভাবেও মুসলমান জমিদার, জোতদার ও কৃষকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু সম্পদায়ের এবং অধিকাংশ জোতদার ও কৃষকরা ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের।[১০৩] পূর্ব বাংলার কৃষকরা মনে করেছিল যে এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হবে এবং ভূমিস্বত্বের ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এর ফলে তারা জমিদার ও জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তি পাবে। একইভাবে পূর্ব বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি মনে করেছিল যে পাকিস্তান প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে মুসলমানদের জন্য সরকারি-বেসরকারি চাকুরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। এসব ক্ষেত্রে তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। পূর্ব বাংলার মুসলমান ব্যবসায়ীরা মনে করেছিল যে এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। পূর্ব বাংলার মুসলমান জমিদাররা মনে করেছিল যে এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে ভূমিস্বত্ব, রাজনীতি ও ব্যবসায়ে তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর মুসলমান জোতদাররা মনে করেছিল যে এই প্রস্তাব কার্যকর হলে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হবে। ফলে জমিদারদের স্থলে তারা স্থলাভিষিক্ত হবে এবং জমিদারদের জমির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। ভূমিস্বত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং লাহোর প্রস্তাব তথা পাকিস্তান প্রস্তাব ছিল পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণির মুসলমানদের ভবিষ্যত উন্নতির স্বপ্নস্বরূপ। এ কারণে লাহোর প্রস্তাবের পর পূর্ব বাংলার মুসলিম জনমত সম্পূর্ণরূপে মুসলিম লীগের পক্ষে চলে যায়। এর ফলে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

[১০০] আহ্মদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ. ৪৯-৫০।
[১০১] আহ্মদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ. ১৪৭-১৪৮।
[১০২] আনিসুজ্জামান, *স্বরূপের সন্ধানে*, পৃ. ৭৬।
[১০৩] Kamal, *State Against the Nation*, p. 60.

উল্লেখ্য, ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে জিন্নাহর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভাইসরয়ের প্রতিরক্ষা পরিষদে যোগদান করায় জিন্নাহ ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন। এছাড়াও জিন্নাহর নির্দেশে ১৯৪১ সালের ১ ডিসেম্বর হক সরকারের মন্ত্রিসভার লীগ সদস্যরাও একযোগে পদত্যাগ করেন। এর ফলে ১৯৪১ সালের ২ ডিসেম্বর হক সরকারের পতন ঘটে। যদিও ১৯৪১ সালের ১১ ডিসেম্বর ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টির প্রগতিশীল অংশের শামসুদ্দিন আহম্মদসহ কংগ্রেসের ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভা, তফসিলি হিন্দুদের সমন্বয়ে 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন' গঠন করে পুনরায় নতুন সরকার (দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা) গঠনে সমর্থ হন, কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের ওপর প্রভাবশালী মুসলিম লীগের প্রচণ্ড চাপের কারণে ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ গভর্নরের নির্দেশে হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। হকের পদত্যাগের পর ১৯৪৩ সালের ২৪ এপ্রিল জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।[১০৪] উল্লেখ্য, ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদানের পর বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য তমিজউদ্দীনসহ বেশ কয়েকজন মুসলমান জোতদার সদস্যও মুসলিম লীগে যোগদান করেন। আর খাজা নাজমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করার পর অনেক মুসলমান জোতদার সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ফলে ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৩৯টি আসনে জয়লাভ করলেও ১৯৪৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভা গঠনের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদে মুসলিম লীগে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৯।[১০৫] আর ১৯৪৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি নাজিমুদ্দিন সরকারের সমর্থক মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৩।[১০৬] কিন্তু এর পরও ১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং বাংলার গভর্নর কে. সি. ব্যারেজ ৯৩ (ক) ধারায় প্রদেশে গভর্নরের শাসন জারি করেন। তখন থেকেই জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতি শুরু করে। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শ্রমিক দল বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে এবং প্রধানমন্ত্রী হন ক্লিমেন্ট অ্যাটলি। নতুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৯৪৫ সালের ২১ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে প্রাথমিক ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের ভবিষ্যত গণ-পরিষদের সঙ্গে চুক্তি দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা করেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যত গণ-পরিষদ গঠনের প্রথম ধাপ ছিল নির্বাচন। ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে ১৯৪৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর এক ঘোষণায় বলেন যে ভারতীয়দের স্বশাসনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বড়লাটের শাসন পরিষদ গঠন করা হবে। এই সিদ্ধান্তনুযায়ী ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয় ১৯৪৫ সালের ১০ ও ১২ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয় ১৯৪৬ সালের ১৯-২২ মার্চ।[১০৭] ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবং ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী (এই অধ্যায়ের শেষ দিকে ১৯৪৬ সালের নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। সংক্ষেপে বলা যায় যে এই নির্বাচনে একদিকে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার যথার্থতা প্রমাণ করা এবং অন্যদিকে জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণ করা। প্রধানত

---

[১০৪] A.K. Fazlul Huq, *Bengal Today* (Dacca : East Bengal Government Press, 1956), pp. 1-62; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১১৬-১১৭; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৬০-৬১।

[১০৫] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, pp. 74-75 and 77; Sen, *Muslim Politics in Bengal*, pp. 88-89; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২২; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১১০ ও ১১৭-১১৮; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৬০।

[১০৬] Rahim, Enayetur and Joyce L. Rahim, *Bengal Politics : Documents of the Raj 1944-1947,* Volume III (Dhaka : The University Press Limited, 2000), p. 20.

[১০৭] এস. এম. রেজাউল করিম, "১৯৪৬ সালের নির্বাচন : পূর্ব বাংলার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৭-২৮, ১৪০৯-১৪১১/২০০২-২০০৪ (ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ২০০৫), পৃ. ১০৩-১০৪।

ভূমি বিরোধের রাজনীতির কারণে নির্বাচনে উভয় দলের দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণে হিন্দু-মুসলিম জমিদার শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু ভূমি বিরোধের রাজনীতির কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষকদের সমর্থনে নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগই বিজয়ী হয়। নির্বাচনে বিজয়ী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের সময়কালে দেশভাগের মাধ্যমে লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুত স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং বাংলা ভাগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০৮] সুতরাং ভূমি বিরোধের কারণেই হিন্দু ও মুসলিম জমিদারদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সুদূরপ্রসারী ফল ছিল ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি এবং পূর্ব বাংলার প্রতিষ্ঠা।

৩.৩ আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিতে জোতদার শ্রেণির পরিবর্তন

৩.৩.১ জোতদার শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ

ভূমি সংশ্লিষ্ট পক্ষ তথা ভূমির অংশীজনদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পক্ষ হলো জোতদার শ্রেণি।[১০৯] জমিদার ও সাধারণ কৃষকের মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগী অংশ সাধারণভাবে জোতদার হিসেবে পরিচিত।[১১০] নারিয়াকি নাকাজাতো জোতদারদের শ্রেণি বিন্যাস করে দেখিয়েছেন যে পত্তনিদার, তালুকদার এবং হাওলাদাররা হলেন প্রথম শ্রেণির জোতদার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির জোতদাররা হলেন দখলিস্বত্ববান কৃষকদের অনুরূপ পর্যায়ের কৃষক। তিনি বিত্তবান বা ধনী কৃষক বা মধ্যস্বত্বভোগী বা দখলিস্বত্ববান জোতজমির মালিকদেরকেও জোতদার হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১১১] সুগত বসু বিত্তবান কৃষককেও জোতদার হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১১২] তাজুল ইসলাম হাশমী জমিদার এবং নিম্নশ্রেণির কৃষকের মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগী ও ধনী কৃষককে জোতদার বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে জোতদাররা সাধারণভাবে প্রজা হিসেবে পরিচিত।[১১৩] রেহমান সোবহান উদ্বৃত্ত কৃষকদেরকে জোতদার বলে অভিহিত করেছেন।[১১৪] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে জমিদার ও কৃষকদের মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির অসংখ্য উপাধির মধ্যে জোতদার হলো একটি। তিনি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির যে তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে জোতদার, ইৎমামদার, ঠিকাদার, লাখেরাজদার, ইজারাদার, জায়গিরদার, ঘাটোয়াল, আয়মানদার, মকরারীদার, পত্তনিদার, মহলদার, হাওলাদার, তালুকদার, গাঁতিদার ও খোদকাশ্‌ত প্রজা। তিনি বলেন যে ১৮১৯ সালের অষ্টম রেগুলেশন অনুসারে বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগীর দল, উপদল সৃষ্টি হয় এবং এই মধ্যস্বত্বভোগীর অধিকার জমিদারি স্বত্বের ন্যায় স্বীকৃতি পায়।[১১৫] আহমদ কামালের মতে সাধারণভাবে যাদের ১০ একরের অধিক পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি ভোগ-দখলে থাকে তাদেরকে জোতদার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ তিনি সচ্ছল ধনী কৃষককে জোতদার হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১১৬] সুতরাং সাধারণভাবে জমিদার এবং কৃষকদের মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগীরা জোতদার হিসেবে পরিচিত।

---

[১০৮] ১৯৪৬ সালের নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, করিম, "*১৯৪৬ সালের নির্বাচন* ", পৃ. ৯৮-১২১।

[১০৯] এর পর থেকে মধ্যস্বত্বভোগী বা মধ্যস্বত্বাধিকারী বা বিত্তবান কৃষক বা উদ্বৃত্ত কৃষক বা মধ্যস্বত্বভোগী কৃষক বা দখলি জোতজমির মালিক বললে একই অর্থ বহন করবে এবং তা এই গবেষণায় জোতদার হিসেবেই বিবেচিত হবে।

[১১০] দ্রষ্টব্য, নারিয়াকি নাকাজাতো জোতদারের সংজ্ঞা ও অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রধানত Rajat and Ratna Ray, 'The Dynamics of Continuity in Rural Bengal under the British Imperium : A Study of Quasi-stable Equilibrium in Underdevelop Socities in a Changing World', *IESHR*, 10:2, 1973; এবং একই লেখকের 'Zamindars and Jotedars : A Study of Rural Politics in Bengal,' *MAS*, 9.1, 1975; Ratnalekha Ray, Change in Bengal Agrarian Society, c. 1760-1850, 1979; Rajat Ray, 'The Retreat of the Jotedars ', *IESHR*, 25:2, 1988 এবং Sugata Bose, *Agrarian Bengal*, pp. 3-33 -এর মতামত বিশ্লেষণ করে নিজের মত করে উপস্থাপন করেছেন। বিস্তারিতভাবে দেখুন, নাকাজাতো, *পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্থা*, পৃ. ৩-৫, ৬৫।

[১১১] নাকাজাতো, *পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্থা*, পৃ. ৩-৬ ও ১৯২।

[১১২] Bose, *Agrarian Bengal*, pp. 18-19.

[১১৩] Hashmi, *Peasant Utopia*), p. 3.

[১১৪] Rehman Sobhan, *Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan* (Dacca : Bureau of Economic Research, 1968), p. 256.

[১১৫] মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭।

[১১৬] Kamal, *State Against the Nation*, p. 60.

বস্তুতপক্ষে, জোতদার শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে ভূমিতে উদ্ভূত মধ্যস্বত্বভোগী বা মধ্যস্বত্বাধিকারী বা সচ্ছল কৃষক বা উদ্বৃত্ত কৃষক বা দখলিস্বত্ববান জোতজমির মালিক থেকে। বলা যায় যে জোতদার হলো এমন একটি শ্রেণি, গ্রামের বড় অংশের ভূ-সম্পত্তি যাদের দখলে থাকে, ঐ বিস্তৃর্ণ ভূখণ্ড তারা বর্গাচাষি, কোর্ফা কৃষক ও মজুর দিয়ে চাষাবাদ করায় এবং জমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী এবং গ্রামীণ প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে গ্রামের গরিব মানুষদের শ্রম নিয়ন্ত্রণ করে। জোতদার শ্রেণি নিজের ভূমি মালিকানাস্বত্বের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মহাজনি করেও গ্রামীণ অর্থনীতিতে 'অন্তর্নিহিত উপশোষকের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম হয়।[১১৭]

উল্লেখ্য, বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মধ্যস্বত্বভোগী বা জোতদাররা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন রংপুর জেলায় মধ্যস্বত্বভোগীরা জোতদার হিসেবে পরিচিত হলেও যশোর জেলায় তারা গুন্তিদার, ফরিদপুরে জোতদার ও হাওলাদার, বাকেরগঞ্জ জেলায় তালুকদার ও হাওলাদার হিসেবে পরিচিত।[১১৮] তাজুল ইসলাম হাশমীও বলেন যে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় জোতদাররা যেমন তালুকদার, হাওলাদার, লাটদার, বসুনিয়া ও মণ্ডল প্রভৃতি নামে পরিচিত।[১১৯] অবশ্য বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার যেখানে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তান শাসনামলে গ্রাম বাংলার সমাজ কাঠামোতে জোতদাররা কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।[১২০] তবে একথাও সত্যি সব অঞ্চলেই যে জোতদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি সমান ছিল তা কিন্তু নয়। পূর্ব বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে জোতদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অনেক বেশি, আবার কোনো কোনো অঞ্চল ছিল মধ্য শ্রেণির সচ্ছল কৃষক প্রভাবিত এবং কোনো কোনো অঞ্চল ছিল জমিদার প্রভাবিত, সেখানে জোতদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বেশি ছিল না। যেমন দিনাজপুর ও রংপুর জেলা এবং ময়মনসিংহ,পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, যশোর ও খুলনা জেলার অংশ বিশেষ এবং তৎকালীন নদীয়া জেলার পূর্বাংশ কুষ্টিয়ায় জোতদাররা ছিলেন খুবই প্রভাবশালী। আবার নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলা ছিল জোতদার ও মধ্য শ্রেণির কৃষক প্রভাবিত। অন্যদিকে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, পাবনা, রাজশাহী জেলা এবং বগুড়া, দিনাজপুর ও রংপুর জেলার কিছু অংশ ছিল জমিদার প্রভাবিত।[১২১]

এখন প্রশ্ন হলো ভূমিতে জোতদার বা মধ্যস্বত্বভোগীর জন্ম হলো কিভাবে এবং কিভাবে তারা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল? সংক্ষেপে এর উত্তরে বলা যায় যে যতদূর জানা যায় ভূমিতে মধ্যস্বত্বভোগী বা মধ্যস্বত্বাধিকারী বা জোতদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল তৃতীয় শতকে গুপ্ত শাসনামলে। গুপ্ত আমলে গুপ্ত রাজাদের পুরোহিতদের স্থায়ী ভিত্তিতে ভূ-সম্পত্তি দানের মাধ্যমে শক্তিশালী মধ্যস্বত্বাধিকারী বা মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল।[১২২] অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসনামলে উদ্ভূত মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি বলতে যা বুঝায় প্রাচীনকালে সে ধরনের কোনো মধ্যস্বত্বাধিকারী বা মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উপস্থিতি ছিল না। প্রাচীনকালে ভূমিতে প্রজার স্বত্ব নির্দিষ্ট ছিল এবং খাজনা আদায়কারী গ্রামপতি ব্যতীত অন্য কোনো মধ্যবর্তী স্বত্ব ছিল না।[১২৩] এমনকি, মুগল শাসনামলেও মধ্যস্বত্বাধিকারী অথবা মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে মুঘল আমলের ইতিহাসে উল্লেখ না থাকলেও, এমনকি, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সৃষ্ট

---

[১১৭] নাকাজাতো, *পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্থা*, পৃ. ৩।

[১১৮] Syed Ahmad, "Subinfeudation in the Land System of East Bengal", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II, No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950), p. 70 নাকাজাতো, *পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্থা*, পৃ. ১৯২-১৯৩।

[১১৯] Hashmi, *Peasant Utopia*, p. 3.

[১২০] নাকাজাতো, *পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্থা*, পৃ. ৩-৪।

[১২১] Hashmi, *Peasant Utopia*, p. 38.

[১২২] শর্মা, *প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ১৬১।

[১২৩] বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, পৃ. ৫২৫।

মধ্যস্বত্বাধিকারী তথা মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির অনুরূপ না হলেও ভূমি দানের মাধ্যমে প্রাচীনকালে বিশেষ করে গুপ্ত আমলে এর উদ্ভব ঘটেছিল। অর্থাৎ মুঘল আমলের লেখনীতে এদের উল্লেখ না থাকলেও গুপ্ত যুগেই ভূমিতে মধ্যস্বত্বভোগীর ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সত্যিকারার্থে মধ্যস্বত্বাধিকারী তথা মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটেছিল ঔপনিবেশিক শাসনামলে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। সিরাজুল ইসলামের মতে ১৮১২ সালের পঞ্চম আইনে পত্তনি দখলিস্বত্বের স্বীকৃতি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। অর্থাৎ ১৮১২ সালের পঞ্চম আইন পত্তনি দখলিস্বত্বের স্বীকৃতির মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভবে ভূমিকা রেখেছিল।[১২৪] আর ব্রিটিশ আমলে বিশেষ করে ১৮১৯ সালের অষ্টম আইন তথা পত্তনি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গুপ্তযুগীয় মধ্যস্বত্বভোগীর চরিত্রে পরিবর্তন আসে এবং বর্তমান রূপ নেয়। ১৮১৯ সালের অষ্টম আইনে সর্বপ্রথম বিভিন্ন শ্রেণির পত্তনিকে স্থায়ী, উত্তরাধিকার এবং হস্তান্তরযোগ্য করার মধ্য দিয়ে ভূমি সংশ্লিষ্ট মধ্যবর্তী (পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, সে-পত্তনিদার ইত্যাদি জমিদার ও সাধারণ কৃষকের মাঝামাঝি অবস্থিত) মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালে নানা কারণে মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগীর বহু স্তর সৃষ্টি হয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত জমিদারদের কারণেই মধ্যস্বত্বভোগীর স্তরগুলো বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেমন বাকেরগঞ্জ জেলার জমিদারদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিলেন অনুপস্থিত। ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যাও ছিল এখানে অনেক বেশি।[১২৫] ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের মতে বাকেরগঞ্জে ১৯ স্তর বিশিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীর উপস্থিতি ছিল।[১২৬] বাকেরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ারের তথ্যানুসারে এখানে আরও বেশি স্তর বিশিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়েছিল।[১২৭] বাকেরগঞ্জ জেলার মধ্যে আবার মধ্যস্বত্বাভোগীদের দৌরাত্ম্য সবচেয়ে বেশি ছিল পটুয়াখালীতে।[১২৮] সাইমন কমিশনের মতে বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫০ বা ততোধিক।[১২৯] যাহোক, এই মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিই ছিল বাংলার সম্পত্তিবান সচ্ছল কৃষক শ্রেণি। এই সম্পত্তিবান সচ্ছল কৃষক শ্রেণিই সাধারণভাবে জোতদার শ্রেণি হিসেবে পরিচিত। সুতরাং বলা যায় যে ১৮১৯ সালের পত্তনি আইনের মাধ্যমেই আধুনিক জোতদার শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই জোতদার শ্রেণি মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবেও পরিচিতি লাভ করে। প্রথম দিকে জোতদাররা ছিল খুবই দুর্বল। এসময় তারা মূলত জমিদার শ্রেণির ওপর নির্ভরশীল ছিল। তবে পরবর্তীকালে নিজেদের স্বার্থে তারা কখনও কৃষকদের পক্ষে আবার কখনওবা জমিদারদের পক্ষে ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন ১৮৭২ সালে জমিদারদের বিরুদ্ধে পাবনার কৃষক বিদ্রোহের সময় জোতদাররা ছিল কৃষকদের পক্ষে এবং মূলত তাদের নেতৃত্বেই এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল।[১৩০] খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের খাজনা বন্ধ আন্দোলনে জোতদাররাই নেতৃত্ব প্রদান করেছিল। চন্ডিপ্রসাদ সরকার মন্তব্য করেন, "The raiyats of Rangpur, mostly belonging to the rich farmer stratum, decided in a meeting to pay nothing more than local rent and cess to the zamindar of Balna and Maharaja of

---

[১২৪] Islam, *Bengal Lands Tenure*, p. 21.

[১২৫] Md. Habibur Rashid (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Bakerganj*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, (Dacca : Bangladesh Government Press, 1981), p. 122.

[১২৬] The names of the nineteen tenures held by middlemen met with in Bakerganj District are as follow : (1) Taluk, (2) ausat taluk, (3) Nim ausat taluk, (4) nim taluk, (5) hawala, (6) ausat hawala, (7) nim ausat hawala, (8) nim ausat nim hawala, (9) tim hawala, (10) patni, (11) dar patni, (12) taksimi, (13) taskhisi, (14) Khand kharid, (15) Zimma, (16) mushkhasi, (17) abadkari, (18) mirash, (19) dar mirash. See, Hunter, *statistical Account: District of Dacca, Bakenganj, Faridpur, and Maimansinh*, Vol. V, p. 369.

[১২৭] Rashid, *District Gazetteers : Bakerganj*, p. 271.

[১২৮] Major General (Rt.) M. A. Latif (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Patuakhali*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1982), p. 242.

[১২৯] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ২৫-২৭।

[১৩০] নাকাজাতো, *পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্থা*, পৃ. ৬।

Cossimbazar. In Bhanga (Faridpur), they even refused to pay rent."[131] জমিদার বিরোধী এই আন্দোলনে জোতদারদের মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিল করা। চন্ডিপ্রসাদ সরকার মন্তব্য করেন, "Not only aimed at the abolition of the Zamindaris of the landlords but also the end of concentration of lands under the *talukdars* and *jotedars*."[132] আবার মুসলিম জোতদাররা পূর্ব বাংলায় কৃষকদের ভূমির খাজনা, চৌকিদারি ও দফাদারি কর বর্জনে উৎসাহিত করেছিল। তারা নিজেদের স্বার্থে কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে জমিদারদের বিপক্ষে গিয়ে ব্রিটিশদের সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু যখনই কৃষকরা নিজেদের স্বার্থে জমিদার ও জোতদার উভয়ের স্বার্থের বিরুদ্ধে খাজনা বন্ধ ও পাট চাষ বন্ধ করে দেয়, তখন জোতদাররা জমিদারদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।[১৩৩] অর্থাৎ খাজনা এবং পাট চাষ আন্দোলনের সময় জোতদাররা জমিদারদের পক্ষে ভূমিকা পালন করেছিল। এভাবে ভূ-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে উভয় পক্ষে অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে জোতদাররা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

উল্লেখ্য, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের ফলে জোতদার শ্রেণির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এই আইনে কৃষকদের স্বত্বাধিকারী, স্থায়ী ও অধীনস্থ-এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করে স্বত্বাধিকারী এবং স্থায়ী কৃষকের অধিকার ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই দুই শ্রেণির কৃষক ভূমিস্বত্বের ওপর স্থায়ী এবং উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা লাভ করেছিল। ইতোপূর্বে প্রণীত ভূমিস্বত্ব সম্পর্কিত আইনের সাথে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের এটাই ছিল বিশেষ পার্থক্য। এই আইনেই সর্বপ্রথম ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের আংশিক স্বত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।[১৩৪] এর বিধানে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়, "Valuable rights were conferred on various grades of tenants in the matter of permanency, heritability and transfer of their interests, and protection from arbitrary enhancement of rent, and ejectment from tenancies."[135] এছাড়াও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের বিধানে উক্ত দুই শ্রেণির কৃষককে ভূমি বিক্রয়, বন্ধক বা ইজারা বা মর্টগেজ দেওয়ার অধিকারও প্রদান করা হয়েছিল।[১৩৬] এই আইনেই প্রথম ভূমিস্বত্বের হস্তান্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিকার কৃষককে প্রদান করা হয়েছিল।[১৩৭] এটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর বিধানে কৃষকদের ভূমি হস্তান্তরের অধিকার থাকার কারণে সচ্ছল কৃষক শ্রেণি ভূমি ক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা মর্টগেজ নিয়ে আরও বেশি ভূমির মালিকানার দাবিদার হয়ে উঠে এবং তাদের সচ্ছলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, উনিশ শতকের শেষ দিকে এমনকি বিশ শতকেও বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কৃষকেরা প্রধানত পাট চাষের মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করেছিল।[১৩৮] উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী পূর্ব বাংলার কৃষকদের সচ্ছলতার পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল পাট চাষ।[১৩৯] শ্রীআনন্দনাথ রায়ের মতে পাট চাষ কৃষক শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি বলেন, "পাটে প্রচুর লাভ পাইয়া মুসলমান ও নমঃশূদ্র

[১৩১] Chandiprasad Sarkar, *The Bengali Muslims : a study in their politicization, 1912-1929* (New Delhi : K P Bagchi & Company, 1991), pp. 105-106.
[১৩২] Sarkar, *The Bengali Muslims*, p. 187.
[১৩৩] Sarkar, *The Bengali Muslims*, pp. 105-124.
[১৩৪] চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম*, পৃ. ৫৪; *সংবাদ*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭৫।
[১৩৫] Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers : Dacca*, p. 367.
[১৩৬] Khan, *District Gazetteers : Pabna*, p. 256; নোমান রাজা, 'কৃষক আন্দোলনের পটভূমি', *দৈনিক বাংলা*, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৪।
[১৩৭] চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম*, পৃ. ৫৪।
[১৩৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, করিম, *বাংলায় পাট চাষ*, পৃ. ৭১-৭৬ ও ৮২-৮৫।
[১৩৯] বিস্তারিতভাবে দেখুন, করিম, *বাংলায় পাট চাষ*, পৃ. ৭১-৭৪; *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ নভেম্বর, ১৮৭৪; ১৯ আগস্ট, ১৯০০; ১৭ মার্চ ১৯০১।

সম্প্রদায় বিশেষ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশের অবস্থা ভালো। প্রত্যেকেই টিনের ঘরের ব্যবস্থা করিয়া ও গয়না তৈয়ার করিয়া আপনার উন্নত অবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে।” তাঁর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে পাট চাষের মাধ্যমেই কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতা এসেছিল। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক এম. মোফাখখারুল ইসলামের মতে পাট চাষের কারণে বাংলায় বিশেষত পূর্ববঙ্গীয় জেলাগুলোতে একদিকে যেমন দরিদ্র কৃষকদের এক অংশের জীবনে কিছুটা সচ্ছলতা আসে, অপরদিকে তেমনি একটি ধনী কৃষক শ্রেণির বিকাশ সম্ভব হয়।[১৪০]

কৃষকেরা তাদের আর্থিক সচ্ছলতা কারণে ভূমি হস্তান্তরের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আরও বেশি ভূমির মালিকে পরিণত হয়। উল্লেখ্য, ১৮৬৯ সালের স্থায়ী লিজ আইন প্রণীত হলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লিজ প্রদান এবং বিশেষ করে কৃষক পর্যায়ে লিজ নেওয়ার প্রমাণ তেমন একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে ভূমিস্বত্বের হস্তান্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিকার পাওয়ার পর স্বত্বাধিকারী এবং স্থায়ী কৃষকেরা স্থায়ী লিজ গ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে অনেকের আর্থিক সচ্ছলতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। সচ্ছলতা বৃদ্ধির কারণে তারা আরও বেশি পরিমাণ জমি লিজ নিতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবে একটি সচ্ছল ধনী কৃষক শ্রেণির সৃষ্টি হয় যারা নতুন করে জোতদার শ্রেণিভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। এ কারণে দেখা যায় যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পর থেকে স্থায়ী লিজের সংখ্যাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল (সারণি ৫)।[১৪১] সারণি ৫ থেকে দেখা যায় যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের পর অল্প সময়ের মধ্যেই স্থায়ী লিজের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তুলনা করলে দেখা যায় যে ১৮৭০-৭২ সালে পূর্ব বাংলার জেলাগুলোতে যেখানে স্থায়ী লিজের সংখ্যা ছিল ৩,৩০,৪৩৩টি, সেখানে ১৮৯৭-৯৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২১,০৩,৫৪৭টিতে। মাত্র ২৯ বছরে স্থায়ী লিজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৭,৭৩,১১৪টি বা ৫৩৬.৬০%। স্থায়ী লিজের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম মন্তব্য করেন, “Needless to say, by the end of the century the perpetual tenureholders emerged as the single largest tenurial group on the agrarian scene in Bengal.”[142] শুধুমাত্র স্থায়ী লিজের সংখ্যাই নয়, বরং প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পর বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভূমি বিক্রি ও বন্ধকের সংখ্যাও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ভূমি হস্তান্তর অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল (সারণি ৬)।[১৪৩] সারণি ৬ থেকে দেখা যায় যে সুগত বসু, বিনয় চৌধুরী, সুনীল সেন, পল আর. গ্রিনো এবং এম. আজিজুল হকের তথ্য অনুযায়ী উক্ত সময়ে ভূমি হস্তান্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। করুণাময় মুখার্জী ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন থানার পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন যে ১৯৩১-১৯৪৩ সময়কালের মধ্যে সেখানকার কোনো কোনো থানায় ৫১ গুণ পর্যন্ত ভূমি হস্তান্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৪৪] অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের পর বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় স্থায়ী লিজ ও বিক্রয়ের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থই হলো জোতদার শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। এর ফলে এক শ্রেণির সচ্ছল ধনী কৃষক শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে যারা ইতোপূর্বে উদ্ভূত জোতদার শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রেহমান সোবহানের মতে ১৯৪৭ সাল

---

[১৪০] করিম, *বাংলায় পাট চাষ*, পৃ. ৮৪; রায়, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃ. ১৭।
[১৪১] Islam, *Bengal Land Tenure*, p. 37.
[১৪২] Islam, *Bengal Land Tenure*, pp. 38.
[১৪৩] Paul R. Greenough, *Prosperity and Misery in Modern Bengal : The Famine of 1973-1944* (New York : Oxford University Press, 1982), p. 200; Chatterjee, *Bengal*, pp. 143-144; Bose, *Agrarian Bengal*, p. 151; হক, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ২৩৫; সুনীল সেন, (অনুবাদিকা : ছায়া দাশ গুপ্ত), *ভারতে কৃষি সম্পর্ক, ১৭৯৩-১৯৪৭* (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫), পৃ. ২৭; মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৩৪।
[১৪৪] Karunamoy Mukerji, *The Problems of Land Transfer : A Study of the Problems of Land Alienation in Bengal* (Birbhum : Santiniketan Press, 1957), p. 191.

নাগাদ বাংলায় একটি মধ্যস্বত্বভোগী মুসলিম জোতদার শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছিল।[১৪৫] নিঃসন্দেহে বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার এই জোতদারদের একটি বড় অংশ ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। সুতরাং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় জোতদার শ্রেণির বিকাশ ত্বরান্বিত করেছিল।

৩.৩.২ জোতদার ও জমিদার শ্রেণির সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিণতি

উনিশ শতকের শেষ দিক হতে বিশ শতকের বিশের দশক পর্যন্ত ভূমি বিরোধের রাজনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের জোতদার ও জমিদাররা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের এই ঐক্যবদ্ধ অবস্থান ছিল কৃষকদের বিপক্ষে। জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত, এমনকি এর পরেও দেখা যায় যে উভয় ধর্মের জোতদার ও জমিদাররা প্রধানত ভূ-অর্থনৈতিক অভিন্ন স্বার্থগত বিষয়ের কারণে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। সুফিয়া আহমেদ কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে মুসলমানদের সম্পৃক্ততা দেখাতে গিয়ে বলেন যে ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বাংলা থেকে যেসব সদস্য কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন তার মধ্যে ২৬ জন ছিলেন জোতদার শ্রেণির। এর মধ্যে পূর্ব বাংলার মুসলিম জোতদার ছিলেন ১১ জন (সারণি ৭)।[১৪৬] উল্লেখ্য, বাংলা তথা পূর্ব বাংলার অন্যতম প্রধান জোতদার শ্রেণির নেতা ছিলেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। ফজলুল হক নিজেও ছিলেন বাকেরগঞ্জ জেলার জোতদার খ্যাত হাকিয়াদার পরিবারের সন্তান।[১৪৭] জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সরাসরি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এ কারণে তিনি লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌ চুক্তি প্রণয়নে অন্যতম মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিলেন। যদিও পূর্ব বাংলার মুসলিম জোতদার ও হিন্দু জমিদার শ্রেণির দ্বন্দ্বেও ফজলুল হকই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বেই বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় জোতদার শ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু তারপরও তাঁকেই জোতদার ও জমিদার শ্রেণির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ঐক্যবদ্ধ রাজনীতির প্রতীক হিসেবেই বিবেচনা করা হয়।[১৪৮] বস্তুতপক্ষে, বিশ শতকের বিশের দশক পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের জোতদার ও জমিদাররা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও বজায় ছিল।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন তথা মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের অধীনে বাংলায় তথা পূর্ব বাংলায় প্রত্যক্ষ ভোটের রাজনীতির সূচনা হয়। এই আইনে সর্বপ্রথম জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রধানত ভোট রাজনীতির সূচনায় মুসলিম জমিদার, জোতদার ও কৃষকরা রাজনীতি ও ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং একই কারণে তারা হিন্দু জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধেও অবস্থান গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ এই ভোট রাজনীতির সঙ্গে ভূমি বিরোধের রাজনীতি মিলেমিশে একাকার হওয়ার কারণে দীর্ঘ দিন ধরে জমিদার এবং জোতদারদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় থাকলেও তা মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করে। উল্লেখ্য, সর্বজন স্বীকৃত যে পূর্ব বাংলায় অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের ও অধিকাংশ কৃষক ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের। এই মুসলমান কৃষকদের মধ্য হতে আবির্ভূত সচ্ছল কৃষকরাই জোতদার শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পূর্ব বাংলায় অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু এবং অধিকাংশ জোতদার ও

[১৪৫] সোবহান, "*বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি*", পৃ. ৫৩৫।
[১৪৬] Ahmed, *Muslim Community in Bengal*, pp. 299-319.
[১৪৭] J. C. Jack, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Bakargan‡jv District, 1900 to 1908,* Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1915), pp. 44-45; Islam, *Bengal Land Tenure*, pp. 87-123; Chatterji, *Bengal divided*, p. 69; Latif, *Bangladesh District Gazetteers : Patuakhali*, p. 242.
[১৪৮] Chatterji, *Bengal divided*, pp. 77-79; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৫৬-৫৭।

কৃষক ছিলেন মুসলমান। ফলে ভোট রাজনীতির সঙ্গে ভূমি বিরোধের রাজনীতি একীভূত হওয়ার কারণে মুসলমান জোতদাররা স্ব-ধর্মের জমিদার ও কৃষকদের পাশে পেয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সুযোগে হিন্দু সম্প্রদায়ের জমিদারদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়। সুতরাং বাংলায় তথা পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি। এ কারণে এতোদিন হিন্দু জমিদারদের একক প্রাধান্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বহাল থাকলেও ভোট রাজনীতির মাধ্যমে প্রদেশে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমান জোতদাররা হিন্দু জমিদারদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়। এসময় মুসলমান জোতদাররা ভোট রাজনীতির স্বার্থে কৃষকদের নিয়ে মফস্বলকেন্দ্রিক রাজনীতি শুরু করে। অন্যদিকে তারা হিন্দু জমিদার ও জোতদারদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং স্ব-সম্প্রদায় ভিত্তিক জোটগঠন করে রাজনীতিতে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় অবতীর্ণ হয়।[১৪৯] উল্লেখ্য, ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বারদোলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে জমিদারদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে কংগ্রেস জমিদারদের আইনসঙ্গত অধিকারের ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ সমর্থন করবে না। ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠকের পর প্রদেশের কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে কর বয়কট নীতি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত। কংগ্রেসের এই নীতি ছিল কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী।[১৫০] অর্থাৎ হিন্দু জমিদারদের চাপে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত ছিল জমিদারদের পক্ষে এবং কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী। স্পষ্টত বুঝা যায় যে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে বিরাজমান ভূমি বিরোধের রাজনীতিকে কংগ্রেস ব্যবহার করেছিল। অন্যদিকে ১৯২৫ সালে মেদিনীপুরের বিশিষ্ট জমিদার স্যার আবদুর রহিম এবং জোতদার শ্রেণির নেতা ফজলুল হক, মৌলানা মোহম্মদ আকরাম খাঁ, সামসুদ্দিন আহমেদ, মৌলভী মুজিবুর রহমান প্রমুখ কৃষক-প্রজা সমিতি গঠন করেন যা পরবর্তীকালে বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দলে পরিণত হয়েছিল।[১৫১] মুসলিম জোতদার ও জমিদারদের এই স্ব-সম্প্রদায় ভিত্তিক জোটগঠনের ফল ছিল তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদে উত্থাপিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিলে ভূমিস্বত্বের ওপর বর্গাদার ও অধীনস্থ কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত মুসলিম জমিদার ও জোতদার নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অন্যদিকে হিন্দু জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস ও স্বরাজ দলের সদস্যবৃন্দ কৃষকদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এই বিলের ওপর পরিষদের হিন্দু ও মুসলিম সদস্যদের আলোচনা শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম তথা সাম্প্রদায়িক বিতর্কে পরিণত হয়েছিল। পরিষদের সদস্য ফজলুল হক অধীনস্থ কৃষকদের খাজনা হ্রাসের প্রস্তাব করলে ঐক্যবদ্ধ মুসলমান জোতদার ও জমিদাররা হকের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন এবং অন্যদিকে স্বরাজ ও কংগ্রেস দলের হিন্দু জোতদার ও জমিদার সদস্যরা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত হকের প্রস্তাবটি ২৭-৩৯ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিল অনুমোদনকালে মুসলিম ব্লক ও সহযোগী সদস্য সংখ্যা ছিল ২১ জন, স্বরাজ ব্লক ও সহযোগী সদস্য সংখ্যা ছিল ৪২ জন এবং সরকারি ও ইউরোপিয়ান ব্লক ও তাদের সহযোগী সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৭ জন।[১৫২] এ কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদে ১৯২৭ সালের প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল পাশের সময় ঐক্যবদ্ধ মুসলমান জোতদার ও জমিদারদের ভূমিকা ছিল নগন্য। বস্তুতপক্ষে, ভোট রাজনীতির কারণেই বিশ শতকের বিশের দশকে মুসলিম জমিদার, জোতদার ও কৃষকদের সঙ্গে হিন্দু জমিদার ও জোতদারদের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল। আর এর মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ স্ব-সম্প্রদায়

---

[১৪৯] Sarkar, *Bengali Muslims*, p. 172.

[১৫০] মল্লিক, *আধুনিক ভারতের রূপান্তর*, পৃ. ৬০৮; চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭৪-৪৭৮।

[১৫১] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Sarkar, *Bengali Muslims*, p. 172; চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭৮; রাজা, কৃষক আন্দোলনের পটভূমি, *দৈনিক বাংলা*, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৪; সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ১ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২২২; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৩৭৬; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, পৃ. ২১৪।

[১৫২] Chatterjee, *Bengal 1920-1947*, pp. 82-95.

ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় বিশ শতকের বিশের দশকে ভূমি বিরোধের রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রম করেছিল। এই পর্যায়ের দ্বন্দ্বে হিন্দু জমিদাররা বিজয়ী হলেও পরবর্তীকালে বিশেষ করে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে মুসলিম জোতদাররাই বাংলার রাজনীতিতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ফজলুল হক জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা পরিত্যাগ করে বাংলার রাজনীতিতে জোতদারদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কৃষকদের নিয়ে মফস্বলকেন্দ্রিক রাজনীতি শুরু করেন।[১৫৩] গ্রামীণ জোতদার অভিজাতদের শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোই ছিল তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে ১৯১৭ সালে তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে কৃষক সমিতি গঠন করেন। ১৯২৪ সালে শিক্ষা মন্ত্রী হওয়ার পর মুসলিম মধ্যবিত্তদের জন্য চাকুরির ব্যবস্থা, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্যও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১৫৪] ১৯২৫ সালে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি বঙ্গীয় প্রজা সমিতি গঠন করেন এবং তিনি এর সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যবিত্ত জোতদার শ্রেণিভুক্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলমানেরাও তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতো এবং শ্রদ্ধা করতো। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে ১৯৩৫ সালে প্রজা সমিতি বাংলার মুসলমানদের একরূপ সর্বদলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এছাড়াও প্রজা সমিতির সভাপতির পদ নিয়ে ফজলুল হক এবং আকরাম খাঁর দ্বন্দ্বে প্রজা সমিতি দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। আকরাম খাঁর গ্রুপকে সহায়তা করেন মুসলিম মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের নগরকেন্দ্রিক শক্তিশালী নেতা সোহরাওয়ার্দীসহ বেশ কয়েকজন মুসলিম জোতদার নেতৃবৃন্দ। কৃষি ভিত্তিক সংগঠনের ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দীর কোনো আগ্রহ না থাকলেও তিনি পল্লী অঞ্চলের ভোটের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে প্রজা সমিতির রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। অন্যদিকে ফজলুল হক গ্রুপের সমর্থক জোতদার নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ময়মনসিংহের আবুল মনসুর আহমদ, নদীয়ার শামসুদ্দিন আহমদ ও যশোরের নওশের আলী প্রমুখ। প্রজা সমিতির কর্তৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্বের পরিণতি হিসেবে প্রজা সমিতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এর মধ্যে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রজা সমিতির অংশ ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় কৃষক প্রজা পার্টিতে পরিণত হয়। অন্যদিকে আকরাম খাঁর নেতৃত্বে বিভক্ত বঙ্গীয় প্রজা সমিতির অংশটি ক্ষীণ শক্তি নিয়ে কিছুকাল সক্রিয় থাকার পর মুসলিম লীগের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। হকের নেতৃত্বে নব গঠিত কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যে বেশির ভাগ ছিলেন জোতদার পরিবারভুক্ত। এছাড়াও তারা ছিলেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা 'প্রথম প্রজন্মের' উচ্চাকাঙ্ক্ষী সচ্ছল মুসলমান কৃষক পরিবারের সন্তান।[১৫৫] এ কারণে কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃবৃন্দ সহজেই পল্লী অঞ্চলের নতুন ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্য ছিলেন জোতদার শ্রেণিভুক্ত। এ কারণে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ফজলুল হক তাঁর কৃষক প্রজা পার্টিতে জোতদারদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। উপরন্তু, তিনি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে নব গঠিত কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী বোর্ডেও জোতদারদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৫৬] নির্বাচনের পূর্বে জোতদার নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে ফজলুল হক তাঁর কৃষক শ্রমিক পার্টিকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে গণআন্দোলনের সূচনা করেন। জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার থেকে মুক্তিদান এবং জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন সচ্ছল কৃষক এবং কৃষিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভোটারদের মধ্যে হকের পার্টিকে

---

[১৫৩] Sarkar, *Bengali Muslims*, p. 172.

[১৫৪] ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৫৭।

[১৫৫] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Sarkar, *The Bengali Muslims*, p. 172; চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ৭৯-৮৩; আহ্মদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ. ৬১; চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭৮; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৫৭-৫৮; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৪, পৃ. ২৩৬।

[১৫৬] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, p. 62; চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ৮৪।

জনপ্রিয় করে তুলেছিল। ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে হকের কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারেও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদকে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকদের ভূমি কেন্দ্রিক প্রধান সমস্যা তথা জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের ইস্যু অন্তর্ভুক্ত থাকায় কৃষক প্রজা পার্টির জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ কারণে নব গঠিত কৃষক প্রজা পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেই ৩৬টি আসন পেয়ে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। উল্লেখ্য, নির্বাচনে আইনসভায় মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত শহর ও পল্লী অঞ্চলের ১১৯টি আসনের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টি শহরে কোনো আসন না পেলেও পল্লী অঞ্চলের ১১১টি আসনের মধ্যে ৩৬টি আসন লাভ করেছিল (সারণি ২০)।[১৫৭] সারণি ২০ থেকে দেখা যায় যে নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি মুসলমানদের প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩১.৫১ ভাগ ভোট পেয়েছিল। এর মধ্যে শহরে শতকরা ১৫.৩৯ ভাগ এবং পল্লী অঞ্চলে শতকরা ৩১.৭৮ ভাগ ভোট পেয়েছিল, যা ছিল জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের চেয়ে বেশি। নির্বাচনে জোতদার প্রভাবিত কৃষক প্রজা পার্টি ভূমি বিরোধের রাজনীতিকে ইস্যু হিসেবে জনগণ তথা কৃষকদের সামনে উপস্থাপন করে তাদেরকে আকৃষ্ট করতে ও তাদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির বিজয়ের মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কৃষক প্রজা পার্টির নেতা এ. কে. ফজলুল হক গভর্নরের আমন্ত্রণে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। উল্লেখ্য, নির্বাচনের পর হক প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হলে মুসলিম লীগ, তফসিলি হিন্দু এবং অ-কংগ্রেসী বর্ণ হিন্দুদের সমন্বয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন।[১৫৮] তবে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলেও জোতদার নেতৃবৃন্দের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল। এবার কৃষক প্রজা পার্টি হিন্দু জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলমান জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ এবং তফসিলি হিন্দু ও অ-কংগ্রেসী বর্ণ হিন্দুদের নিয়ে একটি জোট গঠন করে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছিল। এর মাধ্যমে তৎকালীন জমিদার ও জোতদার দ্বন্দ্বের বাইরে ভিন্ন ধরনের রাজনীতির সূচনা হয়েছিল। এর মূলে ছিল বাংলা তথা পূর্ব বাংলায় ভূমি বিরোধের রাজনীতি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ফজলুল হক মুসলিম জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের সাথে জোটবদ্ধভাবে কোয়ালিশন সরকার গঠন করার একটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর সরকার ১৯৩৮ সালের প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়ন করেন। এর ফলে হকের দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণসহ জোতদাররা বাংলার অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।[১৫৯] এছাড়াও হকের জোতদার প্রভাবিত কোয়ালিশন সরকার বঙ্গীয় কৃষি ঋণ আইন বাস্তবায়নেও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। সরকার গঠনের এক বছরের মধ্যে হক ৩,০০০টি গ্রামে 'ঋণ সালিশি বোর্ড' গঠন করেন। এসব বোর্ড গঠনের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল একটা ফোরাম গঠন করা, যাতে সুদ ব্যবসায়ীরা (অধিকাংশ সুদ ব্যবসায়ী ছিল হিন্দু জমিদার ও হিন্দু জোতদাররা) খাতকদের (অধিকাংশ খাতক ছিল মুসলমান কৃষক) সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে পারে। জয়া চ্যাটার্জীর মতে ঋণ সালিশি বোর্ড

---

[১৫৭] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, pp. 74-75 and 77; Sen, *Muslim Politics in Bengal*, p. 88-89; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২২। উল্লেখ্য, বিভিন্ন গ্রন্থে আসন প্রাপ্তিতে ভিন্নতা রয়েছে। বিস্তারিতভাবে দেখুন, Rana Razzaque, *Bengali Muslims : Social and Political Thought, 1918-1947* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 2019), pp. 68, 116-117, 232-237; চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ৭৯ ও ৮৩; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৫৭-৫৮ ও ৩৭৬; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৯, পৃ. ২৯১; হক, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, ১৮৫৭-১৯৪৭, পৃ. ৫৪০-৫৪১।

[১৫৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Shaikh, "*Muslims and Political Representation in Colonial India* ", p. 90; Chatterji, *Bengal divided*, P. 92-93; ঘোষ, *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি*, পৃ. ১৯৯; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১১০-১১১; হক, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, পৃ. ৫৪১; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৫৮।

[১৫৯] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Chatterji, *Bengal divided*, pp. 104-105 and 172-182.

খাতকদেরকে ঋণ পরিশোধে নিরুৎসাহিত করেছিল। এর ফলে ঋণ ব্যবস্থা মারাত্মক সংকটে পতিত হয়।[১৬০] চ্যাটার্জীর মতে মুসলিম জমিদার ও জোতদারদের আঁতাতের ফলে বাংলা তথা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় মুসলমানরা সফল হয়েছিল। পূর্ব বাংলার মুসলিম জমিদার-জোতদারদের নেতৃত্বে মুসলিম জাতির ঐক্য শক্তিশালী হয় এবং পাশাপাশি পূর্ব বাংলায় 'মুসলিম রাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন'ও জোরদার হয়ে উঠে। পূর্ব বাংলায় জোতদার মুসলমানদের নেতৃত্বে মুসলিম রাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ফজলুল হক কৃষকদের পক্ষে কৃষকবান্ধব আইন প্রণয়ন করার পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি ১৯৩৮ সালে আইনের মাধ্যমে জোতদার পরিবারের শিক্ষিত সন্তানদের সরকারি চাকুরিসহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই আইনে মুসলমানদের জন্য পুলিশ বিভাগে ৫০% ও সরকারি চাকুরির সকল নিয়োগে ৬০% পদ সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়াও তিনি ১৯৩৯ সালে আইন প্রণয়ন করে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল ও ইউনিয়ন বোর্ডসহ স্থানীয় বোর্ডসমূহের নির্বাচনে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬১] এছাড়াও ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কৃষকদেরকে বিনা সেলামিতে বৃক্ষ কর্তন, বাড়ি নির্মাণ, পুকুর খনন ও ভূমি হস্তান্তর করার অধিকার প্রদান করতেও লীগের জমিদার সদস্যরা রাজি হয়েছিলেন।[১৬২] ১৯৩৯ সালে কৃষিজাত পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে সরকারিভাবে সরাসরি হাট প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাট প্রতিষ্ঠার জন্য লাইসেন্স প্রদানের বিষয়েও লীগের সদস্যরা সম্মতি দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, কৃষিপণ্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রির স্থানীয় হাট-বাজারগুলো ছিল প্রধানত হিন্দু জমিদারিতে অবস্থিত, এগুলো ছিল জমিদারদের আয়ের একটি অন্যতম প্রধান উৎস।[১৬৩] উপরন্তু, ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মহাজনী আইনে অর্থলগ্নী ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিদের লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক ও সর্বোচ্চ সুদের হার শতকরা ৮ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছিল। বেশির ভাগ সুদ ব্যবসায়ীরা ছিল হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী, দোকানদার ও পেশাগত মহাজন। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ব্যবসা ছিল তাদের জীবিকা ও উন্নতির সোপানস্বরূপ। ফলে বঙ্গীয় মহাজনী আইন উক্ত ব্যবসায় নিয়োজিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এ কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ করে হিন্দু জমিদার নেতৃবৃন্দ বাংলার মুসলমান সরকারের উক্ত আইনগুলোকে সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড হিসেবে অভিহিত করে। উল্লেখ্য, মহাজনী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রণীত আইনে অল্প কিছু সংখ্যক মুসলমান সুদ ব্যবসায়ী জমিদারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আবুল মনসুর আহমেদের মতে মহাজনী আইন প্রণয়ন বন্ধ রাখতে মন্ত্রিসভার মুসলিম লীগের সদস্যরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। একদিকে জোতদার প্রভাবিত কৃষক প্রজা পার্টির চাপ এবং অন্যদিকে নিজেদের পদ-পদবি লাভের কারণে লীগের জমিদার সদস্যরা এসব আইন প্রণয়নে রাজি হয়েছিলেন। এছাড়াও লীগের সদস্যরা ভোট রাজনীতির বিবেচনায় জনগণ তথা কৃষকদেরকে নিজেদের পক্ষে রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। এমনকি, কৃষক প্রজা পার্টির সাথে মুসলিম লীগের সদস্যরা জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার শর্তে জমিদারি প্রথার বিলোপের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাকেও সমর্থন করেছিলেন।[১৬৪] এভাবে সব শ্রেণির মুসলমানকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কারণে বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সচ্ছল শ্রেণির কৃষকরা মনে করেছিল যে হক সরকারের শাসনামল তাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। উপরন্তু, ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ ফজলুল হক কর্তৃক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন ও গৃহীত হওয়ার পর এই ধনী কৃষক তথা জোতদার শ্রেণি আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কারণ এসময় তারা মুসলমান জমিদার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের সমর্থন পেয়েছিল। এভাবে বাংলায় বিশেষ

[১৬০] চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ১২৪-১২৬।
[১৬১] Chatterji, *Bengal divided*, pp. 107-108.
[১৬২] ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১১৬।
[১৬৩] চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ১২৫।
[১৬৪] আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ১৪৮।

করে পূর্ব বাংলায় মুসলিম জোতদারদের নেতৃত্ব এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু হক আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগে যোগদানের পর জোতদার সংগঠন হিসেবে কৃষক প্রজা পার্টির জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে শুরু করে এবং পার্টির সাংগাঠনিক ভিত্তিও দুর্বল হয়ে যায়।[১৬৫] ১৯৩৭-১৯৪৬ সময়কালে কৃষক প্রজা পার্টির সম্পাদকসহ বহু সংখ্যক জোতদার নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগে যোগদান করায় মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি কার্যত একটি দলে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এর ফলে কাগজ-পত্রে কৃষক প্রজা পার্টি জোতদার সংগঠন এবং মুসলিম লীগ জমিদারদের সংগঠন হিসেবে পরিচিত থাকলেও বাস্তবে মুসলিম লীগ একইসঙ্গে জমিদার ও জোতদার উভয় শ্রেণির সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়।[১৬৬] অন্যদিকে জোতদার সংগঠন হিসেবে পরিচিত কৃষক প্রজা পার্টির জনপ্রিয়তা ভীষণভাবে হ্রাস পায়। এ কারণে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ১২১টি আসনের মধ্যে জোতদার সংগঠন কৃষক প্রজা পার্টি মাত্র ৪টি আসনে জয়লাভ করে এবং এই পার্টির অনেক নেতৃবৃন্দের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় (সারণি ২২)।[১৬৭] অন্যদিকে লাহোর প্রস্তাবের পর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং নির্বাচনী ইশতেহারে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদসহ কৃষকদের দাবি-দাওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করায় নির্বাচনে মুসলিম লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। নির্বাচনে বিজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সচ্ছল শ্রেণির কৃষকরা। উল্লেখ্য, জোতদার সমর্থক মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের প্রধান সোহরাওয়ার্দী পল্লী অঞ্চলের কৃষকদের ভোটের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ভূমি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে দলের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।[১৬৮]

যাহোক, ঔপনিবেশিক সরকারের নীতি কৌশলে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে মুসলিম জমিদার এবং জোতদারদের নেতৃত্বে গঠিত সরকার কৃষকদের পক্ষে যেসকল আইন প্রণয়ন করেন তার দ্বারা ভূমির ওপর অধিকতর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ কৃষকেরা অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল। এর ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এক সময় ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে স্ব স্ব শ্রেণির ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। জমিদারদের উদ্দেশ্য ছিল ভূমিস্বত্বের ওপর একক অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য বজায় রাখা এবং জোতদারদের উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের বিপরীতে ভূমিস্বত্বের ওপর নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে কৃষকদের উদ্দেশ্য ছিল ভূমির ওপর নিজেদের অধিকার আদায় করা। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলের শেষদিকে এসে সরকারের নীতি কৌশলের পরিবর্তনের ফলস্বরূপ ভূমিস্বত্বের ওপর প্রাধান্য বহাল রাখা, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা এবং অধিকার আদায়ের ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বের বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বিশ শতকের ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে এই ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর মুসলমান জমিদার ও জোতদারদের নেতৃত্বে গঠিত সরকার কৃষকদের ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে অধিকতর মনোযোগী হয়। এর ফলে জমিদার, জোতদার ও কৃষক শ্রেণির ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে আসে সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি। অর্থাৎ প্রধানত ভূমি বিরোধের রাজনীতির কারণেই সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যাহোক, উক্ত নির্বাচনদ্বয়ের পর মুসলিম জমিদার এবং জোতদারদের নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, যাকে জয়া চ্যাটার্জী মুসলিম রাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করেছেন, সে আন্দোলনে মুসলমান কৃষকরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ

---

[১৬৫] ফজলুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৩৭ সালের ১৫ অক্টোবর মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

[১৬৬] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Chatterjee, *Bengal*, p. 233; করিম, "*১৯৪৬ সালের নির্বাচন* ", পৃ. ১০৫।

[১৬৭] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, p. 214-215; Rahim and Rahim, *Bengal Politics : Documents of the Raj*, pp. 137-138 and 171; Jalal, *The Sole Spokesman*, p. 161; ইসলাম, "*বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ*", পৃ. ২২৪; করিম, "*১৯৪৬ সালের নির্বাচন*", পৃ. ১১৩।

[১৬৮] আহ্মদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ. ৬১।

করেছিল।[১৬৯] এই আন্দোলনের মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বের ফল ছিল দেশভাগের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং বাংলা ভাগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠা। স্পষ্টতই এটা ছিল ভূমি বিরোধের আর্থ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফল।[১৭০] সুতরাং বলা যায় যে বিশ শতকের ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত জোতদার শ্রেণির প্রভাব বহাল থাকে এবং তারাই ধীরে ধীরে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। উপরন্তু, মুসলিম জমিদার এবং জোতদারদের নেতৃত্বে গঠিত সরকার মুসলমান জমিদার, জোতদার ও কৃষকদের মধ্যে স্ব-সম্প্রদায় ভিত্তিক সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করেছিল। এর ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এককথায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

৩.৪ আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিতে কৃষক শ্রেণির পরিবর্তন

৩.৪.১ কৃষক শ্রেণির ওপর ভূস্বামীদের শোষণ ও নিপীড়ন

ভূমি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ বা ভূমির অংশীজনদের মধ্যে কৃষক ছিল তৃতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন।[১৭১] ১৮৮৫ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভূমিস্বত্ব, অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিতে কৃষক শ্রেণির পরিবর্তনের পরিণতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। উনিশ শতকে ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সরকারের সঙ্গে জমিদারের বা জোতদারের ভূমিকেন্দ্রিক বিরোধের সময় সরকার নিজের পক্ষে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। জমিদারের সঙ্গে জমিদার অথবা জমিদারের সঙ্গে জোতদারের ভূমিকেন্দ্রিক বিরোধের সময় সরকার মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন। কিন্তু জমিদার অথবা জোতদারের সঙ্গে কৃষকের ভূমিকেন্দ্রিক বিরোধে সরকার সমস্যা সমাধান না করে বরং নির্লিপ্ত থাকতেন।[১৭২] সুতরাং ঔপনিবেশিক শাসনামলে জমিদার, জোতদার ও কৃষকের ভূমিকেন্দ্রিক বিরোধে সরকারের ভূমিকা মোটেই কৃষকের স্বার্থের পক্ষে ছিল না। ভূমি বিরোধে রাজনীতিতে কৃষকের গুরুত্ব না থাকার কারণেই এমনটা হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভূমি বিরোধের রাজনীতির মূলে ছিল কৃষকদের ওপর জমিদার এবং জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়ন। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় জমিদাররা সরকারকে নির্ধারিত রাজস্ব প্রদান করতেন। উল্লেখ্য, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকারের রাজস্ব সুনির্দিষ্টভাবে ধার্যকৃত হলেও পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহির্ভূত এলাকা অস্থায়ী (প্রধানত রায়তওয়ারি) ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দিয়ে ও জমিদারদের নিলামকৃত অনেকগুলো এস্টেট ক্রয় করে সরকারিভাবে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করায় সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ কারণে দেখা যায় যে ১৭৯০ সালে দশসালা বন্দোবস্ত ঘোষণার সময় যেখানে বাংলার ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৯০,৪০,০০০ টাকা[১৭৩] এবং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকরের সময় উক্ত ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২,৮৫,৮৭,৭২২ টাকা[১৭৪], সেখানে ১৯৩৬-৩৭ সালে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে বেড়ে দাঁড়ায় ৩,১২,০০,০০০ টাকা[১৭৫]। বিশ শতকের বিশ

[১৬৯] Chatterji, *Bengal divided*, p. 248.

[১৭০] Dhurjati Prasad De, *Bengal Muslims in Search of Social Identity 1905-47* (Dhaka : The University Press Limited, 1998), p. 232.

[১৭১] এর পর থেকে কৃষক, রায়ত ও প্রজা বললে একই অর্থ বহন করবে এবং তা এই গবেষণায় কৃষক হিসেবেই বিবেচিত হবে।

[১৭২] Mohammed Mohibullah Siddiquee, *Socio-Economic Development of a Bengal District : A Study of Jessore, 1883-1925* (Rajshahi : The Institute of Bengladesh Studies, University of Rajshahi, 1997), pp. 208-209.

[১৭৩] Islam, *Permanent Settelment*, p. 3.

[১৭৪] চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্গদেশের কৃষক*, পৃ. ২৯০।

[১৭৫] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত এস্টেটের ২,১৫,০০,০০০ টাক, অস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত এস্টেটের ২৬,০০,০০০ টাকা এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এস্টেটের ৭১,০০,০০০ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৩,১২,০০,০০০ টাকা। দেখুন, *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. V, p. 111.

ও ত্রিশের দশকের ভূমি রাজস্বের চাহিদা ও তা আদায়ের হিসেব থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সরকারের রাজস্ব চাহিদা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল ও তা আদায়ের হারও ছিল সন্তোষজনক (সারণি ৮)।[১৭৬] সারণি ৮ থেকে দেখা যায় যে ১৯২৪-২৫ সালের তুলনায় ১৯৩৭-৩৮ সালে রাজস্ব চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি তা আদায়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু সরকারের এই ভূমি রাজস্বের চাহিদা এবং তা আদায়ের হার বৃদ্ধি পেলেও বাংলার কৃষকের অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। কৃষকদের ওপর জমিদার ও জোতদারদের আর্থিক শোষণের মাত্রা ছিল ভয়াবহ। বিশ শতকে সরকারের রাজস্ব ও জমিদারের খাজনা আদায় সম্পর্কে *গণবাণী* পত্রিকায় বলা হয় যে বাংলার জমিদাররা সরকারকে রাজস্ব দেয় মাত্র ৩ কোটি টাকা, কিন্তু তারা কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা হিসেবে আদায় করে ১৩ কোটি টাকা।[১৭৭] কামাল সিদ্দিকীর মতে ১৯০০ সালে সরকারের ধার্যকৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, কিন্তু জমিদাররা কৃষকদের নিকট থেকে আদায় করেছিল ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ জমিদাররা কৃষকদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত রাজস্বের প্রায় সাড়ে চার গুণেরও বেশি অর্থ আদায় করেছিল।[১৭৮] এর সমর্থনে এম. মোফাখখারুল ইসলাম বলেন যে জমিদারদের নির্ধারিত বৈধ খাজনা ছিল ভূমি রাজস্বের কয়েকগুণ বেশি (সারণি ৯)।[১৭৯] সারণি ৯ থেকে দেখা যায় যে ১৯১৪-১৫ থেকে ১৯১৮-১৯ সময়ের তুলনায় ১৯৩৪-৩৫ থেকে ১৯৩৮-৩৯ সময়ে জমিদাররা কৃষকদের নিকট থেকে ৬১.২০% বেশি বৈধ খাজনা আদায় করেছিল। এটা ছিল তাদের বৈধ আদায়। বৈধ আদায়ের বাইরেও তারা কৃষকের নিকট হতে আরও অনেক বেশি অর্থ আদায় করতো। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনামলে কৃষকরা আর্থিক ক্ষেত্রে ভীষণভাবে শোষণের স্বীকার হয়েছিল।

অন্যদিকে জমিদারের নির্ধারিত খাজনা থেকে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে জোতদারদের খাজনা আদায়ের কারণে কৃষকরা আর্থিকভাবে বাড়তি শোষণের স্বীকার হয়েছিল। বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে দ্বিতীয় শক্তিশালী সামাজিক গোষ্ঠী ছিল জোতদার তথা মধ্যস্বত্বভোগীর দল। ১৮১৯ সালের পত্তনি আইনের পর থেকে জমিদাররা তাদের জমি খণ্ড খণ্ড ভাগ করে পত্তনি দেওয়া শুরু করেছিল। সিরাজুল ইসলামের মতে পত্তনি ব্যবস্থার ফলে কৃষকের খাজনার হার অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কৃষকরা আরও বেশি উৎপীড়নের স্বীকার হয়েছিল। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর পরিণতি ছিল মারাত্মক। কারণ পত্তনিদার আবার মুনাফা অর্জনের আশায় সৃষ্টি করেছিল অধীনস্থ পত্তনি তালুকের ব্যবস্থা।[১৮০] এভাবে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়েছিল। ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে ৫০ বা ততোধিক মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়েছিল।[১৮১] একটি হিসেব থেকে জানা যায় যে বাংলার দেড় লক্ষ

---

[১৭৬] *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1924-25*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1925), p. ii; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1926-27*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1927), p. 28; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1928-29*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1929), p. 32; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1929-30*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1930), p. 32; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 19230-31*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1931), p. 28; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1934-35*, Board of Revenue, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1935), p. 22; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1937-38*, Board of Revenue, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1938), pp. 20-21.

[১৭৭] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক কালে কালোত্তরে*, পৃ. ৪৭৮।

[১৭৮] কামাল সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি* (ঢাকা : শোভা প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ৩২-৩৩।

[১৭৯] M. Mufakharul Islam, *Bengal Agriculture 1920-1946 : A quantitative study* (London : Cambridge University Press, 1978), p. 190.

[১৮০] সিরাজুল ইসলাম, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কৃষক অর্থনীতি", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭), পৃ. ২১৬।

[১৮১] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. I, p. 37.

জমিদারিতে গড়ে ৬টি করে মধ্যস্বত্ব ছিল। এই হিসেবে বাংলার মধ্যস্বত্বের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ লক্ষ।[১৮২] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ রসুলের হিসেব অনুযায়ী ১৯২১ সালে বাংলায় অকৃষক জমির মালিক হিসেবে খাজনাভোগীর সংখ্যা ছিল ৩,৯০,৫৬২ জন এবং ১৯৩১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬,৩৩,৮৩৪ জন। তাঁর মতে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ৬২ ভাগ।[১৮৩] এম. আজিজুল হকের মতে ১৯২১ সালে বাংলায় যারা নিজেরা খাজনা-স্বত্ব ভোগ করে কিন্তু চাষাবাদের সঙ্গে জড়িত ছিল না, এরূপ জমিদারের সংখ্যা ছিল ৩,৮৫,১৭০ জন এবং ১৯৩১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭,৮৩,৭৫৫ জন। তাঁর হিসেবে দশ বছরে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছিল।[১৮৪] পার্থ চ্যাটার্জীর মতে ১৯৩১ সালে বাংলায় মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা ছিল ২৭,৩০,০০০।[১৮৫] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে প্রায় ৮ লক্ষ মধ্যস্বত্বভোগী এবং তাদের ওপর নির্ভরশীলদের নিয়ে মোট ২২ লক্ষ অর্থাৎ সর্বমোট ৩০ লক্ষ মানুষ শুধু খাজনার ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রত্যেক স্তরেই মধ্যস্বত্বভোগী জোতদাররা নিজের লভ্যাংশের ব্যবস্থা রেখেছিল। মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি হওয়ার পর জমিদার কৃষকদের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যায় এবং শেষ পর্যন্ত জমিদার ও কৃষকের মধ্যে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়। জমিদার বাংলার কৃষি উন্নয়নে আগ্রহ হারিয়ে 'পরগাছায়' পরিণত হয়। অপরদিকে মধ্যস্বত্বভোগীরাও জমিদারদের মতো বাংলার কৃষি উন্নয়নে খুব বেশি নজর দেয়নি। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মধ্যস্বত্বভোগী দল বাংলার কৃষি অর্থনীতির বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৮৬] পার্থ চ্যাটার্জীর মতে বাকেরগঞ্জ জেলায় মধ্যস্বত্বের সর্বাধিক চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকদের ওপর কীভাবে বিভিন্ন স্তরে বাড়তি আর্থিক চাপের সৃষ্টি করছিল তার উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে বাকেরগঞ্জের একটি ২০০০ একর জমিদারির রাজস্ব ছিল ২০০ টাকা। এই জমিদারিটি ৪টি তালুকে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক তালুকে জমির পরিমাণ ছিল ৫০০ একর এবং প্রতি তালুকদারির খাজনা ধার্য হয় ১০০ টাকা। আবার চারটি তালুক ২০টি ওসাত তালুকদারিতে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ওসাত তালুকে জমি ছিল ১০০ একর এবং প্রত্যেকটি ওসাত তালুকের খাজনা ধার্য হয় ৫০ টাকা। এই ২০টি ওসাত তালুক আবার ভাগ করা হয় ৮০টি হাওলাদারিতে। প্রতি হাওলাদারিতে জমির পরিমাণ ছিল ২৫ একর এবং খাজনা ধার্য করা হয় ২৫ টাকা। এই ৮০টি হাওলাদারি আবার ভাগ করা হয় ১৬০টি নিম হাওলাদারিতে। প্রত্যেক নিম হাওলাদারিতে জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১২.৫ একর এবং খাজনা ধার্য হয় ২০ টাকা। অবশেষে ১৬০টি নিম হাওলাদারি ৩২০ জন কৃষকের নিকট প্রদান করা হয়। প্রত্যেক কৃষক পায় ৬.২৫ একর জমি এবং তাদের প্রত্যেকের ওপর খাজনা ধার্য করা হয় ১৫ টাকা। এই জমিদারিতে সরকারি রাজস্ব ছিল মাত্র ২০০ টাকা, কিন্তু কৃষকদের নিকট থেকে বিভিন্ন স্তরে আদায় করা হয়েছিল সর্বমোট ৪,৮০০ টাকা।[১৮৭] অর্থাৎ সরকার নির্ধারিত রাজস্বের চেয়েও জমিদার ও জোতদাররা মিলে সরকারি রাজস্বের ২৪০% বেশি অর্থ কৃষকদের নিকট থেকে আদায় করেছিল। সরকারকে জমিদারদের রাজস্ব প্রদান, মধ্যস্বত্বভোগীদের লাভের পরিমাণ এবং কৃষকদের প্রদত্ত খাজনার চিত্র দেখলে সহজেই বুঝা যায় যে ঔপনিবেশিক শাসনামলে কৃষকরা নির্মমভাবে শোষিত হয়েছিল। একইভাবে এম. আজিজুল হক একর প্রতি খাজনা ও রাজস্বের হিসেব দিয়ে দেখিয়েছেন যে জমিদার ও জোতদাররা কৃষকদের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত একর প্রতি রাজস্বের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি খাজনা আদায় করে মুনাফা অর্জন করেছিল (সারণি ১০)।[১৮৮] এর ফলে কৃষকরা জমিদার ও জোতদার কর্তৃক চরমভাবে শোষণের স্বীকার হয়েছিল।

---

[১৮২] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ২৬।
[১৮৩] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস* (কলিকাতা : নবজাতক প্রকাশন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮২), পৃ. ৪৯ ও ৫২।
[১৮৪] এম. আজিজুল হক (অনুবাদ : ওসমান গনি), *বাংলার কৃষক* (ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ১২৬-১৩৩।
[১৮৫] Chatterji, *Bengal*, p. 15.
[১৮৬] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ২৫-২৭।
[১৮৭] Chatterji, *Bengal*, p. 12.
[১৮৮] হক, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ১২৬-১৩৩।

উল্লেখ্য, বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় স্থান ভেদে এমনকি কৃষক ভেদেও খাজনার হারে পার্থক্য ছিল। পার্থ চ্যাটার্জী বিভাগ ভেদে খাজনার হারের পার্থক্য দেখিয়ে বলেন যে বিভাগ ভেদেও কৃষকরা কম-বেশি শোষণের স্বীকার হয়েছিল (সারণি ১১)।[১৮৯] সারণি ১১ থেকে দেখা যায় যে বিভাগভিত্তিক খাজনার হারের দিক থেকে চট্টগ্রাম বিভাগের মোকরারি কৃষক; ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের দখলি কৃষক এবং ঢাকা বিভাগের অদখলি কৃষকদের খাজনার পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি। আবার জেলা ভেদেও কৃষকদের ওপর খাজনার হারে পার্থক্য ছিল (সারণি ১২)।[১৯০] সারণি ১২ হতে দেখা যায় যে বিভিন্ন জেলার মোকরারি, দখলি, অদখলি এবং অধীনস্থ কৃষকদের মধ্যে প্রতি একরে খাজনার হারে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মোকরারি কৃষকদের মধ্যে প্রতি একরে খাজনার হার সবচেয়ে বেশি ছিল নোয়াখালী জেলায় এবং সবচেয়ে কম ছিল যশোর জেলায়। দখলি কৃষকদের মধ্যে প্রতি একরে খাজনার হার সবচেয়ে বেশি ছিল বাকেরগঞ্জ জেলায় এবং সবচেয়ে কম ছিল যশোর জেলায়। অদখলি কৃষকদের মধ্যে প্রতি একরে খাজনার হার সবচেয়ে বেশি ছিল বাকেরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলায় এবং সবচেয়ে কম ছিল যশোর জেলায়। অধীনস্ত কৃষকের মধ্যে প্রতি একরে গড় খাজনার হার সবচেয়ে বেশি ছিল বাকেরগঞ্জ জেলায় এবং সবচেয়ে কম ছিল ঢাকা জেলায়। বিভাগ, জেলা এবং কৃষকদের প্রকার ভেদে খাজনার হারের কম বেশির পার্থক্য প্রমাণ করে যে স্থান ভেদে জমিদাররা ইচ্ছামতো খাজনা হার নির্ধারণ করতো। এ কারণে স্থান ভেদেও কৃষকরা কম বেশি শোষণের স্বীকার হয়েছিল। এছাড়াও সরকারকে প্রদত্ত রাজস্ব ও কৃষকদের নিকট থেকে আদায়কৃত খাজনা আদায়ের হিসেবে দেখা যায় যে চট্টগ্রাম জেলার জমিদাররা সবচেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করেছিল এবং বাকেরগঞ্জ জেলার জমিদাররা সবচেয়ে কম মুনাফা অর্জন করেছিল (সারণি ১০)।[১৯১] অবশ্য জমিদারের মুনাফা অর্জনের দিক থেকে বাকেরগঞ্জ জেলার জমিদাররা কম মুনাফা অর্জন করলেও সেখানে আবার মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। সুতরাং সকল স্থানেই নানাভাবে কৃষকরা আর্থিক শোষণের স্বীকার হয়েছিল। এমনকি চরাঞ্চলের উঠবন্দি কৃষকদের প্রতি একরে খাজনার পরিমাণেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় (সারণি ১৩)।[১৯২] সারণি ১৩ থেকে দেখা যায় যে বিভিন্ন শ্রেণির জমির ওপর উঠবন্দি রায়তের খাজনার হার ছিল বিভিন্ন ধরনের। এর মধ্যে কাঁঠাল বাগানের (Jackfruit groves) জমির খাজনার পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি এবং ছনের বাগানের (Thatching grass land) জমির খাজনার পরিমাণ ছিল সবচেয়ে কম। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ভারতে ভূমি বন্দোবস্ত ছিল প্রধানত দু'ধরনের যথা স্থায়ী ও অস্থায়ী। ব্রিটিশ ভারতের সরকার বিভিন্ন প্রদেশে স্থায়ী ও অস্থায়ী বন্দোবস্ত, আবার দখলিস্বত্বের ধরণ ও দখলিস্বত্বাধিকারীর ভিত্তিতে বন্দোবস্ত প্রদান করেছিল। যেমন জমিদারি, রায়তওয়ারি, মালগুজারী, পাট্টাদারী, ভাইয়াচারা, মহালওয়ারী, মৌজাওয়ারী, জায়গিরদারি এবং মেয়াদি বন্দোবস্ত (সারণি ১৪)।[১৯৩] বিভিন্ন প্রদেশের স্থায়ী ও

---

[১৮৯] Chatterjee, *Bengal*, p. 19.

[১৯০] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. III, p. 60; *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. V, p. 114.

[১৯১] হক, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ১২৬-১৩৩।

[১৯২] Siddiquee, *Socio-Economic Development of a Bengal District*, p. 70.

[১৯৩] *Land Revenue Policy of the Indian Government*, Governor General of India in Council (Calcutta : Government Printing, India, 1902), pp. 5, 9, 16, 21-22, 29, 52, 54, 82, 94, 96, 98-99, 110, 112, 153-170, 193, 205-207 and 261-262; *Land Revenue Policy of the Indian Government*, Governor General of India in Council (Calcutta : Government Printing, India, 1920), p. 4, 7-8, 13, 76-77, 98, 111-112, 123-127 and 251; *Report of the Land Revenue Commission*, Bengal, Vol. II, p. 61; *Report on the Land Revenue Administration of the Province of Bihar and Orissa for the year 1923-1924* (Patna : Government Printing, Bihar and Orissa, 1924), pp. 2-3; *Report of the Banking Enquiry Committee for the Centrally Administered Areas 1929-30*, Volume I (Calcutta : Government of India, 1930), pp. 15-17; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1924-25*, pp. 9-10; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1928-29*, p. 19; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1929-30*, p. 19; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1931-32*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal secretariat Book Depot, 1932), p. 14-15; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1934-35*, pp. 14; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1937-38*, p. 12; *The First Five Year Plan 1955-60*, December, 1957, National Planning Borad, Government of Pakistan (Karachi : Government of Pakistan Press, 1957), pp. 307-308; *Six-Year Development Programme of Pakistan, July, 1951 to June 1957*, Ministry of Economic,

অস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত তথা দখলিস্বত্বের ধরণ ও দখলিস্বত্বাধিকারীর ভিত্তিতে বন্দোবস্তকৃত ভূমি ব্যবস্থায় কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের খাজনার হার নির্ধারিত ছিল (সারণি ১৫)।[১৯৪] সারণি ১৫ থেকে দেখা যায় যে ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তুলনামূলক বিচারে মোট এলাকার হিসেবে প্রতি একরে স্থায়ী বন্দোবস্তকৃত এলাকার মধ্যে যুক্ত প্রদেশে খাজনার পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি এবং বিহার ও উড়িষ্যায় ছিল সবচেয়ে কম। অস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত এলাকার মধ্যে পাঞ্জাবে খাজনার পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি এবং সেন্ট্রাল প্রদেশে ছিল সবচেয়ে কম। সরকারি পরিচালনাধীন বা রায়তওয়ারি এলাকার মধ্যে বাংলায় খাজনার পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি এবং সেন্ট্রাল প্রদেশে ছিল সবচেয়ে কম। মোট এলাকার হিসেবে প্রতি একরে গড়ে মাদ্রাজে খাজনার পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি এবং বিহার ও উড়িষ্যায় ছিল সবচেয়ে কম। অন্যদিকে চাষাধীন এলাকার হিসেবে প্রতি একরে স্থায়ী বন্দোবস্তকৃত এলাকার মধ্যে যুক্ত প্রদেশে খাজনার পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি এবং বিহার ও উড়িষ্যায় ছিল সবচেয়ে কম। অস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত এলাকার মধ্যে বোম্বে ও সিন্ধু প্রদেশে খাজনার পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি এবং সেন্ট্রাল প্রদেশে ছিল সবচেয়ে কম। সরকারি পরিচালনাধীন বা রায়তওয়ারি এলাকার মধ্যে বাংলায় খাজনার পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি ও সেন্ট্রাল প্রদেশে ছিল সবচেয়ে কম। চাষাধীন এলাকার হিসেবে প্রতি একরে গড়ে মাদ্রাজে খাজনার পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি এবং বিহার ও উড়িষ্যায় ছিল সবচেয়ে কম। অর্থাৎ বাংলা তথা পূর্ব বাংলায় সরকারি পরিচালনাধীন বা রায়তওয়ারি বা খাসমহল এলাকার খাজনার পরিমাণ ছিল সমগ্র ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সুতরাং পূর্ব বাংলায় সরকারি পরিচালনাধীন বা রায়তওয়ারি বা খাসমহলের কৃষকরা সবচেয়ে বেশি শোষিত হয়েছিল।[১৯৫] তবে সরকারি রাজস্ব প্রদানের তুলনামূলক বিচারে খাসমহলের কৃষকদের শোষণের মাত্রা বেশি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে জমিদারির অধীনস্থ কৃষকরা অধিক মাত্রায় শোষিত হয়েছিল। কারণ জমিদারি এলাকার কৃষকদেরকে নির্ধারিত খাজনার বাইরেও অসংখ্য ধরনের আবওয়াব বা বাড়তি অর্থ প্রদান করতে হতো। খান বাহাদুর মোহাম্মদ মাহমুদের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদাররা স্থায়ীভাবে জমির মালিকানাস্বত্ব লাভের পর নিরাপদ, নিশ্চিত ও বিলাসী জীবনযাপনে মনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন। জমিদাররা জমিদারি মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত অধীনস্থ জোতদারের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত ও নিরাপদ আয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এর ফলে কৃষকরা জমিদার ও

Government of Pakistan, (Karachi : Government of Pakistan Press, 1952), p. 18; Powell, *The Land Systems of British India*, p. 441; H. Martin Leake, *Land Tenure and Agricultural Production in the Tropics* (Cambridge : W. Heffer & sons Ltd., 1927), p. 14; Romesh Chunder Dutt, *Builders of Modern India*, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India (New Delhi : Government of India Press, 1967), p. 218; Khan Bahadur Mohammad Mahmud, "The Problem of Land Tenure", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II, No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950), p. 48; Shafiqur Rahman, "The Problems of Land Tenure in India and Pakistan", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II, No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950), pp. 119 and 126; Ismail Sethi, "*Land Tenures in N.W.F.P.*", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II, No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950), p. 129-130; M. Moqit, "Problems of Land Tenure in the Punjab", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II, No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950), p. 78; Mrs. Z. N. Ahmed, "Land Tenure Problems and Reform", pp. 9-10; Manoj Kumar, "Land Tenure System and the British East India Company : a Case Study of the South East Punjab", *International Journal of Scientific Redearcch* (*IJSR*), Volume 5, Issue 2, February 2016, p. 144; DOI :10. 15373/22778179; *সেন*, *ভারতে কৃষি সম্পর্ক*, পৃ. ৪-৫।

[১৯৪] *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. II, p. 123.

[১৯৫] পূর্ব বাংলায় সরকারি পরিচালনাধীন বা রায়তওয়ারি অঞ্চল খাসমহল হিসেবে পরিচিত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বাইরে প্রাপ্ত নতুন নতুন ভূখণ্ড রায়তওয়ারি ভিত্তিতে বন্দোবস্ত করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বাইরে প্রাপ্ত এই নতুন নতুন ভূখণ্ডের বেশির ভাগ ছিল পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলার নতুন নতুন চরাঞ্চল। অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় প্রধানত পতিত ভূমি ও চরাঞ্চল আবাদ করার জন্য রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের প্রচলন করা হয়। পূর্ব বাংলার ঢাকা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পাবনা, বগুড়া, ত্রিপুরা, বাকেরগঞ্জ ও সুন্দরবন এলাকার চরাঞ্চলের কয়েক লক্ষ একর পতিত জমি রায়তওয়ারি ভিত্তিতে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। এসম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1924-25*, pp. 9-10; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1928-29*, p. 19; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1929-30*, p. 19; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1931-32*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1932), p. 14-15; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1934-35*, pp. 14; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1937-38*, p. 12.

তার নিয়োগকৃত জোতদার কর্তৃক ভীষণভাবে শোষিত হয়েছিল।[১৯৬] এছাড়াও সরকার জমিদারদের ওপর নির্ধারিত খাজনার পাশাপাশি রাস্তা ও গণপূর্ত কাজের (Road and Public Works Cesses) উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য করতো এবং তা নিয়মিতভাবে জমিদারদের নিকট থেকে আদায় করা হতো। জমিদারদের ওপর ধার্যকৃত এসব করের পরিমাণ বছর বছর বৃদ্ধিও পেয়েছিল (সারণি ১৬)।[১৯৭] সারণি ১৬ থেকে দেখা যায় যে ১৯২৪-২৫ থেকে ১৯৩৭-৩৮ পর্যন্ত সময়কালে রাস্তা ও গণপূর্ত কাজের জন্য সরকারের চাহিদা ও আদায় ধীরে ধীরে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই জমিদাররাও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এসব কর বহুগুণ বৃদ্ধি করে কৃষকদের নিকট থেকে আদায় করতেন। এর ফলস্বরূপ কৃষকরা আর্থিকভাবে আরও বেশি শোষণের স্বীকার হয়েছিল।

উল্লেখ্য, জমিদার এবং জোতদারদের অবৈধ আবওয়াব আদায়ের কারণেই মূলত জমিদারি এলাকার কৃষকরা আর্থিকভাবে অমানবিক, হৃদয়বিদারক এবং ভয়াবহভাবে শোষিত হয়েছিল। ১৯২৬ সালে *গণবাণী* পত্রিকার একটি হিসেব থেকে জানা যায় যে বাংলার জমিদাররা প্রতি বছর বেআইনি আবওয়াব আদায় করতেন ৮ থেকে ১০ কোটি টাকা।[১৯৮] পার্থ চ্যাটার্জীর মতে জমির খাজনা ছাড়াও আবওয়াব এবং সেস আদায়ে জমিদাররা বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন।[১৯৯] আবওয়াব আদায়ের অর্থ অনেক সময় খাজনার অর্থের চেয়েও বেশি হয়ে যেতো এবং আবওয়াব প্রদান প্রায়ই কৃষকদের সাধ্যের বাইরে চলে যেতো। জমিদাররা বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আবওয়াব আদায় করতেন। সুপ্রকাশ রায় ১৫ প্রকার আবওয়াব আদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন : (১) জমিদার বাড়ির বিবাহ উপলক্ষ্যে আদায়; (২) বছর শেষে কৃষকদের হিসাব-নিকাশের সময় তহুরী নামে অর্থ আদায়; (৩) জমিদার বাড়ির পূজাসহ প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের খরচ বাবদ পার্বণী নামে অর্থ আদায়; (৪) জমিদার সরকারি বিদ্যালয়ে সাহায্য বাবদ যে অর্থ দান করতেন তা স্কুল খরচা নামে কৃষকদের নিকট হতে আদায় করা হতো; (৫) জমিদার ও তাঁর পরিবারের লোকজন তীর্থ-ভ্রমণ করতে গেলে তার ব্যয় বাবদ তীর্থ খরচা নামে কৃষকদের নিকট হতে অর্থ আদায় করা হতো; (৬) জমিদার ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি বা বাংলোতে খাদ্যাদি পাঠালে তার ব্যয় বাবদ রসদ খরচা নামে কৃষকদের নিকট হতে অর্থ আদায় করা হতো; (৭) গ্রামের সার্বজনীন ব্যাপারের ব্যয় কৃষকদের নিকট হতে গ্রাম খরচা নামে অর্থ আদায় করা হতো; (৮) জমিদারের ওপর সরকার হতে যে ডাককর ধার্য করা হতো তা কৃষকদের নিকট হতে ডাক খরচা নামে আদায় করা হতো; (৯) জমিদারের ঋণ পরিশোধের জন্য কৃষকদের নিকট হতে ভিক্ষা নামে ঋণের সকল অর্থ আদায় করা হতো; (১০) জমিদার বাড়িতে কোনো কারণে পুলিশ-কর্মচারী আসলে তার জন্য যে অর্থ ব্যয় হতো তা পুলিশ খরচা নামে কৃষকদের নিকট হতে আদায় করা হতো; (১১) জমিদার সরকারকে যে আয়কর দিতেন তা কৃষকদের নিকট হতে আয়কর নামে অর্থ আদায় করা হতো; (১২) জমিদারের বাড়ির ভোজের জন্য সমস্ত ব্যয় ভোজ খরচা নামে অর্থ কৃষকদের দিতে হতো; (১৩) কৃষক কোনো বাসগৃহ নির্মাণ করলে অথবা কোনো জমি লীজ নিলে সেলামি নামে কৃষকদের নিকট হতে অর্থ আদায় করা হতো; (১৪) জমিদারের খাতায় নাম তুলবার জন্য কৃষকদের খারিজ দাখিলা নামে অর্থ দিতে হতো এবং (১৫) জমিদার বা নায়েব খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারিতে বের হলে কৃষকদের নজরানা

---

[১৯৬] Mahmud, "*The Problem of Land Tenure*", pp. 45-46.

[১৯৭] *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1924-25*, pp. xxxviii-xli; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1926-27*, pp. 62-65; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1928-29*, pp. 68-71; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1929-30*, pp. 68-71; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1930-31*, pp. 64-67; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1934-35*, pp. 53-56; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1937-38*, pp. 56-58.

[১৯৮] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭৮।

[১৯৯] Chatterji, *Bengal*, p. 226.

দাখিলা নামে অর্থ দিতে হতো।[২০০] পাবনা জেলার কালেক্টরের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে উক্ত জেলার জমিদাররা কৃষকদের নিকট হতে ডাক, তহুরী, নজরানা, সেলামি, বিবাহ, হাতি, ভিক্ষা (শ্রাদ্ধ, বিবাহ বা অন্য অন্য অনুষ্ঠানের খরচ), জরিমানা, তালাবান (খাজনা আদায়ের জন্য যে পিয়ন পাঠানো হতো তার খরচ), পার্বণী, রাস্তা, রসদ খরচ নামে মোট ১২ প্রকার আবওয়াব আদায় করতো।[২০১] বগুড়া জেলার কালেক্টর মি. বিগনোল্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী বগুড়া জেলায় ১৩ প্রকার আবওয়াব প্রচলিত ছিল। এই আবওয়াবগুলো ছিল : (১) ভিক্ষা-এক বছর পর একবছর ধার্য করা হতো; (২) গ্রাম খরচা-প্রতি রূপিতে ২ আনা; (৩) জমিদারের ডাক খরচ-জমিদার কৃষকদের নিকট হতে আদায় করতেন ৩.১৩% এবং জমিদার সরকারকে দিতেন ১%; (৪) বাট্টা-প্রতি রূপিতে ৫ পয়সা; (৫) তাহরি-প্রতি রূপিতে ১ পয়সা, এটা ছিল হিসেব লেখার খরচ বাবদ; (৬) জাবত্রাই (Zabtrai)-প্রতি রূপিতে ১ পয়সা; (৭) আয়কর-জমিদারের আয়কর দিতে হতো, এটা আদায় করা হতো কৃষকদের নিকট থেকে; (৮) আকস্মিক বা বিশেষ উপলক্ষ্যে কর, যেমন (ক) বিবাহ খরচা-জমিদার পরিবারের সদস্যদের বিবাহের সময় ধার্যকৃত কর, (খ) শ্রাদ্ধ খরচা ও (গ) পুজাপার্বণী; (৯) নজর-কৃষক জমিদারকে সাক্ষাৎ করলে নজরানা দিতে হতো এবং (১০) আগমণী-জমিদার এস্টেট পরিদর্শনে এলে কৃষকদেরকে এই নামে অর্থ দিতে হতো।[২০২] আবু আল সাঈদের মতে জমিদাররা ১৪ প্রকার খাজনা ও সেলামি আদায় করতেন : (১) তহুরি-জমিদার বাড়ির বিবাহ উপলক্ষ্যে বাড়তি খাজনা আদায়; (২) পার্বণী-কোনো পালা পার্বনে জমিদার বাড়িতে উৎসবের খরচা আদায়; (৩) বিদ্যালয় খরচ-জমিদাররা যে সব বিদ্যালয় (নিজেদের নামে) স্থাপন করতেন তার জন্য আদায়কৃত খাজনা; (৪) তীর্থ খরচা- জমিদার বাড়ির কেউ তীর্থে গেলে কৃষকদেরকে খাজনা দিতে হতো; (৫) রসদ খরচা-ইংরেজ সরকারের কোনো প্রতিনিধিকে আদর-যত্ন, খাদ্য ইত্যাদির জন্য খাজনা; (৬) গ্রাম খরচা; (৭) ডাক খাজনা; (৮) ভিক্ষা-জমিদারের ঋণ শোধ করার জন্য যে খাজনা আদায় করা হতো; (৯) পুলিশ পালন খাজনা; (১০) আয়কর-জমিদার সরকারকে যে আয়কর দিতেন তা কৃষকদেরকে পরিশোধ করতে হতো; (১১) ভোজ খরচার খাজনা; (১২) সেলামি-কৃষক যদি কোনো ঘর তৈরি করতো তবে জমিদারকে সেলামি খাজনা দিতে হতো; (১৩) খারিজ দাখিলা এবং (১৪) নজরানা। সাঈদের মতে নির্ধারিত মূল খাজনার বাইরেও জমিদাররা কৃষকদেরকে নিকট থেকে এভাবে অসংখ্য ধরনের অতিরিক্ত খাজনা তথা আবওয়াব আদায় করতেন।[২০৩] আবদুল বাছির কুমুদ কুমার ভট্টাচার্যের উল্লেখপূর্বক বলেন যে জমিদার কর্তৃক কৃষকের নিকট থেকে ৩১ প্রকার বাড়তি কর তথা আবওয়াব আদায় করা হতো।[২০৪] মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সম্পাদিত ত্রৈমাসিক *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য* পত্রিকায় ১৯২২ সালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে সরকার, জমিদার, জোতদার ও মহাজন দ্বারা কৃষক শোষণের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়। উক্ত নিবন্ধে বলা হয় যে জমিদার এবং সরকারের প্রাপ্য ছিল অনেক প্রকারের। জমির বার্ষিক খাজনার সঙ্গে কৃষককে অনেক বেশি বাড়তি দিতে হতো। এসব বাড়তি আবওয়াবের মধ্যে ছিল : (১) পেয়াদার রোজ-খাজনার তাগাদার জন্য লোক (সাধারণত পাইক) পাঠানো হয় তার খোরাকি ও শ্রম বাবদ চার্জ; (২) হিসাবানা-জমিদারের গোমস্তা বা নায়েবের নজর ধার্য, খাজনার প্রতি টাকায় এক আনা হতে তিন আনা; (৩) পথকর ও সেস ধার্য, খাজানার প্রতি টাকায় তিন পয়সা হতে ছয় পয়সা; (৪) কিস্তি খেলাপি সুদ-টাকায় দু পয়সা হতে এক আনা; (৫) নজরানা-জমিদার বা ম্যানেজার বা সুপারিনটেন্ডেন্ট যখন প্রজাদের কল্যাণে মফঃস্বলে যেতেন তখন প্রত্যেক কৃষককে

---

[২০০] রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, পৃ. ৪১৮-৪১৯।

[২০১] Khan, *District Gazetteers : Pabna*, pp. 253-254.

[২০২] K. G. M. Latuful Bari (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Bogra*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dacca : Bangladesh Government Press, 1979), pp. 256-257.

[২০৩] *সংবাদ*, ১৯ এপ্রিল, ১৯৭৫।

[২০৪] আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী (১৭৫৭-১৮৫৭)*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (ঢাকা : ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮), পৃ. ৮৪।

তার সামনে হাজির হয়ে এক টাকা হতে দশ টাকা পর্যন্ত নজরানা প্রদান করতে হতো; (৬) মোকদ্দমা খরচ-কৃষকরা সময়মত খাজনা দিতে না পারায় জমিদারের বিরুদ্ধে কোর্টে প্রায়ই মামলা হতো। এই মামলার খরচ কৃষকদের বহন করতে হতো; (৭) চৌকিদারি ট্যাক্স। এছাড়াও সরকারের দাবিও কৃষককে পূরণ করতে হতো। অন্যদিকে মহাজনের প্রাপ্য ছিল দুই প্রকারের। মহাজনের নিকট হতে কৃষককে নগদ অর্থ ও ধান ঋণ করতে হতো। কৃষককে এর জন্য মহাজনকে বাড়তি লাভ দিতে হতো। অর্থাৎ মহজান নগদ অর্থের জন্য আসলের ওপর সুদ এবং ধানের ওপর সুদ হিসেবে বাড়তি আদায় করতো। হকের মতে মহাজনের আসল ঠিক থাকতো এবং বাড়তি চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেতো। এভাবে মহাজনের প্রদত্ত ঋণ স্থায়ী আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও ছিল ব্যবসায়ীদের ভিন্ন প্রক্রিয়ার শোষণ ক্রিয়া। তারা অল্পমূল্যে কৃষকের ঘর থেকে ফসল ক্রয় করে শহরে বড় ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করতো। যদিও লাভটা কৃষকেরই প্রাপ্য ছিল, কিন্তু কৃষক তার সরলতার জন্য কিছুই পেতো না। জরুরী প্রয়োজনে অনেক সময় কৃষকের উৎপাদন ব্যয়ের চেয়েও অনেক নিম্নমূল্যে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে হতো। ফলে শোষণের বেড়াজাল (Network) থেকে কৃষকের মুক্তি ছিল অসম্ভব।[২০৫]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গদেশের কৃষক* গ্রন্থে আবওয়াব সংক্রান্ত কৃষকদের ওপর জমিদারদের শোষণের এক করুণ চিত্র উপস্থাপন করেন। তিনি আবওয়াব আদায়ের একটি তালিকা দিয়ে বলেন যে ভয়ানক বন্যায় গ্রাম ডুবে গেলেও গোমস্তা ও পাইক-পেয়াদা এসে জোরপূর্বক গ্রামের কৃষকের ওপর জমিদার, নায়েব-গোমস্তাসহ বিভিন্ন কর্মচারীর প্রাপ্য উপলক্ষ্যে আবওয়াব ধার্য করে তা আদায় করতো (সারণি ১৭)।[২০৬] তাঁর মতে ভয়াবহ বন্যার সময় কৃষকরা তাদের যৎসামান্য যে সম্পদ থাকতো তা বিক্রি করে এবং ঋণ নিয়ে জমিদারের চাহিদা পূরণ করতো। কিন্তু এর অল্প কিছুদিন পর পুনরায় গোমস্তা ও পাইক-পেয়াদা উপস্থিত হয়ে জমিদারের কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে আরও বাড়তি দেওয়ার জন্য কৃষকদের ওপর প্রচণ্ড চাপ দিতো। এমন পরিস্থিতিতে কৃষকরা নীলকুঠীতে ঋণ চাইলে তারা ঋণ পেতো না। মহাজনরাও তাদের ঋণ দিতে আগ্রহ দেখাতো না। তখন তারা ফৌজদারি আদালতে গিয়ে নালিশ করতে বাধ্য হতো। বিচারে আসামিদের (জমিদারের গোমস্তা ও পাইক-পেয়াদা) সাজা হতো। কিন্তু সাজার বিরুদ্ধে আসামিরা আপীল করতো। আপীল বিচারের রায়ে জজ সাহেব তাঁর রায়ে উল্লেখ করতেন যে কৃষকদের ওপর অত্যন্ত অত্যাচার হয়েছে বটে, কিন্তু আইন অনুসারে তিনি আসামিদের খালাস দিলেন। চট্টোপাধ্যায়ের মতে সুবিচার হতো বটে, কিন্তু কে না জানে বিচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল আসামিদের খালাস দেওয়া।[২০৭] উক্ত গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেন, "জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্যে; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগলাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতোদি বৃৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ।"[২০৮] যদিও চট্টোপাধ্যায় জমিদার বা ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন না, তবুও তাঁর বিবরণ থেকে জমিদার কর্তৃক ব্রিটিশ শাসনামলে কৃষকদের ওপর জমিদারদের শোষণের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছিল। জমিদার কর্তৃক কৃষক শোষণের একই চিত্র ফুটে উঠেছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্যেও। তিনি নিজে একজন জমিদার হয়েও কৃষকদের ওপর জমিদারদের শোষণ সম্পর্কে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণে

---

[২০৫] মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (সম্পাদিত), *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা* (ত্রৈমাসিক), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র, পঞ্চম বর্ষ-১৩২৯ (১৯২২), ৩য় সংখ্যা, (কলিকাতা : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি, ১৯২২), পৃ. ২১২-২১৬।

[২০৬] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্গদেশের কৃষক*, পৃ. ২৯৬।

[২০৭] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্গদেশের কৃষক*, পৃ. ২৯৬।

[২০৮] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্গদেশের কৃষক*, পৃ. ২৯১-২৯২।

বলেছিলেন, 'জমিদার বণিকের মতো কেবল দীনভাবে আদায় করার পথগুলো সর্বপ্রকারে মুক্ত রেখেছেন'। এমনকি, তিনি কৃষকদের ওপর জমিদারদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা ব্যবহারেরও অভিযোগ করেছিলেন।[২০৯]

অন্যদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে কৃষকরা জমিদার কর্তৃক নির্মম-নির্দয়ভাবে নিপীড়িতও হয়েছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার কৃষকদের ওপর জমিদারদের অত্যাচার-নির্যাতনের ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি এই অত্যাচার-নির্যাতনের বর্ণনায় বলেন,

> ভূম্যধিকারির লোকে বল দ্বারা প্রজাদের ধান্যগ্রহণ করে, গো সকল হরণ করে, এবং তাহারদিগকে গোণী-বন্ধ করিয়া জলমগ্ন করে ও প্রহার করে। ভূস্বামী ও দারোগা এবং তাহাদের কর্ম্মচারিরা প্রজাদিগের যে প্রকার শারীরিক দণ্ড করে, তাহা কলিকাতাবাসি অনেক লোকে সবিশেষে অবগত নহেন। অতএব পশ্চাৎ কয়েক প্রকার কায়দণ্ডের বিবরণ করা যাইতেছে, যথা (১) দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত করে। (২) চর্ম্মপাদুকা প্রহার করে। (৩) বংশকাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষঃস্থল দলন করিতে থাকে। (৪) খাপরা দিয়া কর্ণ ও নাসিকা মর্দ্দন করে। (৫) ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ করায়। (৬) পৃষ্ঠভাগে বাহুদ্বয় নীত করিয়া বন্ধন করে এবং বন্ধন করিয়া বংশদণ্ডাদি দ্বারা মোড়া দিতে থাকে। (৭) গাত্রে বিছুটি দেয়। (৮) হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় নিগড় বদ্ধ করিয়া রাখে। (৯) কর্ণধারণ করিয়া ধাবন করায়। (১০) কাটা দিয়া হস্ত দলন করিতে থাকে (অর্থাৎ দুইখানি কঠিন বাখারির এক দিক বাঁধিয়া তাহার মধ্যে হস্ত রাখিয়া মর্দ্দন করিতে থাকে। এই প্রাণ-ঘাতক যন্ত্রের নাম কাটা)। (১১) গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে পাদদ্বয় অতি বিযুক্ত করিয়া ইষ্টপোকারি ইষ্টক হস্তে দণ্ডায়মান করিয়া রাখে। (১২) অত্যন্ত শীতের সময় জলমগ্ন করে ও গাত্রে জল নিঃক্ষেপ করে। (১৩) গোণীবদ্ধ করিয়া (ছালার মধ্যে পুরিয়া) জলমগ্ন করে। (১৪) বৃক্ষে বা অন্যত্র বন্ধন করিয়া লম্বমান করে। (১৫) ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধান্যের গোলায় পুরিয়া রাখে (সে সময়ে গোলার অভ্যন্তর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, এবং ধান্য হইতে প্রচুর বাষ্প উঠিতে থাকে)। (১৬) চুণের ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখে। (১৭) কারারুদ্ধ করিয়া উপবাসি রাখে, অথবা ধান্যের সহিত তণ্ডুল মিশ্রিত করিয়া তাহাই এক সন্ধ্যা আহার করিতে দেয়। (১৮) গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া লঙ্কা মরিচের ধুম প্রদান করে।[২১০]

উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে কৃষকদের ওপর জমিদারদের শোষণ ও নিপীড়ন শুধুমাত্র আর্থিক এবং শারীরিক নির্যাতনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তারা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিল। কৃষকদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রেও জমিদাররা হস্তক্ষেপ করতো। প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতারও সূত্রপাত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুফিয়া আহমেদের মতে বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় উনিশ শতকের শেষ দশকে এবং বিশ শতকের প্রথম দশকে বেশ কয়েকবার বকরী ঈদ বা ঈদুল আযহার সময় হিন্দু জমিদাররা মুসলমান কৃষকদের গরু কোরবানীতে বাধা দেন। এর ফলে হিন্দু জমিদার এবং মুসলমান কৃষকদের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে, এমনকি এটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেও পরিণত হয়েছিল।[২১১] উল্লেখ্য, কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন কেবলমাত্র জমিদাররাই করতো না বরং তাদের অধীনস্থ মধ্যস্বত্বভোগী জোতদাররাও একইভাবে তাদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন করতো।[২১২] জমিদার কর্তৃক নির্ধারিত খাজনার চেয়েও তারা কৃষকদের নিকট হতে অনেক বেশি বাড়তি অর্থ আদায় করতো। পাশাপাশি তারা গ্রামীণ হাট-বাজারগুলোতে ইজারাদার হিসেবে *তোলা* আদায় করতো।[২১৩] এর মধ্যে একটি *তোলা*র নাম ছিল 'ঈশ্বরবৃত্তি' বা 'ধলতা'।[২১৪] এছাড়াও জোতদাররা ছিলেন স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী। এ কারণে তারা সহজেই কৃষকদের ওপর শোষণ ও

---

[২০৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দশম খণ্ড (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ, ১৮৯৩), পৃ. ৫১৮।

[২১০] মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫।

[২১১] এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, Ahmed, *Muslim Community in Bengal*, pp. 154-158 and 284-285; Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims 1871-1906 : A Quest for Identity* (Delhi : Oxford University Press, 1981), pp. 171-173.

[২১২] বিস্তারিতভাবে দেখুন, মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, পৃ. ৩৭৮-৩৮৯।

[২১৩] *তোলা* অর্থ এক ধরনের হাট-বাজার কর। গ্রামীণ হাট-বাজারগুলিতে যে সকল পণ্য আসে তা সেখানে বিক্রির জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'জনকেই এক ধরনের হাট-বাজার কর দিতে হয়। এক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষে পণ্যের কর হলো *তোলা* নামক এক ধরনের কর। ক্রেতার পণ্য থেকে কিছু পরিমাণ পণ্য নেওয়ার নামই হলো *তোলা*।

[২১৪] 'ঈশ্বরবৃত্তি' বা 'ধলতা' হলো এক ধরনের হাট-বাজার কর। প্রতি মণ কৃষিজ পণ্যের ওপর কৃষককে এক বা দেড় সের বেশি দিতে হতো। এর নাম হলো 'ঈশ্বরবৃত্তি' বা 'ধলতা'।

নিপীড়ন করতে পারতো। যেমন দিনাজপুরের অধিকাংশ জোতদার ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বর্গাদার কৃষকরা কোনো ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারতো না বা প্রতিবাদ করতেও সাহস পেতো না। সরকার, প্রশাসন, পুলিশ, এমনকি আইন-আদালতও জোতদারদের পক্ষ নিতো। জোতদাররা 'অভিভাবক' হিসেবে বর্গাদার কৃষকদের ব্যবহার করে রাজনৈতিক সুবিধাটুকু নিতেও ছাড়তেন না। নির্বাচনের সময় জোতদারদের পছন্দ মতো রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তিকে সমর্থন করতে কৃষকদের বাধ্য করা হতো। এমনকি, জোতদারদের হাত থেকে বর্গাদার কৃষকদের স্ত্রী-কন্যা এবং পুত্রবধুর সম্মান রক্ষা করাও সহজ হতো না।[২১৫] সুতরাং কৃষকরা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শোষণ ও শারীরিক নিপীড়ন নির্যাতন নয় বরং ধর্মীয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও জমিদার ও জোতদার কর্তৃক শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়েছিল যা কৃষকের সাংস্কৃতিক মূল কেন্দ্রে আঘাতের মতো ছিল।

ব্রিটিশ শাসনামলে কৃষক শোষণ-নিপীড়নের আরও একটি বিশেষ দিক ছিল কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা ও বকেয়া আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট প্রথার প্রবর্তন। ১৯১৩ সালের আইনে (Bengal Act III of 1913) সর্বপ্রথম সার্টিফিকেট প্রথার সূচনা হয়েছিল। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার বেঙ্গল সার্টিফিকেট ম্যানুয়াল প্রকাশ করে। এরপর থেকে আদালতে সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯১৪-১৫ সালে ভূমি রাজস্ব চাহিদা ছিল ২,৭৩,৬৭,৫৩১ টাকা এবং ১৯৩২-৩৩ সালে রাজস্ব চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,০৫,২৮,৯৫৯ টাকা। ১৯১৪-১৫ থেকে ১৯৩২-৩৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৯ বছরে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩১,৬১,৪২৮ টাকা বা ১১.৫৫%। অর্থাৎ প্রতি বছর ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির হার ছিল ০.৬১%। অন্যদিকে ১৯১৪-১৫ সালে রাজস্ব বিষয়ে সার্টিফিকেট জারি হয়েছিল ৫৯,৫৬০টি এবং ১৯৩২-৩৩ সালে রাজস্ব বিষয়ে সার্টিফিকেট জারির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১,৫৫,২৮০টি।[২১৬] ১৯১৪-১৫ হতে ১৯৩২-৩৩ পর্যন্ত মোট ১৯ বছরে রাজস্ব বিষয়ে সার্টিফিকেট ইস্যু বৃদ্ধি পায় ৯৫,৭২০টি বা ১৬০.৭১%। অর্থাৎ প্রতি বছর রাজস্ব বিষয়ে সার্টিফিকেট জারির সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৪৬%। সমকালীন সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৯১৩ সালের আইনে ১৯২৪-২৫ থেকে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব সম্পর্কিত মামলার সংখ্যা এবং তার সমাধান বা অপসারণও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল (সারণি ১৮)।[২১৭] সারণি ১৮ থেকে দেখা যায় যে খাজনা ও বকেয়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন জেলায় মামলার সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি সার্টিফিকেট জারির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর সার্টিফিকেট জারি বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষক হয়রানি বৃদ্ধির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে কৃষক হয়রানিও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে ভোট রাজনীতির কারণে সচ্ছল কৃষকদের ভোটে নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকার কৃষকদের স্বার্থে কখনও কখনও সার্টিফিকেট জারি স্থগিত করেছিল। ১৯৪০ সালের ১৮ মার্চ রাজস্বমন্ত্রী স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের জানান যে ভূমি রাজস্ব অনাদায়ে কৃষকদের নামে সার্টিফিকেট ইস্যু ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে স্থগিত রাখা হয়েছে। এর কারণ ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে দেওয়ানি আদালতে সার্টিফিকেট মামলায় কৃষকের হয়রানি এবং অনেক অর্থ খরচ করতে হয়। এই

---

[২১৫] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৬৬-৬৭।

[২১৬] *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1914-15*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1915), pp. 3-6; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1932-33*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1932), pp. 5-8.

[২১৭] *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1924-25*, pp. xvi-xviii; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1926-27*, pp. 42-44; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1928-29*, pp. 46-48; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1929-30*, pp. 46-48; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1930-31*, pp. 42-44; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1934-35*, pp. 40-42; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1937-38*, pp. 42-44.

ধারণা থেকেই সরকার হয়রানি ও অর্থ খরচ হতে কৃষকদেরকে অব্যাহতি দিতে সার্টিফিকেট ইস্যু দুই বছর স্থগিত করেছে।[২১৮] সুতরাং সরকারই স্বীকার করেছিল যে সার্টিফিকেট জারির কারণে কৃষকের অর্থ খরচ ও হয়রানি দুই-ই হতো। উপরিউক্ত শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তি পেতে কৃষকরা ক্রমান্বয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল।

৩.৪.২ কৃষক আন্দোলন

ব্রিটিশ শাসনাকালে প্রধানত রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণ এবং দীর্ঘস্থায়ী ও নির্বিঘ্ন শাসনব্যবস্থা পরিচালনার স্বার্থে সরকারি নীতি কৌশলের বেশ কয়েকবার পরিবর্তন ঘটেছিল এবং সরকার ভূমিস্বত্বের পরিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন করেছিল। এসব আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হলেও তা কৃষি অসন্তোষ তথা ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। একদিকে ইংরেজ রাজত্বকালে কৃষকরা ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকারহীন হয়ে পড়ে এবং অন্যদিকে তাদের ওপর জমিদার ও জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়ন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে অসহনীয় হয়ে উঠে। এর ফলস্বরূপ ঔপনিবেশিক শাসনামলে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। আবদুল বাছির ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগের প্রথম একুশ বছরে সংঘটিত ২৫টি কৃষক বিদ্রোহের পেছনে মোট ১৫টি কারণ উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কৃষকদের আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীনে ভূমি মালিকানা ও কর ব্যবস্থায় কৃষক সমাজ উপেক্ষিত হওয়া, সামাজিক ন্যায়বিচার, নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও অধিকার সম্পর্কে কৃষক সমাজের উপলব্ধিবোধ, সচেতনতাবোধ, সংহতি ও ধর্মীয় চেতনা এবং ভূমি কর ও অতিরিক্ত কর পরিশোধে কৃষকদের অক্ষমতা।[২১৯] রণজিত গুহের মতে ব্রিটিশ শাসনামলের অধিকাংশ কৃষক বিদ্রোহের মূলে ছিল জমিদারদের উচ্চহারে খাজনা ধার্য এবং তা জবরদস্তিমূলকভাবে আদায় করা। তিনি বলেন যে জমিদারদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংহতিবোধ জাগ্রত হওয়া সংগঠিত কৃষকদের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণেই ব্রিটিশ আমলে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল।[২২০]

অর্থাৎ বাংলা তথা পূর্ব বাংলার কৃষকগণ জমিদার ও জোতদারদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ ও নিপীড়ন নীরবে সহ্য করেনি বরং এর বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ১৭৮৩ সালে সংঘটিত রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ।[২২১] উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস দেবী সিংহকে প্রথমে পুর্ণিয়া ও রংপুর জেলার রাজস্ব ঠিকাদার এবং ১৭৮০ সালে দিনাজপুর জমিদারির ম্যানেজার নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর আরোপিত অতিরিক্ত করের চাপে ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৭৮৩ সালে দিনাজপুর এবং রংপুরের কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই বিদ্রোহ এমন চরম আকার ধারণ করেছিল যে তা দমন করার জন্য সরকারকে সৈন্য বাহিনী নিয়োগ করতে হয়েছিল। ১৭৮৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কৃষকদের সাথে ব্রিটিশ সৈন্যদের পাটগ্রাম নামক স্থানে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধানের জন্য সরকার দু'টি কমিশন নিয়োগ করে এবং দেবী সিংহকে অপসারণ করা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া

---

[২১৮] *Assembly Proceedings*, Vol. LVI, No. 4, 1940, pp. 193-194.

[২১৯] বিস্তারিতভাবে দেখুন, বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী*, পৃ. ৭৯-১২০।

[২২০] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Ranajit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India* (New Delhi : Oxford University Press, Oxford India Paperbacks, 2002), pp. 18-219.

[২২১] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Jon E. Wilson, "A Thousand Countries to go to : Peasants and Rulers in late eighteenth-century Bengal", Past & Present, a journal of historical studies, Number 189, November 2005 (Oxford : The Past & Present Society, 2005), pp. 81-109.

কোম্পানির শাসনামলে জমিদার বা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে রংপুর কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। রংপুর কৃষক বিদ্রোহের গুরুত্ব সম্পর্কে জন ই. উইলসন যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছেন,

> The inhabitants of Rangpur and its surrounding districts are proud that their ancestors initiated 'the first formidable peasant uprising against the rule of the East India Company'. But the stories which residents tell now about 1783 are overlaid with the memories of other events. In Bangladesh, conceptions of the Rangpur uprising are perceived as part of longer narratives about the fight against landholder oppression and the struggle for national liberation against British, Indian and sometimes also Pakistani rule.[222]

একইভাবে ১৮৩১ সালের তিতুমীরের কৃষক আন্দোলনেরও কারণ ছিল জমিদারদের শোষণ ও নিপীড়ন।[২২৩] ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর নারিকেল বাড়িয়ায় সরকারের প্রেরিত সেনা কমান্ডার আলেকজান্ডার ও মেজর স্কটের নেতৃত্বে পদাতিক, অশ্বারোহী ও বন্দুকধারী সৈন্যদের এক বিরাট বাহিনী তিতুমীরের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধে তিতুমীর শহীদ হলে কৃষক আন্দোলনের অবসান হয়। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে ফরায়েজি আন্দোলনও সংঘটিত হয়েছিল একই কারণে। ফরিদপুরের ঘোষ এবং সরকার জমিদারদের অত্যাচারের কারণে দুদু মিয়া জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ফরায়েজিরা প্রধানত জোরপূর্বক উচ্চহারে খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এছাড়াও জমিদারদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের আরও অসংখ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল যেমন ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের প্রজাবিদ্রোহ, বাকেরগেঞ্জর তুষখালী বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, বাকেরগেঞ্জর মেহেন্দীগঞ্জ প্রজাবিদ্রোহ প্রভৃতি।[২২৪]

উপরন্তু, ১৮৫৯-৬০ সালের নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল প্রধানত ইউরোপিয়ান নীলকরদের নির্মম শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে।[২২৫] অর্থাৎ অন্যান্য বিদ্রোহের ন্যায় নীল বিদ্রোহও একই কারণে তথা কৃষকদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত শোষণ ও নিপীড়নের ফলে সংঘটিত হয়েছিল। তবে কৃষকদের ওপর নীলকরদের শোষণ-নির্যাতনের মাত্রা ছিল দেশীয় জমিদারদের তুলনায় আরও অনেক বেশি। দেশীয় জমিদারদের শোষণ-নির্যাতনেরই বিচার পেতো না কৃষকরা। ইউরোপিয়ান জমিদার-নীলকরদের নিকট কৃষকেরা ছিল আরও বেশি অসহায়। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটগণ স্বভাবতই স্বজাতীয় নীলকরগণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতো তা ১৮৬০ সালে নীলকর কমিশনও স্বীকার করেছিল। ১৮৬০ সালে গঠিত নীলের চাষ সংক্রান্ত বিষয় তদন্তের জন্য গঠিত নীল কমিশনের সুপারিশের আলোকে সরকার নীল চাষ করা কৃষকদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন বলে আদেশ জারি করতে বাধ্য হয়।[২২৬] উল্লেখ্য, ১৮৫৯-৬০ সালের নীল বিদ্রোহের সময় বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি কর্তৃক প্রকাশিত তৎকালীন উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে *হিন্দু পেট্রিয়ট*, *সমাচার দর্পণ*, *সোমপ্রকাশ*, *সমাচার চন্দ্রিকা*, *সংবাদ ভাস্কর*, *সংবাদ প্রভাকর* প্রভৃতি পত্রিকা শোষিত ও নিপীড়িত কৃষকদের পক্ষে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয় কুমার দত্ত, মীর মোশাররফ

---

[২২২] Wilson, "A Thousand Countries to go to", p. 107.

[২২৩] তিতুমীরের আন্দোলন ছিল পশ্চিম বাংলার কয়েকটি জেলায় বিস্তৃত। কিন্তু এর প্রভাব পূর্ব বাংলার কৃষকদের ওপরও পড়েছিল বলে এখানে উল্লেখ করা হলো।

[২২৪] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Choudhury, *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal*, pp. 11-71; Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, p. 18-219; রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, পৃ. ১০৫-১১২, ২৩৩-২৩৬, ২৮২-৩৪১, ৩৮২-৪৩১; হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ২৩-৩৮; চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৩৪৫-৩৯৪; *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. ৮-১১; চন্দ, *নীল বিদ্রোহ*, পৃ. ৯-১০৯; আখতার উদ্দিন মানিক, *শাহজাদপুর কৃষক বিদ্রোহ ও ঠাকুর জমিদার* (ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৪), পৃ. ৯৫-১৭০।

[২২৫] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Choudhury, *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal*, pp. 73-115; Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, p. 26; Ramachandra Guha (ed.), *Makers of Modern India* (Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, United States of America, 2011), pp. 47-49.

[২২৬] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. ৮-১১।

হোসেন, শিশিরকুমার ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাও নীল বিদ্রোহী কৃষকদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নীল বিদ্রোহে পূর্ব বাংলার যশোর, কুষ্টিয়া (তৎকালীন নদীয়া জেলার অংশ), ফরিদপুর, পাবনা ও রাজশাহী জেলার কৃষকদের ভূমিকা ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[২২৭] সালাহ্উদ্দীন আহ্মদের মতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় সরাসরি ও প্রকাশ্যে কৃষক বিদ্রোহ সমর্থন করেননি, তাঁর আশঙ্কা ছিল যে এর প্রভাবে কৃষকদের দ্বারা জমিদারদের স্বার্থ বিঘ্নিত এবং ভাবমূর্তি কলুষিত হতে পারে।[২২৮] কিন্তু তাঁর লেখনীতে ও কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে চট্টপাধ্যায় নীল বিদ্রোহী কৃষকদের সমর্থন করেছিলেন। উল্লেখ্য, নীল বিদ্রোহ ছিল পূর্ব বাংলায় সংঘটিত অন্য বিদ্রোহ থেকে পৃথক। এই সর্বপ্রথম কোনো বিদ্রোহে কৃষকদের পাশে পত্রিকা ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি সম্পৃক্ত হয়েছিল। এই বিদ্রোহ দেশীয় এবং ইউরোপীয় জমিদারদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের মধ্যে ক্রমপ্রসার্যমানভাবে ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার লাভের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করেছিল। নীল বিদ্রোহের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ ছিল ১৮৭২ সালের পাবনার কৃষক বিদ্রোহ।[২২৯] ১৮৭২ সালে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহাকুমার (বর্তমানে জেলা) কৃষকরা জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। নির্ধারিত খাজনা বহির্ভূত অতিরিক্ত বেআইনী ও উৎপীড়নমূলক কর দিতে অস্বীকার করায় জমিদার এবং কৃষকদের মধ্যে বছর ব্যাপী সংঘর্ষ চলেছিল। পাবনার বিদ্রোহ বগুড়ার কৃষকদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। অতঃপর সরকারের হস্তক্ষেপে কৃষক বিদ্রোহের অবসান হয়।[২৩০] উল্লেখ্য, ১৮৭২-৭৩ সালের পাবনার কৃষক বিদ্রোহের সময় বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আনন্দমোহন বোস, রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মোশারফ হোসেন প্রমুখ কৃষকদের পক্ষে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমনকি, তৎকালীন বাংলার অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও আনন্দমোহন বোস ভারত সভার উদ্যোগে কৃষকদের স্বার্থে আরও উদার খাজনা আইন প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জনসভার আয়োজন করেছিলেন।[২৩১]

উপরিউক্ত কৃষক বিদ্রোহসমূহ কৃষকদের অধিকার আদায়ে সচেতন করে তুলেছিল। অন্যদিকে নীল বিদ্রোহ ও পাবনার কৃষক বিদ্রোহে তৎকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও তাদের পরিচালনায় প্রকাশিত বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকা এবং বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কৃষকদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের গুরুত্ব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। এর ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব হ্রাসে মনোযোগী হয়েছিল। এরপরই ভূমি বিরোধ হ্রাসে সরকারের নীতি কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল। বস্তুতপক্ষে, শাসনকর্তৃপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে ভূমি বিরোধ হ্রাসে ব্যর্থ হলে ঔপনিবেশিক স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। কারণ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য কৃষক বিদ্রোহ ছিল হুমকিস্বরূপ।[২৩২] এর ফলস্বরূপ ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত আইন প্রণীত হয়।[২৩৩] বিশ শতকের প্রথমদিকে প্রখ্যাত সিভিলিয়ান ও অর্থনীতিবিদ রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করে লর্ড কার্জনকে লেখা কয়েকটি খোলা চিঠিতে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলায় একটি শিক্ষিত প্রভাবশালী জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে।

---

[২২৭] বিস্তারিতভাবে দেখুন, চন্দ, *নীল বিদ্রোহ*, পৃ. ৭৩-৯০।

[২২৮] আহ্মদ, *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পৃ. ১০৩।

[২২৯] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Choudhury, *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal*, pp. 117-151; Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, pp. 172-173.

[২৩০] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. ১১।

[২৩১] Islam, *Economic History of Bengal*, pp. 165-166.

[২৩২] চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম*, পৃ. ৫৪।

[২৩৩] Islam, *Economic History of Bengal*, p. 166; *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. ১১।

এই জমিদার শ্রেণি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা সজাগ ছিল। যেহেতু এই শাসনের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িত ছিল কাজেই সুশাসনের জন্য তারা সর্বদাই শাসক গোষ্ঠীকে সহযোগিতা করে চলেছিল। তাছাড়া জমিদার ও কৃষকের মাঝখানে একটি শক্তিশালী বুদ্ধিমান মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর মতে এই মধ্যস্বত্বভোগী জোতদার শ্রেণির সঙ্গে ভূমিস্বত্বের সংশ্লিষ্টতা ছিল এবং তারা সমাজে প্রগতিশীল শ্রেণি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর মতে সর্বশেষে ছিল এক সচ্ছল কৃষক সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় যেমন ভূমিস্বত্বের ওপর নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে সক্ষম তেমনি খরা ও বন্যায় ফসল নষ্ট হলে প্রথম আঘাত স্বাচ্ছন্দ্যে তারা প্রতিহত করতে পারতো।[২৩৪] অর্থাৎ তাঁর মূল বক্তব্য হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল ব্রিটিশ এবং এদেশীয় জমিদার, জোতদার ও কৃষক সকলের জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু দত্তের এই চিন্তাধারা ও অভিমতের বিরোধীতা করে বড়লাট লর্ড কার্জন মন্তব্য করেন, "They know that the evils of absenteeism, of management of estate by unsympathetic agents, of unhappy relations between landlords and tenants, and the multiplication of the tenure holder or middlemen between the zamindar and the cultivator in many and various degrees, are atleast as marked and as much on the increase there as elsewhere."[235] কার্জন দত্তের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলো তুলে ধরেন তার গুরুত্ব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। কারণ কার্জন এবং অন্যান্য ব্রিটিশ শাসকের অভিযোগ ছিল জমিদাররা অত্যাচারী, অনুপস্থিত এবং কৃষকদের কাছ থেকে তারা নানা অজুহাতে বহু বেআইনি কর আদায়ে ব্যস্ত থাকতো। এমনকি, জমিদাররা নিজেদের স্বার্থেই অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে কৃষকদের শোষণ ও নিপীড়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ কারণে জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার থেকে কৃষকদের বাঁচানোর জন্য সরকারকে উনিশ শতকে অন্তত দু'বার (১৮৫৯ ও ১৮৮৫) হস্তক্ষেপ করতে হয়। এর ফলে দু'টি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই দু'টি আইনের উদ্দেশ্য ছিল বর্ধিত কর ও উচ্ছেদের হাত থেকে কৃষক সমাজকে রক্ষা করা। তবে শাসকবর্গ এমন কৃষক দরদী অভিমত দিলেও বাস্তবতা ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থ নিশ্চিত রাখতে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা রক্ষার উদ্দেশ্যে উনিশ শতকে প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নে শাসনকর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছিল। কৃষককে অন্যায় শোষণ ও নিপীড়ন হতে রক্ষা করা উক্ত আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তাই যদিও উক্ত আইন কৃষকের অধিকার এবং স্বার্থরক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল কিন্তু সার্বিকভাবে এই আইন ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব হ্রাস করতে ব্যর্থ হয়েছিল।[২৩৬]

তবে এটিও সত্যি যে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত আইন প্রণয়নের পর থেকে কৃষকদের ওপর জমিদারদের শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছিল। এটি প্রণয়নের পর ভূমি বিরোধ এবং কৃষক বিদ্রোহ অব্যাহত থাকলেও বিদ্রোহের প্রকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল। প্রকৃতপক্ষে বিশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক বিদ্রোহ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এবং কৃষক আন্দোলন পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে। বিশ শতকের শুরুতে যে জাতীয় রাজনীতির সূচনা হয়েছিল তা ছিল কৃষকদের অনুকূলে। বিশ শতকের রাজনীতি কৃষকদের অধিকার আদায়ের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সুযোগে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকরাই জমিদারদের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। এ কারণে বঙ্গভঙ্গবিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকরাই জমিদারদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের

---

[২৩৪] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ২০;
[২৩৫] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৩৭।
[২৩৬] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ২০-২১।

সময়কালে বাংলার মুসলমান ও হিন্দু নমঃশূদ্র বর্গাদার কৃষকরা জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এমনকি, এসময় অনেক মহাজন ও জোতদাররা বর্গাদার কৃষকের হাতে লাঞ্ছিতও হয়েছিল। উপরন্তু, বর্গাদার কৃষকরা রাজস্ব কর্মকর্তাদের নিকট জমিদারদের খাজনা আদায়ের পদ্ধতিগত পরিবর্তনের জন্যও অনুরোধ করেন। যেমন বাকেরগঞ্জ জেলার বর্গাদাররা সেটেলমেন্ট অফিসারদের কাছে 'নগদ খাজনা' ধার্য করার প্রার্থনা জানিয়েছিল। জমিদারদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ৯৭ শতাংশ ক্ষেত্রে তা মঞ্জুর করা হয়েছিল।[২৩৭] এই আন্দোলনের সময় পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে মুসলমান ও হিন্দু নমঃশূদ্র উভয় ধর্মের কৃষকরাই জমিদার ও জোতদারদের খাজনা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে চরম পন্থা গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে ১৯০৭ সালে ময়মনসিংহের জামালপুরে হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের বিদ্রোহ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল বিক্রীত গরু প্রতি চৌদ্দ আনা কর ধার্য, মেলায় গরু বিক্রির জন্য জমিদারকে সেলামি প্রদান এবং মেলায় গরু বিক্রির সময় মহাজনের ঋণের সুদের কিস্তি দিতে কৃষককে বাধ্যকরণ। কৃষকরা জমিদার ও মহাজনদের এসব কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করলে জমিদার ও মহাজনরা তাদের লাঠিয়াল বাহিনী এবং পুলিশ দিয়ে কৃষকদের ওপর নির্মম নির্যাতন শুরু করে। এর ফলস্বরূপ জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয়। এই সংঘর্ষের সময় গুলি ও বোমা বর্ষণে এবং লাঠির আঘাতে অসংখ্য কৃষক হতাহত হয়। ময়মনসিংহের কৃষক বিদ্রোহের অনুরূপ ছিল ১৯০৭ সালে খুলনার বাগেরহাট অঞ্চলে মুসলমান জোতদারদের বিরুদ্ধে হিন্দু নমঃশূদ্র ভাগচাষীদের সংগ্রাম। উল্লেখ্য, ১৯০৬ সালে অনাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক অজন্মা দেখা দেয়। দরিদ্র চাষিদের খাদ্যাভাবের পাশাপাশি বাড়তে থাকে জোতদারদের জুলুম অত্যাচার। জোতদাররা পূর্বে ভাগচাষীদের আধাআধি ভাগে জমি চাষ করতে দিলেও অজন্মার বছরে তারা কৃষকদের নিকট অর্ধেকের বেশি দাবি করতে থাকে। ভাগচাষীরা এই দাবি মানতে অস্বীকার করে। ভাগচাষীরা সভা-সমিতি করে স্থির করে যে তারা জোতদারদের জমি চাষ করবে না। এভাবে দীর্ঘদিন ধর্মঘট চলার পরে জোতদাররা ভাগচাষীদের দাবি মেনে নিলে ধর্মঘটের অবসান হয়েছিল।[২৩৮] আবার ১৯০৯ সালে যশোরের মুসলমান বর্গাদাররা হিন্দু জমিদারের জমি ভাগে চাষ করতে অস্বীকার করে। তারা দাবি করে যে উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ তাদেরকে দিতে হবে। ধর্মীয় সূত্রে ঐক্যবদ্ধ হলেও বর্গাদারদের দাবি ছিল অর্থনৈতিক। এদিকে ১৯১৩ সালে সিরাজগঞ্জের মুসলমান বর্গাদাররা উৎপন্ন ফসল হিন্দু জমিদারদের খামারে তুলতে অস্বীকার করে। কৃষকরা ভাগ চাষে জমি বন্দোবস্ত নিতেও অস্বীকার করেছিল। ১৯১৮ সালে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার বর্গাদার কৃষকরা এক বছর জমিদারদের বর্গা জমি চাষ না করে বসেছিল।[২৩৯] অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় কৃষকরাও জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। উল্লেখ্য, এই আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলিম জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে উভয় ধর্মের কৃষকদের সম্পৃক্ততা ছিল। ফলে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে সংঘটিত কৃষক আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে বরং তা ভূ-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। বস্তুতপক্ষে, উক্ত সময়ের আন্দোলনের মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব।

উল্লেখ্য, বিশ শতকের বিশের দশকেও কৃষক আন্দোলন অব্যাহত ছিল। বিশের দশকের শুরুতে গড়ে উঠা খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন থেকে কৃষকরা জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। আরও উল্লেখ্য যে, মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বে বাংলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন

[২৩৭] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৬৮।
[২৩৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ১৮০-১৮৩।
[২৩৯] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৬৭।

পরিচালিত হয়েছিল। বঙ্গীয় খিলাফত কমিটির সেক্রেটারি মোহাম্মদ আকরম খাঁর নেতৃত্বে ১৯২১ সালের ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলায় ৩৪৭টি খিলাফত কমিটি গঠিত হয়েছিল যার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬,৬৮০ জন। এর মধ্যে জেলা এবং মহাকুমা পর্যায়েও কমিটি গঠিত হয়েছিল। পূর্ব বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তথা কৃষকরা মুসলমান হওয়ায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে কৃষকদের সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনে কৃষকদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে জমিদারপন্থী নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক কূটকৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এই কৌশলের অংশ হিসেবে নেতৃবৃন্দ কৃষকদেরকে দেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে না গিয়ে কেবলমাত্র ইউরোপিয়ান জমিদার ও ব্রিটিশ স্বার্থের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কৃষকরা প্রথমে ইউরোপিয়ান জমিদার এবং পরে দেশীয় জমিদারদের খাজনা দেওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিল। তাদের নিকট থেকে কৃষকরা দাবি আদায়ের কৌশল শিক্ষা লাভ করেছিল। কৃষকরা এই শিক্ষাকে নিজেদের স্বার্থে দেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করেছিল। যেমন খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনের সময় রাজশাহীতে কৃষকরা দেশীয় জমিদারদেরও খাজনা দিতে অস্বীকার করেছিল।[২৪০] এ সম্পর্কে চন্ডিপ্রসাদ সরকার মন্তব্য করেন,

> While the provincial Khilafat leadership sought to preace boycott and swaraj, some local Khilafat leaders engaged themselves in organising the raiyats in certain areas of Rangpur, Faridpur, Bakharganj, Tippera etc. The response was immediate. The raiyats of Rangpur, mostly beloning to the rich farmer stratum, decided in a meeting to pay nothing more than local rent and cess to the zamindar of Balna and Maharaja of Cossimbazar. In Bhanga (Faridpur), they even refused to pay rent. At Matlabganj, a big trade centre of Chandpur subsivision (Comilla) a large number of jute cultivators took the oath not to cultivate jute.[241]

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের সময় ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলায় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং ত্রিপুরায় কর বয়কট আন্দোলন শুরু হয়। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে নতুন করে ইউনিয়ন বোর্ডের খাজনার হার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কাঁথি ও তমলুক মহাকুমায় কৃষকদের ইউনিয়ন বোর্ডবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯২১-২২ সালে পাবনা, বগুড়া ও বীরভূমের রামপুরহাট মহাকুমায় কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা হয়। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহাকুমায় সাঁওতালরা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জলপাইগুড়ি জেলায় সাঁওতালরা গান্ধী টুপি পরে পুলিশের ওপর আক্রমণ চালায়। রংপুর জেলায়ও কর বয়কট আন্দোলন শুরু হয়েছিল। নীলফামারীতে মুসলমান কৃষকরা একজন গান্ধীবাদী দারোগার তত্ত্বাবধানে একটি 'স্বরাজ থানা' প্রতিষ্ঠা করেছিল। উক্ত আন্দোলনের ফলে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯২৩ সালে সরকার বর্গাদার কৃষকদের ভূমিতে অধিকার প্রদান করার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু জমিদার এবং জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস ও স্বরাজ দলের বিরোধিতায় তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ১৯২৫ সালের কৃষক প্রজা সমিতি গঠিত হলে বর্গাদার কৃষকদের আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। আইন সভার মুসলিম সদস্য এবং বঙ্গীয় প্রজা সমিতির নেতৃবৃন্দ বর্গাদার ও অন্যান্য অধীনস্থ কৃষকের ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করলে স্বরাজ ও কংগ্রেস দলের সদস্যরা বিরোধিতা করে। ১৯২৫ সালে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক যখন তীব্র হয়ে উঠে তখন মুসলমান বর্গাদার কৃষকরা হিন্দু জোতদারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। যেমন এসময় পাবনার চাটমোহরের মুসলমান বর্গাদার কৃষকরা হিন্দু জোরদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বর্গাদার কৃষকরা হাট-বাজার লুট করতে শুরু করে। ১৯২৬ সালে পাবনা ও ঢাকা জেলার মুসলমান বর্গাদার কৃষকরা হিন্দু সাহা মহাজনদের জমি বর্গা চাষ করতে অস্বীকার করে। বর্গাদার কৃষকদের এই

---

[২৪০] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Sarkar, *Bengali Muslims*, p. 115; মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৬৭-৬৮।
[২৪১] Sarkar, *Bengali Muslims*, pp. 105-106.

আন্দোলন ময়মনসিংহ জেলায়ও ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় হিন্দু জমিদার এবং জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকরা আন্দোলন করেছিল। অন্যদিকে একই কারণে হিন্দু নমঃশূদ্র কৃষকরাও হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। যেমন ১৯২৮ সালে যশোর জেলার নড়াইল মহাকুমার হিন্দু নমঃশূদ্র ভাগচাষীরা হিন্দু জমিদারদের জমি চাষ করতে অস্বীকার করেছিল। এই বর্গাদাররা হিন্দু জমিদারদের সামাজিকভাবেও বয়কট করেছিল। এ কারণে উক্ত অঞ্চলের অনেক বর্গা জমি দীর্ঘদিন ধরে অনাবাদী পড়ে থাকে।[২৪২] অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের কৃষকরা বিশ শতকের বিশের দশকের খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রধানত হিন্দু জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। সুতরাং এই আন্দোলনেও উভয় ধর্মের কৃষকদের সম্পৃক্ততা থাকায় কোনোভাবেই এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক যুক্ত করা যৌক্তিক হবে না। এই আন্দোলনেরও মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি বা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব। তবে এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে সর্বপ্রথম বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জমিদার এবং জোতদার শ্রেণির বিশিষ্ট মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সমর্থন করেন (এ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইন আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে)। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেও হিন্দু জমিদার ও জোতদার শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কৃষকদের স্বার্থের বিরোধী ছিল এবং এই পর্যায়ের কৃষক আন্দোলনেও তারা একই ভূমিকা পালন করেছিল। ফলে এই পর্যায়ের কৃষক আন্দোলনে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় ধর্মের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরস্পর বিরোধী ভূমিকার কারণে কৃষক আন্দোলন সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করে। কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উভয় ধর্মের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা হয়েছিল তার পেছনে মূল কারণ ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

উল্লেখ্য, অব্যাহত কৃষক আন্দোলন বিশ শতকের ত্রিশের দশকেও পরিলক্ষিত হয়। এই সময় আইন অমান্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠে। ১৯৩০-৩৩ সালের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে বাংলার বিভিন্ন জেলায় শুধুমাত্র সরকারের ট্যাক্স নয় বরং জমিদারদের খাজনা বন্ধ আন্দোলনেরও সূচনা হয়।[২৪৩] জয়া চ্যাটার্জীর মতে দীর্ঘদিন খাজনা বৃদ্ধি ও কৃষক নির্যাতনের পর কৃষকরা খাজনা হ্রাস এবং কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছিল। চ্যাটার্জী মন্তব্য করেন, "In Noakhali, an agitation organised by the local Krishak Samiti for the 'complete remission of arrear rents'. Muslim volunteers circulated printed notices which declared that until the peasants are masters of the country and its wealth, no relief will be obtained."[244] অবশ্য চ্যাটার্জী তাঁর মন্তব্যে কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার কথা বললেও কৃষক রাজ বলতে কি বুঝায় তার কোনো ব্যাখ্য তিনি দেননি। তাঁর বক্তব্য থেকে অনুমেয় যে ভূমি সংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিপীড়ন মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় কৃষকরা আন্দোলন করেছিল। যদি তাঁর মন্তব্যের এই অর্থ সত্য হয় তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সাম্প্রদায়িকতা নয় বরং অর্থনৈতিক মুক্তিই ছিল কৃষক আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। যাহোক, ১৯৩৫-৩৬ সাল থেকে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় মূলত ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার ও খাজনা নিয়ে জমিদার ও জোতদারদের সঙ্গে কৃষকদের (প্রধানত বর্গাদার কৃষক) সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে কৃষক সভা গঠিত হওয়ার পর থেকে কৃষকদের বিক্ষোভ আন্দোলনগুলো সংগঠিত রূপ নেয় এবং তা ক্রমে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। কৃষক সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েকমাসের মধ্যে সমগ্র বাংলায় জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, মহাজনদের ঋণ মওকুফ, বেগার খাটা বন্ধ প্রভৃতি দাবিতে

---

[২৪২] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৬৭-৬৯।
[২৪৩] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৬৭-৬৯।
[২৪৪] Chatterji, *Bengal divided*, P. 92

গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়। দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীও এই সময়ে কৃষক আন্দোলনের গতি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। জাতীয় আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৭ সাল থেকেই কারান্তরীণ ও দীপান্তরিত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মুক্তি দিতে শুরু করে। মুক্তিপ্রাপ্তদের একটি বড় অংশ কারারুদ্ধকালীন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ গ্রহণ করে কমিউনিস্ট হয়ে পড়েছিলেন। তারা কারামুক্ত হয়ে কৃষক আন্দোলন এবং সংগঠন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। এতে কৃষক আন্দোলন প্রসারমান ও বলশালী হয়ে উঠে।[২৪৫] এছাড়াও ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস এবং কৃষক প্রজা পার্টির প্রগতিশীল শাখা সাম্যবাদীদের সঙ্গে একযোগে বঙ্গীয় কৃষক সভা গঠন করে বাংলার দরিদ্র, শোষিত ও বর্গাদার কৃষকদের দাবিকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে উত্তর ময়মনসিংহের ভাগচাষীরা (ভাওলি, টংকা) খাজনা হ্রাস ও জমিতে অধিকার দাবি করে আন্দোলন শুরু করে। রংপুর জেলায় হাট-বাজারের '*তোলা*' ও '*বুটি*'র বিরুদ্ধে কৃষকরা আন্দোলন শুরু করেছিল।[২৪৬] ১৯৩৯-৪০ সালে পঞ্চগড়, দিনাজপুর, রংপুর, যশোর এবং খুলনা জেলায় প্রধানত বর্গাদার কৃষকরা জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে তেভাগা আন্দোলনের সূচনা করে।[২৪৭] ১৯৪২-৪৫ সালের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে খুলনা, রংপুর, দিনাজপুর ও যশোর জেলায় বর্গাদারদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়। কৃষক সভা এই পর্বে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সংঘর্ষ পরিহারের নীতি অনুসরণ করে চলে। উল্লেখ্য, ১৯৩৯-৪২ সাল পর্যন্ত কৃষক সভা ছিল কার্যত নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এই সময়কালে বর্গাদারদের আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। কৃষক সভার নেতারা গোপনে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৪৬ সালের মে মাসে মৌভোগ অধিবেশনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা তেভাগা আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে যদি বর্গা জমির মালিক চাষের খরচ অর্ধেক বহন করে তাহলেই কেবলমাত্র জমির মালিক ফসলের অর্ধেক দাবি করতে পারবে। অন্যথায় মালিক উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশের বেশি পাবে না। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কৃষক সভায় তেভেগা আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তেভেগা আন্দোলন শুরু করার পূর্বে কৃষক সভার নেতৃবৃন্দ জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, মেদিনিপুর ও যশোর জেলায় কৃষকদের সংগঠিত করে এবং আন্দোলন পরিচালনার শক্তি হিসেবে 'কিষাণ ফৌজ' গঠন করে। ১৯৪৬ সালের শেষ দিকে পাবনা, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলে তেভেগা আন্দোলনের সূচনা হয় এবং পরবর্তীকালে তা বাংলার ১৯টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী ফজলুর রহমান বর্গাদারি তেভাগার স্বীকৃতি ও বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করতে একটি অর্ডিন্যান্স জারির ঘোষণা দেন।[২৪৮] এই অর্ডিন্যান্সে মূলত দু'টি বিষয় ছিল : প্রথমত, জমিদাররা পাবে ফসলের এক-তৃতীয়াংশ এবং বর্গাদাররা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ এবং দ্বিতীয়ত, জমিদাররা বর্গাদার কৃষকদের উচ্ছেদ করতে পারবে না।[২৪৯] কিন্তু গভর্নর স্যার

---

[২৪৫] শেখর দত্ত, "অনন্যসাধারণ তেভাগা সংগ্রাম", নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পাদিত), *তেভাগা সংগ্রাম*, ৪০তম বর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ (ঢাকা : বাংলাদেশ কৃষক সমিতি, ১৯৮৮), পৃ. ১২-১৩।

[২৪৬] *বুটি* হলো এক ধরনের হাট-বাজার কর।

[২৪৭] তেভাগা আন্দোলন হলো উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ দাবি নিয়ে সংঘটিত বর্গাচাষিদের আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল : (১) উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ ভাগচাষীদের দিতে হবে; (২) জমিতে ভাগচাষীদের দখলিস্বত্ব দিতে হবে; (৩) শতকরা সাড়ে বারো ভাগের বেশী অর্থাৎ মণকরা ধানে পাঁচ সেরের বেশী সুদ থাকবে না; (৪) হরেক রকম আবোয়াবসহ বাজে কোনো আদায় করা চলবে না; (৫) রশিদ ব্যতীত কোনো ভাগ দেওয়া চলবে না; (৬) আবাদযোগ্য পতিত জমিতে আবাদ করতে হবে এবং (৭) জোতদারের পরিবর্তে ভাগচাষীদের উঠানে/খোলানে ধান তুলতে হবে। তেভাগা আন্দোলনের শ্লোগান ছিল : (১) নিজ খোলানে ধান তোল; (২) আধি নয় তেভাগা চাই এবং (৩) কর্জ ধানের সুদ নেই। দেখুন, দত্ত, "*অনন্যসাধারণ তেভাগা সংগ্রাম*", পৃ. ১২-১৩। এছাড়াও এসম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, Rahim, *Politics and National Formation in Bangladesh*, pp. 198-202; মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ : সমকালীন রাজনীতি ও ইলামিত্র (ঢাকা : মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১), পৃ. ৪৮-১৬৪; সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৪ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২৮৫-২৮৬।

[২৪৮] Rahim, *Politics and National Formation in Bangladesh*, pp. 198-200; মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৬৮-৭১; সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, পৃ. ৪১।

[২৪৯] Rahim and Rahim, *Bengal Politics,* Volume III, p. 188.

ফ্রেডারিক বারোসের আপত্তির কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে এই অর্ডিন্যান্স জারি করা সম্ভব হয়নি। ফলে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন এলাকায় তেভেগা আন্দোলন ধীর গতিতে চললেও ফেব্রুয়ারি মাসে দিনাজপুর জেলায় আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ ধারণ করে। এসময় পুলিশের গুলিতে মোট ২২ জন কৃষক নিহত হয় এবং কৃষক সভার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নেতৃবৃন্দ আত্মগোপন চলে যান। সরকারি দমনপীড়ন এবং নেতৃত্বের অভাবে তেভেগা আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে যায়। অশিক্ষিত পৌন্ড্র-ক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, সাঁওতাল, রাজবংশী ও মুসলমান কৃষকদের পক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনার ক্ষমতা ছিল না। তারপরও বলা যায় যে ব্যাপ্তি এবং গভীরতায় ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভেগা আন্দোলন ছিল নজিরবিহীন ও তাৎপর্যপূর্ণ।

নিঃসন্দেহ বলা যায় যে ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগা আন্দোলন আংশিকভাবে হলেও সফল হয়েছিল। কারণ এই আন্দোলনের ফলেই ৪০% বর্গাচাষি উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ পেয়েছিল এবং বাকি ৬০% বর্গাচাষিরা আবওয়াব বা 'বাড়ি ধান'-এর সুদ দেয়নি।[২৫০] এছাড়াও ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার কয়েকটি জেলায় মুসলমান কৃষকরা হিন্দুদের জমি চাষ করতেও অস্বীকার করে।[২৫১] এসব আন্দোলনের ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও দেশভাগের নানামুখী রাজনৈতিক জটিলতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। সুতরাং ঔপনিবেশিক শাসনামলে উনিশ ও বিশ শতকে জমিদার ও জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন সংগ্রামের কারণে বিভিন্ন সময়ে সরকারের নীতি কৌশলেও পরিবর্তন হয়েছিল। সরকারি নীতি কৌশলে পরিবর্তনের কারণে প্রণীত ভূমি আইনসমূহে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল। বিশ শতকের বিশ হতে চল্লিশের দশকের কৃষক আন্দোলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল-এই সময়ের কৃষক আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জাতীয় রাজনীতিতে স্থান করে নিয়েছিল। ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কৃষকদের পক্ষে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এর ফলে কৃষকদের দাবি-দাওয়া রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দাবি-দাওয়ায় পরিণত হয়েছিল। এমনকি, কৃষক আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি ভোট রাজনীতির স্লোগানে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই স্লোগানের ওপর ভিত্তি করে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করতেও সক্ষম হয়েছিল (এই অধ্যায়ের পরের দিকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)। অর্থাৎ বিশ শতকের বিশ হতে চল্লিশের দশকের কৃষক আন্দোলন জাতীয় রাজনীতি এবং ভোট রাজনীতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সুতরাং ঔপনিবেশিক আমলে সংঘটিত কৃষক আন্দোলনের ফলে একদিকে সরকারের ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল এবং অন্যদিকে এটি জাতীয় রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলেছিল।

৩.৪.৩ কৃষকদের বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠন

ঐতিহাসিকভাবে বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কৃষকরা ছিল দরিদ্র, পশ্চাৎপদ, অসচেতন এবং অসংগঠিত। এ কারণে বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত কৃষকরা সংগঠিত হয়ে অধিকার আদায়ে কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেনি। এমনকি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও তাদেরকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করে কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহ দেখায়নি। উপরন্তু, কৃষকদের আন্দোলনে (নীল বিদ্রোহ ও পাবনা কৃষক বিদ্রোহ ব্যতীত) হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের রাজনৈতিক

[২৫০] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৭১-৭৩।
[২৫১] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৫৫৯।

নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পৃক্ত হয়নি। সর্বপ্রথম বিশ শতকের সূচনায় তথা বঙ্গভঙ্গের পরই দেখা যায় যে বিশিষ্ট মুসলিম জমিদার জোতদার এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুসলমান কৃষকদের সাথে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের পর গড়ে উঠা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষকদেরকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছিল। এই আন্দোলনের সময় তারা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বঙ্গভঙ্গের সুফল সম্বন্ধে কৃষকদেরকে সচেতন করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন ঢাকার বিশিষ্ট জমিদার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ও টাঙ্গাইলের ধনবাড়ির জমিদার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীসহ মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের পক্ষের আন্দোলনে মুসলমান কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এটা ছিল বঙ্গভঙ্গের ভূ-অর্থনৈতিক রাজনীতির ফল। এরপর ১৯১৩ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সক্রিয়ভাবে বাংলার রাজনীতিতে প্রবেশ করে নিজের প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মুসলমান কৃষকদের ভূমি সমস্যাকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে তুলে ধরেন। ১৯১৪ সালে সরকার কৃষকদের স্বার্থে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের প্রস্তাব করলে জোতদার ও সচ্ছল কৃষকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। কৃষকরা তাদের দখলিস্বত্ববান জমির ওপর আরও সুনিশ্চিত অধিকার প্রতিষ্ঠার আশা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৪ সালে মুসলিম জমিদার, জোতদার এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃবৃন্দ কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করে কৃষকদেরকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালে ফজলুল হক, মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলভী রাজীবুদ্দীন তরফদার প্রমুখ মুসলমান নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ময়মনসিংহের জামালপুরের কামারের চরে সর্বপ্রথম কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কৃষক যোগসূত্রতা ছিল। উল্লেখিত মুসলমান নেতৃবৃন্দ কামারের চরের কৃষক সম্মেলনে জমিদারি প্রথার সমালোচনা করেন ও কৃষকদের অধিকতর অধিকার সংরক্ষণের জন্য দাবি জানান। উল্লেখ্য, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জমিদার এবং কৃষক সম্পর্ক নিয়ে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলের জমিদারদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলমান কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল মুসলিম জমিদার এবং জোতদার শ্রেণির রাজনীতিবিদরা ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গড়ে উঠা মুসলমান কৃষক আন্দোলকে সমর্থন করেন। তাদের মুখপত্র ছিলেন বিশিষ্ট জোতদার নেতা ফজলুল হক। ১৯১৫ সাল হতে তিনি জমিদারি-মহাজনি প্রথার বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজাদের সংঘবদ্ধ করতে শুরু করেন। তখন থেকেই পূর্ব বাংলায় কৃষক-প্রজা সমিতির উন্মেষ শুরু হয়।[২৫২]

উল্লেখ্য, ফজলুল হক বাংলার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে ‘কৃষক’ এবং ‘প্রজা’ শব্দ দু’টির সমন্বিত প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বস্তুতপক্ষে বিশ শতকে গড়ে উঠা কৃষক প্রজা সমিতির নেতৃত্ব ছিল প্রধানত শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে। যেহেতু সকল শ্রেণির মানুষের ক্ষেত্রেই ‘প্রজা’ শব্দটি প্রয়োগ করা যায় তাই সেই অর্থে শিক্ষিত সকল মানুষই ছিল ‘প্রজা’। অন্যদিকে ‘কৃষক’ শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এইভাবে প্রজাদের এবং কৃষকদের স্বার্থ একাধারে সংযুক্ত করে ফজলুল হক বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক হতে কৃষক-প্রজা সমিতি গঠন করে বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রার সংযোজন করেন।[২৫৩] ১৯১৭ সালে বাংলার গভর্নর লরেন্স আর্ল অব রোনাল্ডশে ডানডাসের (১৯১৭-১৯২২) পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকটি মুসলমান কৃষক এবং হিন্দু নমঃশূদ্র কৃষক সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। ১৯১৭ সালের শেষ দিকে ফজলুল হক মুসলমান আইনজীবী ও সাংবাদিকদের উদ্যোগে কলকাতা কৃষি এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন।[২৫৪] ১৯১৯ সালে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির

---

[২৫২] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৫৫৪।
[২৫৩] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৫৫৪।
[২৫৪] ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৩৭০।

নেতৃত্বে ত্রিপুরা কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৫৫] তবে এসব সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলেও সার্বিকভাবে রাজনৈতিক দল ও দলের নেতৃবৃন্দের নিকট কৃষক ও কৃষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তখনও পর্যন্ত খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি। এমনকি, বিশ শতকের বিশের দশকের পূর্ব পর্যন্ত কৃষক সম্প্রদায়ও কখনই অনুভবই করেনি যে তারা দেশের রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। প্রধানত বিশ শতকের বিশের দশকে এসে কৃষকরা বুঝতে পারে যে কীভাবে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি করা যায় এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় স্তরের ক্ষোভকে মূল রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গীভূত করা যায়।[২৫৬]

৩.৪.৩.১ কৃষক প্রজা পার্টি

১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন অনুযায়ী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিনের পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। এই আইনে ভোটারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আয়ের মাত্রাভিত্তিক যোগ্যতার চেয়ে বাস্তব সুবিধা-অসুবিধার আলোকে নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটাধিকারের যোগ্যতার শর্ত নির্ধারণ করা হয়। এই আইনে পরিষদ সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শর্ত ছিল : (১) কোনো ব্যক্তিকে একুশ বছর বয়স হতে হবে। (২) নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা হতে হবে অর্থাৎ নির্বাচনী এলাকার মধ্যে তার বাড়ি থাকতে হবে। (৩) নির্বাচনী এলাকায় বা নিজ ইউনিয়নে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে জমি থাকার জন্য নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বের বছরে কমপক্ষে তাকে আট আনা সেচ ট্যাক্স বা ছয় আনা চৌকিদারি ট্যাক্স প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ তাকে ভূমি রাজস্ব বা স্থানীয় কর প্রদান বা শহরাঞ্চলে পৌর কর প্রদান করতে হবে। এছাড়াও এই আইনে গ্রাজুয়েট তথা যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি এবং আইনজীবী, চিকিৎসক, সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত, পেনশনভোগী বা বরখাস্ত অফিসার এবং সৈনিকেরাও ভোটাধিকার লাভ করেছিল। এমনকি, এর দ্বারা নারীরাও ভোটাধিকার লাভ করেছিল। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নানা ধরনের শর্ত থাকার কারণে এ আইনে ভোটাধিকার লাভকারীর সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। এর বিধান অনুযায়ী তৎকালীন জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৩ ভাগ মানুষ ভোটাধিকার লাভ করেছিল। এর মধ্যে আবার নারী ভোটার সংখ্যা ছিল খুবই কম।[২৫৭] ১৯২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪,৭৫,৯২,৪৬২ জন।[২৫৮] জনসংখ্যার শতকরা ৩ ভাগ ভোটার হওয়ায় মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪,২৭,৭৭৪ জন। এম. আজিজুল হকের মতে ১৯২১ সালে বাংলায় যারা খাজনা-স্বত্বভোগী ছিল কিন্তু চাষাবাদের সঙ্গে জড়িত ছিল না এরূপ জমিদারের সংখ্যা ছিল ৩,৮৫,১৭০ জন। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ রসুলের হিসেব অনুযায়ী ১৯২১ সালে বাংলায় অকৃষক জমির মালিক খাজনাভোগীর সংখ্যা ছিল ৩,৯০,৫৬২ জন।[২৫৯] এ দু' শ্রেণির জমির মালিকের মধ্য হতে সর্বোচ্চ সংখ্যক খাজনাভোগী জমিদার ও জোতদারদের সংখ্যা ৩,৯০,৫৬২ জনকে হিসেবে নিয়েও বলা যায় যে খাজনাভোগী জমিদার ও জোতদারদের বাইরেও ১০,৩৭,২১২ জন মানুষ ভোটাধিকার লাভ করেছিল। নিঃসন্দেহে জমিদার এবং জোতদারদের বাইরে এই বিপুল সংখ্যক ভোটাধিকার লাভকারী ছিল মধ্যম শ্রেণির সচ্ছল কৃষকরা। এ কারণে ১৯১৯ সালের আইনে প্রত্যক্ষ ভোটের রাজনীতির প্রবর্তন এবং মধ্যম শ্রেণির সচ্ছল কৃষকরা নির্বাচকমন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে কৃষক ও কৃষকদের স্বার্থ

---

[২৫৫] মল্লিক, *আধুনিক ভারতের রূপান্তর*, পৃ. ৬০৯।

[২৫৬] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭৩।

[২৫৭] Chatterjee, *Bengal*, pp. 92-93; চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ*, পৃ. ৩৫; হক, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, পৃ. ২৯৯, ৩২৯-৩৩০; মল্লিক, *আধুনিক ভারতের রূপান্তর*, পৃ. ৪৫২; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ৯৫-৯৬।

[২৫৮] *Census of India 1921*, Bengal, Report, Vol. V, Part II (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1923), p. 2.

[২৫৯] রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৫২; হক, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ১৩৩।

সম্পর্কিত বিষয় রাজনৈতিক দল ও দলের নেতৃবৃন্দের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে একই কারণে রাজনৈতিক দল ও দলের নেতৃবৃন্দ কৃষকদের সংগঠিত করে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উপরন্তু, এতোদিন রাজনীতিতে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বহাল থাকলেও ভোটের রাজনীতির প্রবর্তনের পর জমিদারদের তুলনায় জোতদার এবং সচ্ছল শ্রেণির কৃষকরা অধিক সংখ্যক ভোটাধিকার লাভ করায় তারা একত্রিত ও সংগঠিত হয়ে রাজনীতিতে জমিদারদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। বিশেষ করে নিজেদের প্রাধান্য সৃষ্টির অভিপ্রায়ে মুসলিম জমিদার ও জোতদার শ্রেণির নেতৃবৃন্দ ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার আদায় ও জমিদারদের শোষণ-নির্যাতন থেকে তাদের রক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন।

১৯১৯ সালের আইনে প্রত্যক্ষ ভোটের নির্বাচনী রাজনীতির সূচনা মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গ্রামাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের সমর্থনলাভের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। তারা মুসলমান কৃষকদের সংগঠিত করে বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠন করেন। যেমন ১৯২০ সালে বঙ্গীয় জোতদার এবং কৃষক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালে ব্যারিস্টার জে. এন. রায় প্রাদেশিক স্তরে এবং কয়েকটি জেলায় কৃষক সংগঠন গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন। কিন্তু তাঁর এই প্রয়াস বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। তবে তাঁর উদ্যোগে গঠিত সংগঠন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে না পারলেও প্রাথমিক স্তরে একটা প্রচেষ্টা হিসেবে এর গুরুত্ব নেহায়েত কম ছিল না। ১৯২১ সালে ফজলুল হকের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় বরিশালের একটি গ্রামে কৃষক প্রজা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ১৯২১ সালে নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গার কাপাসডাঙ্গা গ্রামে (বর্তমান কুষ্টিয়া জেলায়) একজন ইতালিয়ান মিশনারীর উদ্যোগে একটি কৃষক সমিতি গঠিত হয় এবং পরবর্তী বছরে এই সমিতির একটি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৩ সালের শুরুতে কিশোরগঞ্জের শাহ আব্দুল হামিদ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহাকুমার খাগড়া গ্রামে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সভাপতিত্বে একটি কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সম্মেলনে তিনি একটি কৃষক সমিতি গঠন করেন। ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর নেতৃত্বে অপর এক সম্মেলনে মুসলমান কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী প্রচলিত ভূমি আইনের সংস্কারের জোর দাবি করা হয়। ১৯২৫-২৬ সালে হাওড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় কৃষক সভা গঠিত হয়। ১৯২৫ সালে স্যার আবদুর রহিম, মৌলানা মোহম্মদ আকরাম খাঁ, শামসুদ্দীন আহমেদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে প্রজা সমিতি গঠিত হয় এবং রাজীবুদ্দীন তরফদারের উদ্যোগে বগুড়া শহরে প্রথম নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন করা হয়। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিলে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন বিষয়ে কৃষকদের মতামত নেওয়াই ছিল এই দ্বিতীয় অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কৃষক ও শ্রমিক দল গঠন সম্পর্কেও দ্বিতীয় অধিবেশনে আলোচনা করা হয় এবং আলোচনা শেষে 'বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল' গঠিত হয়। ১৯২৯ সালে ফজলুল হকের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় ঢাকার একটি গ্রামে দু'টি বড় কৃষক প্রজা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৯ সালের ১ জুলাই স্যার আব্দুর রহিমের কলকাতার রিপন রোডের বাসভবনে বঙ্গীয় কাউন্সিল পরিষদে ২৭ জন মুসলিম সদস্য একটি সভায় মিলিত হয়ে কিশোরগঞ্জের শাহ আব্দুল হামিদের ১৯২৩ সালের প্রজা সমিতি করার উদ্যোগকে সমর্থন করে বঙ্গীয় প্রজা পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় প্রজা পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন এ কে ফজলুল হক, সাধারণ সম্পাদক হন তমিজুদ্দীন আহমদ খান এবং যুগ্ম সম্পাদক হন আজিজুল হক ও শাহ আব্দুল হামিদ। এছাড়াও উক্ত সভায় বঙ্গীয় কাউন্সিল পরিষদে মুসলিম সদস্যরা বঙ্গীয় প্রজা পার্টির ব্যানারে মুসলমান কৃষকদের স্বার্থে ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার করেন। একইভাবে ১৯২৯

সালের শেষ দিকে কাউন্সিল পরিষদের বাইরে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হয়। অন্যদিকে ফজলুল হক অন্যান্যদের সঙ্গে কৃষক প্রজা আন্দোলনকে একটি সুস্পষ্ট রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি গঠন করেন এবং এই সংগঠন জনগণের রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। এই সংগঠনের সভাপতি হন স্যার আব্দুর রহিম এবং সাধারণ সম্পাদক হন মাওলানা আকরাম খান। এ কে ফজলুল হক, মৌলভী মুজিবুর রহমান, মৌলভী আব্দুল করিম, আব্দুল্লাহ আল-মামুন সোহরাওয়ার্দী, খান বাহাদুর আব্দুল মমেন সহ-সভাপতি হন এবং মৌলভী শামসুদ্দীন আহমেদ ও মৌলভী তমিজুদ্দীন আহমদ খান যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতিতে প্রগতিবাদী হিন্দুদের মধ্যে নরেশ সেনগুপ্ত, অতুল গুপ্ত, জিতেন্দ্র লাল ব্যানার্জীসহ বেশ কয়েকজন ব্যক্তি যোগদান করেন। এর ফলে এটি একটি অসম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত হয়।[২৬০] নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন এবং সমিতির অসম্প্রদায়িক চরিত্র সম্পর্কে চন্ডিপ্রসাদ সরকার মন্তব্য করেন,

> The All Bengal Peasant and *Raiyat* Conference, held in Calcutta at the end of December 1928 under the Chairmanship of Sir Abdur Rahim, had called upon the Muslim Council members who supported the cause of the *raiyats* to form a party in the Council to be called the Tenant Party. *The Saptahik Muhammadi* (February 15, 1929), while emphasising the secular character of the proposed organization, called upon the Muslim tenantry not to listen to those who called upon them to break away from the non-Muslim tenants. It categorically held that their real welfare would depend on their ability to combine with the *raiyats* of the other community.[261]

উল্লেখ্য, ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩২ সালের আগ পর্যন্ত নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করতে পারেনি। সংগঠনটি কার্যক্রম শুরু করলে ত্রিপুরার কৃষক সমিতি (১৯৩৩) সহ কিছু সংখ্যক স্থানীয় কৃষক সমিতি নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে এবং একসঙ্গে কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করে।[২৬২] ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সাম্বৎসরিক অধিবেশনে মিলিত হওয়া এবং কৃষক সমাজের অভাব অভিযোগ তুলে ধরে তা নিরসনের আহ্বান জানানোর মধ্যে সমিতির কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৩৪ সালে নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির সভাপতি স্যার আব্দুর রহিম কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে স্পীকারের পদ গ্রহণ করেন এবং সমিতির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এই সময় সমিতির সভাপতি পদ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। বাকেরগঞ্জের ফজলুল হক ও বর্ধমানের খান বাহাদুর আব্দুল মমেন উভয়েই সমিতির সভাপতি হতে আগ্রহ দেখান। মাওলানা আকরাম খাঁসহ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ প্রতিনিধিরা বর্ধমানের মমেনকে এবং পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিরা বাকেরগঞ্জের হককে সমর্থন করেন। ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহে নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের ভোটে ফজলুল হক সভাপতি ও শামসুদ্দীন আহমেদ সম্পাদক নির্বাচিত হন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আকরাম খাঁ সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ করলে নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৩৫ সালের অধিবেশন থেকেই সমিতির বামপন্থী অনুসারী চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লার প্রতিনিধিরা দাবি করেন যে প্রতিষ্ঠানের সদস্য করতে হবে প্রকৃত কৃষকদের থেকে এবং সমিতির নাম পরিবর্তন করে রাখতে হবে কৃষক প্রজা পার্টি। ১৯৩৬ সালের ১৬-১৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক

---

[২৬০] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Sarkar, *Bengali Muslims*, pp. 221-223; রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৫৮-৫৯; আহ্মদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ. ২০ ও ২৯; চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮ ও ৫৫৪; আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ৬১; শাহ, "*বাঙালি জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি*", পৃ. ৫৮৭; হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ২২৬-২২৭; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ১, পৃ. ৪২৭; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৩৭০ ও ৩৭৬; সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৫ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৪৮২; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, পৃ. ২১৪; রাজা, 'কৃষক আন্দোলনের পটভূমি', *দৈনিক বাংলা*, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৪।

[২৬১] Sarkar, *Bengali Muslims*, pp. 219-220.

[২৬২] বিস্তারিতভাবে দেখুন, রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৬০; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৮৩।

সম্মেলনে সমিতির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় কৃষক প্রজা পার্টি। কামরুদ্দীন আহ্‌মদের মতে ১৯৩৬ সালে মূলত নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির মতবিরোধ এড়ানোর জন্য, 'জমি কার, লাঙ্গল যার' এই নীতির ভিত্তিতে ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যে এবং বামপন্থীদের দাবি মেনে নিয়ে ফজলুল হকের নেতৃত্বে থাকা নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির অংশটি কৃষক প্রজা পার্টি নাম ধারণ করে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে আকরাম খাঁনের নেতৃত্বে থাকা সমিতির অপর অংশটি কয়েক মাস পর আদর্শগত কারণে মুসলিম লীগে যোগদান করে মুসলিম লীগের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।[২৬৩]

৩.৪.৩.২ স্বরাজ পার্টি

স্বরাজ্য দল গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশই প্রথম উপলব্ধি করেন যে দেশের নিপীড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী কৃষকদের জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা এবং তা সফল করা সম্ভব নয়। বাংলার কৃষকদের বড় অংশ মুসলমান হওয়ায় ধর্মীয় সম্প্রীতির বিষয়টিও ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কৃষক প্রজাদের সংগঠিত করা জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেসের নেতৃত্বের দ্বারা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে অসহযোগ আন্দোলন আকস্মিকভাবে গান্ধিজী কর্তৃক প্রত্যাহৃত হলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক হতাশা নেমে আসে। এর পরিণতিতে দেশজুড়ে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯২৩-২৬)। আবার বাংলাসহ অন্যান্য প্রদেশের চরমপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও কৃষকদের ভূ-অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী স্লোগান মেলাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারা মূলত ধর্মীয় আবেদনের মাধ্যমে কাটছাঁট পথেই জনসংযোগের চেষ্টা করেন যা বাংলার মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রায়শই ধ্বংসাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। অমিতাভ চক্রবর্তীর মতে 'হালভাঙা পাল-ছেড়া নৌকার যাত্রীর মতো তখন বাংলার কৃষকরা ছিল দিশাহীন নিয়তি নির্দিষ্ট'।[২৬৪] এই পরিস্থিতিতে ১৯২৩ সালের ১ জানুয়ারি কংগ্রেসের সভাপতি পদ হতে পদত্যাগ করে চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেসের অপর নেতা মতিলাল নেহরুকে সঙ্গে নিয়ে 'কংগ্রেস-খিলাফৎ-স্বরাজ' পার্টি গঠন করেন। এটিই পরবর্তীকালে স্বরাজ পার্টি হিসেবে অভিহিত হয়। সুতরাং স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষকের স্বার্থে ভূমিকা পালনের মাধ্যমে কৃষককে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সম্পৃক্তকরণ। স্বরাজ পার্টির প্রাথমিক ইশতেহারে কৃষকের উন্নততর ভবিষ্যতের উল্লেখ ছিল। কিন্তু স্বরাজ পার্টি গঠনের পরপরই মূলত নেহরুর সহযোগিতায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রধান নায়ক অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা এই পার্টিতে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, বিশ শতকের প্রথম দশকে ঘোষের যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা পূর্ব বাংলায় জমিদারদের ভাড়াটে হিসেবে আগমন করে কৃষকদের ওপর ব্যাপক গুলি ও বোমা বর্ষণ করে অসংখ্য কৃষককে হতাহত করেছিল। এ কারণে বলা যায় যে শুরুতেই স্বরাজ পার্টিতে যোগদান করে কৃষক স্বার্থের বিরোধীরা। বিপ্লবীদের পাশে পেয়ে ১৯২৩ সালের মে মাসে নেহরু ঘোষণা করেন, 'বাংলা আমাদের মুঠোয়' এবং জুন মাসে তিনি বিপ্লবীদের সাহায্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দখল করেন। অর্থাৎ জমিদার প্রভাবিত বাংলার কংগ্রেস কমিটিকেও নবগঠিত স্বরাজ পার্টি দখল করে। উল্লেখ্য, হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি সঠিক স্বীকৃতি প্রদান ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য দেশবন্ধুর প্রচেষ্টায় ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রসিদ্ধ 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা ছিল স্বরাজ দল গঠনের পর কৃষক আন্দোলন এবং বিভিন্ন কৃষক প্রজা সমিতির চাপে ১৯২৩ সালে ঔপনিবেশিক সরকার বর্গাদারদের ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে

---

[২৬৩] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Razzaque, *Bengali Muslims*, pp. 115-117; আহ্‌মদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ. ২৯-৩০; রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৬০; চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ৭৯-৮৩; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৫৭-৫৮; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৮২-৪৮৩।

[২৬৪] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭৬।

একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেও প্রধানত জমিদার সমর্থক স্বরাজ পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল সদস্যদের বিরোধিতার কারণে শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।[২৬৫] আরও উল্লেখ্য যে, জমিদার ও জমিদার সমর্থক অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস হতে পদত্যাগ করে স্বরাজ দলে যোগদান করেন। এর ফলে ১৯২৩ সালের নির্বাচনে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ দলের ৪৭ জন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৫ সালের ১৬ জুন দাশের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ দলের নেতা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি এবং কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র জে. এম. সেনগুপ্ত। মূলত তাঁর নেতৃত্বেই স্বরাজ দলে জমিদারদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে চিত্তরঞ্জন দাশের কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি কংগ্রেস থেকে স্বরাজ দলে আগত জমিদার এবং জমিদার সমর্থক স্বার্থন্বেষী মহলকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। তাই তাঁর মৃত্যুর পর কংগ্রেস থেকে স্বরাজ দলে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দের নিকট কৃষক নয় বরং জমিদার তোষণ নীতিই পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দল হতে আগত নবগঠিত স্বরাজ দলের নেতৃবৃন্দের নিকট কৃষকের স্বার্থ আর গুরুত্ব পায়নি বরং তাদের কাছে জমিদারদের স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।[২৬৬] এ কারণেই ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নের সময় স্বরাজ পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদ সদস্যরা বর্গাদার কৃষকদের ভূমিতে অধিকার প্রদানের বিরোধিতা এবং জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[২৬৭] সুতরাং স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাকালে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তাদের স্বার্থের বিপক্ষে কাজ করেছিল।

৩.৪.৩.৩ কমিউনিস্ট পার্টি

রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পর বাংলায় মার্কসবাদী চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৯২০-এর দশকে *ধূমকেতু*, *সংহতি*, *আত্মশক্তি*, *শঙ্খ*, *বিজলী*, *দৈনিক বসুমতি* বিভিন্ন প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মার্কসবাদী চিন্তা বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির একটি অংশের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণির একটি অংশ মার্কসবাদী আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মুজাফফর আহমেদ, আব্দুল হালিম, হেমন্তকুমার, কাজী নজরুল ইসলাম, মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়সহ অনেকেই কৃষকদের একত্রিত করে সংগঠন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। অর্থাৎ তারা আবার এই আদর্শ বাংলার কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সংস্পর্শে এসে বাংলার কৃষকদেরও একটি অংশ মার্কসবাদী আদর্শে দীক্ষিত হয়। তারা বুঝতে পারে যে জমিদাররাই তাদের দারিদ্র্যতা ও দুঃখ দুর্দশার জন্য প্রধান দায়ী। এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি এবং কৃষকদের একটি অংশ মার্কসবাদী চিন্তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষকদেরকে সংগঠিত করে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের চেষ্টা করে। ১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর কানপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের এক সম্মেলনে নিখিল ভারত কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর পূর্বেই বাংলায় কমিউনিস্টপন্থী চিন্তাধারা এবং কৃষক সভার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।[২৬৮] ১৯২৬ সালের ১২ আগস্ট মুজাফফর আহমদ সম্পাদিত *গণবাণী* পত্রিকা স্বরাজ দলের মুখপত্র *ফরওয়ার্ড* পত্রিকায় প্রকাশিত হিন্দু সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার বিরোধিতা করে। কারণ *ফরওয়ার্ড* পত্রিকার মাধ্যমে স্বরাজ দলের হিন্দু সদস্যরা হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যকার যে কোনো ধরনের সমস্যাকেই

---

[২৬৫] Razzaque, *Bengali Muslims*, pp. 149-153; চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ১৮০ ও ৪৭৬; হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, পৃ. ২২৩-২২৫; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭।

[২৬৬] শওকত আরা হোসেন, *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯২১-১৯৩৬ : অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০), পৃ. ২৯ ও ৪২।

[২৬৭] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Chatterjee, *Bengal*, pp. 82-95.

[২৬৮] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৬৭-৬৯; চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭৮ ও ৫৭১; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৫৫।

সাম্প্রদায়িক বলে প্রচার করার চেষ্টা করেছিল। ১৯২৭ সালের ২৮ এপ্রিল *গণবাণী* পত্রিকায় এক নিবন্ধে বলা হয় যে বাংলার বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান, আর যারা তাদের প্রত্যক্ষভাবে শোষণ করে তারা অধিকাংশই হিন্দু জমিদার। উক্ত প্রবন্ধে বলা হয় যে নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণির মধ্যে স্বভাবতই একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, আর তা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত অথবা চলমান ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে শ্রেণি সংগ্রাম, কিন্তু এগুলো বিপথে চালিত শ্রেণি সংগ্রাম। ১৯২৭ সালের ১২ মে *গণবাণী* পত্রিকার অপর এক নিবন্ধে বলা হয় যে অতিমাত্রায় অর্থনৈতিক শোষণের কারণে বাংলায় কৃষক উত্থানের সূচনা হয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক অসন্তোষকে 'যারা মিথ্যা ধর্মের খোলস পরিয়ে দিচ্ছে তারা মানুষ নয় পশু'। জমিদার ও মহাজন যেমন কৃষকের শোষক, ঠিক একইভাবে শোষক-যারা ধর্মকে ব্যবহার করেছে। *গণবাণী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'জমিদার প্রথার উচ্ছেদ' শীর্ষক ভিন্ন একটি প্রবন্ধে বলা হয় যে দেশের নানা জায়গায় জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে, কিন্তু এই আন্দোলন কৃষক আন্দোলন নয়, কেননা অধিকাংশ স্থলে জোতদাররাই এই আন্দোলন চালাচ্ছে। তারা জমিদারদের অধিকার খর্ব করে নিজেদের অধিকার বৃদ্ধি করতে চায়। কৃষক ও কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষকেরা শ্রম ও উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মূল্য লাভ করুক-জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা তা মোটেই চায়নি। এসব আন্দোলন প্রজা বা কৃষক আন্দোলন নামেই পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো কৃষক আন্দোলন ছিল না। কারণ কৃষক আন্দোলন করবে কৃষকরা, কিন্তু এই আন্দোলন করছিল জোতদাররা।[২৬৯] অর্থাৎ *গণবাণী* পত্রিকায় প্রকাশিক নিবন্ধ থেকে এটা স্পষ্টত যে কৃষক আন্দোলনে সচ্ছল কৃষকরাও অংশগ্রহণ করেছিল।

যাহোক, নিখিল ভারত কমিউনিস্ট পার্টি জন্মলগ্ন থেকেই ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতির স্বীকার হয় এবং ১৯৩৪ সালে সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এ কারণে এই দল বেশির ভাগ সময়েই গোপনে এবং প্রায়শ নতুন নতুন অঙ্গ সংগঠন গড়ে তুলে দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিল। এসব অঙ্গ সংগঠনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল ওয়ার্কার্স এন্ড পিজেন্টস পার্টি (১৯২৫), প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অর্গানাইজেশন (১৯৩৬), নিখিল ভারত কিষাণ সভা (১৯৩৬) ও নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন (১৯৩৬)। ১৯৪২ সালে সরকার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এই পার্টি বাংলাসহ সমগ্র ভারতে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করে। বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় এই পার্টির নেতৃত্বে ১৯৩৮ থেকে ১৯৩৯ সালে রংপুরের কৃষক আন্দোলন, ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৬ সালে দিনাজপুরের কৃষক আন্দোলন, ১৯৪২ সালে ত্রিপুরার রিয়াং বিদ্রোহ, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৬ সালে হাজং বিদ্রোহ, ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৭ সালে নানকার আন্দোলন, টঙ্কা আন্দোলন প্রভৃতি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৭০] বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির এই আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী ফল ছিল ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পার্টি অংশগ্রহণ করে কিছুটা সফল হয়েছিল।

৩.৪.৩.৪ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা

১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত কৃষক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। অমিতাভ চক্রবর্তীর মতে ১৯৩৬ সালের ১৫ জানুয়ারি মিরাটে বিভিন্ন প্রদেশের কৃষক প্রতিনিধিদের এক সভায় নিখিল ভারত কৃষক সভা গঠিত হয়।[২৭১] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

---

[২৬৯] Sarkar, *Bengali Muslims*, pp. 184-187.

[২৭০] বিস্তারিতভাবে দেখুন, শেখ রফিক (সংকলিত), *তেভাগা আন্দোলন* (ঢাকা : বিপ্লবীদের কথা প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ১৩-৪৩৭; চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪১৪-৪৫৪; মুখোপাধ্যায়, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৬৮; কামাল ও চক্রবর্তী, নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ, পৃ. ৩৩-১৮১; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৫৫।

[২৭১] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭৯।

রসুল বলেন যে ১৯৩৬ সালের ১১ এপ্রিল কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সময় নিখিল ভারত কৃষক সভা[২৭২] নামে একটি সংগঠন জন্মলাভ করে।[২৭৩] বদরুদ্দীন উমরের মতে বিশ শতকের ত্রিশের দশকের শুরুতেই অনেকে কৃষকদের জন্য একটি পৃথক শ্রেণি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৩২ সালে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর কৃষক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি জোরদার হয় এবং এর ফলস্বরূপ ১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত কৃষক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৭৪] উল্লেখ্য, বাংলার যে সমস্ত প্রতিনিধিরা লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত থেকে নিখিল ভারত কৃষক সভা গঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁদেরকে বাংলায় কৃষক সভা গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসব প্রতিনিধিরা কলকাতায় ফিরে এসে বঙ্কিম মুখার্জীসহ বঙ্গীয় কৃষক সভার নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং বঙ্গীয় কৃষক সভা গঠনের উদ্দেশ্যে ছোট একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির আহ্বানে ১৯৩৬ সালের ১৬-১৭ আগস্ট কলকাতার অ্যালবার্ট হলের সম্মেলনে বাংলার ২০টি জেলা থেকে প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন। এই সম্মেলনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সংগঠনী কমিটি গঠন করা হয়।[২৭৫] সংগঠনী কমিটির চেষ্টায় বাংলার অনেকগুলো জেলায় জেলা কৃষক সংগঠনী কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে ত্রিপুরা, নোয়াখালী, যশোর, বর্ধমান, হুগলী এবং বাঁকুড়া জেলায় বিভিন্ন নামে জেলা কৃষক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারা তাদের কার্যক্রমও শুরু করেছিল। বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতি তাৎক্ষণিকভাবে নিখিল ভারত কৃষক সভার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নেয়। সাংগঠনিক কমিটির চেষ্টায় পূর্ব বাংলার ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল জেলায় সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ফয়েজপুরে (মহারাষ্ট্র) জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে নিখিল ভারত কৃষক সভার সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ সালের ২৭-২৮ মার্চ বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের গ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার আরও একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় কৃষক সভার প্রাথমিক সদস্য ছিলেন ১১,০৮০ জন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার পাত্রসায়ের সম্মেলনে নিখিল ভারত কৃষক সভার গঠনতন্ত্র ও লক্ষ্যস্থির নির্ধারণ করা হয়। নিখিল ভারত কৃষক সভার লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়, "সারা ভারত কৃষক সভার লক্ষ্য অর্থনীতিক ও রাজনীতিক শোষণ থেকে কৃষকদের জন্য পূর্ণ মুক্তি হাসিল করা, এবং অন্যান্য শ্রেণি ও গণ সংগঠনগুলোর সহিত, বিশেষত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে মিলিয়া পূর্ণ জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্র কায়েম করা, যাহাতে সমস্ত অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষমতা জনগণের মধ্যে ন্যস্ত থাকিবে।"[২৭৬] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে সাম্যবাদীরা কৃষক আন্দোলন পরিচালনার জন্য কৃষক সভা গঠন করেন। কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা পার্টির প্রগতিশীল শাখা সাম্যবাধিদের সঙ্গে এক যোগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা গঠন করে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা বাংলার দরিদ্র, শোষিত ও বর্গাদার কৃষকদের দাবিকে সফলভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল।[২৭৭]

---

[২৭২] ১৯৩৬ সালের ১১ এপ্রিল কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনকে নিখিল ভারত কৃষক সভার প্রথম সম্মেলন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের সময় সম্মেলনের এবং সভার নাম ছিল কৃষক কংগ্রেস-যাকে বলা যেতে পারে জাতীয় কংগ্রেসের কৃষক সংস্করণ। ১৯৩৭ সালের ১৪ জুলাই নিখিল ভারত কৃষক কমিটির নিয়ামতপুর (গয়া জেলা, বিহার) অধিবেশনে কৃষক কংগ্রেসের পরিবর্তে কৃষক সভা নাম গৃহীত হয়। দেখুন, রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৬৭।

[২৭৩] বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ৩৭; রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৬৭।

[২৭৪] উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক*, পৃ. ৩৭।

[২৭৫] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সংগঠনী কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছিল বঙ্কিম মুখার্জীকে এবং আহবায়ক কমিটির অন্যান্যরা ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ (প্রচার), নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার (আইন), আবদুল কাদির (সমবায়) এবং অনন্ত মুখার্জী (অফিস)। এছাড়াও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। দেখুন, রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৬৮।

[২৭৬] বিস্তারিতভাবে দেখুন, রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৬৭-৭২; চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৮০।

[২৭৭] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৬৭-৬৯।

উল্লেখ্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার পাত্রসায়ের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি সভাপতি পরিষদ গঠন করা হয়।[২৭৮] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার পাত্রসায়ের সম্মেলনের অন্যতম সভাপতি মুজফ্‌ফর আহমদ কৃষক সভার শ্রেণি সংগ্রাম সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বলেন যে কৃষক সমস্যার মূল কারণ হলো শ্রেণি সংগ্রাম। ভূমির তথাকথিত মালিকগণই কৃষকদের প্রধান শোষক। অকর্মণ্য মহাজন হলো দ্বিতীয় প্রধান শোষক। কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রির ব্যাপারে দালাল, ফড়িয়া, আড়তদার প্রভৃতিও কৃষককে শোষণ করতে ছাড়ে না। সর্বোপরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে ভারতীয় কৃষকদের অন্যতম প্রধান শোষক। তিনি বলেন যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি দ্বারা এরূপ যত প্রকারের শোষণ-কার্য চলে সে-সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করারই নাম শ্রেণি সংগ্রাম। কৃষকরা নানাদিক হতে শোষিত হয় বলে তাদের নানাদিকে শ্রেণি সংগ্রাম চালাতে হয়। তাঁর মতে এই শ্রেণি সংগ্রামের ভিতর দিয়েই দেশের জনগণ শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবে। সুতরাং কৃষকের মূল সমস্যা হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের সমস্যা। এছাড়াও তিনি বলেন যে ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় কেবলমাত্র যে জমিদার নামে পরগাছার সৃষ্টি হয়েছে তাই নয় বরং জমিদাররা আবার তাদের মালিকানাস্বত্বের জোরে অনেকগুলো উপ-পরগাছার সৃষ্টি করেছে। তাঁর মতে জোতদার, তালুকদার, পত্তনিদার প্রভৃতি নামে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী জোতদাররাই হচ্ছে জমিদার সৃষ্ট উপ-পরগাছা। তাঁর মতে ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থে ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবর্তন করেছে। এর ফলে অসংখ্য জমিদার ও জোতদারের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের শোষণ ও নিপীড়নের কারণেই কৃষকরা বহু সংখ্যায় ভূমিহীন হয়ে পড়েছে। তাঁর মতে এই পরগাছারূপ জমিদার এবং জোতদার শ্রেণির হাত থেকে কৃষককে রক্ষা করতেই কৃষক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২৭৯]

১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার প্রায় সবগুলো জেলাতেই জেলা কৃষক সভা গঠন করতে সক্ষম হয়। এই সময়কালে সংগঠনটির ১০টি প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (সারণি ১৯)।[২৮০] সারণি ১৯ থেকে দেখা যায় যে ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা ছিল ১১,০৮০ জন ও ১৯৪৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২,০৩,৩৮২ জনে। বদরুদ্দীন উমরের মতে কৃষক সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ব্রিটিশ শাসনামলের শেষদিকে শ্রেণি সংগঠন হিসেবে এর গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেন: (১) কৃষক আন্দোলন সারাদেশ জুড়ে হয়নি বরং কোনো কোনো এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছে মাত্র। (২) এটি সমস্ত কৃষক সমাজের ওপরে কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। (৩) যে সকল এলাকায় আন্দোলন ছিল সেখানেও সকল স্তরের কৃষকদের মধ্যে, বিশেষ করে আধিয়ার ও খেতমজুরদের মধ্যে সংগঠনের প্রভাব পড়েনি। (৪) কৃষকদের মধ্য থেকে আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট নেতৃত্ব তৈরি করা সম্ভব হয়নি এবং এই বিষয়ে চেষ্টারও ঘাটতি ছিল। এমনকি সংগঠনের কর্মীরা বিষয়টির গুরুত্বও সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেনি। (৫) কৃষক সভা কৃষকদের মধ্যে কাজ করেছিল ঠিকই কিন্তু কাজের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব ছিল। গণসংগঠন হিসেবে সভাকে কাজে লাগানো যায়নি। মার্ক্সবাদীরা গণ-আন্দোলন হিসেবে কৃষক আন্দোলনকে তৈরি করার জন্য সাধারণ কৃষকদের মধ্যে উপযুক্ত রাজনীতিক ও সাংগঠনিক চেতনা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছিল। কর্মীরা অনুধাবন করেনি যে কৃষক আন্দোলনকে সত্যিকার মার্ক্সবাদী গণ-আন্দোলনে পরিণত করার জন্য সাধারণ কৃষকদের মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলাই ছিল একমাত্র

[২৭৮] সভাপতিত্ব করার জন্য গঠিত পাঁচ সদস্যের স্থায়ী সভাপতি পরিষদের সদস্য ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদ, সৈয়দ আহমদ খান (নোয়াখালী জেলার এম. এল. এ), ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ওসিমুদ্দিন আহমদ (ত্রিপুরা জেলার এম. এল. এ) ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক)। দেখুন, রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৬৯।

[২৭৯] বিস্তারিতভাবে দেখুন, রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৬৯-৭৪।

[২৮০] রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৩৪৬।

উপায়। (৬) কৃষক সভার সমস্ত কাজের মধ্যে নিয়মিত সংযোগ না রাখা এবং তার ফলে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ উপেক্ষা করা হয়। (৭) কৃষক সভার কর্মীরা সাধারণ কৃষকদের জীবনযাত্রা ও সামাজিক চালচলন সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খোঁজ-খবর রাখেনি এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেও পারেনি। তারা চাষাবাদ এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় আইনেরও খোঁজ-খবর রাখেনি।[২৮১] এসব দুর্বলতার কারণে সাধারণ কৃষকরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। ফলে ভোট রাজনীতিতেও কৃষক সভা সুবিধা করতে পারেনি। সুতরাং যে উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা গঠিত হয়েছিল তা সফল হয়নি।

৩.৪.৩.৫ কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি

১৯৩০ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলেও ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই চুক্তির মধ্যে কৃষকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ফলে কংগ্রেসের সাধারণ তথা কৃষকবান্ধব নেতা-কর্মীদের নিকট চুক্তিটা ছিল ব্রিটিশ সরকারের নিকট কংগ্রেস নেতৃত্বের আত্মসমর্পণ। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উক্ত চুক্তির সাফল্য প্রচার করা হলেও সাধারণ নেতা-কর্মীরা মোটেই উৎসাহবোধ করেননি। অন্যদিকে কংগ্রেস লন্ডনের প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বয়কট করলেও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠায়। কিন্তু দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারী কংগ্রেস প্রতিনিধি ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে আসেন। এরপর নতুন করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে সরকার কংগ্রেসের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে কারান্তরীণ করে। এসব কারণে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের একাংশ মনে করেছিল যে একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই মুক্তি লাভ সম্ভব। তাঁদের মধ্যে বামপন্থী মনোভাব জেগে উঠতে থাকে। অনেকে কারাগারে সোশ্যালিজম এবং কমিউনিজম সম্বন্ধে পড়াশোনা ও আলাপ-আলোচনা করতে থাকে। এইভাবে গড়ে উঠা বামপন্থী মনোভাবাপন্ন কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের মধ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্ব সম্বন্ধে মোহভঙ্গ হয় এবং নেতৃত্বের ব্যর্থতা দেখে শ্রেণি আন্দোলনের চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। প্রধানত এই মোহভঙ্গ ও শ্রেণি চিন্তার ফল হিসেবেই ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠিত হয়।[২৮২] এই পার্টির গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জয়প্রকাশ নারায়ণ মন্তব্য করেন, “Founded in 1934, the Congress Socialist Party had a formal existence until the Quit India movement of 1942. In this brief period it nurtured a group of men and women who went on to play pivotal roles in the politics and culture of independent India”.[283] নব গঠিত সোশ্যালিস্ট পার্টি একইসঙ্গে মার্ক্সবাদী মতবাদ ও জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করে। এমনকি, এই পার্টির নেতাকর্মীরা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে। এই উদ্দেশ্যে তারা কৃষক ও শ্রমিকদের শ্রেণি আন্দোলন এবং সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে। এই চিন্তাধারা নিয়েই কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে এই পার্টির নিয়মিত যোগাযোগ এবং আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। সোশ্যালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সকলেই ছিলেন কংগ্রেসের সাবেক সদস্য।[২৮৪] কিন্তু এই পার্টির শ্রেণি আন্দোলনের রাজনীতিতে কৃষকের স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ায় কৃষকদেরকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। ফলে ভূমি বিরোধের রাজনীতির দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত শক্তিটুকু অর্জন করতে সক্ষম হয়নি এই পার্টি।

---

[২৮১] বিস্তারিতভাবে দেখুন, উমর, *চিরস্থায়ী* বন্দোবস্তে *বাঙালাদেশের কৃষক*, পৃ. ৩৮-৪০।
[২৮২] রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৬২।
[২৮৩] Jayaprakash Narayan, “The Grassroots Socialist”, Ramachandra Guha (ed.), *Makers of Modern India* (Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, United States of America, 2011), p. 368.
[২৮৪] রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৬২।

প্রশ্ন হলো ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ভোটের রাজনীতির সূচনা হওয়ার পর এতগুলো কৃষক সমর্থিত সংগঠন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও তাৎপর্য কী ছিল? সংক্ষেপে এর উত্তরে বলা যায় যে উক্ত আইনে ভোট রাজনীতির প্রবর্তনের ফলে কৃষকদের গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণে অনেকগুলো কৃষক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এর ফলে সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তথা কৃষক সমাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে ভূমি সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষ করে কৃষকের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়াদি পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচনেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

৩.৪.৪ ১৯২০ সালের রাজনৈতিক দলহীন নির্বাচনে কৃষকের গুরুত্ব ও স্বার্থ উপেক্ষিত

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯২০ সালে প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে এই নির্বাচনের নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন জমিদার, জোতদার ও ধনী কৃষকরা। উল্লেখ্য, এই নির্বাচনের পূর্বেই খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। এছাড়াও অন্য কোনো রাজনৈতিক দলও এ নির্বাচনে অংশগ্রণ করেনি। তারপরও নির্বাচন ঠিকই অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু প্রায় ৮০% ভোটার ভোটদানে বিরত ছিল। নির্বাচনে হিন্দু ও মুসলিম আসনে বিজয়ীদের অধিকাংশই ছিলেন মহারাজা, রাজা, নবাব, জমিদার ও জোতদার। নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ অংশগ্রহণ না করায় ১২৩টি আসনের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলিম আসনে মাত্র দু'জন (একজন নোয়াখালীর মুচি রসিক চন্দ্র কর্মকার ও গাড়োয়ান মুনশী) সাধারণ প্রার্থী বিজয়ী হয়েছিল।[২৮৫] প্রথম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে বাংলার বিশেষ করে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছিল।

৩.৪.৫ ১৯২৩ সালের নির্বাচনে কৃষকের গুরুত্ব ও স্বার্থ উপেক্ষিত

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯২৩ সালে দ্বিতীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে স্বরাজ পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে চারটি দাবি উত্থাপন করা হয় যথা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা, রাজবন্দিদের মুক্তি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনকভাবে পার্টির দাবি মেনে নেওয়া না হলে সরকারের দৈনন্দিন কাজে বাধাদান ও পার্টির নির্বাচিত সদস্যরা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করবে না। অর্থাৎ এই পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকদের দাবি-দাওয়া উপেক্ষিত হয়েছিল। অবশ্য শওকত আরা হোসেনের মতে নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকদের দাবি-দাওয়া স্থান না পেলেও পার্টির নির্বাচনী প্রচারণার সময় সমাজের ওপর ও নীচ তলার উভয় শ্রেণির স্বার্থকে তুলে ধরা হয়েছিল। নির্বাচনে ১২৩টি আসনের মধ্যে স্বরাজ পার্টি ৪৭টি আসন লাভ করলেও কোনো দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। নির্বাচনে প্রভাবশালী মহারাজা, রাজা নবাব, জমিদার ও জোতদাররা বিজয়ী হয়েছিল।[২৮৬]

৩.৪.৬ ১৯২৬ সালের নির্বাচনে কৃষকের স্বার্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯২৬ সালে তৃতীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯২৬ সালে এই নির্বাচনেই সর্বপ্রথম নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। অন্যদিকে এই নির্বাচনেই সর্বপ্রথম হিন্দু এবং মুসলমানদের সংগঠিত কয়েকটি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। হিন্দুদের মধ্যে

---

[২৮৫] সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, "বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭), পৃ. ২১৮; হোসেন, *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা*, পৃ. ৬০।

[২৮৬] হোসেন, *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা*, পৃ. ৬০-৬৫; ইসলাম, "বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ", পৃ. ২১৯।

অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছিল জে. এম. সেনগুপ্তের নেতৃত্বে স্বরাজ পার্টি, পণ্ডিত মদনমোহন মালবিয়া ও লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট পার্টি, এম.আর. জয়কর ও কেলকরের নেতৃত্বে নব গঠিত রেনপন্সিভিস্ট পার্টি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট কংগ্রেস পার্টি। অন্যদিকে মুসলমাদের মধ্যে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছিল বিশিষ্ট জমিদার নেতা স্যার আবদুর রহিমের নেতৃত্বে বেঙ্গল মুসলিম পার্টি, বিশিষ্ট জোতদার নেতা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে বেঙ্গল মুসলিম কাউন্সিল পার্টি, বিশিষ্ট জমিদার নেতা আব্দুল হালিম গজনভীর নেতৃত্বে সেন্ট্রাল মুসলিম পার্টি এবং মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আকরাম খাঁর নেতৃত্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি। অবশ্য নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বেঙ্গল মুসলিম কাউন্সিল পার্টি, সেন্ট্রাল মুসলিম পার্টি ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি একীভূত হয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি হিসেবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ নির্বাচনে মুসলমান সম্প্রদায়ের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি দল ছিল বেঙ্গল মুসলিম পার্টি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি। নির্বাচনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল প্রথমত, নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষি ও কৃষকের দাবি-দাওয়া স্থান পায়; এবং দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ ভোট রাজনীতির কারণে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক বৈরিতা বৃদ্ধি পায়। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে স্বরাজ পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যান্য দাবির সঙ্গে কৃষি ও কৃষকের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে বলা হয় : (১) দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও অর্থনীতির অগ্রগতির লক্ষ্যে আইন পাশ করা হবে, (২) কৃষক ও ভূ-স্বামীর স্বার্থকে যথার্থ উপায়ে রক্ষার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে, ও (৩) কৃষক ও ভূ-স্বামী/শ্রমিক-পুঁজিপতি সম্পর্ককে সন্তোষজনক করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্বরাজ পার্টির এই নির্বাচনী ইশতেহার এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যেন সমাজের সব শ্রেণির মানুষের সমর্থন পাওয়া যায়। অবশ্য স্বরাজ পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তাদের ঘোষণাপত্রে যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ছিল তা 'ভদ্রলোক' ভোটদাতাদেরকে আকর্ষণ করেছিল। উল্লেখ্য, স্বরাজ পার্টির জমিদার ও সম্পদশালী প্রার্থী দাঁড় করানো, নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি, দলের 'কর্মীসংঘের' স্বেচ্ছাসেবীদের প্রচণ্ড প্রচারণার কারণে দলটি নির্বাচনে ৩৫টি আসনে বিজয়ী হয়েছিল।[২৮৭] অন্যদিকে বেঙ্গল মুসলিম পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করা হয় যে মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্যে তারা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। উক্ত ঘোষণার ব্যাখ্যায় বলা হয় যে বাংলার মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তারা বৈষম্যমূলক সরকারী নীতির কারণে অনগ্রসর রয়েছে। বেঙ্গল মুসলিম পার্টির দলীয় প্রধান হিসেবে আবদুর রহিম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে মুসলমানরা এখন থেকে আর হিন্দুদের লেজুড়বৃত্তি করবে না অথবা প্রশাসনেরও ক্রীড়ানক হবে না। একইভাবে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন বেঙ্গল মুসলিম কাউন্সিল পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।[২৮৮] সুতরাং এই নির্বাচনেই সর্বপ্রথম কৃষকের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্বাচনী ইশতেহারে স্থান পেয়েছিল এবং এর মাধ্যমেই জাতীয়ভাবে কৃষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৩.৪.৭ ১৯২৯ সালের নির্বাচন ও নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকের স্বার্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯২৯ সালে চতুর্থ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী হিন্দুদের প্রধান দু'টি দল ছিল যথা স্বরাজ পার্টি ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট পার্টি। অন্যদিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মুসলিমদের প্রধান দু'টি দল ছিল যথা মুসলিম লীগ ও বেঙ্গল মুসলিম লেজিসলেটরস্

---

[২৮৭] স্বরাজ দলের মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীরা যেমন বিধান চন্দ্র রায়, নির্মল চন্দ্র চন্দর, নলিনী রঞ্জন সরকার, শরৎ চন্দ্র ঘোষ, তুলসী চন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ মিলে কর্মীসংঘ গঠন করেছিল। কর্মীসংঘের কাজ ছিল স্বরাজ দলকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা। হোসেন, *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা*, পৃ. ৭৮।

[২৮৮] হোসেন, *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা*, পৃ. ৬৫-৭০।

এসোসিয়েশন। উল্লেখ্য, ১৯১৫ সালে বাংলায় মুসলিম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুরুতে সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে লীগ ১৯২৯ সালের পূর্বে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রতিশ্রুতি ছিল তারা নির্বাচিত হলে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করবে। স্বরাজ দল অন্যান্য দাবির সঙ্গে ঘোষণা করে যে তারা নির্বাচিত হলে সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন এবং কৃষকের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করবে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট পার্টি ভোটারদের আকৃষ্ট করতে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তাদের লক্ষ্য হবে বাংলার কৃষকের ভাগ্যোন্নয়ন করা এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।[২৮৯] অর্থাৎ ১৯২৯ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে কৃষকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির গুরুত্ব পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সম্পর্কে চন্ডিপ্রসাদ সরকার মন্তব্য করেন, "Its election manifesto called for the achievement of self-government by peaceful and constitutional means. It also pledged itself to remove impediments imposed on the *raiyats* in the last tenancy legislation and to fight for safeguarding the interests of the community in all walks of life. "[290] এই নির্বাচনে বিজয়ী বঙ্গীয় কাউন্সিল পরিষদের মুসলমান সদস্যগণ বাংলা বিশেষত পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়াও তারা কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার্থে কৃষক প্রজা সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও গ্রহণ করেছিল। এমনকি, তারা পরবর্তীকালে কৃষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচিও গ্রহণ করেছিলেন।[২৯১]

৩.৪.৮ ১৯৩০ সালের উপ-নির্বাচন ও নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকের স্বার্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৩০ সালে পঞ্চম বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে কংগ্রেসের নির্দেশে একজন ব্যতীত স্বরাজ দলের সকল সদস্য প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা হতে পদত্যাগ করেন। এই আসনগুলোতে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী হিন্দুদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ছিল কংগ্রেস, স্বরাজ পার্টি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট পার্টি, পিপলস পার্টি, বেঙ্গল হিন্দু সভা ও প্রজা পার্টি। প্রজা পার্টির পক্ষে জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কৃষক-মজুরদের পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসাধারণকে তাঁর দলকে ভোট দিতে আহবান করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল সংসদে যে প্রজা পার্টি আছে সেটা কেবলমাত্র মুসলমান সদস্য নিয়েই গঠিত। তাই তাঁরা আইন সভায় নির্বাচিত হলে প্রজা পার্টিতে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় ধর্মের প্রাধান্য সমভাবে বজায় রেখে জনগণের স্বার্থে কাজ করবে।[২৯২] উল্লেখ্য, জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস ও স্বরাজ পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকের স্বার্থ উপেক্ষিত হলেও প্রজা পার্টি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তথা কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিল। উল্লেখ্য, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে অনুষ্ঠিত পাঁচটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনের প্রথম দিকে কৃষককের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির গুরুত্ব উপেক্ষিত হলেও শেষ দিকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে কৃষক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এর মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

৩.৪.৯ ১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও কৃষক সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে জনসাধারণ তথা কৃষকদের ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয়। এই আইন অনুযায়ী

[২৮৯] হোসেন, *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা*, পৃ. ৭০-৭৩।
[২৯০] Sarkar, *Bengali Muslims*, P. 220.
[২৯১] Sarkar, *Bengali Muslims*, pp. 219-221.
[২৯২] হোসেন, *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা*, পৃ. ৭৫-৭৬।

নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভূক্তির শর্ত ছিল : (১) কোনো নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিকে উক্ত নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা হতে হবে; (২) ভোটার হওয়ার জন্য কমপক্ষে তার বয়স ২১ বছর হতে হবে; (৩) ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিকে ন্যূনতম ৬ আনা খাজনা প্রদান করতে হবে। এছাড়াও নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা তথা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি, সেনাবাহিনীর বরখাস্ত এবং পেনশনভোগী বা অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক বা অফিসার ভোটার হওয়ার যোগ্য ছিলেন। উল্লেখ্য, নারী ও হরিজন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নির্বাচকমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শর্ত ছিল নমনীয়। ঐ শ্রেণি দু'টির পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আরও উল্লেখ্য, বিভিন্ন প্রদেশে বিরাজমান পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্বাচকমণ্ডলীর যোগ্যতার তারতম্য ছিল। সকল প্রদেশে জনসংখ্যার অভিন্ন কিছু শ্রেণি ও অংশকে ভোটাধিকার প্রদান করাই ছিল এই আইনের প্রধান লক্ষ্য। এই আইনে মোট জনসংখ্যার ১৪% মানুষ ভোটাধিকার লাভ করেছিল। এছাড়াও এর দ্বারা নিম্নশ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে প্রায় ১০% লোক ভোটাধিকার লাভ করেছিল।[২৯৩] উল্লেখ্য, ১৯৩১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৫,১০,৮৭,৩৩৮ জন।[২৯৪] এর মধ্যে ১৪% মানুষ ভোটাধিকার লাভ করায় ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭১,৫২,২২৭ জন। এর মধ্যে মুসলমান ভোটার ছিল ৩৪,৬২,৭৬৭ জন বা ৪৮.৪২% এবং হিন্দু ভোটার ছিল ২৮,১৭,১৭৩ বা ৩৯.৩৯%।[২৯৫] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ রসুলের হিসেব অনুযায়ী ১৯৩১ সালে বাংলায় অনুপস্থিত জমির মালিক খাজনাভোগীর সংখ্যা ছিল ৬,৩৩,৮৩৪ জন।[২৯৬] এম. আজিজুল হকের মতে ১৯৩১ সালে বাংলায় যারা নিজেরা খাজনা-স্বত্ব ভোগ করতো কিন্তু চাষাবাদের সঙ্গে জড়িত ছিল না এরূপ জমিদারের সংখ্যা ছিল ৭,৮৩,৭৫৫ জন।[২৯৭] পার্থ চ্যাটার্জীর মতে ১৯৩১ সালে বাংলায় সর্বমোট মধ্যস্বত্বভোগী জোতদারের সংখ্যা ছিল ২৭,৩০,০০০ জন। তিনি এও বলেন যে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বার্ষিক ৩০০০ টাকা ভূমি রাজস্ব অথবা সেস প্রদান সাপেক্ষে ১৯৫১ জন জমিদার ভোটাধিকার লাভ করেছিল।[২৯৮] সুতরাং তাঁর হিসেব অনুযায়ী জমিদার ও জোতদারের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ২৭,৩১,৯৫১ জন। এই সর্বোচ্চ সংখ্যক খাজনাভোগী জমিদার এবং জোতদারদের সংখ্যাকে হিসেবে নিয়েও বলা যায় যে তাদের বাইরেও ৩৫,৪৭,৯৮৯ জন মানুষ ভোটাধিকার লাভ করেছিল। নিঃসন্দেহে জমিদার এবং জোতদারদের বাইরে এই বিপুল সংখ্যক ভোটাধিকার লাভকারী ছিল মধ্যম শ্রেণির সচ্ছল কৃষকরা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই সচ্ছল কৃষকরা ছিল পূর্ব বাংলার। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে ধনী সচ্ছল শ্রেণির কৃষকরাও মধ্যস্বত্বভোগী জোতদার শ্রেণিভুক্ত ছিল। এর ফলে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অতিরিক্ত ভোটাধিকার লাভকারীরা ছিল প্রধানত মধ্যম শ্রেণির সচ্ছল কৃষকরা। আর যৎসামান্য জোতজমির মালিক, বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষক তথা সাধারণ শ্রেণির কৃষকরা নির্বাচনে ভোটাধিকার লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে রাজনৈতিক দল এবং দলের নেতৃবৃন্দের কাছে ধনী ও মধ্যম সচ্ছল নির্বিশেষে সকল শ্রেণির কৃষকের গুরুত্বই বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে প্রধানত ৩টি রাজনৈতিক দল যথা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি দলীয়ভাবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। এছাড়াও ত্রিপুরা কৃষক সমিতি কেবলমাত্র ত্রিপুরা জেলায়

[২৯৩] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৫৫৪; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১০১ ও ১০৬; হক, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, পৃ. ৫১৬-৫১৭; মল্লিক, *আধুনিক ভারতের রূপান্তর*, পৃ. ৫৬৯।
[২৯৪] *Census of India 1931, Bengal & Sikkim,* Report, Vol. V, Part II, (Calcutta : Central Publication Branch, 1932), p. 2.
[২৯৫] Rahim and Rahim, *Bengal Politics,* p. 120.
[২৯৬] রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৫২।
[২৯৭] হক, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ১৩৩।
[২৯৮] Chatterji, *Bengal,* pp. 15-16.

স্থানীয়ভাবে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। নির্বাচনে ত্রিপুরা কৃষক সমিতি ঐ জেলার ৭টি আসনের মধ্যে ৫টি আসনে জয় লাভ করে (সারণি ২০)।[২৯৯] এটা প্রমাণ করে যে নির্বাচনে বিজয়ের মূল শক্তি নিয়ামক ছিল কৃষকরা।

৩.৪.৯.১ কংগ্রেসের নির্বাচনী রাজনীতি ও কৃষক সমাজের প্রতিক্রিয়া

ঔপনিবেশিক শাসনামলে ১৮৮৫ সালে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দলটি বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় কখনই কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেনি। কেননা বাংলা বিশেষত পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জমিদাররা ছিল হিন্দু এবং অধিকাংশ কৃষকরা ছিল মুসলমান। উনিশ শতকে ভূমি বিরোধ বা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে কৃষকরা সব সময় ছিল শোষণ ও নির্যাতনের কেন্দ্র বিন্দুতে। উনিশ শতকে গড়ে উঠা বঙ্গীয় ভূম্যধিকারী সভাসহ যেসব সভা-সমিতি গঠিত হয়েছিল তার বেশিরভাগ সংগঠনেরই নেতৃত্বে ছিলেন জমিদাররা। সরকারের সঙ্গে জমিদারদের যে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধানে ঐসব সংগঠন জমিদারদের পক্ষে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। উল্লেখ্য, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই জমিদার এবং জমিদার পরিবার থেকে উদ্ভূত পেশাজীবীরাই ছিলেন কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে। শুধু তাই নয়, প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্বেও ছিলেন জমিদার ও জমিদার পরিবার থেকে উদ্ভূত পেশাজীবী শ্রেণি। বঙ্গীয় কংগ্রেস এবং এর নেতৃবৃন্দের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জয়া চ্যাটার্জী বলেন, "The politics of the Bengal Congress reflected the social conservatism of its predominantly *bhadralok* membership."[300] এ কারণে প্রতিষ্ঠার পর হতে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস শুধুমাত্র জমিদারদের স্বার্থেই ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮৮৭ সালে কংগ্রেসের পক্ষ হতে কৃষকের ওপর জমিদার ও সরকারের দ্বিমুখী আক্রমণের অর্থনৈতিক চাপ সামলাতে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আধুনিক কৃৎকৌশলে শিক্ষাদান দাবি করা হয়। এ কারণে অমিতাভ চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন যে বাংলার কৃষক সমাজ যখন গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত তখন কংগ্রেস 'রোমান্টিক আন্দোলনে নিজেদের নিস্পৃহ' রেখেছিল। ফলে কংগ্রেসের খাদি এবং হিন্দু স্বরাজ্যের সংগ্রাম ছিল মূলত একটি ইউটোপীয় সংগ্রাম। প্রকৃতপক্ষে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দল প্রধানত জমিদারদের স্বার্থেই কৃষক বিমুখ ছিল। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে একজন জমিদার হয়েও কংগ্রেসের এই রাজনীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের রাজগদি ভাগ করে নেওয়াই পলিটিকস। দেশের সেই পলিটিশিয়ান আর সর্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।"[৩০১] অর্থাৎ কৃষক ও জমিদারের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাসে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছিল।

বস্তুতপক্ষে, কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থ এবং প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখা। এ কারণে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ভোট রাজনীতির প্রবর্তন হওয়ায় সচ্ছল শ্রেণির কৃষকরা নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হলেও নির্বাচনে প্রতিনিধি বন্টনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস কৃষকদের গুরুত্ব দেয়নি। এছাড়াও কংগ্রেস জমিদারি প্রথার অবসান ঘটিয়ে ভূমিব্যবস্থার কোনো আমূল পরিবর্তনেরও পক্ষপাতী ছিল না। যদিও অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে কংগ্রেসের আহবানে বাংলার বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কৃষকরা যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গেই সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শ্রেণি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। এর ফলে কৃষকরা কংগ্রেসের প্রতি হতাশ হয়েছিল। উপরন্তু, ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেসের বারদোলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং

---

[২৯৯] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, pp. 74-75 and 77; Sen, *Muslim Politics in Bengal*, pp. 88-89; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২২।

[৩০০] Chatterji, *Bengal divided*, pp. 88-89.

[৩০১] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭১-৪৭২।

কমিটির বৈঠকে জমিদারদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে তারা জমিদারদের আইনসঙ্গত অধিকারের ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ সমর্থন করবে না। ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠকের পর প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে কর বয়কট নীতি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত। নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের এই নীতি ছিল কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী।[৩০২] এর ফলে কৃষকরা জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেসের কৃষক বিরোধী প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছিল। বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকরা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল যে কংগ্রেস তাদের স্বার্থ রক্ষা না করে বরং তাদের স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। উল্লেখ্য, ১৯২৬ সালে গুয়াহাটিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হয় : (১) জমিতে যেন কৃষকদের স্বত্ব স্থায়ী হয় এবং তারা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পায়, তার জন্য কংগ্রেস চেষ্টা করবে; (২) কংগ্রেস কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সংরক্ষণ ও সমতার ভিত্তিতে জমিদার-কৃষক পুঁজিপতি-শ্রমিক ইত্যাদির সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়াসী থাকবে। কিন্তু সম্মেলনে জমিদারি প্রথা সংক্রান্ত বিষয়ে কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসলে তা নাকচ হয়ে যায়। এর কারণ ছিল জমিদাররা কংগ্রেসকে অর্থ সাহায্য করতো। কৃষকরা জমির স্বত্ব লাভ করলে জমিদাররা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিলে কংগ্রেস অর্থ সাহায্য হতে বঞ্চিত হবে। এ কারণে প্রচুর ভোটের ব্যবধানে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। এমনকি, ১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নের সময়ও কংগ্রেস সদস্যরা জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করে। এই আইন প্রণয়নকালে জমিদার সমর্থক কংগ্রেস ও স্বরাজ দলের সদস্যরা জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বাত্মক চেষ্টা করে এবং তারা সফলও হয়। এই আইন প্রণয়নের পর জমিদার সমর্থক কংগ্রেস দলের প্রচণ্ড আত্মতুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল যে কারণে জৈনক কংগ্রেস সদস্য মন্তব্য করেন, "এই আইনে গাছ কেটে নেবার যে টানা স্বত্ব কৃষককে দেওয়া হলো তাতেই বাংলার কৃষকেরা 'কংগ্রেসের চাষি-হিতৈষণায় মুগ্ধ থাকবে'।" কংগ্রেস সদস্যের এমন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ার বিপরীতে অমিতাভ চক্রবর্তীর অভিমত হলো, "বাংলার চাষি 'চাষা' হলেও অতটা যে 'বোকা' নয়, তা পরবর্তী ঘটনাতেই বোঝা যায়। বস্তুত, জমিদারদের প্রতি কংগ্রেসের এই সহানুভূতিশীল মনোভাব বাংলার কৃষককে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শুধু সন্দিগ্ধ করেই তোলেনি, কংগ্রেস থেকে তাদেরকে অনেক দূরেও সরিয়ে নিয়ে যায়।"[৩০৩] ১৯৩০ সালে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি ১৯৩১ সালের গান্ধি-আরউইন চুক্তির পর প্রত্যাহৃত হয়। উপরন্তু, গান্ধি-আরউইন চুক্তির মধ্যেও কৃষকদের কোনো দাবি-দাওয়া অন্তর্ভুক্ত হয়নি যার ফলে কৃষক সমাজের মধ্যে বিষাদ ও হতাশা নেমে আসে। এটা দূর করতে ১৯৩১ সালের করাচিতে কংগ্রেসের অধিবেশনে কৃষকদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরা হয়। কৃষি খাজনা অথবা রাজস্বের বাস্তবানুগ ছাড়, সময়ের প্রয়োজনানুসারে সুনির্দিষ্ট কর ছাড়, ছোট জমিদারদের ক্ষেত্রে যেখানে প্রয়োজন সেখানেও রাজস্ব ছাড় দেওয়ার দাবি তোলা হয়। কৃষি আয়ের ভিত্তিতে সর্বনিম্নহারে একটি প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা গড়ে তোলারও আহ্বান জানানো হয়।[৩০৪] কিন্তু এমন প্রগতিশীল প্রস্তাব গ্রহণ করা হলেও প্রধানত জমিদারদের প্রভাবে অধিবেশনের পর এটি নিয়ে কংগ্রেসের কোনো কর্মসূচি বা কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। এটা ছিল কংগ্রেসের কৌশলী ভূমিকার অংশমাত্র।

এমনকি, ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বাংলার বিশেষ করে পূর্ব বাংলার বিপুল সংখ্যক মধ্যম শ্রেণির কৃষকরা ভোটাধিকার অর্জন করলেও কংগ্রেস তার নির্বাচনী ইশতেহারে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব দেয়নি। নির্বাচনে কংগ্রেসের একমাত্র বক্তব্য ছিল স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। এটা ঠিক

[৩০২] মল্লিক, *আধুনিক ভারতের রূপান্তর*, পৃ. ৬০৯; চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭৮; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৫৫।
[৩০৩] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৫৫৩-৫৫৪।
[৩০৪] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭৯।

যে, নির্বাচনে কংগ্রেস কোনো মুসলিম আসনে প্রার্থী দেয়নি। কৃষক প্রজা পার্টি ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা অলিখিত বোঝাপড়া ছিল যে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিবে না এবং পরস্পরের এলাকায় প্রবেশ করবে না। এর ফলে দু'পক্ষেরই লাভ হয়েছিল।[৩০৫] উল্লেখ্য যে, কংগ্রেসের প্রগতিশীল একটি অংশ কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার নামে সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টি নামে দু'টি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের নেতৃত্ব কৃষকদের দাবি-দাওয়াকে জাতীয়তাবাদী কর্মসূচির সাথে মেলাতে পারেননি। গান্ধি ও মতিলাল নেহেরুর জমিদার-কৃষকের ঐক্য ও অহিংসার ওপর গুরুত্ব প্রদান ছিল অবাঞ্ছিত। বস্তুত, বাংলায় ও অন্যান্য প্রদেশে চরমপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও কৃষককূলের অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগের সাথে জাতীয়তাবাদী স্লোগান মেলাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।[৩০৬] এর ফলস্বরূপ নির্বাচনে বঙ্গীয় আইন সভার ২৫০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৬০টি আসন লাভ করে (সারণি ২০)।[৩০৭] জয়া চ্যাটার্জীর মতে ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদ অনুযায়ী বাংলার আইনসভার আসন বণ্টনে হিন্দুরা ন্যায্যভাবে যতটা আসন আশা করেছিল তার চেয়ে তাদেরকে অনেক কম আসন দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে বঙ্গীয় আইন সভায় বাঙালি ভদ্রলোকদের (হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে) দুর্বল সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করা হয়। তিনি বলেন যে বাংলা যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করে তখন হিন্দু ভদ্রলোকদের মনে সত্যিকার যে রাজনৈতিক ক্ষমতার আশা ছিল ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ তা নিভিয়ে দেয় এবং মুসলমানদের নিকট তাদের চিরস্থায়ীভাবে অধীনতার সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ছবি ফুটে উঠে। তাই ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদারদের ফলে বাংলা প্রদেশে নাটকীয়ভাবে ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিশ শতকের শুরুতে সামগ্রিকভাবে বাংলায় মুসলমানেরা ছিল সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে তাদের সংখ্যা ছিল স্পষ্টভাবে অধিক। কিন্তু বাঙালি সমাজে আধিপত্য ছিল ভদ্রলোক হিন্দুদের এবং ভারতীয়রা যে সব ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকারী ছিল তার প্রায় প্রতিটি স্তরেই তাদের আধিপত্য ছিল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে নতুন প্রাদেশিক আইন সভায় হিন্দুদেরকে সংখ্যানুপাতে ন্যায্য প্রাপ্য থেকেও কয়েকটি আসন কম দেওয়া হয়। এর ফলে পরিষদে তারা সংখ্যলঘিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। তিনি আরও বলেন যে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের দ্বৈত শাসনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিল পরিষদে হিন্দুরা পায় ৪৬, আর মুসলমানেরা পায় ৩৯টি আসন। এই ব্যবস্থায় বাংলায় হিন্দু ভদ্রলোকের শক্তিশালী আধিপত্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। মাত্র একটা আঘাতের মধ্য দিয়ে এই অবস্থার পরিবর্তন করা হয়। অর্থাৎ সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ বঙ্গীয় আইন সভায় বাঙালি ভদ্রলোকদের (হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে) দুর্বল সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করা হয়।[৩০৮]

কিন্তু জয়া চ্যাটার্জীর এই অভিযোগ ছিল কিছুটা আবেগ তাড়িত সাম্প্রদায়িকতার বিশ্লেষণের ফল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৫,১০,৮৭,৩৩৮ জন।[৩০৯] এর মধ্যে মুসলমান ছিল ২,৭৮,১০,১০০ জন বা ৫৪.৪৪% এবং হিন্দু ছিল ২,২২,১২,০৬৯ জন বা ৪৩.৪৮%।[৩১০] উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে তালিকাভুক্ত মোট ভোটাধিকারীর সংখ্যা ছিল ৬২,৭৯,৯৪০ জন। এর মধ্যে মুসলমান ভোটার ছিল ৩৪,৬২,৭৬৭ জন বা ৪৮.৪২% এবং হিন্দু ভোটার ছিল ২৮,১৭,১৭৩ বা ৩৯.৩৯%।[৩১১] জনসংখ্যার গাণিতিক

---

[৩০৫] Jalal, *Sole Spokesman*, p. 26; Sen, *Muslim Politics in Bengal*, pp. 80-81; ঘোষ, *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি*, পৃ. ১৯৯;.

[৩০৬] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭৬।

[৩০৭] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, pp. 74-75 and 77; Sen, *Muslim Politics in Bengal*, pp. 88-89; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২২।

[৩০৮] চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ২৫।

[৩০৯] *Census of India 1931*, p. 2.

[৩১০] *Census of India 1931*, pp. 268-270.

[৩১১] Rahim and Rahim, *Bengal Politics*, p. 120.

হিসেবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলমানদের প্রাপ্য ছিল ১৩৬টি আসন এবং হিন্দুদের প্রাপ্য ছিল ১০৯টি আসন। অন্যদিকে নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলমানদের প্রাপ্য ছিল ১২১টি আসন ও হিন্দুদের প্রাপ্য ছিল ৯৮টি আসন। ম্যাকডোনাল্ডের সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ অনুযায়ী ১৯৩৫ সালের আইনে ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলমানরা পেয়েছিল ১১৯টি আসন ও হিন্দুরা পেয়েছিল ১০৪টি আসন (সারণি ২১ এর ক এবং খ)।[৩১২] অর্থাৎ জনসংখ্যা অনুযায়ী মুসলমানরা প্রাপ্য আসন থেকে কম পেয়েছিল ১৭টি এবং হিন্দুরা প্রাপ্য থেকে কম পেয়েছিল ৫টি আসন। অন্যদিকে নির্বাচকমণ্ডলীর হিসেব অনুযায়ী মুসলমানরা প্রাপ্য আসন থেকে কম পেয়েছিল ১৯টি আসন এবং হিন্দুরা তাদের প্রাপ্য থেকে বেশি পেয়েছিল ৬টি আসন। সুতরাং চ্যাটার্জীর হিন্দুদেরকে সংখ্যানুপাতে ন্যায্য প্রাপ্য থেকেও কয়েকটি আসন কম দেওয়ার অভিযোগ কতটুকু যৌক্তিক তা নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। উপরন্তু, চ্যাটার্জীর বিশ্লেষণে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের বিভাজন নীতি প্রয়োগের বিষয়টি উঠে এলেও এর জন্য দায় ছিল কার সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা দেননি। বস্তুতপক্ষে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ঘোষিত সম্প্রদায়গত রোয়েদাদে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতির প্রয়োগ ঘটেছিল এটা বাস্তব সত্যি। কিন্তু এর জন্য কোন সম্প্রদায় দায়ী ছিল তিনি সে সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা দেননি। প্রকৃতপক্ষে বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকের বিভিন্ন ঘটনা এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ 'ভাগ করে শাসন কর' নীতি কার্যকরের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার কৌশল অবলম্বন করেছিল। সুনীতি কুমার ঘোষের মতে যুক্ত নির্বাচকমন্ডলী গ্রহণ করলে ব্রিটিশরাজের বিভেদনীতিকে খর্ব করা যেতো, তার পরিবর্তে লন্ডন গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি রূপে গান্ধীজি যুক্ত নির্বাচকমন্ডলীর পক্ষে মুসলমান প্রতিনিধিদের প্রস্তাবকে অস্বীকার করেন এবং মুসলমান ও শিখদের জন্য পৃথক নির্বাচকমন্ডলীকে অনুমোদন করে ব্রিটিশ রাজের সেই বিভেদনীতিকেই শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। তারই ফলস্বরূপ ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে সম্প্রদায় ভিত্তিক নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং ১৯৩৬-৩৭ সাল থেকে ভারত সাম্প্রদায়িক তরঙ্গে প্লাবিত হয়ে যায়। এটা ছিল ভারত ভাগ ও বাংলা ভাগের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।[৩১৩] অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের জন্য প্রধানত কংগ্রেসই দায়ী ছিল। এছাড়াও জয়া চ্যাটার্জীর সাম্পদায়িক বিভেদ নীতির দৃষ্টিভঙ্গিগত বিশ্লেষণের পাশাপাশি উক্ত সময়ের রাজনীতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতেও বিশ্লেষণ করার সুযোগ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকের বাংলার রাজনীতির মূলে ছিল ভূমি রাজনীতি এবং তা ছিল মূলত ভূমি বিরোধের রাজনীতি। অর্থাৎ বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান হয়েছিল তার পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি। এই অধ্যায়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে বিশ শতকের বিশ এবং ত্রিশের দশকে ভোট রাজনীতির সূচনায় বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠন, ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়ন, নেহরু রিপোর্ট তৈরি ও গ্রহণের সময় উদ্ভূত পরিস্থিতি, গান্ধী-আরউইন চুক্তি, লন্ডনের গোল টেবিল বৈঠক প্রভৃতি ঘটনায় মূল প্রভাবকের ভূমিকায় ছিল বাংলার ভূমি বিরোধের রাজনীতি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর সরকারের নীতি কৌশলে পরিবর্তন এবং কংগ্রেসের ভূমিকা সম্পর্কে চ্যাটার্জীর হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সম্প্রদায়গত রোয়েদাদে ব্রিটিশদের সাম্প্রয়িক বিভেদ নীতির প্রয়োগকে বিবেচনা করেও যদি বাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলেও দেখা যাবে যে রোয়েদাদে সাম্প্রদায়িকভাবে বণ্টনকৃত আসন সংখ্যার পার্থক্যের কারণেই কেবলমাত্র বর্ণ হিন্দুদের আধিপত্য হ্রাস পায়নি বরং হিন্দুদের আধিপত্য হ্রাস পাওয়ার মূলে ছিল তফসিলি সম্প্রদায়ের হিন্দুদের ভূমিকা তথা ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

---

[৩১২] চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ২৫ এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক নির্মিত সারণি।

[৩১৩] ঘোষ, *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি*, পৃ. ১২২-১২৩।

কারণ বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কৃষকদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল মুসলমান এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ ছিল তফসিলি সম্প্রদায়ের হিন্দুরা। নিঃসন্দেহে বলা যে জমিদার কর্তৃক শোষিত ও নিপীড়িদের মধ্যে এই তফসিলি হিন্দু কৃষকরাও ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের নমঃশূদ্র কৃষকরা কংগ্রেস নয় বরং তারা তাদের স্বার্থে তফসিলি হিন্দু প্রার্থীদের ভোট দিয়েছিল। এ কারণে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তফসিলি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা ২৩টি আসনে নির্বাচিত হয়েছিল (সারণি ২০)।[৩১৪] নির্বাচনের পর বিজয়ী তফসিলি হিন্দু সদস্যরা ফজলুল হকের কোয়ালিশন সরকারেও যোগদান করেছিল।[৩১৫] প্রশ্ন হলো কংগ্রেসের মতো শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক দল ভালো ফললাভে ব্যর্থ হয়েছিল কেন? সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ ভূমি ও কৃষক সংক্রান্ত বিষয়ে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারে কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না অথবা এর প্রতি দলটি কোনো গুরুত্বও দেয়নি। উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ২৫০টি আসনের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত ছিল ১০৪টি আসন [সারণি ২১ (ক) ও (খ)]।[৩১৬] এর মধ্যে অধিকাংশ আসনে বিজয় বা পরাজয় ছিল পল্লী এলাকার কৃষক ভোটারদের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু পল্লী এলাকার ভোটারদের মন জয় করতে কংগ্রেসের প্রচারণা ছিল কমবেশি দুর্বল ও অসংগঠিত। এছাড়াও সাধারণ হিন্দু স্বনামধন্য কোনো কৃষক কর্মীকেও কংগ্রেস থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। উপরন্তু, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পদশালী ও প্রভাবশালী প্রার্থীকে এবং বিশেষ করে জমিদারদেরকে মনোনয়ন দিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস ছিল শহরকেন্দ্রিক একটি রাজনৈতিক দল। পল্লী অঞ্চলে কংগ্রেসের কোনো ভিত্তি ছিল না। কংগ্রেসের মূল ভিত্তি ছিল হিন্দু জমিদার, জোতদার ও তাদের থেকে উদ্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণি। জয়া চ্যাটার্জীর মতে বাংলায় কংগ্রেস ছিল মোটামুটিভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের জমিদার-জোতদার শ্রেণি থেকে উদ্ভূত ভদ্রলোকের দল। অনেক জেলা সদরে দলের উপস্থিতি থাকলেও দলের শক্তিশালী ভিত ছিল নগরভিত্তিক। বিভিন্ন জেলায় দলের অফিস ছিল সদর মহাকুমায় অবস্থিত। সদর মহাকুমার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যার কারণে পল্লীগ্রামের জনসাধারণের তথা কৃষকের সম্পর্ক কম থাকায় সেখানে কংগ্রেসের ভিত্তি ছিল দুর্বল। জেলাগুলোতে দলের সদস্য ছিল আইনজীবী, স্কুল শিক্ষক, বেতনভোগী কর্মচারী ও ছাত্ররা। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে বঙ্গীয় কংগ্রেস পুরোপুরি একটি শহরভিত্তিক দলে পরিণত হয়। দলের অনেক নেতা ছিলেন অনুপস্থিত জমিদার, গ্রামীণ এলাকায় তাদের অনেক এস্টেট ছিল এবং খাজনা আদায় ছিল তাদের একমাত্র স্বার্থ। বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সচিব কিরণ শংকর রায় ঢাকার তেওতায় বিশাল এস্টেটের জমিদার ছিলেন। কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা তুলসী চরণ গোস্বামীর পিতা রাজা কিশোরী লাল গোস্বামী ছিলেন একজন বড় জমিদার এবং রাজা পেয়ারী মোহন মুখার্জীর প্রপৌত্র তারকনাথ মুখার্জীও ছিলেন বড় এস্টেটের মালিক। যুগান্তর গ্রুপের নেতা (যিনি পরে বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন) সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ছিলেন একজন জমিদার পরিবারের সদস্য। বিক্রমপুরের জমিদার ইন্দুভূষণ গুপ্ত এবং বরিশালের রামচন্দ্রপুরের জমিদার কালী প্রসন্ন ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত।[৩১৭] প্রধানত জমিদার তোষণনীতি এবং কৃষকদের স্বার্থ উপেক্ষা করার কারণেই নির্বাচনে কৃষকরা কংগ্রেসকে সমর্থন করেনি। ফলে পল্লী এলাকায় নির্বাচনে কংগ্রেস সুবিধা করতে পারেনি এবং কৃষকদের ভোট অর্জনে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়। এটা ছিল কংগ্রেসের কৃষক বিমুখতার ফল। সুতরাং কংগ্রেসের নির্বাচনী ফলাফল প্রমাণ করে যে নির্বাচনী রাজনীতিতে

---

[৩১৪] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, pp. 74-75 and 77; Sen, *Muslim Politics in Bengal*, pp. 88-89; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২২।

[৩১৫] বিস্তারিতভাবে দেখুন, রশিদ, *"বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা ১৯৩৭-১৯৪৭"*, পৃ. ১৮৮-২২২; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১১০-১১১; হক, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, পৃ. ৫৪১।

[৩১৬] চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ২৫ এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গষেক কর্তৃক নির্মিত সারণি।

[৩১৭] চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ৯৬-১০৮।

কৃষকদের স্বার্থ ও গুরুত্বকে অবহেলা করার কারণেই কংগ্রেস নির্বাচনে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়েছিল। এটা ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতির ফল।

৩.৪.৯.২ মুসলিম লীগের নির্বাচনী রাজনীতি ও কৃষক সমাজের প্রতিক্রিয়া

ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গবিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনে বাংলা তথা পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষকদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়াও আলোচনা করা হয়েছে যে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ভোট রাজনীতির সূচনা থেকে বিশ শতকের ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিশিষ্ট মুসলিম জমিদার ও জোতদার নেতৃবৃন্দ কৃষকদেরকে সংগঠিত করে বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠন করেন। উপরন্তু, ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নের সময় কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু এটাও ঠিক যে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে এসে বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মুসলিম জমিদার ও জোতদার নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়েছিল।

১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যে ঢাকার নবাব হাবিবুল্লার উদ্যোগে ১৯৩৬ সালের মে মাসে 'নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা' করার লক্ষ্যে ঢাকার নবাবের কলকাতাস্থ বাসভবনে 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। নব গঠিত দলটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নবাব হাবিবুল্লাহ, সহসভাপতি হন জলপাইগুড়ির নবাব মোশাররাফ হোসেন, সেক্রেটারি হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং ট্রেজারার হন কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী হাসান ইস্পাহানী। নতুন এই দলটি ছিল মূলত বাংলার একাধিক প্রসিদ্ধ ও ক্ষমতাশালী মুসলিম জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে একটা নির্বাচনী ঐক্যজোট। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল বিলুপ্ত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের স্থান দখল করা। আকরাম খাঁন ও তার নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির একাংশ ইউনাইটেড মুসলিম পার্টিতে যোগদান করেন। এই পার্টির লক্ষ্য ছিল শহরের মুসলমান ভোটারদের সমর্থন লাভ করা। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন অনুযায়ী শহর এলাকায় মুসলমানদের জন্য ছয়টি আসন বরাদ্দ করা হয়, এর মধ্যে চারটি আসনই ছিল কলকাতায়।[৩১৮] ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে হাসান ইস্পাহানী তৎকালীন মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে বাংলায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। জিন্নাহ সে সময় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের পুনর্গঠন এবং দলে নিজের স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বাংলার রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগকে তিনি সাদরে গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে জিন্নাহ কলকাতায় আসেন এবং অনতিবিলম্বে নবাবদের দ্বারা সৃষ্ট ইউনাইটেড মুসলিম পার্টিকে মুসলিম লীগে একীভূত করানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এভাবেই বাংলায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ দলটি পুনর্গঠিত হয়।[৩১৯] এই পুনর্গঠিত মুসলিম লীগ ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ১১৯টি আসনে মধ্যে ১১৭টি মুসলিম সাধারণ আসনে প্রধানত মুসলিম লীগ এবং কৃষক প্রজা পার্টি একে অপরের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। নির্বাচনে

[৩১৮] মুসলমানদের জন্য বরাদ্দকৃত ছয়টি আসনের মধ্যে কলকাতা-কেন্দ্রিক ৪টি নির্বাচনী এলাকা ছিল : (১) উত্তর কলকাতা, (২) দক্ষিণ কলকাতা, (৩) হুগলী-কাম-হাওড়া (মিউনিসিপ্যাল) ও (৪) ব্যারাকপুর (মিউনিসিপ্যাল) এবং বাকি দু'টি নগরকেন্দ্রিক নির্বাচনী এলাকা ছিল : (৫) ২৪-পরগনা (মিউনিসিপ্যাল) ও (৬) ঢাকা (মিউনিসিপ্যাল), দেখুন, চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ১১৫।

[৩১৯] দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮-৯১।

মুসলিম লীগের প্রচারণার মূল শ্লোগানের বিষয় ছিল মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা।[৩২০] নির্বাচনে মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহার এবং প্রচার-প্রচারণা সম্পর্কে জয়া চ্যাটার্জী মন্তব্য করেন, "The Muslim League campaign, on the, appealed to the simple notion of Muslim unity and the welfare of the Muslim community as a whole."[321] অর্থাৎ নির্বাচনে মুসলিম লীগ শুধুমাত্র মুসলিম ঐক্য এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণের আহ্বান জানায়। মুসলিম লীগ দাবি করে যে তাদের 'প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো প্রজা ও শ্রমিকদের ভাগ্যের উন্নতি করা'। উল্লেখ্য, ঢাকার নবাবের চাচাতো ভাই খাজা নাজিমুদ্দিন মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা ছিলেন। নাজিমুদ্দিনের নির্বাচনী প্রচারণার জন্য 'আহসান মঞ্জিল'র সব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে কাজে লাগানো হয়। এমনকি বাংলার গভর্নর স্যার অ্যান্ডারসন পটুয়াখালী সফর করেন এবং খাজা নাজিমুদ্দিনকে নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারণায় ইসলাম ও মুসলিম পরিচিতির আহবান ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো সত্ত্বেও নাজিমুদ্দিন পল্লীর ভোটারদের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হন। নির্বাচনে খাজা নাজিমুদ্দিন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। অবশ্য সোহরাওয়ার্দী কলকাতার দু'টি পৃথক নির্বাচনী এলাকা থেকে বিজয়ী হন। তাঁর দু'টি আসনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া একটি আসনের উপ-নির্বাচনে নাজিমুদ্দিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।[৩২২] স্পষ্টত যে মুসলিম লীগ নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য 'ইসলাম ধর্ম ও মুসলিমদের ঐতিহ্য'কে ব্যবহার করেছিল কিন্তু তা কাজে লাগেনি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ১১৭টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ৩৯টি আসন (সারণি ২০)।[৩২৩] নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ১১৭টি আসনের মধ্যে ২৯.৯১% আসন লাভ করে। এছাড়াও মুসলিম লীগ মুসলমান ভোটারদের মধ্যে ২৭.১০% ভোট পায় যার মধ্যে শহুরে ভোটের পরিমাণ ছিল ৬১.৬৭% এবং পল্লী অঞ্চলের ভোটের পরিমাণ ছিল ২৬.৫২%।[৩২৪] জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের ভোটের ফলাফল থেকে সহজেই অনুমেয় যে মুসলিম লীগ সার্বিকভাবে কৃষকদের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কৃষকদের অধিকাংশ ছিল ইসলাম ধর্মের অনুসারী অথচ মুসলিম লীগ কর্তৃক মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও ধর্মের কথায়ও কৃষকরা সাড়া দেয়নি। কারণ কৃষকদের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিলাষ ছিল ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার ও শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তি লাভ। এছাড়াও জমিদারি প্রথা ছিল কৃষকদের নিকট মুক্তি পাওয়ার প্রধান অন্তরায়। জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ও প্রচারণার কোথাও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ ছিল না। স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন পরবর্তী মুসলিম লীগের করণীয় সম্পর্কেও পল্লী অঞ্চলের ভোটারদের মধ্যে সন্দেহ ছিল যে বিজয়ী হওয়ার পর লীগ তাদের স্বার্থে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে না। এ কারণে নির্বাচনে মুসলিম লীগ আশানুরূপ ফল পায়নি। নির্বাচনী ফলাফল প্রমাণ করে যে জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ নির্বাচনের সময় আদর্শগত কারণে জমিদারি প্রথাসহ ভূমিস্বত্ব বিষয়ে তথা কৃষকদের স্বার্থে কোনো প্রস্তাব বা বক্তব্য উপস্থাপন না করায় কৃষকরাও লীগের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেনি। সুতরাং প্রধানত ভূমি বিরোধের রাজনীতির কারণেই নির্বাচনে লীগ কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়েছিল।

---

[৩২০] Sen, *Muslim Politics in Bengal*, p. 80.

[৩২১] Chatterji, *Bengal divided*, p. 84.

[৩২২] দেখুন, চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ৮৯-৯৬।

[৩২৩] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, pp. 74-75 and 77; Sen, *Muslim Politics in Bengal*, pp. 88-89; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২২। উল্লেখ্য, নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রাপ্ত আসন নিয়ে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দেখুন, Sen, *Muslim Politics in Bengal*, p. 88; চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ২৫; আহ্মদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ. ৩৬।

[৩২৪] Sen, *Muslim Politics in Bengal*, pp. 88-89.

৩.৪.৯.৩ কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী রাজনীতি ও কৃষক সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি

বিশ শতকের বিশের দশকে ভোট রাজনীতি প্রবর্তনের পর মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ সময় তারা মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা ও বয়স্কদের ভোটাধিকার দাবি করেন। চণ্ডীপ্রসাদ সরকার মন্তব্য করেন, "Thus, towards the close of 1928, at least an influential section of the Bengali Muslims was in a mood to tone down their insistence on separate electorates, only if adult franchise or reservation of seats according to the population were conceded to them."[325] মুসলিম নেতৃবৃন্দের বয়স্কদের ভোটাধিকারের দাবির মধ্যেই কৃষকদের মুক্তি নিহিত ছিল। এই দাবির গুরুত্ব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। তাৎক্ষণিকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের এই দাবি মেনে না নিলেও অব্যাহত প্রচেষ্টা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১৯৩২ সালে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষিত হয় এবং ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অন্তর্ভুক্ত হয়। এ আইনে বয়স্কদের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা না থাকলেও মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা ও সম্প্রসারিত ভোটাধিকার লাভের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে কৃষকদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ১৯৩৬ সালে বিশিষ্ট জোতদার নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম জোতদার ও মুসলিম মধ্যবিত্ত নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হকের নেতৃত্বে নব গঠিত কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগদানকারী বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন মৌলভী আব্দুল মজিদ (অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট); নদীয়া জেলার অভিজাত পরিবারের সন্তান শামসুদ্দিন আহমদ (আইনজীবী); ময়মনসিংহের আবুল মনসুর আহমদ (আইনজীবী ও জোতদার পরিবারের সন্তান); ময়মনসিংহের জোতদার পরিবারের শাহ আব্দুল হামিদ; যশোরের নওশের আলী (নড়াইল মহাকুমার সিভিল কোর্টের প্রসেস সার্ভার); ফরিদপুরের তমিজউদ্দীন আহমদ খান (উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু কৃষক পরিবারের সন্তান) প্রমুখ।[৩২৬] কৃষক প্রজা পার্টির এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে বেশির ভাগ ছিলেন জোতদার এবং অল্প কিছু সংখ্যক ছিলেন মুসলিম মধ্যবিত্ত ও কৃষক পরিবারের সন্তান। এ কারণে কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃবৃন্দ শহর এবং প্রধানত পল্লী অঞ্চলের নতুন ভোটার, বিশেষ করে জোতদার ও সচ্ছল কৃষক শ্রেণির ভোটারদের আস্থা অর্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। ফজলুল হক উক্ত জোতদার, মধ্যবিত্ত ও কৃষক পরিবার থেকে উদ্ভূত নেতৃবৃন্দের সহযোগে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। বিজয়ী হওয়ার কৌশল হিসেবে হক নির্বাচনের পূর্বে ৫ জন জোতদার এবং ৬ জন কৃষক ও মধ্যবিত্ত পরিবারের পেশাজীবীসহ মোট ১১ জন সদস্যের সমন্বয়ে কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী বোর্ড গঠন করেছিলেন।[৩২৭]

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি ১৪ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে অন্যতম ছিল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, জমির খাজনা হ্রাস, জমিদারদের হকশোফা অধিকার (pre-emptive right) বাতিল, জমিদারদের নজর-সেলামি বাতিল, ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করে কৃষকদের ঋণের বোঝা লাঘব ও কৃষকদের জমির ওপর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। এছাড়াও পার্টির কর্মসূচির মধ্যে

---

[৩২৫] Sarkar, *Bengali Muslims*, pp. 212-213, 218.
[৩২৬] চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ৮১।
[৩২৭] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, p. 65; চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ৮৪।

ছিল কাঁচা পাটের ন্যূনতম মূল্য বেঁধে দেওয়া, জমির খাজনা মওকুফ এবং ঋণ বাতিল করা।[৩২৮] কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনীমূলক জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল 'জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও ডালভাত'।[৩২৯] এ সম্পর্কে আমিনুর রহিম মন্তব্য করেন, "To drive home its message, the KPP devised the famous populist slogan dal-bhat (rice and lentil) for every peasant family. The KPP paid less attention to constitutional issues due to its understanding of the political economy of Bengal and thrived on agrarian questions that were close to the hearts of most of East Bengali peasants."[330] এ কারণে নতুন ভোটাধিকার লাভকারী ধনী ও সচ্ছল উভয় শ্রেণির কৃষকরাই কৃষক প্রজা পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এমনকি, নিম্নশ্রেণির কৃষক যাদের ভোটাধিকার ছিল না তারাও নির্বাচনের সময়ে এই শ্লোগানে আকৃষ্ট হয়ে কৃষক প্রজা পার্টির প্রচার-প্রচারণায় পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে যা সামগ্রিকভাবে পার্টির জনপ্রিয়তা অর্জনে ভূমিকা পালন করেছিল। জয়া চ্যাটার্জীর মতে কৃষক প্রজা পার্টির লক্ষ্য ছিল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার বিলোপ করা। পার্টির কর্মসূচিতে ছিল খাজনা মওকুফ ও ঋণ বাতিল করা। এ ধরনের সম্ভাবনা কৃষকদের অবশ্যই খুশি করেছিল এবং তা অগণিত দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণির মানুষকেও উৎসাহিত করেছিল। তবে কৃষক প্রজা পার্টির মূল স্লোগান 'জমিদার নিপাত যাক' ছিল ধনী ও সচ্ছল কৃষকদের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন-কেননা তাঁরা জমিদারদের কাছ থেকে জমির মালিকানার অধিকার পেয়েছিল। জমিদারদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে তাঁরাই ছিল সোচ্চার। কারণ তাদের আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণের পথে জমিদারদের ক্ষমতা ছিল প্রধান বাঁধা। অন্যদিকে ফজলুল হক নিজেও জোতদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলমানেরাও তাঁকে গভীরভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। কারণ তিনি বিশ শতকের বিশের দশকের শেষ দিকে সরকারের মন্ত্রী হয়ে তাদের জন্য চাকুরির ব্যবস্থা, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ তাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩৩১] সুতরাং বলা যায় যে কৃষক প্রজা পার্টির ইশতেহার, প্রতিশ্রুতি ও নির্বাচনী শ্লোগানে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি আকৃষ্ট হয়। নির্বাচনে এধরনের নির্বাচনী ইশতেহার, প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগান অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের ছিল না।

উল্লেখ্য, বিশ শতকের ত্রিশের দশকের বিশ্বব্যাপী মহামন্দার প্রভাব বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিকেও প্রভাবিত করেছিল। এই মহামন্দার সময়ে মূল্যস্ফীতির ফলে খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির কারণে কৃষক তথা জনসাধারণ ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে। আবার কৃষকদের অর্থাভাবের কারণে কর-খাজনা বকেয়া থাকায় জমিদাররাও আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মহামন্দার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেক ব্যবসায়ী ধনশালী হয়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে আবার অনেকেই ছিলেন জোতদার। এই জোতদাররা ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে গঠিত ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিতে তাদের অনেকেই যোগদান করেছিল। নির্বাচনের প্রাক্কালে যোগদানকারী এই জোতদাররাই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে। তারা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে জনপ্রিয় ইশতেহার, প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগান নিয়ে তাদেরই আপনজন সচ্ছল কৃষক তথা অন্য জোতদারদের সামনে হাজির হয়েছিল। এটি এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল যেন জোতদার শ্রেণি আকৃষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ সচ্ছল কৃষক তথা জোতদারদের জনপ্রিয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। এই কর্মসূচিতে জমিদারি প্রথা বিলোপ, ভূমির খাজনা হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ করা,

---

[৩২৮] Razzaque, *Bengali Muslims*, pp. 116-117; Sen, *Muslim Politics in Bengal*, pp. 79-80; চ্যাটার্জী, বাঙলা ভাগ হলো, পৃ. ৮৪-৮৫; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২২; ঘোষ, *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি*, পৃ. ১৯৯।

[৩২৯] Razzaque, *Bengali Muslims*, pp. 116-117; Sen, *Muslim Politics in Bengal*, p. 80.

[৩৩০] Rahim, *Politics and National Formation in Bangladesh*, p. 179.

[৩৩১] চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ৮২-৮৫।

জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে জমিদারদের অগ্রক্রয়ের অধিকার বাতিল, আবওয়াব ও নজর সেলামিসহ বিভিন্ন স্থানীয় করের বিলোপ এবং ঋণ সালিশি বোর্ড গঠনের দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়। কৃষক প্রজা পার্টির এসব প্রতিশ্রুতি জমিদারদের ব্যাপক ক্ষমতার বিরুদ্ধে নিষ্পেষিত প্রজা-মালিকদের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য ছিল খুবই কার্যকর উপায়। তবে কৃষকদের বিভিন্ন স্তর থেকে ক্রমাগত উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে এই পার্টির নেতৃত্ব এবং দলীয় কর্মসূচিতে কোনো দিকনির্দেশনা ছিল না। যেমন বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষক মজুরদের সমস্যা সমাধান, ক্ষুদ্র জমির মালিকদের ক্রমবর্ধমান হারে জমি হস্তান্তর ও বিক্রি এবং কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না। এসব কারণে কৃষক প্রজা পার্টিকে 'জোতদারদের পার্টি' বলে আখ্যায়িত করা হয়। বিশিষ্ট জোতদার নেতা আবুল মনসুর আহমদ স্বীকার করেন যে বাংলার প্রজা আন্দোলনকে অনেকেই জোতদার আন্দোলন বলে নিন্দা করেন। তাঁর মতে তাঁদের অভিযোগ অনেক খানি সত্য ছিল।[৩৩২] কৃষক প্রজা পার্টির নীতি কৌশলের কারণে প্রধানত মুসলমান জোতদার এবং নতুন ভোটাধিকারপ্রাপ্ত ধনী শ্রেণির কৃষকরা বাংলার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। ১৯৩৬ সালের এক হিসেবে দেখা যায় যে ১৩টি জেলায় মুসলিম জোতদারদের কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩৩৩] এসব জেলায় 'অধিকাংশ ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ছিলেন জোতদার শ্রেণির এবং তাদের জমির পরিমাণ ছিল ত্রিশ থেকে তিন'শ একর পর্যন্ত। যেসব জোতদাররা এতোদিন ধরে জেলা, মহাকুমা এবং স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের রাজনীতি সীমিত রেখেছিল তারাই এই নির্বাচনের সুযোগে প্রাদেশিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। তারা কৃষক প্রজা পার্টিকে একটা সুবিধাজনক মঞ্চ হিসেবে গ্রহণ করে-সেখানে তাদের সরব উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এই নির্বাচনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ইতিপূর্বে জমিদার-প্রজা, সুদ ব্যবসায়ী-ঋণগ্রহীতা ও জোতদার-বর্গাদারদের মধ্যকার বিক্ষিপ্ত উত্তেজনা শুধু স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধতা ছিল কিন্তু নির্বাচনের সুযোগে তা প্রাদেশিক রাজনীতিতেও বিস্তৃত হয়।[৩৩৪] অমিতাভ চক্রবর্তীর মতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ৬ আনা খাজনা প্রদানকারী কৃষকদের ক্ষেত্রে ভোটের অধিকার সম্প্রসারিত হওয়ায় প্রথম দিকে কৃষক প্রজা পার্টির খুবই অসুবিধা হয়। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এই অসুবিধা দূর হয়। ফজলুল হক কৃষকদের স্বার্থে জমিদারি প্রথা অবসানের দাবি করেন এবং জমিতে কৃষকের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করার ঘোষণা দেন। নির্বাচন সামনে রেখে হক ঘোষণা করেন যে প্রজাস্বত্ব আইনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো যুক্ত করতে হবে : (১) নজর ও সেলামি আদায়ের যে অধিকার জমিদাররা ভোগ করেন তা বাতিল করতে হবে; (২) অতিরিক্ত খরচ না করেও কৃষকদের নাম পরিবর্তনের (নামজারির) অধিকার মেনে নিতে হবে; (৩) খাজনার পরিমাণ হ্রাস করতে হবে; এবং (৪) জমিদার ও তাদের প্রতিনিধি কর্তৃক অতিরিক্ত বেআইনি আদায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। হকের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্তরে ব্যাপক ভিত্তিক প্রচার এবং জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা হয়। বাংলার কৃষক সমাজ হকের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। মূলত এই কারণেই হকের কৃষক প্রজা পার্টি নির্বাচনে সফলতা লাভ করে।[৩৩৫] উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ধর্ম নিরপেক্ষতাই ছিল কৃষক প্রজা পার্টির কর্মসূচির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি কেবল মুসলমান আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও দলটি অসাম্প্রদায়িক অবস্থানও বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। উল্লেখ্য, ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি কোনো হিন্দু আসনে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। অথচ তাঁর

[৩৩২] আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ৬৪-৬৫।

[৩৩৩] শতকরা এই হার ছিল-যশোর ৬০.২ ভাগ, ঢাকা ৫৭.৮ ভাগ, বাকেরগঞ্জ ৬৪.৪ ভাগ, চট্রগ্রাম ৭৩.৩ ভাগ, ত্রিপুরা ৬৩.৮ ভাগ, নোয়াখালী ৭৩.৩ ভাগ, রাজশাহী ৬৪.৪ ভাগ, বগুড়া ৭৪.১৭ ভাগ, এবং পাবনা ৬৬.৬ ভাগ। দেখুন, চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ১১৪।

[৩৩৪] চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ৮৪-৮৭।

[৩৩৫] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৫৫৪-৫৫৫।

দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন এবং এদের মধ্যে অনেকে ছিলেন জোতদার।[৩৩৬] অর্থাৎ হকের কৃষক প্রজা পার্টির অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য ছিল, যদিও দলটি প্রধানত মুসলমানদেরই নেতৃত্ব দিয়েছিল। এ সম্পর্কে মশিরুল হাসান মন্তব্য করেছেন, "Bengal's Krishak Poja Party, which was 'non-communal in conception and approach' though 'dominantly Muslim in composition and leadership'."[৩৩৭] উল্লেখ্য, নির্বাচনী প্রচারণায়ও এই দলের নেতৃবৃন্দ সম্প্রদায়গত পছন্দকে গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে এবং মুসলিম জমিদারদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নেয়। ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাসে ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত প্রায় চার হাজার মুসলমানদের এক নির্বাচনী জনসভায় ফজলুল হক সকল জমিদারকে কৃষকদের স্বার্থ উপেক্ষা করার জন্য অভিযুক্ত করেন। এছাড়াও উক্ত জনসভায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী বিশিষ্ট জমিদার নেতা স্যার নাজিমুদ্দিন এবং স্যার কে জি এম ফারুকীর বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ ব্যয় ও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় তাঁদের ব্যর্থতার অভিযোগ করেন। নির্বাচনে হকের দৃষ্টি ছিল প্রধানত কৃষক ও কৃষি সংক্রান্ত সমস্যা ও তার সমাধানের ওপর।[৩৩৮] দলটি প্রধানত কৃষক ভোটারদের মন জয় করার প্রচেষ্টা চালায়। কারণ তারাই ছিল নির্বাচনে বিজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থীরা প্রধানত মুসলমান কৃষকদের সমর্থনে বিজয়ী হয়। এই নির্বাচনে হক বিশিষ্ট জমিদার নেতা স্যার খাজা নাজিমুদ্দিকে বিপুল ভোটে হারিয়ে নির্বাচিত হন।[৩৩৯] হকের নব গঠিত কৃষক প্রজা পার্টি নির্বাচনে ৩৬টি আসনে বিজয়ী হয় (সারণি ২০)।[৩৪০] সারণি ২০ থেকে দেখা যায় যে নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম ভোটারদের মধ্যে ৩১.৫১% এবং মুসলিম লীগ ২৭.১০% অর্থাৎ মুসলিম ভোটারদের মধ্যে হকের পার্টি লীগের চেয়ে ৪.৪১% ভোট বেশি পায়। হকের পার্টি শহরের ভোটারদের মধ্যে মাত্র ১৫.৩৯% ভোট লাভ করলেও পল্লী অঞ্চলের ভোটারদের ৩১.৭৮% ভোট পেয়েছিল। নির্বাচনে হকের কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থীরা পূর্ব বাংলার পল্লী অঞ্চলে ভালো ফল পায় এবং বিশেষ করে খুলনা, ময়মনসিংহ, বাকেরগঞ্জ ও নোয়াখালীতে তারা সবগুলো আসনে বিজয়ী হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে হকের পার্টি পূর্ব বাংলার বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের কৃষকদের মন জয় করায় ভালো ফল পেয়েছিল। এ কারণে নির্বাচনোত্তর বিজয় উল্লাসে ফজলুল হক ঘোষণা করেন যে কৃষকদের দাবি পূরণে তাঁর সরকার ব্যর্থ হলে তিনি রাইটার্স বিল্ডিংকে লালদিঘিতে নিক্ষেপ করবেন।[৩৪১] নির্বাচনে বিজয়ী হকের দল সরকার গঠন করেন। হক সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুত জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য ১৯৩৮ সালে ভূমি রাজস্ব কমিশন গঠন এবং ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নসহ কৃষকদের স্বার্থে বেশ কিছু ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (এ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। নির্বাচনে হকের পার্টি মুসলিম লীগকে পরাস্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি লীগের সঙ্গেই কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। তবে সরকার গঠনের শুরুতেই ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ ও চকদিঘির জমিদার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়কে মন্ত্রিসভায় আমন্ত্রণ জানানোর কারণে কৃষক প্রজা পার্টি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ভূমি সংস্কার, কৃষি ঋণ মওকুফসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেও দলীয় অনৈক্য এবং কৃষকদের মূল দাবি জমিদারি প্রথা

[৩৩৬] Sen, *Muslim Politics in Bengal*, p. 81.

[৩৩৭] Mushirul Hasan, *Legacy of a Divided Nation : India's Muslims since Independence* (Delhi : Oxford University Press, 1997), p. 62.

[৩৩৮] চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ৮৭-৯৬।

[৩৩৯] ফজলুল হক পান ১৩,৭৪২ ভোট এবং নাজিমুদ্দিন পান ৬,৩০৮ ভোট পান। দেখুন, Sen, *Muslim Politics in Bengal*, p. 89.

[৩৪০] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, pp. 74-75 and 77; Sen, *Muslim Politics in Bengal*, pp. 88-89; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২২। উল্লেখ্য, নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির প্রাপ্ত আসন নিয়ে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দেখুন, Sen, *Muslim Politics in Bengal*, p. 88; চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ২৫; আহমদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ. ৩৬।

[৩৪১] দেখুন, চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ৮৯-৯৬।

উচ্ছেদে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ উপেক্ষা করার কারণে কৃষক প্রজা পার্টি বাংলার রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।[৩৪২] অমিতাভ চক্রবর্তীর মতে নির্বাচনের পর হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী হলেও তাঁর লক্ষ্য অর্জনে খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। তাঁর সরকারের সময়কালে ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনের সংশোধনের ফলে কৃষকরা কিছু সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের আর্থিক দুর্গতি লাঘব হয়নি। উপরন্তু, তাঁর সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা দ্বারা কৃষকদের একটি অংশের কিছুটা সুবিধা হলেও ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী ও উঠবন্ধি কৃষকদের কোনো সুবিধা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে কৃষক প্রজা পার্টিতে জোতদার ও ধনী কৃষক শ্রেণির প্রাধান্য ছিল উল্লেখ করা মতো। এছাড়াও হকের মন্ত্রিসভার একটি প্রভাবশালী অংশ ছিল মুসলিম লীগ। এই মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ছিলেন জমিদার, জোতদার ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা, যাঁদের স্বার্থ যুক্ত ছিল প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে। এ কারণে তাঁরাও হককে বেশি দূর অগ্রসর হতে দেয়নি। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মাঝে মধ্যে জমিদারি প্রথার অবসান, ভূমি সংস্কার বিষয়ে কথা বললেও কার্যত ভূমি সংস্কারের জন্য কোনো গঠনমূলক উদ্যোগ নিজেরাও নেয়নি, আবার হক মন্ত্রিসভাকেও নিতে দেয়নি। মূলত লীগ সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লাভের জন্য কেবলমাত্র ভূমি সমস্যাকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল।[৩৪৩] এছাড়াও হক লীগে যোগদান করায় সাংগঠনিক অস্তিত্ব পৃথক থাকা সত্ত্বেও কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ একীভূত হওয়ায় কৃষক প্রজা পার্টি নামমাত্র একটি দলে পরিণত হয়েছিল। আবার ১৯৪১ সালে ফজলুল হক লীগ থেকে বহিষ্কার হয়ে নিজের প্রতিষ্ঠিত জোতদার সংগঠন কৃষক প্রজা পার্টিকে পুনরায় দাঁড় করাতে চেষ্টা করলেও পার্টির সম্পাদকসহ বেশ কিছু সংখ্যক জোতদার নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগে যোগদান করায় তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর ফলে কৃষক প্রজা পার্টির সাংগঠনিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং পার্টির জনপ্রিয়তাও হ্রাস পায়। সুতরাং কৃষক প্রজা পার্টির প্রতি কৃষকদের যে প্রত্যাশা ছিল তার কিছু অংশ পূরণ হলেও সার্বিকভাবে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদসহ বেশ কিছু অপ্রাপ্তি রয়ে যায়। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষকরা ভূমিস্বত্বের ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদসহ সার্বিকভাবে শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির আশায় মুসলিম লীগের প্রতি আকৃষ্ট হয় যার প্রতিফলন ঘটে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে।

৩.৪.১০ ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও কৃষক সমাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনেও উক্ত আইন অনুযায়ী নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শর্ত অপরিবর্তিত ছিল। এই শর্ত অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মোট জনসংখ্যার ১৪% মানুষ ভোটাধিকার লাভ করলেও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মোট জনসংখ্যার ১৪.১৭% মানুষ ভোটাধিকার লাভ করেছিল।[৩৪৪] এর কারণ ছিল ভোটার তালিকা সংশোধন। যদিও ১৯৪৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করেন যে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করা হবে না। কিন্তু তিনি এও বলেন যে, "বর্তমান ভোটাধিকার ব্যবস্থায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকরণ সম্ভব হবে না। কারণ এরূপ করিলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে অন্তত আরও দুই বৎসর বিলম্ব হইবে। তবে সরকার বর্তমান ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।"[৩৪৫] বড়লাটের এই ঘোষণা অনুযায়ী ভোটার তালিকা সংশোধনের কারণে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের তুলনায় ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা সামান্য কিছু

---

[৩৪২] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৪৭৮-৪৭৯।

[৩৪৩] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৫৫৪-৫৫৫।

[৩৪৪] Rahim and Rahim, *Bengal Politics*, p. 120.

[৩৪৫] করিম, "১৯৪৬ সালের নির্বাচন ", পৃ. ১০৪-১০৫।

বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, ১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৬,১৪,৬০,৩৭৭ জন।[৩৪৬] মোট জনসংখ্যার ১৪.১৭% ভোটার হওয়ায় মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৭,০৮,৯৩৫ জন। এর মধ্যে মুসলমান ছিল ৪৫,৪০,৩৫৫ জন বা ৫২.১৩% এবং হিন্দু ছিল ৩৪,৮৭,৬৬৮ জন বা ৪০.০৫%।[৩৪৭] ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জমিদার ও জোতদারের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ২৭,৩১,৯৫১ জন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচন পরে এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পূর্বে জমিদার ও জোতদারের সঠিক কোনো হিসেব না পাওয়ায় ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অন্তর্ভুক্ত জমিদার ও জোতদারের সংখ্যাকে বিবেচনায় নিয়েও বলা যায় যে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জমিদার ও জোতদারদের বাইরে মধ্যম শ্রেণির সচ্ছল কৃষকদের মধ্যে ৫৯,৭৬,৯৮৪ জন ভোটাধিকার লাভ করেছিল। নিঃসন্দেহে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জয় পরাজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল এই মধ্যম শ্রেণির সচ্ছল কৃষকরা।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, কৃষক প্রজা পার্টি, ইমারত পার্টি, জামাতে ওলামায়ে হিন্দ, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই), মুসলিম পার্লামেন্টারি বোর্ড, ন্যাশনালিস্ট মুসলিম, র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, হিন্দু মহাসভা, তফসিলি ফেডারেশন, ক্ষত্রিয় সমিতি, ইউরোপিয়ান, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও ভারতীয় খ্রিস্টান সর্বমোট ১৫টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করলেও মূলত মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবির যথার্থতা প্রমাণ করা এবং কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা প্রমাণ করা। নির্বাচনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষক প্রজা পার্টিসহ অন্যান্য মুসলিম রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের মুসলিম লীগে যোগদান। নির্বাচনের পূর্বে কৃষক প্রজা পার্টির সেক্রেটারি মৌঃ শামসুদ্দীন আহমেদ এবং সহ-সম্পাদক মৌঃ নূরুল ইসলাম চৌধুরী ও মৌঃ গিয়াসুদ্দীন আহমদ, পূর্ব বাংলার নবাবজাদা হাসান আলী, আবুল মনসুর আহমেদ ও আব্দুল্লাহেল বাকী, আসামের কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আলী হায়দার খান ও স্যার হিসামুদ্দীনসহ বিশিষ্ট মুসলিম জমিদার ও জোতদার নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগে যোগদান করেন।[৩৪৮] নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে মূলত ৩টি রাজনৈতিক দল দলীয়ভাবে নির্বাচনী ইশতেহার প্রদান করে যার মধ্যে জমিদার প্রভাবিত দল হয়েও মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে জমিদার স্বার্থ বিরোধী এমনসব প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ কৃষকরা আকৃষ্ট হয়। ১৯৪৬ সালের ১১ জানুয়ারি ময়মনসিংহের গফরগাঁয়ের সম্মেলনে লিয়াকত আলী খাঁ, স্যার নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আযাদ সোবহানী, আবুল হাশিম, মৌলবী তমিজুদ্দীন আহমদ খানসহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও কৃষকদের নিকট আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি তথা বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। মুসলিম লীগ ধর্মীয় জাতিত্বের শ্লোগানে যে রাষ্ট্রের দাবি করেছিল তাতে কৃষকের অর্থনৈতিক স্বার্থ নিরাপদ ছিল না। কিন্তু নির্বাচনে মুসলিম লীগের 'লাঙ্গল যার মাটি তার', 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই', 'কায়েমী স্বার্থের ধ্বংস চাই', 'জনগণের পাকিস্তান', 'কৃষক-শ্রমিকের পাকিস্তান' প্রভৃতি শ্লোগান-পোস্টার-প্ল্যাকার্ড কৃষক সমাজকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল।[৩৪৯] শীলা সেনের মতে লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি

---

[৩৪৬] *Census of India 1941, Bengal*, Vol. IV, (Simla : Government of India Press, 1942), pp. 2-3.

[৩৪৭] Rahim and Rahim, *Bengal Politics*, p. 120.

[৩৪৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, করিম, "*১৯৪৬ সালের নির্বাচন* ", পৃ. ১০৫।

[৩৪৯] বিস্তারিতভাবে দেখুন, আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ১৯২-১৯৩।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি কৃষকদেরকে ভালোভাবেই প্রভাবিত করেছিল।[৩৫০]

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্তির কথা বলা হলেও সামগ্রিকভাবে ইশতেহার ছিল দুর্বল বক্তব্য নির্ভর। উপরন্তু, এই পার্টি সীমিত পরিসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করেছিল এবং নির্বাচনী প্রচারণাতেও ফজলুল হকের বক্তব্য ছিল সংযত এবং তা অবশ্যই লীগের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে নয়। প্রকৃতপক্ষে হক ও তাঁর কৃষক প্রজা পার্টি পরোক্ষভাবে হলেও লীগ ও তার নির্বাচনী ইশতেহার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। অন্যদিকে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি। এছাড়াও কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়ন, একটি ফেডারেল সংবিধান তৈরি করে প্রতিটি প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান, প্রতিটি প্রদেশকে নিজেদের জীবন ও সংস্কৃতির উন্নয়নের ক্ষমতা প্রদান, প্রতিটি প্রদেশকে ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে পুনঃবিন্যস্ত করা, রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের দারিদ্র্যতা দূর করে উন্নততর জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা প্রদান, উৎপাদন ও বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে কৃষি ও শিল্পের আধুনিকায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি। নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে কংগ্রেস জনগণকে বুঝাতে চেয়েছিল যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও রাষ্ট্রের জনগণ উন্নততর জীবনযাপন ও প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে।[৩৫১]

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের প্রচার কৌশলের মধ্যে পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। নির্বাচন উপলক্ষে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে সকল পেশার মুসলমানদের (জমিদার, জোতদার, কৃষক, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- স্কুল ও মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, মসজিদের ইমাম, মুসলমান শিক্ষার্থীদের) ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে। নির্বাচনী প্রচারণায় লীগের নেতৃবৃন্দ ভোটাধিকার প্রাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের আস্থা অর্জনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পেলে জমিদারি ব্যবস্থার বিলুপ্তি, কৃষকের কৃষি উন্নয়নে ভর্তুকি ও ভালো বীজ প্রদান, খাদ্য সমস্যার সমাধান, পাটের মূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রচার কৌশলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা এবং কংগ্রেস যে সর্ব-ভারতীয়দের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে তা প্রমাণ করা। এক্ষেত্রে কৃষকদের আস্থা অর্জনে কংগ্রেসের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল না। এ কারণে লীগের প্রচারণা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষকদের মাঝে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায় যার প্রভাব পড়ে নির্বাচনের ফলাফলের ওপর।[৩৫২] বস্তুত, মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মুসলিম কৃষকদের ওপর তাদের প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভূমি সমস্যাকে পুরোপুরিই ব্যবহার করেন। প্রসঙ্গত, এই ভূমি সমস্যার ফলেই রাজনৈতিক পরিবেশ খুবই জটিল রূপ ধারণ করে এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে।[৩৫৩] বস্তুতপক্ষে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, ফেডারেল সংবিধান প্রণয়ন, স্বায়ত্তশাসন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, শিল্পের আধুনিকায়ন বা অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা-এসব বিষয়ে কৃষকদের যতটা না মনোযোগ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহ নিবিষ্ট ছিল ভূমিস্বত্বের ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ কৃষি

---

[৩৫০] Sen, *Muslim Politics in Bengal*, p. 197.

[৩৫১] বিস্তারিতভাবে দেখুন, করিম, "*১৯৪৬ সালের নির্বাচন*", পৃ. ১০৭-১০৮।

[৩৫২] বিস্তারিতভাবে দেখুন, করিম, "*১৯৪৬ সালের নির্বাচন*", পৃ. ১০৮-১১১।

[৩৫৩] চক্রবর্তী, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ৫৫৯।

সংশ্লিষ্ট সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রতি। এ কারণে কৃষকরা মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এবং নির্বাচনে লীগ বিজয়ী হয়।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১২টি এবং কংগ্রেস ৬২টি আসন লাভ করে। অবশ্য নির্বাচনের পর বঙ্গীয় আইনসভায় ২৫০টি আসন বিন্যাসে দেখা যায় যে মুসলিম লীগের আসন সংখ্যা ১১৫টি। এর কারণ ছিল নির্বাচনের পর ইমারত পার্টির ১ জন এবং স্বতন্ত্র ২ জন মোট ৩ জন মুসলিম সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করেন। অন্যদিকে নির্বাচনের পর বঙ্গীয় আইনসভায় ২৫০টি আসন বিন্যাসে দেখা যায় যে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ৮৬টি। এর কারণ ছিল নির্বাচনের পর তফসিলী সম্প্রদায়ের মোট ২৪ জন হিন্দু সদস্য কংগ্রেসে যোগদান করেন (সারণি ২২)।[৩৫৪] তারপরও বলা যায় যে কংগ্রেসের চেয়ে মুসলিম লীগ নির্বাচনে ভালো ফল লাভ করেছিল। মূলত নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকদের আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হওয়ায় কংগ্রেস নির্বাচনে ভালো ফল পায়নি। উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নকালে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলের প্রতিনিধিরা কৃষকদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। নির্বাচন পরবর্তীকালে ফজলুল হকের কোয়ালিশন সরকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিল উত্থাপন করলে কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা বিলের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং বিল পাশে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিলটি ৮০-৭২ ভোটে পরিষদে পাশ হয় এবং তা আইনে পরিণত হয়। উপরন্তু, ১৯৩৭ সালের ৭ অক্টোবর পূর্ব বাংলার জমিদারদের সংগঠন ল্যান্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করে ভারতের গভর্নর জেনারেল লিনলিথগোর নিকট প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিলের বিরোধিতা করা হয়।[৩৫৫] উল্লেখ্য, সর্বভারতীয় কংগ্রেস দল গঠনের শুরু থেকেই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন জমিদাররা। এছাড়াও জমিদার পরিবার থেকে উদ্ভূত পেশাজীবীরাও ছিলেন দলের নেতৃত্বে। শুধু তাই নয়, প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্বেও ছিলেন জমিদার ও জমিদার পরিবার থেকে উদ্ভূত পেশাজীবীরা। তবে এসব কারণে কংগ্রেস নির্বাচনে ভালো ফললাভে ব্যর্থ হলেও পূর্বের (১৯৩৭) নির্বাচনের তুলনায় কংগ্রেসের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। জয়া চ্যাটার্জীর মতে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের চেয়ে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের আসন ও ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩৫৬] কিন্তু কেন কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসন ও ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল সে সম্পর্কে চ্যাটার্জী কোনো ব্যাখ্যা দেননি। তাহলে প্রশ্ন উঠে যে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে আসন ও ভোটারের সংখ্যা কেন বৃদ্ধি পেয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেসের মূল নেতৃত্ব কৃষকদের বিরুদ্ধে অবস্থান করলেও কংগ্রেসের একটি প্রগতিশীল অংশ ভূমি ব্যবস্থার সমর্থক ছিল। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে জলপাইগুড়িতে শরৎ বোসের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে ভূমি রাজস্ব কমিশনের কাছে সঠিকভাবে বাংলার অত্যাচারিত ও নিঃস্ব কৃষকদের অভিযোগ এবং দাবিদাওয়া উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী অভিযান শুরু করার জন্য জেলা, মহাকুমা তথা স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করতে সকল প্রগতিশীল সংগঠনকে অনুরোধ করা হয়। কৃষকদের অবস্থার প্রতিকার এবং তাঁদের অভিযোগ দূর করার জন্য এই সম্মেলনে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারি প্রথার বিলোপের দাবি করা হয়। এছাড়াও বঙ্গীয় কংগ্রেসের মধ্যেও জমিদার ও জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল নেতা-কর্মীরও অভাব ছিল না। এমনকি, ১৯৩৭-৩৯

---

[৩৫৪] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, p. 214-215; Rahim and Rahim, *Bengal Politics : Documents of the Raj*, pp. 137-138 and 171; Jalal, *The Sole Spokesman*, p. 161; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২৪; করিম, *"১৯৪৬ সালের নির্বাচন"*, পৃ. ১১৩।

[৩৫৫] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Chatterji, *Bengal divided*, pp. 104-105; Chatterjee, *Bengal*, pp. 172-182.

[৩৫৬] Chatterji, *Bengal divided*, pp. 88-89.

সময়কালে বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারে কৃষকদের পক্ষে প্রচারে নেমেছিল।[৩৫৭] কংগ্রেসের এই প্রগতিশীল অংশ জমিদারি প্রথার বিলুপ্তির সমর্থক ছিলেন। উপরন্তু, নেহরু কমিটির রিপোর্টকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা ও ১৯৩৫ সালের আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের মুসলমানদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কারণে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ফল হিসেবে হিন্দুরা সংগঠিত হওয়ায় কংগ্রেস ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের তুলনায় ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কিছুটা ভালো ফল লাভ করেছিল। অর্থাৎ ১৯৩৭ সালের নির্বাচন পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয়েই ভোট রাজনীতির স্বার্থে জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি সমর্থন করেছিল। খান বাহাদুর মোহাম্মদ মাহমুদ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি সমর্থন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "For some time past it had been recognised in the Indian sub-continent that the zamindari system is an anachronism in the present times. Both the Congress and the Muslim League have made the abolition of zamindaries one of the main planks in their political platforms."[358] তবে কংগ্রেস মুসলিম লীগের ন্যায় দলীয়ভাবে জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি সমর্থন না করায় লীগের ন্যায় সন্তোষজনক ফললাভে ব্যর্থ হয়।

একই কারণে কৃষক প্রজা পার্টিও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ভালো ফললাভে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জোতদার প্রভাবিত কৃষক প্রজা পার্টি ৩৬টি আসন পেলেও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের মাত্র ৪টি আসন পায় (সারণি ২২)।[৩৫৯] সারণি ২২ থেকে দেখা যায় যে নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ১২১টি আসনের মধ্যে এই পার্টি মাত্র ৪৩টি আসনে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে দুর্বল বক্তব্য নির্ভর প্রচার-প্রচারণায় কৃষকরা আকৃষ্ট না হওয়ার কারণেই কৃষক প্রজা পার্টি নির্বাচনে ভালো করতে পারেনি। এছাড়াও কৃষক প্রজা পার্টির জোতদার নেতৃবৃন্দের অনেকেই মুসলিম লীগে যোগদান করার কারণেও পার্টি জনসমর্থন হারিয়ে দুর্বল হয়ে যায়। একদিকে নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির দুর্বল বক্তব্য নির্ভর প্রচার-প্রচারণা এবং অন্যদিকে মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ-এই দুই কারণে কৃষকরা লীগের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই) নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হওয়ায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু সরকারের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার কারণে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে দলটির প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে এবং কৃষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির গুরুত্ব আরোপ করায় কৃষকরাও দলটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। নির্বাচনে দলটির ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন প্রার্থী বিজয় অর্জন করেছিল।[৩৬০] বস্তুত, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে আসন কম-বেশি পাওয়া তথা নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে কৃষকরা নীতি নির্ধারণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। জয়া চ্যাটার্জীর মতে ক্রমাগত জমির খাজনা বৃদ্ধি ও কৃষক নির্যাতনের পর ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের সময় কৃষকরা তাদের রাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। চ্যাটার্জী মন্তব্য করেন, "An agitation organised by the local Krishak Samiti for the 'complete remission of arrear rents'. Muslim volunteers circulated printed notices which declared that until the peasants are masters of the country and its wealth, no relief

---

[৩৫৭] Bose, *Agrarian Bengal*, pp. 211-212; Chatterjee, *Bengal*, pp. 172-177; ঘোষ, *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি*, পৃ. ২১৩।

[৩৫৮] Mahmud, "*The Problem of Land Tenure*", p. 46.

[৩৫৯] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, p. 215; Rahim and Rahim, *Bengal Politics : Documents of the Raj*, pp. 137-138 and 171; Jalal, *Sole Spokesman*, p. 161; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২৪; করিম, *"১৯৪৬ সালের নির্বাচন"*, পৃ. ১১৩।

[৩৬০] রফিক, *তেভাগা আন্দোলন*, পৃ. ১৯৬; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৫৫।

will be obtained.”[361] তবে নির্বাচনে বিজয়ী হলেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে চ্যাটার্জীর উল্লেখিত ‘কৃষক রাজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করলেও দেশ বিভাগের ঘটনাসহ নানা কারণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ সম্ভব হয়নি। উপরন্তু, ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্নাহ কর্তৃক লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের স্বপ্ন পূরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।[৩৬২] তাজ উল-ইসলাম হাশমী এর সমর্থনে বলেন যে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দিকে এসে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় কৃষকরা যে স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিল তা পূরণ হয়নি।[৩৬৩] সুতরাং সার্বিকভাবে নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করে এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ভূমি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তথা ভূমি বিরোধই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করেছিল।

৩.৫. উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে (১৮৮৫-১৯৪৭) ভূমির অংশীজন তথা ভূমি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের পরিবর্তন ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষের আনুকূল্য ও সমর্থন থাকায় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রত্যক্ষ ভোটের রাজনীতির পূর্ব পর্যন্ত জমিদার শ্রেণির ক্ষমতা ছিল অপ্রতিরোধ্য। এমনকি, প্রত্যক্ষ ভোটের রাজনীতির সূচনা হলেও বিশ শতকের ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জমিদার শ্রেণির প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন থাকে। এ কারণে ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নের পরও দেখা যায় যে ভূমি বিরোধ হ্রাস পায়নি। ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, সাম্প্রদায় ভিত্তিক রোয়েদাদ ও ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই আইনের অধীনে ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষকরা। এ কারণে উভয় নির্বাচনের নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষক ও ভূমি সম্পর্কিত বিষয়াদি গুরুত্বসহকারে উপস্থাপিত হয়। নির্বাচনী ইশতেহারে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিও প্রদান করা হয়েছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদসহ কৃষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। নির্বাচনে কৃষকরাও কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর ফলস্বরূপ হকের নতুন প্রতিষ্ঠিত দলটি নির্বাচনে ভালো ফল লাভ করে এবং নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। হকের সরকার নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের মাধ্যমে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও হকের সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ভূমি রাজস্ব কমিশনও গঠন করে। একইভাবে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনেও মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে তারা বিজয়ী হলে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি তথা পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জমিদারি প্রথা উচ্ছেদসহ ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। নির্বাচনে কৃষকরা মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এর ফলে দলটি নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। তবে নির্বাচনের পর মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলেও প্রধানত

---

[৩৬১] Chatterji, *Bengal divided*, p. 92.
[৩৬২] বিস্তারিতভাবে দেখুন, করিম, “*১৯৪৬ সালের নির্বাচন*”, পৃ. ১১৩-১২১।
[৩৬৩] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Hashmi, *Peasant Utopia*, p. 256.

দেশভাগের রাজনৈতিক জটিলতার কারণে ভূমি রাজস্ব কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কৃষকদের ভোটাধিকার লাভের কারণে জমিদার, জোতদার, কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আসে। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের ভোটাধিকার লাভ এবং ভূমি বিরোধের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে মুসলিম জমিদার, জোতদার ও কৃষকদের মধ্যে জোট গঠন এবং অন্যদিকে হিন্দু জমিদার, জোতদার ও কৃষকদের মধ্যে জোট গঠনের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রাতিষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। ভূমি বিরোধের রাজনীতিতেও এর প্রভাব পড়েছিল। প্রধানত ভূমি বিরোধের রাজনীতির কারণেই ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর দেশভাগ আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। নির্বাচনের পর মুসলিম লীগের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের সময়কালে নির্বাচনী প্রতিশ্রুত দেশভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং একইসঙ্গে বাংলাভাগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং ১৯৪৭ সালে দেশভাগের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং বাংলাভাগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং বাংলা ভাগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকদের ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্ব বাংলায় ভূমি নীতি ও কৌশলে পরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১)

৪.১ ভূমিকা

এই অধ্যায়ে পূর্ব বাংলায় ভূমি নীতি ও কৌশলে পরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ ও বাংলাভাগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমি নীতি ও কৌশলে পরিবর্তন হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারের ভূমি সংক্রান্ত আইন প্রণয়নকালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপিত বিলের ওপর আলোচনাকালে সৃষ্ট ভূমি বিতর্কের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার ভূমি বিরোধের যে চিত্র ফুটে উঠেছিল সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে আরও দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে পাকিস্তান আমলে ভূমিস্বত্বের কী পরিবর্তন হয়েছিল এবং এই পরিবর্তনের ফলস্বরূপ ভূমি বিরোধ কীভাবে ধীরে ধীরে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথকে প্রশস্ত করেছিল।

৪.২ ১৯৪৮ সালের ভূমি হস্তান্তর অর্ডিন্যান্স

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বছর পর ১৯৪৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর ভূমি হস্তান্তর সংক্রান্ত একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছিল।[১] এই অর্ডিন্যান্স জারির মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিল পাশ হয়ে তা আইনে পরিণত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যেন জমিদাররা অসৎ উদ্দেশ্যে ভূমি হস্তান্তর করতে না পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে প্রাদেশিক আইন পরিষদে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিল গৃহীত না হওয়ায় তার সুযোগ গ্রহণ করে জমিদাররা তাদের ইচ্ছেমতো ভূমি হস্তান্তর করে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করেছিল। এর ফলে ভূমি বিরোধ হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৪.৩ ১৯৪৯ সালের পূর্ব বাংলা অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব আইন

১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলা অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব আইন (The East Bengal Non-Agricultural Tenancy Act, 1949) প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদাররা যেন লাভবান হওয়ার জন্য ইচ্ছেমতো ভূমি হস্তান্তর করতে না পারে। বিশেষ করে যদি কোনো প্রজা ক্রমাগত ১২ বছর একটা জায়গা দখল করে থাকে তাহলে তাকে যেন জমিদার উচ্ছেদ করতে না পারে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের ২ এপ্রিল পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে "পূর্ব বাংলা অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব বিল, ১৯৪৯" নামে একটি বিল উত্থাপন করে তৎকালীন ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী তোফাজ্জল আলী বলেন, "The tenants of non-agricultural lands have thus been put in a very precarious position and their conditions can be better be imagined. There was a strong demand for giving better security of tenure to the non-agricultural tenants."[2] আইন পরিষদে বিলটি উত্থাপনের পর জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলীয় কতিপয় সদস্য বিলের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে কংগ্রেস দলের সদস্য পুর্ণেন্দু কিশোর সেন গুপ্ত বিলটি আরও অধিক যাচাই-বাছাইয়ের জন্য একটি সিলেক্ট কমিটি

---

১ *Assembly Proceedings*, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. VI, No. 1, Sixth Session, 1951, 17th, 19th, 20th, 22nd, 23rd, 24th, 25th and 26th October, 1951 (Dacca : East Bengal Government Press, 1953), p. 122.

২ *Assembly Proceedings*, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. III, No. 4, Third session, 1949, The 2nd, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 11th April, 1949 (Dacca : East Bengal Government Press, 1952), pp. 14-15.

গঠনের প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাবিত নয় সদস্যবিশিষ্ট সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি প্রেরণ এবং এই কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বিলটি পাশ করতে সুপারিশ করেন।[৩] লক্ষণীয়, তাঁর প্রস্তাবিত নয় সদস্যবিশিষ্ট সিলেক্ট কমিটিতে তৎকালীন ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী ব্যতীত আটজন সদস্যই ছিলেন কংগ্রেস দলীয় জমিদার সমর্থক সদস্য। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই ধরনের প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা। একই উদ্দেশ্যে অপর কংগ্রেস দলের সদস্য জোতিন্দ্র নাথ ভদ্র বিলটি পাশ করে দ্রুত কার্যকর করলে জনসাধারণের ক্ষতি হবে বলে অভিমত দেন।[৪] এছাড়াও উক্ত দলের সদস্য সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস উল্লেখ করেন যে অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব বিলে বলা হয়েছে যদি কোনো প্রজা ১২ বছর একটা জায়গা ভোগ-দখল করে থাকে তাহলে তাকে কোনো জমিদার উচ্ছেদ করতে পারবে না। তাঁর প্রশ্ন ছিল এই ১২ বছরের সূচনা কখন হতে গণনা করা হবে সে সম্পর্কে বিলে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত ছিল; তা না হলে দেশের কৃষক তথা জনসাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হবে।[৫] এভাবে প্রাদেশিক পরিষদে বিলের ওপর দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৪৯ সালের ২ এপ্রিল বিলটি গৃহীত হয় এবং তা আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে ১৯৪৯ সালের পূর্ব বাংলা অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব আইনে পরিণত হয়।[৬] এই আইন প্রণয়নের ফলে দখলিস্বত্ববান কৃষকরা পূর্বের তুলনায় কিছু অধিক সুবিধা পেয়েছিল। এ সম্পর্কে এ. বি. এম. মোঃ আজিজুল ইসলাম মন্তব্য করেন, "The Act of 1949 also removed some minor restrictions that existed until then on the rights of occupancy raiyats regarding use of their holdings".[৭] তবে পরিষদের কংগ্রেস দলীয় প্রতিনিধিগণ কৃষক তথা জনসাধারণের স্বার্থের উল্লেখপূর্বক বক্তব্য প্রদান করলেও তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিলটি পাশে বিলম্বকরণ এবং জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা। এখানে ভূমি বিরোধের রাজনীতির উপস্থিতি স্পষ্টত প্রকট ছিল।

৪.৪ ১৯৪৯ সালের ভূমি রাজস্ব, খাজনা ও সেস আইন

১৯৪৯ সালে প্রণীত ভূমি রাজস্ব, খাজনা ও সেস (অংশ ভাগ) আইনের [Land Revenue, Rent and Cess (Apportionment) Act, 1949] মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারের রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের ৫ এপ্রিল পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে "ভূমি রাজস্ব, খাজনা ও সেস (অংশ ভাগ) বিল, ১৯৪৯" নামে একটি বিল উত্থাপিত হয়। সরকারের রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক থাকায় জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলের সদস্যরা এই বিলের বিরোধিতা করে যতদূর সম্ভব বিল পাশে বিলম্বকরণ এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। এই বিলের ওপর প্রলম্বিত একটি আলোচনার দাবি করে কংগ্রেস দলীয় সদস্য জোতিন্দ্র নাথ ভদ্র ধীরে সুস্থে বিলটি পাশ করতে সরকারকে অনুরোধ করেন। তিনি বিলে কোর্টের সীমা নির্ধারিত হয়নি বলে অভিযোগ করে বলেন যে বিলটি আইনে পরিণত হলে রাজস্ব আদায় করতে সরকারের অসুবিধা হবে। তিনি র‍্যাডক্লিফ এ্যাওয়ার্ডের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিলটি স্থগিত রাখতে সরকারকে অনুরোধ করেন।[৮] এমনকি, কংগ্রেস দলীয় সদস্য সুরেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তাদের ভূমি রাজস্ব, খাজনা ও সেস নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেওয়ার বিরোধিতা করে বলেন যে এর ফলে

---

[৩] প্রস্তাবিত ৯ সদস্য বিশিষ্ট সিলেক্ট কমিটির সদস্য : (1) The Hon'ble Minister-in-charge of the Finance and Revenue Department, (2) Mr. Dhirendra Nath Datta, (3) Mr. Gobindalal Banerjee, (4) Mr. Monoranjan Dhar, (5) Mr. Suresh Chandra Das Gupta, (6) Mr. Rajani Kanta Roy Burman, (7) Mr. Ganendra Chandra Bhattacharjee, (8) Mr. Munindra Nath Bhattacharjee and (9) Mr. Purnendu Kishore Sen Gupta (the mover). Seen, *Assembly Proceedings*, Vol. III, No. 4, 1949, pp. 17-20.

[৪] *Assembly Proceedings*, Vol. III, No. 4, 1949, pp. 21-22.

[৫] *Assembly Proceedings*, Vol. III, No. 4, 1949, pp. 22-23.

[৬] *Assembly Proceedings*, Vol. III, No. 4, 1949, p. 32.

[৭] Islam, "*Land Reform in Bangladesh-A Skeptical View*", p. 126.

[৮] *Assembly Proceedings*, Vol. III, No. 4, 1949, pp. 14-15, p. 73.

জমিদারদের প্রতি অন্যায় করা হবে।[৯] বস্তুত, এই বিলটি গৃহীত হয়ে আইনে পরিণত হলে সরকারকে জমিদারদের বেশি পরিমাণে ভূমি রাজস্ব, খাজনা ও সেস দিতে হতো। এ কারণে বিলটি গ্রহণে সরকারকে বিরত রাখাই ছিল কংগ্রেস দলীয় সদস্যদের বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ১৯৪৯ সালের ৫ এপ্রিল পরিষদে বিলটি গৃহীত হয়ে ১৯৪৯ সালের ভূমি রাজস্ব, খাজনা ও সেস (অংশ ভাগ) আইনে পরিণত হয়।[১০] নিঃসন্দেহে এই বিল আইনে পরিণত হওয়ায় সরকারের রাজস্ব আদায়ে সুবিধা হয়েছিল। কিন্তু সরকার লাভবান হলেও আইনটি ভূমি বিরোধ হ্রাসে ব্যর্থ হয়েছিল।

৪.৫ ১৯৪৯ সালের পূর্ব বাংলা পতিত ভূমি অধিগ্রহণ আইন

১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলা পতিত ভূমি অধিগ্রহণ আইন (The East Bengal Acquisition of Waste Land Act, 1949) প্রণীত হয়। এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পতিত ভূমি অধিগ্রহণ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পরিষদে "পূর্ব বাংলা পতিত ভূমি অধিগ্রহণ বিল, ১৯৪৯" নামে একটি বিল উত্থাপন করে তৎকালীন ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী বলেন যে পতিত ভূমি অধিগ্রহণ করলে এই প্রদেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে খাদ্য সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হবে।[১১] সরকারের পক্ষ থেকে পরিষদের সদস্যদের জানানো হয় যে সার্বিকভাবে দেশের উন্নতির জন্যই বিলটি আনা হয়েছে। কিন্তু সরকার পতিত ভূমি অধিগ্রহণ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উন্নতির কথা বললেও কৃষকের স্বার্থহানির সম্ভবনাও ছিল। কারণ পতিত জমি না থাকলে কৃষকের চাষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় গবাদি পশুর খাদ্য সংকট সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনাও ছিল। অর্থাৎ দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে যেমন পতিত জমি চাষের অধীন আনা প্রয়োজন ছিল তেমনি কৃষক ও কৃষির স্বার্থে পতিত জমিরও প্রয়োজন ছিল। এ কারণে আইন পরিষদে বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুসলিম লীগ তথা সরকার দলীয় সদস্য মীর আহমেদ আলী বিলের বিরোধিতা বলেন যে সরকারের পতিত ভূমি অধিগ্রহণ নীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করলেও এই আইনের ফলে কৃষকদেরও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কৃষকরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য তিনি বলেন যে পতিত জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর বক্তব্য যৌক্তিক, কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে সমস্ত পতিত জমি অধিগ্রহণ করলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে যা সরকার অনুধাবন করতে পারে নি। তাঁর মতে কৃষিজ উৎপাদনে গবাদি পশু অন্যতম উপকরণ। তিনি বলেন যে সরকারের বক্তব্য যথার্থ যে বর্ধিত কৃষি খামারের জন্যে পতিত জমি দরকার। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে খামার এবং শিল্প না থাকার দরুন দেশের ক্ষতি হচ্ছে। তাঁর মতে কিন্তু এটাও ঠিক যে পতিত জমি ব্যতীত গবাদি পশু রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই তিনি অনুরোধ করেন যে সরকারের পতিত জমি যে পরিমাণ দরকার সেই পরিমাণই অধিগ্রহণ করবেন এবং কৃষকের পশু খেয়ে বাঁচতে পারে সেই পরিমাণ সংরক্ষণ করবেন। তাঁর মতে আইন প্রণয়ন করা হয় দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্যে। তিনি বলেন যে এমন করে আইন করতে হবে যেন কৃষক তথা জনসাধারণের কষ্ট না হয় এবং দেশের স্বার্থও রক্ষা করা যায়।[১২] এভাবে দীর্ঘ আলোচনা শেষে ১৯৫০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বিলটি গৃহীত হয় এবং আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তা ১৯৪৯ সালের পূর্ব বাংলা পতিত ভূমি অধিগ্রহণ আইনে

---

[৯] *Assembly Proceedings*, Vol. III, No. 4, 1949, p. 75-76.

[১০] *Assembly Proceedings*, Vol. III, No. 4, 1949, p. 80.

[১১] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. IV, No. 6, Fourth Session, 1949-50, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 13th, 14th, 15th, and 16th February, 1950 (Dacca : East Bengal Government Press, 1952), p. 87.

[১২] *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 6, 1950, p. 88.

পরিণত হয়।[১৩] প্রাদেশিক পরিষদে সরকার দলীয় সদস্যের আলোচনা থেকে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় উত্থাপিত যুক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে পাকিস্তান আমলে ভূমি সম্পর্কিত বিষয়াদি রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

৪.৬ ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন

ভূমি সংস্কারের ইতিহাসে ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (The East Bengal State Acquisition and Tenancy Act, 1950) ছিল কৃষক সমাজ তথা জনসাধারণের জন্য ঐতিহাসিক, বৈপ্লবিক এবং যুগান্তকারী আইন। এই আইনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বিলুপ্ত বা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়ে আইনগতভাবে হলেও ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বিশেষত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় কৃষকরা ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার হারিয়ে জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজায় পরিণত হয়েছিল। সেই অধিকারহীন এবং ইচ্ছাধীন কৃষকরা এই আইনের মাধ্যমে ভূমিস্বত্বের ওপর নিজেদের মালিকানাস্বত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

বস্তুতপক্ষে, ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের সূচনা হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদে ১৯৩৮ সালের ভূমি রাজস্ব কমিশন বা ফ্লাউড কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি সরকার গঠন করার পর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার বিলুপ্তি বা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে প্রকৃত কৃষকদের হাতে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভূমি রাজস্ব কমিশন গঠন করা হয়েছিল। ১৯৪০ সালে ভূমি রাজস্ব কমিশন সরকারের নিকট তার রিপোর্ট পেশ করলেও জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ সরকার তা বাস্তবায়নের জন্য কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।[১৪] মুসলিম লীগ সরকার ভূমি রাজস্ব কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ না করায় ১৯৪৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদে ফজলুল হক ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং কমিশনের উক্ত সুপারিশের ওপর তিনি কতিপয় পরামর্শও প্রদান করেন।[১৫] তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকার প্রধানত দেশভাগের রাজনৈতিক জটিলতার কারণ দেখিয়ে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। উল্লেখ্য, কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন না করায় প্রাদেশিক আইন পরিষদে জোতদার সমর্থক প্রতিনিধিগণ এটি কার্যকর করার জন্য সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ১৯৪৫ সালের ১২ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য শাহ সৈয়দ গোলাম সরওয়ার হোসাইনী বলেন যে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ বাংলায় সর্বসম্মত অভিমত। বাংলার প্রজাদের সকলেই জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চায়। জমিদারি প্রথা বহাল রাখার পক্ষে সরকারের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়েছিল তখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে জমিদারদের যে চুক্তি হয়েছিল সে চুক্তি বর্তমানে জমিদাররা ভঙ্গ করেছেন। চুক্তি অনুসারে বাংলার কৃষক-প্রজাদের শিক্ষা, পানি, রাস্তা নির্মাণ, চিকিৎসা প্রভৃতি জনস্বার্থ সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব ছিল জমিদারদের ওপর। কিন্তু এখন জনসাধারণ নিজেরাই উক্ত সেবার জন্য সরকারকে বিভিন্ন ধরনের কর প্রদান করে। এ কারণে জমিদারি প্রথা বহাল রাখার পক্ষে সরকার কোনো যুক্তি দেখাতে পারবে না। এছাড়াও ভূমি রাজস্ব কমিশনও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করেছে। এমনকি এই পরিষদের সদস্যরাও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবি উপস্থাপন করছেন। তিনি জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে আরও যুক্তি দেন যে

[১৩] *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 6, 1950, p. 32.

[১৪] *Report of the Land Revenue Commission, Bengal*, Vol. I, p. 2; মুখোপাধ্যায়, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, ঊনবিংশ শতাব্দী, পৃ. ২৭।

[১৫] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Huq, *Bengal Today*, pp. 129-134.

জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হলে জমিদাররা তাদের প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ বিনিয়োগ করার ফলে দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে; শিল্পের প্রসার ঘটবে।[১৬] অর্থাৎ তিনি তাঁর বক্তব্যে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছিলেন। একই উদ্দেশ্যে পরিষদের সদস্য মৌলভী আবদুল ওয়াহেদ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে ফজলুল হকের সরকার জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য ফরিদপুর জেলায় কাজ শুরু করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন অথচ মুসলিম লীগের সরকার জমিদারদের স্বার্থে আইন পাশে অগ্রসর না হয়ে বরং স্থগিত করে রেখেছে।[১৭] জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ সরকার জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে যে আগ্রহী ছিল না তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। এভাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের ভিতরে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে সরকারের ওপর ক্রমাগতভাবে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে জমিদার সমর্থক সদস্যদের (জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মনোনীত এবং নির্বাচিত) সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও নির্বাচনে জোতদার এবং সচ্ছল কৃষক শ্রেণির প্রতিনিধিরাও (কৃষক প্রজা পার্টি ও সিডিউল কাস্ট মনোনীত ও নির্বাচিত) বিজয়ী হয়েছিল। এমনকি, পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি অংশ (যেমন তমিজউদ্দীন খানসহ) কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তারা ছিলেন গ্রাম বাংলার কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল। প্রধানত এঁদের নেতৃত্বেই বিশ শতকের বিশ হতে চল্লিশের দশকের কৃষক-প্রজা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল।[১৮] এমনকি জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে দলীয়ভাবে নেতৃত্ব দিলেও প্রকৃতপক্ষে আইন পরিষদে জোতদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উপরন্তু, মুসলিম জমিদার, জোতদার, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বা বিত্তবান কৃষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারাই ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই নির্বাচিত হওয়া না হওয়া দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের ভোটের ওপর নির্ভরশীল ছিল। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার আশায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ কৃষকদের নিকট জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রতিশ্রুতি ছিল যে তারা বিজয়ী হলে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করবে।[১৯] শুধু তাই নয়, কৃষকদের নিকট দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের ওপর নির্ভরশীল ছিল পরবর্তী নির্বাচনে এসব নেতৃবৃন্দের নির্বাচনী ভাগ্য। সুতরাং ভোটের রাজনীতি সম্পৃক্ত থাকায় কৃষক সমাজের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। স্বাভাবিকভাবেই কৃষকদের নিকট দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে আইন পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে সরকারের ওপর ভীষণভাবে চাপ সৃষ্টি করেছিল। এ কারণে ১৯৪৭ সালের ১০ এপ্রিল সরকার অবিভক্ত বাংলার বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদে "বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব বিল, ১৯৪৭" নামে একটি বিল উত্থাপন করে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষের ক্ষমতা হস্তান্তর এবং দেশভাগের জটিল পরিকল্পনায় ব্যস্ততার কারণে পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব না হওয়ায় পরিষদে উত্থাপিত বিলটি বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের ভিতরে এবং বাইরে সমান্তরালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ কার্যকর করার জন্য সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। উল্লেখ্য, দেশভাগের পরও কৃষক আন্দোলন বিশেষ করে তেভাগা আন্দোলন অব্যাহত ছিল।[২০] অন্যদিকে নির্বাচিত সদস্যসহ

[১৬] *Assembly Proceedings*, Official Report, Bengal Legislative Assembly, Vol. LXIX, No. 2, Twenty Session, 1945, The 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 27th, 28th and 29th March, 1945 (Alipore : Bengal Goverment Press, 1945), pp. 44-45.

[১৭] *Assembly Proceedings*, Vol. LXIX, No. 2, 1945, p. 45.

[১৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Razzaque, *Bengali Muslims*, pp. 18-43.

[১৯] বিস্তারিতভাবে দেখুন, আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ১৯২-১৯৪।

[২০] বিস্তারিতভাবে দেখুন, কামাল ও চক্রবর্তী, *নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ*, পৃ. ১১৬-১২১।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে সরকারের ওপর অব্যাহতভাবে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ আইন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে জোতদার নেতৃবৃন্দ তাদের ভবিষ্যত রাজনৈতিক বিবেচনায় ভূমি রাজস্ব কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ কার্যকর করতে পরিষদের ভিতরে এবং বাইরে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। মুসলিম লীগ সরকারের ওপর অব্যাহত চাপ ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১৯৪৮ সালে ৭ এপ্রিল পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে 'পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব বিল, ১৯৪৮' নামে একটি বিল উত্থাপিত হয়। বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। সিলেক্ট কমিটির ৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ২০ জন ছিলেন জমিদার সদস্য।[২১] প্রধানত মুসলিম লীগের জমিদার তোষণ নীতির কারণে বিলটির কোনো অগ্রগতি হয়নি। অতঃপর তেভাগা আন্দোলন তথা কৃষক আন্দোলন, বিগত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও পরবর্তী নির্বাচন এবং সার্বিক রাজনৈতিক বিবেচনায় মুসলিম লীগ সরকার ১৯৪৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর 'পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব বিল, ১৯৪৯' নামে একটি বিল পুনরায় পরিষদে উত্থাপন করে।[২২]

পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব বিল প্রাদেশিক আইন পরিষদে উত্থাপনের পর পরিষদের প্রতিনিধিগণ বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন। এর ফলে সৃষ্ট ভূমি বিতর্কের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছিল। উক্ত বিলটি পরিষদে উত্থাপনের পর একদিকে পরিষদের জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস সদস্যরা জমিদারি প্রথা রক্ষা এবং শেষপর্যন্ত তাঁরা ব্যর্থ হলে জমিদারদের বাড়তি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে মুসলিম জোতদার নেতৃবৃন্দ বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন পাশে সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। তবে সরকার দলীয় সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ জামিদারি প্রথা উচ্ছেদে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে সরকার দলীয় সদস্য মীর আহমদ আলী অভিমত দেন যে ক্ষতিপূরণ ব্যতীত জমিদার বা জোতদারদের জমি অধিগ্রহণ অনুচিত। তবে তিনি সামান্য পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি অধিগ্রহণপূর্বক ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের মাধ্যমে অধিক শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে সরকারকে পরামর্শ দেন।[২৩] অর্থাৎ প্রথমত, তিনি জমিদারি প্রথা উচ্ছেদকে সমর্থন করেন এবং দ্বিতীয়ত, যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করে জমিদারদের জমিদারি অধিগ্রহণ করে ভূমিহীনদের মধ্যে উক্ত জমি বণ্টনের জন্য সুপারিশ করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস দলীয় সদস্য মুনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য বলেন যে সরকারের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জমিদারি অধিগ্রহণ সম্ভব হবে না, তাতে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হবে। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের নীতি তৈরি করাও সম্ভবপর হবে না। বিশেষ করে কৃষি আয়কর ও অন্যান্য আয়কর সমস্ত আয়ের ওপর ধরা হয়ে থাকে। বিভিন্ন জেলায়ও একজন জমিদারের জমিদারি থাকতে পারে। জমিদারের এক জেলায় আয়ের ওপর কৃষি আয়কর এবং অন্যান্য আয়কর নির্ধারণ করা অন্যায় হবে। এ কারণে তিনি বলেন যে প্রথমে ধীরে সুস্থে জমিদারি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণের নিয়মাবলি ও পদ্ধতির পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে তারপর এই আইন পাশের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।[২৪] অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যে বিল পাশে

---

[২১] K. G. M. Latiful Bari (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Jessore*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dacca : Bangladesh Government Press, 1979), pp. 251-252; Latif, *Bangladesh District Gazetteers : Patuakhali*, p. 252; মাহবুব তালুকদার (সাধারণ সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর যশোর-প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক ইতিহাস*, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯৮), পৃ. ২৪৯; সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, পৃ. ৪৩-৪৪, ১১৬।

[২২] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. IV, No. 5, Fourth Session, 1949-50, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th and 19th December, 1949 (Dacca : East Bengal Government Press, 1952), p. 47.

[২৩] *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 5, 1949, pp. 60-61.

[২৪] *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 5, 1949, p. 47.

বিলম্বকরণ এবং বিলের মধ্যে সরকারের পরিকল্পনার অভাবের চিত্র ফুটে উঠেছিল। একই দলের সদস্য রাজেন্দ্র নাথ সরকারের বক্তব্য ছিল যে জমিদার ব্যতীত অন্যান্যদেরও অতিরিক্ত জমি রয়েছে।[২৫] একই কথা বলেন কংগ্রেসের সদস্য বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তীও। তিনিও বলেন যে খাজনা-ভোগী মাত্রই জমিদার নয়। তাঁর অভিযোগ ছিল বিলের ২০ নং ধারায় খাজনা-ভোগী বলতে প্রত্যেককেই এক একজন জমিদার বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করেন যে এই বিলের মাধ্যমে প্রণীত আইন কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগে স্বল্প আয় বিশিষ্ট খাজনা-ভোগীগণের সমাজে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাঁর মতে জমিদারের নিয়ন্ত্রণে থাকা জমি তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বেশি জমির অধিকারী জমিদারের সংখ্যা অতি নগন্য। তাদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ করেন।[২৬] অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যের মূল কথা ছিল প্রথমত, খাজনা-ভোগী সকলেই জমিদার নয়, এবং দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি করতে হবে। একইভাবে কংগ্রেস দলীয় সদস্য সুরেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত জমিদারদের অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির জন্য সরকারে নিকট সুপারিশ অনুরোধ করেন।[২৭] একই সুপারিশ করেন অপর কংগ্রেস সদস্য জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি খাজনা-ভোগী জমিদারদের সুখ-সুবিধা জন্য সরকারকে ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির অনুরোধ করেন।[২৮] একই বিষয়ে কংগ্রেস দলীয় সদস্য মনোরঞ্জন ধর সরকারের সমালোচনা করে বলেন যে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে বিহারের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের [Clause 19 (1) (a) of the Bihar Abolition of Zamindary Bill, 1947] অনুসরণ করার কথা বলা হলেও সর্বক্ষেত্রে তা করা হয়নি। বিহারের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনে দেখা যায় যে সেখানে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১২টি ধাপ, অথচ পূর্ব বাংলা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনে নির্ধারণ করা হয়েছে ৮টি ধাপ। আবার বিহারে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ গুণ, কিন্তু পূর্ব বাংলায় নির্ধারিত হয়েছে মাত্র ৫ গুণ। এছাড়াও বিহারে জমি এবং ঘরববাড়ির জন্য একই ধরনের সাধারণ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু পূর্ব বাংলায় জমির মূল্য এক রকম, আবার অফিস বা কাছারি বা ঘরবাড়ির জন্য আলাদা মূল্যে ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয়েছে।[২৯] অর্থাৎ এই কংগ্রেস দলীয় সদস্যদের মূল বক্তব্য ছিল ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি করা। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব বিলের ওপর দীর্ঘ ভূমি বিতর্ক হতে কৌতুহলোদ্দীপ্ত প্রবনতা এবং দলাদলির চিত্র পাওয়া যায়। প্রথমত, কংগ্রেসের সদস্যরা জমিদারি রক্ষার প্রশ্নে বিশেষত ক্ষতিপূরণ প্রশ্নে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। তাঁরা সম্ভাব্য সকল প্রকার যুক্তি উত্থাপন করে-যেমন ব্যক্তিগত মালিকানার পবিত্রতা, জমিদারগণ কর্তৃক দেশের প্রভূত সেবা করার ইতিহাস, জমিদারি বিলোপ হলে কমিউস্টিপন্থীরা দেশের ক্ষমতা দখল করে নিবে, জমিদারদের ক্ষতিপূরণ না দিলে কোনো বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ হবে না ইত্যাদি। কংগ্রেস সদস্যদের এধরনের বক্তব্য যে জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ সদস্যদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি তা কিন্তু নয়। তৎকালীন ভূমি সংস্কার ও ভূমি প্রশাসন মন্ত্রী প্রকাশ্যে আইনসভায় মন্তব্য করেন যে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জমি দখল করা ইসলাম বিরোধী কাজ। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার জমিদারদের অধিকাংশ যেখানে ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী, সেখানে মুসলিম লীগ সরকারের মন্ত্রী ইসলাম ধর্ম থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যৌক্তিকতা দেখিয়ে অকাট্য যুক্তি হাজির করেছিলেন। অন্যদিকে মুসলিম লীগ সদস্যরা বিলের বর্গাদার কৃষকদের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়াদি বাদ দিয়ে জমিদারি ও জোতদারি স্বার্থ রক্ষায় সক্রিয় ছিলেন। দ্বিতীয়ত, বিলের বিরোধীতাকারী কংগ্রেসের সদস্যরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন যতদূর সম্ভব বিল পাশ বিলম্ব করা। এক্ষত্রে তারা লীগের জমিদার তোষণ নীতির সুযোগকে ব্যবহার করেছিলেন। এ কারণে তারা সফলও হয়েছিলেন। কেননা এই বিল পাশ

---

[২৫] *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 5, 1949, pp. 61-62.
[২৬] *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 5, 1949, pp. 70-72.
[২৭] *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 5, 1949, p. 72.
[২৮] *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 5, 1949, p. 75.
[২৯] *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 5, 1949, pp. 77-78.

করতে প্রায় দু'বছরের বেশি সময় লেগেছিল। তৃতীয়ত, কংগ্রেস সদস্যরা জমিদারদের সর্বাধিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকারের ওপর সর্বোচ্চ চাপ সৃষ্টি করতেও চেষ্টার ত্রুটি করেননি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে কংগ্রেস দলীয় সদস্যদের বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা। নিঃসন্দেহে জমিদার প্রভাবিত লীগের সদস্যদের ওপর এর প্রভাব পড়েছিল। কারণ লীগের জমিদার সদস্যরা সরকারি সিদ্ধান্তকে স্পষ্টভাবে অগ্রাহ্য করে জমিদারি প্রথা বহাল রাখার পক্ষে এবং শেষপর্যন্ত জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কংগ্রেসের হিন্দু জমিদার সদস্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে যুক্তি উপস্থাপন করতে থাকেন। কামাল সিদ্দিকীর মতে এই আঁতাত ছিল এমন এক সময়, যখন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং তার ফলে লীগ-কংগ্রেস বৈরিতা তুঙ্গে বিরাজ করছিল। তাঁর মতে লীগের সামান্য সংখ্যক সদস্য (জনগণপন্থী) ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং বিল থেকে বর্গাদারদের স্বার্থের অনুকূল অংশ বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন।[৩০] যাহোক, দীর্ঘ আলোচনা ও কংগ্রেস দলীয় সদস্যদের বিরোধীতা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিলটি গৃহীত হয়ে আইনে পরিণত হয়।[৩১] একদিকে সরকার ভূমির ওপর কৃষক তথা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন এবং অন্যদিকে কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা জমিদারদের জীবন-জীবিকার উন্নত অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির দাবি ও জমিদারি প্রথা বহাল রাখার পক্ষে নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছিলেন। একইসঙ্গে আইনটির কার্যকারিতা প্রলম্বিত করতেও তারা চেষ্টা করেছিলেন। তাদের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার ভূমি বিরোধের পরিষ্কার একটি চিত্র ফুটে উঠেছিল।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিলটি ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল হতে ১৯৫০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘ ভূমি বির্তকের পর ১৯৫০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি গৃহীত হয়।[৩২] এরপর আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে ১৯৫১ সালের ১৮ মে তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুসলিম লীগের প্রভাবশালী জমিদার নেতা স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের অনুমতি পাওয়ার পর বিলটি পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনে পরিণত হয়। ১৯৫১ সালের ১৮ মে থেকে আইনটি কার্যকর হয়।[৩৩] এটিই ১৯৫০ সালের ঐতিহাসিক পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন। উল্লেখ্য, পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে ১৯৫০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বিলটি গৃহীত হলেও ১৯৫১ সালের ১৮ মে তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের অনুমতি সাপেক্ষে বিলটি আইনে পরিণত হয়েছিল, তাই এই আইনটি ১৯৫১ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন হিসেবেও পরিচিত।

১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের বিধি-বিধান ছিল ইতোপূর্বে প্রণীত সকল আইনের তুলনায় বৈপ্লবিক ধরনের। ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এর গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই আইনের ধারাসমূহ ছিল নিম্নরূপ : প্রথমত, এই আইনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বাতিল বা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে বিভিন্ন ধরনের স্বত্বাধিকারী কৃষককে সরাসরি সরকারের অধীনে আনা হয়েছিল।[৩৪] উল্লেখ্য, ঔপনিবেশিক আমলে

---

[৩০] সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, পৃ. ৪৪-৪৫।

[৩১] Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath* (Dhaka : The University Press Limited, Second impression, 2003), p. 7.

[৩২] *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 6, 1950, p. 135.

[৩৩] ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ সম্পর্কে তথ্যের ভিন্নতা রয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকর হয়েছে ১৯৫১ সালের ১৬ মে থেকে, আবার কোথাও বলা হয়েছে আইনটি কার্যকর হয়েছে ১৯৫১ সালের ১৮ মে থেকে। দেখুন, Bari, *District Gazetteers : Jessore*, p. 250; তালুকদার, *জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর যশোর*, পৃ. ২৪৯।

[৩৪] Islam, "*Land Reform in Bangladesh-A Skeptical View*", p. 127.

ভূমিতে স্বত্বাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণির কৃষকের স্তর সৃষ্টি করা হয়েছিল। যেমন ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে দুই ধরনের কৃষকের স্বীকৃতি ছিল যথা খোদকাশ্‌ত রায়ত[৩৫] এবং পাইকাশ্‌ত রায়ত[৩৬]। ১৮৫৯ সালের খাজনা আইনে সরকারিভাবে তিন ধরনের কৃষকের স্বীকৃতি পাওয়া যায় যথা খোদকাশ্‌ত রায়ত বা কায়েমী রায়ত, দখলিস্বত্বের অধিকারী রায়ত[৩৭] এবং দখলিস্বত্বের অধিকারবিহীন উঠবন্দী রায়ত বা মেয়াদি রায়ত[৩৮]। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষকদের স্বত্বাধিকারী, স্থায়ী ও অধীনস্থ রায়ত-এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল।[৩৯] অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সরকারিভাবে উপরিউক্ত কৃষকের শ্রেণি বিভক্তি করা হলেও বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় জমিদাররা কৃষকদের আরও অধিক শ্রেণিতে বিভক্তি করে বিভিন্ন হারে খাজনা আদায় করতেন। যেমন খুলনা জেলায় ৬ ধরনের কৃষক-প্রজার পরিচয় পাওয়া যায় : (১) কায়মী কৃষক-নির্ধারিত খাজনা প্রদানকারী দখলিস্বত্ববান কুষক; (২) অদখলিস্বত্ববান কৃষক; (৩) খোদকাশ্‌ত রায়ত-আবাসিক রায়ত; (৪) পাইকাশ্‌ত রায়ত-অনাবাসিক কৃষক; (৫) ভিটাবাড়ি প্রজা-ভূমিস্বত্বাধিকারীর খামারবাড়ির কৃষক এবং (৬) কোর্ফা রায়ত-অধীনস্থ কৃষক।[৪০] অন্যদিকে রংপুর জেলা গেজেটিয়ারে ১১ ধরনের কৃষক প্রজার পরিচয় পাওয়া যায় : (১) নির্ধারিত খাজনা প্রদানকারী চিরস্থায়ী দখলি কৃষক; (২) দখলি অধিকারী কৃষক, কিন্তু খাজনা নির্ধারিত নয়; (৩) ইচ্ছাধীন প্রজা কৃষক; (৪) আধিয়ার কৃষক; (৫) কোর্ফা কৃষক (৬) খোদকাশ্‌ত কৃষক; (৭) পাইকাশ্‌ত কৃষক; (৮) চুকানদার বা অধীন কৃষক; (৯) মুকারারী কৃষক; (১০) মৌরসী কৃষক এবং (১১) জঙ্গলবাড়ি কৃষক।[৪১] ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের মতে বাকেরগঞ্জ জেলায় ৩ ধরনের কৃষক ছিল : (১) পাট্টাধারী কৃষক-ভূমিতে যাদের চিরস্থায়ী অধিকার ছিল এবং খাজনা ছিল নির্দিষ্ট (২) অপাট্টাধারী কৃষক-ভূমিতে যাদের ভোগদখলীয় অধিকার ছিল, কিন্তু নির্দিষ্ট মেয়াদে খাজনা বৃদ্ধির সুযোগ ছিল এবং (৩) ইচ্ছাধীন কৃষক। এছাড়াও উঠবন্দি কৃষকরা ছিলেন প্রধানত নদী বা সাগর তীরবর্তী অঞ্চলে। নদী বা সাগর তীরবর্তী অঞ্চলে জেগে উঠা ভূমিতে জমিদাররা যে কৃষকদেরকে জমি বন্দোবস্ত দিতেন তারা উঠবন্দি কৃষক হিসেবে পরিচিত ছিল। উল্লেখ্য, নদী বা সাগর তীরবর্তী জেগে ওঠা চরাঞ্চলের উঠবন্দি জোত ছিল বিভিন্ন প্রকারের। এই চরাঞ্চলের উঠবন্দি কৃষকরাও ছিল নানা প্রকারের। যশোর জেলায় ৬ ধরনের উঠবন্দি কৃষক ছিলেন।[৪২] এছাড়াও সার্জন জেমস টেইলর মৎস্যজীবীদের জিরাতি কৃষক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে জিরাতি কৃষকদের সাধারণত নদী বা হাওড়-বাঁওড় থেকে মাছ ধরে হাটে-বাজারে বিক্রি করার জন্য স্থানীয় জমিদারকে খাজনা দিতে হতো। তবে যদি অন্য কেউ জিরাতি কৃষকদের নিকট থেকে মাছ ক্রয় করে হাটে-বাজারে বিক্রি করতো তাহলে তাকেই জিরাতি কৃষকের নির্ধারিত হারে জমিদারকে খাজনা দিতে হতো। এক্ষেত্রে যিনি মাছ ক্রয় করে হাটে-বাজারে বিক্রি করতেন তিনি জিরাতি কৃষকের খাজনার হার হিসেব করে মাছের মূল্য থেকে সেই পরিমাণ অংশ বাদ দিয়ে জিরাতি কৃষককে মাছের মূল্য পরিশোধ করতো। অর্থাৎ জিরাতি

[৩৫] জন্মসূত্রে ভোগদখলকারী স্থায়ী রায়ত বা আবাসিক রায়ত। তারা নিজ গ্রামে নিজের জমি চাষ করতো। তারা প্রথাগত বা প্রচলিত হারে জমিদারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা প্রদান করতো, তাদের খাজনা ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করা যাবে না বলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিতে উল্লেখ ছিল। তাদেরকে উচ্ছেদের অধিকার জমিদারের ছিল না। ভূমিতে তাদের স্থায়ী অধিকার ছিল। দেখুন, ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১৬৯, ১১৫-১১৬; *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থা মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট*, পৃ. ৮।

[৩৬] অস্থায়ী অনাবাসিক রায়ত। তারা অন্য গ্রামে জমি চাষ করতো এবং ফসল তোলার পর নিজ গ্রামে ফিরে আসতো। জমিতে তাদের কোনো স্থায়ী অধিকার ছিল না। দেখুন, ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১৬৯।

[৩৭] দখলিস্বত্বের অধিকারী রায়তদের খাজনা শুধু যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করে বৃদ্ধি করা যেতো। দেখুন, ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১১৫-১১৬; *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থা মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট*, পৃ. ৮।

[৩৮] উঠবন্দী রায়ত বা মেয়াদি রায়তদের খাজনা কারণ প্রদর্শন না করেই বাজার চাহিদার ভিত্তিতে বৃদ্ধি করা যেতো। দেখুন, ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস*, পৃ. ১১৫-১১৬; *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থা মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট*, পৃ. ৮।

[৩৯] চৌধুরী, বাংলাদেশের একটি গ্রাম, পৃ. ৫৪।

[৪০] Bari, *District Gazetteers : Khulna*, p. 314.

[৪১] Khan, *District Gazetteers : Rangpur*, p. 267.

[৪২] Hunter, *A Statistical Account : Districts of Dacca, Bakarganj, Faridpur, and Maimansinh*, Volume V, p. 375.

কৃষককেই শেষপর্যন্ত জমিদারের খাজনা পরিশোধ করতে হতো।[৪৩] সুতরাং ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় নানা ধরনের কৃষক প্রজার পরিচয় পাওয়া যায়। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনের পর সকল ধরনের কৃষক-প্রজা সরকারের অধীনে একটি শ্রেণি হিসেবে পরিচিত হয়েছিল। এছাড়াও এই আইনের বিধান অনুযায়ী কৃষক তার জমি ইচ্ছেমতো ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল।[৪৪] এই আইন কার্যকর হওয়ার ফলে দেশে সকল প্রকার মধ্যস্বত্ব বিলোপ হয়ে যায় এবং কৃষকরা সরাসরি রাষ্ট্রীয় প্রজায় পরিণত হয়। কৃষক জমিতে স্থায়ী উত্তরাধিকার ও হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব লাভ করে এবং নিজের জমি স্বাধীনভাবে ভোগ-ব্যবহার করার স্বীকৃতি পায়।[৪৫] দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় এই আইন সম্পর্কে বলা হয়, "According to the Act of 1950, the cultivators have been granted permanent and transferable tenancy rights."[46] তবে জমি হস্তান্তর সম্পর্কে আইনে বলা হয় যে কেবলমাত্র যথার্থ কৃষকদের কাছেই জমি হস্তান্তর করা যাবে।[৪৭] এই আইনের ফলে কোর্ফাদাররাও কৃষকের মর্যাদায় উন্নীত হয়। এমনকি এই আইন প্রণয়নের পর জমিদারের অধীনস্থ সকল চাকরান ও নানকার কৃষকরাও কতকগুলো শর্তে নিজেদের ভোগ দখলি জমিতে রায়তিস্বত্ব অর্জন করে।[৪৮] এই আইনের পর সকল দখলি কৃষকই তার জমি ইচ্ছেমতো ব্যবহারের সুযোগ সুযোগ লাভ করে। এই আইনের বিধানে বলা হয়, "The right of the occupancy ryot in East Bengal will be permanent, heritable and transferable, and he will be able to do his land as he likes.[49] এছাড়াও এই আইনের ফলে ভূমি মালিকের মৃত্যুর পর ভূমিস্বত্বের মালিকানা ধর্মীয় মতে তার উত্তরাধিকারদের ওপর অর্পিত হয়। উপরন্তু, এই আইনের ফলে কৃষকগণ সংশ্লিষ্ট জমি হস্তান্তর করার অধিকার অর্জন করে।[৫০] সুতরাং এই আইনে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকের স্থায়ী, উত্তরাধিকারী, হস্তান্তরযোগ্য, দানযোগ্য ও ইচ্ছামত ব্যবহারের অধিকার অর্জিত হয়। এই আইনের বিধানে জমিতে কৃষকের অধিকার অর্জন সম্পর্কে বলা হয়, "By a legislation known as the East Bengal Estate Acquisition and Tenancy Act, 1950, all proprietory rights of the middlemen, *i.e.*, the Zamindars and other sublessees were abolished and all agricultural tenants were given permanent, heritable and transferable rights in their lands. They are now entitled to use their lands anyway they like."[51] উল্লেখ্য যে, একদিকে এই আইনের বিধানে কৃষকদের জমি হস্তান্তরের পরিপূর্ণ অধিকারের কথা বলা হলেও আবার অন্যদিকে এর বিধানে সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ ছিল। কেননা এর বিধান অনুযায়ী কৃষক তার ইচ্ছেমতো ভূমিস্বত্ব ব্যবহারের অধিকারী হলেও জমি ইজারা (sub-letting) দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়।[৫২] অর্থাৎ এই আইনে ভবিষ্যতে জমি ভাড়া দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। অবশ্য বর্গা প্রথায় জমি চাষ করানোকে ভাড়ায় নয় বরং মজুরি-শ্রম দিয়ে আবাদ করার সমতুল্য বিবেচনা করা হয়।[৫৩]

---

[৪৩] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, p. 152.

[৪৪] *Six-Year Development Programme of Pakistan*, July, *1951 to June 1957*, p. 17.

[৪৫] তালুকদার, *জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর যশোর*, পৃ. ২৪৯; সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, পৃ. ৪৬; আবদুল্লাহ ফারুখ, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৩), পৃ. ১৭০।

[৪৬] *The Second Five Year Plan 1960-65*, June, 1960, Planning Commission, Government of Pakistan (Karachi : Government of Pakistan Press, 1960), p. 191.

[৪৭] সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, পৃ. ৪৭।

[৪৮] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৪-৬৫।

[৪৯] Mirza Nurul Huda, "*Land Tenure and Agricultural Production*", Pakistan Economic Journal, December 1950, Quarterly, Volume II, No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950), p. 160.

[৫০] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৪-৬৫।

[৫১] Siddiqui, *District Gazetteers : Kushtia*, p. 87.

[৫২] Bari, *District Gazetteers : Jessore*, pp. 251-252; ফারুখ, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ১৭০; আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ৭১।

[৫৩] সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, পৃ. ৪৬।

দ্বিতীয়ত, এই আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সরকারি রাস্তা ব্যতীত সকল প্রকার জমি খাজনার আওতাভুক্ত হয়। এই আইনের বিধানে কর প্রদান না করার কারণে জমি ভোগ দখল অধিকার রহিত করায় করমুক্ত জমিসমূহও করের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে।[৫৪] অর্থাৎ এই আইনের বিধান অনুযায়ী করমুক্ত বা নিষ্কর জোত-জমাগুলোকে খাজনার অধীনে আনা হয়।[৫৫] এর দ্বারা কৃষকরা সরকারকে সরাসরি ভূমি রাজস্ব দেওয়ার সুযোগ লাভ করে। এর বিধানে বলা হয়, "They are to pay rent direct to the Government and the amount of rent is in no case to exceed one-tenth of the value of the annual gross produce. Thus, a direct relation has been established between the government and the people where by the tillers of the soil became also its real proprietors."[56] সুতরাং সরকারকে সরাসরি ভূমি রাজস্ব দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার এবং কৃষকের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই আইনে জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগী বা জোতদারদের খাজনা আদায়ের অধিকার বিলুপ্ত হয় এবং সরকার খাজনা গ্রহণের অধিকার অর্জন করে। আইনটি প্রণয়নের পূর্বে খাজনা গ্রহীতা হিসেবে যে অধিকার জমিদারের ওপর অর্পিত ছিল, আইন প্রণয়নের পর উক্ত অধিকার সরকারের ওপর অর্পিত হয়। সংশ্লিষ্ট জমিতে রায়তি স্বত্ব অর্জন করতে হলে সরকারকে যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত খাজনা প্রদানে কৃষক বাধ্য থাকবে বলেও আইনের বিধানে উল্লেখ করা হয়। আইনত জমিদার যে পরিমাণ জমি নিজ দখলে রাখার অধিকার অর্জন করেন তার জন্য তিনি সরকারকে যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত খাজনা প্রদানে বাধ্য থাকবেন বলেও বিধানে উল্লেখ করা হয়। আইনের বিধানে আরও বলা হয় যে সরকার জোত-জমার ন্যায়সঙ্গত খাজনা বা ভূমি কর নির্ধারণ করবেন।[৫৭] এতে বলা হয় "He will pay a fair and equitable rent settled according to the provisions of the Act.[58] উল্লেখ্য যে, এই আইনের পূর্বে ভূমির প্রকারভেদের অন্ত ছিল না। আবার একেক প্রকার ভূমির রাজস্ব ছিল একেক রকম। এ সম্পর্কে একটি গেজেটীয়ারে উল্লেখ আছে, "Before the introduction of the Estate Acquision Act of 1950 the following were the classes, into which the land of the district was divided for the purpose of assessment of rent: (a) Bhiti or homesteads; (b) Nal or cultivable land, which was divided into three classes, *viz.*, awwal, doim, soim; (c) Laik patit or patit or cultivable waste; and (d) Jola or doba or low-lying marshy ground."[59] স্পষ্টতই এই আইনে উল্লেখ করা হয় যে কোনো অবস্থাতেই ভূমি রাজস্ব বার্ষিক উৎপাদনের ১০/১ ভাগের বেশি হবে না। এর ফলে উৎপাদন যাই হোক না কেন নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দেওয়ার টংক নামক যে প্রথা ময়মনসিংহে প্রচলিত ছিল তা বাতিল বলে গণ্য হয়। বাস্তবক্ষেত্রে এর অর্থ ছিল ফসল-খাজনা উৎপন্ন দ্রব্যের ৫০% -এর অধিক হবে না। এছাড়াও নানকার নামে সিলেটে প্রচলিত ভূমিদাস প্রথাও বাতিল বলে গণ্য হয়। এই প্রথায়, একজন নানকারকে সামান্য জমি ব্যবহার করতে দিয়ে জমির মালিক তাকে দিয়ে বেগার খাটাতো। শুধু তাই নয়, এখানে আরও উল্লেখ করা হয় যে সরকারকে রাজস্ব প্রদান করতে হবে নগদে এবং ২০ বছর পর পুনরায় রাজস্বের পরিমাণ পুনঃমূল্যায়ন করা যাবে।[৬০]

---

[৫৪] তালুকদার, *জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর যশোর*, পৃ. ২৪৯।
[৫৫] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৪-৬৫।
[৫৬] Siddiqui, *District Gazetteers : Kushtia*, p. 87.
[৫৭] *Second Five Year Plan 1960-65*, p. 191.
[৫৮] Huda, "*Land Tenure and Agriccultural Production*", p. 160.
[৫৯] Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers : Dacca*, p. 161.
[৬০] Islam, "*Land Reform in Bangladesh-A Skeptical View*", p. 127; Bari, *District Gazetteers : Jessore*, pp. 251-252; সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, পৃ. ৪৭।

প্রশ্ন হলো জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন কার্যকর হওয়ার আগে এবং পরে ভূমির ওপর খাজনা-কর নির্ধারণ এবং কৃষকের শোষণ ও নিপীড়নের ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল কী? সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভূমির নির্ধারিত খাজনার পাশাপাশি কৃষককে জমিদার ও জোতদারকে বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত কর দিতে হতো যা আবওয়াব নামে পরিচিত ছিল। একইভাবে পাকিস্তান শাসনামলেও কৃষককে ভূমির নির্ধারিত খাজনার সঙ্গে উন্নয়ন ও রিলিফ কর, স্থানীয় কর, শিক্ষা কর, অতিরিক্ত উন্নয়ন ও রিলিফ কর, রাস্তা করসহ বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত কর প্রদান করতে হতো। অন্যদিকে ইংরেজ রাজত্বকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় ভূমির নির্ধারিত খাজনা বৃদ্ধি হয়নি, তবে শুধু আবওয়াব বৃদ্ধি পেতো। কিন্তু পাকিস্তান শাসনামালে বছর বছর ক্রমান্বয়ে ভূমির নির্ধারিত খাজনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত করও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি এসব খাজনা-কর আদায়ের জন্য ঔপনিবেশিক আমলের ন্যায় জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন কার্যকর হওয়ার পরেও সার্টিফিকেট মামলাসহ সরকারি নিপীড়ন অব্যাহত ছিল (পঞ্চম অধ্যায়ে পাকিস্তান শাসনামলে কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)। কেবলমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যুগে জমিদাররা কৃষকের ওপর নির্মমভাবে শারীরিক নির্যাতন করতো, কিন্তু পাকিস্তান আমলে এটি অনুপস্থিত ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল এই যে ঔপনিবেশিক শাসনামলে কৃষকের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন হলেও বড় ধরনের কোনো কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সাধারণত সরকার জানতে পারতো না যে দেশে কৃষক ও ভূমি সংশ্লিষ্ট সমস্যা আছে, কিন্তু ভোট রাজনীতির প্রবর্তনের ফলে বিশেষ করে পাকিস্তান আমলে খাজনা-কর বৃদ্ধি তথা কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন হলে তার প্রতিকারের জন্য কৃষক তথা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ কেউ তার প্রতিবাদ করতো; এমনকি খাজনা-কর হ্রাসের জন্যও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হতো। যেমন ১৯৫৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদে ১৯৫৬-৫৭ অর্থ বছরের বাজেট আলোচনার সময় পরিষদের সদস্য তৈয়েবুর রহমান সরকারের বিরুদ্ধে খাজনা-কর বৃদ্ধি করে কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়নের অভিযোগ তুলে বলেন যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই জন্য যে জমিদারদের অত্যাচার এবং শোষণ থেকে কৃষকের রক্ষা করা। কিন্তু জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার পরও খুলনার দক্ষিণ অঞ্চল এবং বাকেরগঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চল, যেখানে সম্পূর্ণ অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং যেখানে এই আইন আংশিক কার্যকরী করা হয়েছে সেখানে কৃষকরা চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। তিনি বলেন যে সেখানে জমির খাজনা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। অধিগ্রহণের পূর্বে যার জমির খাজনা ছিল ৭০ টাকা, অধিগ্রহণের পর তার সেই একই জমির খাজনা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭০০ টাকা। অর্থাৎ অধিগ্রহণের পর জমির খাজনা বৃদ্ধি পেয়েছে দশ গুণ। উপরন্তু, খাজনা আদায়কারী তহশিলদার ও কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারে কৃষকরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সরকারের নিকট এসব বিষয়ে অভিযোগ করেও কৃষকরা কোনো প্রতিকার পায়নি। কৃষকদের অভাব-অভিযোগ, সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সরকার মোটেই লক্ষ্য রাখে না। এর ফলে বর্তমানে কৃষকদের মনে ধারণা জন্মেছে যে ঔপনিবেশিক জমিদারি আমলেই তারা অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল। জমিদারদের আমলে যে সমস্ত খাল-বিল, নদী-নালা কোনোকালেই বন্দোবস্ত দেওয়া হয়নি, সামান্য টাকায় সেগুলো বর্তমানে বন্দোবস্ত দিয়ে কৃষকের নিদারুণ অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও ত্রুটিপূর্ণ সেটেলমেন্টের কারণে কৃষকদের ওপর অবর্ণনীয় অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে। এমনকি একজনের খাজনা নেওয়া হচ্ছে অন্যের নিকট থেকে। এর ফলে কৃষক ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছেছে।[৬১] সুতরাং পরিষদ সদস্যের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন কার্যকর হওয়ার পরও কৃষকরা শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়েছিল। তবে পার্থক্য ছিল এই যে পাকিস্তান আমলে কৃষকদের ওপর শোষণ ও

[৬১] *Assembly Proceeding*, Official Report, East Pakistan Provincial Legislative Assembly, Vol. XV, No. 1, Third Session, 1956, 17th to 23rd September, 1956 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1957), pp. 122-123.

নিপীড়নের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন যা ব্রিটিশ আমলে বিশেষত ভোটের রাজনীতি শুরুর পূর্ব পর্যন্ত অনুপস্থিত ছিল।

তৃতীয়ত, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের বিধানে কৃষককে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করা হয়। এর বিধানে বলা হয় যে কোর্টের আদেশ ছাড়া কৃষককে কোনোভাবেই উচ্ছেদ করা যাবে না। এ আইনে কৃষককে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে তাকে আর উচ্ছেদ হতে হবে না।[৬২]

চতুর্থত, এই আইনে জমির সীমা নির্ধারিত হয় পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা (৩৩.৩ একর) বা পরিবারের সদস্য প্রতি ১০ বিঘা আবাদি জমির হিসেবে যেটা অধিকতর হয়, এবং তদসঙ্গে বসতবাটির জন্য সর্বোচ্চ ১০ বিঘা। আইনের বিধান অনুযায়ী এর অতিরিক্ত জমি সরকার অধিগ্রহণ করতে পারবে। তবে আইনের বিধিতে উল্লেখ করা হয় যে ইক্ষু, চা, কফি, রাবার চাষ, কার্শিয়াপাতা বাগান, ফলের বাগান, শক্তি চালিত যান্ত্রিক আবাদের আওতাধীন বড় খামার এবং বৃহদায়তন গো-দুগ্ধ খামার প্রভৃতির ক্ষেত্রে আইন শিথিল করা হবে। এখানে বলা হয় যে নির্ধারিত পরিমাণ জমি ব্যতীত উদ্বৃত্ত খাস জমি সরকরের ওপর দায়মুক্ত অবস্থায় অর্পিত হবে। নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে বিতরণ করা হবে বলেও আইনের বিধানে উল্লেখ করা হয়। যে সকল কৃষকের জমির পরিমাণ তিন একরের কম কিংবা যাদের মোটেই জমি নেই, তাদের মধ্যে খাস জমি বন্দোবস্তের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলেও আইনের বিধানে উল্লেখ করা হয়। শুধু তাই নয়, যে কোনো চরাঞ্চলের জমি কৃষককে দেওয়া হবে বলেও নিয়ম তৈরি করা হয়।[৬৩]

পঞ্চমত, এই আইনে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে খাজনা-গ্রহীতাদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান করা হয়। ক্ষতিপূরণের হার নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত হয় : (ক) যেখানে জমি থেকে বার্ষিক প্রকৃত আয় ৫০০ টাকা অতিক্রম করে না সেখানে ক্ষতিপূরণের হার হবে ঐ প্রকৃত আয়ের ১০ গুণ; (খ) যেখানে গণনাকৃত বার্ষিক প্রকৃত আয় ৫০০ টাকা অতিক্রম করে কিন্তু মোট প্রকৃত আয়ের পরিমাণ ২,০০০ টাকা অতিক্রম করে না, সেখানে ঐ প্রকৃত আয়ের ৮ গুণ অথবা উপরের ‘ক’ তালিকা অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রকৃত প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের হার আয়ের চেয়ে ঐ ‘ক’ তালিকা অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যার পরিমাণ অধিকতর হয়; (গ) যেখানে বার্ষিক প্রকৃত আয় ২,০০০ টাকা অতিক্রম করে কিন্তু ৫,০০০ টাকা অতিক্রম করে না, সেখানে ঐ প্রকৃত আয়ের ৭ গুণ অথবা উপরের ‘খ’ তালিকা অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চেয়ে ঐ ‘খ’ তালিকা অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যার পরিমাণ অধিকতর হয়; (ঘ) যেখানে বার্ষিক প্রকৃত আয় ৫,০০০ টাকা অতিক্রম করে কিন্তু ১০,০০০ টাকা অতিক্রম করে না, সেখানে ঐ প্রকৃত আয়ের ৬ গুণ অথবা উপরের ‘গ’ তালিকা অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চেয়ে ঐ ‘গ’ তালিকা অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যার পরিমাণ অধিকতর হয়; (ঙ) যেখানে বার্ষিক প্রকৃত আয় ১০,০০০ টাকা অতিক্রম করে কিন্তু ২৫,০০০ টাকা অতিক্রম করে না, সেখানে ঐ প্রকৃত আয়ের ৫ গুণ অথবা উপরের ‘ঘ’ তালিকা অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চেয়ে ঐ ‘ঘ’ তালিকা অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যার পরিমাণ অধিকতর হয়; (চ) যেখানে বার্ষিক প্রকৃত আয়

---

[৬২] *Second Five Year Plan 1960-65*, p. 191; Huda, “*Land Tenure and Agriccultural Production*”, p. 160.

[৬৩] Islam, “*Land Reform in Bangladesh-A Skeptical View*”, p. 127; Bari, *District Gazetteers : Jessore*, pp. 251-252; Bari, *District Gazetteers : Khulna*, p. 324; তালুকদার, *জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর যশোর*, পৃ. ২৪৯; ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৪-৬৫; সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, পৃ. ৪৬।

২৫,০০০ টাকা অতিক্রম করে কিন্তু ৫০,০০০ টাকা অতিক্রম করে না, সেখানে ঐ প্রকৃত আয়ের ৪ গুণ অথবা উপরের 'ঙ' তালিকা অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চেয়ে ঐ 'ঙ' তালিকা অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যার পরিমাণ অধিকতর হয়; (ছ) যেখানে বার্ষিক প্রকৃত আয় ৫০,০০০ টাকা অতিক্রম করে কিন্তু ১,০০,০০০ টাকা অতিক্রম করে না, সেখানে ঐ প্রকৃত আয়ের ৩ গুণ অথবা উপরের 'চ' তালিকা অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চেয়ে ঐ 'চ' তালিকা অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যার পরিমাণ অধিকতর হয়; এবং (জ) যেখানে বার্ষিক প্রকৃত আয় ১,০০,০০০ টাকা অতিক্রম করে, সেখানে ঐ প্রকৃত আয়ের ২ গুণ অথবা উপরের 'ছ' তালিকা অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চেয়ে ঐ 'ছ' তালিকা অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যার পরিমাণ অধিকতর হয়। একইভাবে জমিদারদের অধীনস্থ অতিরিক্ত জমির জন্য ক্ষতিপূরণের হার নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত হয় : (১) কৃষি চাষ, ফল চাষ বা পুকুরের জন্য ব্যবহৃত জমির জন্য ঐ জমি হতে আগত বার্ষিক লাভের ৫ গুণ; (২) যে সকল জমির ওপর হাট বা বাজার বসে সে সকল জমির জন্য ঐ জমি হতে আগত বার্ষিক লাভের ৫ গুণ; (৩) চাষযোগ্য বা সংস্কারের পর চাষযোগ্য জমির জন্য ঐ জমি হতে আগত বার্ষিক লাভের ৫ গুণ অথবা বার্ষিক রায়তী ... এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত পার্শ্ববর্তী চাষযোগ্য জমির সমান এলাকার খাজনা : (ক) লাভজনক জমির জন্য এর ১০ গুণ, যার পরিমাণ অধিকতর হয়, (খ) অ-লাভজনক জমির জন্য একর প্রতি ১০ টাকা; (৪) মৎস্য খামার বা বনাঞ্চলের জন্য জমি বা ফেরি হিসেবে ব্যবহৃত জমির জন্য ঐ জমি হতে আগত বার্ষিক লাভের ৫ গুণ; (৫) জঙ্গল, নদীর গতিপথ (Course) বা মৎস্য খামার নয় এইরূপ অ-চাষযোগ্য জমি যথা রাস্তা, পথ, সাধারণের জন্য কবরস্থান বা শ্মশানঘাট, নদী, খাল এবং পানির গতিপথ যা জনসাধারণ তাদের স্বাভাবিক বা প্রথাগত অধিকার দ্বারা বা ইজমেন্টের অধিকার দ্বারা ব্যবহার করে ঐরূপ জমির জন্য ঐ জমি হতে আগত বার্ষিক লাভের ৫ গুণ; (৬) পতিত অ-কৃষি জমির জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্যকৃত জমি ইজারা দেওয়ার বার্ষিক মূল্যের ৫ গুণ; এবং (৭) দালানসহ জমির জন্য : (ক) জমির জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্যকৃত জমি ইজারা দেওয়ার বার্ষিক মূল্যের ৫ গুণ, ও (খ) দালানের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্যকৃত অপচয় বাদ দিয়ে নির্মাণের প্রকৃত খরচ। কাবেদুল ইসলামের মতে যদিও ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টে ক্ষতিপূরণ সম (flat) হারে পরিশোধের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আইনি শর্ত ছিল আনুপাতিক হারে বা অবস্থা ভেদে।[৬৪] তবে আইনে উল্লেখ করা হয় যে জনগণের সেবায় প্রদত্ত ধর্মীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রকৃত আয়ের সমপরিমাণ অর্থ চিরস্থায়ীভাবে প্রতি বছর দেওয়া হবে, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পত্তির হারেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।[৬৫]

ষষ্ঠত, এই আইন অনুযায়ী জমিদারদের খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে নির্মিত সমস্ত কাছারি বাড়ি সরকারের ওপর অর্পিত হয়। এই আইনের ফলস্বরূপ কোনো স্বত্বাধিকারীর জমির অভ্যন্তরে কোনো খনিজ পদার্থ থাকলে তা সরকারের ওপর অর্পিত হয়। একইভাবে হাট-বাজার, ফেরিঘাট, মৎস্যক্ষেত্র ও বন সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের ওপর অর্পিত হয়। এর ফলে জমিদারগণ সংশ্লিষ্ট ভূমিতে মালিকানাস্বত্ব হারিয়ে ফেলে এবং সে স্থলে জমির মালিকানাস্বত্ব সরকারের ওপর বর্তায়।[৬৬] এককথায়, আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবার প্রতি নির্ধারিত ১০০ বিঘা বা পরিবারের সদস্য প্রতি ১০ বিঘার অতিরিক্ত জমি, প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ জমি, হাট-বাজার, ফেরিঘাট, মৎস্যক্ষেত্র ও বন ভূমি সবই খাস

---

[৬৪] ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ১৯৪৭ থেকে ২০০০*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৮-১১১।
[৬৫] সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, পৃ. ৪৬।
[৬৬] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৪-৬৫।

জমি হিসেবে সরকার অধিগ্রহণ করে। এসব ভূমি ব্যক্তি মালিকানা থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে ভূমির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্পন্ন হয়।[৬৭]

সপ্তমত, এ আইন অনুযায়ী যদি কোনো গ্রামের মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ কৃষি জমির মালিকেরা, যাদের সংখ্যা ঐ গ্রামের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের কম হবে না, তারা যদি কালেক্টরের নিকট জমি একত্রিকরণের জন্য আবেদন করে তাহলে কালেক্টর সে গ্রামের সমস্ত জমি একত্রিকরণ করতে পারবেন। এছাড়াও এই আইন অনুযায়ী কোনো জমিই এমনভাবে বিভক্ত করা যাবে না, যাতে এর রাজস্ব বা খাজনা এক টাকার কম হয়।

১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের অধীনে জমিদার ও অন্য খাজনা-গ্রহীতাদের স্বার্থ অধিগ্রহণের কাজ ১৯৫৮ সালে সমাপ্ত হয়েছিল। দেবোত্তর, ওয়াকফ ইত্যাদি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ধীরগতিতে চলে এবং চূড়ান্তভাবে সকল প্রকার অধিগ্রহণ শেষ হয়েছিল ১৯৬৪ সালে।[৬৮] প্রশ্ন হলো এই আইন প্রণয়নে ও প্রয়োগে এতো বিলম্ব হওয়ার কারণ কী ছিল? সংক্ষিপ্তভাবে এর উত্তরে বলা যায় যে প্রথমত, জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সার্বিক পরিস্থিতি ও ভোটের রাজনীতির কারণে শেষ পর্যন্ত ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করে আইনটি প্রণয়ন করেছিল। এ কারণে দীর্ঘ প্রায় দুই বছর (১৯৪৮-১৯৫০) আলাপ-আলোচনার পর পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব বিল গৃহীত হয়। আবার এখানেই শেষ নয়, বিল পাশের প্রায় পনের মাস পর (১৯৫১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি হতে ১৯৫১ সালের ১৮ মে) গভর্নর জেনারেলের বিলের ওপর সম্মতিদানের মাধ্যমে বিলটি আইনে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব বিলটি উত্থাপনের পর থেকে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলীয় জমিদার সমর্থক সদস্যরা নানাভাবে বিল পাশ না করানোর জন্য বা বিল গ্রহণ দীর্ঘায়িত করতে নানা যুক্তি-তর্কের কৌশলী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কংগ্রেস দলীয় সদস্যদের কৌশলী ভূমিকা পালনেরর উদ্দেশ্য ছিল বিল পাশে বিলম্বকরণ ও বাড়তি সুযোগ-সুবিধা আদায়ের মাধ্যমে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা। অর্থাৎ বিলটি বিলম্বকরণের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস উভয় দলেরই ভূমিকা ছিল। যাহোক, অতঃপর বিলটি গৃহীত হয়ে আইনে পরিণত হওয়ার পর পূর্ব বাংলার জমিদাররা সংগঠিতভাবে আইনটি যেন কার্যকর হতে না পারে তার জন্যও তাদের প্রয়াস অব্যাহত ছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল মামলা করে (পঞ্চম অধ্যায়ে এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে) আইনটি কার্যকর করতে সরকারকে বাধা দান বা বাস্তবায়নে বিলম্বকরণ। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ সরকারের বিদায়ের পর যুক্তফ্রন্ট সরকার আইনটি কার্যকর করতে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু জমিদারদের মামলার আইনগত প্রতিবন্ধকতার কারণে আইনটি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ এ আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকার জমিদারদের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিল।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ দিন ধরে আইনি লড়াইয়ের পর ১৯৫৭ সালের জুন মাসে ঢাকা হাইকোর্ট ও পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট উভয় আদালতে সরকারের পক্ষে চূড়ান্ত রায় দানের পর রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৫৮ সালে সরকার অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য, এই আইন প্রণয়নের পরপরই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম অধিগ্রহণ করা হয়েছিল বড় জমিদারি এস্টেটসসমূহ। ১৯৫২ সালের ১ নভেম্বর পূর্ব

---

[৬৭] *Second Five Year Plan 1960-65*, p. 191.

[৬৮] ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৩; ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৭০-৭১।

বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে তৎকালীন অর্থ ও রাজস্বমন্ত্রী তোফাজ্জল আলী জানান যে সর্বমোট ১০৪টি জমিদারি এস্টেটস অধিগ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ১৯টি ব্যক্তিগত জমিদারি এস্টেটস এবং ৮৫টি কোর্ট অব ওয়ার্ডস এস্টেটস (সারণি ২৩)।[৬৯] সারণি ২৩ থেকে দেখা যায় যে এই আইনে সর্বপ্রথম অধিগ্রহণকৃত ১০৪টি ব্যক্তিগত ও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের জমিদারি এস্টেটসের সবগুলো ছিল বড় জমিদারি এস্টেটস এবং এগুলোর রাজস্বও ছিল অনেক বেশি। এর মধ্যে সাতটি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের জমিদারি এস্টেটের স্বত্বাধিকারী ছিলেন নারী এবং চারটির স্বত্বাধিকারী ছিল ইউরোপিয়ান কোম্পানি। উল্লেখ্য, এই আইন প্রণয়নের পূর্ব থেকেই রাজস্ব বা অন্যান্য কর বকেয়ার কারণে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় অসংখ্য জমিদারি এস্টেট বিক্রি হয়ে যায় যার অধিকাংশের ক্রয়কারী ছিলেন সরকার। ১৯৫১ সালের ৩১ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে জানা যায় যে ১৯৪৯-৫০ সালে রাজস্ব ও সেস বাকি পড়ার কারণে ত্রিপুরা জেলায় বিক্রীত ২৬৭টি এস্টেটের মধ্যে ১৮৩টি এস্টেট সরকার ক্রয় করেছিল (সারণি ২৪)।[৭০] সারণি ২৪ থেকে দেখা যায় যে এই ১৮৩টি এস্টেটস রাস্তা, পি.ডব্লিউ ও শিক্ষা সেস বকেয়ার কারণে নিলামে উঠে এবং তা সরকার ক্রয় করে নেয়।

১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকর করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। এ কারণে এ আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণকৃত জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগী জোতদারদের ক্ষতিপূরণ প্রদানও প্রলম্বিত হয়। ক্ষতিপূরণ তালিকা প্রস্তুত করতে দেরি হওয়ার কারণেই এই বিলম্ব হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ তালিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল : (১) হিন্দু আইনের *দায়ভাগ*[৭১] পদ্ধতি অনুযায়ী অবিভক্ত যৌথ পরিবারের সম্পত্তির ক্ষেত্রে সকল খাজনা গ্রহীতাকে একক ধরে ক্ষতিপূরণ তালিকা প্রস্তুত করা হয়। (২) অনূর্ধ্ব ৫০০ টাকা আয়ের যৌথ স্বত্বাধিকারী খাজনা গ্রহীতাগণের ক্ষেত্রে একই তালিকায় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়। অবশ্য অংশীদারগণের ক্ষতিপূরণে তাদের প্রাপ্য অংশ দেখানো হয়। (৩) মোট সম্পত্তি এবং প্রকৃত আয় নির্ধারণের জন্য আইন অনুযায়ী অধীনস্থ প্রজাগণ কর্তৃক সংবাৎসরিক ভিত্তিতে একজন খাজনা গ্রহীতা যে পরিমাণ খাজনা এবং কর (cess) পেতেন, এর সমষ্টিকেই খাজনা গ্রহীতার মোট সম্পত্তি গণ্য করা হয়। তাছাড়া খাজনা গ্রহীতার নিজস্ব রক্ষণীয় সম্পত্তির খাজনাও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। (৪) খাজনা গ্রহীতার প্রকৃত আয় নির্ধারণ করতে তার মোট বার্ষিক আয় হতে বার্ষিক দেনা বাদ দেওয়ার বিধান করা হয় যেমন : (ক) সরকারকে বা উপরস্থ স্বত্বাধিকারীকে (Superior landlord) প্রদত্ত খাজনা এবং কর; (খ) কৃষি আয়কর; (গ) আয়কর; (ঘ) সেচ বা বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ; এবং (ঙ) মোট সম্পত্তির ২০% খাজনা আদায় বাবদ খরচ। (৫) ধর্মীয় ও দাতব্য ট্রাস্টি সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ চিরস্থায়ী বার্ষিক বৃত্তি হিসেবে আলাদাভাবে প্রস্তুত করা হয়। এই ধরনের ট্রাস্টি সম্পত্তির ১০ বছরের হিসেব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ট্রাস্টি দলিল পর্যালোচনাপূর্বক বার্ষিক গড় পরীক্ষিত খরচ বের করা হয়। দানকৃত সম্পত্তি এই খরচ নির্বাহে সক্ষম। নির্ধারিত এই খরচই ক্ষতিপূরণ বা বার্ষিক বৃত্তি হিসেবে মঞ্জুর করার বিধান করা হয়। ট্রাস্টি সম্পত্তি উক্ত খরচ নির্বাহে সমর্থ না হলে সম্পত্তির বার্ষিক আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারিত হয়। অপরদিকে ট্রাস্টি সম্পত্তির আয় নির্ধারিত বার্ষিক বৃত্তি হতে বেশি হলে অতিরিক্ত আয়ের ওপর সাধারণভাবে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়। উক্ত নির্ধারিত

[৬৯] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. IX, No. 2, Ninth Session, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 28th, 29th, 30th, 31st October and 1st November, 1952 (Dacca : East Bengal Government Press, 1954), pp. 343-347.

[৭০] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. VI, No. 2, Sixth Session, 1951, 30th, 31st October, 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th, 8th, 9th, 10th and 12th November, 1951 (Dacca : East Bengal Government Press, 1953), p. 33.

[৭১] হিন্দু আইনে দু'ধরনের উত্তরাধিকার পদ্ধতি চালু আছে। মিতক্ষরা ও দায়ভাগ পদ্ধতি। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুগণ দায়ভাগ মতবাদের অনুসারী। দায়ভাগ পদ্ধতি অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার তার ওয়ারিশগণ উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত হয়। দায়ভাগ পদ্ধতি অনুযায়ী পিণ্ডদানই উত্তরাধিকার নির্ণয়ের ভিত্তি। বিস্তারিত দেখুন, সরকার, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি আইন*, পৃ. ৫০-৫৩।

বার্ষিক বৃত্তি ট্রাস্টিকে সম আয়সম্পন্ন খাস জমি প্রদান করা হয়। অতিরিক্ত খরচ প্রয়োজন হলে বার্ষিক ক্যাশ এন্যুইটি নির্ধারণ করা হয়। এভাবে প্রতিটি ধর্মীয় ট্রাস্টি যেমন- ওয়াকফ, দেবোত্তর বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত বার্ষিক বৃত্তি তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। যে সমস্ত সম্পত্তির এই ধরনের কোনো ট্রাস্টির অস্তিত্ব ছিল না বা পরীক্ষান্তে কোনো দলিল, হিসেব বই বা অন্য কোনো প্রমাণপত্র পাওয়া যায়নি সে সব ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পত্তির ন্যায় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়। (৬) জমিদার বা জোতদারদের সিলিং বহির্ভূত সম্পত্তি বা অরক্ষণীয় খাস সম্পত্তিরও ক্ষতিপূরণ তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই ধরনের সম্পত্তি হতে বার্ষিক প্রকৃত আয় নির্ধারণ করা হয় এবং উক্ত প্রকৃত আয়ের ৫ গুণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধার্য করা হয়। যে সমস্ত সম্পত্তির কোনো আয় ছিল না সে সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে একর প্রতি ১০ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। হাট-বাজার, তহশিল, কাছারি ইত্যাদির ক্ষতিপূরণও ধার্য করা হয়।[৭২]

উল্লেখ্য, চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ তালিকা এবং বার্ষিক বৃত্তি তালিকা প্রস্তুত করতে দেরি হলেও ১৯৫১ সাল থেকেই ক্ষতিপূরণ প্রদান শুরু হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে তৎকালীন রাজস্ব ও রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিভাগের মন্ত্রী মাহমুদ আলী জানান যে ইতোমধ্যে জমির মালিকদের সর্বমোট ৪২,৭২,৮০২ টাকা ১২ আনা ৬ পয়সা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।[৭৩] ১৯৬২-৬৩ সালে চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ তালিকা ও বার্ষিক বৃত্তি তালিকা তৈরি করা হয়। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের জমিদারি অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয় ৩৬,৩৪,০১,১১১ টাকা। এর মধ্যে দেশীয় জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগী জোতদারদের নির্ধারিত প্রাপ্য ছিল ২৬,৪০,৭৭,২২৬ টাকা বা ৭২.৬৭% এবং অনিবাসী জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী জোতদারদের নির্ধারিত প্রাপ্য ছিল ৯,৯৩,২৩,৮৮৫ টাকা বা ২৭.৩৩%। সর্বমোট ৩৫ লক্ষ জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী জোতদারদের ক্ষতিপূরণ তালিকা তৈরি করা হয়। চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ তালিকা ও বার্ষিক বৃত্তি তালিকা গৃহীত হয়ে ১৯৬২-৬৩ সালে সরকারি গেজেট প্রকাশ করা হয়। তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে হস্তান্তরিত হয়। ১৯৬৩ সাল হতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট জেলায় ক্ষতিপূরণ প্রদান শুরু করেন। দেশীয় জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী জোতদারদের ১৯৬৩ সাল হতে ৫ বছর মেয়াদে নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। অনিবাসী জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগী জোতদারদের অহস্তান্তরযোগ্য বন্ড আকারে বার্ষিক কিস্তিতে ৪০ বছর মেয়াদে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বন্ডের ওপর বছরে ৩% হারে সুদ প্রদানেরও বিধান করা হয়।[৭৪] উল্লেখ্য, ক্ষতিপূরণ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল সরকারের অর্থ সংকট। এছাড়াও সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে রেকর্ডস্বত্ব তৈরিতে বিলম্ব হওয়ার কারণেও ক্ষতিপূরণ দিতে দীর্ঘ সময় লাগে।[৭৫] অর্থাৎ আর্থিক সংকট এবং সরকারের রেকর্ডস্বত্ব তৈরিতে দেরি হওয়ার কারণে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী জোতদারদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বিলম্ব হয়। এ কারণে বলা যায় যে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আইনগতভাবে জমিদারি প্রথা এবং জমিদারদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও বাস্তবে তাদের অস্তিত্ব আরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিদ্যমান ছিল।

[৭২] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৭-৬৯।
[৭৩] *Assembly Proceedings*, Vol. XV, No. 1, 1956, p. 94.
[৭৪] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৭-৬৯।
[৭৫] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Assembly, Vol. XVIII, No. 4, First Session, 1958, 26th March, 1958 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1958), p. 124; *Second Five Year Plan 1960-65*, p. 189; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ মার্চ, ১৯৫৮।

এখন প্রশ্ন হলো পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল এবং ভূমি বিরোধের রাজনীতির ওপর এর কী প্রভাব পড়েছিল? সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়াও আশা করা হয়েছিল যে এর ফলে কৃষকের ওপর শোষণ ও নিপীড়নেরও অবসান হবে। পূর্ব বাংলার তৎকালীন রাজস্ব ও অধিগ্রহণ মন্ত্রী মাহমুদ আলী মন্তব্য করেন যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো ভূমি চাষকারী কৃষককে ভূমির অধিকার প্রদান করে নিজ ভাগ্যের নিয়ন্তা করা। তিনি আরও বলেন যে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যদি কৃষককে তার নতুন মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন এবং কৃষকের সঙ্গে সমীহ ও বিবেচনাপূর্ণ আচরণ করতে সক্ষম হন, তাহলেই কেবলমাত্র এই আইনের মূল উদ্দেশ্য সফল হবে।[৭৬] অর্থাৎ কৃষককে ভূমি মালিকের মর্যাদা দেওয়াই ছিল জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ন্যায় জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের পেছনেও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। উল্লেখ্য, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে ভোট রাজনীতির কারণে এই গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় কৃষকরা মূল নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। একইভাবে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়ও কৃষকরাই ছিল নীতি নির্ধারণী ভূমিকায়। এ কারণে উভয় নির্বাচনে কৃষক তথা জনসাধারণের চাওয়া-পাওয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার কল্যাণে বাংলা তথা পূর্ব বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল। এর মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিল। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিয়েছিল।[৭৭] এদের নেতৃত্বেই কৃষকরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিরোধী তথা জমিদারি প্রথা বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ সরকার চায়নি ঔপনিবেশিক শাসনামলের ন্যায় জমিদারি প্রথা বিরোধী আন্দোলন সরকার পতনের আন্দোলনে পরিণত হোক। এছাড়াও এ ধরনের আন্দোলন পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত যে কোনো সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পতনের মূল কারণ হবে বলেও সরকার অনুমান করেছিল। সুতরাং এই রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণেও মুসলিম লীগ সরকার জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিল। অন্যদিকে অর্থনৈতিক কারণ ছিল যে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ দীর্ঘমেয়াদে সরকারের রাজস্ব আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

উল্লেখ্য, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের পর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। এর ফলে কৃষি উৎপাদনও তেমন বৃদ্ধি পায়নি।[৭৮] এমনকি পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও পূর্ব বাংলা সরকার খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি।[৭৯] সমকালীন বিশ্বে কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হলেও পূর্ব বাংলার কৃষি ব্যবস্থা পূর্বের ন্যায় অবহেলিত রয়ে যায়। এর ফলে পূর্ব বাংলায় খাদ্য ঘাটতি ছিল নিত্যে সঙ্গী। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর আশা করা হয়েছিল যে সরকারি নানা উদ্যোগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণ হবে। এছাড়াও এই আইনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল জমিদারি প্রথাসহ ভূমি সম্পর্কিত যাবতীয় মধ্যস্বত্ব বিলোপ করে কৃষককে সরাসরি সরকারের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। কৃষককে সরাসরি সরকারের

[৭৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।
[৭৭] এ. আর. দেশাই, *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি* (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯২), পৃ. ২৭৫।
[৭৮] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. মুখবন্ধ-ঘ।
[৭৯] শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *পঞ্চাশের মন্বন্তর* (কলিকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫৭।

নিয়ন্ত্রণে এনে কৃষি জমির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে ঊর্ধ্বসীমা বহির্ভূত জমি অধিগ্রহণপূর্বক উক্ত খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। উপরন্তু, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমিস্বত্বের পরিবর্তন এবং উপযুক্ত ও কার্যকরী ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলাও সম্ভব হবে। এসব লক্ষ্যের কথা উক্ত আইনের বিধানে উল্লেখ করা হলেও তা বাস্তবায়নের জন্য কোনো উপযুক্ত পদ্ধতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে কৃষকের নিকট হতে জমিদারি যুগের ন্যায় রাজস্ব বা খাজনা আদায় করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং সরকারের রাজস্ব কর্মকর্তা কর্মচারীগণ রাজস্ব আদায়ের কাজেই মূলত ব্যাপৃত থাকে।[৮০]

তবে এটাও ঠিক যে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও ১৯৫০ সালের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ফলে প্রাচীন জমিদার শ্রেণির পতন ঘটে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর হিন্দু জমিদার পরিবারগুলো দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে আরম্ভ করে। এদের অনেকেরই দেশভাগের বহুপূর্ব থেকেই কলকাতায় বাড়িঘর ছিল। এ কারণে ১৯৫০ সালের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ফলে জমি-জমা বিক্রি করে এরা প্রধানত ভারতের কলকাতায় চলে যায়। এদের জমির ক্রেতারা ছিল প্রধানত গ্রামের ব্যবসায়ী হিন্দু পরিবার, নব্য শিক্ষিত ধনী মুসলমান পরিবার কিংবা আশপাশের গ্রামের উদীয়মান মুসলমান ব্যবসায়ী পরিবারগুলো।[৮১] এর ফলে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের পর পূর্ব বাংলায় ভূমি মালিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেমন ১৯৫১ সালে যশোর জেলায় ভূমি মালিকের সংখ্যা ছিল ৩,৬৫,৬৬৮ জন এবং ১৯৬১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৭৮,৭২৮ জন। ১০ বছরের ব্যবধানে ভূমি মালিকের সংখ্যা ৩০.৯২% বৃদ্ধি পায়।[৮২] একইভাবে ১৯৫১ সালে রাজশাহী জেলায় ভূমি মালিকের সংখ্যা ছিল ৪,১২,৭৯৪ জন (যাদের মধ্যে কৃষি কাজে নিয়োজিত ছিলেন ৪,০৮,৩৬২ জন বা ৯৮.৯৩%) এবং ১৯৬১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫,৯৫,৫৩৫ জন। এই ১০ বছরে ভূমি মালিকের বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৪৪.২৭%।[৮৩] যশোর ও রাজশাহী জেলার ন্যায় ১৯৫১ হতে ১৯৬১ সালে পূর্ব বাংলার অন্যান্য জেলায়ও ভূমি মালিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পর এভাবে ব্যবসায়ী ও নব্য শিক্ষিত ধনী পরিবারগুলো ভূমি ক্রয় করে জোতদার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়। জোতদাররা শোষণকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এই শোষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে পরিস্থিতি বিস্ফোটক হয়ে ওঠে। এদের শোষণ ও নিপীড়নের কারণে ভূমি বিরোধ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এটা ছিল জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য।

জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন ভূমি বিরোধের রাজনীতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই আইন প্রণয়নের পরও ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি ও পূর্বের ন্যায় কৃষকের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে এর প্রধান উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এর জন্য দায়ী ছিল মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের জমিদার তোষণ নীতি। তবে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের একটি অংশ কৃষককে সরকার ও জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়ন হতে রক্ষার জন্য পরিষদের ভিতরে এবং বাইরে অব্যাহতভাবে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। পরিষদের ভিতরে তাদের প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে কৃষকরা জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির পর যতটা উপকৃত হওয়ার আশা করেছিল বাস্তবে তা হয়নি। ১৯৫৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক পরিষদে মহিউদ্দিন আহমদ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন

---

[৮০] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. মুখবন্ধ-ঘ।

[৮১] চৌধুরী, *বাংলাদেশের একটি গ্রাম*, পৃ. ৫৯-৬০।

[৮২] তালুকদার, *জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর যশোর*, পৃ. ২১২ ও ২৪৯।

[৮৩] Siddiqui, *District Gazetteers : Rajshahi*, p. 114.

সম্পর্কে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন যে বরিশাল জেলায় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের পর এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত জেলার দু'টি মহাকুমা যথা পিরোজপুর ও পটুয়াখালীতে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইন কার্যকর করতে সেখানে কৃষকের ওপর ভীষণভাবে অত্যাচার নির্যাতন করা হয়। এমনকি সেখানে জমির খাজনাও মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়াও তিনি বলেন যে পূর্বে যেখানে ৩৫শ' টাকার আয়ের ওপর কৃষি আয়কর ধরা হতো, উক্ত আইন কার্যকর হওয়ার পর সেখানে ২৫শ' টাকার আয়ের ওপর কৃষি আয়কর ধার্য করা হয়েছে। উল্লেখিত আইনের পর মহাজনদের নিকট দুর্ভিক্ষের (১৯৪৬) সময় কৃষকদের কবলা দলিলে বন্ধক রাখা জমি ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই আইনের পর খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্বভোগী বিলুপ্ত করা হয়েছে। পূর্বে ঔপনিবেশিক যুগে বিশেষ করে ফজলুল হকের শাসনকালে ঋণ সালিশী বোর্ড কৃষকদের রক্ষা করলেও উক্ত আইন হওয়ায় সে সুযোগও তারা পায় নি। এর ফলে মহাজনদের নিকট কবলা দলিলে বন্ধক রাখা জমি হারিয়ে কৃষকরা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়েছে। তাই তিনি সরকারের নিকট অনুরোধ করেন যে পূর্ব বাংলায় জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন বা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন সম্পর্কে অনুসন্ধান কমিশন গঠন এবং ঋণ সালিশী বোর্ড গঠনের মাধ্যমে কৃষকদেরকে রক্ষা করতে হবে।[৮৪] একইভাবে কংগ্রেস দলীয় পরিষদ সদস্য আশুতোষ সিনহা উল্লেখিত আইন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ তাদের স্বার্থের জন্য যে জমিদারি প্রথার প্রবর্তন করেছিল সেই প্রথার অবসান হয়েছে ঠিকই কিন্তু যে সমস্ত জমিদারি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং যে এস্টেটগুলো সরকারের পরিচালনায় ছিল সেখানকার কৃষকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছে। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্য ছিল কৃষকের খাজনা কৃষকের কল্যাণেই ব্যয় করা হবে এবং অধিগ্রহণকৃত উদ্বৃত্ত সমস্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা হবে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষকের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন হবে। কিন্তু উক্ত আইন করার ফলে যে সমস্ত জমি সরকারের পরিচালনায় এসেছে সেখানকার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছে। এর একটি অন্যতম কারণ এই যে সেখানে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন যে সরকারি কর্মচারীরাও অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছে। কেউ খাজনা দিতে গেলে তাদের উৎকোচ দিতে হয়। উৎকোচ দিলে কৃষকের নামের তালিকা সংশোধন করা হয় এবং খাজনা আদায় করা হয়। তিনি বলেন যে নানা রকম দুর্নীতি ও অব্যবস্থায় নিমজ্জিত রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিভাগ। উপরন্তু, আর্থিক সমস্যার কারণে খাজনা দিতে না পারলে কৃষকের নামে সার্টিফিকেট জারি করা হয়। জমির মালিক যদি হয় ক, তাহলে খ'র নামে সার্টিফিকেট জারি হয় এবং খ'র সম্পত্তি ক্রোক করে টাকা আদায় করা হয়। তাঁর মতে যদি একটা রেফারেন্ডাম নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে খাসমহল এবং রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এলাকার মানুষ সরকারের পরিচালনা বাতিল করার পক্ষে যাবে। তারা সরকারি অত্যাচার ও অবিচার থেকে মুক্তি চায়।[৮৫] পরিষদের সদস্য এম. এ. কাশেম বলেন যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের বিধানের ত্রুটির কারণে জমিদাররা তাদের একটি পরিবারকে ৩/৪ পরিবারে পরিণত করে নিজেদের জমি নিজেরাই রেখে দিচ্ছেন। তাই তিনি আইনটি ত্রুটি মুক্ত করার প্রস্তাব করেন।[৮৬] অর্থাৎ প্রাদেশিক আইন পরিষদের এসব সদস্যের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে ত্রুটিপূর্ণ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনে কৃষক উপকৃত হয়নি। আরও প্রমাণিত হয় যে ভবিষ্যত ভোট রাজনীতির কথা চিন্তা করে তারা কৃষকদের পক্ষে উল্লেখিত আইনের ত্রুটি দূর করতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং কৃষকদের গুরুত্ব বৃদ্ধির সমান্তরালে ভূমি বিরোধের রাজনীতিতেও নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছিল। সম্ভবত এ কারণেই জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাদের পূর্বতন ধারণা পরিবর্তন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বিলুপ্তি তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে সম্মত হয়েছিল। এ

[৮৪] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XV, No. 2, Third Session, 1956, The 24th to 27th September, 1956 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1957), pp. 63-64.
[৮৫] *Assembly Proceedings*, Vol. XV, No. 2, 1956, pp. 126-127.
[৮৬] *Assembly Proceedings*, Vol. XV, No. 2, 1956, p. 138.

সম্পর্কে খান বাহাদুর মোহাম্মদ মাহমুদ বলেন, "For some time past it had been recognised in the Indian sub-continent that the zamindari system is an anachronism in the present times. Both the Congress and the Muslim League have made the abolition of zamindaries one of the main planks in their political platforms."[87] তবে উল্লেখিত আইনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের অবসানের প্রত্যাশা করা হলেও কার্যত তা হয়নি। কারণ আইনটি বাস্তবায়নই হয়নি। উপরন্তু, আইয়ুব খানের শাসনামলে পরিবার প্রতি জমির সীমা বৃদ্ধি করার কারণে ফল হয় উল্টো। আইয়ুব সরকারের নতুন আইনে জোতদার শ্রেণির ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে শোষণ ও নিপীড়নও বৃদ্ধি পায়। ফলে ভূমি বিরোধ রাজনীতি তথা জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা যোগ হয়। সুতরাং জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন ভূমি বিরোধ হ্রাসের পরিবর্তে বরং এর তীব্রতা বৃদ্ধি করেছিল। এর ফলস্বরূপ ভূমি বিরোধ রাজনীতি চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

৪.৭ ১৯৫১ সালের পূর্ব বাংলা অস্থায়ী অর্ডিন্যান্স বিধিবদ্ধ ও পুনঃবিধিবদ্ধকৃত আইন

১৯৫১ সালে সরকার পূর্ব বাংলা অস্থায়ী অর্ডিন্যান্স বিধিবদ্ধ ও পুনঃবিধিবদ্ধকৃত আইন (The East Bengal Ordinances Temporary Enactment and Re-enactment Act, 1951) প্রণয়ন করে। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষি জমি হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করা। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে "পূর্ব বাংলা অস্থায়ী অর্ডিন্যান্স বিধিবদ্ধ ও পুনঃবিধিবদ্ধকৃত বিল, ১৯৫১" নামে একটি বিল উত্থাপিত হয়। এই বিল উত্থাপনের পর জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলের কয়েকজন সদস্য বিলের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাঁদের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার ভূমি বিরোধের চিত্র ফুটে উঠেছিল। কংগ্রেস দলীয় সদস্য বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী বিলের ওপর আলোচনাকালে অভিযোগ করেন যে বিলটি আইনে পরিণত হলে জমিদারদের ভূমি হস্তান্তর বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি বলেন যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ বা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিল গৃহীত হওয়ার পর সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল বহু ভূসম্পত্তির মালিকদের জমি হস্তান্তর প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। এই অর্ডিন্যান্সের কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে যাদের বেশি সম্পত্তি ছিল তারা জরুরি প্রয়োজনে কিছু জমি হস্তান্তর করতে চাইলেও তা পারে নি। এমনকি যারা প্রয়োজনে মাত্র ১০ বিঘা জমি বিক্রি করতে চায় তাদেরও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। জমিদাররা কৃষকের নিকট থেকে কোনো খাজনা বা সেস আদায় করতে না পারলেও সময়মত সরকারি রাজস্ব দিতে তারা বাধ্য হচ্ছেন। অন্যদিকে সরকারি রাজস্ব ও অন্যান্য সেস দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জমিদার সরকারকে রাজস্ব দিতে না পারায় অনেক স্থলে জমিদারের বডি ওয়ারেন্ট হয়েছে, অনেকের বাড়ি ক্রোক করা হয়েছে, কিন্তু তাদের জমি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের কোনো সুযোগ দেওয়া হয় নি। তাঁর মতে অবশ্য জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের বিধান মতে কালেক্টরের জমি বিক্রির অনুমতি দেওয়ার সুযোগ থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দুরা জমি বিক্রির জন্য তার অনুমতি পায়নি। এই অবস্থায় যদি উক্ত অর্ডিন্যান্সটি নতুন করে আইনে পরিণত করে চালু রাখা হয় তাহলে যেসব হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ পূর্ব বাংলায় রয়েছে তারা ঋণের দায়েই উৎখাত হয়ে যাবে এবং তাদের কোনো প্রকার উপায়ান্তর থাকবে না। তিনি অভিযোগ করেন যে সরকার এভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে উৎখাত করলে ভবিষ্যতে তাদেরকে জমিদারি উচ্ছেদের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। ফলে সরকার লাভবান হবেন।[৮৮]

---

[৮৭] Mahmud, "*The Problem of Land Tenure*", p. 46.

[৮৮] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. V, No. 1, Fifth Session, 1951, The 15th, 16th, 17th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 26th, 27th and 28th February, 1951 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1953), pp. 142-144.

অর্থাৎ তিনি সরকারের ভূমি হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। অপর কংগ্রেস সদস্য প্রভাষ চন্দ্র লাহিড়ী সরকারকে পাক-ভারত চুক্তি[৮৯] স্মরণ করে দিয়ে বলেন যে উক্ত চুক্তিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের জমি বিক্রির কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হলেও এই বিল আইনে পরিণত হলে তারা সেই সুযোগ হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অভিবাসীদের সুবিধার্থে এবং সরকারকে জমিদারদের রাজস্ব দেওয়ার সুবিধার জন্য তিনি এই বিলটি জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেন।[৯০] বস্তুত, তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জমিদারদের জমি হস্তান্তর অব্যাহত রাখা। দিল্লী চুক্তির উল্লেখ করে কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত বিলের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন,

> The Government's intention to introduce a Bill like this was that the Zamindars and persons having large area of land in their possession, at least persons having area of land which exceeds 100 bighas, should be restrained to transfer their land during the passage of the state Acquisition Bill. If you look to the transfer of Agricultural Land Bill, you will find that nobody is entitled now to transfer any quantity of land. You are aware that so far as the Hindus are concerned, there are persons who are agreeable to leave the State. Under the Delhi Pact they should be allowed to transfer all the lands in their possession. If they are not allowed to do so, that amounts to obstructing the implementation of the Delhi Pact.[91]

অর্থাৎ তাঁর মতে এই বিল আইনে পরিণত হলে দিল্লী চুক্তি ব্যাহত হবে। তাঁর বক্তব্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অভিবাসীদের জমি হস্তান্তর বহাল রাখা। পরিষদে কংগ্রেস দলীয় সদস্য মুনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য বিলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে বলেন যে কৃষি ভূমি হস্তান্তর অর্ডিন্যান্স করা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর। ১৯৪৯ সালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ বিলটি উত্থাপিত হয়ে ১৯৫০ সালে তা পাশও হয়েছে। তাঁর মতে যে উদ্দেশ্যে এই অর্ডিন্যান্সটি করা হয়েছিল বর্তমানে আর সে উদ্দেশ্য নেই। কারণ এই অর্ডিন্যান্সে যা ছিল জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনেও তাই আছে। উক্ত আইনে পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা, জনপ্রতি ১০ বিঘা জমি লাভের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও উক্ত আইনে জমি ইচ্ছেমতো ব্যবহার অর্থাৎ মানুষকে জমি হস্তান্তরের অধিকারও দেওয়া হয়েছে। যেহেতু উক্ত আইন প্রণীত হয়েছে সেজন্য অর্ডিন্যান্সটি নতুন করে আইনে পরিণত করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া প্রয়োজনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভূসম্পত্তি বিক্রি করতে দেওয়া না হলে মানুষের ওপর অত্যাচার ও অবিচার করা হবে।[৯২] তাঁর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ভূসম্পত্তি ওপর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। পরিষদের সদস্যদের দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৫১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে বিলটি গৃহীত হয় ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে বিলটি ১৯৫১ সালের পূর্ব বাংলা অস্থায়ী অর্ডিন্যান্স বিধিবদ্ধ ও পুনঃবিধিবদ্ধকৃত আইনে পরিণত হয়। বস্তুত, কংগ্রেস দলীয় সদস্যদের বক্তব্যের মূলে ছিল উল্লেখিত বিলটি আইনে পরিণত হলে জমিদাররা তাদের অধীনে থাকা ১০০ বিঘার অধিক অংশের জমি বিক্রি করে অতিরিক্ত অংশের অর্থ দ্বারা লাভবান হতে পারবে না। অর্থাৎ কৃষি জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত এই বিলের দ্বারা জমিদারদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলেই জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা এর

---

[৮৯] ১৯৫০ সালের ৮ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর মধ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা পাক-ভারত চুক্তি বা দিল্লী চুক্তি বা লিয়াকত-নেহরু চুক্তি হিসেবে পরিচিত। এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে পাকিস্তান ও ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবে, বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্য দেশে উদ্বাস্তু হলে তাদের হারানো বা দখলিকৃত সম্পত্তি ফেরত পাবে এবং প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সাহায্যে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

[৯০] *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 1, 1951, p. 144.

[৯১] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. V, No. 2, Fifth Session, 1951, The 1st, 2nd, 3rd, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th, and 13th March, 1951 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1953), p. 351.

[৯২] *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 1, 1951, pp. 144-145.

বিরোধিতা করেছিলেন। অবশ্য এই বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পরও কৃষি ভূমি হস্তান্তর অব্যাহত ছিল। ১৯৫৩ সালের ১৯ মার্চ পূর্ব বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য প্রভাষ চন্দ্র লাহিড়ী নিজেই স্বীকার করেন যে তাঁর এক আইনজীবী বন্ধুর নিকট থেকে তিনি জেনেছেন যে ঐ বন্ধুর জেলায় যাদের ১০০ বিঘার ওপর জমি আছে তারা সবাই তাদের অতিরিক্ত জমি হস্তান্তর করে দিয়েছে। এ কারণে তিনি বলেন যে জমিদারি উচ্ছেদ আইন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১০০ বিঘার অতিরিক্ত জমি সরকারের নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। তাঁর মতে বিলম্ব হলে জমি হাত ছাড়া হয়ে যাবে এবং এর ফলে সরকার ভূমিহীনদের জমি দিতে পারবে না।[৯৩] বস্তুতপক্ষে, হিন্দুদের জমি হস্তান্তরের বা বিক্রয়ের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে কিছু রাজনীতিবিদ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের বিরোধিতা করেন অথচ তারা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ রোধের পরিবর্তে এর ভিন্ন সমাধানের নীতির বা পথের যুক্তি তুলে ধরতে পারতেন। সুতরাং কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা মূলত জমিদারদের সুবিধার্থে উক্ত বিলের বিরোধিতা করেছিলেন। তবে বিলটি আইনে পরিণত হলেও কৃষি জমি হস্তান্তর অব্যাহত ছিল যে কারণে ভূমি বিরোধ হ্রাস পায় নি।

৪.৮ ১৯৫১ সালের কোর্ট অব ওয়ার্ডস (পূর্ব বাংলা সংশোধন) আইন

১৯৫১ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডস (পূর্ব বাংলা সংশোধন) আইন [The Court of Wards (East Bengal Amendment) Act, 1951] প্রণীত হয়। এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকার কর্তৃক জমিদারি ব্যবস্থাপনা করা। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পরিষদে "কোর্ট অব ওয়ার্ডস (পূর্ব বাংলা সংশোধন) বিল, ১৯৫১" নামে একটি বিলটি উত্থাপিত হয়। বিলটি পরিষদে উত্থাপন করে তৎকালীন অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী তোফাজ্জল আলী বলেন যে ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে সরকার তা কার্যকর করেছেন। আইন পরিষদের কোনো অধিবেশন না বসায় তখন অর্ডিন্যান্সটিকে আইনে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। ফলে এটি আইনে পরিণত করার জন্যই পরিষদে বিল আকারে বর্তমানে উত্থাপন করা হয়েছে। তিনি উত্থাপিত বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "Applications are not barred and Government merely take powers to take in estates even without application."[94] কিন্তু সরকারের এই উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করেন পরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা। তাঁরা জমিদারি সরকারি ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেওয়ার বিরোধিতা করেন। কংগ্রেস সদস্য জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য বিলের বিরোধিতা করে বলেন এটি সত্য নয় যে, অনেক এস্টেটে ব্যবস্থাপনা ত্রুটির কারণে কৃষকের ওপর উৎপীড়ন হচ্ছে তাই সরকার ঐসব এস্টেটগুলো কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে নিয়ে নিয়েছিল। তাঁর মতে বরং সরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকা এস্টেটগুলোর ব্যবস্থাপনা খারাপ হয়েছিল বলে সেখানে কৃষকের ওপর শোষণ ও নিপীড়নও বেশি হয়েছিল। এমনকি সেখানকার ম্যানেজাররা অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন যে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর পাবনা জেলায় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের এক এস্টেটের ম্যানেজার প্রায় ১৭ হাজার টাকা আত্মসাত করেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। আবার ঢাকা জেলায় কতকগুলো জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে সেখানকার জমিদাররা বিগত দেড় বছরে কোনো অর্থ পায়নি। এমনকি অনেক সময় জমিদাররা কৃষকদের দুঃসময়ে খাজনা মাফ করে দিতেন, কিন্তু কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্মচারীরা খাজনা আদায়ের জন্য নির্দয়ভাবে কৃষকদের উৎপীড়ন করে। তাঁর মতে সরকারের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের শামিল। একটা স্বাধীন রাষ্ট্রে নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা এবং নাগরিকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা রাষ্ট্রের জন্য শুভ নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর

---

[93] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. X, No. 1, Tenth Session, 25th, 26th and 27th February, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 14th, 16th, 17th, 18th, 19th and 20th March, 1953 (Dacca : East Bengal Government Press, 1954), p. 475.
[৯৪] *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 1, 1951, pp. 288 and 294.

মতে এই বিলের মাধ্যমে সরকারের ফ্যাসিবাদের নগ্নরূপ আত্মপ্রকাশ করেছিল।[৯৫] জমিদারদের জমিদারি অধিগ্রহণ যে কোনো মূল্যে প্রতিরোধ করতেই তিনি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। একইভাবে বিলের বিরোধিতা করে অপর কংগ্রেস সদস্য প্রভাষ চন্দ্র লাহিড়ী বলেন যে এই বিলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জোরপূর্বক জমিদারদের জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অন্তর্ভুক্তকরণ। তাঁর মতে জমিদারদের অধীনে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্য থেকে দু'-চার'শ ব্যক্তি অভিযোগ করলেই জমিদারি অব্যবস্থাপনার অভিযোগ যৌক্তিক হবে না। মূলত তিনি সরকারের হাতে জমিদারি হস্তান্তরের বিরোধিতা করেন।[৯৬] কংগ্রেস সদস্য বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী বিলের বিরোধিতা করে বলেন যে সরকারের ধারণা হয়েছে জমিদারদের অধীন কৃষকরা অত্যাচারিত হচ্ছে। তাঁর মতে আদালতেই অসংখ্য প্রমাণ আছে জমিদার তার জমি দখলে নিতে পারছেন না। এমনকি রাজস্ব বিভাগেও প্রমাণ আছে কৃষকরা জোরপূর্বক জমিদারের জমি দখল করে রেখেছে। জমিদার প্রাপ্য রাজস্বও কৃষকের নিকট হতে আদায় করতে পারছেন না।[৯৭] অর্থাৎ তিনি তাঁর বক্তব্যে জমিদার কর্তৃক কৃষক নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং এ কারণে বিলটিও অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেন। অপর কংগ্রেস সদস্য মুনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের মতে জমিদার নাবালক বা নারী হলে বা এস্টেটের মালিক নিজে অযোগ্য বিবেচিত হলে তার জমিদারি রক্ষার উদ্দেশ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডস গঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ পূর্বে উক্ত মালিকরা সরকারকে জমিদারি রক্ষক নিযুক্ত করতেন। কিন্তু বর্তমানে এর সঙ্গে আরেকটি শর্ত যুক্ত হয়েছে যে কৃষকের ওপর অত্যাচার হলে জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যাবে। তাঁর মতে জমিদার কোনো কিছু বেআইনি করলে তার প্রতিকারের অন্য আইন আছে। জমিদার কৃষকের প্রতি কোনো প্রকার খারাপ ব্যবহার করলে কৃষক বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী তার প্রতিকার পেতে পারে। জমিদারের কর্মচারী খাজনা নিয়ে রশিদ না দিলে তার জন্য জমিদারও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেই কর্মচারীর বিরুদ্ধে কৃষক পেনাল কোড অনুযায়ী মামলা করতে পারে। তিনি উচ্চকিত হয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে এতো আইন থাকা সত্ত্বেও সরকার কেন এই আইনের প্রয়োজন মনে করেন? ভট্টাচার্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন যে জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে গেলেও অব্যবস্থাপনা হতে পারে। যেমন ১৯১৭ সাল হতে ধানকুড়া এস্টেটের জমিদার একটা স্কুলে মাসিক ২০০ টাকা করে সাহায্য করছেন, কিন্তু তাঁর এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যাওয়ার পর থেকে উক্ত স্কুলে আর কোনো অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়নি। এস্টেটের স্বত্বাধিকারী স্কুলে অর্থ দিতে নিষেধ করেননি। এমনকি স্কুলের সেক্রেটারি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে অর্থের জন্য অনেকবার অনুরোধ করেছেন কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তিনি বলেন যে ধানকুড়া কাচারীতে প্রায় ২০ হাজার টাকা বার্ষিক আদায় হয়। কিন্তু কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অব্যবস্থাপনার ফলে উক্ত স্কুলের অর্থ সাহায্য বন্ধ হয়েছে।[৯৮] অর্থাৎ তাঁর মতে কোর্ট অব ওয়ার্ডসেও অব্যবস্থাপনা হয়। ফলে এই অভিযোগে জমিদারি সরকারি ব্যবস্থাপনায় নেওয়া উচিত নয়। একই দলের সদস্য জোতিন্দ্র নাথ ভদ্র বলেন যে পূর্বে জমিদার অর্থ ব্যয় করে তার জামদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অন্তর্ভুক্ত করতেন। সরকার তখন সহজে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব নিতে রাজি হতেন না। তাঁর মতে কালপরিক্রমায় বর্তমানে বিপরীতটা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন যে জমিদারি সরকারের অধিগ্রহণে বরং কৃষকের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন বৃদ্ধি পায়। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন যে জমিদারের ব্যবস্থাপনায় যেসব জমিদারির আদায় ছিল ৫ হাজার টাকা, সেই একই জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যাওয়ার পর খাজনা বৃদ্ধির কারণে ১০ হাজার টাকা আদায় হয়েছে। ফলে সেখানে মানুষের দুদর্শার শেষ নেই। তাঁর মতে স্বাধীন দেশে জমিদারের কর্মচারীরা কৃষকের ওপর অত্যাচার করার সাহস করে না; বরং তারা শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হচ্ছে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্মচারী দ্বারা। তারা সরকারি কর্মকর্তা বিধায় কৃষকের ওপর নির্ভয়ে অত্যাচার করে। শুধু

[৯৫] *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 1, 1951, pp. 278-280.
[৯৬] *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 1, 1951, pp. 280-281.
[৯৭] *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 1, 1951, pp. 283-284.
[৯৮] *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 1, 1951, pp. 285-286.

কৃষক নয় বরং জমিদাররাও অত্যাচারিত হচ্ছে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে।[৯৯] কংগ্রেস সদস্যদের বক্তব্যের মধ্যে যুক্তি ছিল। কিন্তু তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে কৃষকের স্বার্থ ফুটে উঠলেও তাঁরা মূলত জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় জমিদারদের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছিলেন।

অন্যদিকে মুসলিম লীগ তথা সরকার দলীয় সদস্য মীর আহমেদ আলীর যুক্তি ছিল সেইসব সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেসব সম্পত্তির মালিক শিশু, পাগল, বিধবা এবং নিজের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা করার মতো যার সক্ষমতা থাকে না। এ সময় পরিষদ সদস্য খয়রাত হোসেন ঢাকার নওয়াব বাহাদুরের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। মীর আহমেদ আলী আরও যুক্তি দেন যে যদি দেখা যায় এস্টেট ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং খাজনা আদায় ব্যহত হচ্ছে তবে সেইসব এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আনা হয়। তাঁর মতে সরকারের কয়েকটি বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন যে কোন কোন এস্টেটের জমিদাররা দুর্নীতি পরায়ণ, কোন কোন জমিদার কর্তব্যে অবহেলা করছেন বা কোন কোন জমিদার কৃষকদেরকে অন্যায়ভাবে শোষণ ও নিপীড়ন করছেন? যেসব এস্টেটের দোষ-ত্রুটি প্রমাণিত হবে সেসব এস্টেট অবিলম্বে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনস্থ করা প্রাসঙ্গিক হবে। বিভিন্ন দেশে এই ব্যবস্থা আছে যে কোনো এস্টেটের কর্মকান্ডে দুর্নীতি প্রবেশ করলে সেসব এস্টেট সরকার অধিগ্রহণ করে।[১০০] অর্থাৎ তিনি জমিদারদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণ সাপেক্ষে জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে নেওয়ার পক্ষে ছিলেন। সরকারি দলের সদস্য হয়েও তাঁর বক্তব্য ছিল যুক্তিনির্ভর। তবে তিনি প্রকারান্তরে জমিদারি সরকারি ব্যবস্থাপনার পক্ষে ছিলেন।

যাহোক, দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ১৯৫১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতের ভিত্তিতে বিলটি গৃহীত হয়।[১০১] অতঃপর আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিলটি ১৯৫১ সালের কোর্ট অব ওয়ার্ডস (পূর্ব বাংলা সংশোধন) আইনে পরিণত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের শাসনামলে পরিষদে উত্থাপিত ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ করে জমিদারি সংক্রান্ত যে কোনো বিলের ওপর আলোচনায় একদিকে জমিদার সমর্থিত কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা বিলের বিরোধিতা করতেন এবং অন্যদিকে পরিষদে উত্থাপিত যে কোনো বিলের ওপর আলোচনায় লীগ সদস্যরা বিলের পক্ষে যুক্তি দিতেন। এমনকি জমিদার, জমিদারি, কৃষক স্বার্থ ও ভূমি সম্পর্কিত যে কোনো বিল উত্থাপিত হলেই কার্যত কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা জনমত যাচাইয়ের নামে বিল পাশে যথা সম্ভব বিলম্ব করাতে চেষ্টা করতেন। এই বিলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ছিল। পরিষদে উত্থাপিত উক্ত বিলের ওপর সদস্যদের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে কংগ্রেস দলীয় সদস্যদের বক্তব্যের মধ্যে যুক্তি ছিল ঠিকই কিন্তু তারা একটি বিশেষ শ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। তবে এটাও ঠিক যে এই বিল আইনে পরিণত হওয়ার পর কৃষকরা জমিদারদের হাত থেকে রেহাই পেলেও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্মচারীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তারা সরকারি কর্মচারীদের হাতে শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়েছিল। এ কারণে ভূমি বিরোধও হ্রাস পায়নি। কেবলমাত্র ভূমি বিরোধের চরিত্রে পরিবর্তন হয়েছিল। এবার জমিদারদের পরিবর্তে সরকারি কর্মচারীরা কৃষকদের প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

৪.৯ ১৯৫১ সালের পূর্ব বাংলা স্থানান্তরিত ব্যক্তির (স্থাবর সম্পত্তি প্রশাসন) আইন

১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলা স্থানান্তরিত ব্যক্তির (স্থাবর সম্পত্তি প্রশাসন) আইন [The East Bengal Evacuees (Administration of Immovable Property) Act, 1951] প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯৫০

৯৯ *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 1, 1951, pp. 287-288.
১০০ *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 1, 1951, pp. 284-285.
১০১ *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 1, 1951, p. 295.

সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত জমিদাররা যেন তাদের জমিদারির অংশ বিশেষ বিক্রির সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালের ১০ মার্চ পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে "পূর্ব বাংলা স্থানান্তরিত ব্যক্তির (স্থাবর সম্পত্তি প্রশাসন) বিল, ১৯৫১" নামে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য মনোরঞ্জন ধর বলেন যে এই আইন প্রণয়নের পর কোনো ব্যক্তি ১০ বিঘার বেশি জমি হস্তান্তর করতে পারবে না। ফলে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক যারা ভারতে চলে যেতে চায় তাদের সম্পত্তি বিক্রি করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে।[১০২] তাঁর বক্তব্য সত্য হলেও মূলত বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল জমিদাররা যেন তাদের অতিরিক্ত জমি বিক্রির সুযোগ লাভ করে। এ কারণে ধরের বক্তব্যের জবাবে তৎকালীন অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী তোফাজ্জল আলী ভূমি রাজস্ব কমিশনের প্রদত্ত পরিসংখ্যানের উল্লেখ করে বলেন যে পূর্ব বাংলার ৭০% কৃষকের অধীনে পরিবার প্রতি ৫ একরের বেশি জমি নেই। এছাড়াও তিনি বলেন যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনে পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিক হওয়া যৌক্তিক হয়েছে। এছাড়াও ১০ বিঘার ওপরে জমি বিক্রি করতে পারবে যে কেউ, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মহাকুমা কর্মকর্তার অনুমোদন নিতে হবে। উপরন্তু, তিনি বলেন যে ১০ বিঘা পর্যন্ত জমি হস্তান্তর সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয় নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। তিনি দিল্লী চুক্তির উল্লেখ করে মন্তব্য করেন,

> The Delhi Pact is not being implemented here-that the existing law of the lands is applied equally in every case and there should be no communal colour whatsever. The children of the land, whether they be Muslims, Christians, Hindus or Buddhists, are treated in the same manner under the provisions of the Ordinance for controlling and transfer of agricultural land and no communal distraction is made in the administration of the law. But, with regard to cases where certain persons who want sell their last property covering lands in excess of ten standard bighas and want to migrate from this Province, they are entitled to apply to the District Magistrates or the Subdivisional Officers and I have no doubt that if the officers are satisfied that these are their last property to be sold and it is not merely a camouflage, they will certainly give such permission. With regard to this aspect of the question I may tell my honourable friends opposite that the Hon'ble Prime Minister of East Bengal did agree to see that the migrants of such description get relief if they apply for such permission. No specific case has yet been brought to the notice of the Government whether any migrant wanted to sell lands as the last property for the purpose of migrating from this province.[103]

উল্লেখিত বিলের ওপর পরিষদ সদস্যদের দীর্ঘ আলোচনা শেষে ১৯৫১ সালের ১০ মার্চ পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে বিলটি গৃহীত হয় এবং আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে তা ১৯৫১ সালের পূর্ব বাংলা স্থানান্তরিত ব্যক্তির (স্থাবর সম্পত্তি প্রশাসন) আইনে পরিণত হয়। এই আইনের পরও জমিদাররা তাদের জমিদারির অংশ বিশেষ বিক্রির সুযোগ গ্রহণ করেছিল। সুতরাং পূর্ব বাংলায় ভূমি নীতি কৌশলে পরিবর্তন হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি এবং এর দ্বারা কৃষক তথা জনসাধারণ উপকৃত হয়নি।

৪.১০ ১৯৫১ সালের পূর্ব বাংলা কৃষি ভূমি হস্তান্তর আইন

১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলা কৃষি ভূমি হস্তান্তর আইন (The East Bengal Transfer of Agricultural Land Act, 1951) প্রণীত হয়। এই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষি ভূমি হস্তান্তরের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ

---

[১০২] *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 2, 1951, pp. 360-361.
[১০৩] *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 2, 1951, pp. 361-363.

করা। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে "পূর্ব বাংলা কৃষি ভূমি হস্তান্তর, ১৯৪৯" নামে একটি বিল উত্থাপিত হয়। কিন্তু জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পূর্বে বিলটি আইনে পরিণত করা সরকার সমীচীন মনে করে নি। সরকারের এই বিবেচনায় জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পর ১৯৫১ সালের ২০ অক্টোবর পুনরায় বিলটি প্রাদেশিক আইন পরিষদে উত্থাপন করা হয়। বিলটি পরিষদে উত্থাপনের পর কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ দলের সদস্যদের ভূমি বিতর্কের মাধ্যমে ভূমি বিরোধের রাজনীতির একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছিল। পরিষদে কংগ্রেস দলীয় সদস্য পুর্ণেন্দু কিশোর সেন গুপ্ত বিলের ওপর আলোচনার শুরুতেই বলেন যে কৃষি জমি হস্তান্তর সম্পর্কিত এই বিলের মধ্যে ৩ নং ধারা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিলের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে ১০ বিঘার ওপর কৃষি জমি হস্তান্তর করতে হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা কালেক্টরের অনুমতি ছাড়া কেউ জমি হস্তান্তর করতে পারবে না। অর্থাৎ সরকার মূলত জমি হস্তান্তরের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতেই বিলটি উত্থাপন করেছে। তিনি যুক্তি তোলেন যে এটি সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধা আরোপের আইন-এরূপ নামকরণ করলেই এর ভিতরের বিষয়টা সহজে বোঝা যেত। তাঁর মতে উল্লেখিত বিলের নামটি বিভ্রান্তিকর। তিনি বিলের ওপর চারটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে সরকারকে এর যে কোনোটি গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তিনি তাঁর প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবে বলেন যে কালেক্টরের নিকট জমি হস্তান্তরের অনুমতির জন্য প্রদত্ত দরখাস্ত অনুমতি বা বাতিলের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময় নির্দেশ করতে হবে। তিনি ৩০ দিনের মধ্যে এটা অনুমতি বা বাতিলের প্রস্তাব দেন। কারণ জমি হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে তারপর অনুমতির জন্য আবেদন করা হয়। অনুমতি প্রলম্বিত হলে জমি হস্তান্তর বিলম্ব হবে। অনেক সময় মৌসুমের সমাপ্তি তাকে পুনরায় এক বছর জমি হস্তান্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। অনুমতি বিলম্ব হলে অগ্রীম অর্থ প্রদান না করার কারণে অনেক সময় জমি হস্তান্তর ঠিক হয়ে গেলেও জমি হস্তান্তর হয় না। এর ফলে জমি হস্তান্তরকারী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটা সময় সীমা নির্ধারণ না হলে এর উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য তিনি ৩০ দিনের সময় সীমা করার প্রস্তাব দেন। তাঁর দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয় যে ১০০ বিঘার বেশি জমি কারও থাকলে সে অবাধ হস্তান্তর করতে পারবে না, কিন্তু ১০০ বিঘার কম জমি থাকলে সে তার জমি বা জমির অংশ ইচ্ছেমতো হস্তান্তর করতে পারবে। তাঁর তৃতীয় সংশোধনী প্রস্তাব ছিল জনসাধারণ ১০ বিঘার স্থলে বার্ষিক ২০ বিঘা জমি হস্তান্তর করার অধিকার পাবে। তাঁর চতুর্থ সংশোধনী প্রস্তাব ছিল ৩০ বিঘার ওপর জমির মালিকের নিকট কেউ জমি হস্তান্তর করতে পারবে না। এর চেয়ে কম জমির মালিকের নিকট জমি হস্তান্তর করতে পারবে। তাঁর মতে এই বিলের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জমিদারদের অতিরিক্ত জমি বিক্রিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে উক্ত অতিরিক্ত জমি সরকার রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের মাধ্যমে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা। একদিকে ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং অন্যদিকে যাদের অর্থনৈতিক জোত নেই তাদের হোল্ডিং যেন অর্থনৈতিক জোতে পরিণত হয় তার জন্য এই বিলটি উত্থাপিত হয়েছে। তাঁর মতে এ দু'টির একটিও সরকার কার্যকর করতে পারবে না। কারণ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনে ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বণ্টনের কোনো স্কীম নেই। তাই তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলে ৩০ বিঘার কম জমির মালিকরা জমি ক্রয় করতে পারবে। তিনি ৩০ বিঘাকে সর্বনিম্ন জোত ধরেছেন। কারণ ৩০ বিঘা হলে তাকে একটা অর্থনৈতিক জোত বলা চলে। ৩০ বিঘা সর্বনিম্ন করলে সরকারের উদ্দেশ্য পূরণ হবে।[১০৮] অর্থাৎ গুপ্তের বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং ভূমি হস্তান্তর সহজকরণে সরকারকে পরামর্শ দান। বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে কংগ্রেস সদস্য জোতিন্দ্র নাথ ভদ্র সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন যে সরকারি ভূমি নীতির কারণে পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকরী হওয়ার পূর্বে জমিদারদের জমি হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই বিল উত্থাপন করা

[১০৮] *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, pp. 51, 81-83 and 115.

হয়েছিল। তাঁর মতে ১৯৪৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর হতে এটি অর্ডিন্যান্স হিসেবে কার্যকর আছে। দীর্ঘদিন অর্ডিন্যান্স আকারে কার্যকর থাকার পর আরও প্রলম্বিত করার উদ্দেশ্যে এটি পূর্ণাঙ্গ আইনে রূপদানের উদ্দেশ্যে বিল আকারে উত্থাপিত হয়েছে। তিনি ১৯৪৮ হতে ১৯৫১ পর্যন্ত ৩ বছরে বিক্রীত জমি এই আইনের বাইরে রাখতে সরকারকে অনুরোধ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে যদিও বিলটি জমিদারদের জমি হস্তান্তর বন্ধ করতে উত্থাপন করা হয়েছে কিন্তু বিলে জমিদারদের পাশাপাশি কৃষক এবং অধীনস্থ কৃষকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদেরকেও ১০ বিঘা জমি হস্তান্তর থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন যে কৃষকরা প্রয়োজনবোধে কিছু জমি হস্তান্তর করে উপকৃত হয়। ফলে তাদেরকে এই সুবিধা হতে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। তিনি প্রস্তাব করেন যে কৃষকদেরকে উল্লেখিত বিলে ১০ বিঘা জমি হস্তান্তর নীতি বহির্ভূত রাখা উচিত। কারণ কৃষকের ওপর জমি হস্তান্তরের বিধিনিষেধ বড় প্রশ্ন। তাঁর মতে দেশের শতকরা ৯৯ জন কৃষক। কৃষকদের এই ১০ বিঘার আওতা মুক্ত রেখে তাদের জমি হস্তান্তরের সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি সরকারের নিকট অনুরোধ করেন। তাঁর মতে ১০ বিঘার ওপর জমি বিক্রি বা উপহার অর্থাৎ সর্বপ্রকার হস্তান্তরের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। তিনি বলেন যে তিনি সাম্যবাদের পক্ষপাতী নন। সাম্যবাদীদের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিছু থাকবে না, এটা তিনি বিশ্বাস করেন না। তাই তিনি সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে বলেন যে এই বিলে ১০ বিঘার পরিবর্তে ২০ বিঘা জমি পর্যন্ত হস্তান্তর করার সুযোগ দিতে হবে। তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবের যক্তি ছিল যে প্রথমত, হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই বিলের প্রতিবাদ করছে; দ্বিতীয়ত, নিত্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং তৃতীয়ত, সমস্ত পূর্ব বাংলাকে এক হিসেবে ধরাও উচিত হবে না। সকল স্থানে জমির মূল্যেও পার্থক্য আছে। যেমন ঢাকা জেলায় ১ বিঘা জমির মূল্য ন্যূনপক্ষে ৫-৭ হাজার টাকা অথচ ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে ১ বিঘা জমির মূল্য ৭-৮ শত টাকা এবং তাঁর নিজের পরিষদীয় এলাকা সিলেটের সুনামগঞ্জে ১ বিঘা জমির মূল্য মাত্র ১০০-১৫০ টাকার বেশি নয়। তিনি আরও বলেন যে তিনি মূলত সিলেট জেলার মানুষের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে ১০ বিঘার স্থলে ২০ বিঘার প্রস্তাব করছেন।[১০৫] তবে ভদ্র কৃষকদের কথা উল্লেখ করলেও তাঁর বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা।

উল্লেখিত বিলের ওপর দু'টি সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে পরিষদের সদস্য হারাণ চন্দ্র ঘোষ চৌধুরী দাবি করেন যে তাঁর দেওয়া প্রস্তাব গ্রহণ করলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক তথা জনসাধারণের অনেক অসুবিধা দূর হবে। তিনি তাঁর প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবে উল্লেখ করেন যে বিলের ৪ নং ধারার ২ নং উপধারায় বলা হয়েছে কালেক্টর যদি সন্তুষ্ট হন যে দরখাস্তকারীর জমি হস্তান্তর করার প্রয়োজন আছে তাহলে তিনি তাকে জমি হস্তান্তরের অনুমতি দেবেন, আর তিনি অসন্তুষ্ট হলে বাতিল করে দিবেন। কিন্তু পরিবারের কারও শিক্ষা, চিকিৎসা বা অন্য কোনো জরুরি প্রয়োজনের সময় তার জমি হস্তান্তরের দরখাস্ত ঝুঁলিয়ে রাখা হলে দরখাস্তকারীর গুরুতর ক্ষতি হয়। এজন্য বিলে দরখাস্ত পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে দরখস্তকারীর অনুকূলে অনুমতি বা বাতিল করার বিধান বিলে উল্লেখ করতে হবে। তাঁর দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয় যে কৃষককে দশ বছরের অধিক সময়ের জন্য জমি ভাড়া দেওয়ার অধিকার দিতে হবে এবং হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বন্ধক বা মর্টগেজ কথাটি বিল থেকে বাতিল করতে হবে।[১০৬] তাঁর বক্তব্য ছিল যুক্তিনির্ভর। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্য হওয়ায় সরকার তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। কংগ্রেস দলীয় সদস্য সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত বিলের বিরোধিতা করে বলেন যে এটি কৃষি জমি হস্তান্তর বিল, কিন্তু তার বিপরীত কাজ করার উদ্দেশ্যে সরকার বিলটি পরিষদে উত্থাপন করেছে। তাঁর মতে বিলের মূল উদ্দেশ্যে ছিল কৃষি জমি হস্তান্তরের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা।

[১০৫] *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, pp. 53-63 and 91-92.
[১০৬] *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, pp. 61, 114 and 131.

তিনি বলেন যে যাদের বেশি জমি আছে এবং যাদের অর্থ সম্পদ বেশি আছে, তারা হয় অর্থ দিয়ে না হয় আইনজীবী বা প্রতিপত্তিশালীকে ধরে কালেক্টরের অনুমতি নিয়ে সম্পত্তি বিক্রি করবে। অন্যদিকে সম্পত্তি ক্রয় করবে যার বহু সম্পত্তি একত্রে ক্রয়ের সঙ্গতি আছে। তাঁর মতে ইতোমধ্যে প্রণীত রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনে বলা হয়েছে যে এক পরিবারে ১০০ বিঘার বেশি জমি রাখতে পারবে না, কিন্তু যদি পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি থাকে তাহলে জনপ্রতি ১০ বিঘা হিসাবে জমি রাখতে পারবে। সাধারণত সম্পত্তি বিক্রি করে তারাই যাদের বেশি সম্পত্তি আছে এবং ক্রয় করে তারাই যাদের সামান্য জমি আছে। যারা ভূমিহীন অথবা যাদের সামান্য জমি আছে তারা ২-১ বিঘা করে সম্পত্তি বৃদ্ধি করবে তা এই আইনে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। তাঁর মতে পরিষদ সদস্য বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী ইতোপূর্বে যথার্থই বলেছেন যে জমি ভাড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মানুষের বহু অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। গুপ্তের মতে নিজের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ জমি ভাড়া করবে সে পথও বন্ধ হয়েছে। যদি আত্মীয়স্বজনদের কাছে জমি বণ্টনে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় বা ভাড়া করতে হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটর অনুমতি নিতে হয় তাহলে মানুষের নাগরিক অধিকারকে খর্ব করা হয়। তাঁর মতে যারা সামান্য কিছু জমি বিক্রি করবে তাদের ওপর এই প্রতিবন্ধকতা না রাখাই উচিত। জমি টুকরা টুকরা করে বিক্রি করতে পারলে বিক্রেতার লাভ কিছু বেশি হয় এবং ছোট ছোট জমি ক্রয়ে দরিদ্রদের পক্ষে সুবিধা হয়, তা না হলে তারা একসঙ্গে বেশি অর্থ সঞ্চয় করে বেশি জমি ক্রয় করতে পারবে না। অভিবাসীরা আত্মীয়স্বজনদের নিকট জমি উপহার বা ভাড়া দিলে ভবিষ্যতে তাদের কাছে সাহায্য পাওয়ার সুবিধা হয়। তিনি তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রীর সমালোচনা করে বলেন যে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইন প্রণয়নের সময় তাঁর মাথায় বিপ্লবের ঝোঁক এসেছিল। তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিপ্লবের উল্লেখ করেছেন। তিনি দেশে বিপ্লবের পর বিপ্লব করতে চাচ্ছেন। তিনি তাঁর কথার প্রমাণ হিসেবে বিলের ৯ (১) নং ধারার উল্লেখ করে বলেন যে এই ধারায় বলা হয়েছে, "Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, on and from the date of publication of a notification under sub-section (1) of section 3, no rent-receiver specified in such notification shall, except with the previous permission of a prescribed authority, transfer his rights and interest in any estate, taluk or tenure, to which such notification relates, by private sale, gift, will, mortgage, lease or any contract or agreement, or transfer any land in his khas possession by any such means." অর্থাৎ এই বিলের বিধি অনুযায়ী জমির সকল ধরনের হস্তান্তর বন্ধ থাকবে। তাঁর মতে বিলের এই ৯ (১) নং ধারায় বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে সরকার চেয়েছিলেন জমিদার বা বেশি জমির মালিকদের জমি হস্তান্তর বন্ধ করতে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষকরা। পরিষদ সদস্য মুনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে ১০০ বিঘার ওপর জমির মালিক তাঁর ইউনিয়নে নেই। গুপ্ত দাবি করেন যে খোঁজ করলে দেখা যাবে যে প্রায় সব ইউনিয়নেই এই একই অবস্থা। কাজেই সরকার বড় জমিদারদের জমি বিক্রি বন্ধ করাতে মূল আঘাত এসে পড়লো দরিদ্র কৃষকের ওপর। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনের ৮৮ ধারায় বলা হয়েছে, "The holding of a raiyat or a share or portion thereof shall, subject to the provisions of this Act, be capable of being transferred by him in the same manner and to the same extent as his other immovable property." সুতরাং এক হাতে অধিকার দিয়ে আরেক হাতে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কৃষককে ক্ষমতা দিয়ে তা আবার কেড়ে নেওয়া উচিত হবে না। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইন ও কৃষি জমি হস্তান্তর আইন উভয় আইনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখা উচিত ছিল। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনের ৯০ ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি এই আইন প্রচলিত হওয়ার পর সম্পত্তি খরিদ করতে পারবে সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা পর্যন্ত। তাঁর মতে আইনে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল যে যার কম জমি আছে সে ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমি ক্রয় করতে

পারবে। অর্থাৎ ১০০ বিঘার বেশি পরিমাণ জমি উত্তরাধিকারসূত্রে বা ক্রয়সূত্রে কেউ রাখতে পারবে না। তিনি বলেন যে তা না করে যারা দরিদ্র-জমি বিক্রি করে সামান্য অর্থ সঞ্চয় করবে-তাদের ওপর যত বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাঁর মতে দরিদ্রদের ছেলেমেয়ের চিকিৎসার জন্য জমি বিক্রি করতে হয়। একজন জমি বিক্রির জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রের নিকট হতে অনুমতি পেতে অনেক বেশি সময় লাগে যে কারণে দরিদ্রদের অসুস্থ সন্তান মৃত্যুবরণ করে। তিনি বলেন যে বিলের ৬ নং ধারার ৩ নং উপধারাতে বাজেয়াপ্ত জমি ভূমিহীনদের নামে ট্রাস্টি হওয়ার পর ভূমি কি করা হবে তা সুস্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। ভূমিটা ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা হবে একথা স্পষ্ট করে কোথাও বলা হয়নি। হয়ত এই জমি ভূমিহীনকে না দিয়ে তাতে কোনো মন্ত্রীর বাড়িও তৈরি হতে পারে। বিলে বলা উচিত ছিল যে ভূমি অধিগ্রহণের পর সরকারের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার পরপরই তার নতুন ট্রাস্টি ঠিক হবে। তাঁর ধারণা যে এই শর্ত ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই লিখিত হয় নি। সে কারণে জন্য তিনি জানতে চান যে এই ভূমির কি হবে? এছাড়াও ৬ (১) ধারায় আছে ১০ বিঘার বেশি জমি হস্তান্তর করা হলে হস্তান্তরকারীর জরিমানা হবে ও হস্তান্তরকারীর ভূমিও বাজেয়াপ্ত হবে। তিনি মনে করেন যে ভূমি বাজেয়াপ্ত হলে জরিমানার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া অভিবাসীরা জমি হস্তান্তর করে হিলি বন্দর পার হয়ে ভারতে চলে যাওয়ার পর তাদের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করাও অসম্ভব। তিনি অভিযোগ করেন যে অভিবাসীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়ে দেশে অবস্থানরত ক্রেতার জমিটা সরকার বাজেয়াপ্ত করবেন। ক্রয়কারীর জমি সরকার নিয়ে নিবেন কিন্তু হস্তান্তরকারীর নিকট থেকে জরিমানার টাকা আদায় করে ক্রয়কারীকে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কিনা সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে বিলে বলা হয়নি।[১০৭] গুপ্তের অভিবাসী সম্পর্কিত বক্তব্যের জবাবে তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী তোফাজ্জল আলী বলেন, "Government have not been guided by any communal consideration in the matter of providing penalty for violation of this law."[108] এসময় পরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য মনোরঞ্জন ধর বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে বলেন, "A person may be penalised, the collector has been given wide powers to penalise a man without giving him any hearing or proper investigation of any case but the other side should be given an opportunity to represent his case also so that the Collector may have a complete picture of both the sides of the shield in coming to a decision in the interest of justice and fair play. "[109] সরকারের ভূমি নীতি ও কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় মনোরঞ্জন ধরের সংশোধনী প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়।[১১০] অর্থাৎ বিরোধী দলের কোনো সদস্যের উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাব সরকারের নীতি কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই কেবলমাত্র সরকার তা গ্রহণ করতো।

উল্লেখিত বিলের বিরোধিতা করে কংগ্রেস সদস্য মুনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য বলেন যে এই বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যখন রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিল উত্থাপন করা হয়েছিল তখন যাদের প্রচুর জমি ছিল বিশেষ করে যাদের ১০০ বিঘার অতিরিক্ত জমি ছিল তারা তখন তাদের জমি বিক্রি বা পত্তন করতে শুরু করেছিল। তাদের সেই অতিরিক্ত জমি হস্তান্তরে সরকার তখন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অর্থাৎ অতিরিক্ত জমি পত্তন করে অর্থ লাভ বন্ধ করতেই হস্তান্তর আইন করা হয়েছিল। বস্তুত, বৃহৎ জমিদারগণ যখন অনুধাবন করবেন যে তারা জমিদারি হারাবেন, তখন তারা কিছু আয় বৃদ্ধি করে নিতে চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে সরকারেরও সদুদ্দেশ্য ছিল যে ভূমিহীনদের জমি দিবেন। অর্থাৎ যার ১০০ বিঘার অতিরিক্ত জমি আছে ভবিষ্যতে সেগুলো ভূমিহীনদের নিকট হস্তান্তরিত হবে। এটা একটা

[১০৭] *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, pp. 61-66, 88-90 and 131.
[১০৮] *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, p. 132.
[১০৯] *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, p. 128.
[১১০] *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, pp. 128-129.

বৈপ্লবিক আইন। ভারতবর্ষ বা পাকিস্তানের কোনো জায়গায় এই ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়নি। কিন্তু এই বৈপ্লবিক আইনে কৃষককে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা ছিনিয়ে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। তিনি পরিষদের সদস্যদের স্মরণ করে দিয়ে বলেন যে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনের ৫৩ নং ধারায় বলা হয়েছে, “A raiyat shall have the right to occupy and use the land comprised in his holding in any manner he likes” কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনে এই অধিকার দেওয়া হলেও অত্র বিলে কৃষকের সেই অধিকারকে অনেকখানি সঙ্কুচিত করা হয়েছে। তিনি বলেন যে বাংলা তথা পূর্ব বাংলায় এই বঙ্গীয় প্রজাস্বত্বের একটা ক্রমবর্ধমান ইতিহাস আছে। প্রথমে কৃষক যেসব জমি ভোগ দখল করতো তার ওপর বহু বাধা নিষেধ ছিল। যেমন জমির ওপর দালান নির্মাণ করতে পারবে না, পুকুর কাটতে বা জমির গাছ কাটতে পারবে না, জমি বিক্রি করতে পারবে না, তারপর বিক্রি করলে সেলামি দিতে হবে ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনে এই ধরনের বহু বাধা নিষেধ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উক্ত আইনে বলা হয়েছে কৃষক যে জমি ভোগ করবে তাতে কোনো বাধা নিষেধ আরোপ করা চলবে না। যদিও আইন হয়েছে কিন্তু সমস্ত জমিদারি অদ্যাবধি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কয়েকটা জমিদারি অধিগ্রহণের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে মাত্র। এই পরিষদ বহু আলোচনা করে উক্ত আইন পাশ করেছিল। কিন্তু উক্ত আইনে কৃষককে অধিকার দিয়ে নতুন আইনে সে অধিকার আবার বাতিল করলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সরকার ধারণা করছেন যাদের কয়েক'শ বিঘা জমি আছে তাদের জমি অধিগ্রহণ করবেন। উত্তরবঙ্গে অনেক পরিষদ সদস্যের ১,০০০ বিঘার উপরেও জমি আছে। মানুষ অতি লাভের আশায় কিছু কিছু জমি বিক্রি করছে। রাজস্বমন্ত্রী আইনের মধ্যে ফাঁকফোকর রেখে দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে তাঁর ইউনিয়নে একজন ব্যক্তিরও ১০০ বিঘার ওপরে জমি নেই। সে কারণে তাঁর ইউনিয়ন থেকে ১ বিঘা জমিও সরকার পাবে না। সরকার যদি ১০ বিঘার বেশি জমি বিক্রি বন্ধ করে দেন তাহলে একজন ব্যক্তি সারা জীবনে ১০ বিঘার বেশি বিক্রি করতে পারবে না, তার মানে জমির ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যারা বহুকষ্টে কিছু অর্থ সঞ্চয় করে জমি ক্রয়ের স্বপ্ন দেখেছিল তারা কোনো দিন আর সে স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে না। তিনি তাঁর নিজের গ্রামের দু'টি কৃষক পরিবারের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে উক্ত পরিবার দু'টি নানা কারণে সমস্ত জমি বিক্রি করে দিয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক বছর কৃষি ফসলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া এবং পরিশ্রম করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করে সাম্প্রতিককালে কয়েক বিঘা জমি ক্রয় করেছে। উক্ত পরিবার দু'টি জমি বিক্রি করে ভূমিহীন ও নিঃস্ব হওয়ার পরও পুনরায় সুযোগ পেয়ে জমি ক্রয়ের মাধ্যমে জমির মালিক হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে এই আইন যদি প্রণয়ন করা হয় তাহলে তাঁর ইউনিয়নের মতো অনেক স্থানে যেখানে কারও ১০০ বিঘার অতিরিক্ত জমি নেই সেখানে কোনো খাস জমি দরিদ্রদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। তাঁর মতে এই আইন করে সরকার মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রির অবিসংবাদিত অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন, কিন্তু আইনত সরকার তা করতে পারে না। তিনি তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে বলেন যে পরিষদে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নকালে বৃহত্তর স্বার্থেই তাঁরা সকলেই ত্যাগ স্বীকার করে উক্ত আইন সমর্থন করেছিলেন। সরকারের মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ রেখে তাঁরা সকলেই সেই আইন মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁরা অন্যান্য সম্পত্তি ইচ্ছানুযায়ী ভোগ করতে পারবে না-এটা অন্যায়। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষককে যে সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সেটা কেড়ে নেওয়া অন্যায় হবে। তিনি বিলের ওপর চারটি সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে বিলের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সরকারকে অনুরোধ করেন। তিনি তাঁর প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবে বলেন যে বিলে বলা হয়েছে ১০ বিঘার বেশি জমির মালিক জমি বিক্রি করতে পারবে না। কিন্তু কতদিন পর্যন্ত পারবে না তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এ কারণে তিনি তাঁর প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবে বলেন যে বিলে সুনির্দিষ্টভাবে একটা সময় সীমার নির্দেশ দিতে হবে। তাহলে কঠোরতা অনেকখানি হ্রাস পাবে। তাঁর দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয় যে কৃষককে যে কোনো নির্দিষ্ট একটি

অর্থ বছরে ১০ বিঘা জমি বিক্রি করতে দিতে হবে। তাহলে জনসাধারণের কষ্টের কিছুটা লাঘব হবে। তিনি তাঁর তৃতীয় সংশোধনী প্রস্তাবে উল্লেখ করেন যে বিলের ৬ নং ধারায় যেখানে শাস্তির পরিমাণ দ্বিগুণ অর্থদণ্ড করার কথা আছে সেখানে অর্থদণ্ড অর্ধেক করতে হবে। শাস্তির পরিমাণ লঘু করার উদ্দেশ্যে এই সংশোধনীতে তিনি দুই প্রকার শাস্তি হতে অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন যে তাঁর এই সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে হচ্ছে একবার জরিমানা দেবে, আবার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে, এভাবে দুই রকম শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা অযৌক্তিক। তাঁর চতুর্থ সংশোধনী প্রস্তাব ছিল যখন জমি ক্রয়-বিক্রয় হয় তখন অনেক সময় দেখা যায় একটা জমির জন্য একাধিক ক্রেতা উপস্থিত হয় এবং এসব ক্রেতা নিজ প্রয়োজন অনুসারে জমির মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা জমির দুই বা ততোধিক ক্রেতার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে বিক্রেতা তুলনামূলক অধিক মূল্যে জমি বিক্রি করতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে ক্রেতাদের প্রয়োজনের তারতম্যের জন্য, আবার অনেক সময় পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও শত্রুতা থাকায় জমি ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে অনেক রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। যদি আইনে এমন ধারা থাকে তাহলে কোনো ব্যক্তি ১০ বিঘার বেশি জমি বিক্রি করেছে বলে দরখাস্ত করলেই তার শাস্তি হবে। এমন বিধান থাকলে গ্রামাঞ্চলে যেসব সুবিধাবাদী মানুষ আছে তারা এসবের সুযোগ নিয়ে কোনো এক পক্ষের হয়ে একটি দরখাস্ত দিবে এবং তার ফলে বিক্রেতার শাস্তি হতে পারে। তিনি বলেন যে ইতিমধ্যে পরিষদে মনোরঞ্জন ধরের সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী বিক্রেতার বক্তব্য অনুমোদন কর্তৃপক্ষ শুনবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু শুধু বিক্রেতার পক্ষে অবস্থান নেওয়ার যে সুযোগ রাজস্বমন্ত্রী মেনে নিয়েছেন তাতে তার বক্তব্য শুনলেই যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মানবেন তা নয়। বস্তুতপক্ষে, আদালতের মামলার রায় অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগকারীর পক্ষে প্রায়শ চলে আসে। এর ফলে মানুষের হয়রানি বৃদ্ধি পাবে। কারণ বিক্রেতার কোনো শত্রুও দরখাস্ত করতে পারে, আবার ক্রেতাদের মধ্যে যারা বিফল হবে তারাও করতে পারে। একটা দরখাস্ত দিলে বিক্রেতার যেমন হয়রানি হবে তেমনি যে জমি ক্রয় করবে তারও হয়রানি হবে। সেজন্য তিনি তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবে নির্দেশ করেন যে দরখাস্ত করতে হলে প্রথমে দরখাস্তকারীকে সরকারি কোষাগারে ১০০ টাকা জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে যদি তার দরখাস্তের অভিযোগ সত্য প্রমাণিত না হয়, তাহলে তার টাকা বাজেয়াপ্ত হবে। ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে অযথা কেউ মিথ্যা অভিযোগ করে জমির ক্রেতা-বিক্রেতাকে হয়রানি করবে না।[১১১] সুতরাং তাঁর মূল বক্তব্য ছিল কৃষক তথা জনসাধারণকে ১০ বিঘার বেশি জমি হস্তান্তরের সুযোগ দিতে হবে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দেওয়ার ওপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে হবে।

ভূমি হস্তান্তরে সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে পরিষদের সদস্য প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী উল্লেখ করেন যে এই বিলের ৩ নং ধারার অনুবিধি অনুযায়ী খাজনা ডিক্রির যেসব জমি জমিদাররা ক্রয় করবে সেগুলো আবার তারা বন্দোবস্ত করতে পারবে। এই অধিকার সরকার জমিদারদের দিয়েছেন। এই খাজনা ডিক্রি ছাড়াও জমিদাররা আরও একভাবে কৃষকের নিকট থেকে জমি পায়। অনেক কৃষক পালিয়ে যায় এবং কেউ কেউ ইচ্ছা করেই জমিদারের নিকট তাদের জমি সমর্পণ করে। এভাবে জমিদাররা অনেক জমির অধিকারী হয়। তিনি বলেন যে তাঁর নিজের জেলায় ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর অনেক মানুষ ভারতে চলে যাওয়াতে তাদের জমি মালিকানাহীন হয়ে পড়ে। জমিদাররা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৭ নং ধারা অনুসারে সেসব জমি নিয়ে নিয়েছে। জমিদারদের যদি ঐসব জমি পুনরায় বন্দোবস্ত করতে না দেওয়া হয় তাহলে সেটি অন্যায় হবে এবং তারা আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কারণে তিনি বিলের ওপর প্রথম সংশোধনী প্রস্তাব করেন যে কৃষকের জমি জমিদারের হস্তগত হওয়ার পর জমিদারকে সেসব জমি পুনরায় বন্দোবস্ত

[১১১] *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, pp. 83-85 and 129-130.

দেওয়ার অধিকার দিতে হবে। তাঁর দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়, "Provided further that nothing in his section shall apply to the transfer of lands of the migrants or intending migrants." তাঁর মতে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর অনেক মানুষ সাদা কাগজে জমি হস্তান্তরের দলিল লিখে দিয়ে ভারতে চলে যায়। সেসব জমি হস্তান্তর কাগজে কেবলমাত্র লেখা আছে, "আমার জমি আপনাকে দিয়ে গেলাম।" সেসব জমির চৌহদ্দি, দাগ নম্বর ইত্যাদি দেওয়া নেই। জমি হস্তান্তরের দলিলগুলোর সত্যতাও প্রশ্নবিদ্ধ। লেখা প্রকৃত কিনা তাও যাচাই করা হয়নি। এমনকি এসম্বন্ধে কোনো প্রমাণও নেওয়া হয়নি। এভাবে উক্ত দাঙ্গার সময় বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার বিঘা জমি হস্তান্তরিত হয়েছে। তাঁর প্রশ্ন ছিল ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাস হতে ভূমি হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতামূলক এই আইন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কীভাবে এতো জমি হস্তান্তর হলো এবং এর বিরুদ্ধে সরকার কেন কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি? এছাড়াও এই আইনের ৫ নং ধারা অনুযায়ী ১০ বিঘার ওপর জমি হস্তান্তরের সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও উক্ত হস্তান্তরিত অতিরিক্ত জমি বাতিল করা হয় নি কেন? তিনি উক্ত হস্তান্তরিত অতিরিক্ত জমির অবৈধ হস্তান্তর বাতিল করে জমির মূল মালিককে ফেরত দেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। উপরন্তু, তিনি সরকারকে দিল্লী চুক্তি স্মরণ করে দিয়ে বলেন যে অভিবাসীদের জমি হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে কালেক্টরের বিবেচনার ওপর নির্ভর না করে বরং আইনের মধ্যেই অভিবাসীদের জমি হস্তান্তরের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।[১১২] অর্থাৎ তিনি অভিবাসীদের জমি হস্তান্তর সহজকরণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। এছাড়াও দাঙ্গার সময় অস্পষ্ট হস্তান্তরপত্র যে ভূমি বিরোধের একটি কারণ ছিল-তা তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু পলায়নকারী কৃষক ও স্বেচ্ছায় জমি হস্তান্তরে আগ্রহী কৃষকদের জমিদারদের নিকট জমি হস্তান্তরের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্টত অনুমেয় যে অনেক সময় জমিদাররা জোরপূর্বক কৃষকদের নিকট হতে জমি কেড়ে নিয়ে অন্যত্র বন্দোবস্ত দিতো। সুতরাং তাঁর বক্তব্য থেকে ভূমি বিরোধের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। উল্লেখিত বিলের বিরোধিতা করে কংগ্রেস সদস্য বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী বলেন যে অভিবাসী হিন্দুরা যারা বাস্তুত্যাগ করে ভারতে চলে গেছে তারা অনেকেই একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং তাদের অংশীদার অনেকেই পূর্ব বাংলায় রয়ে গেছে। দেশ ছেড়ে যাওয়ার পরে অনেক অভিবাসীর জমি বেদখল হয়েছে। অনেক স্থানে বর্গাদাররা দখল করে রেখেছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে সরকার নিজেও দখল করেছে। এমতাবস্থায় অংশীদার কিংবা একান্নবর্তী পরিবারের যারা দেশে রয়েছে তারা ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এ কারণে তিনি বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব দেন যে একান্নবর্তী পরিবারের অভিবাসীদের অংশীদারকে জমি বিক্রি করার অবাধ ক্ষমতা দিতে হবে। তিনি বিলের ওপর দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে বলেন যে জমিদারসহ সাধারণ মানুষের সামাজিক ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক জীবন নানাভাবে বিপন্ন হচ্ছে। কাজেই প্রয়োজনমতো এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থার তাগিদে তারা যদি জমি বন্দোবস্ত বা ভাড়া বা বন্ধক দিতে না পারে তাহলে তাদের জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়বে। পরিষদে তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রীর বক্তব্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে দেশের শতকরা ৮০ জন মানুষ জমির ওপর নির্ভরশীল এবং তাদের অনেকেরই অর্থনৈতিক জোত নেই। তাঁর মতে এই শতকরা ৮০ জন মানুষকে অর্থনৈতিক জোত সরকার কখনোই দিতে পারবেন না। সরকারের পক্ষে ভবিষ্যতেও কখনও অর্থনৈতিক জোত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। তাই জনসাধারণকে জমি বিক্রি, লিজ, ভাড়া, মর্টগেজ বা গিফটের সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে প্রস্তাবিত বিলে তাঁরা ভবিষ্যত বংশধরদের কাজের প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করছেন। তাই তাঁর দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাব ছিল মানুষকে প্রতি বছর ১০ বিঘা জমি হস্তান্তর করার সুযোগ দিতে হবে। যদি তাঁর এই প্রস্তাবে আপত্তি থাকে তাহলে তাঁর তৃতীয় সংশোধনী প্রস্তাব ছিল রাষ্ট্রীয়

---

[১১২] *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, pp. 86 and 125-126.

অধিগ্রহণ আইন কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষকে ৫০ বিঘা জমি হস্তান্তর করার অনুমতি দিতে হবে। তাঁর চতুর্থ সংশোধনী প্রস্তাবে তিনি বলেন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় অনেকে জমি-জমা ছেড়ে ভারতে চলে গেছে এবং সেই সব জমি এখনও পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। এখন প্রকৃতপক্ষে এসব জমির মালিক কে হবে তার কোনো সঠিক নির্দেশনা নেই। আইন অনুযায়ী অবশ্য জমির মালিক জমিদার, তার হাতেই জমি চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু জমিদাররা জমির অধিকার পাচ্ছেন না অথচ ঐসব জমির জন্য তাদেরকে রাজস্ব বহন করতে হচ্ছে। কাজেই তিনি প্রস্তাব করেন যে এই প্রকার জমি হস্তান্তরে যেন কোনো অসুবিধার সৃষ্টি না করা হয়। তিনি তাঁর পঞ্চম সংশোধনী প্রস্তাবে বলেন যে জমি হস্তান্তরে অনুমোদন কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট সময়ে অনুমতি বা বাতিল করার বিষয়ে বিলে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। তিনি বলেন যে ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী বলেছিলেন জমি হস্তান্তরে কোনোরূপ অসুবিধার সৃষ্টি করা হবে না এবং এমন ইচ্ছাও সরকারের নেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো অভিবাসীরা তাদের জমি হস্তান্তরের সুযোগ পাচ্ছে না। এমনকি জনসাধারণও প্রয়োজনের সময় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে জমি হস্তান্তর করতে পারছে না। তিনি উল্লেখ করেন যে জমি বিক্রির অনুমতির জন্য কালেক্টরের কাছে দরখাস্ত করলে তিনি দরখাস্ত সার্কেল অফিসারকে তাঁর মতামতের জন্য পাঠিয়ে দেন। সার্কেল অফিসার আবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের অভিমত এবং সুপারিশ অনুযায়ী দরখাস্ত কালেক্টরের কাছে পাঠান। এখন যদি কোনো ব্যক্তির প্রতি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অসন্তুষ্ট থাকেন বা সহায়তা করতে অনিচ্ছুক হন তাহলে উক্ত দরখাস্তকারীর দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ সার্কেল অফিসার সাধারণত ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের অভিমত গ্রহণ করে রিপোর্ট দিয়ে থাকেন। তিনি জানেন এমনও হয়েছে যে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের হাতে দরখাস্ত গেলে তিনি দরখাস্তকারীকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞাসা করেন কি কারণে তিনি জমি বিক্রি করতে চান। সমকালীন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে দরখাস্তকারী নানাভাবে অভাব-অনটনের কথা জানান, কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট দরখাস্তকারী হিন্দু বলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে জানান যে তারা জমি বিক্রি করে ভারতে চলে যাবে। সুতরাং তারা অনুমতি পাওয়ার যোগ্য নয়। কাজেই তিনি দাবি করেন যে দরখাস্তকারীদের দরখাস্ত সম্বন্ধে তদন্তের জন্য নির্দিষ্ট বিধান থাকা দরকার। প্রেসিডেন্টের মতামত নিয়ে কাজ করতে গেলে এই আইনের উদ্দেশ্য সার্থক হবে না। সরকারি কর্মচারীরা নিজে তদন্ত করলে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যেতে পারে। তারপর কালেক্টারের কাছে জমি বিক্রির অনুমতির জন্য দরখাস্ত করলে অনুমতি পেতে অনেক সময় লাগে। তাই তিনি প্রস্তাব করেন যে ৩০ দিনের মধ্যে দরখাস্ত মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করার একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা বিলে উল্লেখ থাকতে হবে।[১১৩] বস্তুত, তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবগুলো খুবই যৌক্তিক ছিল। কিন্তু এর মধ্যে অধিক জমি হস্তান্তরের প্রস্তাব ছিল প্রকারন্তরে জমিদার শ্রেণির স্বার্থে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এসময় চক্রবর্তীর সংশোধনী প্রস্তাবের অনুরূপ অভিবাসীদের জমি হস্তান্তরের অনুমতি দিতে সরকারকে অনুরোধ করে পরিষদের বিরোধীদলীয় উপনেতা ও কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের দাবি ছিল, “If it is the intention of the Government that permission will be given for allowing the migrants to dispose of their property, the intention of the Government should be made clear in the Bill itself.”[114] অন্যদিকে পরিষদে উত্থাপিত বিলকে সমর্থন জানিয়ে মুসলিম লীগ তথা সরকারি দলীয় সদস্য মুজিবুর রহমান বিলের ওপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে বলেন,

> To the first settlement of char lands after the char has been formed and.’ In moving this amendment I want to submit that the whole Bill has been submitted to restrict the sale of excess land in the province and I do not understand why the newly formed char lands will be excluded from the purview of this Bill. Excess

---

[১১৩] *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, pp. 60-61, 87-88 and 116.
[১১৪] *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, p. 117.

lands are mainly available in char area where natural char appears and forms. Taking advantage of this proviso the greedy zamindars have sold away and settled all the excess lands and taken crores of rupees out of Pakistan. So, I want to say that the same principle should be followed and this Act also should include the char lands which will be formed newly and which is already in existence.[১১৫]

সরকারি দলের সদস্য রহমানের উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে কংগ্রেস দলীয় সদস্য মুনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য বলেন যে নদীর চর জেগে উঠলে পার্শ্ববর্তী জমিদাররা এর মালিকানা দাবি করেন। তাঁর মতে চরের জমি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় সাধারণভাবে যে জমিদারের এলাকায় চর জেগে উঠে, সেই জমিদার চরের মালিক হয়। চর দখল নিয়ে প্রায়শই আন্ত-জমিদার সংঘর্ষও হয়। এমনকি প্রায়শই চর দখল নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয় এবং ফৌজদারি মামলাও হয়ে থাকে। তবে যদি কোনো জমিদার দখল নিতে না পারেন এবং ৮-১০ বছর চরের ভূমি দখল বিহীন থাকে সেক্ষেত্রে চরের অবস্থা কি হবে তা স্পষ্টত অনুমেয়। উল্লেখ্য, চর ভূমিতে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়। এ কারণে চর ভূমির বন্দোবস্তের অনুপস্থিতি এবং যথাযথভাবে চাষ আবাদ না হলে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি দাবি করেন যে চর ভূমি সম্পর্কিত উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করার পূর্বে সরকারের সার্বিক বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত।[১১৬] ভট্টাচার্যের সংশোধনী সম্পর্কিত বক্তব্যের পর সরকারি দলের সদস্য রহমানের উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে তৎকালীন অর্থ ও রাজস্বমন্ত্রী তোফাজ্জল আলী বলেন,

With regard to the amendment moved by my honourable friend, Mr. Majibur Rahman, Government is in a position to accept the amendment because on further consideration Government realise that there is really no good reason for distinction betweeen the char lands and other agricultural lands. With regard to this amendment a point has been made out by my friend, Mr. Munindra Nath Bhattacharjee, in the second speech. I may only mention that it will be no interference with the right of ownership of the char lands; it will be merely controlling the right to transfer the char lands beyond a certain limit.[১১৭]

এভাবে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপিত কৃষি জমি হস্তান্তর বিলটি দীর্ঘ আলোচনা শেষে ১৯৫১ সালের ২৩ অক্টোবর গৃহীত হয় এবং আইনগত প্রক্রিয়া শেষে ১৯৫১ সালের পূর্ব বাংলা কৃষি জমি হস্তান্তর আইনে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে, এই বিলের ওপর দীর্ঘ আলোচনাকালে সংশোধনী প্রস্তাবসহ বিলের বিভিন্ন ধারা-উপধারা গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে সংসদীয় নীতি অনুযায়ী পরিষদের সদস্যদের ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হতো। যেমন এই বিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৩ নং ধারার অনুবিধির ওপর ১৯৫১ সালের ২২ অক্টোবর পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়। এই ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণকারী ৫৯ জন সদস্যের মধ্যে মুসলিম লীগ ও সরকার সমর্থক অন্যান্য দলের মোট ৪৬ জন সদস্য বিলের পক্ষে এবং প্রধানত কংগ্রেস দলীয় জমিদার সমর্থক ১৩ জন বিলের বিপক্ষে ভোট দেন।[১১৮] অন্যান্য

---

[১১৫] *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, pp. 92-93.

[১১৬] *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, p. 93.

[১১৭] *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, pp. 94-95.

[১১৮] বিলের পক্ষে যে ৪৬ জন ভোট দেন তাঁরা হলেন : (১) ডাঃ আব্দুল আহাদ, (২) মাওলানা মোঃ আবদুল আজিজ, (৩) দেওয়ান আবদুল বাসিত, (৪) মীর্জা আবদুল হাফিজ, (৫) আবদুল হামিদ (মন্ত্রী), (৬) মওলানা খন্দকার আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, (৭) আবদুর রশিদ, (৮) সৈয়দ আবদুর রউফ, (৯) আকবর আলী, (১০) আওলাদ হোসেন খান, (১১) সৈয়দ আজিজুর রহমান, (১২) বদিউজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস, (১৩) হারাণ চন্দ্র বর্মণ, (১৪) ভোলা নাথ বিশ্বাস, (১৫) দ্বারকা নাথ বারৈই (মন্ত্রী), (১৬) গয়ানাথ বিশ্বাস, (১৭) এসকান্দার আলী খান, (১৮) ফজলুল করিম, (১৯) ফজলুর রহমান, (২০) সৈয়দ হাবিবুল হক, (২১) হাসান আলী (মন্ত্রী), (২২) ইব্রাহীম আলী, (২৩) এম. ইদ্রিস আলী, (২৪) লুৎফর রহমান, (২৫) মাদার বক্স, (২৬) সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল (মন্ত্রী), (২৭) মফিজউদ্দিন আহমেদ (মন্ত্রী), (২৮) মুজিবুর রহমান, (২৯) মাইনুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, (৩০) মোবারক আলী আহমেদ, (৩১) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, (৩২) মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ চৌধুরী (মন্ত্রী), (৩৩) আলহাজ্ব শরফুদ্দিন আহমেদ, (৩৪) মাওলানা হাজী মোহাম্মদ কাসেম, (৩৫) মোঃ নাজমুল হক, (৩৬) কে. নাসরুল্লাহ, (৩৭) নাসিরউদ্দিন আহমেদ, (৩৮) নওয়াব আলী, (৩৯) নওয়াযেশ আহমেদ, (৪০) নুরুজ্জামান, (৪১) নুরুল হোসেন খান, (৪২) মোঃ ওসমান গণি, (৪৩) পনিরুদ্দিন আহমেদ, (৪৪) মোহাম্মদ ইসরাইল, (৪৫) তোফাজ্জল আলী (মন্ত্রী) ও (৪৬) তোফাজ্জল হোসেন। অন্যদিকে বিলের বিপক্ষে যে ১৩ জন ভোট দেন তাঁরা হলেন : (১) গবিন্দ লাল ব্যানার্জি, (২) জোতিন্দ্র নাথ ভদ্র, (৩) মুনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, (৪) বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী, (৫) বিনোদ বিহারী

অনুবিধির ওপর গৃহীত ভোটের চিত্রও ছিল অনুরূপ। এই বিলের ওপর আলোচনায় জমিদারি ও জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে দেওয়া যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ ও সরকার সমর্থক অন্যান্য দলের সদস্যদের বিলের সমর্থনপূর্বক নীরব ভূমিকা পালন করায় সহজেই বুঝা যায় যে ঐ সময়ে ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে জমিদাররা ছিলেন কেন্দ্র বিন্দুতে। কংগ্রেস দলীয় জমিদার সমর্থক সদস্যদের আলোচনায় কখনও কখনও কৃষকের প্রসঙ্গ উঠে এলেও তা ছিল জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় কৌশলী উপস্থাপনা মাত্র। অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসনামলে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে কখনও কখনও সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলায় সেই একই দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে দীর্ঘ ভূমি বিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রণীত কৃষি জমি হস্তান্তর আইনে কৃষকের অর্জন ছিল সামন্যই। তবে কৃষকের কোনো অর্জন না হলেও উল্লেখিত বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে সরকারি এবং বিরোধী দলের সদস্যদের ভূমি বিতর্কের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার ভূমি বিরোধের রাজনীতির একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছিল।

৪.১১ ১৯৫২ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন

১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন [The East Bengal State Acquisition and Tenancy (Amendment) Bill, 1952] প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমিদারদের দলিলপত্র হস্তান্তর এবং অপারগতায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালের ২০ অক্টোবর পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে "পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) বিল, ১৯৫২" নামে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। বিলের ওপর আলোচনাকালে পরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য পুর্ণেন্দু কিশোর সেন গুপ্ত একটি পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন যে সিলেট জেলায় প্রায় ৬০ হাজার হতে ৮০ হাজার খাজনা ভোগী মহল বা জোত আছে। এসব ছোট জোতের খাজনা একবার বকেয়া হলে কৃষক তা আর দিতে পারে না। এসব জোতের বিরুদ্ধে রেকর্ড অব রাইটস জারি হলে সরকার জমিদারি অধিগ্রহণ করবে। অন্যদিকে কৃষক যখন সরকারের অধিগ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হবে তখন তারা আর জমিদারকে খাজনা দিবে না। অর্থাৎ এই আইনের ফলে মানুষের খাজনা দেবার প্রবৃত্তি থাকবে না। তিনি বলেন যে এসব ছোট জোত খাসে রূপান্তরিত হলে একদিকে সরকারের পক্ষে এসব ছোট জোত সমন্বয় করে পরিচালনা সম্ভব হবে না এবং অন্যদিকে অনাদায়ী খাজনার জন্য জমিদার কৃষকের বিরুদ্ধে মামলা করলে আইনজীবীর আয় বৃদ্ধি পাবে ঠিকই কিন্তু কৃষক মুক্তি পাবেনা।[১১৯] অর্থাৎ তাঁর মতে এই আইন প্রণীত হলে জমিদার এবং কৃষক উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্যদিকে সুরেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত বলেন যে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইন প্রণয়নের ফলে সরকার জমিদারদের বড় জমিদারি নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু অধিগ্রহণকৃত জমিদারির অব্যবস্থাপনার জন্য জনসাধারণের দুর্ভোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর মতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে আইন প্রণীত হলেও জমিদারি ব্যবস্থার বিলুপ্ত ঘটেনি। তাঁর মতে এদেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠিত হয়েছে ভূ-অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে। এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একদিকে আছে জমিদার ও তাদের সহযোগী জোতদার শ্রেণি এবং অন্যদিকে আছে কৃষক তথা সাধারণ মানুষের সমাজ। তবে এই সামন্তবাদী ব্যবস্থায় উক্ত দ্বিপক্ষীয় সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। তাই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা উঠে গেলে সমাজের আর্থিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়বে এবং সমাজের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। তাঁর

চৌধুরী, (৬) ব্রজমাধব দাশ, (৭) সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত, (৮) ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, (৯) মনোরঞ্জন ধর, (১০) হারাণ চন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, (১১) প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, (১২) মিসেস আশালতা সেন ও (১৩) পুর্ণেন্দু কিশোর সেন গুপ্ত। দেখুন, *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 1, 1951, pp. 100-101.

[১১৯] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. IX, No. 1, Ninth Session, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 13th, 14th, 17th, 20th and 21st October, 1952 (Dacca : East Bengal Government Press, 1954), p. 221.

মতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন বাস্তবায়নের ফলে এদেশের দ্বিপক্ষীয় সমাজের বিপরীতে সৃষ্ট ব্যবস্থায় সরকার আর কৃষক ছাড়া এর মধ্যে কেউ থাকতে পারবে না, এমনকি কোনো খাজনা-ভোগী স্বার্থও থাকতে পারবে না। সরকার জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন করে পরিবার প্রতি ১০০ বিঘার ওপর সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের পরিকল্পনা করছেন। সরকারি পরিকল্পনা কখনও বাস্তবায়ন হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন যে এর ফলে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।[১২০] তাঁর বক্তব্য যথার্থ ছিল, প্রকৃতপক্ষে হয়েছিলও তাই। কারণ পাকিস্তান আমলে সরকার জমিদারদের জমি অধিগ্রহণ করতে সক্ষম হলেও ভূমিহীনদের মধ্যে তা বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়নি। অপর কংগ্রেস সদস্য মুনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য বিলের বিরোধিতা করে বলেন যে এই বিলের ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে সরকারের নিকট জমিদারের দলিলপত্র দাখিল করতে হবে। প্রজা ও জোত সংখ্যা, প্রজার নাম, মৌজা, জোতের পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য প্রদান করতে হবে এবং এর জন্য সময় দেওয়া হয়েছে ৬০ দিন। কিন্তু এই দুই মাসের মধ্যে তালিকা তৈরি করা জমিদারদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আবার সময়মতো কাগজপত্র সরকারের নিকট জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। তিনি বলেন যে অনেক জমিদারের কর্মচারী নেই। এমনকি অনেক জমিদারের আর্থিক অবস্থাও ভালো নেই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কৃষকের নিকট থেকে খাজনা আদায় করা খুবই কষ্টকর। কেননা এই দেশের মানুষকে ক্রমাগত তাগাদা না দিলে পাওনা টাকা আদায় হয় না। কাজেই জমিদারদের বড় দুর্দিন চলছে। তাঁর মতে দুই মাস অর্থাৎ ৬০ দিনে দাগওয়ারী দলিলপত্র তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। এই দুই মাস খাজনা আদায় সম্ভব হবে না এবং দু'মাস পরও সরকারের চাহিদা অনুসারে কাগজপত্র তৈরি হবে না। এর ফলে জমিদারি নিলাম হয়ে যাবে। জমিদারি নিলাম হলে সরকারের সুবিধা আছে, কিন্তু অসুবিধাও কম নেই। জমিদারের কাছ থেকে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা এবং হিসেব করতে অনেক সময় লাগবে এবং অনেক অসুবিধাও ভোগ করতে হবে। তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী জানিয়ে ছিলেন যে কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যাদের জমিদারি নেওয়া হয়েছে তাদের ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত হিসেব অসম্পূর্ণ থাকায় সরকার জমিদারদেরকে কোনো অর্থ দিতে পারেনি। যার ১০ টাকা পাওনা তাকে এক টাকা দেওয়া হয়েছে। ভট্টাচার্যের মতে সরকার নিজেই কাজের দায়িত্ব নিয়ে ঠিকমতো পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে অথচ জমিদারকে নির্দেশ দিয়েছেন যে দুই মাসের মধ্যে সরকারের চাহিদামতো কাগজপত্র দিতে ব্যর্থ হলে জরিমানার সম্মুখীন হতে হবে।[১২১] বস্তুত, তিনি বিলের বিরোধিতা করে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় কৌশলী যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। এভাবে পরিষদে উত্থাপিত বিলের ওপর দীর্ঘ আলোচনা শেষে ১৯৫২ সালের ২০ অক্টোবর পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে বিলটি গৃহীত হয় এবং আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে তা ১৯৫২ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনে পরিণত হয়। এই আইন প্রণয়নের ফলে সরকার জমিদারদের নিকট হতে জমিদারির বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র সংগ্রহ করে জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের তালিকা প্রণয়ন করেন। এর ফলে সরকার জমিদারি অধিগ্রহণ করে লাভবান হলেও কৃষকরা এর দ্বারা কোনোভাবেই উপকৃত হয়নি। সুতরাং এই আইন প্রণয়ন ভূমি বিরোধ হ্রাসেও কোনোরূপ প্রভাব পড়েনি।

৪.১২ ১৯৫৩ সালের বঙ্গীয় চরাঞ্চল ভূমি (পূর্ব বাংলা সংশোধন) আইন

১৯৫৩ সালে বঙ্গীয় চরাঞ্চল ভূমি (পূর্ব বাংলা সংশোধন) আইন [The Bengal Alluvial Lands (East Bengal Amendment) Act, 1953] প্রণীত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারিভাবে চরাঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালের ১ এপ্রিল পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক

[১২০] *Assembly Proceedings*, Vol. IX, No. 1, 1952, pp. 322-323.
[১২১] *Assembly Proceedings*, Vol. IX, No. 1, 1952, pp. 226-328.

পরিষদে "বঙ্গীয় চরাঞ্চল ভূমি (পূর্ব বাংলা সংশোধন) বিল, ১৯৫৩" নামে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক স্বার্থসংশ্লিষ্ট হলেও বিলটি আইনে পরিণত হলে চরাঞ্চলের ভূমিতে জমিদারদের স্বার্থহানি হওয়ার আশঙ্কায় পরিষদের জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করেন। কংগ্রেস দলীয় সদস্য জোতিন্দ্র নাথ ভদ্র বিলের বিরোধিতা করেন এবং বিলটি জনসম্মুখে তুলে ধরে জনসাধারণের মতামত নেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। কারণ জনসাধারণের স্বার্থ এর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। তিনি অভিযোগ করেন যে রাজস্ব বিভাগ ক্রমশ সিভিল কোর্টের এখতিয়ার হতে মুক্ত হওয়ার জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করছে। রাজস্ব বিভাগ হতে উপস্থাপিত সমস্ত বিলের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে রাজস্ব বিভাগের ওপর সিভিল কোর্টের কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো। তাঁর মতে রাজস্ব বিভাগের এই স্বৈরাচারী আচরণ জনসাধারণ পছন্দ করে কি না তা রাজস্ব বিভাগ কখনও জানতে চায় না। এই বিল জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলে এ সম্বন্ধে তাদের মতামত জানা যাবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে এই বিলটি খণ্ডিত, সম্পূর্ণ বিলটি একসঙ্গে উপস্থাপন করলে এর সব ধারা-উপধারা একত্রে সংশোধন করতে সুবিধা হবে। এই বিলের ওপর ভিত্তি করে আইন তৈরি হলে এর উদ্দেশ্যই নষ্ট হবে। তাছাড়া বিলের ৩ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে কালেক্টর যদি খবর পান কোনো চর নিয়ে সংঘাত-সংঘর্ষ হওয়ার আশঙ্কা আছে বা শান্তি ভঙ্গের কারণ আছে অথবা অনুমান করেন যে শান্তি ভঙ্গ হতে পারে, তাহলে এই আইন বলে তিনি চরটি দখল করতে পারবেন। এমনকি চরটি নতুন কিনা তাও নির্ধারণ করবেন কালেক্টর নিজেই। কালেক্টর যদি মনে করেন যে সেই চরটি নতুন তাহলে সেটাই গ্রাহ্য হবে। সুতরাং এই আইন বলে কালেক্টর যে কোনো চর যে কোনো অজুহাতে দখল করতে পারেন তাতে বাধা দেওয়ার বৈধ ক্ষমতা কারও নেই। শুধু তাই নয়, এই আইন বলে চর দখল করে চরের জমি তিনি এক বছরের স্থলে তিন বছরের জন্যও বন্দোবস্ত দিতে পারবেন। একবার কাউকে তিন বছরের জন্য চরের জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পর তা প্রত্যাহার করার কোনো সুযোগ আইনে উল্লেখ নেই। বিলের ৪ নং ধারা অনুযায়ী কালেক্টর অল্প দিনের মধ্যে চরের ম্যাপ ও জরিপ সম্পন্ন করে ৫ নং ধারা অনুসারে সিভিল কোর্টে রিপোর্ট প্রেরণ করবেন। ৫ নং ধারা অনুযায়ী কোর্টে প্রেরণ করার বিধান আছে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সময় সীমা উল্লেখ নেই। এটা সম্পূর্ণ কালেক্টরের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। এই বিষয়ে রাজস্ব বিভাগেরও কিছু করার নেই। তিনি অভিযোগ করেন যে সমাজে যারা প্রভাবশালী তারা আমিন বা কানুনগোর সঙ্গে যোগসাজশে চরের জমি বন্দোবস্ত নিয়ে অনির্দিষ্টকাল ধরে ভোগ করবেন। তাঁর মতে এতোদিন চরের জমির মালিক হিসেবে জমিদার সিভিল কোর্টের আশ্রয় নিলে এর প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু এই আইন প্রণয়নের পর সেই সুযোগ আর থাকবে না। এই ন্যায়বিচারের সুযোগকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যেই এই বিল উত্থাপন করা হয়েছে। এ কারণে বর্তমান আকারে এই বিল এই পরিষদে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে পূর্ব বাংলার ইতিহাসে দেখা যায় যে অনেক চরের জমি বহুদিন যাবৎ সরকারের দখলে আছে। সরকারের নিকট থেকে এসব চরের জমি ছাড়িয়ে নেওয়ার কোনো উপায় নেই। তাঁর মতে এক্ষেত্রে সরকারের যুক্তি হলো চরের জমি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে যে কেউ স্বত্ব মামলা (Title suit) করতে পারে। কিন্তু চরের জমির স্বত্ব মামলার সমস্যা হলো প্রথমত, চরের জমির স্বত্ব মামলায় প্রমাণসহ সমস্ত কাগজপত্র জমা দিলেও কোর্টে ১০-১২ বছর, এমনকি আরও বেশি সময় ধরে মামলা চলতে থাকে। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘ সময় ধরে সরকারের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা পরিচালনা করা আর্থিকভাবে ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। তৃতীয়ত, এই ধরনের স্বত্ব মামলায় সাধারণত সরকারের পক্ষে রায় হয়। এমনকি রাষ্ট্রের স্বার্থহানির আশঙ্কায়ও এ ধরনের মামলার রায় সরকারের পক্ষে যায়। তারপরও এতোদিন মানুষ ন্যায়বিচারের আশায় সিভিল কোর্টের আশ্রয় নিতো। কিন্তু এই আইন প্রণয়নের পর সেই সুযোগও মানুষ পাবে না। এ কারণে তিনি বিলটি জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রচারে দেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। এর ফলে বিলের

বিষয়বস্তু সম্পর্কে জনসাধারণের অভিমত পাওয়া যাবে, তাদের কোনো মন্তব্য থাকলে সরকার সেটাও জানতে পারবে। এভাবে জনমত নিয়ে বিলটি গৃহীত হলে দেশের মানুষ উপকৃত হবে।[১২২] এটি সত্যি যে ভদ্রের বক্তব্যে যুক্তি ছিল। কিন্তু তিনি চরের জমির মালিক হিসেবে জমিদারদের উল্লেখপূর্বক তাদের স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করেন। সুতরাং এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে তাঁর বক্তব্য যৌক্তিক হলেও বক্তব্যের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা। অপর কংগ্রেস সদস্য বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী বিলের বিরোধিতা করে বলেন যে কালেক্টরকে চরের জমি বন্দোবস্ত বা পুনঃবন্দোবস্তের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার ফলে সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে জটিল সমস্যার উদ্ভব হবে। কারণ কালেক্টর অনেক সময় অধঃস্তন কর্মচারী দ্বারা কাজ করান। এ কারণে অনেক সময় প্রকৃত মালিকের স্বার্থের পরিপন্থি কাজ হয় এবং প্রকৃত মালিক ক্ষতিগ্রস্তও হয়। প্রশ্ন হলো এক্ষেত্রে মালিকের প্রতিকার পাওয়ার উপায় কি? বস্তুতপক্ষে, এই আইন প্রণয়নের পর প্রতিকারের জন্য চরের জমির মালিকের সিভিল কোর্টে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ বিলে বলা হয়েছে যে, কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে রাজস্ব বোর্ডে প্রতিকারের জন্য যেতে পারবে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো অদ্যাবধি সরকার যে সব জমি দখলে নিয়েছিল সেগুলোর সর্বশেষ অবস্থা কি ছিল? প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি জমির ম্যাপ বা রেকর্ড ইত্যাদি তৈরি করে বিচারালয়ের কাছে পাঠিয়েছিল মাত্র। তাঁর মতে কালেক্টরকে যেভাবে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতে জনসাধারণের উপকার হবে না। তিনি কালেক্টরের এই ক্ষমতা বাতিল করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। কারণ কালেক্টরের কাজের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল। তাই তিনি যুক্তি তুলে ধরেন যে বিধিতে একটি নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে কালেক্টর নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি রিপোর্ট দাখিল করতে বাধ্য থাকবেন। তাঁর মতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জমির প্রকৃত মালিক দরিদ্র হলে তার স্বত্ব মামলা করার শক্তি থাকে না; তাই সে কোনো দিন জমির অধিকারও পায়না। কানুনগো-তহশিলদার এসব জমি ভোগ করে এবং তাদের স্থানীয় সহযোগীরা উপস্বত্ব ভোগ করে। তাই জমির প্রকৃত মালিক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার ব্যবস্থা করা এবং বিলটি জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রচার করার অনুরোধ করেন। তাঁর দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাব ছিল প্রকৃত মালিক তার স্বার্থের ক্ষতি হলে যেন সিভিল কোর্টের মাধ্যমে তার প্রতিকার পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন যে কার্যত দেশভাগের পরবর্তী ১০-১২ বছরে চরের জমির স্বত্ব সম্পর্কিত একটি মামলাও হয়নি। তাঁর কাছে বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হয়েছে। তাঁর মতে সরকার যদি মনে করে থাকেন যে এই সম্পত্তি চিরদিন সরকারের হাতে থাকবে তাহলে পরিষদ সদস্যদের কিছু বলার নেই।[১২৩] অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যের মূল কথা ছিল চরের জমি যেন প্রকৃত মালিক ভোগ করতে পারে।

বিলের বিরোধিতা করে পরিষদের জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলীয় সদস্য জোতিন্দ্র নাথ ভদ্র বলেন যে এই বিলের ৩ নং ধারার ২ নং উপধারা অনুযায়ী কালেক্টর বন্দোবস্ত বা পুনঃবন্দোবস্ত দিলে কেউ তার বিরুদ্ধে সিভিল কোর্টে মামলা করতে পারবে না। এমনকি সিভিল কোর্টের রায় যা হয়েছে তাও বাতিল হয়ে যাবে; চলমান মামলাসমূহও আর চলবে না এবং ১৯৫১ সালের ৩১ মার্চের পরে সিভিল কোর্টে কেউ নতুন করে কোনো মামলা দায়ের করতে পারবে না। সুতরাং এই বিলের বিধানে সিভিল কোর্টে ব্যক্তির আইনি অধিকার পাওয়ার সুযোগের ওপর হস্তক্ষেপ সৃষ্টির কারণে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাঁর মতে এর ফল হবে মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। তিনি অভিমত দেন যে সিভিল কোর্টের ওপর জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হলে সরকারের ওপরও জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হবে।[১২৪] তাঁর বক্তব্য যে সঠিক ছিল তা

১২২ *Assmbly Proceedings*, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. X, No. 2, Tenth Session, 21st, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 30th and 31st March and 1st April, 1953 (Dacca : East Bengal Government Press, 1954), pp. 322-323.
১২৩ *Assmbly Proceedings*, Vol. X, No. 2, 1953, pp. 324-327.
১২৪ *Assmbly Proceedings*, Vol. X, No. 2, 1953, pp. 327-328.

পূর্ব বাংলার পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলি থেকে প্রমাণিত হয়। একইভাবে কংগ্রেস সদস্য প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী বিলের বিরোধিতা করে বলেন যে প্রস্তাবিত বিলের ৯ (ক) নং ধারা অনুযায়ী ১৯৫১ সালের মার্চ মাসের পর সিভিল কোর্টের রায় বাতিল হয়ে যাবে। ফলে উক্ত সময়ের পর সিভিল কোর্টের আদেশ মোতাবেক যিনি চরের জমির মালিক নির্দিষ্ট হয়েছে তিনি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তিনি ইতোমধ্যে প্রদত্ত কোর্টের আদেশ বহাল রাখার জন্য সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।[১২৫] অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইতোমধ্যে কোর্টের আদেশে চরের জমির মালিকানা ফিরে পাওয়া মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা। উল্লেখিত বিলের ওপর এভাবে দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৫৩ সালের ১ এপ্রিল বিলটি পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে গৃহীত হয় এবং আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে তা ১৯৫৩ সালের বঙ্গীয় পাললিক ভূমি (পূর্ব বাংলা সংশোধন) আইনে পরিণত হয়। বস্তুত, প্রাদেশিক পরিষদের কতিপয় কংগ্রেস দলীয় সদস্য বিলের বিরোধিতা করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কোনো সংশোধনী প্রস্তাব ছাড়াই বিলটি গৃহীত হয়ে আইনে পরিণত হয়। এই আইন প্রণয়নের পর যদিও আশা করা হয়েছিল চরাঞ্চলের ভূমি সরকারের হাতে এলে কৃষকরা উপকৃত হবে কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি বরং ইতোপূর্বে কৃষকরা স্বল্পপরিসরে হলেও চরাঞ্চলের যেসব ভূমি ব্যবহার করতো তাও হাতছাড়া হয়ে যায়। উপরন্তু, জমিদাররা প্রশাসনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে চরাঞ্চলের ভূমি ভোগ দখল অব্যাহত রাখার ফলে ভূমি বিরোধকে হ্রাস না করে বরং বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

৪.১৩ ১৯৫৩ সালের পূর্ব বাংলা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর (শিথিলকরণ) আইন

১৯৫৩ সালে পূর্ব বাংলা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর (শিথিলকরণ) আইন [The East Bengal Transfer of Immovable Property (Relaxation of Restriction) Act, 1953] প্রণয়ন করা হয়। সরকার ঘোষিত এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের সুবিধা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালের ২৭ আগস্ট পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে তৎকালীন অর্থ ও রাজস্বমন্ত্রী "পূর্ব বাংলা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর (শিথিলকরণ) বিল, ১৯৫৩" নামে একটি বিল উত্থাপন করে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,

> The Government of Pakistan have established an organisation called 'The Agricultural Development Finance Corporation' for the purpose of financing the agriculturists in conducting agricultural operation on more improved line including mechanised agriculture. This corporation has already come into existence and begun to function. It has been found on examination that because of the restriction on transfer of immovable property under the State Acquisition Act and certain other Acts of East Bengal. It is not possible to accept mortgages of all agricultural lands by the Agricultural Development Finance Corporation for the purpose of advancing money to the agriculturists of this Province.[126]

পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপিত বিলের ওপর আলোচনাকালে কংগ্রেস দলীয় সদস্য জোতিন্দ্র নাথ ভদ্র বলেন যে পূর্ব বাংলায় ভূমি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে যতগুলো আইন হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে জনসাধারণের অধিকার হরণ করা হয়েছে। আবার প্রত্যেক আইনে এই সুবিধাও রয়েছে যে কালেক্টর ইচ্ছা করলেই সরকারের প্রয়োজন অনুসারে জনগণের জমি হস্তান্তরের অনুমতি দিতে পারেন। তবে সে হস্তান্তর হতো খুব ধীরগতিতে এবং সরকারের ইচ্ছেমতো।[১২৭] অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যের মূল কথা ছিল সরকার চাইলে জমি হস্তান্তর হবে, না চাইলে হবে না। একই দলের অপর সদস্য

---

[১২৫] *Assmbly Proceedings*, Vol. X, No. 2, 1953, p. 328.

[১২৬] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. XI, No. 1, Eleventh Session, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 31st August and 2nd September, 1953 (Dacca : East Bengal Government Press, 1954), p. 105.

[১২৭] *Assembly Proceedings*, Vol. XI, No. 1, 1953, p. 106.

প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী মন্তব্য করেন যে তাঁরা (পরিষদের কংগ্রেস দলীয় কয়েকজন সদস্য) ইতিপূর্বেই সম্পত্তি হস্তান্তর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আইন তৈরির সময় বিরোধিতা করেছিলেন। তখন তাঁরা অভিমত দিয়েছিলেন যে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধান মতে ১০ বিঘার বেশি সম্পত্তি কেউ হস্তান্তর করতে পারবেনা। ফলে সেটি মানুষের ক্ষতির কারণ হবে। মানুষের জরুরি কাজে অর্থের প্রয়োজন হয় এবং সেজন্য অনেক সময় জমি হস্তান্তরও করতে হয়। কিন্তু সরকার তখন পরিষদের সদস্যদের মন্তব্য গ্রহণ করে নি। সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষমতাবলে জোরপূর্বক তখন সম্পত্তি হস্তান্তর প্রতিবন্ধকতার আইন প্রণয়ন করেন। ফলস্বরূপ প্রতিনিয়ত জনসাধারণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। রাজস্বমন্ত্রী বর্তমান বিল উত্থাপন করায় প্রমাণিত হয় যে মানুষের সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রয়োজন আছে। এমনকি ব্যক্তি ও পারিবারিক জরুরি প্রয়োজন ছাড়াও জমির উন্নতি ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও মানুষের অর্থের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় কৃষকের পাশাপাশি জমিদার ও জোতদারের হাতেও নগদ অর্থ থাকে না। এজন্য তাকে জমি বন্ধক দিয়ে ঋণ নিতে হয়। কিন্তু উক্ত জমি হস্তান্তর আইনে এই বন্ধক দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে। অথচ বর্তমান বিলে বলা হয়েছে যে ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের নিকট জমি বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়া যাবে। এর দ্বারা স্বীকার করা হলো যে জমি হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু বর্তমান বিলে জমি বন্ধক দেওয়ার অধিকার প্রদান করলেও বিক্রি করার অধিকার দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন যে মানুষের জমি বন্ধক দেওয়ার পাশাপাশি বিক্রি করারও প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু বর্তমান বিলের বিধি অনুযায়ী মানুষ জমি বিক্রি করতে পারবে না। বর্তমান বিলে বলা হয়েছে যে জমি বিক্রির বিষয়ে পূর্বের আইনই বলবৎ থাকবে। সেই আইন অনুযায়ী জমি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করলে সেই আবেদন অনুমোদন সাপেক্ষে জমি হস্তান্তরিত হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে তাঁর জানা মতে সাধারণত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা বড় জোর ২% বা ৩% ক্ষেত্রে জমি হস্তান্তরের অনুমতি দেন। তিনি সরকারের নিকট প্রশ্ন করেন যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে যখন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তখন অনর্থক এই আইন করতে যাচ্ছেন কেন? ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের কাছে অর্থ ধার করতে গেলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই বন্ধক দেবার অনুমতি দিতে পারেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদত্ত আবেদন যৌক্তিক মনে হলে তিনি অনুমতি দিবেন-এই ক্ষমতা যদি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়া হয় তাহলে তিনি মনে করেন যে বর্তমান আইন অনাবশ্যক। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের ওপর সরকারের অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই। বর্তমান বিল উত্থাপনের পর তাঁর মনে হয়েছে যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা অনুমতি দেন না, কারণ সরকারের সেই মতো নির্দেশ থাকে। সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে আইন যদি করতেই হয় তাহলে ১০ বিঘার বেশি জমি কেউ হস্তান্তর করতে পারবেনা বলে যে আইন রয়েছে তা প্রত্যাহার করে জনসাধারণের অসুবিধা দূর করতে হবে।[১২৮] অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ১০ বিঘার বেশি জমি হস্তান্তরের অধিকার দিতে হবে। অপর কংগ্রেস সদস্য বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী সরকারের সমালোচনা করে বলেন যে কঠোর আইন দ্বারা কৃষিকার্যের সহায়তা করা সম্ভব নয়। তিনি নিজেই গ্রামাঞ্চলে দেখেছেন যে কৃষকদের সংসারের ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য না থাকায় অর্থাভাবে উপযুক্তভাবে জমি চাষ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তিনি বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি উন্নয়ন ফাইন্যান্স কর্পোরেশন করেছেন এবং তার কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিষয়ে প্রাদেশিক সরকার কোনো বিষয় প্রয়োজন মনে করলে তাদের কাছে পেশ করবে এবং তারা সমীচীন মনে করলে সেটা গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রে কৃষির উন্নয়ন কল্পে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে সব পদক্ষেপ দরকার তার জন্য বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের শিথিলকরণ দরকার তা বিবেচনা করে দেখা দরকার। কাজেই এসব বিষয়ের জন্য এই বিল জনমত গ্রহণের জন্য প্রচার করা দরকার। তাঁর ধারণা ছিল যে এই প্রদেশে অনেক জমি পড়ে আছে যা হস্তান্তর করা বা

[১২৮] *Assembly Proceedings*, Vol. XI, No. 1, 1953, pp. 106-107.

চাষ করা সম্ভব নয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অনেক জমি পত্তনের জন্য আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু তারা কোনো উত্তর দেয়নি। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন যে আইনি কঠোরতার জন্য বহু জমি ময়মনসিংহ জেলায় পড়ে আছে। তাঁর মতে কৃষির উৎকর্ষসাধনের জন্য কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা বিস্তারিতভাবে এই পরিষদে আলোচনা করা উচিত। এর ফলে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ হবে এবং এর মাধ্যমে দেশের মানুষ উপকৃত হবে। তিনি বলেন যে পূর্ব বাংলার সমবায় সমিতি বা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষক ও কৃষির উন্নয়নে সুষ্ঠুভাবে কোনো কাজ করে না বরং তাদের কাজে দেশবাসীর আরও দুর্ভোগে ভুগতে হয়। জনসাধারণের হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া উচিত যাতে তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দেশে কৃষির অবনতি হয়েছে যার ফলে দেশের মানুষ দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছে। দেশের আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। দেশের কৃষি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেন চেষ্টা করতে পারে সে দিকে লক্ষ রেখে আইন প্রণয়ন করতে হবে। চক্রবর্তীর মতে সরকার যদি সত্যিই আইন শিথিল করতে চায় তাহলে শুধু বর্তমান আইন নয় বরং সকল আইনের কঠোরতা হ্রাস করা প্রয়োজন। কোথায় আইন শিথিলকরণ বা আইনের কঠোরতা হ্রাস প্রয়োজন তা বিচারের জন্য জনসাধারণের নিকট বিষয়গুলো প্রচার করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।[১২৯] অর্থাৎ তিনি দেশ এবং জনসাধারণের স্বার্থে ভূমিসংক্রান্ত সকল আইন পরিবর্তনে সরকারকে পরামর্শ দেন। পরিষদ সদস্য মুনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য বিলের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে এটি প্রথমে ১৯৪৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর ভূমি হস্তান্তর অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় আইন হিসেবে কার্যকর করার পর ১৯৫১ সালের ২০-২৩ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদে দীর্ঘ আলোচনা শেষে গৃহীত হয়ে আইনে পরিণত হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে শুরু থেকেই তাঁরা [প্রাদেশিক পরিষদের কংগ্রেস দলীয় কতিপয় সদস্য] জনসাধারণের ভূমি হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এই আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। এমনকি ১৯৫১ সালে যখন এটি আইনে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বিল হিসেবে এই পরিষদে উত্থাপন করা হয়েছিল তখনও মানুষের সমস্যার কথা উল্লেখ করে ভূমি হস্তান্তর সহজকরণ করার জন্য তাঁরা সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সরকার তখন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষমতাবলে জোরপূর্বক ভূমি হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে কঠোর আইন প্রণয়ন করেছিলেন। অথচ বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে হলেও রাজস্বমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে কৃষির উন্নতির জন্য হলেও ভূমি হস্তান্তর শিথিলকরণ প্রয়োজন। কারণ কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের মূলধন প্রয়োজন হয়। কেননা প্রত্যেক বছর বীজ বপনকালে, ক্ষেত নিড়ানোর সময় এবং ফসল কাটা ও ঘরে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অধিকাংশ কৃষকের হাতে থাকে না। সে জন্য কৃষককে তখন ঋণ করে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। এমনকি অনেক সময় তার খাদ্যের জন্যও ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো ঋণের জন্য কৃষকের আমানত কী ছিল? প্রকৃতপক্ষে কৃষকের আমানত হচ্ছে মূলত জমি। কঠোর ভূমি হস্তান্তর আইন তৈরির পূর্বে কৃষকরা জমি বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করতো। কিন্তু সরকারের কঠোর আইন প্রণয়নের পর কৃষকের খাদ্য বা কৃষির উন্নতি বা অন্যান্য পারিবারিক জরুরি প্রয়োজনে কৃষক আর দু'এক বিঘা জমি বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে না। অন্যান্য প্রয়োজনের কথা বাদ দিলেও কৃষি কার্যের জন্য হলেও কৃষকের অর্থের প্রয়োজন হয়। বীজ ক্রয় বা গবাদিপশুর হঠাৎ মৃত্যু একজন কৃষকের জন্য ভয়ানক বিপদ সৃষ্টি করে। এসব বিপদ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে জমি বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহের জন্য কৃষককে ভূমি হস্তান্তরের অধিকার দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে পরিষদের সদস্যদের সুপারিশ সরকার পক্ষ অবজ্ঞা করে এসেছিল। কিন্তু বর্তমানে সরকারের উপলব্ধি হয়েছে যে কৃষকের জমি বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহের পথ উন্মুক্ত করা উচিত। তবে এই বিলেও সরকার কৃষককে যে অধিকার দিচ্ছেন তাতে কৃষকরা পুরোপুরি উপকৃত হবে না। কারণ এই বিলে কেবলমাত্র বলা হয়েছে যে কৃষকরা কৃষি

---

[১২৯] *Assembly Proceedings*, Vol. XI, No. 1, 1953, pp. 107-108.

সংশ্লিষ্টতার প্রয়োজনে কৃষি ফাইন্যান্স কর্পোরেশনে জমি বন্ধক রেখে ঋণ নিতে পারবে। প্রশ্ন হলো তারা কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষককে ঋণ দেবে? প্রকৃতপক্ষে তারা ঋণ দেবে ট্রাক্টর ও সার ক্রয়ের জন্য। তিনি বলেন যে সত্যি হলো এটাই যে দেশের গরিব চাষীরা ট্রাক্টর ক্রয় করে না এবং সারও ক্রয় করে না। তারা সারের ব্যবহার জানে না। তারা গোবরের সার ব্যবহার করে। বস্তুত, তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন হয় বীজ ক্রয়, জমি নিড়ানোর সময় এবং হঠাৎ করে গবাদিপশুর মৃত্যু হলে। এদেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র। তাদের স্বল্প জমির চাষ এবং স্বল্প অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এই সামান্য অর্থ ঋণ দিতে আগ্রহ দেখাবে না। তারা ঋণ দিবে বেশি জমির মালিকদের, যারা ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করবে তাদেরকে। সে জন্য তিনি বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব করেন যে কর্পোরেশনের পাশাপাশি 'ব্যক্তির কাছে বন্ধক' দেওয়ার সুবিধা দিতে হবে। তা না হলে দেশের শতকরা ৮০ জন কৃষক এই সুবিধা নিতে পারবে না।[১৩০] অর্থাৎ তাঁর মূল বক্তব্য ছিল সাধারণ কৃষকদের সুবিধার জন্য কৃষি ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের পাশাপাশি ব্যক্তির নিকটও জমি বন্ধক রাখার সুযোগ দিতে হবে। তাঁর প্রস্তাব মতে এই ব্যবস্থা বিলে সংযুক্ত হলে নিঃসন্দেহে অন্যরাও বিশেষত জমিদাররাও যে এই সুবিধা নিতে পারতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতপক্ষে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলীয় সদস্য ভট্টাচার্যের মূল উদ্দেশ্যও ছিল সেটাই। কিন্তু সরকার শুধু তাঁর প্রস্তাব নয়, অন্য কোনো কংগ্রেস দলীয় সদস্যের সংশোধনী প্রস্তাবও গ্রহণ করে নি। যাহোক, দীর্ঘ আলোচনা শেষে ১৯৫৩ সালের ২৭ আগস্ট বিলটি গৃহীত হয় এবং আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে বিলটি ১৯৫৩ সালের পূর্ব বাংলা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর (শিথিলকরণ) আইনে পরিণত হয়। মূলত এটি ছিল কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইন। কিন্তু এই আইনের পর জমিদাররা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অতিরিক্ত জমি হস্তান্তর করে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কার্যকর হওয়ার পর আইনটি কার্যত জমিদারদের সুবিধা বৃদ্ধি করেছিল এবং পাশাপাশি জোতদাররাও লাভবান হয়েছিল। সুতরাং জমিদার ও জোতদার প্রভাবিত সরকারের উদ্দেশ্যে ফলপ্রসূ হলেও কৃষকরা এই আইনে কোনোভাবে উপকৃত হয়নি। ফলে এই আইন ভূমি বিরোধ হ্রাসে কোনো প্রভাব পড়েনি।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতে চুয়ান্ন সালের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগ সরকারের শাসনামলে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে ভূমি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্থাপিত বিলের ওপর আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জমিদার এবং জোতদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ তথা সরকার দলীয় সদস্যরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীরব থাকতেন। তবে কখনও কখনও তাঁরা কৃষক ও জোতদারদের পক্ষে বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব দিতেন এবং সরকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সরকার তা গ্রহণও করতেন। অন্যদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা বিলের বিরোধিতা করতেন। এছাড়াও তাঁরা বেশির ভাগ সময় জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সংশোধনী প্রস্তাব দিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। উল্লেখ্য, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত হিন্দু প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিলেন জমিদার প্রভাবিত রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস মনোনীত জমিদার ও জমিদার সমর্থক নেতৃবৃন্দ। এই জমিদার সমর্থক নেতৃবৃন্দের মধ্যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণি হিসেবে পরিচিত একটি অংশ ছিলেন হিন্দু জমিদার ও জোতদার পরিবারের সন্তানরা। এরা পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে জমিদারদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন। তবে নির্বাচিত হিন্দু প্রতিনিধিদের মধ্যে অল্প সংখ্যক কিন্তু স্পন্দমান একটি অংশ ছিলেন যারা ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে জমিদারদের স্বার্থের পরিবর্তে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন। নির্বাচিত এই হিন্দু প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন সিডিউল কাস্ট ও অকংগ্রেসি বর্ণ হিন্দু সদস্য (ভারতীয়

[১৩০] *Assembly Proceedings*, Vol. XI, No. 1, 1953, pp. 109-111.

কমিউনিস্ট পার্টি-সি.পি.আই'র ৩ জন, ক্ষত্রিয় সমিতির ১ জন, তফসিলি ফেডারেশনের ২ জন ও স্বতন্ত্র ৪ জন সর্বমোট ১০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন) যারা প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের কৃষকদের সমর্থনে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১৩১] নির্বাচনের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কেউ কেউ মুসলিম লীগ সরকারেও যোগদান করেন। যেমন ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত ৮ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভায় তফসিলি হিন্দু সদস্য যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (বিচার ও সংসদীয় বিষয়ক, পূর্ত ও গৃহনির্মাণ) মন্ত্রী হিসেবে সরকারে যোগদান করেন।[১৩২] পরবর্তীকালে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় যোগদান করলে নতুন করে সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভায় ৪ জন সদস্য যোগদান করেন তার মধ্যে ৩ জন ছিলেন হিন্দু সদস্য। এঁরা হলেন তারকানাথ মুখার্জী (সেচ ও নদীপথ মন্ত্রী), নগেন্দ্র নারায়ণ রায় (বিচার ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী) ও দ্বারকানাথ বাড়ৈ (ওয়ার্কস ও বিল্ডিং বিষয়ক মন্ত্রী)। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা বাংলাকে দু'টি অংশে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলা বিভক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দীর স্থলে খাজা নাজিমউদ্দিন সংসদীয় নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট খাজা নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা এবং পরবর্তীকালে নূরুল আমিনের মন্ত্রিসভায়ও হিন্দু সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।[১৩৩] ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর নির্বাচিত সিডিউল কাস্ট এবং অকংগ্রেসি বর্ণ হিন্দু সদস্যদের বেশ কয়েক জন যেমন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, তারকানাথ মুখার্জী, নগেন্দ্র নারায়ণ রায়, দ্বারকানাথ বাড়ৈ, হারাণ চন্দ্র বর্মন, ডা. ভোলা নাথ বিশ্বাস, গয়ানাথ বিশ্বাস, জগদ্বন্ধু সরকার প্রমুখ পরিষদে ভূমি সংক্রান্ত বিশেষত কৃষি ও কৃষক শ্রেণির স্বার্থে উত্থাপিত বিলের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষ সমর্থন করতেন। অন্যদিকে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে পুর্ণেন্দু কিশোর সেন গুপ্ত, জোতিন্দ্র নাথ ভদ্র, মুনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী, বিনোদ বিহারী চৌধুরী, বসন্ত কুমার দাস, ব্রজমাধব দাস, সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত, ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, নীরেন্দ্র নাথ দেব, মনোরঞ্জন ধর, হারাণ চন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, অবলা কান্ত গুপ্ত, প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, রজনী কান্ত রায় বর্মন, প্রফুল্ল রঞ্জন সরকার, মিসেস নীলী সেন গুপ্ত এবং গোবিন্দলাল ব্যানার্জীসহ মোট ১৮ জন সদস্য প্রধানত জমিদারদের স্বার্থে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনসহ ভূমি সংক্রান্ত যে কোনো আইন প্রণয়ন ও আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে উত্থাপিত বিলের বিরোধিতা, সমালোচনা এবং বিধি শিথিলকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হতেন।[১৩৪] এসব কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় আইন পরিষদে নানা কৌশলী ভূমিকা পালন করতেন। এর ফলে আইন সভায় সরকার কর্তৃক আনীত বিলের ওপর আলোচনার সময় যে ভূমি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার ভূমি বিরোধের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছিল। পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের এই ভূমি বিতর্কের সময় কখনও কখনও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ মনে হলেও মূলত তা ছিল ভূমি বিরোধের প্রতিচ্ছবি। প্রকৃতপক্ষে এই ভূমি বিতর্কের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উপাদানের উপস্থিতির চেয়ে রাজনৈতিক উপাদান অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। এই ভূমি বিতর্ককে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝা যায় যে বিদ্যমান ভূমি কেন্দ্রিক সমস্যা পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে কতখানি প্রভাব বিস্তার সক্ষম হয়েছিল।

---

[১৩১] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, p. 214; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২৪।

[১৩২] রশিদ, *"বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা"*, পৃ. ২০৭।

[১৩৩] মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা : সময় প্রকাশন, তৃতীয় বর্ধিত সংস্করণ, ২০০৩), পৃ. ৮১-৮২।

[১৩৪] এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *Assembly Proceedings*, Vol. XI, No. 1, 1953, pp. 103-104.

৪.১৪ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৯৫৬ সালের ভূমি সংস্কার

১৯৫৬ সালের ২২ মে পূর্ব পাকিস্তান সরকার সকল শ্রেণির ভূ-সম্পত্তিতে সরকারি কর্তৃত্ব স্থাপন এবং একশ বিঘার বেশি জমির মালিকদের অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন এবং ১৯৫৬ সালের এতৎসম্পর্কিত প্রদত্ত সাধারণ বিজ্ঞপ্তি সংশোধন করে দু'টি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। প্রথম বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত প্রদেশের সকল স্থানে অবস্থিত সমস্ত খাজনা আদায়ী স্বত্ব, ভূ-সম্পত্তি, তালুক, রায়তিস্বত্ব, জোত-জমা এবং প্রজাস্বত্ব সম্পর্কিত সকল স্বত্ব-স্বামীত্ব দখলে নেওয়ার ঘোষণা দেয় এবং এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে বলে উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ত্রুটির জন্য এবং ১৯৫৬ সালের ১৪ এপ্রিল প্রকাশিত সাধারণ বিজ্ঞপ্তির আওতায় পড়ে না এমন সকল ভূসম্পত্তি এতকাল দখল করা সম্ভব না হওয়ায় ঐ সমুদয়কে এর আওতায় আনার উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ছাড়া প্রদেশের যে কোনো স্থানে অবস্থিত সমস্ত খাজনা আদায়ী স্বত্বের মধ্যে নির্ধারিত মানের একশ বিঘার অতিরিক্ত জমিও অবিলম্বে দখল করেছে বলে গণ্য হবে। উপরিউক্ত উভয় বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের যথাক্রমে ৩ ধারার (১) ও (২) উপধারা অনুযায়ী এ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে ওয়াকফ, দেবোত্তর ও অন্য ধর্মীয় ট্রাস্টের জমি-জমার ওপর এ বিজ্ঞপ্তি প্রযোজ্য হবে না।[১৩৫] অর্থাৎ সরকার এই দু'টি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রদেশের সকল শ্রেণির সাধারণ ভূসম্পত্তি সরকারি কর্তৃত্বে নিয়ে আসে। এর ফলে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন ত্রুটিমুক্ত হয় এবং একশ বিঘার ওপর সমস্ত জমি সরকারি দখলে চলে আসে। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৯ সালের ২১ মে সরকার আরও একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এই বিজ্ঞপ্তির বলে সরকার প্রদেশের যে কোনো স্থানে অবস্থিত একশ বিঘার অতিরিক্ত জমিদার ও জোতদারের দখলিকৃত সমস্ত জমি দখল করে নেয়। এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে একশ বিঘার অতিরিক্ত কৃষি জমি দখল সংক্রান্ত নির্দেশনামা অবিলম্বে কার্যকর হবে। তবে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে এতদ্বারা ওয়াক্ফ, দেবোত্তর ও অন্যান্য ধর্মীয় ট্রাস্টের অধীনস্থ ভূমি দখল করা হবে না।[১৩৬] উক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ভূমি সংস্কার সম্পন্ন হলেও সরকারি অধিগ্রহণকৃত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। ফলে সাধারণ কৃষক বা ভূমিহীন কৃষকরা এর দ্বারা কোনোভাবেই উপকৃত হয়নি। এ কারণে এ ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমি বিরোধও হ্রাস পায়নি।

৪.১৫ ১৯৬১ সালের পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে জেনারেল আগা মোহাম্মদ আইয়ুব খান প্রধান সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং ২৭ অক্টোবর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইসকান্দার মীর্জাকে উৎখাত করে ২৮ অক্টোবর তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১৩৭] আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই দ্রুত দেশের ভূমি সংস্কারের ঘোষণা দেন।[১৩৮] তিনি ক্ষমতায় এসেই বুঝতে পারেন যে ভূমি সংস্কার ছাড়া রাজস্ব প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা অসম্ভব। ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি ভূমি সংস্কার

[১৩৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ মে, ১৯৫৯।
[১৩৬] *সংবাদ*, ২৩ মে, ১৯৫৯।
[১৩৭] রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৫০।
[১৩৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ অক্টোবর, ১৯৫৮।

কমিশন গঠনেরও ঘোষণা করেন। আইয়ুব খানের ভূমি সংস্কার কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, "No significant action was taken until October 1958, when the Government appointed the Land Reforms Commission to examine the problems relating to the ownership and tenancy of agricultural land, and to recommend suitable measures for ensuring social justice, security of tenure for the tenant and better production."[139] আইয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পরই পশ্চিম পাকিস্তানে ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর আখতার হোসেনকে প্রধান করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি ভূমি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের বাকি ৮ জন সদস্য ছিলেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য। এই কমিশন আখতার হোসেন কমিশন হিসেবে পরিচিত।[১৪০] এই কমিশন পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও ১৯৫৮ সালের ২৩ নভেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত ভূমি সংস্কার কমিশনের বৈঠকের পর ঘোষণা করে যে এই কমিশন পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি সংস্কারেও কাজ করবে। কমিশনের মতে ইতোপূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে ভূমি সংস্কার যথাযথভাবে কার্যকরী করা হয়নি। কেননা ভূমির মালিকানাস্বত্ব জনসাধারণের নিকট হস্তান্তর করা হয় নি। সুতরাং এবার মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তর করবে কমিশন। উল্লেখ্য, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে অধিগ্রহণকৃত অধিকাংশ ভূমি প্রাদেশিক সরকারের অধীনে থাকলেও তা জনসাধারণের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নি। আখতার হোসেন কমিশনের মতে এই সমস্ত ভূমি হস্তান্তর করা হলে প্রদেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে করাচীতে অনুষ্ঠিত অর্থনীতিবিদদের সম্মেলনে প্ল্যানিং বোর্ডের ভূমি সংস্কার পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছিল।[১৪১] এই পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য প্ল্যানিং বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ভূমির ঊর্ধ্ব সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে জনসাধারণের জন্য নির্ধারিত ভূমির ঊর্ধ্বসীমা ছিল সম্পূর্ণভাবে সেচ কাজের ওপর নির্ভরশীল ভূমির ক্ষেত্রে ১৫০ একর, আংশিকভাবে সেচের ওপর নির্ভরশীল ভূমির ক্ষেত্রে ৩০০ একর এবং সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল ভূমির ক্ষেত্রে ৪৫০ একর। উল্লেখ্য, পশ্চিম পাকিস্তানে ৬ হাজার মানুষের মালিকানায় ভূমির পরিমাণ ছিল পাঁচশ একর বা ততোধিক এবং একশ একর বা ততোধিক একরের ওপর ভূমি মালিকদের সংখ্যা ছিল ৬৫,০০০ জন। কাজেই তাদের মধ্যে ভূমির মালিকানা পুনর্বণ্টনই ছিল প্রধান সমস্যা। পশ্চিম পাকিস্তানে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানার পরিমাণ ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি কারণ এখানে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো তথ্য বা পরিসংখ্যান ছিল না। ১৯৫৮ সালের ২৪ নভেম্বর *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার খবরে জানা যায় যে ভূমি সংস্কার কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করার পর পাকিস্তানের সর্বত্র ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে। এছাড়াও পাকিস্তান প্ল্যানিং বোর্ড ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানার পরিমাণ নির্ধারণের যে সুপারিশ পেশ করেছিল তা আরও বৃদ্ধি করা হবে বলেও জানা যায়।[১৪২] ১৯৫৯ সালের জানুয়ারির মাসে আখতার হোসেন কমিশন একটি দীর্ঘ সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেন। এই কমিশন জায়গীরদারি প্রথার বিলুপ্তি, দখলিস্বত্বের কৃষকদের জমির মালিকানা প্রদান, নির্দিষ্ট খাজনা ধার্য, শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি, পরিবার প্রতি জমির সীমা হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সুপারিশ করে।[১৪৩] কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে আইয়ুব খানের সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে ৬৪ নং রেগুলেশন

---

[১৩৯] *Second Five Year Plan 1960-65, June, 1960,* pp. 184-185.
[১৪০] ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৭।
[১৪১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ জুন, ১৯৫৬।
[১৪২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ নভেম্বর, ১৯৫৮।
[১৪৩] ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৭।

জারি করে।[১৪৪] এই রেগুলেশনের বিধান অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানে পরিবার প্রতি জমির সীমা সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকায় ৫০০ একর এবং সেচ-সুবিধা বহির্ভূত এলাকায় ১০০০ একর নির্ধারিত হয়।[১৪৫]

আইয়ুব খানের শাসনামলে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর বলেন যে এক দশকের অধিকাল ধরে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পের বিকাশ ঘটলেও ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সেখানে কোনো ভূমি সংস্কার হয় নি। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল। আইয়ুব খানের পূর্ববর্তী শাসকদের ভূস্বামী শ্রেণির ওপর অনেক বেশি নির্ভর করতে হতো, তারা নিজেরাও অধিকাংশই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় সামন্ত পরিবারের সন্তান। কাজেই যতোদিন তাদের হাতে নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল ততোদিন পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো ভূমি সংস্কারই সম্ভব হয় নি। আইয়ুব খানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান সেদিক দিয়ে অনেক স্বতন্ত্র ছিল। ভূস্বামীর শ্রেণির সাথে তাঁর সামরিক শাসনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকলেও তাদের ওপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন না। সে দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে শিল্প, ব্যবসা ও সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণির সাথেই আইয়ুবের যোগসূত্র ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশি। এই শ্রেণির সমর্থনে ও স্বার্থেই আইয়ুব খান শাসন ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে বড় বড় সামন্ত পরিবারের ভূস্বামী শ্রেণির প্রভাব ক্ষুণ্ন করে দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে বড় বড় সামন্ত পরিবারের ভূস্বামীদের প্রভাব ক্ষুণ্ন করাই ছিল আইয়ুব খানের মুখ্য উদ্দেশ্য। তারপরও বলা যায় যে ভূমি সংস্কারের দিক থেকে জমির সীমা হ্রাস করা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ সেখানে বড় জমিদারদের এক একজনের জমির পরিমাণ ছিল দশ থেকে তিরিশ-চল্লিশ হাজার একর পর্যন্ত।[১৪৬] এ ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমির ঊর্ধ্ব সীমা অনেক হ্রাস করা হয়েছিল। হেলাল উদ্দিন আহমেদের মতে আইয়ুব খানের পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমি সংস্কারের ফলে মাঝারি পর্যায়ের নতুন একটি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে এবং তারা ছিলেন খামার মালিক। পরবর্তী সময়ে এই খামারগুলোই কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[১৪৭] প্রকৃতপক্ষে আইয়ুব খানের ভূমি সংস্কারে পশ্চিম পাকিস্তানের এই মাঝারি পর্যায়ের খামার মালিকেরাই আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছিল। তারা আর্থিকভাবে সচ্ছলতা লাভ করে আইয়ুব খানের সমর্থক ও সহযোগী শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে সরকারি সহযোগিতার অভাবে সাধারণ কৃষকরা পূর্বের ন্যায় দরিদ্র অবস্থায় রয়ে যায়। সুতরাং এই ভূমি সংস্কারে পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষককুল আদৌ উপকৃত হয় নি। কিন্তু এর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষকদের মধ্যেও কোনো দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নি। কারণ একদিকে আইয়ুব খানের শাসনামলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল এবং অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অসংগঠিত কৃষকরাও ভূমি সংস্কারের পর উল্লেখযোগ্য কোনো কর্মসূচি ঘোষণা করে নি। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানে ভূমি সংস্কারের পর সেখানকার কৃষকরা নীরব ভূমিকা পালন করেছিল।

একদিকে আইয়ুব খানের সরকার ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে রেগুলেশন জারির মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে ভূমি সংস্কার সম্পন্ন করে এবং অন্যদিকে উক্ত সময়েই পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যে তদানীন্তন রাজস্ব

---

[১৪৪] https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_Pakistan, Accessed on 12 July 2019.

[১৪৫] বদরুদ্দীন উমর, *বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৫), পৃ. ৪২-৪৩; ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৭; https://en.wikipedia.org/ *wiki/Agriculture_in_Pakistan*, Accessed on 12 June 2019.

[১৪৬] উমর, *বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন*, পৃ. ৪২-৪৩।

[১৪৭] ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫।

বোর্ডের সাবেক জ্যেষ্ঠ সদস্য খান বাহাদুর মোহাম্মদ মাহমুদের[১৪৮] সভাপতিত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট 'ভূমি রাজস্ব কমিশন' গঠন করে। এই কমিশনের অপর দু'জন সদস্য ছিলেন খান বাহাদুর মাহাবুবউদ্দিন আহমেদ[১৪৯] এবং টি. হোসাইন[১৫০]। এই কমিশন পূর্ব পাকিস্তান ভূমি রাজস্ব কমিশন হিসেবেই সমধিক পরিচিত। তবে ভূমি রাজস্ব কমিশনের সভাপতি হিসেবে খান বাহাদুর মোহাম্মদ মাহমুদ দায়িত্ব পালন করায় এই কমিশন মাহমুদ কমিশন নামেও পরিচিত।[১৫১] পূর্ব পাকিস্তান ভূমি রাজস্ব কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য ছিল প্রদেশের দখলিকৃত জমিদারির ক্ষতিপূরণ দান ও ভূমি রাজস্ব আদায়ের কার্যকরী ও উন্নত ধরনের পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ করা।[১৫২] দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ভূমি রাজস্ব কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> In December, 1958, the East Pakistan Government, realizing the administrative and other difficulties facing the speedy implementation of the scheme, appointed a Land Revenue Commission. The Commission was asked to examine, *inter alia* the methods of assessment and payment of compensation, the procedures for the preparation of correct record of rights, the state of collection of rents and cesses, and the administration of the Revenue Department.[153]

বস্তুত, পূর্ব পাকিস্তান ভূমি রাজস্ব কমিশনের কার্যপরিধিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ কার্যক্রমের অগ্রগতি, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, এই পদ্ধতির কার্যকারিতা ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে জটিলতাসহ রাজস্ব বিভাগীয় প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। এছাড়াও কমিশনের দায়িত্ব ছিল জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ফলে ভূমি মালিক কৃষকদেরকে সরাসরি সরকারের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য সঠিক ভূমি রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবনসহ সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার সুপারিশ করা। উল্লেখ্য, মধ্যস্বত্ব বিলোপ করে ভূমি মালিক কৃষকদেরকে সরাসরি সরকারের সংস্পর্শে এবং নিয়ন্ত্রণাধীণে আনার একমাত্র মাধ্যম ছিল রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই কমিশনের অভিমত ছিল যে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তন করতে হলে উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে প্রত্যেক ভূমি মালিকের ভূমির বিবরণ, জমির শ্রেণিবিভাগ, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণসহ যাবতীয় কৃষি তথ্য, ভূমি মালিকের উত্তরাধিকারিগণের তালিকা এবং পরিবর্তিত মালিকানার ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে খতিয়ান পরিবর্তন ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ভূমি রেকর্ড প্রণয়ন পদ্ধতি পরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এটা ছিল একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার অথচ কমিশনের ওপর দায়িত্ব ছিল স্বল্পতম সময়ে মধ্যে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সার্থক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে এবং সামাজিক শান্তি, স্থিরতা অর্জন ও কৃষি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তনে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করতে হবে। উল্লেখ্য, রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ ছিল সঠিক ও নির্ভরযোগ্য খতিয়ান প্রণয়ন করা। কেননা এই খতিয়ানের ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে মৌজা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে রেকর্ড সংরক্ষণ ও সংশোধন কাজ পরিচালিত হবে। এ কারণে পরিবার ভিত্তিক সঠিক খতিয়ান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে রেকর্ড প্রণয়ন পদ্ধতির সংশোধন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপযোগী রূপরেখা প্রণয়ন সম্পর্কেও কমিশন বিবেচনা করেছিল।[১৫৪]

---

[১৪৮] Khan Bahadur Mahmud, Retired Member, Board of Revenue, Government of former East Pakistan, as the Chairman, to review the difficulties faced in the implemention of the provisions of the East Bengal State Acquisition and Tenancy Act, 1950.

[১৪৯] Khan Bahadur Mahbubuddin Ahmed, Retired Joint Secretary, Revenue Department, Government of former East Pakistan.

[১৫০] Mr. T. Hussain, the then Director of Land Records and Survey, Government of former East Pakistan.

[১৫১] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. মুখবন্ধ ঘ-ঙ; Bari, *District Gazetteers : Jessore*, pp. 253-254; Khan, *District Gazetteers : Pabna*, pp. 259-260. অবশ্য দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার তথ্য মতে পূর্ব পাকিস্তান ভূমি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয় ১৯৫৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর। দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জুলাই, ১৯৫৯।

[১৫২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জুলাই, ১৯৫৯।

[১৫৩] *Second Five Year Plan 1960-65*, June, 1960, p. 189.

[১৫৪] *ভূমি রেকর্ড ও জরিপ*, পৃ. মুখবন্ধ ঘ-ঙ।

১৯৫৯ সালের ৮ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান ভূমি রাজস্ব কমিশন প্রাদেশিক গভর্নর জাকির হোসেনের নিকট কমিশনের সুপারিশ সম্বলিত একটি রিপোর্ট পেশ করে। পূর্ব পাকিস্তান ভূমি রাজস্ব কমিশনের সুপারিশসমূহ ছিল নিম্নরূপ : (১) ভবিষ্যতে সমস্ত কৃষক ভূমির 'মালিক' বলে পরিচিত হবে। (২) ভবিষ্যতে কৃষকদের জমি ব্যবহার ও দখলের জন্য তারা সরকারকে যে অর্থ দিবে তাকে "ভূমি রাজস্ব" বলা হবে। (৩) কোনো ব্যক্তির পরিবার প্রতি বসতবাটি, ফলের বাগান প্রভৃতিসহ জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ১২৪ একর বা ৩৭৫ বিঘা। কিন্তু যেখানে একর প্রতি উৎপাদন গড় ১৫ মণের কম সেখানে বসতবাটি ও পারিবারিক ফলের বাগানসহ পরিবার প্রতি সর্বাধিক জমির পরিমাণ হবে ১৩৩ একর বা ৪০৩ বিঘা। (৪) জমির অধিকতর বিখণ্ডিকরণ প্রতিরোধের জন্য জমির সর্বনিম্ন খণ্ড তিন একর নির্ধারণ করে দিতে হবে। (৫) মূল্য নির্ধারণ ও ক্ষতিপূরণের ভিত্তিতে জমি রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ করতে হবে। (৬) ৩০ বছরের স্থলে ২০ বছর পর পর খাজনা বা রাজস্ব পুনঃনির্ধারণ করতে হবে। (৭) অন্তর্বর্তীকালীন সমস্ত প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে হবে এবং জমির প্রাক্তন মালিকদের অনতিবিলম্বে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। (৮) সরকার কর্তৃক দখলিকৃত সকল ওয়াক্ফ, দেবোত্তর এবং ট্রাস্টি সম্পত্তির জন্য প্রদত্ত বার্ষিক ভাতা দ্রুত নির্ধারণ করতে হবে এবং ওয়াক্ফ কমিশনার অথবা সরকার নিযুক্ত ট্রাস্টির মাধ্যমে মোতোয়াল্লি, সেবাইত ও সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টির নিকট তা নিয়মিতভাবে প্রদান করতে হবে। (৯) রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৬৭ নম্বর ধারা মোতাবেক প্রাক-জমিদারি দখল সময়ের যে সকল বকেয়া খাজনা ও সেস আদায়ের ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত হয়েছে এবং যার প্রকৃত খাজনা ও সেস নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, তার শতকরা ৭০ ভাগ নির্ধারণ করে আদায়কৃত অর্থ অনতিবিলম্বে প্রাক্তন খাজনা-ভোগীদের প্রদান করতে হবে। (১০) ক্ষতিপূরণ হিসেবে যাদের প্রাপ্য দু'শ টাকার বেশি নয়, পূর্বেকার সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বপ্রথম তাদের ক্ষতিপূরণ নগদ টাকায় প্রদান করতে হবে; ক্ষতিপূরণ হিসেবে যাদের প্রাপ্য এক হাজার টাকার বেশি নয়, তাদের এক দফায় নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; ক্ষতিপূরণ হিসেবে যাদের এক হাজার টাকার বেশি প্রাপ্য রয়েছে, তাদের বন্ডে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে এবং এই বন্ড ইস্যুর কাজ ১৯৫৯ সালের ১ আগস্ট হতে শুরু করা বাঞ্ছনীয়; ক্ষতিপূরণ হিসেবে যারা এক হাজার টাকার বেশি পাবেন, তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের জন্য বন্ড প্রদান করতে হবে। উক্ত বন্ড এরূপভাবে প্রদান করতে হবে যেন কোনো ক্ষেত্রে প্রাপক প্রতি দফায় বার্ষিক এক'শ টাকার বেশি না পান। (১১) জমিদারি দখলের ফলে ভূমি রাজস্বের সকল অতিরিক্ত আয় অন্য কোনো খাতে ব্যয় না করে প্রাথমিকভাবে প্রাক্তন খাজনা-ভোগীদের ক্ষতিপূরণ পরিশোধের জন্য প্রদান করতে হবে। (১২) যদি এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, নগদ অর্থ এবং বন্ডে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি ভূমি রাজস্বের অতিরিক্ত আদায়ের দ্বারাও মোকাবেলা করা সম্ভব নয়, তবে প্রতি বছর এই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারের স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা উচিত। (১৩) প্রাক্তন খাজনা-ভোগীদের মধ্যে যারা পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন তাদের নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাবে না। (১৪) প্রাক-জমিদারি দখল সময়ে বকেয়া খাজনা, সেস, বাঁধকর এবং কৃষি আয়কর আদায়ের জন্য সরকার কর্তৃক জারিকৃত সার্টিফিকেটের কার্যকারিতা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে ও ৬৭ নম্বর ধারা অনুসারে এই সকল প্রাপ্য অর্থ প্রাক্তন খাজনা-ভোগীদের চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ হতে কেটে রাখতে হবে। (১৫) ২৫ হাজার টাকার বার্ষিক আয় সমন্বিত এলাকায় এবং সাড়ে ১২ বর্গমাইল এলাকা সম্বলিত প্রতি ইউনিয়নে একটি করে তহশিল অফিস স্থাপন করতে হবে। (১৬) প্রতিটি থানায় রেভিনিউ সার্কেল অফিসার অথবা ইউনিয়ন বোর্ড সার্কেল অফিসার হিসাবে কাজ করার জন্য একজন ডেপুটি কালেক্টর নিয়োগ অথবা সাব ডেপুটি কালেক্টরের পদ পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। (১৭) প্রতিটি মহাকুমার ভূমি রাজস্ব সম্পর্কিত শাসন বিষয়াদি মহাকুমা হাকিমের দায়িত্বে অর্পণ করতে হবে। (১৮) জেলা কালেক্টরকে জেলার রাজস্ব পরিচালনার ভার দিতে হবে। তিনি রাজস্ব পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবেন। (১৯) বিভাগীয় কমিশনার তাঁর

বিভাগের ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত শাসনব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকবেন। (২০) রাজস্ব বোর্ডকে শক্তিশালী করতে হবে। বোর্ড কেবলমাত্র ভূমি রাজস্বসংক্রান্ত শাসনব্যবস্থার সর্বময় কর্তৃত্ব করার এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্বসংক্রান্ত সকল বিষয়ের দায়িত্বে থাকবে। রাজস্বসংক্রান্ত মামলায় বোর্ড শেষ আপিল ট্রাইব্যুনাল বলে গণ্য হবে। এটা পানি ও বিদ্যুৎ শক্তি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মতো স্বাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হবে এবং সরকারের রাজস্ব বিভাগ কেবলমাত্র নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে অধিকর্তা হবে। (২১) যেসব অফিসারকে রাজস্ব সংক্রান্ত শাসনব্যবস্থার দায়িত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হবে, তাদেরকে জরিপ ও বন্দোবস্ত এবং সাধারণভাবে রাজস্ব পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। (২২) ইউনিয়ন বোর্ডের ওপর খাজনা ও সেস আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। (২৩) যে সব এলাকায় গ্রাম্য প্রধান পদ্ধতি চালু আছে সেখানে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে তা সঠিক পদ্ধতি হিসেবে বহাল রাখা উচিত হবে কি হবে না এবং সেসব এলাকায় একজন গেজেটেড অফিসার প্রত্যেক থানার রাজস্ব পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করবেন। (২৪) প্রত্যেক সার্কেল সদর দপ্তরে হেডম্যান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ গ্রহণের জন্য সাব-ট্রেজারি থাকবে বা থানায় দুই তলা বিশিষ্ট সিন্দুক প্রোথিত থাকবে। (২৫) রাজস্ব এবং বন্দোবস্ত সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পাঁচজন তরুণ ও প্রাণবন্ত ডেপুটি কালেক্টরকে শীঘ্রই যেখানে গ্রাম্য প্রধান পদ্ধতি পরীক্ষা করা হচ্ছে, সেইরূপ পাঁচটি থানায় রাজস্ব সার্কেল অফিসার নিয়োগ করতে হবে। এছাড়াও তাদেরকে হেডম্যান পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য ও উক্ত কাজে ট্রেনিং গ্রহণের উদ্দেশ্যে চার মাসের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ডেপুটেশনে পাঠাতে হবে। (২৬) হেডম্যান পদ্ধতিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করার জন্য রাজস্ব অফিসারদের মধ্যে যারা সার্টিফিকেট অফিসার হবেন তাদেরকে বকেয়া খাজনার জন্য দায়ী কৃষকদেরকে গ্রেফতার ও আটক রাখার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। (২৭) গেজেটেড অফিসারদের ট্রেনিংদানের জন্য অবিলম্বে একটি রাজস্ব ট্রেনিং একাডেমি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (২৮) তহশিলদারদের উপযুক্ত ট্রেনিংদানের ব্যবস্থা করতে হবে। (২৯) জমির খাজনা যুক্তিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে রেকর্ড-অব-রাইটসের আমূল সংস্কার করতে হবে। (৩০) চাকুরিরত তহশিল স্টাফদের সাধারণ স্ক্রিনিং করতে হবে। দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য স্টাফদের চাকুরিচ্যুত করতে হবে এবং বাকিদের ব্যাপক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। (৩১) সপ্তাহে একবার করে তহশিল অফিস পরিদর্শন এবং তহশিল অফিস হতে আদায়কৃত অর্থ সীলমোহরযুক্ত ব্যাগে করে ট্রেজারি বা সাব-ট্রেজারিতে জমা দেওয়ার জন্য সশস্ত্র পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করতে হবে। তহশিলদারকে মাসে একবার করে ট্রেজারীতে অর্থ জমা দেওয়ার জন্য হেড কোয়াটারে যেতে হবে। (৩২) আদায়কারী কর্মচারীদের মানি অর্ডারে খাজনা ও সেস গ্রহণের অধিকার দিতে হবে। (৩৩) দ্রুত খাজনা ও সেস আদায়ের জন্য বঙ্গীয় রাজস্ব আদায় আইনের সংস্কার করতে হবে। ভবিষ্যতে বকেয়া খাজনা ও সেস দ্রুত আদায়ের জন্য পাঞ্জাব ভূমি রাজস্ব আইনের অনুরূপ আইন প্রণয়ন করতে হবে। (৩৪) সার্টিফিকেট অফিসারদের বকেয়া খাজনার জন্য দায়ীদের অস্থাবর ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের ক্ষমতা দিতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে অনুমোদিত যে কোনো ডিগ্রি এটাচ করার ক্ষমতা দিতে হবে। (৩৫) খাজনা ও সেস আদায়ের উন্নতির উদ্দেশ্যে তহশিল স্টাফদের মধ্যে ভালো আদায়ের জন্য পুরস্কার এবং খারাপ আদায়ের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। (৩৬) সরকার কর্তৃক পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোনো হাট বা বাজারে নীট আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ তার উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করতে হবে। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হবে। (৩৭) খাজনা-ভোগীদের অধীনে ধান্য-করারী চুক্তি বাগী, গুলা প্রভৃতি উৎপাদনের ভিত্তিতে কর প্রদানকারী কৃষকদের মধ্যে পূর্বোক্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কররূপে উৎপাদনের যে ভাগ খাজনা-ভোগীরা পায়, জমিদারি দখলের সময় তার মূল্য হিসেবেই তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (৩৮) জমিদারি দখলের তারিখ হতে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদত্ত বন্ডের ওপর সুদ দিতে হবে (বন্ড ইস্যু করার তারিখ হতে নয়)। (৩৭) ঢাকা শহরের আবাসিক এলাকার

মতো চাষ-আবাদহীন জমির কর পুনঃধার্যের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তারা প্রত্যেক এলাকায় বেসরকারি জমির মালিকদের সাধারণ যে হারে কর দেওয়া হয় তা উপেক্ষা করবেন না। (৪০) সিলেট জেলায় স্থায়ীভাবে বন্দোবস্তকৃত খাজনা-ভোগীদের খাস জমির ওপর যে হারে কর নির্ধারিত হয়েছে, তা জয়ন্তিয়া পরগণায় নির্ধারিত খাজনার হারের সাথে তুলনামূলকভাবে সংশোধন করতে হবে। এছাড়াও এক ফসলী জমির খাজনার হার একর প্রতি তিন টাকা বার আনা এবং বাগানসহ বসতবাড়ির খাজনার হার একর প্রতি ৪ টাকা দুই আনার বেশি হওয়া উচিত নয়। এক ফসলী ধানী জমি হতে দো-ফসলী জমি ও বাগানের খাজনার হার শতকরা ২৫ টাকা অধিকহারে নির্ধারিত হতে পারে। (৪১) যে সকল জমির ওপর মসজিদ, মন্দির, গির্জা, স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং যেহেতু তা জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত এবং তা থেকে মালিক কোনো মুনাফা পায় না, সেহেতু তার ওপর নির্ধারিত মান অনুযায়ী শতকরা সাড়ে বার ভাগের বেশি কর নির্ধারণ করা উচিত হবে না। অনুরূপভাবে চাষের অযোগ্য পতিত জমি, চাষ যোগ্য অথবা চাষের অযোগ্য জঙ্গল, পশুচারণ ভূমি, খেলার মাঠ, টিলা, ছোট পাহাড়, বালুচর, রাস্তা, খাল, ডোবা, বাঁধ, নালা, ঈদগাহ, দেবস্থান, পীরস্থান, কবরস্থান, শ্মশান ও দরগার ওপর সাধারণ মান অনুযায়ী শতকরা সাড়ে বার ভাগের বেশি কর ধার্য করা উচিত হবে না।[১৫৫] ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টে দখলিকৃত জমিদারির ক্ষতিপূরণ প্রদান পদ্ধতি এবং ভূমি রাজস্ব আদায়ের কার্যকরী ও উন্নত পদ্ধতিরও সুপারিশ করা হয়। কমিশন ২৫ হাজার টাকার বার্ষিক আয় সমন্বিত এলাকায় এবং সাড়ে বার বর্গমাইল এলাকা সম্বলিত প্রতি ইউনিয়নে একটি করে তহশিল অফিস স্থাপনের সুপারিশ করে। প্রাদেশিক গভর্নর এই রিপোর্ট গ্রহণকালে সরকারের পক্ষ হতে 'এই বিরাট কাজের জন্য' কমিশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে যখন তাঁরা শাসনাভার গ্রহণ করেছিলেন তখন ভূমি রাজস্ব আদায় করা তাঁদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল।[১৫৬]

উল্লেখ্য, ১৯৫৯ সালের ৭ আগস্ট পশ্চিম পাকিস্তানের মারীতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নর আখতার হোসেন জানান যে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানে পরিবার প্রতি ভূমির পরিমাণ পূর্ব নির্ধারিত ৩০ একর হতে ১০০ একরে বৃদ্ধি করার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেন যে বর্তমানে ভূমি যে পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে তাতে অনেক ভূমির মালিক গ্রামে থাকতে উৎসাহবোধ করেন না এবং অনেকেই গ্রামে ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছেন। ফলে ভূমি সংস্কারের প্রথম কাজ হবে ভূমির ওপর কৃষকদের স্বত্ব স্বীকার করে নেওয়া।[১৫৭] পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের পরিবার প্রতি ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির ঘোষণার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৯ সালের ১১ আগস্ট ঝিনাইদহে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নরের বক্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।[১৫৮] কারণ ভূমি সংস্কারের বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের হলেও সিদ্ধান্ত আসছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পর পূর্ব বাংলার মানুষ আশা করেছিল যে ভূমিস্বত্বের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক তথা জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। উপরন্তু, এই আইনে অধিগ্রহণকৃত ভূমি থেকে ভূমিহীনরা বাস্তুভিটাসহ চাষাবাদের জন্য কিছু পরিমাণ ভূমি লাভের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন হবে ও তারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নরের বক্তব্যের পর স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে স্বৈরাচারী সামরিক শাসক আইয়ুব খান পূর্ব বাংলার মানুষের ভাগ্যের নেতিবাচক

---

[১৫৫] *Second Five Year Plan 1960-65*, June, 1960, p. 189; Khan, *District Gazetteers : Pabna*, pp. 259-260; Bari, *District Gazetteers : Jessore*, pp. 253-254; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জুলাই, ১৯৫৯।

[১৫৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জুলাই, ১৯৫৯।

[১৫৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ আগস্ট, ১৯৫৯।

[১৫৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ আগস্ট, ১৯৫৯।

পরিবর্তনের নীল নকশা করেছিলেন। এ কারণে বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নরের পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি সংস্কারের বক্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর এই প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানবাসীরই প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও আইয়ুব খানের সরকার পূর্ব পাকিস্তান ভূমি রাজস্ব কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ইতোপূর্বে প্রণীত আইনসমূহ সংশোধন করে ১৯৬১ সালের পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ জারি করেন। এই অধ্যাদেশের ৪ নং ধারায় বলা হয়,

> Provided that the aggregate quantity of all lands of the classes referred to in clauses (a) and (b) in the whole of the province so retained in possession by a rent-receiver, a cultivating raiyat, a cultivating under-raiyat or a non-agricultural tenant shall not exceed three hundred and seventy-five standard bighas or an area determined by calculating at the rate of ten standard bighas for each member of his family, whichever is greater.[159]

এই আইনের বিধান অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে পরিবার প্রতি জমির ঊর্ধ্ব সীমা নির্ধারণ করা হয় ৩৭৫ বিঘা বা ১২৪ একর। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান ভূমি রাজস্ব কমিশনের সুপারিশসমূহও এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৬০] উল্লেখ্য, এই আইনেই সর্বপ্রথম কৃষকরা জমির মালিক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।[১৬১] অর্থাৎ এই আইন প্রণয়নের পর আইনগতভাবে কৃষকরা জমির মালিক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের বিধানে কৃষকরা সরাসরি সরকারকে খাজনা প্রদান করলেও জমির মালিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু এই আইন অনুসারে মালিক হিসেবে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। বস্তুতপক্ষে আইয়ুব খান প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে কৃষককে জমির মালিক ঘোষণা করে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। এর মাধ্যমে তিনি নিজেকে কৃষকদের নিকট কৃষক-বান্ধব শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এতে ক্ষমতা প্রলম্বিত করার অভিস্পা যুক্ত ছিল।

আইয়ুব খানের শাসনামলের ভূমিসংস্কারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূস্বামীদের দুর্বল করে সেখানে একটি মাঝারি খামার মালিক শ্রেণির সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের দুর্বল করে জোতদারদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে এখানেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। পশ্চিম পাকিস্তানে ভূমিসংস্কারের দু'টি দিক ছিল প্রথমত, ভূমি মালিকদের ৫০০ একরের অতিরিক্ত জমির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। এই ক্ষতিপূরণ ছিল ভূস্বামীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের সম্পত্তির মূল্য পরিশোধ। যেহেতু সামন্তব্যবস্থার ন্যায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করে জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয়ত, ক্ষতিপূরণের অর্থে শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমি সংস্কার শিল্পের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। একদিকে যেমন ভূমি সংস্কার দ্বারা গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অন্যদিকে ভূস্বামীরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ শিল্পে বিনিয়োগ করেছিল। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়

---

[১৫৯] ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৭।

[১৬০] T. Hussain, *A study on Legal Aspects of Land Use Regulation in Bangladesh* (Dacca : Ministry of Agriculture and Forests, Government of the people's Republic of Bangladesh, 1982), p. 50; Bari, *District Gazetteers : Jessore*, pp. 251-252; উমর, *বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন*, পৃ. ৪২-৪৩; ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৭।

[১৬১] Siddiqui, *District Gazetteers : Dinajpur*, p. 257.

পুঁজির অভাব অনেকটা দূর হয়েছিল ও উৎপাদিত শিল্পপণ্য ক্রয়ে গ্রামীণ কৃষকরা সক্ষমতা অর্জন করেছিল। এর ফলস্বরূপ পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছিল। ইংল্যান্ডসহ ইউরোপেও এই একইভাবেই ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল। সেখানেও ধনতন্ত্রের বিকাশের যুগে সামন্ত ভূস্বামীরা শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করার কারণে ভূমি থেকে অর্জিত আয় ছাড়াও তারা এই নতুন এবং অতিরিক্ত আয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। ভূস্বামীদের এই বর্ধিত আয়কে কার্ল মার্কস 'যন্ত্রশিল্পরূপ গাছের সোনার ফল' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব খানের ভূমি নীতি ফলপ্রদায়ক হলেও পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর গৃহীত ভূমি নীতি ধনতন্ত্রের বিকাশ তথা শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক ছিল না। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে ভূমির ঊর্ধ্ব সীমা ১০০ বিঘা থেকে বৃদ্ধি করে ৩৭৫ বিঘা করার কারণে এখানে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে যেহেতু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি তাই এখানে ভূমি সংস্কার দ্বারা শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের প্রশ্নও অবান্তর; বরং পূর্ব পাকিস্তানে ভূমি সংস্কারের ফল ছিল উল্টো। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনে ভূমির ঊর্ধ্ব সীমা ১০০ বিঘা নির্দিষ্ট করাতে ভূমির প্রতি আগ্রহ হ্রাস পেয়েছিল। ফলে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের পর শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের যে ধারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছিল তা পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। একদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর নানা দুঃখ-দুর্দশা এবং আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে কৃষকরা জোতদারদের নিকট ঋণের দায়ে যেভাবে ভূমি হস্তান্তর করেছিল আইয়ুব খানের ভূমি নীতি তাকেই আইনগত সমর্থন দিয়ে বহাল রাখা এবং প্রবল করারই ব্যবস্থা করেছিল। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের পর জোতদারদের মধ্যে অনেকে কৃষকের ভূমি সরাসরি নিজেদের মালিকানাধীনে আনতে না পেরে সেগুলোকে বন্ধকি ভূমি হিসেবে নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। আইয়ুব খানের সংস্কার ভূমির ওপর জোতদারদের দখলিস্বত্বকে মালিকানাস্বত্বে পরিণত করার পথ পরিষ্কার করেছিল। শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানে নতুন করে অধিক পরিমাণ ভূমি ব্যক্তি মালিকানার অধীনে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে আইয়ুব খানের সামন্ত শাসনযন্ত্র বেআইনি ভূমি দখলকেও বাধা না দিয়ে বরং তাকে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করার নীতিই গ্রহণ করেছিল। এই উৎসাহের ফলে পূর্ব বাংলার সর্বত্র তো বটেই, বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলের চরাঞ্চলে জোতদাররা ঘুষ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে হাজার হাজার বিঘা ভূমি নিজেদের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছিল। কাজেই জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের যা কিছু সামান্য সুফল কৃষকরা পেয়েছিল সেটাও এই নতুন ভূমি নীতির কারণে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। নতুন ভূমি নীতির কারণে অল্প ভূমির মালিক কৃষকদের আয় হ্রাস পেতে শুরু করে এবং সেই অনুযায়ী তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিবর্তে তা উত্তরোত্তর হ্রাস পেতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই নীতির কারণে প্রাপ্ত কৃষি উদ্বৃত্ত ভূমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয় এবং গ্রামাঞ্চলে বাজারের প্রয়োজনীয় বিস্তৃতি না ঘটার পরিণতিতে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত হয়। আইয়ুব খানের ভূমি নীতির অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল দু'ধরনের : পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে- (১) পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষকদের মধ্যে ভূমি বিতরণ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং কৃষককে তার উৎপাদিত ফসলের অধিকতর অংশ দেওয়া। এর দ্বারা কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও শিল্প পণ্যের দেশীয় বাজার সম্প্রসারণ করা। (২) পশ্চিম পাকিস্তানের ভূস্বামীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে শিল্পে অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহ দানের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের সম্প্রসারণ করা। (৩) পশ্চিম পাকিস্তানে আয়ের উৎস হিসেবে ভূমির প্রতি ঝোঁক হ্রাস করে শিল্প মালিকানার দিকে ঝোঁক বৃদ্ধি করা। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে- (১) পূর্ব পাকিস্তানে কৃষকদের ভূমি হস্তান্তর সহজতর করা এবং তাদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিবর্তে সঙ্কুচিত করা (বিশেষত উৎখাত হওয়া কৃষকদের মজুর হিসেবে নিয়োগের সুযোগের অভাবে)। (২) পূর্ব পাকিস্তানের ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে ভূমি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ধারা অব্যাহত রেখে জমির প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি করা এবং এর মাধ্যমে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের এক বিরাট অংশকে শিল্পক্ষেত্র থেকে ভূমি ক্রয়ের দিকে চালনা করা। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তানে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে

সাম্রাজ্যবাদী এবং পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক বড় পুঁজির জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা। (৩) পূর্ব পাকিস্তানে সামন্ত প্রথার অবশেষসমূহকে সামরিক শাসনের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করা। উপরিউক্ত আইয়ুব খান সরকারের ভূমি নীতির অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলো পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝা যায় যে এটা পশ্চিম পাকিস্তানে সামন্ত শক্তিকে খর্ব করে শিল্প সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যমান আধা সামন্তবাদী পশ্চাৎপদ অর্থনীতিকে বহাল রেখে এখানকার শিল্প সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত করেছিল। বদরুদ্দিন উমরের মতে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পের বিক্রয়ক্ষেত্র বা বাজার হিসেবে ব্যবহার করাই ছিল এই নতুন ভূমি নীতির মূল অর্থনৈতিক লক্ষ্য।[১৬২]

কিন্তু বদরুদ্দিন উমরের উপরিউক্ত বিশ্লেষণে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমি সংস্কারের একটি তুলনামূলক চিত্র ফুটে উঠলেও ভূমি সংস্কারের আরেকটি অন্যতম লক্ষ্য জোত খণ্ডিতকরণ ও বিখণ্ডীকরণের উদ্দেশ্য অনালোচিত রয়েছে। বস্তুতপক্ষে, পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খানের ভূমি সংস্কারের একটি অন্যতম লক্ষ্য ছিল জোত বিখণ্ডীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। ১৯৬০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জাকির হোসেন হবিগঞ্জে এক জনসভায় জানান যে ভূমি সংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে জোত বিখণ্ডীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের জমির খণ্ড খণ্ড অবস্থা দূর করে বিচ্ছিন্ন জোতসমূহ একত্রীকরণ করা হবে। তিনি আরও বলেন যে পরিকল্পনাটি প্রণীত হলেই বুনিয়াদী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হবে।[১৬৩] উল্লেখ্য, পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতার অন্যতম একটি কারণ ছিল জোত বিখণ্ডীকরণ। অর্থাৎ ছোট ছোট খণ্ডিত জোতে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ সম্ভব ছিল না। এর পরিনামও ছিল ভয়াবহ রকমের। যেমন ১৯৬০ সালের কৃষি শুমারীর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে পাবনা জেলার আবাদযোগ্য জমির শতকরা ৯৭.৫ ভাগই ছিল খণ্ডিত-বিখণ্ডিত। পরবর্তীকালে তা আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৬৪] কিন্তু ঘনবসতিপূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জোত বিখণ্ডীকরণ বাস্তবায়ন করাও খুবই কষ্টকর ছিল। এ কারণে ভূমি রাজস্ব প্রশাসনিক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল, "No further scheme for compulsory consolidation of holdings be taken up in any area in East Pakistan."[165] অর্থাৎ এটা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব বলেই নতুন করে এধরনের পরিকল্পনা হতে বিরত থাকাই ছিল উত্তম পন্থা। স্বাভাবিকভাবেই আইয়ুব খানের ভূমি সংস্কারের এই লক্ষ্যও পূরণ হয়নি। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানে এই নতুন ভূমি নীতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা সফল হয়নি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তাঁর নতুন ভূমি নীতির লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অনুৎসাহী বেশি জমির মালিকদের বিতাড়িত করে বৃহৎ জোত খণ্ডিতকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই লক্ষ্যে তিনি বেশি জমির মালিকদের নির্ধারিত উর্ধ্ব সীমার অতিরিক্ত জমি নিয়ে বৃহৎ জোত খণ্ডিত করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের মাধ্যমে পূর্বের চেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি আইয়ুব খান তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিহীন ৫০০টি কৃষক পরিবারকে পশ্চিম পাকিস্তানের গোলাম মোহাম্মদ বাঁধের ধান উৎপাদন উপযোগী কৃষি ভূমিতে বসতি স্থাপনের সুযোগ দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন।[১৬৬] উপরন্তু, তিনি এর মাধ্যমে উভয় পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রীতির মহৎ উদ্যোগ

---

[১৬২] উমর, *বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন*, পৃ. ৪১-৪৫।

[১৬৩] *সংবাদ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০।

[১৬৪] নুরুল ইসলাম খান (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : পাবনা-বর্তমান পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার গেজেটীয়ারবদ্ধ ইতিবৃত্ত*, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯০), পৃ. ১২৯।

[১৬৫] Hussain, *A study on Legal Aspects of Land Use Regulation in Bangladesh*, p. 50.

[১৬৬] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *সংবাদ*, ৫, ৭ ও ২৪ জানুয়ারি ১৯৬০; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ মার্চ ও ৯ জুলাই ১৯৫৯ এবং ৫ ও ২৪ জানুয়ারি এবং ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০।

প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করেছিলেন। যাহোক, জোত খণ্ডিতকরণ ও বিখণ্ডীকরণের মাধ্যমে উভয় পাকিস্তানে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করাই ছিল আইয়ুব খানের ভূমি সংস্কারের আরেকটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য।

আইয়ুব খানের শাসনামলের ভূমি সংস্কার একদিকে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের সুফল পাওয়া থেকে কৃষকরা বঞ্চিত হয়েছিল এবং অন্যদিকে পরিবার প্রতি জমির ঊর্ধ্ব সীমা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে জমিদারদের স্থলে জোতদারদেরকে ব্রিটিশ প্রশাসন কর্তৃক সৃষ্ট জমিদার শ্রেণির অনুকরণে একটি শক্তিশালী অনুগত শ্রেণি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে জমিদাররা যেমন ভূমি নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল তেমনি আইয়ুব খানের শাসনামলেও ঠিক একইভাবে জোতদাররাও সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। সুতরাং জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে যে আশার সঞ্চার হয়েছিল তা না হয়ে বরং নতুন করে ভূমি বিরোধ তথা জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, ভূমি সংস্কারের বিবেচনায় জমির ঊর্ধ্ব সীমা হ্রাস করা পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে একটা অগ্রসর পদক্ষেপ হলেও পূর্ব পাকিস্তানে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমির ঊর্ধ্ব সীমা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আইয়ুব খানের ভূমি নীতি ছিল একটি নেতিবাচক সংস্কার।[১৬৭] আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে গৃহীত এই ভূমি নীতির কারণে ভূমিস্বত্বের ওপর জোতদারদের কর্তৃত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যদিকে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের কারণে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেছিল তারও মৃত্যু ঘটে। এই আইনের ফলে জোতদার কর্তৃক কৃষকরা নতুন করে আরও বেশি শোষিত ও নির্যাতিত হতে শুরু করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই আইনের পর থেকে জোতদার ও কৃষকদের মধ্যে নতুন করে ভূমি বিরোধের সূচনা হয়েছিল এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং আইয়ুব খানের ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের ওপর জোতদারদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভূমি বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং তা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

৪.১৬ ১৯৬৪ সালের অর্ডিন্যান্স ও ১৯৬৫ সালের শত্রু সম্পত্তি আইন

১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে পরিবেশ অশান্ত হয়ে ওঠে। উক্ত দাঙ্গার সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ দেশ ত্যাগ করে ভারতে যেতে শুরু করলে তাদের সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন অর্ডিন্যান্স [The East Pakistan Disturbed Persons Rehabilitation Ordinance, 1964 (East Pakistan Ordinance No. 1 of 1964] জারি করেন। সরকার ঘোষিত এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভিবাসীদের সম্পত্তি রক্ষা করা। এর বিধান অনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমি হস্তান্তরের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। তবে সরকারি প্রচারণায় এই অর্ডিন্যান্সের মূল উদ্দেশ্য অভিবাসীদের সম্পত্তি রক্ষা করার কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল হস্তান্তর বিরোধ বা বিক্রয় বিরোধী আইন। এটা ছিল সম্পত্তি সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল। সরকার এর মেয়াদ ক্রমশ বৃদ্ধি করে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৬৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত বর্ধিত করেন। অন্যদিকে ১৯৬৫ সালে (এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর) পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার ১৯৬৫ সালে 'ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস' জারি করেন। একইসঙ্গে সরকার ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন অর্ডিন্যান্স [The East Pakistan Disturbed Persons (Rehabilitation) Ordinance, 1965 (East

[১৬৭] উমর, *বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন*, পৃ. ৪২-৪৩।

Pakistan Ordinance No. VI of 1965)] নামে আরেকটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। ১৯৬৫ সালের এই অর্ডিন্যান্সের বিধান অনুসারে ১৯৬৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর হতে ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যেসব নাগরিক পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে চলে যায় তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৬৪ সালের অর্ডিন্যান্সের বিধানসমূহ ১৯৬৫ সালের অর্ডিন্যান্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বস্তুত, ১৯৬৪ সালের অর্ডিন্যান্সেরই বর্ধিত রূপ ছিল ১৯৬৫ সালের অর্ডিন্যান্স। যাহোক, ১৯৬৫ সালের অর্ডিন্যান্সের বিধান অনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যারা দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যায় তাদের ভূমি হস্তান্তরের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকবার পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের অনুমতি সাপেক্ষে ১৯৬৫ সালের অর্ডিন্যান্সটির মেয়াদ ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। উল্লেখ্য, এই অর্ডিন্যান্সটির মেয়াদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপিত হলে পরিষদের সদস্যদের অর্ডিন্যান্সের পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে ভূমি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করে ১৯৬৭ সালের ৩০ জুন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নুরুল হক বলেন যে এই অর্ডিন্যান্সের কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা সম্পত্তি বিক্রি তথা সম্পত্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে।[১৬৮] পরিষদের সদস্য মোঃ সিরাজুদ্দিনও একই বক্তব্য প্রদান করেন।[১৬৯] পরিষদের সদস্য নিরোদ নাগ বলেন যে একদিকে হিন্দুরা জমি বিক্রির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অন্যদিকে জমি ক্রয় করার অধিকারও তাদের নেই। জমি বিনিময় করেও তারা জমি নিয়ন্ত্রণে নিতে পারছে না। তিনি এটাকে বিপর্যয়কারী আইন (disastrous law) হিসেবে অভিহিত করেন।[১৭০] এছাড়াও এই অর্ডিন্যান্স নিয়ে বিভিন্ন অধিবেশনে পরিষদের সদস্যরা হিন্দুদের সম্পত্তির ওপর সরকারের বিধি-নিষেধের পক্ষে-বিপক্ষে ভূমি বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[১৭১] অর্থাৎ এই অর্ডিন্যান্সের কারণে একদিকে হিন্দুরা সম্পত্তি বিক্রি তথা সম্পত্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছিল এবং অন্যদিকে সম্পত্তি সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকায় সরকার লাভবান হয়েছিল। পরিষদের সদস্যদের ভূমি বিতর্কের মধ্য দিয়ে আইয়ুব খানের শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি বিরোধের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছিল। কেবলমাত্র পরিষদের ভিতরেই নয় বরং পরিষদের বাইরেও উক্ত অর্ডিন্যান্স তথা শত্রু সম্পত্তি আইনের বিরুদ্ধে অনেকেই তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। যেমন ১৯৬৭ সালের ৮-৯ এপ্রিল সিলেট জেলার কুলাউড়াতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সমিতির সম্মেলনে শত্রু সম্পত্তি আইনের বিরোধিতা করে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবদুল হক সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ন্যায় সংখ্যালঘুদের জমি হস্তান্তরের সহজ অধিকার না থাকায় তাদের নাগরিক অধিকারই খর্ব করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। উক্ত সম্মেলন সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি হস্তান্তরে পূর্ণ ক্ষমতা দান এবং ভারতে অবস্থানরত সংখ্যালঘুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি বলে ঘোষণা প্রত্যাহার করে তাদের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে তা বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের নিকট দাবি জানানো হয়।[১৭২] সুতরাং শত্রু সম্পত্তি বলে বিবেচিত সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি নিয়ে আইন পরিষদের ভিতরে ও বাইরে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতির প্রতিচ্ছবি।

---

[১৬৮] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXII, No. 7, Budget Session, 1967-68, The 30th June, 1st and 8th July, 1967 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1969), pp. 3-5.

[১৬৯] *Assembly Proceedings*, Vol. XXXII, No. 7, 1967, pp. 12-15.

[১৭০] *Assembly Proceedings*, Vol. XXXII, No. 7, 1967, pp. 21-25.

[১৭১] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXX, No. 1, Budget Session, 1966-67, The 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and 13th June, 1966 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1967), pp. 185 and 194-201; *Assembly Proceedings*, Vol. XXXII, No. 7, 1967, pp. 3-5, 12-16, 21-37 and 43-50; *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXIII, No. 2, First Session, 1968-69, The 18th, 19th, 20th, 22nd and 23rd January, 1968 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1969), pp. 164-172, 198-207 and 212-217.

[১৭২] আবদুল হক (সাধারণ সম্পাদক), *পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি*, ১৯৬৭ সালের ৮-৯ এপ্রিল (২৬-২৭ চৈত্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ), কুলাউড়ায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির প্রাদেশিক কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাববলী (ঢাকা : আরফান প্রেস, ১৯৬৭), পৃ. ১০।

উল্লেখ্য, প্রবল জনমতের চাপে ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান হতে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এর ফলস্বরূপ পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্স ও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু এই আইনগুলোর প্রয়োগের ফলে যে সমস্ত সম্পত্তি সরকারের কাস্টোডিয়ানে ন্যস্ত ছিল তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার পুনরায় ১৯৬৯ সালে শত্রু সম্পত্তি জরুরি বিধি (ধারাবাহিকতা) অধ্যাদেশ জারি করেন। এই নতুন অধ্যাদেশ অনুসারে সরকারের কাস্টোডিয়ানের কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখা হয়েছিল। এই নতুন অধ্যাদেশ জারির কারণে বেদখলে থাকা অভিবাসী হিন্দুদের সম্পত্তি পূর্বের ন্যায় বেদখলে থেকে যায়, এমনকি অনেকের সম্পত্তি নতুন করে বেদখলে চলে যায়। উল্লেখ্য, মুসলমান কৃষকদের ওপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। প্রথমত, অভিবাসী হিন্দুদের জমি দখলকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি ও জমি সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল। স্থানীয় প্রশাসন ঝুঁকি এড়ানোর জন্য শত্রু সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত অভিবাসী হিন্দুদের জমির পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করতো, এমনকি উক্ত এলাকার সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর স্থগিত রাখতো। সুতরাং ১৯৬৪ সালের অর্ডিন্যান্স ও ১৯৬৫ সালের শত্রু সম্পত্তি আইন ভূমি বিরোধ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

৪.১৭ উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলায় সরকারের ভূমি নীতি ও কৌশলে পরিবর্তনের ফলে ভূমি বিরোধ হ্রাস না করে বরং তা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। উল্লেখ্য, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক জমিদার এবং জমিদার সমর্থক সদস্য থাকলেও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো জমিদার প্রতিনিধি ছিলেন না। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল জোতদার শ্রেণির সদস্য। কিন্তু বাকি অংশ সংখ্যায় স্বল্প হলেও তারা কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসেছিল। তারা ছিলেন কৃষকের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় তারা আইনপরিষদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আরও উল্লেখ্য, ১৯৪৭ হতে ১৯৫৮ পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব বাংলার ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের অভ্যন্তরে তীব্র ভূমি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। পরিষদে উত্থাপিত ভূমি সংক্রান্ত যে কোনো বিলের ওপর আলোচনাকালে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলীয় সদস্যদের আলোচনায় ভূমি বিতর্ক কখনও কখনও সাম্প্রদায়িক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল প্রধানত ভূমি ভিত্তিক অর্থনৈতিক স্বার্থ সংক্রান্ত। এই বিতর্ককে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে ভূমি বিরোধের রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ভূমি বিরোধ প্রচণ্ডভাবে প্রভাব ফেলেছিল। পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমি বিতর্কের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল যা ঔপনিবেশিক শাসনামলেও বিদ্যমান ছিল। তারপরও ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব বাংলায় ভূমি নীতি ও কৌশলের পরিবর্তনের ফলে যে সকল ভূমি আইন প্রণীত হয়েছিল তাতে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর ১৯৬১ সালে প্রণীত ভূমি আইনে কৃষকদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়ে প্রধানত জোতদারদের স্বার্থ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে ভূমি বিরোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথকে প্রশস্ত করেছিল যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়
ভূমি বিরোধের রাজনীতি (১৯৪৭-১৯৭১)

৫.১ ভূমিকা

পঞ্চম অধ্যায়ে ভূমি বিরোধের রাজনীতি (১৯৪৭-১৯৭১) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মূলত বিশ্লেষণ করা হয়েছে জমিদার, জোতদার ও কৃষকের পরিবর্তন কীভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত পূর্ব বাংলায় ভূমি নীতি ও কৌশলে পরিবর্তনের (১৯৪৭-১৯৭১) ফলে জমিদার, জোতদার ও কৃষক সমাজের যে পরিবর্তন হয় তা ভূমি বিরোধের রাজনীতির উপর কী প্রভাব পড়েছিল সে সম্পর্কেও এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

৫.২ পূর্ব বাংলায় জমিদার শ্রেণির পতন

৫.২.১ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন ও জমিদারদের অস্তিত্ব রক্ষায় কৌশল

১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে দেশভাগের মাধ্যমে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার ফলস্বরূপ পূর্ব বাংলায় জমিদারদের চূড়ান্ত পতন ত্বরান্বিত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলার বর্ণ হিন্দুদের নিয়ে গঠিত হিন্দু জমিদারদের অধিকাংশই ভারতে চলে যায়।[১] দেশভাগের পর বর্ণ হিন্দুদের ভারতে চলে যাওয়া প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "বর্ণ হিন্দুরা প্রায় সকলেই পূর্ব বাংলা ছেড়ে চলে গেছে, কিছুসংখ্যক নিম্ন বর্ণের হিন্দু আছে।"[২] মোল্লা আমীর হোসেনের মতে ১৯৪১ হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত খুলনা জেলার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু শ্রেণির ৭৫% মানুষ ভারতে চলে যায় যাদের মধ্যে এই অঞ্চলের উচ্চবর্ণীয় হিন্দু জমিদাররা ছিলেন অন্যতম।[৩] অর্থাৎ দেশভাগের পূর্বে কিছু সংখ্যক জমিদার কলকাতায় চলে গেলেও দেশভাগের পরপরই পূর্ব বাংলার হিন্দু জমিদারদের অধিকাংশই ভারতের কলকাতায় চলে যান। এর ফলে পূর্ব বাংলায় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিয়ে গঠিত জমিদার শ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতাও যথেষ্ট হ্রাস পায়।[৪] উপরন্তু, ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হলে চূড়ান্তভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বাতিল বা জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হয় এবং সেই সঙ্গে আইনগতভাবে ও আনুষ্ঠানিকভাবে হলেও জমিদার শ্রেণিরও পতন ঘটে।

তবে পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পর আইনগত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে জমিদার শ্রেণির পতন হলেও তারা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নানা ধরনের কৌশলের আশ্রয় নেয়। অবশ্য জমিদারদের এই কৌশলী ভূমিকা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পূর্ব থেকেই। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, সর্বপ্রথম জমিদারদের কৌশলী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায় পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলীয় সদস্যদের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ বিলের বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে। এছাড়াও পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে জমিদারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে কোনো বিল উত্থাপিত হলেই জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা জনমত

[১] Rahim, *Politics and National Formation in Bangladesh*, p. 205.
[২] রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৬৬।
[৩] মোল্লা আমীর হোসেন, *হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ, ১৯৪১-৭১ : খুলনা* (ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১৮), পৃ. ২১৬।
[৪] সোবহান, *উতল রোমন্থন*, পৃ. ১০।

যাচাইয়ের নামে এবং সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে বিলটি বাতিল করতে অথবা তা বিলম্বকরণের চেষ্টা করতেন।[৫] এছাড়াও তারা বিলে জমিদারদের পক্ষে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা আদায়েরও চেষ্টা করতেন। ১৯৪৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপিত পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে কংগ্রেস দলীয় সদস্য বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী উক্ত বিলের বিরোধিতা করে বলেন যে স্বল্প-আয় বিশিষ্ট জমিদারদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের পর দেখা যাবে যে খাজনা-ভোগীগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে-তাঁদের রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা করা হয় নি। তাঁর মতে জমিদারদের খাস[৬] জমি দখল করাও আইন সম্মত নয়। কারণ এটা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই সম্পত্তির আয়ের ওপর স্বল্প-আয় বিশিষ্ট ভূস্বামীগণের জীবিকা নির্ভর করে। কাজেই জমিদারদের খাস জমির বিষয়টি পৃথকভাবে বিবেচনা করা উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৭] একইভাবে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় কংগ্রেস সদস্য সুরেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত বলেন যে বিলের ২০ নং ধারায় সবক্ষেত্রে ৫ গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন যে ৫ গুণ কেন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা হলো সেটাই ভাববার কথা। তাঁর মতে কোনো একটা আয়ের উৎস যদি দীর্ঘ দিনের হয়, আর কোনোটার আয় যদি অতি অল্প সময়ের জন্য হয় তাহলে তাদের ক্ষতিপূরণটা একরকম হওয়া উচিত নয়। যার আয় দীর্ঘদিনের তাকে তুলনামূলক অধিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। তিনি প্রস্তাব করেন যে ক্ষতিপূরণ ৫ গুণের পরিবর্তে ১৫ গুণ করতে হবে।[৮] অপর কংগ্রেস সদস্য মনোরঞ্জন ধর বলেন যে অর্থমন্ত্রী পরিষদে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে বিহারের জমিদারি উচ্ছেদ আইন অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু বিহারের জমিদারি উচ্ছেদ আইনে দেখা যায় যে সেখানে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১২টি ধাপ আর পূর্ব বাংলা জমিদারি উচ্ছেদ আইনে নির্ধারণ করা হয়েছে ৮টি ধাপ। আবার বিহারে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ গুণ কিন্তু পূর্ব বাংলা নির্ধারিত হয়েছে মাত্র ৫ গুণ। এছাড়াও বিহারে জমি ও ঘরবাড়ির জন্য একই ধরনের সাধারণ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু পূর্ব বাংলায় জমি, অফিস, কাছারি এবং ঘরবাড়ির জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৯] অর্থাৎ কংগ্রেস দলীয় জমিদার ও জমিদার সমর্থক সদস্যরা জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে সবরকম চেষ্টা করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব বিলটি ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও দেশভাগের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নীতিগত কারণে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে) পাশ করলেও তা আইনে পরিণত করতে দীর্ঘ কালক্ষেপণ করে। ১৯৫০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বিলটি গৃহীত হলেও প্রায় একবছর তিন মাস পর অর্থাৎ ১৯৫১ সালের ১৮ মে তা আইনে পরিণত হয়। এতো দেরি হওয়ার প্রধান কারণ ছিল পূর্ব বাংলায় ও পাকিস্তানের কেন্দ্রে জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। উল্লেখ্য, সে সময় (মে, ১৯৫১) পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিলেন পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট জমিদার নেতা স্যার খাজা নাজিম উদ্দিন।

[৫] জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস দলীয় সদস্যর মধ্যে পূর্ণেন্দু কিশোর সেন গুপ্ত, জ্যোতিন্দ্র নাথ ভদ্র, মুনীন্দ নাথ ভট্টাচার্য, বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী, বিনোদ বিহারী চৌধুরী, বসন্ত কুমার দাস, ব্রজমাধব দাস, সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত, ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, নীরেন্দ্র নাথ দেব, মনোরঞ্জন ধর, হারাণ চন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, অবলা কান্ত গুপ্ত, প্রভাষ চন্দ্র লাহিড়ী, রজনী কান্ত রায় বর্মন, প্রফুল্ল রঞ্জন সরকার, মিসেস নীলী সেন গুপ্ত এবং গোবিন্দলাল ব্যানার্জী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেখুন, *Assembly Proceedings*, Vol. XI, No. 1, 1953, pp. 103-104.

[৬] জমিদার যে সমস্ত জমি নিজে ব্যবহার করতেন বা শ্রমিক দ্বারা চাষাবাদ করতেন সাধারণভাবে সে সমস্ত জমি খাস জমি হিসেবে পরিচিত ছিল।

[৭] *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 5, 1949, pp. 70-72.

[৮] *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 5, 1949, p. 72.

[৯] *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 5, 1949, pp. 77-78.

তৃতীয়ত, পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পর পূর্ব বাংলার জমিদাররা সংগঠিতভাবে আইনটি যাতে কার্যকর হতে না পারে তার জন্য অব্যাহতভাবে নানাবিধ চেষ্টা করতে থাকেন। এর মধ্যে অন্যতম দৃষ্টান্ত ছিল মামলার মাধ্যমে আইনটি বাস্তবায়নে বাধা প্রদান। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারের অবসান হলে যুক্তফ্রন্ট সরকার আইনটি দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে কিন্তু জমিদারদের মামলার কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। ১৯৫৬ সালের ২৪ এপ্রিল (১ বৈশাখ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) হতে পূর্ব বাংলার অবশিষ্ট জমিদারি দখল সম্পর্কিত ১৯৫৬ সালের ২ এপ্রিল তারিখে প্রাদেশিক সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি, জমিদারি দখল আইন এবং এই আইনের সংশোধনী অর্ডিন্যান্সসমূহের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা আট আনা রাজ এস্টেটের জমিদার শ্রী জীবেন্দ্র কিশোর আশ্চার্য চৌধুরীর নেতৃত্বে ৮৩ জন জমিদার ঢাকা হাইকোর্টে একটি রীট মামলা দায়ের করেন। এছাড়াও একই কারণে জমিদারদের পক্ষ থেকে এডভোকেট বি.এ. সিদ্দিকী ১৪টি এবং ব্যারিস্টার আবু সাইদ চৌধুরী ৫০টিরও অধিক আবেদনপত্র হাইকোর্টে দাখিল করে রীট মামলা করেন।[১০] অন্যদিকে ১৯৫৬ সালের ২ এপ্রিল পূর্ব বাংলা সরকার ওয়াকফ সম্পত্তি অধিগ্রহণের আদেশ জারি করলে তার বিরুদ্ধেও সম্পত্তির মুতওয়াল্লীগণ ঢাকা হাইকোর্টে একটি রীট মামলা দাখিল করেন।[১১] এসব রীট মামলায় ১৯৫৬ সালের ২ এপ্রিলে প্রাদেশিক সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি বাতিল এবং মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জমিদারি দখল স্থগিত রাখার জন্য নির্দেশনার প্রার্থনা করা হয়। ১৯৫৬ সালের ১৩ এপ্রিল ঢাকা হাইকোর্টে একই সঙ্গে উভয় রীট মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি আমীন উদ্দিন আহমদ ও বিচারপতি হাসানের দ্বৈত বেঞ্চ প্রাদেশিক সরকারকে বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হতে অর্থাৎ জমিদারি খাজনা আদায়ী স্বত্ব এবং খাস জমিসমূহ দখল হতে বিরত থাকার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ইনজাংশন জারি করেন। বিচারপতিদ্বয় অন্তর্বর্তীকালীন ইনজাংশন জারি করে অতিরিক্ত ঢাকা গেজেটে প্রকাশিত জমিদারি দখল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল করার জন্য 'রিট অব ম্যান্ডেমাস' কেন জারি করা হবে না তা জানাতে প্রাদেশিক সরকারের অর্থ ও রাজস্ব দপ্তরের (ভূমি রাজস্ব শাখা) সচিবকে ২১ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে এবং বর্তমান মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জমিদারি দখল স্থগিত রাখতে নির্দেশ দেন।[১২] ১৯৫৬ সালের ১৪ এপ্রিল পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার সাংবাদিকদের জানান যে সরকারের ১৯৫৬ সালের ২ এপ্রিল তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জমিদারি দখল সংক্রান্ত কাজ স্থগিত রাখার জন্য ঢাকা হাইকোর্ট (১৯৫৬ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে) যে নির্দেশ জারি করেছেন তা এখনও পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে পৌঁছেনি। তারপরও সরকার পূর্ববঙ্গের জমিদারি দখলের কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।[১৩] ১৯৫৬ সালের ১১ জুন ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আমীন উদ্দিন আহমদ, বিচারপতি ইস্পাহানী ও বিচারপতি হামুদুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত স্পেশাল বেঞ্চে জমিদারি দখল মামলার শুনানি শুরু হয়। মামলায় প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে এডভোকেট জেনারেল এস. এন. বাকের, প্রখ্যাত ব্রিটিশ কৌঁসুলি মি. ডি. এন. প্রিট, পাকিস্তানের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী এ. কে. ব্রোহী এবং জমিদারদের পক্ষে পাটনা হাইকোর্টের প্রখ্যাত কৌঁসুলি শ্রী পি. আর. দাশ (দেশবন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাশের ভ্রাতা), কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার শ্রী অশোক সেন ও ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থ রায়, ঢাকা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার আবু সাইদ চৌধুরী এবং ব্যারিস্টার বি. এ. সিদ্দিকী শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন।[১৪] ১৯৫৬ সালের ৭ আগস্ট ঢাকা হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চ জমিদারি দখল মামলার রায় প্রদান করে। রায়ে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন বা জমিদারি দখল আইন এবং পরবর্তীকালে প্রাদেশিক গভর্নরের সংশোধনী অর্ডিন্যান্সসমূহকে বৈধ বলে

---

[১০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ এপ্রিল, ১৯৫৬; Bari, *District Gazetteers : Patuakhali*, pp. 253-254.
[১১] *দৈনিক নাজাত*, ১৩ মে, ১৯৫৯।
[১২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ এপ্রিল, ১৯৫৬।
[১৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ এপ্রিল, ১৯৫৬।
[১৪] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২, ১৪, ১৫ ও ১৫ জুন এবং ৮ আগস্ট, ১৯৫৬।

ঘোষণা করা হয়। তবে ওয়াকফ এবং দেবোত্তর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত খাস জমি দখল সম্পর্কে সরকারি নোটিশের বিরুদ্ধে অন্যান্য আবেদনকারীর মামলায় স্পেশাল বেঞ্চ রায় দান প্রসঙ্গে উপরিউক্ত খাস জমি দখল সংক্রান্ত নোটিশ বাতিল বলে ঘোষণা করেন। এতদনুযায়ী উল্লিখিত এস্টেটের খাস জমিসমূহ অধিগ্রহণের আওতামুক্ত রাখার জন্যও রায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে দেবোত্তর ও ওয়াকফ এস্টেটের খাস জমি ছাড়া অন্য সমস্ত সম্পত্তি সরকার আইনত দখল করতে পারবে বলেও রায়ে উল্লেখ করা হয়। রায়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন এবং ১৯৫৬ সালে প্রাদেশিক গভর্নর কর্তৃক খাস জমি দখলে রাখা সংক্রান্ত আদেশের বিরুদ্ধে করা আবেদনের পক্ষে ডিগ্রি প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট আইনের ২০ ধারা মোতাবেক বসতবাড়ি এবং অন্য যে জমিতে স্বত্বাধিকারের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে তা স্বত্বাধিকারীগণ দখলে রাখতে পারবে বলেও রায়ে উল্লেখ করা হয়।[১৫] ঢাকা হাইকোর্টের উক্ত রায়ের পর জমিদারি দখল আরও দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখার জন্য কোর্টের নিকট নির্দেশ চেয়ে পুনরায় আবেদন করা হয়। কিন্তু বিচারপতিগণ এই আবেদন খারিজ করে দেন এবং তাদেরকে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করার অনুমতি প্রদান করেন। বিচারপতিগণ রায়ে উল্লেখ করেন যে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের দ্বারা সরকার মধ্যস্বত্ব লোপ করে জমিদারি দখলের মাধ্যমে প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর ফলে দেশের ধনসম্পদ আর জমিদারদের নিকট জমা হতে পারবে না।[১৬] ১৯৫৬ সালের ১৫ আগস্ট জমিদারি দখল মামলা রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপীলের জন্য সময় প্রার্থনা করে ৬৫ জন জমিদার আবেদন করলে বিচারপতি আকবর ও বিচারপতি মুর্শেদের সমন্বিত কোর্ট সকল প্রকার খাজনা আদায়িস্বত্ব গ্রহণ হতে ১৯৫৬ সালের ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত বিরত থাকার জন্য প্রাদেশিক সরকারের প্রতি নির্দেশ ('সেট অর্ডার') জারি করেন।[১৭] ১৯৫৭ সালের ১৭ জানুয়ারি পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ মুনীর, বিচারপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, বিচারপতি এ. আর কর্নেলিয়াস, বিচারপতি মোহাম্মদ শরীফ এবং বিচারপতি আমীরুদ্দিনকে নিয়ে গঠিত ফুল বেঞ্চের রায়ে ১৯৫০ সালের জমিদারি দখল আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জের সমস্ত আপীলের আবেদন নাকচ করা হয়।[১৮] ১৯৫৭ সালের জুন মাসের মধ্যে হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্ট উভয় আদালতে সরকার পক্ষ জয়লাভ করে সকল জমিদারি একইসাথে অধিগ্রহণ করার আইনগত ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। তদনুযায়ী ১৯৫৮ সালে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এভাবে জমিদারি অধিগ্রহণের জন্য ১৯৫০ সালে আইন প্রণীত হলেও তা বাস্তবায়নে প্রায় ১০ বছর সময় লাগে। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে অনেক জমিদার জালিয়াতি, ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার মাধ্যমে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ গ্রহণ করে।[১৯] উল্লেখ্য, ১৯৫৬ সালের ২ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের এক প্রশ্নোত্তর থেকে জানা যায় যে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ মামলা শুনানির জন্য সরকার পক্ষের ৯ জন আইনজীবীকে সর্বমোট ৯০,১৮৮ টাকা প্রদান করা হয় (সারণি ২৫)।[২০]

বস্তুতপক্ষে, উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে তথা ভূমি বিরোধে বা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের প্রধান পক্ষ ছিলেন জমিদার। বাংলার ভূমি থেকে যে খাজনা আদায় করা হতো তার ৭৬.৭% জমিদাররা ভোগ করতেন। এদের বেশির ভাগ ছিলেন ছোট জমিদার। ৮৫.৩৯% জমিদারের অধীন ছিল মাত্র ৯.৭৮% জমি এবং এদের দেয় বার্ষিক গড় রাজস্ব ছিল ১০০ টাকার কম। ১৩.৮০% জমিদারের অধীন ছিল ৩৯.৩০% জমি

---

[১৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ আগস্ট, ১৯৫৬।
[১৬] *দৈনিক আজাদ*, ৮ আগস্ট, ১৯৫৬।
[১৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট, ১৯৫৬।
[১৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৫৭।
[১৯] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৭।
[২০] *Assembly Proceedings,* Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XV, No. 3, Third Session, 1956, The 28th September to 2nd October, 1956 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1957), pp. 244-246.

এবং এরা বার্ষিক রাজস্ব দিতো ১০০-৫০০০ টাকার মধ্যে। মাত্র ০.৭৭% জমিদারদের অধীন ছিল ৩৫.৪৮% জমি, এরাই ছিল বাংলার বড় জমিদার এবং এদের দেয় বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৫,০০০-৫০,০০০ টাকার মধ্যে। আর ৫০,০০০ টাকার বেশি বার্ষিক রাজস্ব প্রধানকারী জমিদারের জমিদারির শতকরা হার ছিল ০.০৪ ভাগ এবং এদের অধীনে ছিল মোট জমির ১৫.৪৪%। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে তিন থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৩৫ জন। আর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে তৈরিকৃত ভোটার তালিকায় দেখা যায় যে দুই থেকে তিন হাজার টাকা রাজস্ব প্রদানকারী জমিদার ছিলেন মাত্র ১৯৫১ জন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলার অধিকাংশ জমিদারি ছিল আয়তনে ছোট এবং জমিদার ছিলেন স্বল্প আয়ের।[২১] ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে পূর্ব বাংলায় জমিদারির সংখ্যা ছিল ১,৫৩,২০০টি; এর মধ্যে ১,০২,০৩১টি জমিদারি রাজস্ব দিত, বাকি ৫১,১৬৯টি জমিদারি বা এস্টেট ছিল নিষ্কর। উল্লেখ্য, এই জমিদারিগুলোর সবকটির মালিকানা আবার বেসরকারি ছিল না। এর মধ্যে বেশ কয়েকটির মালিকানা ছিল সরকারের। সরকারের মালিকানাধীন জমিদারিগুলো খাসমহল নামে পরিচিত ছিল। খাসমহলগুলো ছিল যশোর, খুলনা, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল, সুন্দরবন, ২৪ পরগণার উপকূলবর্তী অঞ্চল, মেদিনিপুর, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়। খাসমহলের জমি স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হতো এবং সরকার 'সার্টিফিকেট' জারি করে তার রাজস্ব আদায় করতো। খাসমহলে খাজনার হার বেশি ছিল। খাসমহলে কৃষককে প্রতি একর জমির জন্য ৪ টাকা ৬ আনা থেকে ৪ টাকা ১১ আনা খাজনা দিতে হতো, অথচ জমিদারি এলাকায় এই হার ছিল প্রতি একরে ৩ টাকা।[২২] ১৯৪৯ সালের ২৬ মার্চ পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে সদস্যরা অভিমত দেন যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে শতকরা ৯০ জন লোক প্রভাবিত হবে। ৪৪ লক্ষ লোক জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে ভুক্তভোগী হবে।[২৩] পূর্ব পাকিস্তানের জমিদারি অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয় ৩৬,৩৪,০১,১১১ টাকা। তন্মধ্যে দেশীয় জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের নির্ধারিত প্রাপ্য ছিল ২৬,৪০,৭৭,২২৬ টাকা এবং অনিবাসী জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের নির্ধারিত প্রাপ্য ছিল ৯,৯৩,২৩,৮৮৫ টাকা। মোট ৩৫ লাখ জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ তালিকা প্রস্তুত করা হয়। দেশীয় জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের ১৯৬৩ সাল হতে ৫ বছর মেয়াদে নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। অনিবাসী জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অহস্তান্তরযোগ্য বন্ড আকারে বার্ষিক কিস্তিতে ৪০ বছর মেয়াদে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বছরে ৩% হারে সুদ প্রদানেরও বিধান করা হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিপূরণ তালিকা এবং বার্ষিক বৃত্তি তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং তা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হয়। তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পর থেকেই কিছু পরিমাণ ক্ষতিপুরণ প্রদান শুরু হলেও মূলত চূড়ান্তভাবে ক্ষতিপূরণ তালিকা ও বার্ষিক বৃত্তি তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ হওয়ার পর ১৯৬৩ সাল হতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট জেলায় সার্বিকভাবে ক্ষতিপুরণ প্রদান শুরু করেন।[২৪] উল্লেখ্য, ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের অধীনে খাজনা গ্রহীতাদের জমি অধিগ্রহণের কাজ ১৯৫৮ সালে সমাপ্ত হয়। তবে দেবোত্তর, ওয়াকফ ইত্যাদি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ধীরগতিতে চলে এবং চূড়ান্তভাবে সকল প্রকার অধিগ্রহণ শেষ হয় ১৯৬৪ সালে।[২৫] সুতরাং জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে আইনগত ও আনুষ্ঠানিকভাবে জমিদারদের অস্তিত্ব বিলীন হলেও বাস্তবে তাদের অস্তিত্ব ও প্রভাব শেষ হতে অনেক দিন

---

[২১] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ২১।

[২২] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ২১, ২৭।

[২৩] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. III, No. 3, Third Session, 1949, The 26th, 28th, 29th, 30th, 31st March and 1st April, 1949 (Dacca : East Bengal Government Press, 1952), pp. 56-57.

[২৪] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৬৭-৬৯।

[২৫] ভূঞা, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব*, পৃ. ৭০-৭১; ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৩।

সময় লাগে। পাকিস্তান শাসনামলে তারা তাদের অস্তিত্ব ও স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট ছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে জমিদারদের পতন ঘটে।

৫.২.২ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জমিদারদের প্রভাব হ্রাস

১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকর হওয়ার পর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়েছিল। এর ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জমিদারদের প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যুগে জমিদাররা যেসব স্কুল ও ডিস্পেন্সারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার জন্য তারা বাড়তি কর (আবওয়াব) আদায় করতেন।[২৬] কিন্তু সেসময় সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল বা প্রচার করা হয়েছিল যে জমিদাররা কৃষক হিতৈষিণী ও জনদরদী হিসেবে কৃষকদের উপকারার্থে এসব কার্যক্রম গ্রহণ করেন। পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের পর জমিদাররা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য সংস্থায় আর্থিক সহযোগিতা করতে অপারগতা জানায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার দেশের জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে প্রাক্তন জমিদার কর্তৃক সৃষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণমূলক দাতব্য সংস্থাসমূহের ব্যয় নির্বাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২৭] ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদে রাজস্বমন্ত্রী তোফাজ্জল আলী ঘোষণা করেন, “Government propose to continue the payments of the contributions to the charitable and educational institutions which the ex-proprietors used to make.”[28] সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কিছু অর্থ বরাদ্দও করা হয় (সারণি ২৬)।[২৯] সারণি ২৬ থেকে দেখা যায় যে ১৯৫৬-৫৭ সালে অধিগ্রহণকৃত জমিদারি এস্টেটের ২১টি প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি অনুদানের সর্বমোট পরিমাণ ছিল ২০৪১ টাকা। যদিও সরকারি এই অনুদানের পরিমাণ ছিল চাহিদার তুলনায় যৎসামান্য, তারপরও দেশের জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে এটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আর জমিদারি আমলে তৈরিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণমূলক দাতব্য সংস্থাসমূহের সরকারি ব্যয় বহনের মাধ্যমে আর্থ-সামজিক ক্ষেত্রে জমিদারদের প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পায়। তবে এরপরও বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকেও জমিদারদের অস্তিত্ব ও প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ১৯৫১ সালের ঢাকা দেওয়ানি আদালতে ঢাকা জেলা জুরি বোর্ডের সদস্য তালিকা (সারণি ২৭) এবং ১৯৫৩ সালের ঢাকা দেওয়ানি আদালতে ঢাকা জেলার জুরি বোর্ডের সদস্য তালিকায় (সারণি ২৮) দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পরও জমিদার উপাধিতেই তাদেরকে দেওয়ানি আদালতের জুরি বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।[৩০] সারণি ২৭ থেকে দেখা যায় যে ১৯৫১ সালের ঢাকা দেওয়ানি আদালতে ৩০ জন জমিদার এবং সারণি ২৮ থেকে দেখা যায় যে ১৯৫৩ সালের ঢাকা দেওয়ানি আদালতে ৩২ জন জমিদার ঢাকা জেলা জুরি বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পরও কেন জমিদারদেরকে জুরি বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল? সংক্ষেপে এর উত্তরে বলা যায় যে উক্ত আইন প্রণয়নের পর আইনগতভাবে অস্তিত্ব বিলীন হলেও সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রাক্তন জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল। উপরন্তু, শিক্ষা দীক্ষায় তারাই ছিলেন সমাজের অগ্রসর শ্রেণি যা জুরি বোর্ডের সদস্য নিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় ছিল। উল্লেখ্য, ঔপনিবেশিক শাসনামল হতে পাকিস্তান আমলের ষাটের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থায় জুরি প্রথার প্রচলন ছিল। তৎকালীন বিচার

---

[২৬] Sachse, *Bengal District Gazetteers : Mymensingh*, p. 108.
[২৭] Latif, *District Gazetteers : Patuakhali*, p. 254.
[২৮] *Assembly Proceedings*, Vol. X, No. 1, 1953, p. 199.
[২৯] File No. 18S-1/58, *Bundle No. 237*, BNA Serial No. 224.
[৩০] *Jury List for the year 1950 in the District of Dacca*, Appendix-List of special and common jurors, The Dacca Gazette, April 12, 1951; *Jury List for the year 1953 in the District of Dacca*, Appendix-List of Special and Common Jurors, The Dacca Gazette, July 16, 1953.

ব্যবস্থায় যাদেরকে সরকার জুরি বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করতেন তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, এমনকি তাদের রাজনৈতিক অবস্থানও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হতো। ফলে এসব বিবেচনায়ই সরকার জমিদারদেরকে জুরি বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করেছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর জমিদারদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত না হলেও তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল।

৫.২.৩ ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও জমিদারদের বিলুপ্তি

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অংশত অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হলেও ক্রমেই তা হ্রাস পেতে থাকে এবং সত্তরের দশকের শুরুতে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পরও জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আংশিক বহাল থাকলেও ১৯৫৪ সালের পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে তাদের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। এই নির্বাচন ছিল জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের সর্বশেষ অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ১১৯টি আসনের মধ্যে ৩৫টি আসন বা ২৯.৪১% (সারণি ২০)[৩১] এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ১২১টি আসনের মধ্যে ১১৪টি আসন বা ৯৪.২১% (সারণি ২২)[৩২] লাভ করলেও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে মাত্র ১০টি[৩৩] বা ৩.৮০% আসনে বিজয়ী হয় (সারণি ২৯)।[৩৪] আর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান হতে জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত ১৬৯টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্ধারিত ৩১০টি আসনের মধ্যে ত্রিধাবিভক্ত মুসলিম লীগ [মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), মুসলিম লীগ (কনভেনশন) ও মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)] পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনও পায়নি (সারণি ৪৭ ও ৪৮)।[৩৫] সুতরাং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জমিদারদের পতনের যে যাত্রা শুরু হয় তা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছায়। অতঃপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে জমিদারদের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে। রেহমান সোবহান যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছেন,

> ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গ আইনসভা নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির পর শেষ পর্যায়ে পৌঁছায় পারিবারিক ভাগ্যের অধোগতি। পরিবারের যেসব সদস্য ১৯৫৪ সালের নির্বাচন লড়েছিল লীগের টিকিটে তারা এমনকি ঢাকার আশপাশে তাদের চিরাচরিত নির্বাচন কেন্দ্রগুলোতেও পরাজিত হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পূর্ববাংলায় ঢাকা নবাব পরিবারের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তির মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। ... স্থানীয় মুসলিম লীগ রাজনীতিতে সক্রিয় ঢাকা নবাব পরিবারের সদস্য খাজা খায়েরউদ্দিন ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে পুরান ঢাকার একটি আসন থেকে দাঁড়াবার হঠকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে বিপুল ব্যবধানে হেরে যায়। বহু বছর ধরে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার যে সিদ্ধান্ত আঁকড়ে থেকেছে ঢাকা নবাব পরিবারের সদস্যরা-বাংলা শেখার চেষ্টা করেনি অথবা যাদের মাঝে বসত সেই স্থানীয় জনসমষ্টির ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেনি-এগুলোই বিচ্ছিন্ন করেছে তাদের। এই বিচ্ছিন্নতা আরও বাড়িয়ে তোলে ক্রমে অজনপ্রিয় হয়ে উঠে মুসলিম লীগের সঙ্গে তাদের ইতিহাসগত ঘনিষ্ঠতা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ঢাকা নবাব পরিবারের সদস্যরা বাঙালিদের থেকে ভিন্নকূল হিসেবে বিবেচিত হয়।

---

[৩১] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, pp. 74-75 and 77; Sen, *Muslim Politics in Bengal*, pp. 88-89; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২২।

[৩২] Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, p. 215; Rahim and Rahim, *Bengal Politics : Documents of the Raj*, pp. 137-138 and 171; Jalal, *Sole Spokesman*, p. 161; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২৪; করিম, *"১৯৪৬ সালের নির্বাচন"*, পৃ. ১১৩।

[৩৩] ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৯টি আসনে বিজয়ী হয় এবং পরবর্তীকালে বিজয়ী ১ জন স্বতন্ত্র সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করায় আইন পরিষদে লীগের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১০টি। দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : দি প্রিন্টার্স, ১৯৮২), পৃ. ৩৮৯; আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও এস. এম. রেজাউল করিম করিম, "১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার ও পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া", *সমাজ নিরীক্ষণ*, নং ৮৭, মে-আগস্ট ২০০৩ (ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ২০০৩), পৃ. ৬৯ ও ৭২।

[৩৪] হোসেন ও করিম, *"১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার"*, পৃ. ৭২।

[৩৫] হারুন-অর-রশিদ, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা* (ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, ২০২০), পৃ. ৭২-৭৩; এ এস এম সামছুল আরেফিন (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নির্বাচন, ১৯৭০-২০০১* (ঢাকা : বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩), পৃ. ২৩; মোশারফ হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন : বাংলাদেশের অভ্যুদয়* (ঢাকা : দ্যু প্রকাশন, ২০২০), পৃ. ১৮৪-১৮৫; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২২৪; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৮২-২৮৩।

ফলে পূর্ববঙ্গের এই একদা প্রতাপশালী পরিবার তলিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল তলায়। পরিত্যক্ত ভগ্নাবশেষ হয়ে যায় তাদের পৈতৃক ভিটে আহসান মঞ্জিল।[৩৬]

সুতরাং ঔপনিবেশিক শাসনামলের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধ্য এবং প্রভাবশালী জমিদাররা পাকিস্তান শাসনামলে ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন, ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাদের যে পতন প্রক্রিয়া শুরু হয় তা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে এবং জমিদারদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়।

৫.৩ জোতদার শ্রেণির পতন

৫.৩.১ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন ও চুয়ান্নর নির্বাচনের পর জোতদারদের প্রাধান্য হ্রাস

ঔপনিবেশিক শাসনামলে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে বাংলার সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে জোতদার শ্রেণির যে প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে তা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও পূর্ব বাংলায় অব্যাহত থাকে। উল্লেখ্য, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট জমিদার ও জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা খাজা নাজিম উদ্দিন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এ কারণে পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে, এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও জোতদার শ্রেণির প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন থাকে। ফলে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের ভিতরে ও বাইরে জোতদার শ্রেণির নির্বাচিত প্রতিনিধিরা মুসলিম লীগ সরকারের ওপর অব্যাহতভাবে প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রে জোতদাররা নিজেদের ও কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে এবং জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে কয়েকজন জোতদার সদস্য রাজস্ব কর্মকর্তাদের ওপর ভূমি রাজস্ব, খাজনা ও সেস নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়ায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং তা বাতিলের জন্য সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেন। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিল পাশে সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করছে বলেও তারা অভিযোগ করেন। এছাড়াও জমিদারি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ সম্পর্কে সরকারের নীতি কৌশলের সমালোচনা করেন এবং অধিগ্রহণকৃত জমি সরকারের নিয়ন্ত্রণ হতে ভূমিহীনদের প্রদান করে অধিক শস্য উৎপন্ন করতে পারলে দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান হতো বলেও সরকারকে পরামর্শ দেন। উল্লেখ্য, সরকারের নিয়ন্ত্রণে অধিগ্রহণকৃত স্থিতি (Balance) জমির পরিমাণ ছিল ৬,২৫,৯৬৯ একর (সারণি ৪১)।[৩৭] উপরন্তু, জোতদার সদস্যরা পূর্ব বাংলা পতিত ভূমি অধিগ্রহণ বিলের সমালোচনা ও বিলের বিভিন্ন ধারা পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়ে পতিত জমি সরকারের নিয়ন্ত্রণে গেলে চাষীর সর্বনাশ হবে বলেও অভিমত দেন। সুতরাং বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে জোতদাররা নিজেদের ও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৩৮] জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পর একদিকে সাধারণ কৃষকদের ভূমিস্বত্বের ওপর আংশিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অন্যদিকে জোতদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতেও সুবিধা হয়। আমিনুর রহিম মন্তব্য করেন, “The Tenancy Act, enacted in 1950, abolished the zamindary system, but it hardly benefited the poor peasants and was of great benefit to the jotdars, who acquired more lands

---

[৩৬] সোবহান, *উতল রোমন্থন*, পৃ. ১১।

[৩৭] Ali, “*Land Reform Measures and Their Implementation in Bangladesh*”, p. 165.

[৩৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Assembly Proceedings*, Vol. III, No. 4, 1949, p. 73-76; *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 5, 1949, pp. 47-78; *Assembly Proceedings*, Vol. IV, No. 6, 1950, p. 88; Shawkat Ali, “Land Reform Measures and Their Implementation in Bangladesh”, Muhiuddin Khan Alamgir (ed.), *Land Reform in Bangladesh* (Dacca : Centre For Social Studies-CSS,1981), p. 165.

through their social and political power."[39] বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে জোতদারদের গুরুত্ব এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে জমিদারদের তুলনায় তাদেরকেই অধিক সংখ্যায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করা হয়। যেমন ১৯৫১ ও ১৯৫৩ সালের ঢাকা জেলা জুরি বোর্ডের সদস্য তালিকায় তালিকাভুক্ত সদস্যদের মধ্যে জোতদারদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় (সারণি ২৭ ও ২৮)।[৪০] সারণি ২৭ থেকে দেখা যায় যে ১৯৫১ সালে ঢাকা দেওয়ানি আদালতে জুরি বোর্ডের সদস্য ছিলেন ১৮৭ জন জোতদার, ২৪৫ জন তালুকদার, ২৭ জন জমিদার, ১২ জন ভূম্যধিকারী, ৩ জন ভূস্বামী ও ১ জন ভূমির মালিক। জুরি বোর্ডের সর্বমোট ১১৭১ জন সদস্যের মধ্যে সরাসরি ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট সদস্য ছিলেন ৪৭৫ জন বা ৪০.৪৬%। এই ভূমি সংশ্লিষ্ট ৪৭৫ জন সদস্যের মধ্যে আবার সর্বমোট জোতদার (জোতদার ও তালুকদারের সমন্বয়ে) সদস্য ছিলেন ৪৩২ জন। অন্যদিকে সারণি ২৮ থেকে দেখা যায় যে ১৯৫৩ সালে ঢাকা দেওয়ানি আদালতে জুরি বোর্ডের সদস্য ছিলেন ২০৫ জন জোতদার, ২১১ জন তালুকদার, ২২ জন জমিদার, ১৩ জন ভূম্যধিকারী এবং ১০ জন ভূস্বামী। ১৯৫৩ সালে ঢাকা জেলার জুরি বোর্ডের সর্বমোট ১১৪৬ জন সদস্যের মধ্যে সরাসরি ভূমি সংশ্লিষ্ট সদস্য ছিলেন ৪৬১ জন বা ৪০.২৩%। ভূমি সংশ্লিষ্ট এই ৪৬১ জন সদস্যের মধ্যে সর্বমোট জোতদার (জোতদার ও তালুকদারের সমন্বয়ে) সদস্য ছিলেন ৪১৬ জন। উক্ত সারণিদ্বয় বিশ্লেষণে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পর সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে জোতদারদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলেও জোতদাররা জুরি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হতেন। জোতদাররা জুরি বোর্ডের সদস্য হওয়ার কারণে একদিকে তারা মামলার বিচারকার্যে অংশগ্রহণপূর্বক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতেন এবং অন্যদিকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনেও তাদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতো। কুমিল্লা জেলার বশারত আলীর ডায়েরি থেকে জানা যায় যে ১৯২৮-৩২ সময়কালে তিনি জোতদার হিসেবে কুমিল্লা জজ কোর্টের জুরি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বশারত আলী তাঁর ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন যে তিনি জুরি বোর্ডের সদস্য হিসেবে প্রায়ই কুমিল্লা জজ কোর্টে উপস্থিত হয়ে মামলায় জুরির দায়িত্ব পালন করতেন এবং তার জন্য সম্মানিও পেতেন।[৪১] এ কারণে শুধুমাত্র আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনই নয় বরং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও জোতদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে পর জোতদার প্রভাবিত কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। আরও আলোচনা করা হয়েছে যে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পূর্বে কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃবৃন্দের একটি বড় অংশ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এর ফলে একদিকে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে লীগের নির্বাচনী বিজয় ত্বরান্বিত হয় এবং অন্যদিকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগ দল জমিদার প্রভাবিত হলেও বাস্তবে দলটির একটি বড় অংশ এবং স্পন্দমান সদস্যরা ছিলেন জোতদার শ্রেণিভুক্ত। ফলে লীগে জোতদাররা তুলনামূলক বিচারে প্রভাবশালীর ভূমিকা পালন করেছিল। এ কারণে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে জোতদারদের স্বার্থবিরোধী যে কোনো বিল উত্থাপিত হলেই পরিষদের জোতদার সদস্যরা তার বিরোধিতা করতেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে জোতদারদের স্বার্থবিরোধী "The Bengal Agricultural Income-Tax (East Bengal Amendment) Bill, 1951"-বিলটি উত্থাপিত হলে পরিষদের জোতদার সদস্যরা এর বিরোধিতা করেন। এক্ষেত্রে তাদের মন্তব্য ছিল

---

[৩৯] Rahim, *Politics and National Formation in Bangladesh*, p. 208.

[৪০] *Jury List for the year 1950 in the District of Dacca*; *Jury List for the year 1953 in the District of Dacca*.

[৪১] মো. মাহবুবর রহমান (সম্পাদিত), *মোঃ বশারত আলীর ডায়েরি (১৯২৩-৪৩) : কুমিল্লা জেলার এক জোতদার পরিবারের ইতিহাস ও তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা* (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), পৃ. ৫১।

যে বিলটি আকারে ছোট হলেও এর কার্যকারিতা 'এটম বোমা'র মতই মারাত্মক ও বিপজ্জনক। কারণ পূর্বে যাদের ১০০ বিঘা জমি এবং ৩৫০০ টাকা আয় ছিল তাদের ওপর কর ধার্যের ব্যবস্থা ছিল, উল্লেখিত বিলে তাকে নামিয়ে ৭৫ বিঘা জমি এবং ২৫০০ টাকা আয়ের ব্যক্তির ওপর কর ধার্যের নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কারণে তারা অভিমত দেন যে জনসাধারণকে শোষণ করে সরকার অর্থ আদায়ের শোষণমূলক নীতি গ্রহণ করেছে। পরিষদের জোতদার সদস্যদের মূল বক্তব্য ছিল তুলনামূলক স্বল্প আয়ের ও ক্ষুদ্র কৃষকের ওপর যদি করের বোঝা চাপানো হয় তবে তারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরিষদের সদস্যদের মতে প্রথমত, খামার ভাড়া, উৎপাদিত পণ্যের স্থানান্তরের ব্যয় ইত্যাদি কৃষককে বহন করতে হয়; দ্বিতীয়ত, যদিও রাজস্ব কমিশন বা ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে প্রতি একরে ২২ মণ ফসল উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেওয়া আছে কিন্তু তা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন রংপুরে প্রতি একরে উৎপন্ন হয় ১৮ মণের সামান্য অধিক ফসল। কিন্তু রাজস্ব কর্মকর্তাগণ এমনি পার্থক্য আমলে না নিয়েই সমভাবে সকলের ওপর কর ধার্য করেন; এবং তৃতীয়ত, পূর্ব পাকিস্তানে কৃষিজ পণ্যের হিসেব রাখার জন্য কোনো পরিসংখ্যান ব্যুরো না থাকায় সরকারি কর্মকর্তাগণ জমির পরিমাণের ওপর নির্ভর করেই কর ধার্য করেন, যা ছিল অনভিপ্রেত। এর ফলে জোতদার ও কৃষকরা শোষিত হচ্ছিল এবং তারা তাদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। এ কারণেই তারা সরকারকে ১৫% খরচা সুবিধা প্রদানের অনুরোধ করেন। পরিষদের জোতদার এবং জোতদার সমর্থক সদস্যরা আরও অনুরোধ করেন যে কর্মকর্তাগণ যদি কোনো অঞ্চলের মন্ত্রী, পরিষদ সদস্য বা অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুপারিশক্রমে কৃষি আয়কর ধার্য করেন তাহলে হয়তো জোতদাররা কিছুটা রেহাই পাবে।[৪২] অবশ্য বিলের বিরুদ্ধে জোতদার ও জোতদার সমর্থক সদস্যদের সমালোচনার জবাবে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন মন্তব্য করেছিলেন, "Some spoke in the name of *Janasadharan* which is the main slogan of my friend, Mr. Khairat Hossain although it does not affect *Janasadharan*. It affect only a handful of *jotedars* who are rich."[43] বস্তুতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য যথার্থই ছিল। কারণ পরিষদের জোতদার ও জোতদার সমর্থক সদস্যরা জনসাধারণের সমস্যার কথা উল্লেখ করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থেই উক্ত বিলের বিরোধিতা করেছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জোতদার ও কৃষক শ্রেণি থেকে উদ্ভূত নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২১৫টি বা ৯০.৭২% আসনে বিজয়ী হয়েছিল।[৪৪] কিন্তু ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর সার্বিকভাবে জোতদার শ্রেণি যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সীমিত বৈষয়িক সুবিধা নিয়ে টিকে ছিল। কেননা মাত্র ১০০ বিঘা জমির জোতদারি ক্ষমতা নিয়ে খুব বেশি বিকশিত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।[৪৫] সুতরাং চুয়ান্নর নির্বাচনের পর জোতদারদের প্রাধান্য কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছিল।

৫.৩.২ মৌলিক গণতন্ত্র ও ১৯৬১ সালের ভূমি আইনে জোতদারদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা

জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক আইন জারির পর থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত প্রধানত দু'টি কারণে জোতদার শ্রেণির প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথমত, মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের পর আইয়ুব খানের একটি লক্ষ্য ছিল জোতদার শ্রেণি ও সরকারের মধ্যে মৈত্রী গড়ে তোলা। অর্থাৎ জোতদার শ্রেণিকে সরকারের

[৪২] *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 2, 1951, pp. 447 and 452; *Assembly Proceedings*, Vol. XV, No 3, 1956, p. 66.

[৪৩] *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 2, 1951, p. 454.

[৪৪] ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২১৫টি আসনে বিজয়ী হয় এবং এর মধ্যে ফজলুল হক একাই ২টি আসন লাভ করেন। পরবর্তীকালে ফজলুল হক ১টি আসন ছেড়ে দিলে যুক্তফ্রন্টের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৪টি। অতঃপর নির্বাচনে বিজয়ী ৯ জন স্বতন্ত্র সদস্য যুক্তফ্রন্টে যোগদান করায় আইন পরিষদে যুক্তফ্রন্টের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৩টি। দেখুন, রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮৯; হোসেন ও করিম, "*১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার*", পৃ. ৬৯ ও ৭২।

[৪৫] আজাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ২২৯।

অনুগত শ্রেণি হিসেবে তৈরি করা। আইয়ুব খানের ধারণা হয়েছিল যে জোতদাররা মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলে তারা সামরিক সরকারকে সমর্থন করবে, কেননা সরকারও তাদের স্বার্থ রক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। হয়েছিলও তাই। কারণ অনুষ্ঠিত মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্যদের প্রায় সকলেই ছিলেন জোতদার শ্রেণিভুক্ত। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা ছিলেন আইয়ুব সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণের সহযোগী। একদিকে এই নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রী জোতদাররা অনুগত ও সহযোগী শ্রেণি হিসেবে সরকারের নির্বিঘ্ন শাসন ব্যবস্থা তথা সরকারের অস্তিত্ব রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল, অন্যদিকে সরকারও নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষা করেছিল। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জোতদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ১৯৬১ সালের পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত তৃতীয় সংশোধনী আইনে পরিবার প্রতি জমির সীমা নির্ধারণ করা হয় ১২৪ একর বা ৩৭৫ বিঘা। এর ফলে ইতোপূর্বে প্রণীত পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে পরিবার প্রতি জমির সীমা ১০০ বিঘা নির্ধারণ করা হলেও ১৯৬১ সালের নতুন আইনে জমির সীমা ৩৭৫ বিঘায় নির্ধারিত হওয়ায় অধিক পরিমাণ জমির ওপর জোতদারদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে জোতদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং একদিকে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন এবং অন্যদিকে পরিবার প্রতি ৩৭৫ বিঘা জমির সীমা নির্ধারণ করার ফলে জোতদাররা গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। রেহমান সোবহানের মতে গ্রামীণ সমাজের উদ্বৃত্ত কৃষক তথা জোতদাররাই ছিলেন ইউনিয়ন কাউন্সিলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী।[৪৬] এর ফলে পূর্ব বাংলায় নতুন করে জোতদারি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই নতুন জোতদারি ব্যবস্থায় সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জোতদাররাই ছিলেন কৃষককূলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।[৪৭] এর ফলস্বরূপ কৃষকরা আরও বেশি শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়েছিল।

উল্লেখ্য, আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর স্থানীয় শাসন প্রবর্তন করে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারি করেন।[৪৮] সরকারি ঘোষণা মতে মৌলিক গণতন্ত্র আইনের অধীনে প্রবর্তিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল 'জনগণের ইচ্ছাকে সরকারের কাছাকাছি এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জনগণের কাছাকাছি এনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ' সাধন করা।[৪৯] এই আইনে পাঁচ স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো ছিল : (১) ইউনিয়ন কাউন্সিল (গ্রাম এলাকায়) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহর এলাকায়); (২) থানা কাউন্সিল (পূর্ব পাকিস্তানে) এবং তহশিল কাউন্সিল (পশ্চিম পাকিস্তানে); (৩) জেলা কাউন্সিল; (৪) বিভাগীয় কাউন্সিল; (৫) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দু'টি প্রাদেশিক উন্নয়ন উপদেষ্টা কাউন্সিল (১৯৬২ সালের সংবিধান কার্যকর হলে প্রাদেশিক আইন পরিষদ চালু হওয়ার পর এই স্তরটির বিলুপ্তি ঘটে)।[৫০] মৌলিক গণতন্ত্রের শাসনামলে যে পাঁচ স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো ছিল তার মধ্যে সর্বনিম্ন অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তরটি ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিল। প্রথমদিকে ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচিত ও মনোনীত উভয় প্রকারের সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। দশ-পনের হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত ৮ থেকে ১০ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সীমানা নির্ধারিত হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন ১৫ জন। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ছিলেন নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ সদস্য ছিলেন মনোনীত। এই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সার্বজনীন

---

[৪৬] Sobhan, *Basic Democracies*, p. 256.

[৪৭] Khan, *District Gazetteers : Rangpur*, p. 127.

[৪৮] M. Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council : A Study of Union and District Councils in East Pakistan* (Dacca : Oxford University Press, 1968), pp. 7-8.

[৪৯] ডালেম চন্দ্র বর্মন, "স্থানীয় সরকার", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭), পৃ. ৩৯১।

[৫০] Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, pp. 7-8.

ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন। এই নির্বাচিত সদস্যরাই মৌলিক গণতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উভয় প্রদেশ হতে ৪০,০০০ করে পাকিস্তানে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর সংখ্যা নির্ধারিত হয়। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা ইলেক্টরাল কলেজ হিসেবে প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ভোটারে পরিণত হন। রেহমান সোবহানের মতে আইয়ুব খান যে ইলেক্টরাল কলেজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন তা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী ব্যবস্থায় প্রচলিত ইলেক্টরাল কলেজ থেকে ভিন্নতর ছিল।[৫১] ১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারি সর্বপ্রথম সারা পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য ছিলেন সরকার মনোনীত। এই মনোনীত সদস্যরা ছিলেন প্রধানত সরকার সমর্থক এবং এদেরকে মনোনয়ন করতেন থানা পর্যায়ের কর্মকর্তারা। কার্যত দেখা যেতো থানা পর্যায়ের যে সকল কর্মকর্তার ওপর এই মনোনয়নের দায়িত্ব দেওয়া হতো, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের খেয়ালখুশি মতো সদস্য মনোনয়ন দিতেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কর্মকর্তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মানুষেরাই মনোনীত হতেন। এতে একদিকে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং অন্যদিকে অধিকাংশ মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্যের কাছ থেকে সরকারের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অর্থাৎ মনোনয়ন প্রথা মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের মূল লক্ষ্য অর্জনে বাধার সৃষ্টি করে। এ কারণে ১৯৬২ সালে প্রণীত অধ্যাদেশের এক সংশোধনী দ্বারা মনোনয়ন প্রথা বাতিল করে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সকল সদস্যকেই নির্বাচিত হওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্রীগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন। থানার অর্ন্তগত ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানবৃন্দ, টাউন বা ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যানবৃন্দ (যদি থাকে) ও নির্ধারিত সমসংখ্যক সরকারি সদস্যদের সমন্বয়ে থানা কাউন্সিল গঠিত হতো। অর্থাৎ থানা কাউন্সিলে ৫০% থাকতেন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে, ২৫% নিযুক্ত হতেন মনোনীত এবং ২৫% নিয়োগ পেতেন থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের (যেমন কৃষি ও সমবায় কর্মকর্তা, রেভেনিউ সার্কেল ইন্সপেক্টর, স্কুল পরিদর্শক ইত্যাদি) মধ্য থেকে। মহাকুমা প্রশাসক থানা কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। থানার সার্কেল অফিসার পদাধিকারবলে থানা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হতেন। জেলা কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০ জন। এর মধ্যে ৫০% থাকতেন সরকারি কর্মকর্তবৃন্দ, ২৫% নিযুক্ত হতেন জনপ্রতিনিধি (Public representatives) এবং ২৫% ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে মনোনীত হতেন। ডেপুটি কমিশনার জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। বিভাগীয় কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। মোট সদস্যের অর্ধেক সরকারি ও অর্ধেক ছিল বেসরকারি সদস্য। বিভাগের অর্ন্তগত জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ ছিলেন সরকারি সদস্য। বেসরকারি সদস্যদের অন্তত অর্ধেক বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে মনোনীত হতেন। বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকারবলে বিভাগীয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হতেন।[৫২] সুতরাং ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও বিভাগীয় কাউন্সিল সর্বক্ষেত্রে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ফলে মৌলিক গণতন্ত্রের বিধান অনুযায়ীই ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের অপ্রতিরোধ্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে দেশে স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের অধীনে ইউনিয়ন পর্যায়ে চেয়ারম্যানদের স্বৈরাচারী ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যরা ক্ষমতাহীন থাকায় সরকারের প্রতি যতটা না অনুগত ছিলেন তার চেয়ে তারা

---

[৫১] Sobhan, *Basic Democracies*, p. 256.

[৫২] Sobhan, *Basic Democracies*, pp. 77-78; Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, pp. 9-10; Siddiqui, *Bangladesh District Gazetteers : Rajshahi*, p. 325; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : দি প্রিন্টার্স, ১৯৮২), পৃ. ৪৬-৫৯; আজাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ৯১; বর্মন, "স্থানীয় সরকার", পৃ. ৩৯১-৩৯৪; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৫৪-১৫৬; ঈশিতা আক্তার মুক্তি, "৭০-এর নির্বাচন : জনসংখ্যাভিত্তিক আসন বণ্টন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতা অর্জনে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, সাঁইত্রিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জুন ২০১৯ (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০১৯), পৃ. ১০৫।

বেশি অনুরক্ত ছিলেন চেয়ারম্যানদের প্রতি। পরবর্তীকালে সরকার মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের সংশোধন করে আর্টিকেল ২৫(এ)-এর মাধ্যমে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদেরকে চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে তাদের পদচ্যুত করার অধিকার প্রদান করে। এর ফলে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানরা পদচ্যুত হওয়ার ভয়েই ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের সমীহ করে চলতো। এর ফলস্বরূপ ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও সদস্যরা জনসাধারণের স্বার্থের তুলনায় রাষ্ট্রীয় নির্দেশ পালনে ও সরকারের স্বার্থ রক্ষায় অধিকতর মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। এভাবেই মৌলিক গণতন্ত্রীরা অর্থাৎ ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও সদস্যরা কৃষকদের স্বার্থের বিপরীতে নিজেদের ও সরকারের স্বার্থে ভূমিকা পালন করে এবং সরকারের আজ্ঞাবহ অনুগত শ্রেণিতে পরিণত হয়।[৫৩]

বস্তুতপক্ষে, সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার কারণে পূর্ব বাংলায় আইয়ুব খান ও তাঁর অধীনস্থ শাসকবর্গের কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না। এমনি ভিত্তিহীন অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই শাসকের অস্তিত্বকে সংকটময় করে তোলে। কাজেই এই বিপদ থেকে মুক্তির অভিলাষে আইয়ুব খানের প্রয়োজন হয় পূর্ব বাংলায় এক শ্রেণির সমর্থক ও সহযোগী সৃষ্টি করা। কিন্তু স্বার্থের ঐক্য ব্যতীত কোনো সক্রিয় সহযোগিতা কখনও সম্ভব নয়। এই জন্যে আইয়ুব খান পূর্ব বাংলায় এমন এক শ্রেণিকে বাছাই করেন যারা তাঁর স্বার্থের পক্ষে উপযোগী এবং যাদের স্বার্থের সাথে তার কোনো সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল না। এই শ্রেণিকেই অবলম্বন করে আইয়ুব খান পূর্ব বাংলায় নিজের সামরিক শাসনের সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। বলাই বাহুল্য এই নীতি গ্রহণের কারণেই আইয়ুব খান পূর্ব বাংলার সামন্ত অবশেষের প্রতিনিধি গ্রামীণ সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জোতদার শ্রেণিকে তাঁর সরকারের অনুগত ও সহযোগী শ্রেণি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সুতরাং গ্রামবাংলার জোতদাররাই ছিলেন পূর্ব বাংলায় আইয়ুব খান সরকারের সর্বপ্রধান মিত্র। খানের ভূমি নীতি জোতদারদের ক্ষমতাকেই পল্লী বাংলায় প্রভূতভাবে বৃদ্ধি করে। ১৯৬১ সালের ভূমি আইনে পরিবার প্রতি জমির ঊর্ধ্ব সীমা ৩৭৫ বিঘায় বৃদ্ধি করায় অধিক পরিমাণ জমির ওপর জোতদারদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূস্বামীরা যদি পর্যাপ্ত ভূসম্পত্তি নিশ্চিতভাবে এবং শান্তিতে ভোগ করতে পারেন তবে তার মনে সরকার পরিবর্তনের কোনোরূপ ইচ্ছা জাগ্রত না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। লর্ড কর্নওয়ালিসের মতোই আইয়ুব খানও পূর্ব বাংলায় তাঁর ভূমি নীতি প্রবর্তন করেন। কাজেই শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়েই নয়, রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিক দিয়েও পূর্ব বাংলায় আইয়ুব খানের ভূমি ব্যবস্থা ছিল তর্কাতীতভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরই এক নতুন ও সাম্প্রতিক সংস্করণ। এই ভূমি নীতিকে সফল ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান সারাদেশে মৌলিক গণতন্ত্র এবং ওয়ার্কস প্রোগ্রাম নামে এক বিশেষ ধরনের 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন' ও 'জনহিতকর কর্মসূচি'র সূচনা করেন। এই মৌলিক গণতন্ত্রই পরিণত হয় পূর্ব বাংলায় আইয়ুব খানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার। মৌলিক গণতন্ত্র ও ওয়ার্কস প্রোগ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানেই প্রবর্তিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সামাজিক অগ্রগতির দিক দিয়ে ছিল একটা মস্তবড় পদক্ষেপ। কারণ ইতিপূর্বে সেখানে সামন্ত অভিজাত শ্রেণির এতোটাই দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল যে অন্য কারও সামান্যতম রাজনৈতিক স্বাধীনতা অথবা প্রভাবের অস্তিত্ব সেখানে ছিল না। এর ফলে একদিকে অর্থনৈতিক শোষণ এবং অন্যদিকে নিজ এলাকায় তারা নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। মৌলিক গণতন্ত্রের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে সামন্ত শাসনকে কিয়দংশে শিথিল করে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনের ধারা প্রবর্তন করে। পশ্চিম পাকিস্তানের ইউনিয়ন

---

[৫৩] Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, p. 11; আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ৯২-৯৩।

কাউন্সিলে যারা নির্বাচিত হয় তারা অনেকখানি সামন্ত প্রভাবের আওতামুক্ত ছিল এবং সামাজিক পরিবর্তনের দিক দিয়ে বিচারে তারা ছিল 'সামন্ত প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা' এক নতুন শ্রেণির মানুষ। এই শ্রেণি হলো গ্রাম্য বুর্জোয়া। পশ্চিম পাকিস্তানে এই গ্রাম্য বুর্জোয়াদের মাধ্যমে সামন্ত শক্তি শিথিল করা এবং এদের মাধ্যমে ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার পরিকল্পনা করা হয়। অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের আগ থেকেই (ঔপনিবেশিক আমলের শেষ কয়েক যুগ ধরে) গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন তথা ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সাথে সুপরিচিত ছিল। শুধু তাই নয়, মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন থেকে পূর্ব বাংলায় প্রচলিত ইতিপূর্বের ব্যবস্থা ছিল অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক। একথা ১৮৮৫ ও ১৯১৯ সালের স্থানীয় স্বাত্তশাসন আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। এছাড়াও ১৯৫৬ সালে পূর্ব বাংলায় ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোট, গোপন ব্যালট, প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের প্রত্যক্ষ নির্বাচন ইত্যাদি ব্যবস্থা মৌলিক গণতন্ত্র থেকে বহুগুণে গণতান্ত্রিক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আইয়ুব খানের পূর্ব বাংলায় প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের শ্রেণিচরিত্র কিছুটা ভিন্ন ছিল। তাঁর মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলায় ইউনিয়ন কাউন্সিলে যারা নির্বাচিত হতেন তারা ছিলেন প্রধানত জোতদার। উল্লেখ্য, এই জোতদাররা ছিলেন সামন্ত অবশেষের প্রতিনিধি। এই জোতদাররা যে শুধু আইয়ুব খানকে রাজনৈতিক সমর্থন দানই করেছিল তাই নয় বরং গ্রামাঞ্চলে পশ্চাৎপদ অর্থনীতিকে প্রয়োজনমতো টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রেও তাঁরাই সরকারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকে শক্তিশালী করার জন্য আইয়ুব সরকার ওয়ার্কস প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ সমগ্র পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে ব্যয় করে। দুর্নীতির মাধ্যমে এই অর্থের এক বৃহৎ অংশ পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মৌলিক গণতন্ত্রীদের হাতেই যায়। কিন্তু পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে ওয়ার্কস প্রোগ্রামের এই অর্থ একইভাবে বিনিয়োগ হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানে এই অর্থ ব্যয়িত হয় মোটামুটিভাবে ছোটখাট শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে। পশ্চিম পাকিস্তানে এই অর্থ বা মূলধন সামন্তবাদকে খর্ব করার পথ তৈরি করেছিল। অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় সেই একই মূলধন বিনিয়োগ করা হয় প্রধানত জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে। পূর্ব বাংলায় এই মূলধন আধা-সামন্তবাদী পশ্চাৎপদ অর্থনীতিকে প্রয়োজন মতো টিকিয়ে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করার পরিবর্তে পশ্চাৎমুখী ও প্রতিক্রিয়াশীল জোতদার শ্রেণিকে যে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ়তম রাজনৈতিক মিত্র হিসেবে গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মৌলিক গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সেটা মৌলিক গণতন্ত্র ও ওয়ার্কস প্রোগ্রামের ফলাফল পর্যালোচনায় সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। মৌলিক গণতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে এর গভীর যোগাযোগ। ১৯৬২ সালের সংবিধানে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ব্যবস্থা ছিল না। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের পরিবর্তে সরকারি অনুগ্রহপুষ্ট মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটের ওপর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচনকে দাঁড় করানোর রাজনৈতিক সুবিধা সহজেই বোধগম্য। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় নির্বাচনের একটা আচরণ রেখে আইয়ুব সরকার পূর্ব বাংলার সামন্ত শক্তির সাথে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থগত যোগসূত্রকে অনেকাংশে নিরাপদ এবং দৃঢ়তর করে।[৫৪]

মৌলিক গণতন্ত্রীগণের শ্রেণি চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, যেখানে পেশাগত দিক দিয়ে ১৯৫৭ সালে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের শতকরা ৭২.৩২ জন ছিল কৃষির, শতকরা ১০.৭৬ জন ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার, শতকরা ১০.১০ জন আইনজীবী, শিক্ষক ও ডাক্তার এবং শতকরা ১.৮২ জন অন্যান্য পেশাভুক্ত ছিলেন; সেখানে ১৯৫৯ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের শতকরা ৮২.৪৬ জন ছিল কৃষির, শতকরা ১৫.৬০ জন ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার, শতকরা ০.৬৫

---

[৫৪] উমর, *বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন*, পৃ. ৪৫-৪৮।

জন আইনজীবী, শিক্ষক ও ডাক্তার এবং শতকরা ১.২৯ জন অন্যান্য পেশাভুক্ত ছিলেন। আবার যেখানে ১৯৬১ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের শতকরা ৮২.৪৬ জন ছিল কৃষির, শতকরা ১৫.৬০ জন ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার, শতকরা ০.৬৫ জন আইনজীবী, শিক্ষক ও ডাক্তার এবং শতকরা ১.২০ জন অন্যান্য পেশাভুক্ত ছিলেন; সেখানে ১৯৬৪ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের শতকরা ৭৭.৭৮ জন ছিল কৃষির, শতকরা ১৬.৯৬ জন ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার, শতকরা ২.৭৮ জন আইনজীবী, শিক্ষক ও ডাক্তার এবং শতকরা ২.৪৮ জন অন্যান্য পেশাভুক্ত ছিলেন ১৯৬৬ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের শতকরা ৭৭.৭৮ জন ছিল কৃষির, শতকরা ১৬.৯৬ জন ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার, শতকরা ২.৭৮ জন আইনজীবী, শিক্ষক ও ডাক্তার এবং শতকরা ২.৪৮ জন অন্যান্য পেশাভুক্ত ছিলেন। এছাড়াও ১৯৬৬ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্যে শতকরা ৭০.৩৫ জন ছিল কৃষির, শতকরা ২৩.৯৭ জন ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার; শতকরা ৪.৩৬ জন আইনজীবী, শিক্ষক ও ডাক্তার এবং শতকরা ১.৩২ জন অন্যান্য পেশাভুক্ত ছিলেন (সারণি ৩১)।[৫৫] সুতরাং আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের যুগে কৃষি খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত পেশাজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু কৃষি খাত সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা সাধারণ কৃষক ছিলেন না, তারা ছিলেন ধনী কৃষক বা উদ্বৃত্ত কৃষক তথা জোতদার। লক্ষণীয় যে, জমির মালিকানার বিচারে মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রধান অংশই ছিল বড় খামারের মালিক। ১৯৬০-৬৫ সময়ের সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক তথা সাধারণ মানুষের যেখানে খামারের আয়তন ছিল শতকরা ১৩ জনের ০.৫ একরের নিচে, শতকরা ১১ জনের ০.৫ একর হতে ১ একরের নিচে, শতকরা ২৭ জনের ১ একর হতে ২.৫ একরের নিচে, শতকরা ২৬ জনের ২.৫ একর হতে ৫ একরের নিচে; শতকরা ১২ জনের ৫ একর হতে ৭.৫ একরের নিচে, শতকরা ৭ জনের ৭.৫ একর হতে ১২.৫ একরের নিচে এবং শতকরা ৩ জনের খামারের আয়তন ছিল ১২.৫ একর হতে ২৫ একরের নিচে; সেখানে শতকরা ২.২৯ ভাগ নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের অধীনে খামারের আয়তন ছিল ১ একর হতে ২.৫ একরের নিচে, শতকরা ১৩.২৬ ভাগের ছিল ২.৫ একর হতে ৫ একরের নিচে, শতকরা ২১.১৭ ভাগের ছিল ৫ একর হতে ৭.৫ একরের নিচে; শতকরা ২০.৪১ ভাগের ছিল ৭.৫ একর হতে ১২.৫ একরের নিচে, শতকরা ২৩.৪৭ ভাগের ছিল ১২.৫ একর হতে ২৫ একরের নিচে, শতকরা ১২.৫০ ভাগের ছিল ২৫ একর হতে ৪০ একরের নিচে এবং শতকরা ৬.৮৮ ভাগের অধীনে খামারের আয়তন ছিল ৪০ একর ও তার উপরে। এমন কোনো মৌলিক গণতন্ত্রী জোতদার ছিলেন না যার খামারের আয়তন ১ একরের নিচে ছিল (সারণি ৩২)।[৫৬] সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক তথা সাধারণ মানুষের খামারের আয়তন এবং নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের খামারের আয়তন বিশ্লেষণে সহজেই বুঝা যায় যে সাধারণ কৃষকের তুলনায় তারা ছিলেন ধনী কৃষক বা উদ্বৃত্ত কৃষক তথা জোতদার শ্রেণিভুক্ত। গ্রামাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠী সাধারণ কৃষক তথা ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক পরিবার থেকে কোনো ব্যক্তিই মৌলিক গণতন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়নি, অথচ তারাই ছিল সে সময়ের গ্রাম্য জনগোষ্ঠীর শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ। সুতরাং এই শতকরা ৫০ ভাগ মানুষের পক্ষে স্থানীয় সরকারে কোনো প্রতিনিধিত্বই ছিল না।[৫৭]

মৌলিক গণতন্ত্রীগণের আয়গত দিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে যেখানে ১৯৫৭ সালে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের শতকরা ৩৪.৮৫ জনের বার্ষিক আয় ছিল ৪০০০ টাকা এবং তার উপরে, শতকরা ২৬.৬৫ জনের বার্ষিক আয় ছিল ২০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ৩০০০ টাকার নিচে, শতকরা ১৫.৭৩ জনের বার্ষিক আয় ছিল ১০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ২০০০ টাকার নিচে এবং মাত্র শতকরা ৩.৭৩ জনের বার্ষিক আয় ছিল ১০০০ টাকার নিচে; সেখানে

---

[৫৫] Sobhan, *Basic Democracies*, p. 82; Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, p. 37.
[৫৬] Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, p. 43.
[৫৭] আজাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ৯৪।

১৯৬১ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের শতকরা ৩৮.৭৮ জনের বার্ষিক আয় ছিল ৪০০০ টাকা ও তার উপরে; শতকরা ২৪.০৩ জনের বার্ষিক আয় ছিল ২০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ৩০০০ টাকার নিচে, শতকরা ১২.৭৬ জনের বার্ষিক আয় ছিল ১০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ২০০০ টাকার নিচে এবং মাত্র শতকরা ১.৮৮ জনের বার্ষিক আয় ছিল ১০০০ টাকার নিচে। ১৯৬৬ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের শতকরা ৩০.৪৪ জনের বার্ষিক আয় ছিল ৪০০০ টাকা এবং তার উপরে, শতকরা ২১.৩৫ জনের বার্ষিক আয় ছিল ২০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ৩০০০ টাকার নিচে, শতকরা ২১.২৪ জনের বার্ষিক আয় ছিল ১০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ২০০০ টাকার নিচে এবং মাত্র শতকরা ১০.১৯ জনের বার্ষিক আয় ছিল ১০০০ টাকার নিচে (সারণি ৩৩)।[৫৮] এছাড়াও ১৯৬১ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্যে শতকরা ৭৬.৯০ জনের বার্ষিক আয় ছিল ১০০০ টাকার নিচে, শতকরা ১২.২০ জনের বার্ষিক আয় ১,০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ২,০০০ টাকার নিচে, শতকরা ৭.৩০ জনের বার্ষিক আয় ২০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ৩,০০০ টাকার নিচে, শতকরা ২.৪০ জনের বার্ষিক আয় ৪,০০০ টাকা ও তার উপরে এবং মাত্র শতকরা ১.২০ জনের বার্ষিক আয় ছিল ৩,০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ৪,০০০ টাকার নিচে। ১৯৬৫ সালে শতকরা ৬১.১২ জনের বার্ষিক আয় ছিল ৪,০০০ টাকা ও তার উপরে, শতকরা ১৪.৯১ জনের বার্ষিক আয় ৩,০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ৪,০০০ টাকার নিচে, শতকরা ১৪.২৮ জনের বার্ষিক আয় ২০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ৩,০০০ টাকার নিচে, শতকরা ৭.৫১ জনের বার্ষিক আয় ১০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ২,০০০ টাকার নিচে এবং মাত্র শতকরা ২.১৮ জনের বার্ষিক আয় ছিল ১০০০ টাকার নিচে (সারণি ৩৪)।[৫৯] সুতরাং মৌলিক গণতন্ত্রী জোতদারদের মধ্যে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের বার্ষিক আয় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক তথা জনসাধারণের তুলনায় অনেক বেশি। উল্লেখ্য, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের মাত্র শতকরা ১৪.৩০ ভাগ মানুষের যেখানে বার্ষিক আয় ছিল ২,০০০ টাকার উপরে, তাদের মধ্য থেকেই মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিল শতকরা ৮৯.৯১ ভাগ। আবার এদের মধ্যেও শতকরা ৬১.১২ ভাগের বার্ষিক আয় ছিল ৪,০০০ টাকার উপরে। অর্থাৎ গ্রামের উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো মৌলিক গণতন্ত্রে একক প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।[৬০]

অন্যদিকে মৌলিক গণতন্ত্রীগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, যেখানে ১৯৫৭ সালে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের শতকরা ৪৪.৬২ জন ছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত, শতকরা ৩৬.৭৫ জন প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত, শতকরা ১২.৮৪ জন ম্যাট্রিকুলেশন ও তার উপরে এবং শতকরা ৫.৭৯ জন ছিলেন নিরক্ষর; সেখানে ১৯৫৯ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের শতকরা ৮৭.২৪ জন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত, শতকরা ১০.৭৪ জন ম্যাট্রিকুলেশন ও তার উপরে এবং শতকরা ২.২ জন ছিলেন নিরক্ষর। আবার যেখানে ১৯৬১ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের শতকরা ৪৬.৯২ জন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত, শতকরা ৩৩.৩২ জন প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত, শতকরা ১৪.১৮ জন ম্যাট্রিকুলেশন ও তার উপরে এবং শতকরা ৫.৫৮ জন ছিলেন নিরক্ষর; সেখানে ১৯৬৪ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের শতকরা ৮২.৩৩ জন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত, শতকরা ১৬.৫৯ জন ম্যাট্রিকুলেশন ও তার উপরে এবং শতকরা ১.০৮ জন ছিলেন নিরক্ষর। ১৯৬৬ সালে সদস্যদের শতকরা ৮২.২৩ জন ছিলেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত; শতকরা ১৬.৫৯ জন ম্যাট্রিকুলেশন ও তার উপরে এবং শতকরা ১.০৮ জন ছিলেন নিরক্ষর (সারণি ৩৫)।[৬১] এছাড়াও যেখানে ১৯৬১ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্যে শতকরা

[৫৮] Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, p. 40.
[৫৯] Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, p. 41.
[৬০] আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ৯৩।
[৬১] Sobhan, *Basic Democracies*, p. 80; Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, p. 34.

৬৭.১০ জন ম্যাট্রিকুলেশনসহ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত, শতকরা ১৩.৪০ জন প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত, শতকরা ১২.২০ জন কলেজ শিক্ষা পর্যন্ত এবং শতকরা ৭.৩০ জন ছিলেন স্নাতক পাশ; সেখানে ১৯৬৫ সালে শতকরা ৭৮.৯০ জন ম্যাট্রিকুলেশনসহ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত, শতকরা ৯.৪৮ জন প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত, শতকরা ৬.০৪ জন স্নাতক পাশ, শতকরা ৫.১৯ জন কলেজ শিক্ষা পর্যন্ত এবং শতকরা ০.৩৯ জন ছিলেন নিরক্ষর (সারণি ৩৬)।[৬২] সারণি ৩৬ থেকে সহজেই অনুমেয় যে শিক্ষার দিক থেকে মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা ছিলেন তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের শিক্ষিত এবং এমনকি উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণিভুক্ত। তৎকালীন সময়ে যেখানে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকদের অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর সেখানে মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদারদের অধিকাংশই ছিলেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পাশ, এমনকি তাদের একটি অংশ স্নাতক পাশও ছিলেন। সুতরাং তৎকালীন গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা ছিলেন শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণিভুক্ত। সরকারের সঙ্গে মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদারদের ঘনিষ্টতা থাকায় স্বাভাবিকভাবেই তারা গ্রামীণ সমাজের প্রতিপত্তিশালী অভিজাত শ্রেণি হিসেবে একদিকে নিজেরা কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন চালাতো এবং অন্যদিকে সরকারি শোষণ-নিপীড়নেও সহায়ক ভূমিকা পালন করতো।

বস্তুতপক্ষে, মৌলিক গণতন্ত্রীগণের উপরিউক্ত শ্রেণি চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জমির ভিত্তিতে দেখলে মৌলিক গণতন্ত্রীদের শুধু জোতদারি চরিত্র বোঝা যায়। কিন্তু মোট আয়ের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে মহাজনী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট জোতদারদের জমির আয়ের সাথে মহাজনী কারবারের আয় যুক্ত হওয়াতেই আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন মৌলিক গণতন্ত্রীদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণির আপেক্ষিক সংখ্যাগুরুত্ব প্রমাণিত হয়। উপরিউক্ত মৌলিক গণতন্ত্রীদের সম্পর্কিত ছয়টি সারণির তথ্য (সারণি ৩১-৩৬) ভিন্ন হলেও প্রত্যেকটির মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক ও সত্য চোখে পড়ে, আর সেটি হলো মৌলিক গণতন্ত্রীদের মধ্যে জোতদার শ্রেণির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা।[৬৩] সুতরাং মৌলিক গণতন্ত্রীগণের শ্রেণিগত অবস্থানের কারণেই জোতদাররা গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। সামরিক শাসক আইয়ুব খানের আমলে এই মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররাই ছিলেন ক্ষমতার আধার। মৌলিক গণতন্ত্রীদের ওপর সে সময় ৩ ধরনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল : (১) প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ভোট প্রদান করা; (২) স্থানীয় ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কাজ তত্ত্বাবধান করা; এবং (৩) স্থানীয় সরকার ও রাষ্ট্র নির্ধারিত রাজস্ব ও কর সংগ্রহের কাজে সহযোগিতা করা। সেই সাথে স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার কাজে সরকারকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা।[৬৪] এই মৌলিক গণতন্ত্রীরা যেহেতু সরকার নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো সেহেতু সরকারও তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে সচেষ্ট ছিল। প্রধানত স্থানীয় ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কাজ দিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান করার মাধ্যমে সরকার মৌলিক গণতন্ত্রীদের তুষ্ট করার চেষ্টা করতো। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের ওপর যথার্থভাবে কোনো জবাবদিহিতামূলক তত্ত্বাবধান ছিল না। এমনকি, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম কাজের হিসাব-নিকাশের ওপরও সরকারের কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ফলে একদিকে যেমন ওয়ার্কস প্রোগ্রামের লক্ষ্য অর্জনে পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়, অন্যদিকে ওয়ার্কস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে নিয়োজিত মৌলিক গণতন্ত্রী ও বড় বড় খামারের মালিকেরা ক্রমপ্রসার্যমানভাবে ধনশালী হয়ে উঠেন। মৌলিক গণতন্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে ১৯৬৪-৬৫ সালে ওয়ার্কস প্রোগ্রামে যতো টাকা বরাদ্দ করা হয়, সরকারি হিসেব অনুযায়ীই তার শতকরা ১৯.৩৯ ভাগ অপচয় হয়েছিল। নয়টি খাতের মধ্যে শুধুমাত্র ছোট ছোট ২টি

---

[৬২] Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, p. 35.
[৬৩] উমর, *বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন*, পৃ. ৫১।
[৬৪] আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ৯৪।

খাতে ঠিকমতো কাজ হয়েছিল এবং বাকি ৭টি খাতেই ব্যাপক অপচয় হয়েছিল। জেলা, থানা ও ইউনিয়ন কাউন্সিল খাতে মোট বরাদ্দ ১৪৪ কোটি টাকার মধ্যে খরচের হিসেব পাওয়া যায় ১১৪.৮৫ কোটি টাকার। অর্থাৎ এসব খাতে বরাদ্দকৃত টাকার শতকরা ২০.২৬ ভাগ অর্থের কোনো হিসেবই পাওয়া যায়নি।[৬৫] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে মৌলিক গণতন্ত্রীরা অর্থ লোপাট করেছিল। রেহমান সোবহানের অনুসন্ধানে দেখা যায় যে জেলা ও থানা কাউন্সিলের মৌলিক গণতন্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সম্পাদিত প্রকল্পের খরচের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল। বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন কর্মসূচিতে খরচের পার্থক্য হিসেবে করে তিনি দেখিয়েছেন কোথাও যে পরিমাণ কাজ করতে খরচ হয়েছে ৫০০ টাকার নিচে, আবার কোথাও সেই একই পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে খরচ পড়েছে ৫০০ টাকারও অনেক বেশি। তিনি দেখিয়েছেন যে জেলা কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি বাঁধ নির্মাণ করতে ১০% মহকুমাতে খরচ হয়েছে ৫০০ টাকার কম; ১০% মহকুমায় ৫০০-১,০০০ টাকা; ২৩% মহকুমায় ১,০০০-১,৫০০ টাকা; ১৫% মহকুমায় ১,৫০০-২,০০০ টাকা; ১৩% মহকুমায় ২,০০০-২,৫০০ টাকা; ১০% মহকুমায় ২,৫০০-৩,৫০০ টাকা; ৮% মহকুমায় ৩,৫০০-৪,৫০০ টাকা এবং বাকি ১০% মহকুমায় খরচ হয়েছে আরও অনেক বেশি। থানা কাউন্সিলের অধীনস্থ কাজে এই ধরনের অসমতা আরও বেশি ছিল। থানা কাউন্সিলের বাঁধ নির্মাণের কাজে ২৩% মহকুমায় প্রতি ইউনিটের জন্য খরচ হয়েছে ৪,৫০০ টাকারও বেশি; ৫% মহকুমায় খরচ হয়েছে ১,০০০ টাকারও নিচে। খাল খননের ক্ষেত্রেও সেই একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের মৌলিক গণতন্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে ১৮% মহকুমায় খাল খনন কাজে একক প্রতি খরচ হয়েছে ১,০০০ টাকার নিচে; ৪৩% মহকুমায় ২,০০০ টাকা; ১১% মহকুমাতে খরচ হয়েছে ৪,৫০০ টাকার উপরে। এই একই কাজে থানা কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে ৫% ক্ষেত্রে একক প্রতি খরচ হয়েছে ১,০০০ টাকার নিচে এবং ৩৮% কাজে খরচ হয়েছে ৪,৫০০ টাকার উপরে। এছাড়াও ওয়ার্কস প্রোগ্রামের বরাদ্দ পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ধরন ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পর সোবহান দেখিয়েছেন যে এর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, ইচ্ছেমতো মৌলিক গণতন্ত্রীরা এবং প্রশাসনের কর্মচারীরা বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করতো এবং তাদের মর্জিমতো কাজের হিসেব প্রদান করতো। মূলত এ কারণেই সমপরিমাণ কাজের জন্য বিভিন্ন মহকুমাতে একক প্রতি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন রকম। এর মাধ্যমে ইউনিয়ন কাউন্সিলের মৌলিক গণতন্ত্রীরা এবং বিশেষ করে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানরা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল। এ কারণে দেখা যায় যে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েও মাত্র কয়েক বছরের মাথায় তাদের অনেকের বার্ষিক আয় দাঁড়ায় ৪০,০০০ টাকারও উপরে।[৬৬]

অর্থাৎ মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা স্থানীয় উন্নয়নে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় দেখিয়ে নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়েছিলেন। সুতরাং তত্ত্বগতভাবে যদিও এই বিপুল পরিমাণ অর্থ মৌলিক গণতন্ত্রীরা স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করতেন, কিন্তু বাস্তবে এই অর্থের অধিকাংশ নিজেরা লুটপাট করতেন। এভাবে অর্থ আত্মসাৎ করার সুবিধার বিনিময়ে আইয়ুব সরকারের সমর্থক হিসেবে এই মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। ঔপনিবেশিক শাসনামলে যেমন জমিদাররা ছিলেন ব্রিটিশদের ক্ষমতার ভিত্তি, তেমনিভাবে আইয়ুব সরকারের শাসনামলেও মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা ছিলেন তাঁর শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকার মূল নিয়ামক শক্তি। এ কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে মৌলিক গণতন্ত্রের 'সৃষ্টিকর্তা' আইয়ুব

---

[৬৫] Sobhan, *Basic Democracies*, pp. 141-143 and 186-187; আজাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ৯৪।
[৬৬] Sobhan, *Basic Democracies*, pp. 187, 200; আজাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ৯৫-৯৬।

খান নিজেকে পাকাপাকিভাবে ক্ষমতায় রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।[৬৭] বস্তুতপক্ষে, ঔপনিবেশিক শাসনামলে যেমন জমিদাররা খাজনা আদায় ও স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাসহ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ঠিক একইভাবে আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররাও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং খাজনা আদায়সহ স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[৬৮] জোতদার তথা মৌলিক গণতন্ত্রীরা স্থানীয় কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট, নিরাপত্তা, সামাজিক প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করতেন। রেহমান সোবহানের মতে মূলত মামুলি মানের গ্রামীণ রাস্তা তৈরিতে সম্পদ লগ্নীকারক আর.পি.ডব্লিউ.পি. ভ্রষ্টাচারের উৎস ছিল যারা গ্রামীণ উচ্চবর্গীয়দের সমৃদ্ধ করেছে এই প্রত্যাশায় যে এরা আইয়ুব সরকারের স্থায়িত্বকে নিজেদের 'শ্রীবৃদ্ধি'র কার্যকারণ ধরে নিয়েছিলেন।[৬৯] তবে আইয়ুব খানের ওয়ার্কস প্রোগ্রাম শুরুর পর মৌলিক গণতন্ত্রীদের 'শ্রীবৃদ্ধি' হলেও গ্রামীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন হয়নি; বরং এই সময়ে তাদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল। একই সঙ্গে তাদের ঋণের পরিমাণ এবং রাজস্ব ও করের পরিমাণও বেড়ে গিয়েছিল। এসময়ে চারটি মহকুমার ওপর পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে ১৯৫৭-৫৮ সালে শতকরা যতটি পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল এক হাজার টাকার নিচে, ১৯৬৩-৬৪ সালে তার হার আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কুমিল্লার যে এলাকাতে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কাজ চালানো হয় সেখানে ১৯৫৭-৫৮ সালের বার্ষিক এক হাজার টাকার কম আয়ক্ষম পরিবারের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৮.৯ ভাগ, ১৯৬৩-৬৪ সালে তার সংখ্যা বেড়ে শতকরা ৫২.৪ ভাগে উন্নীত হয়। স্মরণযোগ্য যে, এই ৭ বছরে টাকার মান মোটেও বাড়েনি বরং উল্লেখযোগ্য হারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছিল। অর্থাৎ এই সময়ে নিম্ন আয়ভুক্ত মানুষের হার প্রকৃত অর্থে অনেক বেশি ছিল। এই সময়ে গ্রামীণ মানুষের পরিবার পিছু ঋণের পরিমাণও ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও ওয়ার্কস প্রোগ্রামের ফলে কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি। এসময়ে চারটি এলাকায় জরিপে দেখা যায় যে একমাত্র কুমিল্লার কোতোয়ালীতে সঞ্চয়ের পরিমাণ ও সঞ্চয়কারীর সংখ্যা ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাকি তিনটি এলাকা অর্থাৎ নড়াইল, পঞ্চগড়ের বোদা ও মানিকগঞ্জের শিবালয়ে এই সময়ে সামান্য সঞ্চয় বাড়লেও সঞ্চয়কারীর সংখ্যা মোটেও বৃদ্ধি পায়নি। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে গ্রামের অধিকাংশ পরিবার বিপুল পরিমাণ ঘাটতির হাত থেকেও নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি। নড়াইল থানার শতকরা ৭৪.৮ জন, পঞ্চগড়ের বোদা থানার শতকরা ৪০.১ জন এবং মানিকগঞ্জের শিবালয় থানার শতকরা ৮৫.৫ জন এসময় বার্ষিক ৫০০ টাকা করে ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছিল। ৫০০ টাকার নিচে যাদের ঘাটতি পড়েছে তাদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর।[৭০]

মৌলিক গণতন্ত্রের শাসনামলের যে সময়ে সঞ্চয় বাড়েনি বরং ঘাটতি পরিবারের সংখ্যা ক্রমশ প্রতিবছর বৃদ্ধি পেয়েছিল, ঠিক সে সময়ে গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ কৃষকদের রাজস্ব ও করের বোঝা হ্রাস না পেয়ে বরং তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ৪টি থানার ওপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মৌলিক গণতন্ত্রের শাসনামলে প্রতিবছর করের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেমন কুমিল্লায় ১৯৫৭-৫৮ সালে আয়ের ২% এর বেশি কেউ কর দিতো না, কিন্তু ১৯৬৩-৬৪ সালে ৩% পরিবারকে ২% এর বেশি কর দিতে হয়েছিল। মানিকগঞ্জের শিবালয়ে ২% এর বেশি কর দিতে বাধ্য হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। পঞ্চগড় জেলার বোদা থানায় ১৯৫৭-৫৮ সালে যেখানে ৮৬.৫% পরিবার কর দিতো, সেখানে ১৯৬৩-৬৪ সালে করদাতাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৩.৪%। সেইসঙ্গে বোদা থানায় ১৯৫৭-৫৮ সালে ২% এর বেশি আয়কর দিত এমন পরিবারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪.৫%, কিন্তু

[৬৭] রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৮৩।
[৬৮] Khan, *District Gazetteers : Noakhali*, p. 300-302.
[৬৯] সোবহান, *উতল রোমন্থন*, পৃ. ২৩৬-২৩৭।
[৭০] Sobhan, *Basic Democracies*, pp. 229-233; আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ৯৬-৯৭।

১৯৬২-৬৩ সালে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৮.৫% এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২১.১%। নড়াইলের তথ্য থেকেও একই চিত্র ফুটে উঠে, সেখানে ১৯৬৩-৬৪ সালে আয়ের ২% এর বেশি কর দিতে হয়েছিল ২৭.৭% পরিবারকে। মৌলিক গণতন্ত্রের শাসনামলের ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ পরিবারগুলোর ওপর করের বোঝা ক্রমপ্রসার্যমান হয়েছিল। যদিও ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কারণে প্রধানত মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদার শ্রেণি লাভবান হয়েছিল, কিন্তু এই লাভের মূল্য দিতে হয়েছিল সমগ্র গ্রামবাসী কৃষকদের। শুধুমাত্র বিভিন্ন কর প্রদানের মাধ্যমে খেসারত দিয়েই সাধারণ কৃষকরা রক্ষা পায়নি বরং তাদেরকে রাজস্বের ক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণ খেসারত দিতে হয়েছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালের হিসেব থেকে দেখা যায় যে কুমিল্লাতে ৬% পরিবারের কোনো খাজনা দিতে হতো না, ৮৩.৫% পরিবার খাজনা দিয়েছিল আয়ের ২% এর নিচে এবং বাকি ১০.৫% খাজনা দিয়েছিল আয়ের ২% এর উপরে। কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে ৩.১% পরিবার কোনো খাজনা দেয়নি, ৪২.৫% খাজনা দিয়েছে আয়ের ২% এর নিচে, বাকি ৫৪.৪% খাজনা দিয়েছে আয়ের ২% এর বেশি। ১৯৬৩-৬৪ সালে ৪৯.৬% পরিবারকে আয়ের ২% এর বেশি রাজস্ব দিতে হয়েছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে আয়ের ৪% এর বেশি খাজনা দিতে হয়েছিল মাত্র ১.৯% পরিবারকে, কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে আয়ের ৪% এর বেশি খাজনা দিতে হয় ১৭.৮% পরিবারকে। পঞ্চগড়ের বোদা থানায় ১৯৫৭-৫৮ সালে ১১.৪% পরিবারকে কোনো খাজনা দিতে হয়নি, ৪২% পরিবার খাজনা দিয়েছে আয়ের ২% এর কম, ৩৩.৭% দিয়েছে আয়ের ৪% এবং বাকি ১২.৯% খাজনা দিয়েছে ৪% এর বেশি। অন্যদিকে ১৯৬২-৬৩ সালে মাত্র ২.২% পরিবার খাজনার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে, ৪২.৩% পরিবারকে আয়ের ৪% এর বেশি পরিমাণে খাজনা দিতে হয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে ৩১.৪% পরিবারকে আয়ের ৪% এর বেশি হারে খাজনা দিতে হয়েছে। অন্যান্য এলাকার অবস্থাও প্রায় একই রকম ছিল।[৭১] অর্থাৎ ষাটের দশকে উল্লেখযোগ্য হারে কর ও খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এসময় গ্রামের সাধারণ মানুষ তথা কৃষকের গড় পড়তা আয়ের পরিমাণ বা সঞ্চয়কারী পরিবারের সংখ্যা সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেতে থাকে। কর ও খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে সাধারণ কৃষকরা চরম প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত হয়। আইয়ুব খানের শাসনামলের শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তানে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পূর্বে কৃষকদের কাছ থেকে জমিদারদের বার্ষিক বৈধ আদায় ছিল ৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। এর বিপরীতে জমিদারদের নিকট সরকারের বার্ষিক আদায় ছিল ৯২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। উক্ত আইন প্রণয়নের পর ধারণা করা হয়েছিল যে সরকার নিজেই যেহেতু রাজস্ব আদায় করবে সেহেতু ইতোপূর্বেকার জমিদারদের বার্ষিক বৈধ আদায় ৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণটাই সরকারি কোষাগারে জমা হবে। এর মধ্যে খাজনা আদায়ে বার্ষিক খরচ ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বাদ দিয়েও সরকারের বার্ষিক রাজস্ব আয় দাঁড়াবে ৭ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার মতো। কিন্তু বাস্তবতা ছিল সরকারের ভূমি রাজস্ব আয় ছিল এর চেয়েও অনেক বেশি। কারণ পাকিস্তান শাসনামলের শুরুতে মুসলিম লীগ সরকার এবং পরবর্তীকালে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের সময়ে খাজনাসহ বিভিন্ন ধরনের কর বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এর ফলে সরকারের রাজস্ব আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৫৮ সালের পর থেকে রাজস্ব চাহিদা ও আদায়ের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭০ সালে সরকারের ভূমি রাজস্বের চাহিদা দাঁড়ায় ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের মধ্যে খাজনা বৃদ্ধির যে ধারা ছিল সেসব নীতি প্রয়োগ করায় এটা সম্ভবপর হয়েছিল। তদুপরি, জমির খাজনার সঙ্গে যুক্ত ছিল শিক্ষা কর, স্থানীয় সরকার কর, ত্রাণকার্য কর, উন্নয়ন করসহ প্রভৃতির জন্য ধার্যকৃত বর্ধিত কর। আইয়ুব খানের শাসনামলে অপরিশোধিত খাজনার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনেই এমন বিধান ছিল

---

[৭১] Sobhan, *Basic Democracies*, pp. 234-235; আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ৯৭-৯৮।

যে কোনো জমির খাজনা পরিশোধ না করা হলে সেটি নিলামে দেওয়া যেতে পারে। পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের বিধানে পরিবর্তন এনে আরও কঠোরতর আইন করার উদ্দেশ্যে 'Bengal Public Demands Recovery Act 1913'-কে পুনরুজ্জীবিত করে ১৯৬২ সালে ভূমি রাজস্ব আদায় অর্ডিন্যান্স (Land Revenue Recovery Ordinance (No. V of 1962, Commonly Known as Sunset Law)] জারি করা হয়, যাকে কেবল ১৭৯৯ সালের কুখ্যাত সপ্তম আইনের (দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে) সঙ্গেই তুলনা করা চলে। ঔপনিবেশিক আমলেও খাজনা কখনও মাফ করা হতো না, তবে স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব খাটিয়ে বা জমিদার ও তার খাজনা আদায়কারী কর্মচারীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগের মাধ্যমে তা পরিশোধের সময় বাড়িয়ে নেওয়া যেতো। কিন্তু ১৯৬২ সালের নতুন আইনে খাজনা না দেওয়ার অপরাধে শাস্তি হিসেবে বডি ওয়ারেন্ট জারি করা, মালপত্র নিলামে দেওয়া, গবাদি পশু ও অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা প্রভৃতি প্রায়ই হতে থাকে।[৭২] এই ধরনের নির্যাতন সত্ত্বেও কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থার কারণে তাদের নিকট হতে খাজনা আদায় করা সম্ভব হয়নি। ১৯৬৭ সালের ২৯ জুন প্রাদেশিক আইন পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে অর্থমন্ত্রী এম এন হুদা জানান যে খাজনা-করের জন্য কৃষকদের বিরুদ্ধে ৮০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা বিদ্যমান রয়েছে।[৭৩] সুতরাং মৌলিক গণতন্ত্রের শাসনামলে একদিকে জোতদারদের ক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকরা অর্থাভাবে খাজনা-কর দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সার্টিফিকেট মামলায় নিপীড়নের স্বীকার হয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে সামরিক শাসন জারির পর থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের জন্য ছিল এমন একটি সময়, যখন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল প্রচণ্ডভাবে পশ্চাৎপদ, কৃষকগণ মহাজনী ঋণে ছিল জর্জরিত এবং খাজনা-ট্যাক্সের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে কৃষকরা দিশেহারা হয়ে উঠেছিল। সরকারের খাজনা-করের দাবি পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় কৃষকের ওপর নেমে এসেছিল সার্টিফিকেট মামলাসহ নির্বিচার ক্রোক ও তাদের ধন সম্পত্তির লুণ্ঠন। এছাড়াও তারা নির্মম নির্যাতনেরও স্বীকার হয়েছিল। এসকল কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিল তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা। এই জোতদাররা একদিকে ছিল বড় খামারের মালিক, ফলে তাদের কৃষি উদ্বৃত্ত দিয়ে ক্রমাগতভাবে তাদের খামারের আয়তন বাড়িয়ে চলেছিল এবং অন্যদিকে সেই বাড়তি জমিকে বর্গা দিয়ে পশ্চাৎপদ উৎপাদন ব্যবস্থাকেও আরও বেশি বৃদ্ধি করেছিল। অধিকন্তু, তারা ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কৃষি উন্নয়নের অর্থ আত্মসাত করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছিল। মৌলিক গণতন্ত্রীরা যেহেতু সরকারি প্রশাসনের অনুগত ও সমর্থক ছিল সেহেতু সরকারি খাজনা-ট্যাক্সের দাবি মেটাবার কাজে জবরদখল আদায় ও ক্রোকি কার্যকলাপেও তারা নেতৃত্ব দিতো এবং প্রতিবেশী দরিদ্র কৃষকরা খাজনা বাকির অপরাধে অত্যাচারিত হলেও তারা প্রতিবাদ করতো না বরং সরকারকে সহযোগিতা করতো। এভাবে মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররাই গ্রামাঞ্চলে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিপন্ন হতে থাকে। রাষ্ট্রের সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে এদের ক্ষমতা হয়ে উঠেছিল সীমাহীন। গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবেচিত প্রধান তিনটি উপাদানেরই সমাবেশ ঘটেছিল জোতদার তথা মৌলিক গণতন্ত্রীদের মধ্যে। এরা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার সমান্তরালে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবেও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল গ্রাম পুলিশ হিসেবে বিবেচিত চৌকিদার-দফাদাররা। জনসাধারণের সম্পদ ক্রোক থেকে শুরু করে বল প্রয়োগমূলক কাজের সঙ্গেও এরাই জড়িত থাকতো।

---

[৭২] সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, পৃ. ৬০-৬১।

[৭৩] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXII, No. 6, Budget Session, 1967-68, The 28th and 29th June, 1967 (Dacca : East Pakistan Governement Press, 1969), p. 115.

ফলে এরা জনসাধারণের কাছে ভীতিকর ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। এ কারণে এরা একসময় সামাজিক সন্ত্রাসের মূল উৎসে পরিণত হয়।[৭৪] মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদারাই ছিলেন গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে অভিজাত শ্রেণি।[৭৫] গ্রামীণ সমাজে তাদের এতো বেশি প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তাদের বিরুদ্ধে কেউ কোনো প্রতিবাদ করতেও সাহস করতো না। প্রশাসন এবং এমনকি আইন-আদালতও সবসময় জোতদারদের পক্ষ নিতো। কারণ গ্রামীণ সমাজে জোতদার ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। নির্বাচনের সময় মৌলিক গণতন্ত্রী তথা জোতদারদের পছন্দ মতো ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতে বাধ্য করা হতো। গ্রামীণ হাট-বাজারগুলোতেও জোতদাররা তোলা আদায় করতো। এমনকি তারা তোলা হিসেবে 'ঈশ্বরবৃত্তি'[৭৬] বা 'ধলতা' বাবদ অতিরিক্ত পণ্য আদায় করতো। বর্গাদারদের অভিভাবক হিসেবে মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা রাজনৈতিক সুবিধাটুকু নিতেও ছাড়তেন না। এমনকি মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদারদের হাত থেকে বর্গাদার কৃষকের কন্যা ও পুত্রবধুর সম্মান রক্ষা করাও সহজ হতো না।[৭৭] এর ফলস্বরূপ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের সঙ্গে জোতদারদের বিরোধ ভূমি বিরোধে পরিণত হয়। সুতরাং আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন এবং ১৯৬১ সালের ভূমি আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে জোতদারদের অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সঙ্গে ভূমি বিরোধ তথা জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

৫.৩.৩ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর জোতদারদের প্রাধান্য হ্রাস

মূলত নিজেদের অস্তিত্ব ও স্বার্থ রক্ষার্থে রাজনৈতিক দিক থেকে প্রায় সকল মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদারই আইয়ুব সরকারের জোর সমর্থক হয়ে উঠেছিল। তারা একদিকে ছিল গ্রামীণ সমাজের শোষক এবং অন্যদিকে ছিল কেন্দ্রীয় শোষকের স্থানীয় প্রতিভূ। রাষ্ট্রযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা গ্রামীণ সমাজে যে ক্ষমতার জাল ও শোষণের বৃত্ত তৈরি করেছিল তার প্রভাব শহুরে সমাজে, বিশেষত ছাত্রদের ওপর তার গভীর প্রভাব পড়েছিল। কেননা সে সময় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের বিশাল একটি অংশ এসেছিল গ্রাম থেকে। কৃষক পিতার ওপর বিপুল হারে খাজনা-ট্যাক্সের বোঝা আর অর্থকরী ফসলের নিম্নমূল্যের কারণ তাদের নিকট অজানা ছিল না। তাই একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, ষেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, আটষট্টির ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থানকালে শহুরে ছাত্র-জনতা যে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল তা গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন সংগ্রামের সাথেও সম্পর্কহীন ছিল না।[৭৮] উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতনের পর মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররাও দুর্বল হয়ে পড়ে। উপরন্তু, ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রাপ্তবয়স্কদের এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ঘোষণার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সুবিধাবাদী জোতদারদের পতনও ঘনিয়ে আসে।[৭৯] ১৯৩৭, ১৯৪৬ ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নির্বাচিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জোতদার প্রতিনিধি থাকলেও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী প্রতিনিধিদের মধ্যে জোতদারদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়নি (সারণি ৪৫ ও ৪৬)।[৮০] এই নির্বাচনে মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা তেমন কোনো সুবিধা করতে পারেনি। সুতরাং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে মৌলিক গণতন্ত্রী তথা জোতদার শ্রেণির প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকাংশে হ্রাস পায়।

---

[৭৪] আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ৯৯-১০০।
[৭৫] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Rahim, *Politics and National Formation in Bangladesh*, pp. 231-236.
[৭৬] 'ঈশ্বর বৃত্তি' হলো একধরনের বাজার কর। প্রতি মণ কৃষিজ পণ্যে কৃষককে এক বা দেড় সের বেশি দিতে হতো। এর নাম 'ধলতা'।
[৭৭] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৬৬-৬৭।
[৭৮] আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ১০০।
[৭৯] মুক্তি, "*৭০-এর নির্বাচন : জনসংখ্যাভিত্তিক আসন বন্টন*", পৃ. ১০৭।
[৮০] আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন*, পৃ. ৫০২-৫১৭।

৫.৩.৪ স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং জোতদারদের পতন

মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা অনুভব করেছিল যে পাকিস্তানের অস্তিত্বের সঙ্গে তাদের স্বার্থ ও অস্তিত্বের সম্পর্ক ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে তারা নিজেদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের শাসক ও সেনাবাহিনীর পক্ষাবলম্বন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের শাসক ও সেনাবাহিনীর সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এই মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গঠিত শান্তি কমিটিতে যোগদানপূর্বক এদেশের গণমানুষের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদারদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন শান্তি কমিটির সদস্যরা নানাভাবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং সেনাবাহিনীকে সহায়তা করেছিল। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিভিন্ন জেলা, মহাকুমা, থানা ও ইউনিয়নে গঠিত শান্তি কমিটির সদস্যদের একটি বড় অংশ ছিল মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদারদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ইউনিয়ন কাউন্সিলের সাবেক ও বর্তমান চেয়ারম্যান ও সদস্যরা। এছাড়াও মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদারদের ভোটে নির্বাচিত বেশ কয়েকজন প্রাক্তন জাতীয় পরিষদ সদস্য (এম.এন.এ) এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের (এম.পি.এ) একটি অংশও শান্তি কমিটির নেতৃস্থানীয় পদ-পদবিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। উপরন্তু, শান্তি কমিটির সদস্যদের একটি অংশ ছিল কনভেনশন মুসলিম লীগ, মুসলিম লীগ (কিউ.এম.এল) ও সাবেক মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রাক্তন জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, সাবেক মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এবং মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা ছিলেন শান্তি কমিটির সভাপতি, চেয়ারম্যান বা আহবায়ক।[৮১] প্রভাবশালী, ক্ষমতালোভী এবং শোষক শ্রেণি হিসেবে পরিচিত পাকিস্তানপন্থী এই মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা গ্রামীণ সমাজে যে ক্ষমতার বৃত্ত তৈরি করেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে তার প্রভাব না পড়ে পারে নাই। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালে একদিকে পাকিস্তানপন্থী জোতদার তথা মৌলিক গণতন্ত্রীরা চেয়েছিল পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব অটুট রাখতে এবং অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে জোতদারদের নেতিবাচক ভূমিকার কারণেই কৃষক শ্রেণি ও তাদের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানরা চেয়েছিল যেকোনো মূল্যে স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। সত্যিকারার্থে ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রু হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে এই মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদার শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে কৃষকরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতি। এই যুদ্ধে মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদারদের পরাজয় ও পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

৫.৪. কৃষক সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা

৫.৪.১ পাকিস্তান শাসনামলে কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব, হিন্দু-মুসলিম তথা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বহুমাত্রিক দ্বন্দ্বের মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও পুরাতন ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে। ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার পর ভূমি বিরোধ জমিদার-জোতদার-কৃষক

[৮১] বিস্তারিতভাবে দেখুন, মুনতাসির মামুন, *শান্তিকমিটি ১৯৭১* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২), পৃ. ২০৫-২০৮, ২১০, ২১৩, ২১৮-২২২, ২২৪, ২২৮, ২৩২, ২৪৮-২৫২ ও ২৬২-২৭১; আহম্মেদ শরীফ, *নীলফামারী ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন* (ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১৫), পৃ. ৩৯-৪০; স্বরোচিষ সরকার, *একাত্তরে বাগেরহাট : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস* (ঢাকা : সাহিত্য বিলাস, ২০০৬), পৃ. ১০২-১০৩।

দ্বন্দ্ব হতে জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলেও তার দ্বারা কৃষকদের বাস্তবিক অর্থে কোনো উপকার হয়নি। কারণ প্রথমত, পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় প্রদেয় খাজনার নাম পরিবর্তন করে রাজস্ব রাখা হলেও ঔপনিবেশিক জমিদারি যুগের খাজনার সাথে রাজস্বের কোনো পার্থক্য ছিল না। এর দ্বারা ব্যক্তি মালিকের পরিবর্তে সরকারই জমিদারে পরিণত হয় এবং জমিদারের গোমস্তা ও কর্মচারীদের মতো সরকারি তহশিলদারসহ বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারীরা পূর্বের মতোই কৃষকদের থেকে খাজনা আদায়ে নিযুক্ত থাকে। এই ব্যবস্থা একদিক থেকে ছিল অধিক উৎপীড়নমূলক, কারণ ঔপনিবেশিক আমলে জমিদার ও তার কর্মচারীদের সাথে কৃষকদের একটা স্থানীয় সম্পর্ক থাকার সুবাদে অনেক সময় খাজনা ইত্যাদির ব্যাপারে কিছু কিছু রেয়াত পাওয়ার সুবিধা থাকতো, কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় তা সম্ভব ছিল না। সরকারি কর্মচারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল অস্থানীয় এবং তাদের খাজনা আদায় পদ্ধতিও ছিল পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি যান্ত্রিক। তাছাড়া নতুন ব্যবস্থায় পুরাতন আবওয়াবের মতো বেআইনি আদায়ও পূর্বের মতোই বহাল ছিল এবং সরকারি কর্মচারীরাই ছিল এসব বেআইনি আদায়ের সুবিধাভোগী। দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় কৃষকদের শোষণ ও উৎপীড়নের যেসব ব্যবস্থা ছিল সেগুলো মূলৎপাটনের কোনো বিধি বা পদক্ষেপ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনে ছিল না। এজন্যেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা উচ্ছেদে যে আইন প্রণীত হয় তা ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তাই ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও পূর্বের মতোই বিদ্যমান ছিল। বদরুদ্দীন উমরের মতে জমিদারি শোষণের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল মহাজনী শোষণ। কিন্তু জমিদারি প্রথার অবসান পূর্ব বাংলায় মহাজনী শোষণের অবসান ঘটাতে অথবা তার মাত্রা ও বিস্তৃতিকে খর্ব করতে সমর্থ হয় নি।[৮২] সুতরাং পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের অবসান না হয়ে তা নতুন করে শুধুমাত্র জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। ইতিপূর্বে জমিদার-জোতদার দ্বন্দ্বের সময় বিভিন্ন শ্রেণির কৃষকরা (সাধারণ কৃষক যারা কিছু পরিমাণ ভূমির মালিক ছিল, ভূমিহীন, বর্গাদার প্রভৃতি) সংগঠিতভাবে জোতদারদের সমর্থন করেছিল প্রধানত অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে। জমিদারের শোষণ হ্রাস পেলে স্বাভাবিকভাবেই কৃষকের ওপর জোতদারের শোষণও আনুপাতিক হারে হ্রাস পেতো। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর বিদ্যমান ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে সামগ্রিকভাবে কৃষক সমাজ জোতদারদের বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও দীর্ঘ দিনের শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির আশায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকরা যে স্বপ্ন দেখেছিল, তাদের সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। কারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই মুসলিম লীগ সরকার যে লেভি প্রথার প্রবর্তন করে তার দ্বারা পূর্ব বাংলার কৃষকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক কৃষকের কৃষিজপণ্য অধিক উৎপাদন দেখিয়ে লেভি ধার্য করা হয় এবং তা আদায়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নানাবিধ হয়রানি ও নিপীড়নের পন্থা বেছে নেওয়া হয়। লেভি ধার্য করে কৃষকদের ওপর যে শোষণ ও নিপীড়ন করা হয় তার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের ভিতরে ও বাইরে প্রতিবাদের ঝড় উঠে, কিন্তু তাতেও কৃষকরা রক্ষা পায় নি। পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে খুলনা জেলায় লেভি ধার্যের কারণে কৃষকরা চরমভাবে হয়রানির স্বীকার হয়।[৮৩] ১৯৪৯ সালের একটি পরিসংখ্যানে বলা হয় যে পূর্ব বাংলায় ৪ কোটি ৪৮ লক্ষ মানুষের বাস, তার মধ্যে ১৬ লক্ষ মানুষের ঘাটতি খাদ্য ক্রয় করার কারণে সমগ্র দেশজুড়ে কৃষকদের ওপর লেভি ধার্য করে অত্যাচার করা হয়। খুলনা জেলায় বাধ্যতামূলক লেভি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে মানুষের নিকট থেকে জোর জবরদস্তি করে ধান নিয়ে নেওয়া হয়। পরিষদের সদস্যদের অভিযোগ ছিল যে মানুষের হাতে হাতকড়া দিয়ে সোয়া সাত টাকা মূল্যে তাদের ধান কেড়ে নেওয়া হয়।

[৮২] উমর, বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন, পৃ. ১১ ও ৩২-৩৩।
[৮৩] *Assembly Proceedings,* Vol. III, No. 3, 1949, p. 63.

লেভির ফলে চারিদিকে হাহাকার পড়ে যায়।[৮৪] জানা যায় যে নেত্রকোণায় জমির পরিমাণের চেয়েও বেশি পরিমাণে লেভি ধার্য করা হয়। লেভি ক্রয়ে অনাচার করা হয়। এমনকি, মানুষ নিজের ভিটেমাটি বিক্রি করেও লেভির পাওনা পরিশোধ করতে পারে নি।[৮৫] ১৯৪৯ হতে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ সরকারের শাসনামলে লেভি ব্যবস্থার প্রবর্তন ও তা কার্যকরের মাধ্যমে কৃষকদের ওপর যে শোষণ ও নিপীড়ন করা হয়েছিল তা পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের আলোচনা থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার কৃষক তথা জনসাধারণ লেভি ব্যবস্থার শোষণ ও নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৫ সালে স্বৈরাচারী সামরিক শাসক আইয়ুব খানের শাসনামলে পুনরায় লেভি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং তা কার্যকর করার ফলে কৃষক তথা জনসাধারণ চরমভাবে শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়। এসময়ে যদিও দেশে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম অনুপস্থিত ছিল এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হতো আইয়ুবপন্থী মৌলিক গণতন্ত্রী তথা জোতদার দ্বারা, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে লেভি প্রথার কঠোরতার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় ১৯৬৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য মোঃ আজিজার রহমান সরকার, মোঃ সিরাজ উদ্দিন, আসাদুজ্জামান খান, আবদুস সোবহান মৌলানা, শামসুর রহমান, আসাদুজ্জামান প্রমুখ এবং ১৯৬৬ সালের ২০ জুন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নুরুল গণি চৌধুরী, আকমল হোসেন, মীর্জা রুহুল আমীন, মোঃ সেরাজুদ্দিন, এম এ ওয়াদুদ প্রমুখ লেভি প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।[৮৬] পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের উক্ত সদস্যদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনাসহ ঘাটতি জেলাগুলোও লেভি প্রথা থেকে বাদ যায়নি। তাঁরা অভিযোগ করেন যে সরকার এভাবে লেভি ধার্য এবং তা জোরপূর্বক আদায় করতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।[৮৭] কিন্তু লেভির বিরুদ্ধে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের একটি অংশের সমালোচনা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার লেভি ব্যবস্থা কার্যকর করে। এর ফলে একদিকে ধান-চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদিকে কৃষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এতদসত্ত্বেও ১৯৬৭ সালের ১৮ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে প্রশ্নোত্তর পর্বে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে ১৯৬৬ সালে বাধ্যতামূলক লেভি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান হতে প্রচুর পরিমাণে ধান-চাল সংগ্রহ করা হয়েছিল (সারণি ৩৭)।[৮৮] সারণি ৩৭ থেকে দেখা যায় যে ৩৮৮টি ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৪,০১,৬৪১ মণ ৩ সের ৮ ছটাক ধান-চাল সরকার সংগ্রহ করে। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ধান-চাল উৎপাদনে দিনাজপুর জেলার অবস্থান সবচেয়ে উপরে এবং যশোর জেলার অবস্থান সর্বনিম্নে। এছাড়াও সারণিতে দেখা যায় যে ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনাসহ অন্য ঘাটতি জেলাসমূহে সরকার অসংখ্য ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে লেভি হিসেবে প্রচুর পরিমাণে ধান-চাল সংগ্রহ করেছে। লেভি প্রথা কার্যকর করায় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় খাদ্য ঘাটতি, খাদ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিসহ কৃষকদের আর্থ-সামাজিক জীবনে নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এমনও দেখা যায় যে অনেক জেলায় প্রাকৃতিক কারণসহ নানা কারণে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হয়নি, কিন্তু সরকার তারপরও সেখানে লেভি প্রথা

---

[৮৪] *Assembly Proceedings*, Vol. III, No. 3, 1949, pp. 315-320.

[৮৫] *Assembly Proceedings*, Vol. III, No. 3, 1949, pp. 324-326.

[86] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXIX, No. 3, Second Session, 1965, The 14th, 15th, 16th and 17th December, 1965 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1967), pp. 182-185 and 191-196; *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXX, No. 3, Budget Session, 1966-67, The 20th and 21th June, 1966 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1967), p. 18-22, 25, 36 and 95.

[৮৭] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXIX, No. 2, Second Session, 1965, The 10th, 11th and 13th December, 1965 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1965), p. 70; *Assembly Proceedings*, Vol. XXIX, No. 3, 1965, pp. 184-185 and 193.

[৮৮] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXI, No. 2, First Session, 1967, 18th January, 1967 (Dacca : East Pakistan Governement Press, 1967), pp. 92-106.

কার্যকর করায় একদিকে এটি সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটে, অন্যদিকে সেখানে মূল্য বৃদ্ধিসহ নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। সুতরাং লেভি প্রথার প্রবর্তন ও তা কার্যকর করার মাধ্যমে কৃষক তথা জনসাধারণ চরমভাবে শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়েছিল।

উপরন্তু, পাকিস্তান শাসনামলে ক্রমাগতভাবে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি ও বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয় এবং জোরপূর্বক তা আদায়ের কঠোরতার কারণে কৃষকরা প্রচণ্ড শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়। পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পর ভূমি রাজস্ব নির্ধারণে সরকার তাৎক্ষণিকভাবে কোনো পদক্ষেপ না নিলেও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে সরকার যৌক্তিকভাবে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করবে এবং এটা কোনোভাবেই ১/১০ ভাগের বেশি হবে না। এই আইনের বিধানে আরও উল্লেখ করা হয় যে কৃষকরা সরকারকে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবে এবং সেই ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা হলো বার্ষিক মোট উৎপাদনের ১/১০ ভাগ।[৮৯] এর পর সকল ধরনের কৃষি জমি প্রতি একর ৩.৬০ টাকা রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়।[৯০] মনে হতে পারে যে এর ফলে খাজনা এবং বাড়তি বিভিন্ন কর থেকে কৃষকরা অব্যাহতি পেয়েছিল। কিন্তু না, তা হয় নি। উল্লেখিত আইনের পরে সরকার ভূমির খাজনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমি সংক্রান্ত অন্য অনেকগুলো অতিরিক্ত কর ধার্য করে এবং তা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। এসব অতিরিক্ত করের মধ্যে ছিল শিক্ষা কর, স্থানীয় কর, উন্নয়ন কর, অতিরিক্ত উন্নয়ন ও রিলিফ কর প্রভৃতি।[৯১] ১৯৫১ সালের কৃষি আয়কর আইনের [The Bengal Agricultural Income-Tax (East Bengal Amendment) Act, 1951] মাধ্যমে সরকার মোট আয়ের ওপর ট্যাক্স আরোপের ব্যবস্থা করে। তবে আয়কর আইনের বিরুদ্ধে আইন পরিষদের সদস্যদের একটি অংশ তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়।[৯২] পরিষদের সদস্যদের বক্তব্য প্রমাণ করে যে বহু ক্ষেত্রে প্রজার খাজনা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। যেখানে খাজনা ৩০ টাকা ছিল সেখানে ৩০০ টাকা করা হয়, যেখানে ৭০ টাকা ছিল সেখানে ৭০০ টাকা করা হয়। এর ফলে প্রজারা অত্যাধিক শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়। জমি জমা বিক্রি করেও অনেক ক্ষেত্রে প্রজারা খাজনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়।[৯৩] ১৯৫৭ সালের ১৪ মার্চ একটি দৈনিক পত্রিকা থেকে জানা যায় যে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী থানার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জমিদারি দখলের পর ভূমির খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদ করে প্রাদেশিক রাজস্ব মন্ত্রীর নিকট এক তারবার্তা প্রেরণ করেন। উক্ত তারবার্তায় তিনি অবিলম্বে খাজনা বৃদ্ধি বন্ধের দাবি জানিয়ে বলেন যে জমিদারি অধিগ্রহণের পর জনসাধারণ ভেবেছিল দীর্ঘদিনের অনাচারের অবসান ঘটবে, কিন্তু সরকারি খামখেয়ালীর ফলে মানুষ ভিটে মাটি ছাড়া হতে শুরু করেছে। তিনি বলেন যে সরকার রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনের মাধ্যমে যেসব সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেছেন জনসাধারণ বা কৃষককে সেইসব সম্পত্তি নতুন করে বন্দোবস্ত নিতে প্রতি একর সাড়ে সাত টাকা সেলামি দিতে হচ্ছিল। এছাড়াও অধিগ্রহণকৃত জমির প্রতি ডেসিমলে এক আনা করে খাজনা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে ৭ বছরের খাজনা একত্রে দিতে হচ্ছিল। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনের পর হতে খাজনা অনাদায়ে সম্পত্তি নিলামের মাধ্যমে বেদখল হয়ে যাচ্ছিল। উপরন্তু, সকল শ্রেণির জমির খাজনা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল।[৯৪] নিঃসন্দেহে তাঁর এই অভিযোগ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনের পর জনসাধারণ বা কৃষকের ধারণা ছিল তারা শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তি পাবে, কিন্তু বাস্তবে হয়েছিল তার উল্টোটা।

---

[৮৯] Siddiqui, *District Gazetteers : Dinajpur*, pp. 127, 257; Khan, *District Gazetteers : Pabna*, p. 261.
[৯০] Latif, *District Gazetteers : Tangail*, p. 109.
[৯১] Siddiqui, *District Gazetteers : Rajshahi*, p. 130.
[৯২] *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 2, 1951, p. 447; *Assembly Proceedings*, Vol. XV, No. 2, 1956, pp. 132-133.
[৯৩] *Assembly Proceedings*, Vol. XV, No. 2, 1956, pp. 134.
[৯৪] *মিল্লাত*, ১৬ মার্চ, ১৯৫৭।

১৯৫৮ সালের ৪ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নর সুলতান উদ্দিন আহমদ 'রিলিফ ও উন্নয়ন কর প্রবর্তন ও কর আদায়' সংক্রান্ত প্রচলিত ৮টি আইনের সংশোধন করে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। উক্ত অর্ডিন্যান্স পূর্ব পাকিস্তান সরকারের একটি অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশ করা হয়। "পূর্ব পাকিস্তান ফাইন্যান্স (দ্বিতীয়) অর্ডিন্যান্স" নামে খ্যাত এই অর্ডিন্যান্সটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা কার্যকরী হয়। প্রাদেশিক গভর্নরের এই অর্ডিন্যান্স জারির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রদেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে নতুন করে অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য করে পূর্বের ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত অর্ডিন্যান্সে প্রত্যেক প্রজার ভূমির ওপর প্রদত্ত খাজনা টাকা প্রতি চার আনা বর্ধিত করা হয় এবং তা ১৩৬৫ বাংলা সনের (১৯৫৮ সালের ১৪ এপ্রিল) প্রথম দিন হতে আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও খাজনা মুক্ত জমির মালিকদের নিকট হতে পূর্ব পাকিস্তান জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী আদায়কৃত খাজনার ওপর টাকা প্রতি চার আনা হারে উন্নয়ন ও রিলিফ ট্যাক্স আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়। গভর্নর কর্তৃক ১৯৫৮ সালের ফাইন্যান্স অর্ডিন্যান্স জারির কারণে দরিদ্র কৃষকদের ওপর টাকা প্রতি চার আনা উন্নয়ন ও রিলিফ ট্যাক্স ধার্য করায় কৃষকদের অর্থনৈতিক দুর্গতি বৃদ্ধি পায়।[৯৫] পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ভিতরে ও বাইরে ১৯৫৮ সালের এই নতুন কর ধার্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে ১৯৫৮ সালে ১৪ ধরনের কর ধার্য করা হয়, তার মধ্যে ছিল মৎস্যজীবী কর, বাঁধকর, ঔষুধের লাইসেন্স কর, রাস্তা ও পুলের ওপর কর, নৌকা কর, ইলেকট্রিসিটি কর, অতিরিক্ত শিক্ষা কর, ছাপাখানা কর ও সাইকেল কর ইত্যাদি। এইসব কর দরিদ্র জনসাধারণ তথা কৃষকের জন্য খুবই পীড়নমূলক ছিল।[৯৬] ১৯৫৮ সালের ৬ আগস্ট দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় 'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা' নামে সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর 'পূর্ব পাকিস্তান ফাইন্যান্স অর্ডিন্যান্স' নামে খ্যাত এক নতুন ফরমান জারি করে প্রদেশের নিদারুণ অর্থনৈতিক দুর্যোগের সময় কতিপয় নতুন কর ধার্য করেছেন। ভূমি রাজস্বের ওপর শতকার পঁচিশ টাকা হারে কর বৃদ্ধি, বড়-ছোট সকল দোকানের ওপর দোকান কর এবং মোটর চালিত রিক্সাসমূহের ওপর কর ধার্য করার ফলে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত কৃষক শ্রেণি, ছোট দোকানদার ও রিক্সাচালকগণ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। উৎপন্ন ফসলের মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে কৃষকদের ওপর কর বৃদ্ধি করা সরাসরি জুলুম ব্যতীত কিছুই নয়। উল্লেখ্য, ১৯৫৮ সালের ২২ জুন হতে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি অবস্থায় এই নতুন কর ধার্য করা হয়।[৯৭] পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খানের শাসনামলে ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে গভর্নরের জারিকৃত পূর্ব পাকিস্তান ফাইন্যান্স অর্ডিন্যান্সটি আইনে রূপদানের উদ্দেশ্যে ১৯৬২ সালের জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদে 'ভূমি রাজস্ব আদায় অর্ডিন্যান্স বিল, ১৯৬২' নামে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। এই বিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের নিকট হতে খাজনা ব্যতীত অতিরিক্ত আদায় বৈধতা দানের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে তা আদায় করা। যদিও আইয়ুব খানের আমলে মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদারদের ভোটে প্রাদেশিক আইন পরিষদে সদস্যরা নির্বাচিত হতেন, তারপরও দেশের জনসাধারণের শোষণ ও নিপীড়নের চিত্র দেখে কোনো কোনো সদস্য এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্বের মোট পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি টাকা। ১৯৬২ সালে তা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৯৮] আবদুল্লাহ ফারুকের মতে

---

[৯৫] *দৈনিক ইত্তেহাদ*, ৪ আগস্ট, ১৯৫৮।

[৯৬] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Assembly, Vol. XVIII, No. 3, First Session, 1958, 20th to 22nd March, 1958 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1958), p. 58.

[৯৭] *দৈনিক ইত্তেহাদ*, ৬ আগস্ট, ১৯৫৮।

[৯৮] *Assembly Proceedings*, official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXI, No. 1, First Session, 1962, 9th, 11th, 12th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th and 20th June, 1962 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1963), p. 220.

১৯৫০-৫১ সালে সরকারের ভূমি রাজস্ব আদায় ছিল ৩.৪২ কোটি টাকা। ১৯৬০-৬১ সালে সরকারের মোট ভূমি রাজস্ব প্রাপ্য ছিল ২৪.২০ কোটি টাকা এবং আদায় হয়েছিল ১০.৯৭ কোটি টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে ভূমি রাজস্ব চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায় এবং একইসঙ্গে ভূমি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৫০ কোটি টাকায় পৌঁছায়।[৯৯] অর্থাৎ পাকিস্তান শাসনামলে প্রায় প্রতি বছর ক্রমাগতভাবে ভূমি রাজস্ব চাহিদা ও আদায় বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এছাড়াও আইয়ুব খানের শাসনামলে বিভিন্ন উপলক্ষে কৃষকের ওপর নিত্য নতুন কর আরোপ করায় তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। কৃষকদের ওপর এসব কর আরোপের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা কখনও কখনও সরকারের সমালোচনাও করেছেন। ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেট অধিবেশনে বাজেটের অর্থ বিলের মধ্যে সরকার কৃষকদের ওপর ভূমি রাজস্ব সারচার্জ (Land Revenue surcharge) নামে নতুন একটি কর সংযুক্ত করেন। এর বিরুদ্ধে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নুরুল গণি চৌধুরী, আকমল হোসেন, মীর্জা রুহুল আমীন, মোঃ সেরাজুদ্দিন, এম এ ওয়াদুদ প্রমুখ তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়।[১০০] পরিষদের সদস্যরা অভিযোগ করেন যে পূর্ব বাংলার ৭০ লক্ষ কৃষকের মধ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষকের ওপর সরকার ৮০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা দিয়েছে। সহজেই অনুমেয় যে সার্টিফিকেট মামলার চাপ থাকার পরও অর্থনৈতিক দুর্বলতা তথা দারিদ্র্যতার কারণে কৃষকরা সরকারকে খাজনা প্রদানে ব্যর্থ হয়। সার্টিফিকেট জারি হয়েছিল সরকারের তাকাভী লোন, সমবায় লোন, কৃষি ব্যাংকের লোন এবং ই.পি.এ.ডি.সি'র সার লোনের জন্য। তাদের মূল বক্তব্য ছিল জোরপূর্বক সরকারের ঋণ এবং খাজনা-কর আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের ওপর যে শোষণ ও নিপীড়ন করা হচ্ছিল যা ঔপনিবেশিক শাসনামলের অত্যাচারের সঙ্গে তুলনীয়।[১০১] কৃষকদের ওপর সরকারের উপর্যুপরি খাজনা ও অন্যান্য কর বৃদ্ধি এবং এর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের ভিতরে ও বাইরে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ হলেও সরকার নতুন করে খাজনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৬৭ সালের ২৯ জুন পরিষদে 'The East Pakistan Finance Bill, 1967' নামে নতুন করে আরও একটি বিল উত্থাপন করেন। এই বিলে জমির ওপর একর প্রতি ০.৫০ টাকা ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়। এই বিলের বিরুদ্ধে পরিষদের সদস্য আব্দুল মালেক উকিল, মোল্লা আবুল কালাম আজাদ, মোসলেম উদ্দিন খান, নুরুল হক, আজহার উদ্দিন আহমদ, আহাদ আলী খান, শামসুর রহমান, নুরুল ইসলাম খান, নুরুল গণি চৌধুরী, মোশারফ হোসেন, এম এ করিম, নিরোদ নাগ, আবদুস সোবহান মৌলানা, সৈয়দ আশরাফ হোসেন, আহমাদুল কবির, আসাদুজ্জামান খান প্রমুখ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।[১০২] পরিষদের সদস্য আজহার উদ্দিন আহমদ বলেন, "যে সময় প্রায় ৮০ লক্ষ সার্টিফিকেট কৃষকদের মাথার উপর ঝুলছে; যে সময় দেশের কৃষকরা আগামী বছরের খাদ্য শস্য উৎপন্ন করতে গিয়ে ঋণের জন্য মহাজনদের কাছে ধন্না দিচ্ছে, যে সময় খাদ্যের অভাবে লোকে ভুট্টা খেয়ে মারা যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় কৃষকদের উপর এই ট্যাক্স ধরা উচিত হয়নি। আজকে যদি জমির খাজনাকে fair and equitable করা হত, তাহলে আমাদের এই ট্যাক্স ধরার প্রয়োজন হত না। তারপর যে সমস্ত জমির বন্দোবস্ত হয়নি সেগুলি যদি ঠিক মত বন্দোবস্ত দেওয়া হয়, তাহলে এই ট্যাক্স ধরার কোন প্রয়োজন হয় না।"[১০৩] অর্থৎ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টত বোঝা যায় যায় যে প্রথমত, সরকার নতুন করে খাজনা বৃদ্ধি করে কৃষকদের ওপর জুলুম করেছিল; দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান আমলে জমির খাজনা ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত ছিল না এবং তৃতীয়ত, সরকারের নিয়ন্ত্রণে অধিগ্রহণকৃত প্রচুর খাস জমির পরিমাণ থাকলেও তা বন্দোবস্ত

---

[৯৯] ফারুখ, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, পৃ. ১৭২।

[১০০] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXX, No. 3, Budget Session, 1966-67, The 20th and 21th June, 1966 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1967), p. 18-36 and 95.

[১০১] *Assembly Proceedings*, Vol. XXXII, No. 6, 1967, pp. 36-46.

[১০২] পরিষদে উত্থাপিত 'The East Pakistan Finance Bill, 1967' বিলটির পক্ষে ছিলেন ৮২ জন এবং বিপক্ষে ছিলেন ২৯ জন সদস্য। বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Assembly Proceedings*, Vol. XXXII, No. 6, 1967, pp. 96-119.

[১০৩] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Assembly Proceedings*, Vol. XXXII, No. 6, 1967, p. 100.

দেওয়া হয় নি। এটি সত্যি যে পাকিস্তান আমলে সরকারের নিয়ন্ত্রণে অধিগ্রহণকৃত প্রচুর খাস জমি ছিল যা বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নি (সারণি ৪১)।[১০৪] পরিষদের সদস্য আবদুস সোবহান মৌলানা অভিযোগ করেন, "যখন কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়ার উপক্রম, বিভিন্ন রকম দেনার দায়ে যখন তাদের ওপর লক্ষ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা জারি করা হয়েছে, তাদের ওপর পরোয়ানা জারি করে পাওনা খাজনা আদায় করা হচ্ছে, তখন তাদের কাছ থেকে আরও অতিরিক্ত ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে নতুন করে একর প্রতি পঞ্চাশ পয়সা কর ধার্য কৃষককূলকে ধ্বংস করার অভিযান ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১০৫] তবে পরিষদের কিছু সংখ্যক সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিলটি পাশ করিয়ে আইনে পরিণত করে এবং এর বিধি অনুযায়ী কৃষকদের ওপর বর্ধিত খাজনা চাপিয়ে দেয়। এমনকি পরিষদের সদস্যদের বিলের বিরোধিতার জবাবে অর্থমন্ত্রী এম এন হুদা বলেন, "This additional tax of 50 paisa per acre is not a serious burden on the farmers."[106] ১৯৬৮ সালের ২৯ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের এক প্রশ্নোত্তর থেকে জানা যায় যে ভূমি মালিকদের নির্ধারিত ভূমি রাজস্বের বাইরেও (১) উন্নয়ন ও রিলিফ কর হিসেবে ভূমি রাজস্বের ২৫%; (২) স্থানীয় কর ভূমি রাজস্বের ১২.৫%; (৩) শিক্ষা কর ভূমি রাজস্বের ২০%; (৪) ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ (১৯৬৭ সালের ১৪ এপ্রিল) থেকে অতিরিক্ত উন্নয়ন ও রিলিফ কর প্রতি একরে ০.৫০ পয়সা হিসেবে অতিরিক্ত ভূমি কর প্রদান করতে হয়। ভূমি রাজস্বের বাইরে এই অতিরিক্ত ভূমি কর থেকে প্রতি বছর সরকারের মোট রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪,৪৮,৫৪,১৯৭ টাকা।[১০৭] পরিষদের সদস্যদের বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পর কৃষকদের ওপর একশ টাকার রাজস্ব বেড়ে দাঁড়ায় আড়াইশ' টাকা।[১০৮] সুতরাং স্পষ্টত পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার কৃষকদের ওপর নির্ধারিত খাজনা ছাড়াও লেভিসহ বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত কর আরোপের মাধ্যমে তাদেরকে শোষণ ও নিপীড়ন করা হয়েছিল।

পাকিস্তান আমলে কৃষকদের ওপর ধার্যকৃত খাজনা এবং লেভিসহ বিভিন্ন ধরনের কর আদায়ে সামরিক শাসক আইয়ুব সরকার নানাবিধ পন্থা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠোর পদক্ষেপ ছিল ১৯৬২ সালের ভূমি রাজস্ব আদায় আইন। এই আইনের মাধ্যমে সরকার কৃষকদের নিকট হতে জোরপূর্বক খাজনা আদায় করার ব্যবস্থা করে। কৃষকেরা সময়মতো খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের জমি নিলামে দিয়ে বাকি খাজনা আদায় করা হতো। এটি সাধারণভাবে "সূর্যাস্ত আইন" হিসেবে পরিচিত ছিল। এই আইনের ফলে কৃষকরা ভীষণভাবে শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়। একারণে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে কৃষক, রাজনীতিবিদ, এমনকি মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদারদের ভোটে নির্বাচিত প্রাদেশিক আইন পরিষদের কোনো কোনো সদস্যও এই আইনের বিরোধিতা করে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং আইনের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করেন।[১০৯] পরিষদের সদস্যদের অভিযোগ ছিল জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সময় বলা হয়েছিল যে মধ্যস্বত্বদের যদি ধ্বংস করা যায় তাহলে এই মধ্যস্বত্বরা যে বিরাট অংকের অর্থ নিজের স্বার্থে ব্যয় করতো সেই অর্থ থেকে যে আয় হবে সেটা গ্রামের চাষীদের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হবে। কিন্তু যখন জমিদারি প্রথা উঠে গেল তখন এই বিরাট আয় থেকে গ্রাম্য চাষীদের জন্য কিছুই করা হয়নি। অর্থাৎ তাদের প্রবঞ্চিত করা হয়েছিল। উপরন্তু, উন্নয়নের নামে তাদের ওপর ধার্য করা হয় উন্নয়ন কর এবং বসানো হলো শিক্ষা কর প্রভৃতি। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলে যেসব সুবিধা দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার পরিবর্তে নানা ধরনের

---

[১০৪] Ali, "*Land Reform Measures and Their Implementation in Bangladesh*", p. 165.
[১০৫] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Assembly Proceedings*, Vol. XXXII, No. 6, 1967, p. 106-107.
[১০৬] *Assembly Proceedings*, Vol. XXXII, No. 6, 1967, pp. 114-119.
[১০৭] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXIII, No. 4, Winter Session, 1968-69, The 26th and 29th January, 1969 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1971), pp. 61-64.
[১০৮] *Assembly Proceedings*, Vol. XXXIII, No. 4, 1969, p. 137.
[১০৯] *Assembly Proceedings*, Vol. XXI, No. 1, 1962, p. 214.

অসুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং কৃষকদেরও তা মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। জমিদারি আমলে দেশে প্রাকৃতিক কারণে আবাদ না হলে জমিদাররা ঐ এলাকায় খাজনা রেয়াত দিতেন। কিন্তু জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর অবস্থা এমন হয়েছে যে এক পয়সা খাজনা আর রেয়াত দেওয়া হয় নি। এমনকি ঔপনিবেশিক শাসনামলের ন্যায় সার্টিফিকেট জারি করে কৃষকদের নিকট থেকে জোরপূর্বক খাজনা আদায় করা হয়। মধ্যস্বত্ব লোপ করে তাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার পরিবর্তে কৃষকেরা পেয়েছে 'সূর্যাস্ত আইন'। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির জন্য বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন যখন কৃষক খাজনা দিতে পারছে না, কষ্টের মধ্যে তাদের দিন কাটছে, তখন 'সূর্যাস্ত আইন' দ্বারা খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। পরিষদের সদস্যরা অভিযোগ করেন যে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তথা কৃষকরা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ চেয়েছিল জমিদারের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, কিন্তু জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর তারা জমিদারের মুহুরীর পরিবর্তে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছিল। পরিষদের সদস্যরা বলেন যে পূর্ব বাংলা কৃষি প্রধান অঞ্চল এবং এর শতকরা ৮৫ জন মানুষ কৃষক। কৃষকরাই পূর্ব বাংলার মেরুদণ্ড। তাই তারা "সূর্যাস্ত আইন" বাতিল করার জন্য সুপারিশ করেন।[১১০] তাদের আরও অভিযোগ ছিল যে এমনিতেই পূর্ব বাংলার কৃষকরা স্থানীয় করসহ বিভিন্ন ধরনের করভারে জর্জরিত ছিল, তদুপরি কৃষি আয়করের সুপার ট্যাক্স শতকরা ১২.৫০ টাকা হতে ২০ টাকায় বর্ধিত করায় কৃষকরা আরও বেশি নিপীড়নের স্বীকার হচ্ছিল। উপরন্তু, খাজনা আদায়কারী তহশিলদার ও পেয়াদাদের জুলুম, "সূর্যাস্ত আইন" এবং সার্টিফিকেটের অত্যাচারে কৃষকরা বাস্তুভিটা পর্যন্ত হাতছাড়া করতে বাধ্য হচ্ছিল।[১১১] পরিষদের সদস্যরা অভিমত প্রকাশ করেন যে পূর্ব বাংলার জনগণের শতকরা ৯০-৯৫ জন মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এই বিশাল কৃষক সমাজকে ধ্বংস করার জন্যই "সূর্যাস্ত আইন" করা হয়েছে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে 'সূর্যাস্ত আইন' বদৌলতে ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকে জমিদারি কেড়ে নিয়ে একটি হিন্দু জমিদার সমাজ সৃষ্টি করেছিল। পরিষদের কতিপয় সদস্যের অভিমত ছিল যে সরকারের খাজনা আদায়ের পদ্ধতির কারণে কৃষককূল ধ্বংস হবে সন্দেহ নেই। এমন অনেক কৃষক আছে সূর্যাস্ত আইনের আমলে বাকি খাজনার দাবি মেটাতে গিয়ে অনেক জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে। তাদের মতে এভাবে 'সূর্যাস্ত আইন' ৫-৭ বছর চলতে থাকলে দেশের অবস্থা খারাপ হবে এবং কৃষককূল ধ্বংস হয়ে যাবে।[১১২] ১৯৬২ সালের ২১ জুন প্রাদেশিক পরিষদে কৃষকের ওপর চরম শোষণ ও নিপীড়নের অভিযোগ করে আবদুল হামিদ আপেক্ষের সুরে বলেন যে তিনি যৌবনে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন করেছিলেন, বার্ধ্যক্যে তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে পরিষদ সদস্য হয়ে এখানে এসেছেন। তিনি বলেন যে পূর্ব বাংলার মানুষ জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ সমর্থন করেছিল কারণ তারা মনে করেছিল তাদের মঙ্গল হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ফলে কারও কোনো সুবিধা হয়নি বরং তাদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। হামিদ বলেন যে যদি জনগণের রায় নেওয়া হয় যে তারা এখনকার অবস্থা চায় না ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের জমিদারি প্রথায় ফিরে যেতে চায় তবে নিঃসন্দেহে তারা পূর্বেকার জমিদারি প্রথাকেই সমর্থন করবে। এর কারণ হলো জনগণ পাকিস্তান আমলে পূর্বের (ঔপনিবেশিক আমলের) তুলনায় অধিক শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হচ্ছিল। তাঁর মতে সার্টিফিকেট কোর্ট, রাজস্ব সার্কেল অফিস, তহশিলদারী কাচারি সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে কৃষকরা নিদারুনভাবে অত্যাচার ও অবিচারের স্বীকার হচ্ছিল। উপরন্তু, সূর্যাস্ত আইনে পূর্ব বাংলার মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছিল। হাটে যে গরুর মূল্য ৫০০ টাকা উঠেছিল তাতেও কৃষক বিক্রি করেনি, কিন্তু এই আইনের কবলে পড়ে সেই গরু ৩০০ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল কেবল খাজনা দেওয়ার জন্য। সূর্যাস্ত আইনের

[১১০] *Assembly Proceedings*, Vol. XXI, No. 1, 1962, p. 258-262.
[১১১] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXI, No. 2, First Session, 1962, The 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th June, 1962, (Dacca : East Pakistan Government Press, 1963), p. 30.
[১১২] *Assembly Proceedings*, Vol. XXI, No. 2, 1962, p. 35.

অত্যাচারে গ্রামের মানুষের গরু-বাছুর এমনকি স্ত্রীর গায়ের গহনা পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেন যে বিট্রিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের খাজনা আদায়ের নিপীড়ন এবং জোর-জবরদস্তিমূলক আইনের অনুরূপ এক মারাত্মক আইন পাকিস্তান সরকার নতুন করে চালু করার ফলে পূর্ব বাংলার কৃষকরা ভীতসন্ত্রস্ত। তিনি অবিলম্বে 'সূর্যাস্ত আইন' বিলুপ্ত করার সুপারিশ করেন। এমনকি, হুমকি দেন যে 'সূর্যাস্ত আইন' রহিত করা না হলে জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পরিষদের ভিতরে এবং বাইরে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবেন।[১১৩] সুতরাং পরিষদের সদস্যদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের শোষণ ও নিপীড়নের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছিল।

পাকিস্তান শাসনামলে নতুন নতুন কর বৃদ্ধি করে তা আদায়ে উদ্দেশ্যে ভূমি রাজস্ব আদায় অর্ডিন্যান্স বা বহুল পরিচিত ১৯৬২ সালের ভূমি রাজস্ব আদায় আইন বা 'সূর্যাস্ত আইন' প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ এবং ঔপনিবেশিক যুগের সার্টিফিকেট প্রথা প্রয়োগের কারণেও কৃষকেরা শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়েছিল। ঔপনিবেশিক আমলে যে সার্টিফিকেট প্রথা প্রয়োগের কারণে কৃষকরা চরমভাবে অত্যাচারের স্বীকার হয়েছিল তা বিলুপ্তির আশায় তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও তারা সেই সার্টিফিকেট প্রথার নিপীড়নের স্বীকার হয়েছিল। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে শোষণ ও নিপীড়নের বিশেষ অস্ত্র হিসেবে কৃষকদের ওপর সার্টিফিকেট প্রথার প্রয়োগ ছিল মাত্রাতিরিক্ত। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এক হিসেব থেকে দেখা যায় যে সার্টিফিকেট প্রথা প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যান্য করসহ সরকারের মোট ভূমি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল (সারণি ৩৮)।[১১৪] সারণি ৩৮ থেকে দেখা যায় যে ১৯৫৯-৬০ সালে যেখানে ভূমি রাজস্ব ও বিভিন্ন ধরনের করসহ সরকারের মোট বকেয়ার পরিমাণ ছিল ১০,৪১,৯৪,৯২৯ টাকা, সেখানে ১৯৬৭-৬৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২১,৭৩,১৮,০৫০ টাকা। অন্যদিকে ১৯৫৯-৬০ সালে সার্টিফিকেট প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারের আদায় ছিল ৮১,৮৮,০৫৯ টাকা। কিন্তু ১৯৬৭-৬৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭,০১,৫৪,৮৭৮ টাকায়। ১৯৫৯-৬০ সালে আদায়ের হার ছিল ৭.৮৬%, কিন্তু ১৯৬৭-৬৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩২.২৮%-এ। সার্টিফিকেট মামলার দ্বারা কৃষকদের ওপর অমানবিক নিপীড়নের মাধ্যমে সরকার পাওনা রাজস্বের পরিমাণ এবং আদায়ের পরিমাণ প্রতি বছর বৃদ্ধি করে চলেছিল। সরকারি ভাষ্যমতে মূলত রাষ্ট্রের আর্থিক দুরবস্থার কারণে সার্টিফিকেট প্রথা প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু এটি প্রয়োগের ফলে কৃষকরা চরমভাবে নিপীড়নের স্বীকার হলেও অসচ্ছলতাবশত তারা সরকারের বকেয়া পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছিল। এ কারণেই কৃষক, রাজনীতিবিদ ও কৃষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দসহ আইয়ুব খানের অনুগত প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের অনেকেই সার্টিফিকেট প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।[১১৫] পরিষদের সদস্যরা অভিযোগ করেন যে পূর্ব বাংলার দরিদ্র কৃষকের বকেয়া খাজনা, অন্যান্য ধার্যকৃত কর ও তার বকেয়া আদায়ের জন্য

---

[১১৩] *Assembly Proceedings*, Vol. XXI, No. 2, 1962, pp. 34 and 211-218.

[১১৪] *Report on the Land Revenue Administration of East Pakistan for the Year 1959-60*, Board of Revenue, Government of East Pakistan, (Dacca : East Pakistan Government Press, 1967), P. 32; *Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1960-61*, Board of Revenue, Government of East Pakistan, (Dacca : East Pakistan Government Press, 1969), P. 37; *Annual Land Revenue Administration Reports for the Year 1961-62*, Board of Revenue, Government of East Pakistan, (Dacca : East Pakistan Government Press, 1967), P. 42; *Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1962-63*, Board of Revenue, Government of East Pakistan, (Dacca : East Pakistan Government Press, 1968), P. 36; *Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1963-64*, Board of Revenue, Government of East Pakistan, (Dacca : East Pakistan Government Press, 1969), P. 31; *Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1965-66*, Board of Revenue, Government of East Pakistan, (Dacca : East Pakistan Government Press, 1971), P. 33; *Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1966-67*, Board of Revenue, Ministry of Revenue, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1973), P. 34; *Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1967-68*, Board of Revenue, Ministry of Revenue, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1973), P. 32.

[১১৫] *Assembly Proceedings*, Vol. XXI, No. 2, 1962, pp. 214-215.

সার্টিফিকেট জারি এবং তা আদায়ের জন্য তাদের কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। এমনকি, সরকারি ঋণের অর্থ ও তার বকেয়া আদায়ের জন্যও কৃষকদেরকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল। এই কারণে কৃষকরা চরমভাবে শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়েছিল। পরিষদের সদস্যদের আক্ষেপ ছিল যে ৩ কোটি টাকা খাজনা আদায়ের জন্য ১০ কোটি টাকা খরচ করা হয় অথচ সেই ৩ কোটি টাকা খাজনা মওকুফ করা হয় না। ফলে খাজনা আদায় নিপীড়ন ছাড়া আর কিছুই নয়।[১১৬] ১৯৬৭ সালের ২৯ জুন প্রাদেশিক পরিষদে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এম. এন হুদা নিজেই স্বীকার করেন যে খাজনা বকেয়ার জন্য কৃষকদের বিরুদ্ধে ৮০ লক্ষ সার্টিফিকেট জারি করা হয়েছিল।[১১৭] ১৯৭০ সালের জুন মাসে একটি দৈনিক পত্রিকা থেকে জানা যায় যে ময়মনসিংহ জেলার ৪টি থানায় ভূমি রাজস্ব বাকি পড়ায় ৫ হাজার সার্টিফিকেট জারি করা হয়েছিল। অত্যাচার এমন ভয়ংকর পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সেখানে রাজস্ব আদায়কারী তহশিলদারদের ভয়ে হালের গরু নিয়ে কৃষকরা জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিল।[১১৮] সুতরাং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের ন্যায় সার্টিফিকেট প্রথার প্রয়োগের কারণে ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য অতিরিক্ত করসহ বকেয়া পাওনা আদায়ের মাধ্যমে সরকার কৃষকদের ওপর ভীষণভাবে শোষণ ও নিপীড়ন চালিয়েছিল।

এটা সত্যি যে সামরিক শাসন জারির পর থেকে কৃষকদের ওপর সরকারের শোষণ ও অত্যাচারের ফলস্বরূপ ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য অতিরিক্ত করসহ সরকারের বকেয়া পাওনা আদায়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৫৯ সালের ১৩ মার্চ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানে ভূমি রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৯ সালের ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত এক বছরে সরকারের প্রায় ১২ কোটি টাকা ভূমি রাজস্ব আদায় হয়। অথচ ১৯৫৮ সালের ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত এক বছরে ভূমি রাজস্ব আদায় হয়েছিল মাত্র ৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা ৫ কোটি টাকা বেশি রাজস্ব আদায় হয়।[১১৯] অতি দ্রুত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির পেছনে ভূমি রাজস্ব আদায় অর্ডিন্যান্স বা 'সূর্যাস্ত আইন' ও সার্টিফিকেট প্রথা প্রয়োগসহ বিভিন্ন ধরনের সরকারি চরম পন্থাসমূহ কার্যকর ছিল। কাজেই সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের ওপর নিপীড়নও অত্যাধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখ্য, বিশ শতকের ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানে বার্ষিক ভূমি রাজস্ব ছিল ১৩ কোটি টাকা।[১২০] তবে সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক জোর-জুলুম করে ভূমি রাজস্ব আদায় করা সত্ত্বেও মূলত কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থার কারণে প্রতি বছর বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল (সারণি ৩৯)।[১২১] সারণি ৩৯ থেকে দেখা যায় যে যেখানে ১৯৫৯-৬০ সালে বাকি রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১০,৭৮,৬৩,৭২৬ টাকা, সেখানে ১৯৬৭-৬৮ সালে সরকারের পাওনা বাকি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩,২০,৭৫,৭৪৭ টাকা। আবার যেখানে ১৯৫৯-৬০ সালে বকেয়া রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছিল ৪,১৫,৬১,০৭৫ টাকা, সেখানে ১৯৬৭-৬৮ সালে বকেয়া রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,৭২,৩৫,৮১৪ টাকা। উক্ত সারণিতে আরও দেখা যায় যে একদিকে বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং অন্যদিকে বকেয়া রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল। উল্লেখ্য,

[১১৬] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXI, No. 5, First Session, 1967, The 1st, 2nd, 3rd, and 6th February, 1967 (Dacca : East Pakistan Governement Press, 1968), pp. 338-341.

[১১৭] *Assembly Proceedings*, Vol. XXXII, No. 6, 1967, p. 115.

[১১৮] *দৈনিক আজাদ*, ২২ জুন, ১৯৭০।

[১১৯] *দৈনিক নাজাত*, ৩০ এপ্রিল, ১৯৫৯।

[১২০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ মার্চ, ১৯৫৯।

[১২১] *Report on the Land Revenue Administration of East Pakistan for the year 1959-60*, p. 28; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1960-61*, p. 33; *Annual Land Revenue Administration Reports for the year 1961-62*, p. 36; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1962-63*, p. 30; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1963-64*, p. 24; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1965-66*, p. 27; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1966-67*, p. 26-27; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1967-68*, p. 24.

পাকিস্তান আমলে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি না পেলেও ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য করের পরিমাণ ও সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৫০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের এক প্রশ্নোত্তর থেকে জানা যায় যে উক্ত বছরে সরকারের ধার্যকৃত ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,০৩,৮০,৬৫৯ টাকা এবং রাস্তা ও পূর্ত করের পরিমাণ ছিল ৭১,৩৮,৯০৬ টাকা (ভূমি রাজস্বের ৬৮.৭৭%)।[১২২] পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের পর যদিও কৃষকরা মনে করেছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর তাদেরকে ভূমি রাজস্বের বাইরে কোনো আবওয়াব বা বাড়তি কর দিতে হবে না। কিন্তু দেখা যায় যে পাকিস্তান আমলে বিশেষ করে সামরিক শাসনামলে সরকার ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নতুন বিভিন্ন নামে ভূমি সংক্রান্ত কর সৃষ্টি করে তা সংগ্রহে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৬৭ সালের ২৯ জুন প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য আবদুস সোবহান মৌলানা উল্লেখ করেন যে পাকিস্তান শাসনামলে সরকার কৃষকদের ওপর ১৭ ধরনেরও ওপরে ট্যাক্স ধার্য করেছে।[১২৩] সামরিক শাসনামলে একদিকে ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত কর ধার্য বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদিকে তা আদায়ের পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পায় (সারণি ৪০)।[১২৪] সারণি ৪০ থেকে ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য ধার্যকৃত কর সংগ্রহের পরিমাণ দেখে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে কৃষকদের ওপর সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারণি ৪০ থেকে আরও দেখা যায় যে ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য অতিরিক্ত ধার্যকৃত কর আদায় ভূমি রাজস্বের প্রায় সমপর্যায়ে পৌঁছায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ১৯৬৩-৬৪ সালে আদায়কৃত ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬২.০৩% ও ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য কর সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৩৭.৯৭%, ১৯৬৪-৬৫ সালে আদায়কৃত ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫৮.৫৩% ও ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য কর সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪১.৪৭%, ১৯৬৫-৬৬ সালে আদায়কৃত ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫৪.২৮% ও ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য কর সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪৫.৭২%; এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে আদায়কৃত ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫৩.০৮% ও ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য কর সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪৬.৯২%। অর্থাৎ সামরিক শাসনামলে ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য কর ধার্য এবং জোর-জুলুমপূর্বক তা সংগ্রহের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় আদায়কৃত ভূমি রাজস্বের সমপর্যায়ে পৌঁছে যায়। সুতরাং সামরিক শাসনামলে ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য কর আদায় বৃদ্ধির সমান্তরালে কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়নও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

উপরন্তু, ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন দুর্নীতির কারণেও পূর্ব বাংলার কৃষকরা শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যরা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিভাগকে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত বিভাগ বলে অভিযুক্ত করেন। পরিষদের সদস্যরা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিভাগের দুর্নীতি সম্পর্কে আরও অভিযোগ করেন যে দূর-দূরান্ত থেকে খাজনা দিতে মানুষ তহশিল অফিসে জড়ো হলেও তহশিলদার কয়েকজনের খাজনা নিয়েই বলতেন যে, 'আজকে আর খাজনা নেওয়া হবে না। তোমরা চলে যাও, কালকে আবার এসো।' কিন্তু অনেকেই তহশিলদারকে উৎকোচ প্রদান করলে সেদিনই খাজনা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যেতো। এ কারণে গ্রামের নিরক্ষর দরিদ্র কৃষকদের শোষণ হয়রানির কোনো অন্ত ছিল না। দরিদ্র কৃষকদের অভিযোগ ছিল যে তারা খাজনা দেওয়ার জন্য জমিদারের কাছারিতে, তহশিলদারের কাছে, অথবা মানি অর্ডার করে কালেক্টরের কাছে গেলেও কেউ তাদের খাজনা গ্রহণ করতো না। একদিকে তাদের নিকট থেকে ঠিকমতো খাজনা নেওয়া হতো না, অন্যদিকে খাজনা বকেয়া দেখিয়ে তাদের চাষের

---

[১২২] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. IV, No. 7, Fourth Session, 1949-50, The 25th, 27th, 28th, February, 1st and 2nd March, 1950 (Dacca : East Bengal Government Press, 1952), p. 1.

[১২৩] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Assembly Proceedings*, Vol. XXXII, No. 6, 1967, p. 106-107.

[১২৪] *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXI, No. 1, First Session, 1967, The 3rd, 4th, 5th, 7th, and 9th January, 1967 (Dacca : East Pakistan Governement Press, 1967), pp. 214-215.

ভালো জমি গোপনে সার্টিফিকেট জারি করে গোপনেই নিলামে বিক্রি করা হতো। পরিষদের সদস্যরা অভিমত দেন যে যদি অধিগ্রহণকৃত এস্টেটের সমস্ত কর্মচারী চাকরিতে প্রবেশের পূর্বে ও পরে তাদের সম্পত্তির হিসেব সংগ্রহ করে সম্পত্তির পরিমাণের তুলনা করা যেতো তাহলেই দুর্নীতির ব্যাপকতা সরকারের নজরে পড়তো। তাদের মতে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিভাগের সকল কর্মচারীই দুর্নীতিপরায়ণ ছিল। এমনকি, সরকারের খাস জমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা ভীষণ রকমের দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল।[১২৫] উল্লেখ্য, পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পর সরকারে নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণকৃত বিপুল পরিমাণ খাস জমি ছিল (সারণি ৪১)।[১২৬] সারণি ৪১-এ দেখা যায় যে ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণকৃতসহ সরকারে নিয়ন্ত্রণে সর্বমোট খাস জমির পরিমাণ ছিল ৬,৩০,৩৭১ একর। এর মধ্যে মাত্র ৪,৪০২ একর জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছিল। অবশিষ্ট ৬,২৫,৯৬৯ একর জমি পাকিস্তান আমলে আর বন্দোবস্ত দেওয়া হয়নি। পরিষদের সদস্যদের অভিযোগ যে ছিল এই বিপুল পরিমাণ স্থিতি (Balance) খাস জমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল। অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় প্রভাবশালীরা এইসব খাস জমি এক-দু' বছরের জন্য বন্দোবস্ত নিয়ে প্রতিবছর সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মচারীদের উপরি দিয়ে বছরের পর বছর ভোগ করতো। অর্থাৎ খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগের মূলে ছিল দুর্নীতি। ১৯৫৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সরকারের রাজস্বমন্ত্রী খাজনা-কর আদায় বিভাগ, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিভাগ, খাস জমি বন্দোবস্ত বিভাগ এবং জরিপ কার্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি স্বীকার করে প্রতিশ্রুতি দেন যে ভবিষ্যতে অনুরূপ দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।[১২৭] কিন্তু বাস্তবে সরকার দুর্নীতি দমনে সফল হয়নি, যদিও সরকার প্রতিশ্রুত দুর্নীতি রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল (সারণি ৪২)।[১২৮] সারণি ৪২ থেকে দেখা যায় যে ১৯৫৯-৬০ হতে ১৯৬৭-৬৮ পর্যন্ত দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত খাজনা-কর আদায় বিভাগ, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ বিভাগ, খাস জমি বন্দোবস্ত বিভাগ এবং জরিপ কার্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ায় দোষীদের চাকুরিচ্যুত, সাময়িক বরখাস্তকরণ, বদলি বা প্রত্যাহার, সতর্ককরণ, পদাবনতি, ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এতোসব কিছুর পরও ভূমি সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই এসব দুর্নীতির কারণে কৃষকরা শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়েছিল।

৫.৪.২ পাকিস্তান শাসনামলে কৃষক আন্দোলন

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে সৃষ্ট ভূমি বিরোধ এবং তার ফলে সৃষ্ট কৃষক আন্দোলন ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও বিদ্যমান ছিল। ব্রিটিশ শাসনের শেষ প্রান্তে এসে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে তেভেগা আন্দোলন তথা কৃষক আন্দোলনের তীব্রতার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন বাংলার রাজস্ব মন্ত্রী ফজলুর রহমান বর্গাদারি তেভেগার স্বীকৃতি এবং বর্গাদার কৃষক উচ্ছেদ বন্ধের জন্য একটি অর্ডিন্যান্স জারির প্রস্তাব দিলেও প্রধানত গভর্নরের আপত্তির কারণে তা বাস্তবায়িত হয় নি। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্গাদারি তেভেগার স্বীকৃতি ও বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধে সরকার কোনো প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ না করায় তেভেগা আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ ধারণ করে এবং এটি আরও তীব্রতর হয়ে উঠে। আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে মোট ২২ জন কৃষক নিহত হন। তেভেগা

---

[১২৫] *Assembly Proceedings*, Vol. XVIII, No. 3, 1958, pp. 13-14; *Assembly Proceedings*, Vol. XXI, No. 2, 1962, pp. 214-215; *Assembly Proceedings*, Vol. XXXII, No. 6, 1967, p. 34.

[১২৬] Ali, "*Land Reform Measures and Their Implementation in Bangladesh*", p. 165.

[১২৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮।

[১২৮] *Report on the Land Revenue Administration of East Pakistan for the year 1959-60*, p. 20; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1960-61*, p. 25; *Annual Land Revenue Administration Reports for the year 1961-62*, p. 28; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1962-63*, p. 23; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1963-64*, p. 16-17; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1965-66*, p. 20; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1966-67*, p. 18-19; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1967-68*, p. 17.

আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারী কিষাণ সভা প্রতিরোধে বিশ্বাসী ছিল না। সুতরাং এই সংগঠনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নেতারা আত্মোগোপন করেন। সরকারি দমনপীড়ন ও নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। অশিক্ষিত পৌন্ড্র-ক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, সাঁওতাল, রাজবংশী ও মুসলমান কৃষকদের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার ক্ষমতা ছিল না।[১২৯] উপরন্তু, দেশভাগ ও বঙ্গবিভাগের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার কর্মক্ষেত্র মূলত সীমাবদ্ধ হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা তখন থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভায় পরিণত হয়। পূর্ব বাংলা থেকে কৃষক সভার বহু হিন্দু কর্মী ও নেতা পশ্চিমবঙ্গে চলে যায়।[১৩০] যদিও ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মানুষেরা তেভেগা আন্দোলন থেকে সরে আসে, কিন্তু জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবিতে জনমত প্রবল ছিল।[১৩১] ১৯৪৮ সালের ১৬-১৭ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান শহরে সারা ভারত কৃষক সভার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তখন পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পাসপোর্ট ও ভিসা প্রথা চালু হয়নি। উভয় দেশে গমনাগমন ছিল অবাধ। এ কারণে বর্ধমানের কৃষক সভায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেন। দেশভাগ হলেও তখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষক সমিতিও পৃথক হয় নি। বর্ধমানের কৃষক সভায় কমরেড মণি সিংহকে সভাপতি ও মনসুর হাবিবকে সম্পাদক করে সর্বপ্রথম 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি' গঠিত হয়। এই কমিটির নেতৃত্বেই ১৯৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের টঙ্কা, নানকার এবং তেভেগা আন্দোলন পরিচালিত হয়।[১৩২] এই আন্দোলন ১৯৫০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[১৩৩] কৃষকদের এই আন্দোলন একেবারে ব্যর্থ হয় নি। পাকিস্তান আমলে আন্দোলনের চাপে মুসলিম লীগ সরকার টঙ্কা ও নানকার প্রথা বাতিল করতে বাধ্য হয়। এছাড়াও কৃষকদের এই আন্দোলন পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নে বা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদেও সহায়তা করে।[১৩৪] তবে কিছুটা সফল হলেও উক্ত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ওপর মুসলিম লীগ সরকার পাশবিক দমন-পীড়ন, হত্যাকাণ্ড এবং জেল-জুলুমের কৌশল অবলম্বন করে। এর ফলে কৃষক সমিতির সবধরনের কার্যকলাপ কার্যত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কৃষক সমিতির তথা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই হয় কারাগারে, নয়তো আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়। সমিতির সম্পাদক মনসুর হাবিব ভারতে ফিরে যায়। প্রকৃতপক্ষে সরকারের তীব্র দমন নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে। একইসঙ্গে ১৯৫২ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় পূর্ব পাকিস্তানে কৃষক আন্দোলন স্থবির হয়ে পড়ে।[১৩৫]

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের সূচনায় (১৯৫২ সালের শেষ বা ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে) কৃষক সমিতিকে পুনঃসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে আতাউর রহমান খানের ঢাকার ওয়াইজঘাটের বাসভবনে কৃষক নেতৃবৃন্দের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আতাউর রহমান খানকে কনভেনর, কুমিল্লার প্রখ্যাত কৃষক নেতা ইয়াকুব আলীকে (বড় মিয়া) সম্পাদক এবং বগুড়ার আবদুল মতিন ও আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমদকে যুগ্ম-সম্পাদক করে কৃষক সমিতির সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। এই সময় পূর্ব বাংলার কোনো কোনো জেলায় কৃষক সমিতি গড়ে উঠে। ১৯৫৩ সালের শেষ দিকে ঢাকায় একটি কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশকে সভাপতি এবং কিউ. কিউ. জামানকে (জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক) সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি গঠিত হয়। কিন্তু এই সমিতিও কৃষকদের স্বার্থে কোনো কার্যক্রম গ্রহণে সফল হয় নি। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি

[১২৯] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৭১-৭২।
[১৩০] রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ১৭৫-১৭৬।
[১৩১] মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৭২-৭৩।
[১৩২] নূহ-উল-আলম লেনিন, "বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন", শেখ রফিক (সংকলিত), *তেভাগা আন্দোলন* (ঢাকা : বিপ্লবীদের কথা প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ৪৩৭-৪৩৮।
[১৩৩] কামাল ও চক্রবর্তী, *নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ*, পৃ. ১৪৭।
[১৩৪] লেনিন, *"বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন"*, পৃ. ৪৩৮।
[১৩৫] Umar, *Emergence of Bangladesh*, p. 193.

মাসে ফুলছড়ি ঘাটে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি কৃষক সম্মেলনে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও হাতেম আলী খানকে সম্পাদক এবং জিতেন ঘোষ, গুরুদাস তালুকদার, হাজী দানেশ, অমূল্য লাহিড়ী, মহিউদ্দিন আহমেদ ও আব্দুল হক প্রমুখকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি পুর্নগঠিত হয়। এই সংগঠনের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় কৃষক সংগঠন বিস্তার লাভ করে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান দেশে সামরিক শাসন জারি করলে অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের ন্যায় কৃষক সমিতির কার্যক্রমও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হলে কৃষক সমিতি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। কিন্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভক্তি এবং তাত্ত্বিক বিতর্কে কৃষক সমিতি পিকিংপন্থী ও মস্কোপন্থী-এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[১৩৬] বদরুদ্দীন উমরের মতে সংগঠনটি ১৯৬৭ সালের দিকে 'মস্কোপন্থী' ও 'পিকিংপন্থী' কমিউনিস্টদের দ্বন্দ্বের ফলে সংকটের সম্মুখীন হয় এবং শেষ পর্যন্ত দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া স্বত্বেও সংগঠনের মূল অংশটি মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীনেই থাকে এবং তার মধ্যে পিকিংপন্থী কমিউনিস্টরাই আবার প্রাধান্যে থাকেন। তাঁর মতে কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট রাজনীতি একাকার হয়ে পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কৃষক সমিতির প্রধান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন মাওলানা ভাসানী। অন্যদিকে মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কৃষক সমিতির প্রধান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ। তাঁর মতে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) পরিচালনায় কৃষক সমিতি ছিল ষাটের দশকে কৃষকদের একমাত্র জাতীয় সংগঠন। ন্যাপের মধ্যে কমিউনিস্টরা কৃষক সমিতির মূল সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতেন এবং মাওলানা ভাসানী ছিলেন তার সভাপতি। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর হতে ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সময় চাঁদপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জের মতো এলাকায় কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জোতদার, মহাজন, ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, সদস্য, পুলিশ প্রভৃতি শোষক নির্যাতকদের কয়েক জনকে হত্যা করে। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ও উনসত্তুরের গণ-আন্দোলনের মাধ্যমেও কৃষক সমিতির কোনো বিকাশ ও শক্তি বৃদ্ধি হয়নি। সাংগঠনিক দিক থেকেও তার কোনো উন্নতি ঘটেনি। উমরের মতে ষাটের দশকে বিশেষ করে ১৯৬৬ সাল থেকে আওয়ামী লীগ বুর্জোয়া পদ্ধতিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল এবং একটি ছয় দফা কর্মসূচিও তারা জনগণের সামনে হাজির করেছিল। এই কর্মসূচির মধ্যে দরিদ্র মেহনতিদের জন্য কিছুই ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে জনগণকে নতুনভাবে শোষণ করাই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু তবু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আওয়ামী লীগের পেছনেই জনগণ সমবেত হতে শুরু করলো। এর প্রধান কারণ ছিল কমিউনিস্ট পার্টি অথবা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচি ছিল না। অথচ এই নিপীড়ন শ্রেণি শোষণকে অধিকতর তীব্র ও পীড়নমূলক করছিল এবং জনগণ সেই নিপীড়নের অবসান চেয়েছিল।[১৩৭] তবে উমরের মন্তব্যের বিপরীতে শুধু এতটুকু বলা যায় যে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তথা কৃষকের ভূমি সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং খাজনা ও অন্যান্য কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য কৃষক সমিতি তথা কমিউনিস্ট পার্টি বা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কোনোরূপ বাস্তব ভিত্তিক কর্মসূচি ছিল না। এ কারণেই মূলত পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তথা কৃষকরা তাদের কর্মসূচির প্রতি আকৃষ্ট হয়নি এবং তাদের ঘোষিত আন্দোলনেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে নি। অন্যদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার কৃষকদের ওপর রাষ্ট্রীয় শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ভিত্তিক আন্দোলন শুরু করেছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্বেও দলটি কৃষকদের ভূমি সংশ্লিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাস্তব ভিত্তিক ২১ দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেছিল। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রীয় শোষণ ও

[১৩৬] লেনিন, *"বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন"*, পৃ. ৪৩৮-৪৩৯।
[১৩৭] উমর, *বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন*, পৃ. ১৮-২৪।

নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছয় দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকেরা কমিউনিস্ট পার্টি অথবা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি তথা কৃষক সমিতির পরিবর্তে আওয়ামী লীগের পেছনেই সমবেত হয়েছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও দেখা যায় যে কৃষক সমিতি তথা কমিউনিস্ট পার্টি অথবা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পরিবর্তে আওয়ামী লীগের পক্ষেই পূর্ব বাংলার কৃষকরা তাদের রায় দিয়েছিল (পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে আওয়ামী লীগের সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি ছিল বলেই পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তথা কৃষকরা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছিল।

যাহোক, বিশ শতকের ষাটের দশকে যে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল তার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন ধরনের। নূহ-উল-আলম লেনিনের মতে দ্বিতীয় পর্যায়ের টঙ্কা, নানকার বা তেভেগা আন্দোলনের পর পাকিস্তানি শাসনামলে প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর পরিসরে কোনো কৃষক আন্দোলন হয়নি। তবে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঢাকা জেলাসহ কয়েকটি জেলার হাট-বাজারে ইজারাদারদের জুলুম বন্ধ, রেকর্ড বর্গা, দ্রব্যমূল্য, খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ, ঘুষ-দুর্নীতি, খাজনা-কর কমানো ও ফসলের মূল্য নির্ধারণসহ প্রভৃতি ইস্যুতে ক্ষুদ্র পরিসরে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি আন্দোলন হয়েছিল। ইজারা ও রেকর্ড বর্গা ছাড়া অন্য আন্দোলনগুলো ছিল মূলত প্রচারমূলক। ষাটের দশকের শেষ দিকে কৃষক সমিতির ব্যানারে বেশ কিছু বড় জমায়েত ও সম্মেলন হলেও সেগুলোর প্রকৃতি ছিল মূলত রাজনৈতিক।[১৩৮] ১৯৬৭ সালের ২৭ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের বিন্যাফইরে পূর্ব পাকিস্তান পাটচাষী কনফারেন্সে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কৃষকদের সমস্যা তুলে ধরে বলেন যে এদেশের কৃষক সমাজ ফসল উৎপাদন করে, কিন্তু যে জমিতে তারা ফসল উৎপাদন করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই জমির মালিক হলো অন্য মানুষ। তাই দেশের কৃষকের মূল সমস্যা ছিল জমির মালিকানার সমস্যা। তিনি বলেন যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক ধনতান্ত্রিক সামন্তবাদী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা পরিচালনার কেন্দ্রে ছিল একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের দ্বারা পরিচালিত এই ধনতান্ত্রিক সামন্তবাদী সরকার কৃষি সংস্কারের নামে সামন্তবাদকে রক্ষা করে চলেছে। তিনি বলেন যে ঔপনিবেশিক আমলের সামন্তবাদী খাজনা ও ঋণ ব্যবস্থা পাকিস্তান শাসনামলেও বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর মতে কৃষি ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু গ্রাম্য ঋণের শতকরা মাত্র তিন ভাগ সরবরাহ করে সরকার, অবশিষ্ট ৯৭ ভাগ ঋণ দেয় গ্রাম্য মহাজনরা। প্রতি বছর এই ঋণের দায়ে কৃষককে প্রচুর পরিমাণে জমি হারাতে হচ্ছিল। উপরন্তু, দেশে দেখা দিচ্ছিল অনাহার আর দুর্ভিক্ষ। আর কৃষককে ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই ঋণের দায়েই অবশেষে কৃষককে হারাতে হয়েছিল জমি। ১৯৬১ সালে সরকারের কৃষি সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে প্রতি একশ' জন কৃষকের মধ্যে ৭১ জন কৃষকের হয় জমি নেই অথবা অতি সামান্য দু'এক বিঘা জমি ছিল। জমির ফসল এই শতকরা ৭১ জন কৃষকের গোলায় উঠতো না। অন্যদিকে শতকরা পাঁচজন অকৃষক জমির মালিক হলেন সমগ্র আবাদযোগ্য জমির ৬০ ভাগ বা তার বেশি জমির। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা হলেন জোতদার। এই জোতদারদের গোলায় উঠে মাঠের অধিকাংশ ধান। পাটচাষী কনফারেন্সে ভাসানী দাবি করেন যে, যিনি জমি চাষ করবেন তিনিই হবেন জমির মালিক; জোতদারি-মহাজনী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করতে হবে; অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে; শহর ও গ্রামে রেশনিং প্রথার প্রবর্তন করতে হবে; পানি সেচ ও জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে; গ্রামাঞ্চলে টেস্ট রিলিফের ব্যবস্থা করতে হবে; পাটশিল্প ব্যবসা জাতীয়করণ করতে হবে; সমগ্র পূর্ব বাংলাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করতে হবে; বকেয়া খাজনা ও ঋণ

[১৩৮] লেনিন, *"বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন"*, পৃ. ৪৩৮-৪৩৯।

মওকুফ করতে হবে; খাজনা ও ট্যাক্স হ্রাস করতে হবে; রেশনের চাউলের মূল্য মণ প্রতি ২০ টাকা আর গমের মূল্য মণ প্রতি ১০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে; শহর ও গ্রামাঞ্চলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সস্তাদরের দোকান প্রবর্তন করতে হবে; এবং পাটের মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে। তিনি উপরিউক্ত দাবির ভিত্তিতে গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতির পতাকাতলে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান করেন।[১৩৯] অন্যদিকে ১৯৬৭ সালের ৮-৯ এপ্রিল সিলেট জেলার কুলাউড়ায় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবদুল হক তাঁর অভিভাষণে বলেন যে কুলাউড়া সম্মেলন জাতীয় জীবনের এক চরম দুর্যোগময় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এক সর্বগ্রাসী খাদ্য সংকট সমগ্র দেশকে গ্রাস করে ফেলেছে। বড় পুঁজি পরিচালিত ধনবাদী, সামন্তবাদী রাষ্ট্রের চরম ব্যর্থতা সবচেয়ে প্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে কৃষিক্ষেত্রে। কৃষি সংকট সমাধানের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ ছিল কৃষকের হাতে জমি প্রদান এবং কৃষকের ওপর হতে সামন্তবাদী ও ধনবাদী শোষণের বিলোপ সাধন। তাঁর মতে পুঁজিবাদী সরকার কৃষি সংস্কারের নামে সামন্তবাদী ব্যবস্থার অবশেষ জোতদারি প্রথাকে সংরক্ষণ করেছে। বস্তুত, কৃষি সমস্যার সার্বিক সমাধানের জন্য প্রয়োজন ছিল কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, কৃষকের হাতে জমি হস্তান্তর ও কৃষকের ওপর হতে সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদীদের শোষণের অবসান। তাই কৃষক সম্মেলনে তিনি দাবি করেন যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করতে হবে; প্রদেশের সর্বত্র-শহর ও গ্রামে পুর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা প্রর্বতন করতে হবে; রেশনের চাউল প্রতি মণ ২০ টাকা ও আটা ১০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে; খাজনা ও কৃষি ঋণ মওকুফ করতে হবে; কৃষক সমাজের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শীঘ্র রিলিফের ব্যবস্থা করতে হবে; সহজ শর্তে বিনাসুদে দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ঋণ সরবরাহ করতে হবে; সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে; শহর ও গ্রামে ন্যায্য মূল্যের দোকান প্রর্বতন করতে হবে; মজুতদারবিরোধী অভিযান চালু করতে হবে; গ্রামে গ্রামে ও ইউনিয়নে ইউনিয়নে কৃষক সমিতিসহ সরকারি পর্যায়ে সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠন করতে হবে; বিদেশে খাদ্য রফতানি বন্ধ করতে হবে; এবং ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে হবে। তিনি সকল রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন এবং দলমত নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি মানুষকে খাদ্যের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি জিরাতি কৃষকদের সমস্যার সমাধানের জন্য এবং সীমান্ত এলাকার সমস্ত দরিদ্র কৃষকদের বাঁচার পথ সুগম করে তোলার জন্যও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে জোর দাবি জানান।[১৪০]

উল্লেখ্য, পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সংগঠিত করা এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ আন্দোলনের তুলনায় বিভিন্ন সভায় মিলিত হয়ে কৃষক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে ধরতেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৭ সালের ২৯ নভেম্বর রংপুরে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসানে কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও জনসাধারণ তথা কৃষকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব হয় নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য দেশে বিদ্যমান রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে মুক্ত আধা-ঔপনিবেশিক দেশে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশে কায়েম হয়েছে এক ধনবাদী-সামন্তবাদী ব্যবস্থা, আর এই রাষ্ট্রের পরিচালক শক্তি হলো বড় ধনিক গোষ্ঠী। এই পুঁজিবাদী গোষ্ঠী নিজেদের শ্রেণি অবস্থানকে ধরে রাখার তাগিদেই সামন্তবাদী শোষণ

[১৩৯] *পূর্ব পাকিস্তান পাটচাষী কনফারেন্স*, সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অভিভাষণ, ১৩ মাঘ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৭, বিন্যাফইর, টাঙ্গাইল (ঢাকা : আরফান প্রেস, ১৯৬৭), পৃ. ১-৬।
[১৪০] হক, *পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি*, পৃ. ১-৮।

ও নিপীড়নের অবশেষ যেমন-জোতদারি ও মহাজনী প্রথা, খাজনা, বর্গা ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা বহাল রেখেছে। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সমাজব্যবস্থা সামন্তবাদী সমাজ থেকে আধা-সামন্তবাদী সমাজে পরিণত হয়েছে। ১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত কৃষি সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী আবাদযোগ্য শতকরা ১৯ ভাগ জমির মালিক ছিলেন জোতদাররা। পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে জমির সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা নির্ধারণ করা হলেও তা কার্যকর না করে বরং সামরিক শাসনামলে আইয়ুব খান জোতদার শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্য জমির সীমা ৩৭৫ বিঘা নির্ধারণ করেন। কেবল তাই নয়, জোতদার-মহাজনেরা কারসাজি করে নিজেদের হাতে রেখেছে বিরাট পরিমাণ জমি। সরকার নিজ হাতে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর সাবেক জমিদারি আমলের অত্যাচারের সাথে সরকারি আমলাদের অত্যাচার যুক্ত হয়েছে এবং এর ফলে কৃষকদের ওপর চলছে আমলা-নায়েব-তহশিলদারদের সীমাহীন শোষণ ও নিপীড়ন। কৃষকের সার্বিক মুক্তির উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির কাউন্সিল অধিবেশনে নিম্নোক্ত ১৭ দফা দাবি ঘোষণা করা হয় : (১) প্রতি পরিবারের জমির পরিমাণ ঊর্ধ্বে ৫০ বিঘা ও বাড়তি জমি বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা এবং জমি বিতরণের সময় ভূমিহীন, মোহাজের ও গরিব কৃষকদের দাবি দাওয়াকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; (২) ক্ষেত মজুরের বাঁচার মতো মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে; (৩) সার্টিফিকেট প্রথা বিলোপ করতে হবে; (৪) বকেয়া খাজনা মওকুফ করতে হবে; (৫) খাজনার হার শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করতে হবে; (৬) মহাজনী প্রথা ও বর্গা প্রথা বিলোপ করতে হবে; (৭) সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বাজেয়াপ্ত ও দেশীয় বৃহৎ পুঁজি যথা পাটশিল্প ও ব্যবসা জাতীয়করণ করতে হবে এবং পাট, তামাক, আখ, পান প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের ন্যায্যমূল্য কৃষক জনসাধারণ যাতে পেতে পারে তার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (৮) খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসা জাতীয়করণ করতে হবে; (৯) কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষক সমিতির সাথে আলোচনাক্রমে সরকারের তরফ হতে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন ও লোনা পানি প্রতিরোধ প্রভৃতি ব্যবস্থা এবং সেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে; (১০) বন্যা প্রতিরোধের জন্য সরকারের পক্ষ হতে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে দ্রুত কাজে অগ্রসর হতে হবে; (১১) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, কৃষকদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, গ্রামে গ্রামে উপযুক্ত রাস্তাঘাট তৈরি প্রভৃতির জন্য সরকার হতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে; (১২) ঘুষ ও দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে হবে; (১৩) হাট, বাজার, বন, মহাল ও ঘাটে ইজারাদারি প্রথা বাতিল, তোলা ও মাশুল কমানো, খাজনার হার নির্দিষ্ট করা, দুধ, তরিতরকারি ইত্যাদি জিনিসপত্র যা গরিব কৃষকরা হাটে বাজারে বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের তোলা-খাজনা মওকুফ করতে হবে; (১৪) জলকর অথবা জল মহালের ওপর হতে ইজারাদারি প্রথা বাতিল করে প্রকৃত মৎসজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং যে সব জলাশয়ে সাধারণ কৃষকরা বিনা খাজনায় মাছ ধরে আসছে, তার ওপর খাজনা ধার্য করা যাবে না; (১৫) প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, পার্লামেন্টারি ও ফেডারেল শাসনতন্ত্র, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার প্রভৃতি গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে; (১৬) বিনা বিচারে আটক আইন ও দেশরক্ষা আইন বাতিল ও জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে এবং কৃষক নেতা-কর্মীসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি দিতে হবে; (১৭) সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, বড় পুঁজি ও তাদের প্রতিভূ বর্তমান স্বৈরাচারী সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।[১৪১] সুতরাং বিশ শতকের ষাটের দশকের কৃষক আন্দোলন ছিল দাবি-দাওয়া ও কর্মসূচি প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেহেতু মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃশ্যমান কোনো বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করেনি সেহেতু নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলার কৃষকদের আকৃষ্ট

[১৪১] *পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি : ঘোষণাপত্র, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি এবং গঠনতন্ত্র*, ১৯৬৭ সালের ২৯ নভেম্বর রংপুরে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত ঘোষণাপত্র, কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্র (ঢাকা : জাগৃতি মুদ্রায়ণ, ১৯৬৭), পৃ. ৩-৮।

করতে বা তাদের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অন্যদিকে এই ষাটের দশকেই মুক্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে গড়ে উঠা ছয় দফা আন্দোলনে কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল (এ সম্পর্কে এ অধ্যায়ের পরের দিকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

উল্লেখ্য, বিশ শতকের সত্তরের দশকেও কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। বদরুদ্দীন উমরের মতে ১৯৭১ সালে কমিউনিস্টরা সামরিক শক্তির সমর্থনে যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি জেলায় জোতদারদের কিছু জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে। কিন্তু সেই জমির ওপর কৃষকরা নিজেদের অধিকার বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। কারণ যে শক্তির সহায়তায় তারা জমির ওপর অধিকার অর্জন করেছিল সে শক্তি গ্রামাঞ্চলে খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।[১৪২] সুতরাং সার্বিকভাবে বলা যায় পাকিস্তান শাসনামলে যে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল তা ছিল দুর্বল প্রকৃতির; এটা কোনোভাবেই কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণভিত্তিক ছিল না; এটা ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবার অভিলাষের প্রচার সর্বস্ব কর্মকাণ্ড মাত্র। তবে কৃষকরা নিজেদের অধিকার আদায়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ ভিত্তিক আন্দোলন না করলেও পাকিস্তান আমলে কৃষকদের পক্ষে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যরা সোচ্চার ছিলেন তা লক্ষণীয় যা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ গঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংগঠনটি বাস্তব ভিত্তিক কর্মসূচি দিয়ে কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছিল যার ফলস্বরূপ কৃষকরাও বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছিল (এ সম্পর্কে পরের দিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)।

৫.৪.৩ ভাষা আন্দোলন ও কৃষক সমাজ

পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় বাধা ছিল উর্দু। পশ্চিম পাকিস্তানি উর্দু ভাষাভাষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সূচনা হয়। উল্লেখ্য, উনিশ শতকেও মুসলিম ঐক্যবোধ এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারাও উর্দুকে পছন্দ করতেন। এ সময়ের মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রদানকারীরা যেমন নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, স্যার সৈয়দ আহমেদ কেউ বাংলা ভাষায় কথা বলতেন না এবং তাঁরা বাঙালি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায়ও আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন আশরাফ শ্রেণির[১৪৩], তাই তাঁরা হয় উর্দু অথবা ইংরেজি ব্যবহারে আগ্রহী ছিলেন। এমনকি উক্ত নেতৃবৃন্দ উর্দুকে প্রধান্য দেওয়ার জন্যও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[১৪৪] বস্তুত, দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত ভূমি বিরোধের রাজনীতির দ্বন্দ্ব ছিল হিন্দু-মুসলিম, জমিদার-জোতদার, কলকাতা-ঢাকা, হিন্দি-উর্দু কেন্দ্রিক। এছাড়াও জমিদার ও জোতদার দ্বন্দ্বের ফলে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে বিশেষত ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলায় জোতদার শ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সামগ্রিকভাবে এসব দ্বন্দ্বের মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব। এর ফলস্বরূপ

---

[১৪২] উমর, *বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন*, পৃ. ২৬।

[১৪৩] উনিশ শতকে, এমনকি বিশ শতকেও মুসলমান সমাজ দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল যথা আশরাফ ও আত্রাফ শ্রেণি। মুসলমানদের মধ্যে সামাজিকভাবে উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অভিজাত শ্রেণি সাধারণভাবে আশরাফ শ্রেণি হিসেবে পরিচিত ছিল। এই শ্রেণি অর্থনৈতিকভাবেও অধিকতর সচ্ছল ছিল। উর্দু, আরবি, ফার্সি ও ইংরেজি ভাষা জনলেও আশরাফ শ্রেণি ছিল উর্দুভাষী এবং কলকাতা কেন্দ্রিক। অন্যদিকে গ্রামীণ মুসলমানদের মধ্যে নিম্ন শ্রেণি হিসেবে পরিচিত ছিল আত্রাফ শ্রেণি (Muslims of lower strata)। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Razzaque, *Bengali Muslims*, pp. 8-9, 65, 138 and 288; Hasan, *Legacy of a Divided Nation*, pp. 38, 159.

[১৪৪] De, *Bengal Muslims in Search of Social Identity 1905-47*, p. 97.

১৯৪৭ সালে দেশভাগের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিমদের জন্য পৃথক ভারত-পাকিস্তান নামক পৃথক রাষ্ট্র গঠন এবং বাংলা ভাগের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও ঔপনিবেশিক শাসনামলের ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। তবে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ হিন্দু জমিদাররা পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় চলে গেলে জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের প্রধান পক্ষ তথা জমিদাররা পূর্ব বাংলায় দুর্বল হয়ে পড়ে। উপরন্তু, ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পর আইনগতভাবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে হলেও জমিদারদের পতন ঘটে। ফলে পূর্ব বাংলায় বিদ্যমান ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়। এসময় জমিদারদের স্থান দখল করে নেয় জোতদাররা এবং জোতদারদের স্থলাভিষিক্ত হয় তুলনামূলকভাবে সচ্ছল মুসলমান কৃষকেরা। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের শোষণ ও নিপীড়নের শৃঙ্খল (Chain of exploitation and oppression) অনুযায়ী জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে দেখা যায় যে জমিদারারা তাদের অধীনস্থ জোতদারদের, জোতদাররা তাদের অধীনস্থ কিছুটা সচ্ছল কৃষকদের এবং কিছুটা সচ্ছল কৃষকরা তাদের অধীনস্থ বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন করতো। ঐ সময়ে দেখা যায় যে প্রধানত অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে কিছুটা সচ্ছল মুসলমান কৃষকদের নেতৃত্বে সাধারণ কৃষক, বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষকরা সংগঠিতভাবে জোতদারদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ছিল। কারণ জমিদারদের শোষণ হ্রাস পেলে স্বাভাবিকভাবেই জোতদাররাও কৃষকদের ওপর শোষণের মাত্রা কমিয়ে দিতো। আবার কৃষকদের ওপর জোতদারদের শোষণ হ্রাস পেলে বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষকরাও কিছুটা বাড়তি সুবিধা পেতো। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পর নতুনভাবে আবির্ভূত জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে সার্বিকভাবে বর্গাদার, ভূমিহীনসহ সকল শ্রেণির সাধারণ কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের পর জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং এই বিতর্কের পরিণতি ছিল ভাষা আন্দোলন। প্রশ্ন হলো ভাষা আন্দোলন তথা উর্দু-বাংলা বিতর্কের সঙ্গে ভূমি বিরোধের রাজনীতির (জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের) সম্পর্ক কি ছিল এবং এর সঙ্গে কৃষকের সম্পৃক্ততা ছিল কিনা? সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে মুসলিম লীগের তৎকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, খাজা নাজিম উদ্দিনসহ উর্দু ভাষার সমর্থকগণ ছিলেন জমিদার অথবা জমিদার শ্রেণির সমর্থক। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের পর তারা মূলত জোতদার শ্রেণিকে সমর্থন করতে শুরু করেন। এমনকি, পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং জোতদার শ্রেণি থেকে উদ্ভূত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও প্রধানত উর্দু ভাষার ব্যবহার করতেন।

অন্যদিকে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ভাষা শহীদ, ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের সদস্য ছিলেন। যেমন ভাষা শহীদ রফিকউদ্দীন আহমদ, আবদুল জব্বার, আবুল বরকত শফিউর রহমান এবং আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অধ্যাপক আবুল কাসেম, অধ্যাপক নূরুল হক ভূইয়া, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, অলি আহাদ, আবদুল ওয়াহেদ, অব্দুল মতিন, আবদুল মালেক, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ প্রায় সকলেই গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন।[১৪৫] এমনকি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেও গ্রামীণ মধ্যবিত্ত কৃষক

[১৪৫] বিস্তারিতভাবে দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, "ভাষা আন্দোলন", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭), পৃ. ৩৩৭-৩৬৫; আহমেদ কামাল, *কালের কল্লোল : ইতিহাস*, *উন্নয়ন ও রাজনীতি* (ঢাকা : সংহতি প্রকাশন, ২০০৮), পৃ. ৬৭-৭০; আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ২৪৮-২৫০; সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৭ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৩২৯-৩৩০।

পরিবারের সদস্য ছিলেন।[১৪৬] উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুই ছিলেন ১৯৪৭-১৯৫০ সময়কালে জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে এবং ১৯৫০-১৯৭১ সময়কালে জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বে কৃষকদের পক্ষে মূল নেতৃত্ব প্রদানকারী নেতা। আরও উল্লেখ্য, ভাষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবার থেকে উঠে এলেও এদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। আহমেদ কামালের মতে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনের সময়ে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের শতকরা ৮৫ জন মানুষ ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন।[১৪৭] এখন প্রশ্ন হলো এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও অক্ষরজ্ঞানহীন জনসাধারণ তথা কৃষকের ঐক্যের সূত্র কী ছিল? সংক্ষেপে এর উত্তরে বলা যায় যে ঢাকার বাইরে গ্রামাঞ্চলে ভাষা আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল যা প্রমাণ করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিভিন্ন মৌলিক সমস্যাগুলোর সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের একটা গভীর ঐক্যসূত্র ইতিপূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদ নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে জাতীয়তাবাদ তৈরিতে কৃষকের সাথে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব উচ্চবর্গের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইতে কৃষকের সাথে ঐক্যের পরিসর তৈরি করেছিল।[১৪৮] আহমেদ কামালের মতে ভাষা আন্দোলনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকের ব্যাপক অংশগ্রহণের প্রশ্নটি অনুসন্ধান করতে হলে উল্লিখিত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার। তিনি বলেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের ক্ষোভের পেছনে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের খাদ্যনীতি, লেভি প্রথা, কৃষিপণ্যের বাজারদর, আমলা ও আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে পুলিশের আচরণ এই আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে সমগ্র পূর্ব বাংলায় খাদ্যাভাবের জন্য কর্ডন প্রথা, লেভি প্রথা কৃষকদের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পুলিশি এবং আমলাদের জুলুম। তিনি একটি হিসেব দিয়ে দেখিয়েছেন যে ১৯৪৮ সালে ৯০ বার, ১৯৫০ সালে ১১০ বার এবং ১৯৫১ সালে ৫০ বার পুলিশ-জনতা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ১৯৪৭ সালের ১৬ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের মদনগঞ্জে প্রায় তিন হাজার মানুষ পুলিশের নিকট হতে কর্ডন আইন ভঙ্গকারী প্রায় ২০০টি নৌকা ছাড়িয়ে নেয়। এভাবে ১৯৪৭ হতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়কালে পুলিশি ও আমলাদের জুলুমের কারণে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাঁর মতে ১৯৫২ সালে জনগণের কাছে আইন-শৃঙ্খলার কাজে নিয়োজিত পুলিশের কর্মকাণ্ড বৈধতা প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল। অন্যদিকে ছিল কৃষি অর্থনীতির বিপর্যস্ত অবস্থা। তিনি তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেন যে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে সর্বোচ্চ ভালোমানের পাটের মূল্য ছিল মণপ্রতি গড়ে ৪০ টাকা, মাঝারি গড়ে ২৮-২৫ টাকা এবং নিম্নমাণের গড়ে ১৫ টাকা। অথচ পূর্বের বছর একই সময়ে সর্বোচ্চ ভালোমানের পাটের মূল্য ছিল মণপ্রতি গড়ে ৬৫ টাকা এবং মাঝারি ৫০ টাকা। অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময় থেকেই পূর্ব বাংলায় পাটের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। অন্যদিকে পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় চাল ১৫ টাকা মণ দরেই বিক্রি হচ্ছিল। সুতরাং পাটের মূল্য হ্রাস পেলেও চালের ক্ষেত্রে পূর্বের মূল্যই বহাল ছিল। তাঁর মতে সরকারের ভ্রান্ত নীতির কারণে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত কৃষকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং এ কারণে কৃষকের মনে হতাশা বিরাজ করছিল। ফলে একদিকে পুলিশের নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং অন্যদিকে কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থা-এই দুইয়ে মিলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাষা আন্দোলনে কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণকে যৌক্তিকতা দান করেছিল।[১৪৯]

---

[১৪৬] ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, Sheikh Hasina (ed.), *Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, 1948-71,* Declassified Documents, Vol. I, 1948-1950 (Dhaka : Hakkani Publishers, 2018), pp. 15-319, শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), পৃ. ২৬-৯১; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১৬৪-১৬৭; ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯।

[১৪৭] কামাল, *কালের কল্লোল*, পৃ. ৬৮।

[১৪৮] কামাল, *কালের কল্লোল*, পৃ. ৬৯।

[১৪৯] কামাল, *কালের কল্লোল*, পৃ. ৬৯-৭০।

তবে ভাষা আন্দোলনে কৃষকদের সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ হিসেবে আহমেদ কামালের বিশ্লেষণ বিবেচনায় নিয়েও বলা যায় যে কৃষকদের অসন্তোষের পেছনে খাদ্যনীতি, লেভি প্রথা, কৃষিপণ্যের বাজারদর বিশেষত পাটের মূল্য পতন, কর্ডন প্রথা, আমলা ও পুলিশের আচরণ সম্পর্কিত বিষয়াদি উঠে এলেও প্রকৃতপক্ষে কৃষকের অসন্তোষের মূল কারণ ছিল ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব যা তাঁর আলোচনায় পরিষ্কারভাবে উঠে আসেনি। বস্তুতপক্ষে ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন বা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পর কৃষকদের প্রত্যাশা ছিল যে আইনটি দ্রুত কার্যকর হলে একদিকে ভূমিস্বত্বের ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং একইসঙ্গে বাড়তি খাজনা ও অন্যান্য বিভিন্ন কর থেকে অব্যাহতি পেয়ে ভূমি সংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিপীড়ন থেকে তারা চিরস্থায়ীভাবে মুক্তি পাবে। কিন্তু কৃষকদের সে প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। কারণ প্রথমত, মুসলিম লীগ সরকার জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করতে দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করে। ১৯৫০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বিলটি আইন পরিষদে গৃহীত হলেও প্রায় একবছর তিন মাস পর অর্থাৎ ১৯৫১ সালের ১৮ মে বিলটি আইনে পরিণত হয়। এতো দেরি হওয়ার প্রধান কারণ ছিল পূর্ব বাংলায় এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রে জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতাসীন ছিল এবং সে সময় (মে, ১৯৫১) পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিলেন পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট জমিদার নেতা স্যার খাজা নাজিম উদ্দিন। এছাড়াও পূর্ব বাংলার জমিদাররা সংগঠিতভাবে আইনটি যাতে কার্যকর হতে না পারে তার জন্য হাইকোর্টে মামলা করেন। ফলে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন কার্যকর হলে কৃষকরা যে শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তি পাওয়ার প্রত্যাশা করেছিল তা পূরণ হয় নি। দ্বিতীয়ত, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পরও সকল ধরনের কৃষি জমির ওপর খাজনা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই আইনের পর সরকার প্রতি একরে ৩.৬০ টাকা করে রাজস্ব নির্ধারণ করে যা পূর্বে আরও কম ছিল।[১৫০] পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের কার্যবিবরণীতে থেকে দেখা যায় যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পরপরই কৃষি জমির ওপর প্রতি একরে ৫০ পয়সা করে খাজনা বৃদ্ধি করা হয়েছিল।[১৫১] সুতরাং জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পর খাজনা বৃদ্ধি হবে না কৃষকদের এমন ধারণাও ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। তৃতীয়ত, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পর কৃষকরা ধারণা করেছিল যে এই আইন প্রণয়নের পর তাদেরকে আর আবওয়াবের মতো বিভিন্ন ধরনের বাড়তি কর দিতে হবে না। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি, হয়েছিল উল্টো। কারণ নতুন ব্যবস্থায় পুরাতন আবওয়াবের মতো বেআইনি আদায়ও পূর্বের মতোই বহাল ছিল। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পরও সরকার ভূমি সংক্রান্ত অনেকগুলি অতিরিক্ত কর যেমন শিক্ষা কর, স্থানীয় কর, উন্নয়ন কর, ত্রাণ কর প্রভৃতি ধার্য করে কৃষকদের নিকট হতে আদায় করার ব্যবস্থা করেছিল।[১৫২] উপরন্তু, ১৯৫১ সালের কৃষি আয়কর আইন প্রণয়ন করে সরকার মোট আয়ের ওপর ট্যাক্স আরোপের ব্যবস্থা করে। কৃষি আয়কর আইনের বিরুদ্ধে আইন পরিষদের সদস্যদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে কৃষকরা জমি-জমা বিক্রি করেও সরকারের খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছিল।[১৫৩] ১৯৫১ সালের ১৩ মার্চ পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে সরকারের উত্থাপিত কৃষি আয়কর বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে কংগ্রেস দলীয় সদস্য জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন যে বিলটি আকারে ছোট হলেও এর কার্যকারিতা ছিল 'এটম বোমের' মতোই মারাত্মক। তিনি বলেন যে সরকার রাস্তা প্রভৃতি কর নেওয়ার পরও এই বিলটিকে আইনে পরিণত করে মোট আয়ের (gross income) ওপর কর বসাবার ব্যবস্থা করে কৃষকের সর্বনাশ করেছে।[১৫৪] ১৯৫৩ সালের ৩ মার্চ পূর্ব বঙ্গীয়

[১৫০] Major General (Rt.) M. A Latif (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Tangail*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1983), p. 109.
[১৫১] *Assembly Proceedings*, Vol. XXXIII, No. 4, 1969, p. 137.
[১৫২] Siddiqui, *District Gazetteers : Rajshahi*, p. 130.
[১৫৩] *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 2, 1951, p. 447; *Assembly Proceedings*, Vol. XV, No. 2, 1956, pp. 132-134.
[১৫৪] *Assembly Proceedings*, Vol. V, No. 2, 1951, p. 447.

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদে ১৯৫৩-৫৪ অর্থ বছরের বাজেট আলোচনাকালে পরিষদের সদস্য হারাণ চন্দ্র ঘোষ চৌধুরী বলেন যে পূর্ববঙ্গে যে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে তা বিগত ২৫ বছরের (১৯২৮-১৯৫৩) মধ্যে দেখা যায়নি। তাঁর মতে পূর্ব বাংলার শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ কৃষক; সুতরাং কৃষকের অবস্থা খারাপ হওয়ার ফলে পূর্ব বাংলার সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছে। তিনি বলেন যে দেশে এক সঙ্কটময় অর্থনৈতিক সমস্যা বিদ্যমান; ভূমিহীন কৃষক এবং যাদের সামান্য কিছু জমির উপর নির্ভর করতে হয় তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়েছে।[১৫৫] চতুর্থত, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পরও কৃষকদের ওপর জমিদার ও জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়ন অব্যাহত ছিল, যদিও ঔপনিবেশিক শাসনামলের তুলনায় তা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু জমিদার ও জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়ন কিছুটা হ্রাস পেলেও কৃষকদের ওপর সরকারি শোষণ ও হয়রানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর মধ্যে মুসলিম লীগ সরকারের লেভি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং তা কার্যকর করার কারণে কৃষকরা প্রচণ্ডভাবে শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়েছিল। পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের কার্যবিবরণীতে থেকে জানা যায় যে মানুষের হাতে হাতকড়া দিয়ে সোয়া সাত টাকা মূল্যে তাদের ধান কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল। লেভির ফলে চারিদিকে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। পরিষদের সদস্যদের বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে জমির পরিমাণের চেয়েও বেশি পরিমাণে লেভি ধার্য করা হয়েছিল। এমনকি, মানুষ নিজের ভিটেমাটি বিক্রি করেও লেভির পাওনা পরিশোধ করতে পারে নি।[১৫৬] এছাড়াও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পর কৃষকরা জমির খাজনা দিতে গিয়েও শোষণ ও হয়রানি স্বীকার হয়েছিল। প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে গ্রামাঞ্চলের মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে খাজনা দিতে তহশিল অফিসে গেলেও তাদের নিকট থেকে তহশিলদার উৎকোচ ব্যতীত জমির খাজনা গ্রহণ করতো না। এর ফলে গ্রামের নিরক্ষর দরিদ্র কৃষকদের শোষণ ও হয়রানির কোনো অন্ত ছিল না। একদিকে তহশিলদাররা কৃষকদের নিকট থেকে ঠিকমতো খাজনা নিতো না এবং অন্যদিকে খাজনা বকেয়ার কারণে তাদের চাষের ভালো জমি গোপনে সার্টিফিকেট জারি করে গোপনেই নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হতো।[১৫৭] সুতরাং ভূমি সংশ্লিষ্ট শোষণ-বঞ্চনার কারণে কৃষকরা সরকার, জমিদার ও জোতদারদের ওপর এমনিতেই হতাশ ও ক্ষুব্ধ ছিল। উপরন্তু, আহমেদ কামালের উল্লেখিত মুসলিম লীগ সরকারের শাসনকালে কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থাসহ আমলা এবং পুলিশের কর্মকাণ্ড-সামগ্রিকভাবে কৃষকদের ওপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। এই নেতিবাচক প্রভাব কৃষকদের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গামী সন্তানদের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। উল্লেখ্য, বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গামী ছাত্রদের অধিকাংশই ছিল সরকারের ওপর গ্রামের এই অসন্তোষ এবং হতাশ ও ক্ষুব্ধ হওয়া কৃষকের সন্তান। আরও উল্লেখ্য যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অনুপ্রেরণায় কৃষকের সন্তানরা তথা ছাত্রদেরই একটি বড় অংশ ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এসব ছাত্ররা পুলিশি নির্যাতন ও হয়রানি স্বীকার হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের অভিভাবক হিসেবে কৃষক পিতারাও ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকেরা ভাষার প্রশ্নের গুরুত্ব যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হলেও ছাত্রদের অভিভাবক হিসেবে তারা এটা স্পষ্টত বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে এই আন্দোলন সফল হলে তারা ভূমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সরকারি ও জোতদারি শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তি পাবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার কৃষকের কাছে ভাষা আন্দোলন ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বেরই একটি অংশ। এ কারণেই সমগ্র পূর্ব বাংলার প্রতিটি শহর ও গ্রামাঞ্চলে ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এর ফলস্বরূপ ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। অর্থাৎ বলা যায় যে ১৯৫২

---

[১৫৫] *Assembly Proceedings*, Vol. X, No. 1, 1953, pp. 122-124.

[১৫৬] *Assembly Proceedings*, Vol. III, No. 3, 1949, pp. 315-326.

[১৫৭] *Assembly Proceedings*, Vol. XVIII, No. 3, 1958, pp. 13-14; *Assembly Proceedings*, Vol. XXI, No. 2, 1962, pp. 214-215; *Assembly Proceedings*, Vol. XXXII, No. 6, 1967, p. 34.

সালের ভাষা আন্দোলনে সামগ্রিকভাবে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তথা কৃষকরা প্রধানত ভূ-অর্থনৈতিক অসন্তোষ ও হতাশা এবং শোষণ ও হয়রানির কারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল অথবা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। সুতরাং পূর্ব বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

৫.৪.৪ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও কৃষক সমাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি

১৯৫৪ সালে ২১ বছর বয়স্ক সকল নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিক ভোটাধিকার লাভ করায় পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তথা কৃষকের গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভূমি বিরোধের রাজনীতিতে এর গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই নির্বাচনে ভোটাধিকারপ্রাপ্ত মোট জনসংখ্যার তুলনায় কৃষকদের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নির্বাচনের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল কৃষক শ্রেণি।[১৫৮] কারণ বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে কৃষকরাই ছিল পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যার ৮৫%।[১৫৯] এই নির্বাচনে ১৬টি রাজনৈতিক দল দলীয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ এবং জোতদার ও কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্টের[১৬০] মধ্যে। যুক্তফ্রন্টের সাথে জোতদার সমর্থক ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি ও ইসলামপন্থী দল নেজামে ইসলাম থাকলেও জনসাধারণ তথা কৃষকের নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী মুসলিম লীগই ছিল নির্বাচনে মুসলিম লীগের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্ট, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, গণতন্ত্রী দল, পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল, কংগ্রেস ও পূর্ববঙ্গ তফসিলি জাতি ফেডারেশন (রসরাজ মণ্ডল গ্রুপ) নির্বাচনী ইশতেহার প্রদান করে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইস্যুসহ বিভিন্ন ধরনের বিষয় প্রাধান্য পেলেও ভূমি ও কৃষকের অর্থনৈতিক বিষয় গুরুত্ব পায়নি। যেমন গণতন্ত্রী দলের নির্বাচনী ইশতেহারে রাজনৈতিক বিষয় ভিন্ন ভূমি ও কৃষকের অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। কংগ্রেস দলের নির্বাচনী ইশতেহারেও ভূমি ও কৃষকের অর্থনৈতিক বিষয়ে কোনো বক্তব্য ছিল না। তফসিলি জাতি ফেডারেশনের (রসরাজ মণ্ডল গ্রুপ) নির্বাচনী ইশতেহারেও উক্ত বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য তুলে ধরা হয়নি। এমনকি, মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও ভূমি ও কৃষকের অর্থনৈতিক বিষয় বিশেষ করে কৃষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো ধরনের বক্তব্য বা প্রতিশ্রুতি ছিল না। খেলাফতে রব্বানী পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে অবশ্য কৃষকদের স্বার্থে পাটসহ সমস্ত একচেটিয়া ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, বিনা খেসারতে সমস্ত কর আদায়, ভূমি স্বত্বের বিলোপ সাধন, সর্বোচ্চ উৎপাদন এবং ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রকৃত চাষীদের মধ্যে জমি বণ্টন, লবণ, তামাক, সুপারি ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য ও খাদ্যশস্যের কর বাতিল করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। অবশ্য খেলাফতে রব্বানী পার্টি যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে একত্রিত হয়ে নির্বাচনী মোর্চা গঠন না করলেও বাইরে থেকেই দলটি যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করেছিল। খেলাফতে রব্বানী পার্টির নির্বাচনী প্রচারের মূল সুর ছিল মুসলিম লীগ বিরোধী। একমাত্র পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ৪২ দফা নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে অধিকাংশ ছিল ভূমি ও কৃষক সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক বিষয়াদি এবং বিশেষত কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি। আওয়ামী লীগের এই ৪২ দফা কর্মসূচিতে কৃষকদের স্বার্থে বিনা খেসারতে জমিদারি দখলের জন্য জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের আমূল পরিবর্তন, পাট ও চা শিল্পের জাতীয়করণ, কুটির শিল্পের উৎসাহদানসহ নানা ধরনের

[১৫৮] হোসেন ও করিম, *"১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার"*, পৃ. ৬৯।

[১৫৯] Rahim, *Politics and National Formation in Bangladesh*, p. 227.

[১৬০] যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম-এই ৩টি দলের সমন্বয়ে। দেখুন, হোসেন ও করিম, *"১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার"*, পৃ. ৪৯।

প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রধানত জনসাধারণ তথা কৃষকের চাহিদা এবং দাবি-দাওয়া তুলে ধরা হয়। নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে গঠিত যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের অনুরূপ। প্রধানত সমাজের বৃহত্তর শ্রেণি কৃষকের ভোটের প্রতি লক্ষ রেখে আওয়ামী লীগের ৪২ দফা কর্মসূচির প্রধান প্রধান ধারা নিয়ে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার ২১ দফা কর্মসূচি রচিত হয়। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষককে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হলে কৃষকদের স্বার্থে নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে : (১) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে, উচ্চ হারের খাজনা হ্রাস করা হবে এবং সার্টিফিকেট যোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হবে। (২) পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ব বাংলা সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এনে পাট চাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেংকারী তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে ও তাদের অসুদপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। (৩) কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে এবং সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্ত শিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে। (৪) পূর্ব বাংলাকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎশিল্পের লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণ কেলেংকারী সম্পর্কে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে ও তাদের অসুদপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। (৫) খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে। (৬) পূর্ব বাংলাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করে ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হবে। (৭) দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান দু'টি দলের তথা মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষক তথা সাধারণ জনগণের দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত হয়েছিল। মুসলিম লীগ প্রধানত ধর্মকে ব্যবহার করে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করেছিল। তাই মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে পূর্ব বাংলার কৃষকরা আকৃষ্ট না হয়ে বরং তারা আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং তাদের অনুভূতি দলটির বিপক্ষে চলে যায়। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার ২১ দফা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ছাত্র-শিক্ষক, নিম্ন বিত্ত, শ্রমিক এবং ডানপন্থী ও বামপন্থীদের পাশাপাশি জনসাধারণ তথা কৃষকরা দীর্ঘদিন শোষণ ও নিপীড়ন হতে যে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল সেই প্রত্যাশিত স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটেছিল যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচিতে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার ২১ দফা কর্মসূচির বিষয়বস্তু পূর্ব বাংলার কৃষক তথা সাধারণ জনগণের জন্য ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী। পূর্ব বাংলার কৃষক তথা সাধারণ জনগণ মুসলিম লীগ সরকারের দীর্ঘ দিনের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, খাজনা আদায়ে সার্টিফিকেট মামলাসহ ভূমি সংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিপীড়নের কবল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহার প্রত্যাখ্যান এবং যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারের ২১ দফা কর্মসূচিকে গ্রহণ করে।[১৬১] এর ফলস্বরূপ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয় এবং যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৯০ শতাংশ নির্বাচকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে।[১৬২]

---

[১৬১] বিস্তারিতভাবে দেখুন, হোসেন ও করিম, *"১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার"*, পৃ. ৫০-৬৮।

[১৬২] আহমদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৮।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন সভার ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে (সারণি ২৯)।[১৬৩] সারণি ২৯ থেকে স্পষ্টত যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী মূল দু'টি দলের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি বা ৯৪.০৯% আসন এবং মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি বা ৪.২২% আসন লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফলের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীসহ প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার ৭ জন সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ বিপুল ভোটের ব্যবধানে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের নিকট পরাজিত হন, এমনকি অনেকের জামানতও বাজেয়াপ্ত হয় (সারণি ৩০)।[১৬৪] মুসলিম লীগ এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার কৃষক তথা জনগণ কর্তৃক এমনভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় যে পরবর্তীকালে জনসমর্থন লাভ করা মুসলিম লীগের পক্ষে আর কখনোই সম্ভব হয়নি বরং বহুধা বিভক্ত হয়ে দলটি নাম-সর্বস্ব দলে পরিণত হয়।[১৬৫] প্রশ্ন হলো নির্বাচনে মুসলিম লীগের এমন পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়ের কারণ কী ছিল এবং এই নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের সম্পর্ক কী ছিল? এর উত্তরে বলা যায় যে নানাবিধ কারণে নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে ও যুক্তফ্রন্টের বিজয় অর্জিত হয়।[১৬৬] নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নূরুল আমিন তাঁর দলের পরাজয় সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'পূর্ববঙ্গের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি।' এমনকি ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পরদিন যে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা মন্তব্য করেছিল, 'নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু হয়েছে'। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সেই একই পত্রিকার প্রতিক্রিয়া ছিল, "যে সব কর্ম্মচারী তাঁদের সুমহান দায়িত্ব পালন করেন নাই কিম্বা ইচ্ছা করিয়া অন্যায় এবং পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণ করিয়াছেন তাঁদের প্রতি কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"[১৬৭] নূরুল আমিন সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর স্বয়ং সরকার প্রধানের এরূপ মন্তব্য এবং সরকার সমর্থক *আজাদ পত্রিকা'র* এমন প্রতিক্রিয়া কতটুকু যথার্থ তা সহজেই অনুমেয়। আহমেদ কামাল মন্তব্য করেন, "Muslim League leaders have produced their own explanations of the defeat of 1954. In a post-election assessment, some League members 'doubted the purity of [the] conditions under which [the] election had taken place' - a rather unconvincing argument as the League itself was the ruling party at the time of the elections. Accusations of sluggishness, incompetence and dishonesty are levelled against other League members in their analysis."[168] আহমেদ কামাল তাঁর *State Against the Nation : The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-54* গ্রন্থে বদরুদ্দীন উমর, রওনক জাহান, খালিদ বিন সাঈদ, লরেন্স জিরিং, রিচার্ড এল. পার্কসহ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের অভিমতের ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের বিজয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও তিনি পার্কের অভিমতের আলোকে বলেন যে মুসলিম লীগ সরকারের শাসনামলে পাটের মূল্য পতনও নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং মুসলিম লীগের পরাজয়ে প্রভাব পড়েছিল।[১৬৯] রেহমান সোবহানের মতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে

---

[১৬৩] হোসেন ও করিম, "*১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার*", পৃ. ৭২।

[১৬৪] হোসেন ও করিম, "*১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার*", পৃ. ৭৪।

[১৬৫] হোসেন ও করিম, "*১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার*", পৃ. ৮৩।

[১৬৬] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Kamal, *State Against the Nation*, pp. 3-203; হোসেন ও করিম, "*১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার*", পৃ. ৭৫-৮৩।

[১৬৭] বিস্তারিতভাবে দেখুন, হোসেন ও করিম, "*১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার*", পৃ. ৮২; *দৈনিক আজাদ*, ১১ ও ১৪ মার্চ, ১৯৫৪।

[১৬৮] Kamal, *State Against the Nation*, p. 4.

[১৬৯] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Kamal, *State Against the Nation*, pp. 4-8.

যুক্তফ্রন্টের জয় স্পষ্টতই ২১ দফা কর্মসূচির এজেন্ডা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।[১৭০] নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের বিজয় সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে মন্তব্য করেন যে জনগণকে ইসলাম এবং মুসলমানের নামে স্লোগান দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যায় না। জনসাধারণ চায় শোষণহীন সমাজ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি। একুশ দফা দাবি জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য পেশ করা হয়েছিল এবং তারা তা বুঝতেও পেরেছিল। আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সাল থেকে এর অনেকগুলো দাবি প্রচার করেছিল।[১৭১]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্তব্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন হলো নবগঠিত আওয়ামী লীগ এতো স্বল্প সময়ে কিভাবে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে তাঁর কি ভূমিকা ছিল? সংক্ষেপে এর উত্তরে বলা যায় যে বিশ শতকের শুরুতে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে গঠিত জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ বিশ শতকের বিশের দশকে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন অনুযায়ী জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটের রাজনীতির কারণে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে আসে এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পূর্বে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদসহ কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় নানা প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একদিকে মুসলিম লীগের রক্ষণশীল অংশ সংগঠনে বা দলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং অন্যদিকে দলের প্রগতিশীল অংশ দল থেকে ছিটকে পড়ে। দলে রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত ছিলেন খাজা নাজিম উদ্দিন, মাওলানা আকরাম খাঁন, নুরুল আমিন ও ফজলুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রক্ষণশীলরা জমিদার এবং কিছু ক্ষেত্রে জোতদারদেরও স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জিন্নাহ একাধারে গভর্নর জেনারেল, গণপরিষদের সভাপতি ও পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি হন এবং তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তি লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সরিয়ে নতুন প্রধানমন্ত্রী করা হয় বিশিষ্ট জমিদার পরিবারের সদস্য খাজা নাজিম উদ্দিনকে। অন্যদিকে মুসলিম লীগে প্রগতিশীল হিসেবে পরিচিত ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আহমদ হোসেন, মাওলানা রাগিব আহসান, আবুল মনসুর আহমেদ, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দিন আহমেদ ও মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিয়া) এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, নুরুদ্দিন আহমেদ, শামসুল হক এবং অলি আহাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এক সময়ের মুসলিম লীগের এই গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান যারা ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম লীগের হয়ে কাজ করেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ও ক্ষমতার আধার হয়ে উঠে আহসান মঞ্জিল, যেখানে এসব নেতার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এছাড়াও *দৈনিক আজাদ* ও ইস্পাহানী কোম্পানিতেও তাদের প্রবেশ সংরক্ষিত হয়ে যায়।[১৭২] আহমেদ কামাল বলেন, “Essentially, the Muslim League remained mortgaged to three centres; to Ahsan Manzil, for its leadership, to the owner of the daily Azad for its publicity and to the commercial house of the Ispahanis for its finance.”[173] পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দই যেখানে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে যেতে পারেননি সেখানে কৃষক এবং কৃষকদের প্রতিনিধিদের প্রবেশ আশা করা যায় না। এমনকি পূর্ববাংলার কমিউনিস্টপন্থী নেতৃবৃন্দও

---

[১৭০] সোবহান, *উতল রোমন্থন*, পৃ. ২৪৭-২৪৯।
[১৭১] রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৫৮।
[১৭২] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Kamal, *State Against the Nation*, pp. 20-26; Zillur R Khan, *The Third World Charismat : Sheikh Mujib and the Struggle for Freedom* (Dhaka : The University Press Limited, 1996), p. 26.
[১৭৩] Kamal, *State Against the Nation*, p. 22.

যারা একসময় মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারাও লীগের কর্মকাণ্ডে বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেন।[১৭৪]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ কার্যত রক্ষণশীল ও কট্টরপন্থীদের হাতে বন্দি হয়ে যায়। এরপর দলের প্রগতিশীল অংশ নীতি নির্ধারণী ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শেষ পর্যন্ত দল থেকে বহিস্কৃত হন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার জনস্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হলে শোষণ ও নিপীড়নহীন সমাজ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'পূর্ব পাকিস্তান জনগণের মুসলিম লীগ' বা 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগ দল গঠিত হয়। সূচনায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক হন শামসুল হক এবং প্রথম যুগ্ম সম্পাদক হন কারাবন্দি অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান।[১৭৫] পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কৃষক তথা সাধারণ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি, শোষণ ও নিপীড়নহীন সমাজ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল তাতে শেখ মুজিব ছাড়াও নতুন প্রতিষ্ঠিত দলের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকসহ দলের অন্য নেতৃবৃন্দেরও অসামান্য অবদান ছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিব। এমনকি পরবর্তীকালেও তিনি কৃষক তথা জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন, শোষণ ও নিপীড়নহীন কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যান। অবশ্য এর জন্য তিনি জেল-জুলুম ও নির্যাতনেরও স্বীকার হয়েছিলেন। আর এভাবেই তিনি পূর্ব বাংলার জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শেখ মুজিব ও তাঁর দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৪৯ সাল থেকেই যে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করেছিল তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীর বিভিন্ন রিপোর্টে। এমনকি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের ভূমিস্বত্ব ও খাজনাসহ শোষণ ও নিপীড়ন হতে অব্যাহতিসহ ভূমিসংশ্লিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন, শোষণ ও নিপীড়নহীন সমাজ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় উক্ত রিপোর্টে। গোয়েন্দা বাহিনীর একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৯৪৮ সালের ১৩ জানুয়ারি ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের কর্মীরা তিন টাকা মূল্যের যে বুকলেট ও লিফলেট বিতরণ ও প্রচার করেছিল তার প্রকাশক ছিলেন স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিব কর্তৃক প্রকাশিত একটি বুকলেটে বলা হয়, "পূর্ব্ব-পাকিস্তানে দুর্ভাগা জনসাধারণ কৈফিয়ত দিতে হবে আমাদের দাবী।"[১৭৬] গোয়েন্দা বাহিনীর অপর এক রিপোর্টে ১৯৪৮ সালের ১ জুন নরসিংদী ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বিরোধী গ্রুপের আহূত সভায় কৃষক তথা জনসাধারণের পক্ষে এবং জমিদার ও জমিদারির বিপক্ষে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া বক্তব্য সম্পর্কে বলা হয়, "Sheikh Mujibur Rahman spoke on the abolition of Zamindary system, taxes on poor people, education, corruption, ill payment of lower officers etc. Mujibur Rahman gave particular stress on the abolition of Zamindari system without compensation."[177] ১৯৪৮ সালের ১২ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

---

[১৭৪] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Kamal, *State Against the Nation,* pp. 20-26.
[১৭৫] Hasina, *Secret Documents of Intelligence Branch,* p. 201; রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১২১; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১৭২-১৭৩।
[১৭৬] Hasina, *Secret Documents of Intelligence Branch,* p. 4.
[১৭৭] Hasina, *Secret Documents of Intelligence Branch,* p. 24.

দিবসে ছাত্র সম্প্রদায়ের কর্তব্য সম্পর্কে বিশিষ্ট লীগ কর্মী শেখ মুজিবুর রহমান যে বিবৃতি দেন তা ১৯৪৮ সালের ১৩ আগস্ট *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে তিনি বলেন,

> ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমরা যে 'আজাদী' লাভ করিয়াছি, সেটা যে গণ আজাদী নয়, তা' গত একটী বছরে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। 'জাতীয় মন্ত্রিসভা' দীর্ঘ একটি বছরে জনগণের দুইশ' বছরের পূঞ্জীভূত দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের কোন চেষ্টা ত করেনেই নাই, বরঞ্চ সেই বোঝার উপর অসংখ্য শাকের আটি চাপাইয়াছেন। ভুখা, বিবস্ত্র, জরাগ্রস্ত ও শত অভাবের ভারে ন্যুব্জ জনসাধারণের ভাত, কাপড়, ঔষুধ পত্র ও অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের কোন ব্যবস্থা তাঁরা করেন নাই; বরঞ্চ পাট, তামাক, শুপারী ইত্যাদির উপর নয়া ট্যাক্স বসাইয়া ও বিক্রয়-কর বৃদ্ধি করিয়া জনগণের দৈনন্দিন জীবন দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিয়াছেন। বিনা খেসারতে জমিদারী বিলোপের ওয়াদা খেলাফ করিয়া তাঁরা জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদিগকে পঞ্চাশ ষাট কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। নুতন জরীপের নাম করিয়া তাঁরা জমিদারী প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ আট বছর স্থগিত রাখার ষড়যন্ত্র করিতেছেন।[১৭৮]

১৯৪৯ সালের ১০ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ সরকারের নিকট যে রিপোর্ট প্রদান করেন সেখানে শেখ মুজিবের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়, "A note on political activities of Sheikh Mujibur Rahman on Language Movement, food & cloth problems, abolition of Zamindary System, paddy reapers' demand, introduction of free primary education, strike of menials & students of Dacca University etc."[179] এই রিপোর্টে তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সম্পাদক ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক উল্লেখপূর্বক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৪৯ সালের ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ১৯টি পয়েন্ট তুলে ধরা হয়।[১৮০] এর মধ্যে ৪ নং পয়েন্টে উল্লেখ করা হয়, "He addressed a series of meetings in the districts of East Bengal and severely criticised the present Ministry for failing to tackle the food and cloth problems and demanded abolition of Zamindari System without compensation."[181]

১৯৫০ সালের ১২ অক্টোবর ঢাকার আরমানিটোলায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের জনসভায় ১৪ দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে বিনা খেসারতে জমিদারি বিলুপ্তি, পাটের ন্যূনতম মূল্য ৪০-৫০ টাকা নির্ধারণ, শিক্ষা সংস্কার ও বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৮২] সুতরাং শেখ মুজিব যথার্থভাবেই বলেছিলেন যে পূর্ব বাংলার জনগণ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড বিবেচনা করেই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যানপূর্বক যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছিল। উপরের উল্লেখিত সকল বক্তব্য ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কর্মকাণ্ড থেকে প্রমাণিত হয় যে পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যার ৮০% মানুষ তথা কৃষকরা ভূমি কেন্দ্রিক দীর্ঘকালীন সমস্যা থেকে মুক্তির আশায়ই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী করেছিল। বস্তুতপক্ষে, পূর্ব বাংলার কৃষকরা ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন এবং রাজনৈতিক বিষয়ে যতটা না সচেতন ছিল, তার থেকেও তাদের কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ভূমি কেন্দ্রিক বিষয়াদি বিশেষত ভূমির মালিকানাস্বত্ব, চাষের জমির সংকট, ধার্যকৃত বর্ধিত খাজনা ও অন্যান্য কর প্রদানের অক্ষমতা, সার্টিফিকেট মামলায় জেল-জুলুম, কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, পাটসহ অর্থকরী ফসলের মূল্য হ্রাস এবং জমিদার ও জোতদার কর্তৃক শোষণ ও

---

[১৭৮] Hasina, *Secret Documents of Intelligence Branch*, p. 44; *দৈনিক ইত্তেহাদ*, ১৩ আগস্ট, ১৯৪৮।

[১৭৯] Hasina, *Secret Documents of Intelligence Branch*, p. 318.

[১৮০] Hasina, *Secret Documents of Intelligence Branch*, pp. 318-321.

[১৮১] Hasina, *Secret Documents of Intelligence Branch*, p. 319.

[১৮২] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Hasina, *Secret Documents of Intelligence Branch*, pp. 516-519.

নিপীড়নের প্রতি। পূর্ব বাংলার কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে যে শোষণ ও নিপীড়নহীন সমাজ, জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন এবং অর্থ-সামাজিক উন্নতির স্বপ্ন দেখেছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ সরকারের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে হতাশ হয়ে কৃষকেরা নিজেদের প্রত্যাশা পূরণের অভিলাষে শেখ মুজিব ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগকে সমর্থন করেছিল বলেই যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিল। সুতরাং নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল ভূমি কেন্দ্রিক সমস্যা তথা ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের ফল। তবে নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার মূলত কৃষক শ্রমিক পার্টির অপরাজনীতি ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের কারণে পূর্ব বাংলার ভূমি কেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান তথা কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে ঘন ঘন সরকার বদল হতে থাকে। মাত্র চার বছরে সাত বার মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং তিন বার গভর্নরের শাসন জারি হয়।[১৮৩] তারপরও ভোটের রাজনীতির কারণেই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে জমিদার ও জোতদার শ্রেণির প্রভাব কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছিল এবং কৃষকরা পূর্বের চেয়ে কিছুটা হলেও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

৫.৪.৫ ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও কৃষক সমাজের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের প্রধান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ২১ বছরের প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার অর্জন, জনসংখ্যানুপাতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধি নির্ধারণ এবং যুক্ত নির্বাচন। নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার অর্জনে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকরা হয়ে উঠেছিল নির্বাচনী বিজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি। এ কারণে কৃষকরা তাদের দীর্ঘদিনের ভূমি সংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তিলাভ ও ভূমির ওপর নিজেদের চূড়ান্ত অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ফলে এই নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী।

প্রশ্ন হলো ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে জনসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ এবং যুক্ত নির্বাচন প্রবর্তনের সঙ্গে ভূমি বিরোধের রাজনীতির কী সম্পর্ক ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের পর ১৯৫৬ সালে বহু প্রত্যাশিত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদে সংবিধান বিল পাশ হয় এবং গভর্নর জেনারেলের সম্মতির পর ১৯৫৬ সালের ২৩ জুন হতে সংবিধান কার্যকর হয়।[১৮৪] প্রধানত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়। তারপরও দীর্ঘদিন পর রাজনৈতিক বিবেচনায় আইনসভা ও সামরিক বিভাগসমূহে সংখ্যাসাম্য প্রবর্তন, যুক্ত নির্বাচন, পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটে[১৮৫] পরিণত করা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার শর্তে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আপতত সমঝোতায় পৌঁছায় এবং এর ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সংবিধান প্রণীত হয়।[১৮৬] পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ মূলত পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্ব হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও সংখ্যাসাম্য মেনে নেয়। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার

---

[১৮৩] বিস্তারিতভাবে দেখুন, হোসেন ও করিম, *"১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার"*, পৃ. ৮৩।
[১৮৪] রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৪৩।
[১৮৫] সংখ্যাসাম্য নীতি অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সমপর্যায়ে আনার লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি ইউনিট হিসেবে গণ্য করা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে (পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান) একত্রিত করে অনুরূপ একটি ইউনিটে পরিণত করা হয়।
[১৮৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ নভেম্বর, ১৯৫৭।

ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হয়েও সংখ্যাসাম্য নীতির কারণে জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেও পাকিস্তানে প্রাধান্য বিস্তারে ব্যর্থ হয় (সারণি ৪৩)।[১৮৭] তবে জাতীয় স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ সংখ্যাসাম্য মেনে নিলেও সংবিধান কার্যকর হওয়ার পরবর্তীকালে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ যুক্ত নির্বাচন, পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটে পরিণত করা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মেনে নিতে অস্বীকার করেন। সংবিধান কার্যকর হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সংখ্যাসাম্য নীতি সম্পর্কিত সংবিধানে উল্লেখিত বিষয়ে বিরূপ মন্তব্যের কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫৬ সালের ২৫ জুন সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয় যে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী সীমা নির্ধারণ কমিশন গঠন করা হয়েছে। গেজেট প্রকাশ করে বলা হয় যে সরকার যথাসম্ভব শীঘ্র সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে আগ্রহী।[১৮৮] সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত গেজেট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন নিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই বিতর্কের সমান্তরালে পূর্ব পাকিস্তানেও জাতীয় পরিষদের সংখ্যাসাম্য বিষয়ে সমালোচনার ঝড় উঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালের ৪ আগস্ট পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ১২২-১০ ভোটে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৮৯] ১৯৫৬ সালের ৭ আগস্ট পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে দেশব্যাপী প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।[১৯০] নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির মধ্যেই ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেন যে পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমন্বয় করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে পৃথক নির্বাচনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালের ১ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদে ১৫৯-১ ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে যুক্ত নির্বাচন প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৯১] এই বিল গৃহীত হওয়ার পর তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত নেতা ও সরকারের বন মন্ত্রী শ্রী গৌরচন্দ্র বালা তফসিলি সম্প্রদায়ের এক সভায় উল্লেখ করেন যে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির ফলে দেশে রাজনৈতিক ঐক্য সাধিত হবে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।[১৯২] ১৯৫৬ সালের ৯ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করেন যে কোয়ালিশন সরকারের দুই অংশ আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান দলের বৈঠকে স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আরও বলেন, "আমরা একই রাষ্ট্রভুক্ত হইলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভিন্ন নির্বাচন নীতি গ্রহণ করা হইলে কোনো ক্ষতি নাই।" অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির সমন্বয়ে গঠিত কোয়ালিশন সরকার যুক্ত নির্বাচন বিষয়ে একটি আপোষ-মীমাংসা করে। কোয়ালিশন সরকারের দু'দল পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন বিনা শর্তে সমর্থন করে।[১৯৩] উভয় দলের সম্মতির ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালের ১২ অক্টোবর জাতীয় পরিষদে ৪৮-১৯ ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন পরিচালনার নীতি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি গৃহীত হয় এবং তা আইনে পরিণত হয়।[১৯৪] কিন্তু ১৯৫৬ সালের সংবিধানের নির্বাচনী আইনের

[১৮৭] *Census of Pakistan Population, 1951,* East Bengal, Vol. 3, (Karachi : Government of Pakistan, 1952), p. 6-2; *Census of Pakistan Population, 1961,* Vol. I, Pakistan (Karachi : Ministry of Home and Kashmir Affairs, 1964), p. II-24.

[১৮৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ জুন, ১৯৫৬।

[১৮৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ আগস্ট, ১৯৫৬।

[১৯০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ আগস্ট, ১৯৫৬।

[১৯১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ অক্টোবর, ১৯৫৬।

[১৯২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ অক্টোবর, ১৯৫৭।

[১৯৩] *লোক সেবক*, ১১ অক্টোবর, ১৯৫৬।

[১৯৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ অক্টোবর, ১৯৫৬; *লোক সেবক*, ১৫ অক্টোবর, ১৯৫৬।

সংশোধনপূর্বক ১৯৫৭ সালের ২৪ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দীর শাসনামলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে দেশের উভয় অংশেই যুক্ত নির্বাচন প্রবর্তনে একটি বিল গৃহীত হয়ে তা আইনে পরিণত হয়। এই আইনে বলা হয় যে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান হতে সাধারণ আসনে ১৫০টি আসন ও মহিলাদের জন্য ৫টি সংরক্ষিত আসন থাকবে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সাধারণ আসনে ১৪০টি আসন, মহিলাদের জন্য ৫টি সংরক্ষিত আসন এবং বিশেষ ১০টি আসন থাকবে। উক্ত আইনে আরও বলা হয় যে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে সাধারণ আসনে ৩০০ জন সদস্য ও মহিলাদের জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত থাকবে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে সাধারণ আসনে ২৭০ জন সদস্য, মহিলাদের জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং বিশেষ অঞ্চলসমূহের জন্য ৩০টি আসন থাকবে।[১৯৫] অর্থাৎ এই আইনেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাসাম্য নীতি বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের স্থলে জাতীয় ঐক্য ও বৃহত্তর স্বার্থে সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে নেয়, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ জাতীয় পরিষদে সংখ্যাসাম্য নীতি বহাল রেখে পৃথক নির্বাচন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিটের স্থলে পূর্বের ন্যায় একাধিক ইউনিট অর্থাৎ ৪টি প্রদেশ (পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান) পুনর্বহাল করতে সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৭ সালের ৬ অক্টোবর লাহোরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "একদিন যাঁরা এক ইউনিটের যুক্ত রচয়িতা ছিলেন, আজ সেই মুসলিম লীগ ও রিপাবলিকানরাই রাতারাতি ভোল পাল্টে তা ভেঙ্গে দেওয়ার পাঁয়তারা করছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রভুত্বলাভের দ্বন্দ্ব সমগ্র পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি গুরুতররূপে বিপন্ন করে তুলছে।"[১৯৬] ১৯৫৭ সালের ৭ অক্টোবর করাচীতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ঘোষণা করেন যে বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আগামী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বহাল থাকবে। তিনি আরও জানান যে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে 'যে কোনো অবস্থাতেই' তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। একই দিনে করাচীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে বলেন যে এক ইউনিটের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাসাম্য নীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু যদি সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেই পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করা হয় তাহলে পূর্ব পাকিস্তানও ন্যায়সঙ্গতভাবেই সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য নীতির বদলে জনসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্বের দাবি জানাবে।[১৯৭]

এক ইউনিট বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ ১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগে পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হবে মন্তব্য করে লন্ডনের বিখ্যাত *দ্য টাইমস*-এ বলা হয় যে সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগ বিশ্বে আরও একটি অস্থিতিশীল এলাকা সৃষ্টি হলো। বস্তুতপক্ষে, রিপাবলিকান ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আঁতাতই ছিল তাঁর পদত্যাগের কারণ। উল্লেখ্য, সোহরাওয়ার্দী এক ইউনিটের ভিত্তিতে (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে দু'টি ইউনিট হিসেবে গণ্য করে) পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে ন্যাপ-রিপাবলিকান পার্টি পূর্ব পাকিস্তানকে এক ইউনিট ধরে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিলপূর্বক সাবেক ৪টি প্রদেশ (পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান) পুনর্বহাল করে পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষপাতী ছিল। এর ফলে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের দু'টি অংশের

---

[১৯৫] *লোক সেবক*, ২৫ এপ্রিল, ১৯৫৭।
[১৯৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ অক্টোবর, ১৯৫৭।
[১৯৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ অক্টোবর, ১৯৫৭।

একটি না হয়ে পাঁচটি অংশের একটিতে পরিণত হতো।[১৯৮] **১৯৫৭** সালের **১৭** অক্টোবর মুসলিম লীগ নেতা ইব্রাহীম ইসমাইল চুন্দ্রীগড় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেই পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরের মোচিগেটে প্রথম জনসভায় ঘোষণা করেন যে তাঁর সরকার দেশে পৃথক নির্বাচন প্রবর্তন এবং ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।[১৯৯] প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় সোহরাওয়ার্দী প্রতিবাদ করেন যে যদি জোরপূর্বক স্বতন্ত্র নির্বাচন চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানও সংখ্যাসাম্য নীতি বর্জন করে জাতীয় পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবি করবে।[২০০] **১৯৫৭** সালের **২১** অক্টোবর নেজামে ইসলামীর নেতা মাওলানা আতাহার আলীর 'সংখ্যাসাম্যের সঙ্গে নির্বাচন পদ্ধতির কোনোরূপ সম্পর্ক নেই'-বিবৃতির বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. খালেক (এম.পি) বলেন যে এক ইউনিট, যুক্ত নির্বাচন ও সংখ্যাসাম্য পরস্পর নির্ভরশীল ও অচ্ছেদ্য। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতায় স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে যদি নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্ন পুনরায় আলোচনা শুরু হয়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানবাসী সংখ্যাসাম্য বাতিল করার দাবি উত্থাপন করবে। যদি জবরদস্তিমূলকভাবে পূর্ব পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানবাসী জাতীয় পরিষদে এবং সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগে-দফতরে অর্থাৎ সর্বত্র জনসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব দাবি করবে।[২০১] শেখ মুজিব পৃথক নির্বাচনের বিভেদমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধে **১৯৫৭** সালের ৮ নভেম্বর দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালনের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীও ঘোষণা করেন যে জনগণের দাবি অনুসারে তিনি যুক্ত নির্বাচনের সপক্ষে অভিযান শুরু করবেন।[২০২] জাতীয় পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা বসন্ত কুমার দাস এক বিবৃতিতে জানান, 'আমি বরাবরের ন্যায় এখনও যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিকে সমর্থন করি'।[২০৩] পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুস্পষ্টভাবে পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও ১৯৫৭ সালের ২৪ অক্টোবর চুন্দ্রীগড়ের সরকার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার বাসভবনে এক বৈঠকে পৃথক নির্বাচন নীতি গ্রহণ করেন এবং পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির ভিত্তিতে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২০৪] কেন্দ্রীয় সরকার পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনের জন্য সম্প্রদায় ভিত্তিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত নতুন বিধি-রীতি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পৃথক নির্বাচন নীতি গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম. এম. খান সরকারকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তিত হলে নির্ধারিত সময়ে (১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে) নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে না। নির্বাচন কমিশনের মতে জাতীয় পরিষদে প্রয়োজনীয় আইন পাশ বা সরকার ভোটার তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত বিধি সংশোধন না করা পর্যন্ত কমিশন নির্বাচনের নতুন সময় নির্ধারণ করতে পারবে না। নির্বাচন কমিশন সরকারকে আরও জানায় যে মৌখিক অনুরোধ বা লিখিত নির্দেশেই পৃথক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কমিশন ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করতে পারেন না। এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে অথবা সরকারকে ভোটার তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত বিধি সংশোধন করতে হবে। এমনকি, নির্বাচন কমিশন সরকারকে এও জানিয়ে দেয় যে জাতীয় পরিষদে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিও সংশোধন করতে পারে না। অন্যদিকে নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণ কমিশনের চেয়ারম্যান তৎকালীন পাকিস্তান

---

[১৯৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ অক্টোবর, ১৯৫৭।
[১৯৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ অক্টোবর, ১৯৫৭।
[২০০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ অক্টোবর, ১৯৫৭।
[২০১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ অক্টোবর, ১৯৫৭।
[২০২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ অক্টোবর, ১৯৫৭।
[২০৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ নভেম্বর, ১৯৫৭।
[২০৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ অক্টোবর, ১৯৫৭।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ মুনীর সরকারকে জানিয়ে দেন যে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তিত হলে কতো দিনে সীমানা নির্ধারণের কাজ শেষ হবে তা কমিশন বলতে পারেন না। কারণ সকল অমুসলমান একসঙ্গে নাকি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পৃথকভাবে ভোট দিবে তা কমিশনকে জানতে হবে। তাঁর মতে কেবল জাতীয় পরিষদই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এরপরও প্রধানমন্ত্রী চুন্দ্রীগড় ১৯৫৭ সালের ২৬ অক্টোবরে ঘোষণা করেন যে নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে অর্থাৎ পৃথক নির্বাচনী নীতিতেই সরকার নির্ধারিত ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসেই নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হবে।[২০৫] চুন্দ্রীগড়ের নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তনের ঘোষণার পরপরই পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা বসন্ত কুমার দাস এক বিবৃতিতে বলেন যে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস যুক্ত নির্বাচনের সমর্থনে তাদের পূর্ব ঘোষিত নীতিতে অটল রয়েছে। বিবৃতিতে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পাকিস্তানে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং এক জাতীয়তার আদর্শ গড়ে তোলার পথে প্রধান অন্তরায়। পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার অর্থ অনৈক্য ও বিভেদকে স্থায়ী করে রাখা এবং সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা। কিন্তু পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।[২০৬]

যাহোক, পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন এবং নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কিত বিতর্কের মধ্যেই মাত্র ১ মাস ২৯ দিন ক্ষমতায় থেকে চূন্দ্রীগড় ১৯৫৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ঐ দিনই মুসলিম লীগ থেকে গঠিত রিপাবলিকান দলের নেতা মালিক ফিরোজ খান নূন রিপাবলিকান ও আওয়ামী লীগ দলের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫৮ সালের ৫ জানুয়ারি জাতীয় পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান যে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোটার তালিকায় ভোটারদের ধর্মের কোনো উল্লেখ থাকবে না।[২০৭] অর্থাৎ তাঁর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু এই পর্যায়ে পাকিস্তান জামাতে ইসলামী যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সূচনা হয় এবং দেশে পুনরায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়। ১৯৫৮ সালের ৩০ জানুয়ারি পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর মাওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী সাংবাদিকদের জানান যে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হলে পূর্ব পাকিস্তান হতে যাঁরা কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হবেন, তাঁরা পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতির বিরুদ্ধে কাজ করবেন। ফলে দেশকে সমূহ বিপদ হতে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সংখ্যাসাম্য নীতি বজায় রেখে পৃথক নির্বাচনী নীতির ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়া সম্পর্কিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মওদুদী বলেন যে নির্বাচন ইস্যুর সঙ্গে সংখ্যাসাম্যের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি একইসঙ্গে এক ইউনিট এবং যুক্ত নির্বাচনের বিরোধিতা করেন। তিনি আরও বলেন যে এক ইউনিট প্রশ্নে গণভোটে তিনি সম্মত রয়েছেন, তবে সংখ্যাসাম্যের প্রশ্নে গণভোটে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।[২০৮]

প্রশ্ন হলো মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীসহ পশ্চিম পাকিস্তানিদের যুক্ত নির্বাচনের বিরোধিতা করার মূল কারণ কী ছিল? সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে যুক্ত নির্বাচনের বিরোধিতা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসন

---

[২০৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ অক্টোবর, ১৯৫৭।
[২০৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ অক্টোবর, ১৯৫৭।
[২০৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ জানুয়ারি, ১৯৫৮।
[২০৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫৮।

ব্যবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা। মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীসহ পশ্চিম পাকিস্তানিরা চেয়েছিল যদি সংখ্যাসাম্য বহাল রেখে উভয় পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচনী পদ্ধতির প্রবর্তন করা যায় তাহলে স্থায়ীভাবে তারা পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় প্রাধান্য ও প্রভূত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হবে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক জনসংখ্যা বিন্যাসই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের যুক্ত নির্বাচনের বিরোধিতা করার মূল কারণ। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ছিল ৭,৫৬,৭২,৪৯৬ জন। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৪,১৯,৩২,৩২৯ জন বা দেশের মোট জনসংখ্যার ৫৫.৪১% এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৩,৩৭,৪০,১৬৭ বা দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৪.৫৯%। আবার পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান ছিল ৩,২২,২৬,৬৩৯ জন বা ৭৬.৮৫%; হিন্দু ছিল ৯২,৩৯,৬০৩ জন বা ২২.০৪% এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছিল ৪,৬৬,০৮৭ জন বা ১.১১%। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান ছিল ৩,৩৭,৪০,১৬৭ জন বা ৯৭.১২%; হিন্দু ছিল ৫,৩১,০০০ জন বা ১.৫৮% এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছিল ৪,৪০,০০০ জন বা ১.৩০% (সারণি ৪৩)।[২০৯] ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সংখ্যাসাম্য নীতি কার্যকর করায় জাতীয় পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৫টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৫টি আসন।[২১০] স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাসাম্য বহাল রেখে যুক্ত নির্বাচন না হয়ে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি গৃহীত হলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্ত ১৫৫টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা অনুযায়ী মুসলমানেরা ৭৬.৮৫% অর্থাৎ ১১৯টি আসন, হিন্দুরা ২২.০৪% অর্থাৎ ৩৪টি আসন এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ১.১১% অর্থাৎ ২টি আসন লাভ করতো। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাপ্ত ১৫৫টি আসনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা অনুযায়ী মুসলমানরা ৯৭.১২% অর্থাৎ ১৫১টি আসন, হিন্দুরা ১.৫৮% অর্থাৎ ২টি আসন এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ১.৩০% অর্থাৎ ২টি আসন লাভ করতো। এর ফলস্বরূপ স্থায়ীভাবে জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রাধান্য বজায় থাকতো ও পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় তাদের প্রভুত্বই অটুট থাকতো। এ কারণেই মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীসহ পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিম নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় স্থায়ীভাবে নিজেদের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব বজায় রাখতেই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং পাকিস্তানের জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ ধর্মীয় বিন্যাস কাঠামো নির্বাচনী রাজনীতিতে এবং শাসন ব্যবস্থায় প্রাধান্য ও প্রভুত্ব অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ সম্পর্কে ১৯৬১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে যথার্থভাবেই মন্তব্য করা হয়েছে, "Religion has always been an important factor in consideration of the social and political problems of Pakistan."[211]

যাহোক, ১৯৫৮ সালের ১৯ জুলাই সর্বদলীয় নির্বাচনী সম্মেলনে মুসলিম লীগ ব্যতীত পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাকিস্তানের উভয় অংশে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন এবং উভয় অংশে একই তারিখে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২১২] ১৯৫৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জাতীয় পরিষদের শরৎকালীন অধিবেশনে 'জনপ্রতিনিধিত্ব আইন সংশোধন' নামে একটি বিল উত্থাপিত হয়। এই বিলের মূল উদ্দেশ্যে ছিল বিধি-বিধান সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাজে সহায়তা করা। পাকিস্তানের উভয় অংশে ১৫ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ ও ৭ মার্চ ভোট গণনার ফল প্রকাশে নির্বাচন কমিশন

---

[২০৯] *Census of Pakistan Population, 1951*, p. 6-2; *Census of Pakistan Population, 1961*, Vol. I, Pakistan (Karachi : Ministry of Home and Kashmir Affairs, 1964), p. II-24.

[২১০] রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২০৫-২০৬।

[২১১] *Census of Pakistan Population, 1961*, p. II-24.

[২১২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ জুলাই, ১৯৫৮।

যেন কাজ করতে পারে তার জন্যই এই বিলটি উত্থাপিত হয়।[২১৩] কিন্তু এই বিল গৃহীত হওয়ার পূর্বেই ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যরা পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর ওপর হামলা চালায়। এই হামলার পেছনে ছিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ, পাকিস্তান জামাতে ইসলামী, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম[২১৪] দলের নেতৃবৃন্দের গভীর ষড়যন্ত্র। এসব দলের নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন যে নির্বাচন পদ্ধতি (যুক্ত না পৃথক নির্বাচন) সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হলে প্রধানমন্ত্রীর ইতিপূর্বের (১৯৫৮ সালের ৫ জানুয়ারির) ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর ফলে কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকারের দুই শরিক দল আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান দল নির্বাচনে ভালো ফল অর্জনে সক্ষম হলেও তাদের দলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং যে কোনো মূল্যে নির্বাচন বন্ধ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এ কারণেই ডেপুটি স্পিকারের ওপর হামলা করা হয়। এই হামলায় আহত ডেপুটি স্পিকার ১৯৫৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।[২১৫] এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়। সুতরাং নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কিত জটিলতা থেকে সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণেই মূলত দেশে সামরিক শাসনের সূচনা হয়।

বস্তুতপক্ষে, গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝা যায় যে যুক্ত ও পৃথক নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার বিষয়টি শুধুমাত্র নির্বাচন বিষয়ক রাজনীতি ছিল না, বরং এর মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে শাসন ক্ষমতায় স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তথা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতো। কিন্তু ১৯৫৬ সালের সংবিধান রচনাকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঐক্য ও বৃহত্তর স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য প্রবর্তনের বিনিময়ে জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে সংখ্যাসাম্য মেনে নেয়। অথচ ১৯৫৬ সালের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ সংখ্যাসাম্য বহাল রেখে যুক্ত নির্বাচনের বদলে পৃথক নির্বাচন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙ্গে সাবেক প্রদেশসমূহ পুনর্বহাল করতে চায় যাতে পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্ব ও প্রাধান্য হ্রাস করা যায়। উপরন্তু, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সামরিক বিভাগসহ কোনো ক্ষেত্রেই সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এতদসত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ মুসলমান ও হিন্দুসহ সকল সম্প্রদায়ের সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে এবং প্রধানত সকল সম্প্রদায়ের কৃষক তথা সাধারণ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুক্ত নির্বাচন বহাল রাখার দাবি করলেও মুসলিম লীগ, পাকিস্তান জামাতে ইসলামী, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম দলের পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সোচ্চার হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৮০% কৃষক তথা সাধারণ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক তথা সাধারণ জনগণের ভোটাধিকার থাকার অর্থই হলো তাদের সমস্যার সমাধান করে তাদের সমর্থন লাভ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে কৃষক তথা সাধারণ জনগণের মূল সমস্যা ছিল ভূমি কেন্দ্রিক। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত ১৯৩৭, ১৯৪৬ ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে, যে রাজনৈতিক দল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ

---

[২১৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮।

[২১৪] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম যুক্তফ্রন্টভুক্ত হলেও মূলত এই দু'টি দল উক্ত নির্বাচনের শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি এবং বিশেষত মুসলিম লীগের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই দু'টি দলের মূল উদ্দেশ্য ছিল ষড়যন্ত্র করে ও আওয়ামী লীগের উপর ভর করে শাসন ক্ষমতায় যাওয়া। নির্বাচনে এই দু'টি দলের জোটভুক্ত হওয়া, এই দু'টি দলের সদস্যদের নমিনেশন দেওয়া, নির্বাচনী প্রচারণার সময়, এমনকি নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হওয়ার পর মন্ত্রিসভা গঠনের সময়ও দেখা যায় যে এই দু'টি দল পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। বিস্তারিতভাবে দেখুন, রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৪৪-২৬১; হোসেন ও করিম, *"১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার"*, পৃ. ৬৮।

[২১৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ও ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮।

কৃষকের ভূমি কেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান দেওয়ার বাস্তব ভিত্তিক প্রতিশ্রুতি প্রদান ও সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী ছিল সেই দলই উক্ত নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিল। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবি করে সফল হলে পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করবে এটা বাধাগ্রস্ত করতেই ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পিকারের ওপর হামলার মাধ্যমে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে, যার ফলস্বরূপ দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। সুতরাং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে দেশে সামরিক শাসন জারির পূর্ব পর্যন্ত অধিকাংশ ঘটনা দৃশ্যমান নির্বাচন সম্পৃক্ত রাজনীতি হলেও প্রকৃতপক্ষে এর অন্তর্নিহিত কারণ ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলের শুরুতে বেশ কয়েক বছর দেশে গণতন্ত্র ও রাজনীতির অনুপস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকরা ক্ষমতাহীন ও অধিকারহীন হয়ে সবদিক থেকে শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়। প্রথমত, দেশে সামরিক আইন জারি করার শুরুতেই মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ায় কৃষক তথা সাধারণ জনগণ ক্ষমতাহীন ও অধিকারহীন হয়ে পড়ে যা ইতিপূর্বে এই অধ্যায়ের জোতদার অংশে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনে সার্বজনীন ভোটাধিকার না থাকায় কৃষকরাও ছিল অবহেলিত। যদিও তারা মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতো, কিন্তু ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচনে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। উপরন্তু, দেশের নীতি নির্ধারণী প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতি, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনে কৃষকদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা না থাকায় ভূমি কেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনো সুযোগ ছিল না। অন্যদিকে মৌলিক গণতন্ত্রের আমলে নির্বাচিত অধিকাংশ ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন জোতদার। ফলে ভূমি কেন্দ্রিক সমস্যা সৃষ্টির মূল হোতা জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়ন হতে কৃষকদের রক্ষা করার কেউ ছিল না। অর্থাৎ ভোটাধিকার হারিয়ে জনসাধারণ তথা কৃষকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়ত, দেশে সামরিক শাসন জারি করার কয়েক মাসের মধ্যেই ১৫০ জন সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এবং প্রায় ৬০০ জন সাবেক জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনা হয়। তাঁদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তদন্ত করে দেখার নামে হয়রানি করা হয়। এছাড়াও ১৯৫৯ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসনের শুরুতেই দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অসংখ্য রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'নির্বাচিত সংস্থাসমূহ (অযোগ্যতা) আদেশ' বা EBDO (Elective Bodies Disqualification Order, 1959) এবং 'সরকারি পদ লাভে অযোগ্যতা আদেশ' বা PODO (Public Office Disqualification Order, 1959) নামে দু'টি আদেশ জারি করা হয়। এই আদেশ বলে সামরিক সরকার নির্বাচিত সংস্থার সদস্য ও সরকারি পদে আসীন ব্যক্তিদেরকে 'অসদাচরণের'[২১৬] দায়ে অভিযুক্ত করে ট্রাইবুনালে দোষী প্রমাণিত করতে শুরু করেন এবং তাদেরকে ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে দেশের যে-কোনো নির্বাচিত সংস্থার সদস্য হওয়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা করেন। আইয়ুব খানের সামরিক সরকার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ ৮৭ জন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে এবডো'র আওতায় অভিযুক্ত করেন। দেশে রাজনীতিবিদদের গ্রেফতারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলের প্রথম ৪৪ মাসে তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো আন্দোলন সংঘটিত হয়নি, এমনকি কোনো বক্তব্য-বিবৃতিও উচ্চারিত হয় নি।[২১৭] দেশে রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের কার্যকলাপ

---

[২১৬] অসদাচরণ বলতে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কার্যকলাপ, ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন ও দুর্নীতি করাকে বুঝানো হয়।

[২১৭] রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৫১ ও ১৬৩।

স্থবির হওয়ার ফলে কৃষক তথা জনসাধারণ ভীষণভাবে শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হলেও তাদের পক্ষে কথা বলার এবং তাদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ ছিল না। এই সুযোগে আইয়ুব খানের সামরিক সরকার ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ জারি করেন। এই আইনের বিধান অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে পরিবার প্রতি জমির ঊর্ধ্ব সীমা নির্ধারণ করা হয় ১২৪ একর বা ৩৭৫ বিঘা।[২১৮] এর ফলে জোতদার শ্রেণি আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠে, যার ফলস্বরূপ জনসাধারণ তথা কৃষকের ভূমির ওপর বিদ্যমান সামান্য অধিকারটুকুও হারিয়ে তাদের অবস্থা ঔপনিবেশিক শাসনামলের পর্যায়ে পৌঁছায় (চতুর্থ অধ্যায়ে ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)। অন্যদিকে সামরিক শাসনামলে কৃষক তথা জনসাধারণ উপর্যুপরি ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের করের চাপে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিকন্তু, অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে কৃষকরা এসব ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য কর দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সার্টিফিকেট মামলাসহ জেল-জুলুম, হয়রানি এবং নির্যাতনের স্বীকার হয় (এসম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)। সুতরাং সামরিক শাসনামলের প্রথম দিকের কয়েক বছর দেশে রাজনীতির অনুপস্থিতির ফলে কৃষক তথা জনসাধারণ শোষণ-উৎপীড়নের স্বীকার হলেও এর প্রতিকারের কোনো সুযোগ ছিল না।

১৯৬২ সালের শুরুতে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা সর্বপ্রথম ধর্মঘট আহ্বান করে এবং তারা রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান[২১৯] ঘোষণা করা হয় (এবং এই সংবিধান কার্যকর হয় ১৯৬২ সালের ৮ জুন থেকে)। এই সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানিদের 'দাবি-দাওয়া' চরমভাবে উপেক্ষিত হয়। সংবিধানে পাকিস্তানের জনসাধারণের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয় ও তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের মাধ্যমে শাসকের অনুগত একটি শ্রেণির সৃষ্টি করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ আইয়ুব খান প্রণীত সংবিধানের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এছাড়াও এই সংবিধানের আওতায় সারাদেশে ১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ ও ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করা হলে ছাত্ররা রাজনীতিবিদদের নিকট উক্ত নির্বাচন বয়কটের আহ্বান করে ও নির্বাচন প্রতিহত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে আন্দোলন আরও জোরদার করে তোলে। উপরন্তু, ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শরীফ কমিশনের শিক্ষা রিপোর্টের[২২০] বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমাজ 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে একটি আন্দোলন সংগঠিত করে। এমনকি ছাত্র সমাজ ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে অবাঙালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে এবং মার্চ মাসে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনবিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে।[২২১] কিন্তু ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে গড়ে উঠা এসব আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ ও সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ না থাকায় এগুলো বেশি দূর এগোতে পারেনি। বস্তুত, ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ছয় দফা[২২২] কর্মসূচি ঘোষণায় সৃষ্ট ছয় দফা আন্দোলনে সর্বপ্রথম

---

[২১৮] Hussain, *A study on Legal Aspects of Land Use Regulation in Bangladesh*, p. 50; Bari, *District Gazetteers : Jessore*, pp. 251-252; উমর, *বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন*, পৃ. ৪২-৪৩; ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৭।

[২১৯] পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৫৭-১৬২।

[২২০] শরীফ কমিশনের শিক্ষা রিপোর্ট সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৬৫-১৬৬।

[২২১] দেখুন, রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৬৪-১৬৮।

[২২২] ছয় দফা রচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সহযোগিতা করেছিলেন পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলাম, মোশাররফ হোসেন, হাবিবুর রহমান, আখলাকুর রহমান, আনিসুর রহমান ও রেহমান সোবহান। দেখুন, সোবহান, *উতল রোমন্থন*, পৃ. ২৫১-২৫২।

পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদ ও কৃষক তথা জনসাধারণসহ সকল শ্রেণির মানুষের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে পুনরায় পূর্ব বাংলায় একটি সার্বিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা হয়।[২২৩]

বঙ্গবন্ধু ঘোষিত এই ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ।[২২৪] ঐতিহাসিক ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ অভিহিত করে শেখ হাসিনা বলেন যে এই ছয় দফার মাধ্যমেই বাঙালির স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল।[২২৫] হারুন-অর-রশিদের মতে ১৯৬৬ সালে বাঙালির জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'আমাদের বাঁচার দাবি'-খ্যাত ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি দেশের জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে এই ছয় দফা কর্মসূচি প্রণীত হয়েছিল তৎকালীন পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে বাঙালির দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে, ছয় দফা 'রাজনৈতিক দর-কষাকষি'র কোনো বিষয় ছিল না। তাঁর মতে ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তির সনদ বা 'ম্যাগনাকার্টা'।[২২৬] এ কারণে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ দেশজুড়ে ছয় দফা প্রচার শুরু করলে অচিরেই তা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফার পক্ষে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালের ৬ জুন কারাগারে বসেই মন্তব্য করেন, "পূর্ব বাংলার জনগণকে আমি জানি, হরতাল তারা করবে। রাজবন্দিদের মুক্তি তারা চাইবে। ছয় দফা সমর্থন করবে।"[২২৭] এখন প্রশ্ন হলো এই ছয় দফা কর্মসূচির মূল বিষয়বস্তু কী ছিল এবং পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকরা ছয় দফাকে কেন মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল? সংক্ষেপে এর উত্তরে বলা যায় যে ছয় দফা কর্মসূচির ১ম দফায় বলা হয় লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হবে, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে ও প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত সংসদ ও রাজ্য পরিষদসমূহ হবে সার্বভৌম। অর্থাৎ ১ম দফায় জনসাধারণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ তথা কৃষকদের ক্ষমতায়ন করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচনের অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ২য় দফা থেকে ৫ম দফায় প্রধানত পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলা হয়েছিল। আর ষষ্ঠ দফায় ছিল পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার বিষয়। অর্থাৎ ছয় দফা কর্মসূচির মূল দাবি ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে কিভাবে ছয় দফা স্বায়ত্তশাসন অর্জনের দাবি ছিল? কামাল উদ্দিন আহমেদের মতে ছয় দফায় জোর দিয়ে বলা হয় যে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকবে এবং অন্য সকল বিষয় যেমন মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর ও রাজস্ব সংগ্রহ থাকবে প্রদেশগুলোর এখতিয়ারে। তিনি বলেন যে শেখ মুজিব ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনকে ছয় দফার ওপর গণভোট বলে ঘোষণা করেন এবং নির্বাচনে জয়লাভের পর তিনি ছয় দফা দাবি থেকে একচুল পরিমাণও সরে দাঁড়ান নি, কেননা ছয় দফার প্রশ্নে কোনো আপসরফা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।[২২৮] বস্তুতপক্ষে, ছয় দফা কর্মসূচির মূল অর্থ কী ছিল তা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের কাছে বিবেচ্য বিষয় ছিল না। এমনকি তারা স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্নিহিত অর্থও বুঝতো না। পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তথা কৃষকের কাছে মূল বিবেচ্য বিষয় ছিল ছয় দফা কর্মসূচির আন্দোলনের মাধ্যমে ভূমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা, বাড়তি খাজনা-করসহ অর্থনৈতিক বঞ্চনার অবসানে শোষণ ও নিপীড়নহীন কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠা। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলন সফল হলে শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তি পাবে এটাই ছিল কৃষকদের নিকট দৃঢ় বিশ্বাস। অর্থাৎ তাদের কাছে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা

[২২৩] ছয় দফা কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৬।
[২২৪] রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৭২।
[২২৫] বিস্তারিত দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ জুন, ২০২১।
[২২৬] রশিদ, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা*, পৃ. ২৫।
[২২৭] রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৬৭।
[২২৮] আহমেদ, "*স্বায়ত্তশাসনের সন্ধানে*", পৃ. ৩৮১।

কর্মসূচি ছিল তাদের দাবি আদায়ের হাতিয়ার। বঙ্গবন্ধু নিজেও তাঁর ছয় দফা কর্মসূচির ব্যাখ্যায় তাই বলেছেন। তিনি তাঁর *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে মন্তব্য করেন, "নিম্নতম কর্মসূচিই ছয় দফা। সেই সঙ্গে রাজবন্দিদের মুক্তি, কৃষকদের পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, গরিব কর্মচারীদের সুবিধা ও খাদ্য সমস্যা সমন্ধে কর্মসূচি নেওয়া চলে।"[২২৯] আর এ কারণেই পূর্ব বাংলার কৃষক তথা জনসাধারণ ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। তারা অনুভব করেছিল যে এই কর্মসূচি সফল হলেই তাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসবে। তাই ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ছয় দফা কর্মসূচি আদায়ে হরতাল আহ্বান করলে তা সফল হয়। ১৯৬৬ সালের ৮ জুন কারাবন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু কৃষক তথা জনসাধারণের হরতাল পালন সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছে। তারা ছয় দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়, বাঁচতে চায় খেতে চায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, কৃষকের বাঁচবার দাবি তারা চায়-এর প্রমাণ এই হরতালের মধ্যে হয়েই গেল।"[২৩০] বঙ্গবন্ধু নিজেই ছয় দফা কর্মসূচির সাফল্যের সঙ্গে পূর্ব বাংলার কৃষক তথা সাধারণ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার যোগসূত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "ছয় দফা জনগণের দাবি। পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচা মরার দাবি। এটাকে জোর করে দাবান যাবে না। দেশের অমঙ্গল করা হবে একে চাপা দেবার চেষ্টা করলে।"[২৩১] এ কারণেই ছয় দফা কর্মসূচিকে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তথা কৃষক তাদের মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকের যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা বিরাজমান ছিল তার সমাধান ও বাঙালি জাতির মুক্তির জন্যেই বঙ্গবন্ধু ছয় দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। ছয় দফা আন্দোলনের সূচনা করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ছাত্ররা; সেখান থেকে এই আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ছয় দফা আন্দোলনকারী কৃষকদের লক্ষ্য ছিল প্রধানত মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা, যারা তাদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন চালিয়েছিল এবং স্থানীয় ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কাজে ব্যাপক দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অবাঙালি পুঁজিপতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছিল। ফলে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে তারা তাদের নিয়োগকর্তাদের ঘেরাও বা অবরোধ করেছিল। প্রতিরোধের এই তিন শ্রেণি তথা ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক সম্মিলিতভাবে এক প্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এর ফলে সংঘটিত আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বাভাসে উচ্চকিত হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি নিরুৎসাহী এবং আইয়ুব সরকারের এক ধরনের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা ভাসানী ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকের সম্মিলিত আন্দোলনে যুক্ত হয়ে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের একজন অগ্রদূত হিসেবে তিনি নিজেকে তুলে ধরতে প্রচেষ্টা চালান। এই প্রচেষ্টারই অংশ হিসেবে তিনি ছয় দফার বিপরীতে চৌদ্দ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রবিন্দু ও পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যুত্থানের প্রধান মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু। কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুসহ বহু বাঙালি আমলা ও সামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি করতে ভারতীয়দের সঙ্গে হাত মেলাবার যে অভিযোগ এনে বঙ্গবন্ধুকে কলংকিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, রাজনৈতিকভাবে সেটা বিপরীত ফল দেয়। এর ফলে বাঙালিদের চোখে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেন জাতীয় বীর।[২৩২]

---

[২২৯] রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৭২।
[২৩০] রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৬৯।
[২৩১] রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৪২।
[২৩২] সোবহান, *উতল রোমন্থন*, পৃ. ২৫৮-২৬০।

সুতরাং বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক তথা জনসাধারণের সার্বিক মুক্তির কথা বলা হয়েছিল। এ কারণেই ছয় দফা কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তথা কৃষকের আস্থা অর্জন করে এবং তাদের কাছে এটি মুক্তির সনদ বলে বিবেচিত ও গৃহীত হয়। সালাহ্উদ্দীন আহ্মদের মতে আওয়ামী লীগ প্রদত্ত ছয় দফা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচির নিশ্চয়তা দান করেছিল। এ কারণে ১৯৬৬ সালের মধ্যে শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জাতীয় প্লাট্‌ফরমে পরিণত হয়েছিল।[২৩৩] ছয় দফার জনপ্রিয়তা দেখেই আইয়ুব সরকার ১৯৬৬ সালের ৮ মে শেখ মুজিবকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করেন। কেবল তাঁকেই নয়, ১৯৬৬ সালের ১০ মে'র মধ্যে তাঁর দলের প্রায় ৩,৫০০ জন নেতা-কর্মীকেও গ্রেফতার করা হয়। শেখ মুজিবের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের আহবানে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সমগ্র প্রদেশে সাধারণ ধর্মঘট বা হরতাল পালিত হয়। এই হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১০ জন নিহতসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মানুষ আহত হয়।[২৩৪] সরকারের আন্দোলন বিরোধী মারমুখী আচরণে ছয় দফার জনপ্রিয়তা এবং গুরুত্ব আরও অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। এদিকে প্রধানত রাজনৈতিক কারণে ছয় দফার জনপ্রিয়তা দেখে ১৯৬৬ সালের ১২ জুন ন্যাপ প্রধান মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছয় দফার বিপরীতে 'ন্যাপের চৌদ্দ দফা-জাতীয় মুক্তির কর্মসূচি' গ্রহণ করেন।[২৩৫] ন্যাপের এই চৌদ্দ দফা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগ যেসব দাবি-দাওয়া উত্থাপন করেছিল তার বাইরে চৌদ্দ দফায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো বিষয়বস্তু ছিল না। বরং ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে যে প্রতিনিধিত্ব দাবি করেছিল ন্যাপের এই চৌদ্দ দফা কর্মসূচিতে তারও উল্লেখ ছিল না। উল্লেখ্য, চৌদ্দ দফা কর্মসূচি উত্থাপনের পর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চীনপন্থী ও সোভিয়েতপন্থীদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হয়। এমনকি, এই একই কারণে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চূড়ান্তভাবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটি অংশ ন্যাপ ভাসানী এবং অপর অংশ ন্যাপ মোজাফফর বা ন্যাপ রিকুইজিশনিস্ট নাম ধারণ করে। ন্যাপ ভাসানী অংশের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং ন্যাপ মোজাফফর বা ন্যাপ রিকুইজিশনিস্ট অংশের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ। এর মধ্যে ন্যাপ ভাসানী সামরিক শাসক আইয়ুব খানের সরকারকে সমর্থন করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টো কর্তৃক নতুন গঠিত পাকিস্তান পিপলস পার্টির সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করে।[২৩৬]

কিন্তু সরকার ন্যাপ ভাসানীর সমর্থন পাওয়ার পরও ছয় দফা আন্দোলনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আওয়ামী লীগের প্রথম সারির প্রায় সকল নেতাকে গ্রেফতার করেছিল। এই সুযোগে ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব হ্রাস করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতা আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল আইয়ুব বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ যথা পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (পশ্চিম পাকিস্তানিদের নেতৃত্বে পরিচালিত); পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল); জামাতে ইসলামী; জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এন.ডি.এফ) ও পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পি.ডি.এম) নামে একটি ঐক্যজোট গঠন করেন। এমনকি আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কয়েকজন রক্ষণশীল নেতাও এই ঐক্যজোটে যোগদান করেন। পি.ডি.এম আট দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে এবং তা জনগণের মাঝে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

---

[২৩৩] আহ্মদ, *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পৃ. ১২০।

[২৩৪] রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৮৯-১৯০।

[২৩৫] ন্যাপের ১৪ দফা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৯৪-১৯৫।

[২৩৬] রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২০০।

সত্যিকারার্থে পি.ডি.এম'র আট দফা দাবি ছিল আওয়ামী লীগের ছয় দফারই বর্ধিত সংস্করণ।[২৩৭] এ কারণে পূর্ব বাংলার কৃষক তথা জনসাধারণসহ সকল শ্রেণির মানুষের কাছে ছয় দফাই অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে। ছয় দফার ক্রমপ্রসার্যমান জনপ্রিয়তা স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের প্রতি মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং ছয় দফা আন্দোলনের সমস্ত উপাদানকে চিরতরে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' আবিষ্কারের ঘোষণা করা হয় এবং এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি অপর একটি সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শেখ মুজিবকেও উক্ত মামলার প্রধান আসামি বলে ঘোষণা করা হয়। সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি হিসেবে গ্রেফতারের ঘোষণা দেওয়ার পরদিন ১৯৬৮ সালের ১৯ জানুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট পালিত হয়। উল্লেখ্য, সরকারের আগরতলা ষড়যন্ত্র আবিষ্কার ঘোষণার দুই দিন পর অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নসরুল্লাহ খানকে আহবায়ক করে আওয়ামী লীগ (ছয় দফা পন্থী), পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (পশ্চিম পাকিস্তানিদের নেতৃত্বে পরিচালিত পি.ডি.এম পন্থী), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী-মোজাফফর), ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এন.ডি.এফ) এবং জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম-এই আটটি রাজনৈতিক দল মিলে 'ডেমোক্রেটিক একশন কমিটি' সংক্ষেপে 'ডাক' (DAC) নামক একটি বিরোধী রাজনৈতিক জোট গঠন করা হয়। ভাসানী ন্যাপ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি এই জোটে অংশগ্রহণ করেনি। 'ডাক' জনসাধারণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারে ব্যাপকতর ও সমন্বিত আন্দোলন গড়ে তুলতে আট দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।[২৩৮] এই আট দফা কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম ছিল শেখ মুজিবসহ রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান। কিন্তু বামপন্থী ও ডানপন্থীদের সমন্বয়ে 'ডাক' গঠিত হওয়ায় আওয়ামী লীগের ছয় দফাকে পুরোপুরি সমর্থন করা সম্ভব হয় নি। ফলে 'ডাক'-এর পক্ষে আইয়ুব-বিরোধী জোরদার কোনো আন্দোলনও গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। এই অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে আইয়ুব-বিরোধী এক ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে 'ছাত্র সংগ্রাম কমিটি' বা 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনের এগারো দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।[২৩৯] বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার সাথে আরও পাঁচটি দফা যোগ করে এগারো দফা তৈরি হয়েছিল, যেগুলো ছিল বামপন্থী আন্দোলনের সংস্কারপন্থী চিন্তাভাবনার প্রতিফলন। সে সময় এই দফাসমূহ নির্বাচনের দিক থেকে গুরুত্বহীন হলেও ছাত্র সমাজ এবং দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ তথা কৃষকদের মধ্যে সেগুলোর যথেষ্ট শক্তিশালী প্রভাব ছিল।[২৪০] এই এগারো দফায় পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবি-দাওয়ার মধ্যে অন্যতম ছিল কৃষকের ওপর হতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করতে হবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করতে হবে; সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে; পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ ও আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে এবং পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করতে হবে।[২৪১] কৃষক তথা জনসাধারণের

---

[২৩৭] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮৪-২৯২; আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রেজা, *বাংলাদেশের রাজনীতি : প্রকৃতি ও প্রবণতা, ২১-দফা থেকে ৫-দফা* (ঢাকা : সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭), পৃ. ১৪৪-১৪৭; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৯৭-১৯৯।

[২৩৮] ডাকের আট দফা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০০-৪০১; আজাদ ও রেজা, বাংলাদেশের *রাজনীতি*, পৃ. ১৭৭-১৭৮; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, পৃ. ২০১।

[২৩৯] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-৪০৮; আজাদ ও রেজা, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ১৭৮-১৮৩; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২০২-২০৪।

[২৪০] সোবহান, *উতল রোমন্থন*, পৃ. ২৫৮-২৬০।

[২৪১] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-৪০৮; আজাদ ও রেজা, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ১৭৮-১৮৩; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২০০-২০৭।

দাবি-দাওয়ার পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত, শিক্ষিত মধ্যবিত্তসহ পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের দীর্ঘ দিনের শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির জন্য প্রত্যাশিত দাবি-দাওয়ার সবই এই এগারো দফা দাবির মধ্যে নিহীত ছিল। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রধানত ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র-আন্দোলন শুরু হলেও ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে এগারো দফা কর্মসূচি ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক তথা সাধারণ জনগণসহ সকল শ্রেণির মানুষ আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে এই এগারো দফা ভিত্তিক ছাত্র-আন্দোলন ব্যাপক সমর্থন লাভ করে গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। গণ-আন্দোলনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আইয়ুব খানের সামরিক সরকার সেনাবাহিনী, পুলিশ, ইপিআর এবং সরকার সমর্থকদের দিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ, লাঠিচার্জ ও অত্যাচার-নির্যাতন করে আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে আন্দোলন তো স্তব্ধ হয়ইনি, বরং তা দিন দিন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সামরিক শাসক আইয়ুব সরকারের ১৪৪ ধারা, সান্ধ্য আইন, শত শত আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিবর্ষণ ও লাঠিচার্জ করেও সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বিস্তৃত গণ-আন্দোলনকে থামানো সম্ভব হয়নি। এক হিসেবে দেখা যায় যে ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে প্রায় ১০০ জন পূর্ব পাকিস্তানি নিহত হয়েছিলেন।[২৪২] এই গণ-আন্দোলন শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা পল্লীগ্রামসহ মফস্বল শহরেও বিস্তৃত হয়েছিল। প্রধানত ভূমি বিরোধের কারণেই পল্লীগ্রামে এই গণ-আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটেছিল। আতিউর রহমানের মতে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মূলে অন্যতম ছিল কৃষকদের অসন্তোষ।[২৪৩] বলার অপেক্ষা রাখে না যে কৃষকদের অসন্তোষের মূলে ছিল ভূমিসংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিপীড়ন তথা ভূমি বিরোধ।

উল্লেখ্য, ১৯৬৯-এর আন্দোলনকারীদের সমর্থন করে বেশ কয়েকজন বিরোধী দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য পদত্যাগ করেন। গণ-আন্দোলনকারীরা সামরিক শাসক আইয়ুব খানের অনুগত মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগের আহ্বান জানালে প্রায় ৭৫% মৌলিক গণতন্ত্রী সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে পদত্যাগ করেন।[২৪৪] লেনিন আজাদের মতে এই পদত্যাগকারীদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজারেরও অধিক।[২৪৫] এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের অত্যাচার-নির্যাতনে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তথা কৃষক এতোটাই বিক্ষুব্ধ ছিল যে এই গণ-আন্দোলনের সময় পল্লী এলাকায় অনেক মৌলিক গণতন্ত্রীকেও তারা হত্যা করেছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের ফল। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে বন্দি অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা পুলিশের বেয়নেট চার্জে মৃত্যুবরণ করেন। এই দু'টি মৃত্যুসংবাদ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়লে গণ-আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। গণঅভ্যুত্থানে ভীত হয়ে স্বৈরাচারী সামরিক শাসক আইয়ুব সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে এবং উক্ত মামলায় গ্রেফতারকৃত শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ লাখো-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান করে এবং এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেই তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত

[২৪২] রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২০৫।
[২৪৩] রহমান, *জনমানুষের মুক্তিযুদ্ধ*, পৃ. ৪৬১।
[২৪৪] রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২০৫।
[২৪৫] আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ৬০৪।

করা হয়। এই সভায়তেই বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ও এগারো দফা দাবি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। লেনিন আজাদের মতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দিদের মুক্তির মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জিত হয়, তা'হলো আওয়ামী লীগের ছয় দফার রাজনীতির বিজয়। তবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু স্বীকার করেন যে ছাত্রদের এগারো দফাই জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে, বিশেষত কৃষক-শ্রমিকসহ সকল স্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি পূর্ব বাংলার কৃষক তথা সাধারণ জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবি-দাওয়া আদায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।[২৪৬] ১৯৬৬ সাল থেকে প্রধানত ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন প্রতিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা ও ১৯৬৯ সালের এগারো দফা কর্মসূচির আন্দোলনে সৃষ্ট গণঅভ্যুত্থানের ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তথা কৃষক, ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত, শিক্ষিত মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা এবং প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি মুজিব থেকে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের বঙ্গবন্ধুতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধুতে রূপান্তরিত হওয়ার মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতির ফল।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত হলেও পর পূর্ব পাকিস্তানে গণ-আন্দোলন অব্যাহত থাকে, এমনকি, আন্দোলনের ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ আইয়ুব খান গণ-আন্দোলন হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ও আপস-মীমাংসার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে সকল রাজনৈতিক দলের গোল টেবিল বৈঠক আয়োজন করেন। এই বৈঠকে ভাসানী ন্যাপ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি ব্যতীত সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে যোগদান করে বঙ্গবন্ধু তাঁর দল আওয়ামী লীগের ছয় দফা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা দাবিকে এজেন্ডা হিসেবে আলোচনার জন্য উপস্থাপন করেন। তিনি ছয় দফা ও এগারো দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের প্রধান দাবি হিসেবেও উল্লেখ করেন। এই বৈঠকে তিনি চেয়েছিলেন আইয়ুব সরকার বদলের সূচক হিসেবে সর্বদলীয় চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বশর্ত হিসেবে তাঁর ছয় দফা এজেন্ডা গৃহীত হোক।[২৪৭] কিন্তু জামাতে ইসলামীর নেতা মাওলানা মওদুদী এবং নেজামে ইসলামীর নেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বঙ্গবন্ধুর উক্ত দাবির বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে ন্যাপ মোজাফফরের নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ ও বৈঠকে যোগদানকারী স্বতন্ত্র সদস্য বিচারপতি এস. এম. মুরশেদ বঙ্গবন্ধুর দাবিকে সমর্থন করেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পরও বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বঙ্গবন্ধুসহ সকল নেতৃবৃন্দের সম্মতিতে ঐক্যমতে আসতে ব্যর্থ হয়ে ১৯৬৯ সালের ১৩ মার্চ আইয়ুব খান নিজেই একতরফাভাবে (১) ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং (২) প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠান-এই দু'টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বৈরাচারী সামরিক শাসক আইয়ুব খান নিজেই গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তকে 'ঐতিহাসিক' বলে মন্তব্য করেন। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু আইয়ুব খানের গৃহীত সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করেন যে পূর্ব পাকিস্তানবাসী এতে খুশি হতে পারে না। আওয়ামী লীগ এবং ন্যাপ মোজাফফর ছাড়া অন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ আইয়ুব খানের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। জামাতে ইসলামী গোল টেবিল বৈঠককে 'সফল' বলে অভিহিত করেন। হামিদুল হক চৌধুরী একে 'জনমতের বিজয়' বলে মন্তব্য করেন। মাওলানা ভাসানী বৈঠকে যোগদান না করলেও বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধু সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের মনোভাব বুঝতে পেরে 'ডাক' থেকে আওয়ামী

[২৪৬] রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২০৪-২০৫; আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ৬০৪; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৭৪; হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন*, পৃ. ৫৭-৫৮।

[২৪৭] সোবহান, *উতল রোমন্থন*, পৃ. ২৫৮-২৬০।

লীগকে প্রত্যাহার করে নেন। ন্যাপ মোজাফফরও বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণ করে 'ডাক' থেকে সরে দাঁড়ায়। এর ফলে ১৯৬৯ সালের ১৪ মার্চ 'ডাক' ভেঙ্গে যায়। ১৯৬৯ সালের ২১ মার্চ বঙ্গবন্ধু ছয় দফা এবং এগারো দফার আলোকে পাকিস্তানের সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া তৈরি করে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নিকট পেশ করেন। এই খসড়া সংবিধানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেনাবাহিনীর ক্ষমতা সংকোচনের প্রস্তাব করা হয়। সংবিধান সংশোধনীর খসড়া পেয়ে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান আরও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য, আইয়ুব-বিরোধী গণ-আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তান ছাড়িয়ে পশ্চিম পাকিস্তানেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেখানে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে সাবেক চারটি প্রদেশ পুর্নবহালের দাবিও জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এই দাবিতে পশ্চিম পাকিস্তানে গণ-আন্দোলন ব্যাপকতর হয়। ফলে একদিকে উভয় পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-আন্দোলন এবং অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছয় দফা ও এগারো দফার আলোকে পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধনীর খসড়া-এই দুইটি কারণে আইয়ুব খানের পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান তার ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়ার বদলে সেনাবাহিনীর হাতে অর্পণ করাকে শ্রেয় মনে করেন। এমতাবস্থায় ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ আইয়ুব খান একটি চিঠি লিখে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা গ্রহণের আহ্বান জানান। এই চিঠি পেয়ে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে ঐদিনই তিনি দেশে সামরিক আইন জারি করেন। একইসঙ্গে তিনি নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে দেশের সংবিধান এবং পার্লামেন্টও বাতিল ঘোষণা করেন। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ সকল দমন-পীড়ন উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে চূড়ান্তভাবে তাদের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে আন্দোলন করতে থাকেন। এই সময় বাঙালির অধিকার আদায়ে অনমনীয় বঙ্গবন্ধু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে অটল থাকেন। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান তখন বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। সামরিক শক্তি তখন জনশক্তির কাছে অসহায় হয়ে পড়ে। তাঁর সহযোগিতা ছাড়া তখন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু এই সময় জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংসদের আসন বণ্টন এবং সে অনুযায়ী নির্বাচনের জোর দাবি তোলেন।[২৪৮]

উদ্ভূত সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে ঘোষণা করেন যে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ হবে দেশকে একটি ব্যবহারযোগ্য শাসনতন্ত্র প্রদান এবং যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা গণমনকে আলোড়িত করেছে তার একটা সমাধান বের করা। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের 'আইনগত কাঠামো আদেশ' -এর মূলধারা ঘোষণা করেন। এই আইনগত কাঠামো আদেশের মূলধারায় নির্বাচনী কার্যক্রমের প্রধান তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। প্রথমত, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে সেখানকার পুরাতন চারটি প্রদেশ যথা পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পুনরুজ্জীবিত করা হয়। দ্বিতীয়ত, 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতি অর্থাৎ জনসংখ্যানুপাতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসন বণ্টনের ভিত্তিতে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়। তৃতীয়ত, যুক্ত নির্বাচক মণ্ডলী এবং সার্বজনীন ভোটাধিকার অর্থাৎ ২১ বছর প্রাপ্তবয়স্কদের

[২৪৮] রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২০৫-২০৭; হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন*, পৃ. ৫৮; মুক্তি, "*৭০-এর নির্বাচন*", পৃ. ১০৭।

যৌথ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।[২৪৯] ইয়াহিয়া খানের উক্ত তিনটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রথম সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তথা জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করা হয়। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়নের পর পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ যথা পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাতিল করে পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটে পরিণত করার ফলে সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এক ইউনিট ভেঙ্গে পুনরায় সাবেক চারটি প্রদেশ পুনর্বহালের উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে এক ইউনিটের স্থলে চারটি প্রদেশ পুনর্বহাল হলে পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যার সমাধান হয়। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ সন্তুষ্ট হয়। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নেওয়া হয়। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়নের সূচনা থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তথা জনসাধারণের প্রধান দাবি ছিল জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তথা জনসাধারণ প্রধানত সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতি ও প্রশাসনে একক প্রাধান্য ও প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা ও তা অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের এই যৌক্তিক দাবি ইতিপূর্বে মেনে নেয়নি। কিন্তু ইয়াহিয়া খানের এই সিদ্ধান্তের ফলে শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানিরাও সংখ্যাসাম্য নীতির বদলে জনসংখ্যানুপাতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের আসন বণ্টন করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ছিল ৯,৩৮,৩২,০০০ জন। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ছিল ৫,০৮,৪০,২৩৫ জন বা ৫৪.১৮% এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ছিল ৪,২৯,৯১,৭৬৫ জন বা ৪৫.৮২% (সারণি ৪৪)।[২৫০] মূলত পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের হিস্যা অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের আসন বণ্টন করা হয়। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে জনসংখ্যানুপাতে পূর্ব পাকিস্তান পায় ১৬৯টি বা ৫৪% আসন এবং পশ্চিম পাকিস্তান পায় ১৪৪টি বা ৪৬% আসন। তবে প্রাদেশিক পরিষদের ৬২১টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত হয় ৩১০টি আসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত হয় ৩১১টি আসন (সারণি ৪৫)।[২৫১] তৃতীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তথা কৃষকরা ১৯৭০ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে প্রধান নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কারণ ২১ বছর প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারীদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি ছিল কৃষক। এর ফলে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ লাভের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকেরা নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের বৃহত্তর প্রভাবশালী অংশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে ইয়াহিয়া খান প্রথমে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় প্রবল বন্যা দেখা দেওয়ার কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচন পেছানোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচনের নতুন তারিখ নির্ধারিত হয়। কিন্তু ১৯৭০

[২৪৯] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০২-৫১০; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২১০; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৭৮; হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন*, পৃ. ৬৭; মুক্তি, "*৭০-এর নির্বাচন*", পৃ. ১০৭।

[২৫০] *Census of Pakistan Population, 1961*, Vol. I, pp. II-2, II-14 and II-24.

[২৫১] রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২১১; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৭৯।

সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে আকস্মিক এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে ঐসব এলাকার নির্বাচন পিছিয়ে ১৯৭০ সালের ১৭ জানুয়ারিতে নেওয়া হয় এবং যথারীতি নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়।[২৫২]

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর আরোপিত বিধি নিষেধ তুলে নেওয়া হয়।[২৫৩] এর পরপরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ছিল ১৬৯টি আসন। এর মধ্যে ৫টি আসন ছিল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। বাকি ১৬২টি সাধারণ আসনের নির্বাচনে প্রথমে ১৭টি রাজনৈতিক দল দলীয়ভাবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়ে নির্বাচনী প্রতিক বরাদ্দ নিলেও নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ভাসানী) নির্বাচন বর্জন করে। অর্থাৎ জাতীয় পরিষদের ১৬২টি সাধারণ আসনের নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত ১৬টি রাজনৈতিক দল দলীয়ভাবে এবং ১৩৯ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় (সারণী ৪৬)।[২৫৪] অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ১০টি আসন ছিল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩০০টি সাধারণ আসনের নির্বাচনে ১৩টি রাজনৈতিক দল দলীয়ভাবে এবং ৪৮০ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে।[২৫৫] ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দলীয়ভাবে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা শুরু করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং বিজয় পরবর্তী দলীয় ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করে এবং তা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে। এছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে মূলত দলীয় প্রধান বা সভাপতি জাতির উদ্দেশ্যে বেতার-টিভি ভাষণের মাধ্যমেও দলীয় ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন। উল্লেখ্য, নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে স্বায়ত্তশাসন, ইসলাম রক্ষা, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, দেশের পরারাষ্ট্র ও দেশরক্ষা নীতি, দুর্নীতি রোধ, সমাজতন্ত্র কায়েম, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কারসহ বিভিন্ন শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি এবং বিশেষত পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তথা কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মপরিকল্পনা স্থান পেয়েছিল।[২৫৬] উল্লেখ্য, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে রাজনৈতিক ও ধর্মীয়সহ বিভিন্ন ধরনের বিষয়াদি স্থান পেলেও ভূমি ও কৃষক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তেমন একটা গুরুত্ব পায়নি। জামাতে ইসলামীসহ বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে প্রধানত নীতি নৈতিকতা, ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্মীয় বিষয়াদি অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছিল। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী গ্রুপ), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টিসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে ভূমি ও কৃষক সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূ-অর্থনৈতিক বিষয়াদি স্থান পেয়েছিল। এর মধ্যে কৃষক শ্রমিক পার্টির ইশতেহারে কৃষকদেরকে আকৃষ্ট করতে বলা হয় যে এই পার্টি ইসলামিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী সকল প্রকার শোষণ ও অবিচারের অবসান ঘটিয়ে একমুখী

---

[২৫২] রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৭৯-২৮০; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২২১; হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন*, পৃ. ৮৬-৮৯; *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ নভেম্বর, ১৯৬৯।

[২৫৩] রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২৭৮।

[২৫৪] আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন*, পৃ. ২৩; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২২০; রশিদ, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা*, পৃ. ৭২; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৮২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০।

[২৫৫] রশিদ, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা*, পৃ. ৭৩; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২২৫; হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন*, পৃ. ১৮৫; আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন*, পৃ. ২৫।

[২৫৬] বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধান বা সভাপতির জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও এবং টেলিভিশনে ভাষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, *Morning News*, 5, 7, 11, 12, 30 and 31 January and 4, 10, 11, November, 1970; *The Pakistan Observer*, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 29 and 31 January and 9 February, 1970; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ অক্টোবর এবং ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৮, ১৯, ২০, ২৭ ও ২৮ নভেম্বর, ১৯৭০; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২১৬-২২০; হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন*, পৃ. ১০৫-১৫৫।

ও জনকল্যাণমূলক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করবে। তাদের ইশতেহারে বলা হয় যে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে; পাটের মণপ্রতি কমপক্ষে ৫০ টাকা মূল্য দিতে হবে; চাষীকে জমির খাজনা হতে অব্যাহতি দিতে হবে এবং জমির খাজনা মওকুফের ফলে সরকারের যে অর্থ ঘাটতি হবে তা বড় বড় শিল্পসমূহে ট্যাক্স বাড়িয়ে পূরণ করতে হবে।[২৫৭] একইভাবে কৃষকদের স্বার্থে পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাইয়ুম গ্রুপ) ইশতেহারে বলা হয় যে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ৩ একর পর্যন্ত জোতের (হোল্ডিং) খাজনা শতকরা ৩৫ ভাগ এবং ৩ হতে ৬ একর পর্যন্ত জোতের খাজনা শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস করা হবে। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্পসমূহকেও এই দল অগ্রাধিকার দিবে।[২৫৮]

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের ইশতেহারে বলা হয় যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই দলের লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে সীমিত করা এবং দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনের মূল ব্যবস্থাপনার ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে প্রত্যক্ষভাবে কৃষিতে নিয়োজিত সর্বাধিক সংখ্যক মানুষকে জমির মালিকানা প্রদান করা। অর্থাৎ ‘লাঙ্গল যার জমি তার’ এই নীতির অনুসরণ করা এবং অনুপস্থিত মালিকের জমির মালিকানা রহিত করা। ভূমি রাজস্ব সম্পূর্ণভাবে মওকুফ করে এই বাবদ ঘাটতি রাজস্ব অন্যান্য উৎস থেকে পূরণ করা।[২৫৯] অন্যদিকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ ওয়ালী) ইশতেহারে বলা হয় যে কৃষকদের স্বার্থে পূর্ব বাংলার ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে। জমির ঊর্ধ্ব সীমা পরিবার প্রতি ১০০ বিঘায় সীমিত করে বাড়তি জমি ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। কৃষকদের স্বার্থে বর্গাপ্রথা সংস্কার করা হবে। সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা করা হবে। পাট, আখ, তামাক ও অন্যান্য অর্থকরী ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। পাটের নিম্নতম মূল্য ৪০ টাকায় ধার্য করা হবে। খাদ্যের ব্যাপারে প্রদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। ১৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা মওকুফ করে দেওয়া হবে। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করা হবে। ন্যাপ ওয়ালীর নির্বাচনী স্লোগান ছিল ‘বাংলার কৃষক-শ্রমিক জাগো’। ন্যাপ ওয়ালীর নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয় যে শুরু থেকেই এই দল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে।[২৬০] উল্লেখ্য, ন্যাপ ওয়ালীর রাজনীতির প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। এ কারণে ইশতেহারের কর্মসূচি ও প্রচারণায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিষয়াদি গুরুত্ব পেয়েছিল বেশি। ফলে ইশতেহারের কর্মসূচি ও প্রচারণায় পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়াদি বিশেষত কৃষি সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার কিছুটা চেষ্টা পরিলক্ষিত হলেও তার গুরুত্ব তেমন একটা ছিল না। এমনকি ন্যাপ ওয়ালীর প্রধান ওয়ালী খান ১৯৭০ সালের ৭ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে বেতার-টিভি ভাষণেও পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়াদি বিশেষত কৃষি সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেন নি।[২৬১] নির্বাচন উপলক্ষে জামাতে ইসলাম নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। দলটি দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। দলের প্রধান লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকে এমন একটি রাষ্ট্রে পরিণত করা যেখানে কোরআন-সুন্নাহর পূর্ণ আনুগত্য ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের অনুসারী নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। দলের ইশতেহারে বলা হয় যে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান সমাজতান্ত্রিক কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ কর্মসূচির দ্বারা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র ইসলামি অর্থনীতিই পারে পাকিস্তানের সকল সমস্যার সমাধান

---

[২৫৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ নভেম্বর, ১৯৭০।
[২৫৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ নভেম্বর, ১৯৭০।
[২৫৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ নভেম্বর, ১৯৭০।
[২৬০] হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন*, পৃ. ১০৯-১১২; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২১৮।
[২৬১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ নভেম্বর, ১৯৭০।

করতে।[২৬২] ১৯৭০ সালের ৩ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে বেতার-টিভি ভাষণে জামাতে ইসলামীর আমীর মাওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কৃষি সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ তথা কৃষককে আকৃষ্ট করতে বলেন, “The major reforms the Jamaat proposed in the field of agriculture was that all jaigirdaris, old or new, should be scrapped. The ceiling for agriculture in fertile areas of West Pakistan shall be 102 acres and in East Pakistan 100 bighas. For less productive regions this ceiling shall vary according to this very standard.”[263] অন্যদিকে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির ইশতেহারে বলা হয় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শিল্প ক্রমশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। সরকার এসবের অধিকাংশ শেয়ারের মালিক হবে। ফলে লভ্যাংশের সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত হবে। পাট চাষীদের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে পাট ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হবে।[২৬৪] ১৯৭০ সালের ১৪ জানুয়ারি পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি নূরুল আমিন কৃষি সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষককে আকৃষ্ট করতে বলেন,

> According to Islamic principles the wealth of the rich would be equally distributed among the poor if his party was voted to power. He said that like other parties his party had not promised for the fulfillment of such things which were not possible. He said that they had promised to do only those things which were possible. He said that his party also had not promised to stop collection of taxes. To run the state collection of tax was essential. His party would, however, exempt land revenue up to 15 bighas of agricultural land.[265]

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রণীত নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালের ১১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণার শুরুতেই আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দলীয় নির্বাচনী ইশতেহারের মূল অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন,

> If the Awami League was successful in elections, it will nationalise the jute trade, key industries, banks and insurance companies. On economic issues, he said the Awami League would establish a ‘peasant-worker raj’ in which the peasants will enjoy tax holiday for ten years. Land revenue will be exempt on holdings up to 25 bighas. Primary teachers will get their due remuneration. He said fair prices will also be ensured for tobacco and sugarcane. The labourers and workers will enjoy share of profits from the industrial establishments.[266]

সুতরাং বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সুস্পষ্টভাবে কৃষকদের সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ‘কৃষক রাজ’ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন। লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু কৃষকদের নিকট যে ‘কৃষক রাজ’ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে কৃষকরা তাদের দীর্ঘ দিনের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণের আশায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল। যদিও বঙ্গবন্ধু তাঁর ঘোষণায় কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠা বলতে কী বুঝাতে চেয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করেননি, তবে কৃষকদের নিকট কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ ছিল ভূমির ওপর তাদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ খাজনা-কর মুক্ত শোষণ ও নিপীড়নহীন একটি কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠা। অধিকন্তু, এমন একটি কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠা যেখানে তাদের জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ও নিরপত্তার নিশ্চয়তা থাকবে।

---

[২৬২] বিস্তারিতভাবে দেখুন, হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন*, পৃ. ১১৩-১১৮; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২১৯।
[২৬৩] *Morning News*, 4 November, 1970.
[২৬৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ নভেম্বর, ১৯৭০।
[২৬৫] *The Pakistan Observer*, 15 January, 1970.
[২৬৬] *Morning News*, 12 January, 1970.

এমনকি, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তের দ্বারা কৃষকবান্ধব পূর্ণ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে কৃষক সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তথা কৃষকেরা দীর্ঘ দিন ধরে এমন একটি কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠারই স্বপ্ন দেখে এসেছিল। স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গবন্ধুর কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তথা কৃষকেরা তাদের সেই বহু কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণের প্রতাশায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের এই কৃষক বান্ধব নির্বাচনী ইশতেহারের খসড়া তৈরি করেছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ, তরুণ আইনজীবী ড. কামাল হাসেন, অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, নুরুল ইসলাম, আনিসুর রহমান এবং এ. আর. খান, স্বদেশ বোস ও হাসান ইমাম। এরপর বঙ্গবন্ধু খসড়ার মূল বৈশিষ্টগুলো যত্নসহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যেসব জায়গায় তাঁর কাছে রাজনৈতিকভাবে অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল সেগুলো তিনি সংশোধন করেন। চূড়ান্ত নির্বাচনী ইশতেহার ১৯৭০ সালের ৬ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ পর্ষদের বৈঠকে গৃহীত হয়। লীগের এই ইশতেহার তৈরি সম্পর্কে রেহমান সোবহান বলেন যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের জন্য তৈরিকৃত ইশতেহারের মূল উদ্দেশ্য ছিল এটা যেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক এজেন্ডার অনুমোদনের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হিসেবে কাজ করে। তাঁর মতে এযাবত পাকিস্তানের যেকোনো দল কর্তৃক প্রকাশিত ইশতেহারের মধ্যে সবচেয়ে সুচিন্তিত দলিল বলে অভিহিত এই ইশতেহার সম্ভবত যেকোনো বামপন্থী দল কর্তৃক প্রকাশিত ইশতেহারের চেয়েও বেশি সংস্কারপন্থী হয়েছিল। তিনি বলেন যে আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে একটি সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বপ্ন তুলে ধরেছিল যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহ দেওয়া হবে। এমনকি, এই ধরনের উন্নয়নের সুফল যাতে ন্যায্যভাবে সমাজের সমস্ত শ্রেণির মধ্যে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বণ্টিত হয় সে ব্যবস্থাও ইশতেহারে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে 'রাষ্ট্রীয়করণ ও সমবায় উদ্যোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে এবং ইক্যুইটি ও শিল্প উদ্যোগ পরিচালনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণের মতো নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা সরকারি খাত সম্প্রসারণ' -এর মতো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবও ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় : (১) পশ্চিম পাকিস্তানে চালু থাকা জায়গিরদারি, জমিদারি ও সর্দারি ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ করা হবে; (২) প্রকৃত কৃষকের স্বার্থ যাতে পরিপূর্ণ রক্ষিত হয় সে লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থার বিন্যাস করা হবে; (৩) জমির মালিকদের জমির ঊর্ধ্ব সীমা বেঁধে দেওয়া হবে এবং এই সর্বোচ্চসীমা অতিক্রম করা জমি অধিগ্রহণপূর্বক ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে; (৪) বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং (৫) সমগ্র পাকিস্তানে ২৫ বিঘা (৮.৩৩) পর্যন্ত জমি ভূমি রাজস্বের আওতার বাইরে থাকবে এবং এই পরিমাণ জমির বকেয়া খাজনা মওকুফ করা হবে।[২৬৭] ১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর জাতির উদ্দেশ্যে বেতার-টিভি ভাষণে বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের নির্বাচনী ইশতেহার তুলে ধরে পূর্ব বাংলার কৃষকের তথা জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি তথা ভূমি সংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তির কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের পুনরুল্লেখ করে বলেন,

> দেশের স্বার্থে কৃষি ব্যবস্থা ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করিবার জন্য আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদারী, জায়গীরদারী ও সরদারী প্রথার বিলুপ্তি, ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, ভূমি দখলের সর্বোচ্চসীমা নির্দেশ করিয়া বাড়তি জমি ও সরকারি খাস জমি ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বন্টন, কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ আওয়ামী লীগের বিঘোষিত নীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া তিনি বলেন, এমনকি বর্তমান ভূমি রাজস্ব প্রথা তুলিয়া দেওয়ার কথাও আমরা ভাবিতেছি।[২৬৮]

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি পূর্ব বাংলার ভূমিস্বত্বের অধিকারী কৃষক ছাড়াও ভূমিহীন কৃষককেও আকৃষ্ট করেছিল। কারণ দীর্ঘদিন ধরে সরকারের নিয়ন্ত্রণে ৬,২৫,৯৬৯ একর খাস জমি থাকলেও তা

[২৬৭] সোবহান, *উতল রোমন্থন*, পৃ. ২৬৯।
[২৬৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ অক্টোবর, ১৯৭০।

ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়নি (সারণি ৪১)।[২৬৯] এমনকি, সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা এই বিপুল পরিমাণ খাস জমি এতোদিন সরকার স্থায়ীভাবে কৃষকদেরকে বন্দোবস্তও দেওয়া হয়নি। ফলে ভূমিহীন কৃষকদের ধারণা হয়েছিল আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলে তারা উক্ত জমি বন্দোবস্ত পেয়ে উপকৃত হবে। এই ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। বিশ শতকের সত্তরের দশকের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ ছিল ভূমিহীন কৃষক।[২৭০] সুতরাং আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সরকারি খাস জমি বণ্টনের ঘোষণায় দেশের বিপুল পরিমাণ ভূমিহীন কৃষকরা আকৃষ্ট হয়েছিল। আওয়ামী লীগ ইশতেহার ঘোষণার পর দেশব্যাপী নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যাপৃত হয়। ১৯৭০ সালের ৬ নভেম্বর সিলেটে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, "বাঙালী বাংলার সম্পদের মালিক হইবে কিনা আসন্ন নির্বাচনে উহাই নির্ধারিত হইবে। তাই এই নির্বাচনে জনগণকে আওয়ামী লীগের 'নৌকায়' ভোট দিয়া সুস্পষ্ট রায় ঘোষণা করিতে হইবে যে বাংলাদেশকে আর আমরা কলোনী হিসাবে ব্যবহার করিতে দিব না।"[২৭১] এছাড়াও তিনি সিলেটের জকিগঞ্জের এক জনসভায় সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার সমালোচনা করে বলেন যে রক্ত খরচের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদের যে ভোটাধিকার অর্জিত হয়েছে তাতে অংশগ্রহণের কোনো ন্যায়সঙ্গত অধিকার কারও নেই। জনসভায় তিনি উল্লেখ করেন যে জাতীয় পরিষদে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বকে হ্রাস করার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে।[২৭২] ১৯৭০ সালের ১৩ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজুদ্দীন আহমেদ আসন্ন নির্বাচনে বাংলার মুক্তির সনদ ছয় দফা ও এগারো দফার পক্ষে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জনগণের দাবি আদায়ের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন যে স্বায়ত্তশাসন ও গরিবদের অধিকার আদায় এবং দুশমনদের বিতাড়নই এই নির্বাচনের উদ্দেশ্য।[২৭৩] ১৯৭০ সালের ২৬ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু এক নির্বাচনী জনসভায় বলেন যে, যেন বাংলার মানুষ স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচতে পারে এবং বাংলাই হতে পারে বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা-তার জন্যই এই নির্বাচনে ছয় দফা ও এগারো দফার পক্ষে ভোট দিতে হবে।[২৭৪] পরদিন (২৭ নভেম্বর, ১৯৭০) সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন যে বাংলার মানুষের বাঁচা-মরার সিদ্ধান্ত পিণ্ডি-ইসলামাবাদের বদলে বাংলাদেশকেই নিতে হবে।[২৭৫] ১৯৭০ সালের ৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু জামালপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় উল্লেখ করেন যে এই নির্বাচন হলো ছয় দফার ওপর গণভোট।[২৭৬] বস্তুতপক্ষে, আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনকে ছয় দফা ও এগারো দফা দাবিসমূহের ওপর 'রেফারেন্ডাম' হিসেবে অভিহিত করে। বঙ্গবন্ধু এই নির্বাচনকে সকল শোষণ ও নিপীড়নের প্রতিবাদ করার সুযোগ বলে মনে করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে আসন্ন নির্বাচন হচ্ছে ব্যালটের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তথা কৃষকের দাবি আদায়ের সর্বশেষ সংগ্রাম।[২৭৭] এছাড়াও নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যের খতিয়ানসহ 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' নামে একটি পোস্টার প্রকাশ করে তা নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করেন। সমগ্র পূর্ব বাংলায় এই পোস্টার ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে তা ছিল খুবই কার্যকর।[২৭৮] অর্থাৎ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ও প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য ছিল

---

[২৬৯] Ali, "*Land Reform Measures and Their Implementation in Bangladesh*", p. 165.

[২৭০] *দৈনিক বাংলা*, ৫ জুন, ১৯৭৩।

[২৭১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ নভেম্বর, ১৯৭০।

[২৭২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ নভেম্বর, ১৯৭০।

[২৭৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ নভেম্বর, ১৯৭০।

[২৭৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০।

[২৭৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ নভেম্বর, ১৯৭০।

[২৭৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭০।

[২৭৭] রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২১৫-২১৬।

[২৭৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন*, পৃ. ৩০৩; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৮১।

পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণির মানুষ এবং বিশেষত শতকরা ৮০ ভাগের ঊর্ধ্বে কৃষি সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষককে আকৃষ্ট করা। এই কাজ আরও সহজ হয়েছিল যখন ১৯৭০ সালের ৮ নভেম্বর পাকিস্তান আওয়ামী উলেমা পার্টির নেতা মাওলানা ইরশাদুর হক (মাওলানা এহতেশামুল হক থানভীর ভ্রাতা) এক বিবৃতিতে আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে ঘোষণা করেন যে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোনো পার্টিই দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের পার্টি হতে পারে না এবং আর কেউই নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর দুর্বিষহ অবস্থার প্রতিকারে আগ্রহান্বিত নয়। তিনি বলেন যে মুসলিম লীগ (মুসলিম লীগ কাইয়ুম গ্রুপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও কনভেনশন মুসলিম লীগ) ও পিডিপি'র নেতাদের একাধিকবার পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে তাঁরা দেশব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থাভিত্তিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শাসন পদ্ধতি কায়েমে বদ্ধ পরিকর। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং পিপলস পার্টি জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার উল্লেখ করলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তারা বৈদেশিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ আমদানি করার পক্ষপাতী। অপরদিকে এই সমস্ত পার্টিতে জোতদার, জায়গিরদার ও পুঁজিপতিদের প্রাধান্য বেশি। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এই সমস্ত শক্তির প্রভাবমুক্ত। এই পার্টি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী আইন প্রণয়ন না করারও ওয়াদা করেছে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পার্টি ক্ষমতাসীন হলে একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় দফতর প্রতিষ্ঠারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইসলামী ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে এটাই হবে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।[২৭৯] সুতরাং আওয়ামী লীগের ইশতেহার, বেতার-টিভির ভাষণ, নির্বাচনী প্রচারণা ও সর্বশেষ প্রখ্যাত মাওলানার বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানে ভূমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ শোষণ ও নিপীড়নহীন কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল।

অন্যদিকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ভাসানী) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করার দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই দলীয় নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। দলটির ইশতেহারে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তথা কৃষককে আকৃষ্ট করতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে ভূস্বামীদের নিকট থেকে বিনা ক্ষতিপূরণে জমি অধিগ্রহণ করে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। পশ্চিম পাকিস্তানে জমির মালিকানা একশ একর নির্ধারণ করা হবে। অতিরিক্ত জমি ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। সেচ ও অসেচকৃত জমি যথাক্রমে সাড়ে চার একর ও পঁচিশ একর পর্যন্ত খাজনা মওকুফ করা হবে।[২৮০] কিন্তু নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার পর ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসের শুরুতে দলের প্রধান মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জানান যে তাঁর দল দলীয় কাউন্সিল সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[২৮১] কিন্তু জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা নিয়ে দলটির নেতৃবৃন্দ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং অন্তর্কলহে লিপ্ত হয়।[২৮২] নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের প্রধানদের জাতির উদ্দেশ্যে বেতার-টিভির ভাষণের সুযোগ গ্রহণ করে ১৯৭০ সালের ৬ নভেম্বর ভাসানী বলেন যে ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক তথা পূর্বাঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা যথাযথরূপে গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও তিনি বলেন যে শতকরা ৮৫ জন কৃষক ও ১০ জন শ্রমিক অর্থাৎ ৯৫ জন নিপীড়িত, নির্যাতিত, অভুক্ত, অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য সংখ্যানুপাতে আইনসভার আসনসংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। তাঁর মতে একমাত্র সমাজতন্ত্র ছাড়া পৃথিবীর নির্যাতিত, নিপীড়িত ও মজলুম মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি কোনোকালেই সম্ভবপর হবে না।[২৮৩] উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল জলোচ্ছ্বাসে অসংখ্য মানুষ হতাহত ও পশু-পাখিসহ বিপুল পরিমাণ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত

---

[২৭৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ নভেম্বর, ১৯৭০।
[২৮০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭০।
[২৮১] *Morning News*, 12 January. 1970.
[২৮২] *The Pakistan Observer*, 29 January. 1970.
[২৮৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ নভেম্বর, ১৯৭০।

হয়।[২৮৪] এই পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাপ ভাসানী দলের জেনারেল সেক্রেটারি সি. আর. আসলাম সাধারণ নির্বাচন ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত স্থগিত রাখার অনুরোধ করেন।[২৮৫] এছাড়াও ন্যাপ ওয়ালীপন্থী পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন নির্বাচন কিছু সময় পিছিয়ে দেওয়ার দাবি করেন। পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা খায়রুদ্দীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন স্থগিত রাখার আহ্বান জানান।[২৮৬] কিন্তু ১৯৭০ সালের ২০ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেন যে নির্ধারিত তারিখেই (জাতীয় পরিষদ ৭ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদ ১৭ ডিসেম্বর) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭০ সালের ২৪ নভেম্বর ন্যাপ ভাসানী দলের সভাপতি মাওলানা ভাসানী অসুস্থ হয়ে টাঙ্গাইলের সন্তোষে নিজ বাসভবনে থাকায় দলের সহ-সভাপতি এম. এ. জব্বার ঘোষণা করেন, "গত ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্ট পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান পিকিং ন্যাপ আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।"[২৮৭] ১৯৭০ সালের ২৪ নভেম্বর পিডিপি প্রধান নূরুল আমিন ঘূর্ণিঝড়জনিত কারণে নির্বাচন স্থগিত রাখতে সরকারকে অনুরোধ জানান।[২৮৮] ১৯৭০ সালের ২৬ নভেম্বর পশ্চিম পাকিস্তান পিডিপি প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান সরকারের নিকট নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবি জানান। একই দিনে পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামীর পীর মহসিনউদ্দিন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখার জন্য সুপারিশ করেন। অবশ্য ঐ দিন গণ-আন্দোলনের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান কেবল উপদ্রুত অঞ্চলে সাময়িককালের জন্য নির্বাচন স্থগিত রাখা ন্যায়সঙ্গত হবে বলে অভিমত দেন।[২৮৯] কিন্তু ১৯৭০ সালের ২৭ নভেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[২৯০] তাঁর এই ঘোষণার পর পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান 'নির্বাচন স্থগিত ও আইনগত কাঠামো রদবদল না হলে নির্বাচনে শরিক হয়ে কোনো লাভ নেই' উল্লেখ করে নিজে নির্বাচন হতে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন এবং দলীয় সকল নির্বাচনী প্রার্থীর প্রতি তাঁর পদাঙ্কনুসরণের আহ্বান জানান।[২৯১] উল্লেখ্য, জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের প্রার্থী ছিলেন মাত্র ১৩ জন (সারণি ৪৬)।[২৯২] নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের ২ জন প্রার্থী নির্বাচন করে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলেন (জাতীয় পরিষদ আসন-৯৭, নির্বাচনী এলাকা ফরিদপুর-৪ এবং আসন-১১২, নির্বাচনী এলাকা ঢাকা-৯)। এই দু'জনের মধ্যে একজন ছিলেন দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আমেনা বেগম। এছাড়াও দলের একজন প্রার্থী নির্বাচন করে তৃতীয় স্থান লাভ করেছিলেন (জাতীয় পরিষদ আসন-১১০, নির্বাচনী এলাকা ঢাকা-৭)। উপরন্তু, প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের ১ জন প্রার্থী নির্বাচন করে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন (প্রাদেশিক পরিষদ আসন-১৮৬, নির্বাচনী এলাকা ঢাকা-১৬) এবং একজন প্রার্থী নির্বাচন করে তৃতীয় স্থান লাভ করেন (প্রাদেশিক পরিষদ আসন-১৬৪, নির্বাচনী এলাকা ময়মনসিংহ-২৬)।[২৯৩] সুতরাং একথা বলা যায় যে পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান নিজে নির্বাচন থেকে সড়ে দাঁড়ালেও তাঁর দলের অন্য প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

---

[২৮৪] বিস্তারিতভাবে দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০।
[২৮৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ নভেম্বর, ১৯৭০।
[২৮৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ নভেম্বর, ১৯৭০।
[২৮৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭০।
[২৮৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭০।
[২৮৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০।
[২৯০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ নভেম্বর, ১৯৭০।
[২৯১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ নভেম্বর, ১৯৭০।
[২৯২] আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন*, পৃ. ২৩; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২২০; রশিদ, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা*, পৃ. ৭২; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৮২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০।
[২৯৩] আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন*, পৃ. ৬২ ও ৭০।

অন্যদিকে পিকিংপন্থী ন্যাপ প্রধান মাওলানা ভাসানী দলীয় প্রধান হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানি প্রার্থীদের নির্বাচন হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেও পশ্চিম পাকিস্তানি প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছিলেন।[২৯৪] উল্লেখ্য, ন্যাপ ভাসানী জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে মাত্র ১৫টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিল (সারণি ৪৫)।[২৯৫] বলার অপেক্ষা রাখে না যে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পিকিংপন্থী ন্যাপ ভাসানী দলের দলীয় অবস্থান এবং জনসমর্থনে ঘাটতি থাকার কারণেই মূলত দলটি পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি সাধারণ আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে ব্যর্থ হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে নির্বাচন স্থগিত রাখার অনুরোধ জানালেও একমাত্র ন্যাপ ভাসানী দল ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক দল দলীয়ভাবে নির্বাচন হতে বিরত ছিল না। সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে প্রধানত ন্যাপ ভাসানী দলের নেতৃবৃন্দের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, জনভিত্তিহীনতা এবং নির্বাচনে ভালো ফলো পাবে না-এ তিনটি কারণেই দলটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের ১৬২টি সাধারণ আসনের নির্বাচনে ১৬টি রাজনৈতিক দল ও ১৩৯ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন, পিডিপি ১টি আসন (পিডিপি'র সভাপতি নূরুল আমিন) এবং ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী (পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে রাজা ত্রিদিব রায়) নির্বাচনে জয় লাভ করে। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ৭টি মহিলা সংরক্ষিত আসনসহ জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের মোট আসনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭টি। এ কারণে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের ফলাফলে দেখা যায় যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি[২৯৬] আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৮৮টি আসন পেয়ে জাতীয় পরিষদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হয় (সারণি ৪৭)।[২৯৭] উল্লেখ্য,পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের ১৬২টি সাধারণ আসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রদত্ত ভোটের ৭৪.৯% লাভ করে।[২৯৮] আরও উল্লেখ্য, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনও লাভ করতে পারেনি। ফলে উভয় রাজনৈতিক দল স্ব স্ব প্রদেশে আঞ্চলিক জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল হিসেবে বিবেচিত হয়। আমিনুর রহিমের মতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি আঞ্চলিক দল এবং মুজিব ও ভুট্টো আঞ্চলিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।[২৯৯] অন্যদিকে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে ৩০০টি সাধারণ আসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৭০.৪৫ ভাগ ভোট লাভ করে (সারণি ৪৮)।[৩০০] নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান হতে জাতীয় পরিষদের সাধারণ আসনে ১৬২ জন নির্বাচিত সদস্যের পেশাভিত্তিক

---

[২৯৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০।

[২৯৫] আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন*, পৃ. ২৩; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২২০; রশিদ, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা*, পৃ. ৭২; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৮২; দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০।

[২৯৬] আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনে বিজয়ী হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৭টি আসনের সবগুলোতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। এর ফলে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭টি। উল্লেখ্য, পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসনে বিজয়ী না হওয়ায় পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭টি।

[২৯৭] আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন*, পৃ. ২৩; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২২৪; রশিদ, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা*, পৃ. ৭২; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৮২-২৮৩; হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন*, পৃ. ১৮৪-১৮৫।

[২৯৮] আহমদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১৬৫; আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন*, পৃ. ২৩।

[২৯৯] Rahim, *Politics and National Formation in Bangladesh*, p. 242.

[৩০০] রশিদ, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা*, পৃ. ৭৩।

বিশ্লেষণে দেখা যায় যে জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ভূমি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ তথা কৃষক থেকে উদ্ভূত প্রতিনিধিত্ব ছিল সংখ্যায় ও শতকরা হারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ (সারণি ৪৯)।[৩০১] সারণি ৪৯ থেকে দেখা যায় যে সরাসরি কৃষিজীবী প্রতিনিধি ছিলেন ১১ জন বা ৬.৭৯%। এছাড়াও আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদসহ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যেও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ভূমি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ তথা কৃষক থেকে উদ্ভূত। একইভাবে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যেও ভূমি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষক থেকে উদ্ভূত প্রতিনিধিত্ব ছিল সংখ্যায় ও শতকরা হারে আরও বেশি পরিমাণে (সারণি ৫০)।[৩০২] সারণি ৫০ থেকে দেখা যায় যে নির্বাচনে বিজয়ী সরাসরি কৃষিজীবী প্রতিনিধি ছিলেন ২৬ জন বা ১০.৩৩%। এছাড়াও আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদসহ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যেও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ভূমি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ তথা কৃষক থেকে উদ্ভূত। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে সরাসরি কৃষিজীবী প্রতিনিধি ছিলেন ৩৭ জন বা ১৭.১২%। সুতরাং ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের এই ফলাফল থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে নির্বাচনে উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইশতেহার, জাতির উদ্দেশ্যে বেতার-টিভির ভাষণ ও নির্বাচনী জনসভায় দেওয়া বক্তব্যের মধ্যে একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের বক্তব্যই ছিল সুস্পষ্ট এবং জনসাধারণ তথা কৃষকের নিকট আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য।

উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতবর্ষ তথা বাংলার ভূমি সম্পদ পাচারের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করে শিল্প বিপ্লবসহ ইংল্যান্ডের ঐশ্বর্য বিনির্মাণ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে যেভাবে সম্পদ পাচারের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের সম্পদ ও সেখানকার মানুষের মাথা পিছু আয় উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছিল, ঠিক একইভাবে পাকিস্তান শাসনামলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ পাচারের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ ও মাথাপিছু আয় দু'ই বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত চলে যেতো তৎকালীন পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিন্ডি তথা পশ্চিম পাকিস্তানে। কার্ল মার্কসের ব্যবহৃত 'উদ্বৃত্ত মূল তত্ত্ব' অনুযায়ী কৃষকরা উৎপাদন করে, ভোগ করে মালিক।[৩০৩] পাকিস্তান আমলেও মার্কসের এই তত্ত্ব অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকরা উৎপাদন করলেও ভোগ করেছিল মালিক হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানিরা। বস্তুতপক্ষে, যে কোনো সমাজ উন্নয়নে উদ্বৃত্ত সম্পদের প্রয়োজন হয়। পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত ছিল পুরোটাই কৃষিতে। এই কৃষির উদ্বৃত্ত দিয়েই সম্ভব ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করা। এটা শুধু রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরাই নয় কৃষকরাও বুঝতে পারতো যে সম্পদ পাচার তথা উদ্বৃত্ত পাচার বন্ধ করতে না পারলে তাদের কোনো উন্নতি হবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ কৃষকদের বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে তাদের শ্রমের ফল পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় পূর্ব বাংলা এবং এই অঞ্চলের কৃষকের উন্নতি হচ্ছে না। কৃষির উদ্বৃত্ত দিয়ে কৃষক ও পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন হতে পারতো কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও নিপীড়নের কারণে তা সম্ভব হয় নি। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের সামনে এটা যথার্থভাবেই উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং তারা তা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিল। মূলত এ কারণেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এতো ভলো ফল লাভে সক্ষম হয়েছিল। উপরন্তু, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকের কাছে স্বায়ত্তশাসন, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কার, ইসলাম রক্ষা, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, দেশের পরারাষ্ট্র ও দেশরক্ষা নীতি, দুর্নীতি রোধ, সমাজতন্ত্র কায়েমসহ

---

[৩০১] আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন*, পৃ. ৫০২-৫০৭।

[৩০২] আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন*, পৃ. ৫০৮-৫১৭।

[৩০৩] বিস্তারিতভাবে দেখুন, Hamza Alavi, "Peasantry and Capitalism : A Marxist Discourse", Teodor Shanin (ed.), *Peasants and Peasant Societies,* Selected Readings (London : Penguin Books, Second Edition, 1988), pp. 185-195.

বিভিন্ন শ্রেণি স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতির রাজনীতি যতটা না তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তার থেকেও তাদের নিকট আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভূমির ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট স্বার্থগত বিষয়াদি যেমন কৃষি কাজে প্রয়োজনীয় উন্নত বীজ, সার, ঔষধ, গরু, লাঙ্গল, বাড়তি খাজনা ও অতিরিক্ত বিভিন্ন ধরনের কর আরোপ এবং এ সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা ও জেল-জুলুম, সার্টিফিকেট জারি করে হয়রানি এবং সর্বোপরি ভূমি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ দিনের শোষণ ও নিপীড়ন। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তথা কৃষকরা অনুধাবন করেছিল যে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের কল্যাণেই তারা এই নির্বাচনে ভোটাধিকার লাভ করেছে এবং তা প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছে। উপরন্তু, পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকের নিকট বঙ্গবন্ধুর 'কৃষক রাজ' প্রতিষ্ঠার ঘোষণার অর্থ ছিল তাদেরকে আর সরকার ও রাষ্ট্রের সুবিধাভোগী ও অনুগত শ্রেণি জোতদার কর্তৃক শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হতে হবে না। সুতরাং ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ছিল প্রকৃতপক্ষে ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের ফল।

৫.৪.৬ ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে কৃষক সমাজ

১৯৭০ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তথা কৃষকরা আশা করেছিল যে তাদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বে পাকিস্তানের নতুন সরকার গঠিত হবে এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের 'কৃষক রাজ' প্রতিষ্ঠিত হবে। এর ফলে তাদের জীবনে পরিবর্তন সূচিত হবে। তারা স্থায়ীভাবে শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তি পাবে। কিন্তু নির্বাচনের পর পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের কারণে পূর্ব বাংলার কৃষক তথা সাধারণ মানুষের সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়ের প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছয় দফার ওপর নিরঙ্কুশ সমর্থন দেওয়ার কারণে এর ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের সংবিধান প্রণীত হবে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিক্রিয়ার জবাবে পিপিপি'র প্রধান ভুট্টো দাবি করেন যে তাঁর দলের সহযোগিতা ছাড়া কেন্দ্রে কোনো সরকার প্রতিষ্ঠা কিংবা সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না। ভুট্টোর দাম্ভিক দাবির জবাবে বঙ্গবন্ধু পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছয় দফা ও ১১ দফার প্রতি ম্যান্ডেট ঘোষণা করেছে। এখন ছয় দফা জনসাধারণের সম্পত্তি এবং তা রদবদল করা সম্ভব নয়। তিনি উল্লেখ করেন যে কেউই আওয়ামী লীগকে ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না।[৩০৪] বস্তুতপক্ষে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের পর ছয় দফার বিষয়ে কোনো ধরনের আপস-আলোচনার সুযোগ ছিল না। ১৯৭০ সালের ৯ ডিসেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই নির্বাচনী রায়কে ছয় দফা ও এগারো দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রণীত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর 'গণরায়' বলে উল্লেখ করেন। ১৯৭০ সালের ১১ ডিসেম্বর সন্দ্বীপে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু পুনর্ব্যক্ত করেন, "ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে দেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হবে। আওয়ামী লীগ এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং আমরা এমন একটি সংবিধান করবো যা বাঙালিদের ওপর শোষণের অবসান ঘটবে।"[৩০৫]

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকা রেসকোর্স ময়দানের এক জনসভায় নির্বাচিত কন্সটিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির (সি.এ) সমস্ত আওয়ামী লীগ সদস্যদের জনসমক্ষে শপথ করান যে ছয় দফার বিষয়ে তারা কোনোরকম আপস রফা করবেন না। শপথনামায় সংসদ সদস্যরা অঙ্গীকার করেন যে, "শাসনতন্ত্রে

---

[৩০৪] রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২২৬-২২৭।
[৩০৫] আহমদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ১৬৫।

ও বাস্তব প্রয়োগে ৬-দফা কর্মসূচিভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও এগারো দফা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটাতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব। ... সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে যে-কোনরূপ ত্যাগ স্বীকার করতঃ আপোসহীন সংগ্রামের জন্য আমরা সদা প্রস্তুত থাকিব"।[৩০৬] অতঃপর বঙ্গবন্ধু ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে একটা কার্যকরী সংবিধান তৈরির কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় সংবিধানের খসড়া তৈরির বৈঠকসমূহে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডসহ উপস্থিত থাকতেন বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী, সারওয়ার মুরশিদ, আনিসুর রহমান ও রেহমান সোবহান। উল্লেখ্য, ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বুদ্ধিজীবী সহযাত্রী হিসেবে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছিল। যাহোক, আওয়ামী লীগের খসড়া সংবিধান প্রণয়নকালে ১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারি ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে তিন দিন ধরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেন। এই সময় তিনি সম্ভবত নিশ্চিত হয়ে যান যে ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান তৈরি করতে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই অনুমানের ভিত্তিতেই ইয়াহিয়া খান তাঁর সামরিক চক্রান্তের পরবর্তী কার্যকলাপ স্থির করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৭-২৯ জানুয়ারি ভুট্টো পিপিপি'র এক বিশাল অনুগামী দল নিয়ে ঢাকায় আসেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সংবিধান নিয়ে আলোচনা করতে। দীর্ঘ আলোচনা শেষে ভুট্টো ছয় দফার মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম ও ষষ্ঠ দফাদ্বয় মেনে নিতে সম্মত হন। উল্লেখ্য, এই দীর্ঘ আলোচনায় ছয় দফার ভিত্তিতে তৈরিকৃত সংবিধান কার্যকর করার পরিবর্তে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির আপোস রফায় অধিক আগ্রহী ছিলেন ভুট্টো। ১৯৭১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। রেহমান সোবহানের মতে নির্বাচনী প্রচারণার সময় পশ্চিম পাকিস্তানের জামাতে ইসলাম কিংবা মুসলিম লীগ রাজনীতিবিদের প্রতিমুখে ছয় দফা সম্পর্কে ভুট্টো কিছুটা নীরব থেকেছিলেন এবং ১৯৭১ সালের ঢাকা সফরে তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছয় দফা কর্মসূচির ব্যাপারে আপস রফায় উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি বঙ্গবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বুঝতে পেরে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে ছয় দফা সম্পর্কে হঠাৎ প্রকাশ্যে অবস্থান বদল করেন ভুট্টো, কেননা এটি তাঁর মুখ্য রাজনৈতিক দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে ভুট্টো হুমকি দেন যে শেখ মুজিব ছয় দফার ব্যাপারে আপসে রাজি না হলে ৩ মার্চ আইনসভার অধিবেশন সে বর্জন করবে। ভুট্টো বলেন যে তাঁর দল কেবলমাত্র অন্য একটি দল কর্তৃক প্রণীত একটি সংবিধানে সম্মতি দেওয়ার জন্য ঢাকায় যেতে পারেন না। এমনকি, তিনি হুমকি দেন যে যেসব কন্সটিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সদস্য আইনসভার অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকা যাবার সাহস দেখাবে তাদের তিনি 'মেরে ঠ্যাং ভেঙ্গে' দেবেন। আহূত আইনসভার অধিবেশন ভণ্ডুল করতে ভুট্টোর এই বৈড়ালব্রতী কর্মকাণ্ড শঙ্কা ও বিস্ময় দুইই সৃষ্টি করেছিল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে। ভুট্টোর হুমকি ও কপটতার জবাবে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন যে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান পরিষ্কার; যদি পশ্চিম পাকিস্তান তাঁর দলের ছয় দফা কর্মসূচি পুরোপুরি মেনে না নেয়, তাহলে তিনি একাই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন।[৩০৭] উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যে একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[৩০৮] এছাড়াও ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের লারকানায়ও একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই বৈঠকের চক্রান্তেরই ফল ছিল ভুট্টোর হুমকি। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতে ইয়াহিয়া খান সামরিক শক্তি প্রয়োগের জন্য অপারেশন ব্লিৎজ নামে একটা সম্ভাব্য পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। এর প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল পাকিস্তানে সামরিক শাসন দীর্ঘায়িত করার

[৩০৬] আতিউর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭), পৃ. ৯৮।
[৩০৭] সোবহান, *উতল রোমন্থন*, পৃ. ২৮৭-২৯৬।
[৩০৮] হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন*, পৃ. ২৪৯।

জন্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করা। এই পরিকল্পনার মূলে ছিল সেনাবাহিনীর আদেশ অমান্যকারী রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তাদেরকে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা। অপারেশন ব্লিৎজের প্রস্তুতির সময়ে তৈরি নির্ঘণ্ট থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে এটি ভুট্টোর ঢাকা থেকে ফেরার কাছাকাছি কোনো সময়ের পরিকল্পনা ছিল এবং করাচি ও লারকানা বৈঠকে এর চূড়ান্ত রূপরেখা অনুমোদিত হয়। একদিকে ভুট্টোর হুমকি ও ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মধ্যেকার করাচি-লারকানা বৈঠকের চক্রান্ত এবং অন্যদিকে অপারেশন ব্লিৎজ পরিকল্পনার ফল হিসেবে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ এক ঘোষণায় ৩ মার্চ (১৯৭১) অনুষ্ঠিতব্য ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন।[৩০৯] ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়।[৩১০] এই হরতাল আহ্বানের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয়। ২ মার্চ (১৯৭১) ঢাকায় হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে ২ জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঐদিন সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিন্দা প্রকাশ করেন এবং ৭ মার্চ (১৯৭১) পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই নতুন কর্মসূচিতে বলা হয় যে ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ (১৯৭১) পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল পালিত হবে এবং ৭ মার্চ (১৯৭১) বেলা ২টায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।[৩১১] ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু আহূত কর্মসূচি পালনকালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ঢাকায় পল্টন ময়দানে এক জনসভায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ[৩১২] প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণ ও নিপীড়নহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক রাজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়াও উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে। উপরন্তু, উক্ত সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৫টি কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয় যার মধ্যে অন্যতম ছিল- গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে প্রতিটি গ্রামে এবং এলাকায় মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হবে। উক্ত সভায় গৃহীত ইশতেহারে উল্লেখ করা হয় যে, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক'। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ছাত্রলীগ কর্তৃক আয়োজিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু তাঁর নিকট পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান করেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত সকল ধরনের ট্যাক্স প্রদান বন্ধ রাখার জন্য জনগণকে নির্দেশ দেন।[৩১৩] ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক ভাষণে পূর্ব বাংলার জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন,

> আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। ... এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। ... ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ... ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। ... যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে

---

[৩০৯] সোবহান, *উতল রোমন্থন*, পৃ. ২৯৬-২৯৮।

[৩১০] রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৭৫।

[৩১১] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৭১-৬৭৪; সোবহান, *উতল রোমন্থন*, পৃ. ২৮৭-২৯৮; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২২৬-২২৯; হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন*, পৃ. ২৪৬-২৫০।

[৩১২] পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' নামটি সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্মরণে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে ঘোষণা করেন, "আজ থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।" দেখুন, রহমান, *জনমানুষের মুক্তিযুদ্ধ*, পৃ. ৩০৪; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৯।

[৩১৩] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৬৬-৬৬৮ ও ৬৭১-৬৭৪; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২২৮-২৩০।

> দেওয়া হলো-কেউ দেবে না। ... এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।[৩১৪]

বস্তুতপক্ষে, পূর্ব বাংলার কৃষকেরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে ভূমির ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ ও নিপীড়নহীন কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেছিল, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে তারই প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। ঐ দিনই সন্ধ্যায় ভিন্ন এক ঘোষণায় পরবর্তী ৭ দিন (৮-১৪ মার্চ, ১৯৭১) আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু ১০ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন; এর মধ্যে অন্যতম ছিল সরকারকে খাজনা-কর না দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা।[৩১৫] স্বাভাবিকভাবেই কৃষক তথা জনসাধারণ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরকারকে খাজনা-কর দানে বিরত থাকে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) প্রচারপত্রের মাধ্যমে পূর্ববাংলার মুক্তির জন্য প্রত্যেক গ্রামে কৃষকদের গেরিলা লড়াইয়ে সংগঠিত করার আহ্বান জানায়।[৩১৬] অন্যদিকে ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ পূর্ব বাংলার গণ-মানুষের অন্যতম নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী 'পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন' শীর্ষক এক প্রচারপত্রে লিখেন, "প্রিয় দেশবাসী, আজ আমি সাতকোটি পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই জরুরি আহ্বান জানাইতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনারা দল, মত, ধর্ম ও শ্রেণি নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ একত্রে এবং একযোগে একটি সাধারণ কর্মসূচি গ্রহণ করুন, যার মূল লক্ষ্য হবে ২৩ বৎসরের অমানুষিক এবং শোষণকারী শাসকগোষ্ঠীর করাল কবল থেকে পূর্ববাংলাকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রক্ষা করা।"[৩১৭] ১৯৭১ সালের ১০ মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাসানী ঘোষণা করেন যে ২৫ মার্চের (১৯৭১) মধ্যে দাবি মেনে না নিলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে এক হয়ে বাঙালির স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করবেন। এই সভায় তিনি ১৪ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন যার মধ্যে পূর্ব বাংলার কৃষকের স্বার্থে বলা হয় : (১) উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ও সুষম বণ্টন এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদবিরোধী কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম এবং ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা; (২) শেখ মুজিবুর রহমান খাজনা, ট্যাক্স বন্ধের যে আহ্বান জানিয়েছেন তা যাতে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় তারজন্য সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে লবণ শুল্ক, নগর শুল্ক, হাট-বাজারের তোলা, খাজনা, ইনকাম ট্যাক্স, কৃষি ট্যাক্সসহ সমুদয় ট্যাক্স প্রদান সুসংগঠিতভাবে বন্ধ রাখা এবং (৩) ত্রিশ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য স্বেচ্ছায় উৎপাদন বৃদ্ধি ও পতিত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা।[৩১৮] অর্থাৎ ভাসানী মূলত বঙ্গবন্ধুর অনুরূপ কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যাহোক, বঙ্গবন্ধু ঘোষিত নির্ধারিত সাত দিনের আন্দোলনের শেষদিন অর্থাৎ ১৪ মার্চ (১৯৭১) এক বিবৃতির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এযাবত কার্যকরী সকল নির্দেশাবলি বাতিল করে তদস্থলে নতুন করে ৩৫ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং ১৫ মার্চ (১৯৭১) হতে এর ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এই ৩৫ দফা কর্মসূচির মধ্যে পূর্ব বাংলার কৃষকের উদ্দেশ্যে ১৭ নং দফায় কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বলা হয় : (ক) ধান ও পাটবীজ, সার ও কীটপতঙ্গনাশক ঔষধ ক্রয়, চলাচল ও বণ্টন অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার ও চাল গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং এর সকল প্রকল্পগুলো যথারীতি কাজ করবে। (খ) পাওয়ার পাম্প ও অন্যান্য

[৩১৪] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭০০-৭০২; রশিদ, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা*, পৃ. ৩০-৩৩।

[৩১৫] রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২৩১-২৩২।

[৩১৬] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭১৬-৭১৭; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২৩৩।

[৩১৭] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭১২; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২৩৩।

[৩১৮] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনত যুদ্ধ*, দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭১৯ ও ৭২৩-৭২৪; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২৩৩; আজাদ ও রেজা, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ২৩২-২৩৪।

কারিগরি যন্ত্রপাতির চলাচল, বণ্টন, মাঠে চালু রাখা ইত্যাদি অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া তেল, জ্বালানি, যন্ত্রপাতি ও এইসবের সংরক্ষণ এবং মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলা থাকবে। (গ) নলকূপ খনন, খাল খনন এবং এই জাতীয় পানিসেচ সম্পর্কিত সকল কাজ চালু থাকবে। (ঘ) পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও তার অঙ্গসংস্থাগুলো থানা সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সংস্থাগুলো থেকে কৃষিঋণ দেওয়া অব্যাহত থাকবে। (ঙ) যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো তার কার্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থার প্রয়োজনীয় শাখাগুলো খোলা থাকবে। (চ) কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকগুলো থেকে ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের জন্য সুদবিহীন ঋণ ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণ দেওয়া বলবৎ থাকবে। (ছ) আলু কিনে গুদামজাত করার জন্য কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের তহবিল মজুত রাখতে হবে। এছাড়াও ৩১ নং দফায় বলা হয় যে কোনো খাজনা-কর আদায় করা যাবে না। উপরন্তু, বলা হয় যে পুনঃনির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত : (১) সকল ভূমি-রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে; (২) বাংলাদেশের কোথাও কোনো লবণ-কর আদায় করা যাবে না; (৩) বাংলাদেশে কোথাও কোনো তামাক-কর আদায় হবে না; (৪) তাঁতিরা কোনো রকম আবগারি শুল্ক ছাড়াই মিল মালিক এবং ডিলারদের নিকট থেকে সুতা ক্রয় করবে।[৩১৯] একদিকে বঙ্গবন্ধুর এই ৩৫ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় সামরিক অভিযানের প্রস্তুতির জন্য কালক্ষেপণের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার অজুহাতে ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৯৭১ সালের ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক চলাকালে ২১ মার্চ (১৯৭১) ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং মুজিব-ভুট্টো-ইয়াহিয়া আলোচনার ছলে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পর্যাপ্ত সংখ্যক সামরিক বাহিনীর সদস্য ও বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জামাদি এনে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ২৫ মার্চ (১৯৭১) পৃথকভাবে ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করার সময় পূর্ব বাংলায় সামরিক অভিযানের নির্দেশ দিয়ে যান। তাঁর করাচি পৌঁছার পরপরই ঐ দিন রাত ১১টার দিকে প্রথমে ঢাকায় এবং পরে পূর্ব বাংলার প্রধান প্রধান শহরগুলোতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে যা 'অপারেশন সার্চলাইট' হিসেবে পরিচিত। পূর্ব বাংলায় এই সামরিক বাহিনী সশস্ত্র অভিযানের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ৩৫ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে যে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল তার সমাপ্তি ঘটে।

প্রশ্ন হলো নির্বাচনের পর বিশেষত ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত কর্মসূচির ভিত্তিতে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তথা কৃষকের প্রতিক্রিয়া কী ছিল এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে ভূমি বিরোধের রাজনীতির কী সম্পর্ক ছিল? সংক্ষেপে এর উত্তরে বলা যায় যে নির্বাচনের পর পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তথা কৃষকের ধারণা হয়েছিল যে যেহেতু কৃষকদের ভোটে বিজয়ী আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের কারণে সরকার গঠন করতে পারেনি, বরং বঙ্গবন্ধু ঘোষিত কর্মসূচি পালনের সময় তাদেরই আপনজনকে পুলিশ গুলি করে হতাহত করেছে এবং এই কর্মসূচিতেও খাজনা-করসহ তাদেরই স্বার্থগত বিষয়াদিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেহেতু তারা বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত কর্মসূচিকে পূর্ণ সমর্থন করে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, অসহযোগ আন্দোলনে ঘোষিত কর্মসূচিতেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর অনুরূপ কৃষক-শ্রমিক রাজ বা কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠাসহ খাজনা-কর বন্ধ রাখার আহ্বান নিঃসন্দেহে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তথা কৃষককে আকৃষ্ট করেছিল। অর্থাৎ একাত্তরের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলনে কৃষক তথা জনসাধারণের স্বার্থগত বিষয়াদির প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ফলে জনপ্রিয় এই কর্মসূচির আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকসহ প্রায় সকল

---

[৩১৯] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৩৮-৭৪৬; রশিদ, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা*, পৃ. ১৪৮-১৫৩; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২৩৪ ও ৪০৭-৪১৪।

শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে প্রকট ছিল। এর ফলে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের অঘোষিত প্রধান শাসকে পরিণত হন এবং পূর্ব পাকিস্তানে কার্যত তাঁর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নির্দেশ দিতেন এবং অপরদিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়ক থেকে বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিতেন, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশই মেনে চলতো। অফিস, আদালত, ব্যাংক, বীমা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, গাড়ি, শিল্প কারখানা সর্বত্র বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মতো চলছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার খানের সকল নির্দেশ অমান্য করে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের সকল শ্রেণির মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল ইতিহাসে বিরল। এভাবেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের সার্বজনীন নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মূলত ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ হতে ২৫ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধুই তার পরিচালনা করেছিলেন।[৩২০] অর্থাৎ ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সময় সরকার প্রধান না হয়েও কার্যত তাঁর নির্দেশেই পূর্ব পাকিস্তানের সকল কার্যাবলী পরিচালিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে জিল্লুর আর. খান বলেন,

> Popular compliance and organizational endorsement of Mujib's directive demonstrated that his government was gradually assuming a positive role of decision-making. The original exemptions of the general rules of non-cooperation and civil disobedience were being substituted with positive directives of governmental policy. In this change of role of Sheikh Mujib and his Awami League Party, an increasingly effective process of codification of unwritten rules and development of effective procedures became clearly noticeable. Both Mujib and his party were experiencing a rare political process through which a *de jure* government was becoming a *de facto* government, notwithstanding the politico-legal barriers it was required to cross.[321]

সুতরাং ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তথা কৃষকরা প্রধানত ভূমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ খাজনা-কর হতে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। অর্থাৎ তাদের আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

৫.৪.৭ কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠায় স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে (২৫ মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে[৩২২]) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বমুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[৩২৩] বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন :

> This may be my last message, from to-day Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.[324]

---

[৩২০] রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৭৫-২৭৬।

[৩২১] Khan, *The Third World Charismat : Sheikh Mujib and the Struggle for Freedom*, pp. 99-100.

[৩২২] রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৭৬।

[৩২৩] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, মুজিবনগর : প্রশাসন, তৃতীয় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : দি প্রিন্টার্স, ১৯৮২), পৃ. ১; রশিদ, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা*, পৃ. ১১০; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২৩৬।

[৩২৪] রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৭৬।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্দি[৩২৫] হওয়ার পূর্বেই তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণাটি বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়্যারলেস, টেলিফোন এবং টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।[৩২৬] আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেনের মতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়। তিনি বলেন যে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়ারলেসযোগে চট্টগ্রাম প্রেরণ করা হয়। এটি প্রথমে চট্টগ্রাম শহরে সাইক্লোস্টাইল করে প্রচার করা ছাড়াও মাইকিং করেও জনসাধারণকে জানানো হয় এবং পরে তা দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচারিত হয়। এমনকি, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বিবিসি'র প্রভাতি অধিবেশনেও বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম কালুরঘাট 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন। একই কেন্দ্র থেকে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট) প্রথমে নিজ নামে এবং পরে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন। এরপর ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ অনেকেই ঘোষণাটি প্রচার করেন।[৩২৭] এখন প্রশ্ন হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ পূর্ব বাংলার কৃষকরা কীভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং এর ফল কী ছিল? সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে প্রথমত, পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তথা কৃষকরা প্রত্যাশা করেছিল ঔপনিবেশিক শাসনামলের জমিদার ও জোতদার কর্তৃক দীর্ঘদিনের শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তি পাবে। বিশেষত পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের পর থেকেই তাদের এই প্রত্যাশা আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তা তো হয়ইনি বরং সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন এবং ১৯৬১ সালের ভূমিস্বত্ব আইন প্রণয়নের পর দেখা গেল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের প্রত্যাশার ফল হলো উল্টো। আইয়ুব সরকার কর্তৃক উক্ত দু'টি পদক্ষেপের ফলস্বরূপ ভূমি বিরোধ তথা জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব বহু মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। তাঁর শাসনামলে একদিকে রাষ্ট্র তথা সরকার কর্তৃক খাজনা ও অন্যান্য কর বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয় এবং তা আদায়কালে সার্টিফিকেট মামলাসহ নানাভাবে পূর্ব বাংলার কৃষক তথা জনসাধারণ প্রচণ্ডভাবে শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয় (এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। অন্যদিকে রাষ্ট্র তথা সরকারের সহযোগিতায় জোতদাররাও ভোটাধিকারহীন কৃষকদের ওপর ইচ্ছেমতো শোষণ ও নিপীড়ন চালিয়ে যায় (এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। ফলে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের ধারণা হয়েছিল যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের তথা সরকারের পরিবর্তন বা পতন ঘটিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলেই কেবলমাত্র খাজনা ও অন্যান্য কর বৃদ্ধি এবং সার্টিফিকেট মামলাসহ নানাবিধ শোষণ ও নিপীড়ন হতে তারা মুক্তি পাবে। উপরন্তু, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হলে পাকিস্তান রাষ্ট্র তথা সরকারের অন্যতম সহযোগী জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়ন হতেও তারা স্থায়ীভাবে অব্যাহতি পাবে। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের মূল লক্ষ্য স্থির হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের মুক্তি লাভ। এই লক্ষ্যে স্বাধীনতা ঘোষণার পর দেশের জনসাধারণ তথা কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয়ত, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হতেই পাকিস্তান সরকারের অন্যতম সহযোগী জোতদারাই ছিলেন দেশের বিভিন্ন স্থানে গঠিত শান্তি কমিটির প্রভাবশালী সদস্য। অনেক স্থানে তারাই ছিলেন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান বা আহ্বায়ক। গ্রামাঞ্চলে তাদের নেতৃত্বেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী

[৩২৫] পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১:৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং এর তিন দিন পর তাঁকে বন্দি অবস্থায় পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। দেখুন, রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৭৭।

[৩২৬] রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৭৬।

[৩২৭] আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস* (ঢাকা : বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ২২৭-২২৮।

জনসাধারণ তথা কৃষকদের হত্যা করা হচ্ছিল এবং তাদের ধনসম্পদ লুঠতরাজ ও তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। এমনকি গ্রামাঞ্চলে তাদের নেতৃত্বেই কৃষক তথা জনসাধারণের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে নিজেরা অথবা পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের ইজ্জত লুণ্ঠিত ও শ্লীলনতাহানি করে এবং এমনকি অনেককে হত্যাও করে।[৩২৮] ফলে স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘদিনের শোষণ ও নিপীড়নকারী জোতদাররা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের ওপর নতুন করে যে নির্মম-নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয় মূলত তার ফলস্বরূপ জোতদারদের চিরস্থায়ীভাবে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুতরাং স্বাধীনতা যুদ্ধে জোতদারদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল ভূমি বিরোধ তথা জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ। অন্যান্য কারণে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও কৃষকদের অংশগ্রহণের মূল লক্ষ্য ছিল ভূমির ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ শোষণ ও নিপীড়নহীন কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

তৃতীয়ত, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাস ব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালে প্রধানত আওয়ামী লীগ এবং ন্যাপ-ভাসানীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সংগঠন সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের স্বার্থগত বিষয়াদি বিশেষত কৃষিসহ ভূমি সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে যেসব কর্মসূচি ও কার্যসূচি ঘোষণা করে তাতে স্বাভাবিকভাবেই তারা মনে করেছিল যে স্বাধীনতা অর্জিত হলেই তাদের দীর্ঘদিনের শোষণ ও নিপীড়নের অবসানের প্রত্যাশা পূরণ হবে এবং বঙ্গবন্ধু ঘোষিত কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়।[৩২৯] মাহবুবর রহমানের মতে ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট ও তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় যা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ভারতের শিলিগুড়ির 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে'র এক ভাষণে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়।[৩৩০] ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহাকুমার (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে বাংলাদেশ সরকারের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। এই অভিষেক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ইউসুফ আলী (এমএনএ) নতুন রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। অভিষেক অনুষ্ঠানের ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সরকারের নামকরণ করা হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' যা মুজিবনগর সরকার নামে সমধিক পরিচিত।[৩৩১] যাহোক, কৃষকেরা দীর্ঘদিনের শোষণ ও নিপীড়নের অবসান ঘটিয়ে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষত ভূমির ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত পাকিস্তানি শাসক এবং জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন যুদ্ধে বিজয়ী হলে কৃষকদের ভূমির ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ খাজনা-কর হতে মুক্তি লাভসহ শোষণ ও নিপীড়নহীন কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের বিভিন্ন কর্মসূচিও প্রদান করেছিল। নিঃসন্দেহে এসব কর্মসূচি কৃষকদেরকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯৭১ সালের ৫ মে 'পূর্ব

---

[৩২৮] বিস্তারিতভাবে দেখুন, মামুন, *শান্তিকমিটি*, পৃ. ২০৫-২০৮, ২১০, ২১৩, ২১৮-২২২, ২২৪, ২২৮, ২৩২, ২৪৮-২৫২ ও ২৬২-২৭১; শরীফ, *নীলফামারী*, পৃ. ৩৯-৪০, ১৬০-১৬৫; সুমা কর্মকর, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ, নাটোর জেলা*, জরিপ গ্রন্থমালা ৪ (খুলনা : ১৯৭১-গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৮), পৃ. ৬১-৬৫ ও ১১২-১২৪; সরকার, *একাত্তরে বাগেরহাট*, পৃ. ১০২-১০৩।

[৩২৯] রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৭৭।

[৩৩০] ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করা হয়। দেখুন, রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২৪৬।

[৩৩১] ১৯৭০ সালের নির্বাচনী রায় এবং ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাকে ভিত্তি ধরে '৭১-এর ১০ এপ্রিল আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্যদের পক্ষে একটি 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এই ঘোষণাপত্র অধ্যাপক ইউসুফ আলী পাঠ করেন। এটিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার 'সাংবিধানিক ঘোষণা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ঘোষণাপত্র সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৯৪-২৯৫; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২৪৬-২৫১।

বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতি মাওলানা ভাসানীর আবেদন-দালাল, বিশ্বাসঘাতক ও মোনাফেক হইতে সাবধান' শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশ করে বলা হয় যে দীর্ঘকাল যাবত পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের নির্মম শোষণ ও শাসনে পূর্ব বাংলা 'আজ কঙ্কালসার' হয়ে পড়েছে। ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনসাধারণ এই শোষকদের বার বার নির্মূল করার চেষ্টা করলেও তাদের সমূলে বিনাশ করতে পারেনি। পূর্ব বাংলাকে তারা চিরস্থায়ী 'দুর্ভিক্ষ-বন্যা-মহামারীর' দেশে পরিণত করেছিল। মুসলমান হয়েও পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষকসহ সকল পেশার মানুষকে ধর্ম, সংহতি ও ইসলামের দোহাই দিয়ে তাদের ধনসম্পদ হরণ করে তাদের কপর্দকশূন্য করে ফেলেছিল। তারা পূর্ব বাংলার কৃষির উন্নয়ন করেনি এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও করেনি। এমতাবস্থায় পূর্ব বাংলার কৃষকসহ সকল পেশার মানুষের নিকট তিনি আবেদন জানান, যে জনযুদ্ধ শুরু হয়েছে তা শুধু বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম নয়, তা পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচার-অবিচার হতে নিপীড়িত, নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামও বটে।[৩৩২] এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে এই যুদ্ধ ছিল মূলত তাদের মুক্তির সংগ্রাম। এই মুক্তি ছিল ভূমির ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও খাজনা-করসহ ভূমি সংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিপীড়ন হতে চিরস্থায়ী মুক্তি লাভ। ১৯৭১ সালের ১৮ মে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে নবগঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জনসাধারণ তথা কৃষকদেরকে আশ্বস্ত করে বলেন যে সত্তরের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ জনগণকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার প্রতিটি তারা পালন করবে। তিনি আরও বলেন যে আওয়ামী লীগের সরকার ভূমিহীনকে ভূমিদান, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, বড় বড় শিল্প জাতীয়করণের মাধ্যমে দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তি অর্জনে সহায়তা করার আবেদন জানান।[৩৩৩] অর্থাৎ সত্তরের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ যে কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা যুদ্ধ শেষে বাস্তবায়ন করা হবে বলেও যুদ্ধকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতি কৃষকদের নিকট অঙ্গীকার করেছিলেন। নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালে আওয়ামী লীগ সরকারের এই ঘোষণায় দেশের কৃষকরা নিশ্চিত হয়েছিল যে এই যুদ্ধে বিজয়ী হলে তারা তাদের বহু প্রত্যাশিত ও কাঙ্ক্ষিত শোষণ ও নিপীড়নহীন কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। সুতরাং তারা তাদের স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৭১ সালের ১ জুন বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী ন্যাপ), পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (দেবেন শিকদার গ্রুপ), শ্রমিক-কৃষক কর্মী সংঘ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (হাতিয়ার), পূর্ব বাংলা কৃষক সমিতি, পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন এবং পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' গঠন করে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত একটি ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের জনগণের নিকট করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে ১৫ দফা দাবি উপস্থাপন করে। ১৫ দফা দাবির মধ্যে অন্যতম ছিল : (১) বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে জনতার বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সর্বদলীয় গণ-মুক্তি পরিষদ গঠন করতে হবে। এই গণ-মুক্তি পরিষদ গ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও সর্ববিধ কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে, গ্রামরক্ষীবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করবে এবং গ্রাম আদালত গঠন করে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করবে। (২) পাক-জঙ্গীশাহী সরকারকে দেওয়া খাজনা, ট্যাক্স, ঋণ ও সুদ পরিশোধ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখতে হবে। (৩) যারা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য মজুত রাখবে, গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ তাদের

---

[৩৩২] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৩-৪৯৭।

[৩৩৩] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, মুজিবনগর : গণমাধ্যম, ষষ্ঠ খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : দি প্রিন্টার্স, ১৯৮২), পৃ. ৩১-৩৩।

সেই উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করে গরিব জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। (৪) গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ গ্রামে গরিব জনসাধারণের ওপর নিপীড়নমূলক মহাজনী ব্যবস্থা বন্ধ করবে। (৫) যারা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে কোনো প্রকার সহযোগিতা ও সাহায্য প্রদান করবে অথবা চর হিসেবে কাজ করবে, গ্রাম গণ-মুক্তি পরিষদ তাদের কঠোরতম শাস্তি প্রদান করবে এবং তাদের সকল সম্মত্তি বাজেয়াপ্ত করে গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করবে। (৬) যে সকল জোতদার জাতীয় মুক্তির সপক্ষে থাকবে তাদের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের ওপর জোতদারের পুরাতন শোষণ লাঘব হয়। (৭) গ্রামে গ্রামে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র ও অন্যান্য তরুণদের সমন্বয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেরিলা দল গঠন করতে হবে।[৩৩৪] সুতরাং স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের মূল লক্ষ্য ছিল জোতদারদের পতন ঘটিয়ে শোষণ ও নিপীড়নহীন কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণ করা।

১৯৭১ সালের ৩০ নভেম্বর পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের জনগণের সামনে স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা ও কর্মসূচি প্রকাশ করে। এই কর্মসূচিতে বলা হয় যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ওপর কেবলমাত্র পাকিস্তানি শাসকরাই শোষণ ও নিপীড়ন চালায়নি-তাদের সাথে শোষকের শরিকদার ছিল জোতদার ও মহাজন তথা সামন্তবাদী শ্রেণি। বস্তুতপক্ষে, পূর্ব বাংলার কৃষক তথা মেহনতি জনগণের মূল শত্রু ছিল পাকিস্তানি শাসক ও তার অনুগত ও সহযোগী জোতদাররা। উক্ত কর্মসূচিতে আরও বলা হয় যে পূর্ব বাংলার কৃষক তথা মেহনতি জনগণ ও তাদের সন্তানদের দ্বারা গঠিত মুক্তিবাহিনীই হলো মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি। এই কর্মসূচিতে কৃষক এবং কৃষি সমস্যার সমাধানে বলা হয় : (১) বাংলাদেশের আধাসামন্তবাদী তথা জোতদারি ব্যবস্থার অবশেষকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করতে হবে। (২) 'যে চাষ করে জমি তার' এই নীতির ভিত্তিতে কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা হবে। (৩) জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জোতদার ও মহাজনদের সমস্ত জমি ও কৃষি যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করে গরিব কৃষক, ক্ষেতমজুর ও বর্গাচাষীদের মধ্যে প্রয়োজন অনুপাতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। (৪) আবাদযোগ্য পতিত জমি ও সরকারি খাস জমিসমূহ কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। (৫) ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তির নামে যুগ যুগ ধরে কৃষকদেরকে যে শোষণ করা হচ্ছে তাকে বিলুপ্ত করা হবে। (৬) কৃষি শ্রমিক বা ক্ষেতমজুরদের জন্যে উপযুক্ত মজুরি পাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (৭) জাতীয় শত্রু জোতদার ও মহাজনদের নিকট যে সমস্ত কৃষক-মজুর ও গরিব কুটিরশিল্পী যুগ যুগ ধরে ঋণগ্রস্ত, তাদেরকে ঐ ঋণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করা হবে। (৮) কৃষকদের ও কুটিরশিল্পীদের জন্য বিনাসুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পাবার ব্যবস্থা করা হবে এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির উচিতমূল্য পাবার ব্যবস্থা করা হবে। (৯) সকল প্রকার ইজারাদারিসহ প্রচলিত খাজনা প্রথার বিলোপ সাধন করা হবে। সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফ করা হবে। 'খাজনা প্রথার স্থলে উৎপাদন অনুসারে কর আদায়ের প্রথা' প্রবর্তন করা হবে। নিম্ন আয়ের কৃষক ও গরিব কুটিরশিল্পীদের জন্য-যাদের ভরণ-পোষণের পর উদ্বৃত্ত থাকে না-তাদেরকে উৎপাদন কর থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।[৩৩৫] অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার কৃষক তথা মেহনতি জনগণের শত্রু হিসেবে পাকিস্তানি শাসক ও জোতদারদের চিহ্নিত করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধে শত্রুর নিধন ও পতন ঘটিয়ে বিজয়ী হওয়াই ছিল কৃষকদের মূল লক্ষ্য। উপরন্তু, যুদ্ধে বিজয়ী হলে দীর্ঘদিনের শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্ত হয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য কী কী পদক্ষেপ গৃহীত হবে সে সম্পর্কেও তাদের কাছে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং পূর্ব বাংলার কৃষকদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত জোতদারদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা এবং পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের

[৩৩৪] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫০৯-৫১৫।
[৩৩৫] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬০৫-৬১৫।

অবসানের উদ্দেশ্যে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শাসন ব্যবস্থা ও তার পুনর্গঠনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন [স্মারক নং পিসি-১৪৩/(২)/৭১] প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে উপস্থাপিত ভূমি সম্পর্কিত বিষয়াদিই বাংলাদেশ সরকারের ভূমি নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের ভূমি নীতিতে কৃষকের ভূমি রাজস্ব মওকুফ সম্পর্কে বলা হয়,

> The Awami League is committed to the following principle in regard to land revenue : 'The burden of land revenue bears heavily upon our peasants population. As a measure of immediate relief, all holdings up to 25 bighas (8.33 acres) throughout Pakistan (now it will be throughout Bangladesh) shall be exempt from the payment of land revenue and arrears in respect of such plots shall be written off. The ultimate aim is the total abolition of the present system of land revenue. The land records system shall be simplified and improved.[336]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে এনামুল হকের রচিত 'অস্ত্র হাতে তুলে নাও' নৃত্যনাট্যে বলা হয়েছিল, "তবুও আসবে জোতদার, চাইবে ধানের ভাগ তার, বল কি হে ভোট দিয়ে কি পেটের ক্ষুধা যাবে? অস্ত্র হাতে তুলে নাও।"[৩৩৭] এভাবে কবি-সাহিত্যিকরা পাকিস্তানি স্বৈরশাসক এবং দোসর জোতদারদের বিরুদ্ধে অসংখ্য নৃত্যনাট্য, গান, কবিতা প্রভৃতি রচনা করে মুক্তিযোদ্ধদের সাহস এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। সুতরাং ১৯৭১ সালে সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধে সত্তর সালের নির্বাচনে নির্বাচিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা একদিকে কবি-সাহিত্যিকদের রচনা থেকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছিল এবং অন্যদিকে নবগঠিত আওয়ামী লীগ সরকারসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন হতে ভবিষ্যতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিও পেয়েছিল। এ কারণে ১৯৭১ সালের দীর্ঘ নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের সেই বহু কাঙ্ক্ষিত 'কৃষক রাজ' তথা শোষণ ও নিপড়িনহীন কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর *নতুন বাংলা* (১ম বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা) সংবাদপত্রে 'স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার সমীপেষু' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়,

> আজ একথা বলবার প্রয়োজন রাখে না যে-গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শকে সামনে রেখেই এদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও যুবক স্বাধীনতার লড়াইয়ে জীবন দিয়েছে। জীবন ছাড়া যেমন জীব হয় না তেমনি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ছাড়া স্বাধীনতার কোনো অর্থ হয় না। কৃষকরা বলাবলি করছে এবারে তারা জমি পাবে, পাটের ন্যায্য মূল্য পাবে, প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমবে, ঘুষ রিশওয়াত ও অন্যান্য দুর্নীতির হাত হতে মুক্তি পাবে। তাদের সন্তান ছাত্র ভাবে এবার তাঁর লেখা-পড়ার সুযোগ হবে। তাদের সন্তান যুবক মনে করে এবার তাঁর চাকুরির সংস্থান হবে। অন্য পেশার মানুষেরাও মনে করেছিল তাদেরও গতি হবে। এককথায় আজ এদেশের কৃষকসহ আপামর জনসাধারণ ভাবছে-পারব এবার মানুষের মতো বাঁচতে, কথা বলার অধিকার পাব।[৩৩৮]

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে একদিকে ছিল কায়েমি স্বার্থবাদী পক্ষ তথা পশ্চিম পাকিস্তানপন্থী স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার ও তার অনুগত-সহাযোগী হিসেবে পরিচিত জোতদাররা এবং অন্যদিকে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তথা কৃষকেরা ও তাদের ভোটে নির্বাচিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিরা। আতিউর রহমানের মতে স্বাধীনতা যুদ্ধে মধ্যবিত্তের ভূমিকা ছিল নেতৃত্বমূলক। বস্তুতপক্ষে, সত্তর সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকেরা যে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিলেন সেই প্রতিনিধিরাই একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে মূল নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। তাদের নেতৃত্বেই কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

---

[৩৩৬] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৫৭।
[৩৩৭] *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ*, দলিলপত্র, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৭৪৩-৭৪৮।
[৩৩৮] রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮৪-৩৯০।

রহমানের তথ্য মতে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রায় চার-পঞ্চমাংশ মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন কৃষক পরিবারের সন্তান এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ৭৮ ভাগই এসেছিলেন গ্রাম থেকে। অধিকাংশের পিতাই ছিলেন কৃষক। অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কৃষক শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ ছিল সর্বোচ্চ। রহমানের পরিচালিত এক গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ৯১ ভাগের মূল লক্ষ্য ছিল শোষণ ও নিপীড়নহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর মতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে 'কৃষকসমাজ সরাসরি এবং তাদের সন্তান ও আত্মিক পরিমণ্ডলের দ্বারা সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণি' মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৩৩৯] সুতরাং দীর্ঘদিন ধরে শোষণ ও নিপীড়নহীন কৃষক সমাজ তথা 'কৃষক রাজ' প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষকরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে তারা তা বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

৫.৫ উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে পাকিস্তান আমলে ভূমি বিরোধের রাজনীতি তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নেই বিদ্যমান ভূমি বিরোধকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের ভোটের রায়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে একদিকে জমিদার প্রভাবিত ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পরাজয়ের মাধ্যমে কাগুজে সংগঠনে পরিণত হয় এবং অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক দল তথা নব গঠিত আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ও আইনগতভাবে জমিদার শ্রেণি বিলুপ্ত হয় এবং তাদেরই একটি অংশ বিদ্যমান জোতদার শ্রেণিভুক্ত হয়ে যায়। যদিও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর সামগ্রিকভাবে জোতদার শ্রেণি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব সরকারের মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন, ১৯৬১ সালের ভূমিস্বত্ব আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমির ঊর্ধ্ব সীমা বৃদ্ধি এবং শাসনকর্তৃপক্ষের সমর্থন ও সহযোগিতায় পুনরায় তারা প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠে। এর ফলে ভোটাধিকারহীন কৃষকরা ভীষণভাবে শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়। উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে একদিকে আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর ষাটের দশকের ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনের ফলস্বরূপ সত্তরের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকরা ভোটাধিকার ফিরে পায়। এর ফলে ভোটের রাজনীতিতে তাদের গুরুত্বও অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তারাই ছিল নির্বাচনী বিজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি। উল্লেখ্য, সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ভূমি সমস্যার সমাধানসহ 'কৃষক রাজ' প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এই প্রতিশ্রুতির ফলস্বরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের রায়ে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হয়। কিন্তু বিজয়ী হলেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের কারণে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে পারেনি। মূলত নির্বাচনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের পরিণামে দেশে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে একদিকে ছিল নির্বাচিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে শোষিত ও নিপীড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকরা এবং অন্যদিকে ছিল তাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত পাকিস্তানি শাসক ও শাসকের সহযোগী জোতদাররা। স্বাভাবিকভাবেই শত্রু দমনের উদ্দেশ্যে কৃষকরা

---

[৩৩৯] রহমান, *জনমানুষের মুক্তিযুদ্ধ*, পৃ. ২৪, ৪৬১ ও ৪৮৩।

স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। কৃষকদের মনে এই ধারণারও সৃষ্টি হয়েছিল যে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ী হলেই বঙ্গবন্ধু ঘোষিত 'কৃষক রাজ' প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকরা প্রধানত ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ ভূমি সংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিপীড়ন হতে অব্যাহতি লাভ বা শোষণ ও নিপীড়নহীন কৃষক সমাজ তথা 'কৃষক রাজ' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত করার পেছনে প্রধান কারণ ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

এই গবেষণায় (১৮৮৫-১৯৭১) প্রধানত ভূমি-কেন্দ্রিক রাজনীতি এবং তার পরিণতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে ভূমির সঙ্গে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সরকার, জমিদার, জোতদার ও কৃষকের পরিবর্তন এবং এর পরিণতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকার, জমিদার, জোতদার ও কৃষকের মধ্যে একটি বস্তুতাত্ত্বিক উৎপাদন ও উৎপাদন-কেন্দ্রিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আরও উল্লেখ্য যে, ঔপনিবেশিক আমলে, এমনকি, পাকিস্তান শাসনামলেও ভূমি ছিল সরকার ও জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস। পাকিস্তান শাসনামলের শেষ দিকে অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালের জি.ডি.পি-তেও কৃষি খাতের অবদান ছিল ৬২.৪২%। স্বাভাবিকভাবেই এই গবেষণার সময়কালে সরকার, জমিদার, জোতদার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক তথা জনসাধারণের নিকট ভূমির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। একদিকে সরকারের লক্ষ্য ছিল জমিদার ও জোতদারদের পক্ষে রেখে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বহাল থেকে আপন স্বার্থ রক্ষা করা, জমিদার ও জোতদারদের লক্ষ্য ছিল সরকারের সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা এবং অন্যদিকে কৃষকদের লক্ষ্য ছিল ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ ভূমিসংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তি লাভ করা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে ব্রিটিশ ও পাকস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলা তথা পূর্ব বাংলায় শোষণের প্রক্রিয়াকে বলশালী করার অভিলাষে অর্থকরী ফসল উৎপাদন এবং শিল্পায়নের প্রয়াস চলেছিল। ফলে ব্রিটিশ আমলের 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন' এর ধারাবহিকতা পাকিস্তান আমলেও অজ্ঞাতসারেই অংশত অব্যাহত ছিল। এই উন্নয়নের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সমাজের বস্তুতাত্ত্বিক উৎপাদনের শক্তিসমূহের সাথে বিদ্যমান উৎপাদন কেন্দ্রিক সম্পর্কসমূহের দ্বন্দ্বের সূচনা করেছিল। পরবর্তীকালে এই দ্বন্দ্ব আরও প্রকট আকার ধারণ করে সামাজিক সংগ্রামের পটভূমি রচিত হয়। এই সংগ্রাম বা জনযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

প্রশ্ন হলো, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের ভূমি সংস্কারের ফলাফল কী ছিল? এর উত্তরে বলা যায় যে ঔপনিবেশিক সরকার রাজস্ব আদায় নিশ্চিত ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে সরকারি নীতি কৌশলে পরিবর্তন এনে ভূমি সংস্কার করেছিল। এর মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুর দিকে ১৭৯৩ সালের ভূমি সংস্কার ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সংস্কারের মাধ্যমে একদিকে ভূমিস্বত্বের ওপর জমিদারদের সম্পূর্ণ একক অধিকার ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অন্যদিকে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকরা তাদের চিরাচরিত ভোগদখলীয় অধিকার হারিয়ে ফেলে। এরপর ১৭৯৫, ১৭৯৯, ১৮১২ এবং ১৮১৯ সালের ভূমি সংস্কারের ফলে ভূমিস্বত্বের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একদিকে জমিদার ও জোতদাররা অতিমাত্রায় ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল এবং অন্যদিকে ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকারহীন কৃষকদের ওপর তাদের শোষণ ও নিপীড়ন মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ১৭৯৩ সালের ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ভূমি বিরোধের সূচনা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালের ভূমি সংস্কারে এই বিরোধের তীব্রতা আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ভূমি বিরোধের ফলে কৃষি অসন্তোষ দেখা দেয় এবং কৃষকরা সংগ্রাম-মুখর হয়ে উঠে। ফলে সংঘটিত হয় অসংখ্য কৃষক আন্দোলন/বিদ্রোহ। সুতরাং ভূমি সংস্কারের মাধ্যমেই ভূমি বিরোধের সূচনা হয়েছিল এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভূমি বিরোধ হ্রাসের উদ্দেশ্যে সরকার ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের কিছুটা অধিকার প্রদান করে। সূচনা হয় কৃষকদের অধিকারহীন থেকে

অধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রা। উপরন্তু, এই আইনে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের কিছুটা অধিকার প্রদান এবং অবৈধ আদায়ের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে জমিদারদের প্রাধান্য কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গবিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সরকার ১৯০৭ সালে জমিদারদের মাত্রাতিরিক্ত খাজনা এবং অন্য বাড়তি আদায়ের অধিকার প্রদান করায় ভূমিস্বত্বের ওপর জমিদার ও জোতদারদের পুনরায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার পূর্বের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পায়। তবে বিশ শতকের সূচনায় সম্প্রসারিত ও জোরালো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংস্পর্শে কৃষকরা পূর্বের তুলনায় অধিক সচেতন হয়ে উঠে। এই আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় কৃষকরা জমিদার ও জোতদারের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। উপরন্তু, বিশ শতকের বিশের দশকের সূচনায় খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের সঙ্গে কৃষকদের সম্পৃক্ত করার ফলে কৃষকদের অধিকার সচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এমনকি, এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বিদেশি জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের ব্যবহার করার কারণে কৃষকরা দেশীয় জমিদার এবং জোতদারদের বিরুদ্ধেও নিজেদের অধিকার আদায়ের কৌশল রপ্ত করতে শুরু করে। ১৯২৮ সালের সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নকালে মুসলমান জমিদার ও জোতদার শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রত্যক্ষভাবে ভূমিস্বত্বের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তথা কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রধানত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকার কারণেই প্রণীত ১৯২৮ সালের আইনে পূর্বের তুলনায় ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকতর অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বিজয়ী এ কে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃত্বে গঠিত কোয়ালিশন সরকার ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করলে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের আরও বেশি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভূমি বিরোধের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু তখনো পর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা জমিদারি প্রথা বিদ্যমান থাকায় ভূমিসংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিপীড়নও অব্যাহত থাকে। সুতরাং ঔপনিবেশিক আমলে ভূমিস্বত্বের ওপর জমিদার, জোতদার ও কৃষকের অধিকার হ্রাস-বৃদ্ধিতে ভূমি সংস্কারের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। এটা সত্যি যে ঔপনিবেশিক শাসনামলের সূচনায় ভূমি সংস্কারের কারণে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকরা অধিকারহীন হয়ে পড়লেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্যায়ের ভূমি সংস্কারে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অনেকাংশে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হলো অবিভক্ত বাংলায় ভূমি বিরোধের পরিণতি কী হয়েছিল? এর উত্তরে বলা যায় যে ব্রিটিশ আমলের প্রথমদিকে বিশেষ করে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা জমিদারি প্রথার প্রবর্তনে ফলে জমিদাররা ভূমিস্বত্বের ওপর নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। একইসঙ্গে ব্রিটিশ শাসন কর্তৃপক্ষের অনুগত এবং সহযোগী হিসেবে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায়ও জমিদাররা ব্যাপৃত ছিল। পরবর্তীকালে ১৮১৯ সালের পত্তনি আইন প্রণয়নের ফলে একইভাবে জোতদাররাও ভূমিস্বত্বের ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বৈধ অধিকার অর্জন করে এবং পাশাপাশি জমিদারদের অনুগত ও সহযোগী হিসেবে কিছুটা হলেও ভূমিস্বত্বের ওপর নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারে সুযোগ লাভ করে। কাজেই কৃষকরা ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার হারিয়ে সংগ্রাম-মুখর হয়ে উঠে। একদিকে ভূমিস্বত্বের ওপর জমিদার ও জোতদারদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং অন্যদিকে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকারহীনতা ও তাদের ওপর জমিদার ও জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়নের ফলে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। এই বিরোধে সবসময় ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ অনুগত ও সহযোগী হিসেবে জমিদার ও জোতদারদের পক্ষ সমর্থন করে এবং

তাদের পক্ষে ভূমিকা পালন করে। যেমন ভূমি বিরোধের কারণে সৃষ্ট তিতুমীরের আন্দোলন, ফরায়েজি আন্দোলন, পাবনার কৃষক বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের জামালপুরের কৃষক বিদ্রোহ, পাবনার চাটমোহরের বর্গাদার কৃষকদের জোরদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন প্রভৃতি কৃষক আন্দোলনে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ জমিদার ও জোতদারদের পক্ষ সমর্থন করেছিল। অন্যদিকে জমিদার ও জোতদাররাও ব্রিটিশ বিরোধী যে কোনো আন্দোলনে শাসন কর্তৃপক্ষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। যেমন সিপাহী বিদ্রোহ বা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলনের সময় জমিদাররা ব্রিটিশদের পক্ষে ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি, গোড়া থেকেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জমিদার ও জোতদার শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ঔপনিবেশিক শাসন কর্তৃপক্ষের স্বার্থ রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভূমি বিরোধ ও রাজনীতি একে অপরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। কারণ এই দু'টি রাজনৈতিক দলের জমিদার ও জোতদার শ্রেণির নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থে ব্রিটিশ শাসন কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করেছিল। ফলে উভয়ের মধ্যে (শাসন কর্তৃপক্ষ এবং জমিদার ও জোতদার শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ) পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ কারণেই ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯২৮ সালের সংশোধিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নকালে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষায় ঔপনিবেশিক সরকার কৌশলী ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি, তেভেগা আন্দোলনের সময় তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী বর্গাদারি তেভাগার স্বীকৃতি ও বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করতে অর্ডিন্যান্স জারির ঘোষণা দিলেও তৎকালীন বাংলার গভর্নরের আপত্তি কারণে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও ঔপনিবেশিক সরকার প্রচুর সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র, দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিয়াল রাখার বৈধ অনুমোদন দিয়ে জমিদার এবং জমিদারি রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এ কারণে ঔপনিবেশিক আমলে কৃষকদের নির্মমভাবে শোষণ ও নিপীড়ন করা হলেও তুলনামূলক বিচারে কৃষক আন্দোলন/বিদ্রোহের সংখ্যা ছিল অতি নগন্য। তবে শাসনকর্তৃপক্ষ এবং জমিদার ও জোতদারদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমর্থনমূলক সম্পর্ক বিশ শতকের বিশের দশক পর্যন্ত অটুট থাকলেও ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটের রাজনীতি সূচনা হলে এই সম্পর্ক ধীরে ধীরে চিড় ধরতে শুরু করে। উল্লেখ্য, বিশ শতকের বিশের দশক পর্যন্ত প্রধানত ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের জমিদার ও জোতদারদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ও সম্প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের সময় উভয় ধর্মের জমিদার ও জোতদারদের মধ্যে ভূমিস্বত্ব এবং রাজনীতিতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি হয়। এই আইনে ভোট রাজনীতি প্রবর্তনের পর হিন্দু ও মুসলমান জমিদার ও জোতদারদের মধ্যে স্ব-ধর্মীয় সচেতনতা এবং ঐক্যবদ্ধতার সম্পর্ক গড়ে উঠে। এমনকি, মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনে প্রত্যক্ষ ভোটের নির্বাচনী নীতি গ্রহণের পর জমিদার ও জোতদার শ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মুসলমান জমিদার ও জোতদার নেতৃবৃন্দ মুসলিম কৃষকদের সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলে। অর্থাৎ বিশ শতকের বিশের দশকে প্রধানত ভূমি বিরোধের রাজনীতি আন্তঃসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। বলা যায় যে ভোট রাজনীতির কারণে ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এর ফল ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। এই আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সম্পর্ক এবং ভূমি বিরোধ বিশ শতকের বিশ হতে চল্লিশের দশকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। উপরন্তু, বিখ্যাত সাইমন কমিশন, নেহরু রিপোর্ট, জিন্নাহর চৌদ্দ দফা প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান জমিদার ও জোতদারদের মধ্যে সম্প্রীতির বদলে বিভেদ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণার পেছনেও

মূল কারণ ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি। উল্লেখ্য, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়াও ১৯৩৫ সালের আইনে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের সম্প্রসারিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে সম্প্রদায় ভিত্তিক জনপ্রতিনিধিত্ব নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭১,৫২,২২৭ জন। এর মধ্যে খাজনাভোগী জমিদার ও জোতদারের বাইরে ভোটাধিকার লাভ করেছিল ৩৫,৪৭,৯৮৯ জন। এই বিপুল সংখ্যক ভোটাধিকার লাভকারীরা ছিল মধ্যম শ্রেণির সচ্ছল কৃষক। অর্থাৎ যৎসামান্য জোত-জমির মালিক, বর্গাদার এবং ভূমিহীন কৃষক তথা সাধারণ শ্রেণির কৃষক ব্যতীত মধ্যম শ্রেণির সচ্ছল কৃষকরা নির্বাচনে ভোটাধিকার লাভ করেছিল। এর ফলে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক তথা জনসাধারণ নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের প্রধান নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ নির্বাচনী বিজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল কৃষকরা। এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিশেষ করে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ এবং শোষণ ও নিপীড়ন হতে কৃষকদের মুক্তির বিষয়টি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে প্রধানত ৩টি রাজনৈতিক দল-কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি দলীয়ভাবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এছাড়াও ত্রিপুরার কৃষক সমিতি শুধুমাত্র ত্রিপুরা জেলায় স্থানীয়ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। নির্বাচনে একমাত্র ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, জমির খাজনা হ্রাস এবং এমনকি খাজনা মওকুফ ও ঋণ বাতিল প্রভৃতি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। এছাড়াও কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনের মূল শ্লোগান ছিল 'জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও ডালভাত' কর্মসূচি কার্যকর করা। অন্য দু'টি রাজনৈতিক দল অর্থাৎ জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ভূমি ও কৃষি তথা কৃষকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি না থাকায় কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইশতেহার ও শ্লোগানের প্রতি নতুন ভোটাররা অর্থাৎ ধনী ও সচ্ছল উভয় শ্রেণির কৃষকরাই আকৃষ্ট হয়েছিল। এমনকি, নিম্ন শ্রেণির কৃষক যাদের ভোটাধিকার ছিল না তারাও নির্বাচনের সময়ে এই শ্লোগানে আকৃষ্ট হয়ে প্রচার-প্রচারণায় পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে যা সামগ্রিকভাবে কৃষক প্রজা পার্টির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এর প্রভাব পড়ে নির্বাচনের ফলাফলের ওপর। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে হকের নবগঠিত কৃষক প্রজা পার্টি নির্বাচনে নতুন ভোটাধিকার লাভকারী সচ্ছল শ্রেণির মুসলমান কৃষকদের সমর্থনে ৩৬টি আসনে বিজয়ী হয়। অন্যদিকে নির্বাচনে জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগ ৪টি বিশেষ আসনসহ ৩৯টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম ভোটারদের মধ্যে ৩১.৫১% ভোট লাভ করে, যেখানে মুসলিম লীগ পেয়েছিল ২৭.১০% ভোট। অর্থাৎ মুসলিম ভোটারদের মধ্যে হকের পার্টি লীগের চেয়ে ৪.৪১% ভোট বেশি পায়। এমনকি, নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থীরা পল্লী অঞ্চলে বিশেষ করে পূর্ব বাংলার খুলনা, ময়মনসিংহ, বাকেরগঞ্জ এবং নোয়াখালী জেলার সবগুলো আসনে বিজয়ী হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে হকের পার্টি বিশেষ করে পূর্ব বাংলার পল্লী অঞ্চলের কৃষকদের মন জয় করায় এমন অভূতপূর্ব ফল পেয়েছিল। নির্বাচনের পর হকের কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। উল্লেখ্য, নির্বাচনে কংগ্রেস ৬০টি আসনে বিজয়ী হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়। বলা যায় যে নির্বাচনে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তথা কৃষকদের গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়ায় নির্বাচনে আশানুরূপ ফল পায় নি। সুতরাং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ভালো ফল লাভ করে সরকার গঠনের সক্ষমতা অর্জনের মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

একইভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৪৬ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৮৭,০৮,৯৩৫ জন। নির্বাচনে জমিদার ও জোতদারদের বাইরে মধ্যম শ্রেণির সচ্ছল কৃষকদের মধ্যে ৫৯,৭৬,৯৮৪ জন ভোটাধিকার লাভ করেছিল। নিঃসন্দেহে নির্বাচনে জয় পরাজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল এই মধ্যম শ্রেণির সচ্ছল কৃষকরা। অর্থাৎ বিজয়ের প্রধান নিয়ামক শক্তি ছিল কৃষকেরা। এক্ষেত্রে ১৫টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করলেও নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে। এ নির্বাচনে একদিকে মুসলিম লীগের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবির যথার্থতা প্রমাণ করা এবং অন্যদিকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা প্রমাণ করা। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস এবং কৃষক প্রজা পার্টি দলীয়ভাবে নির্বাচনী ইশতেহার প্রদান করে যার মধ্যে জমিদার প্রভাবিত দল হয়েও মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে জমিদারদের স্বার্থবিরোধী এমনসব প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল যাতে কৃষকরা আকৃষ্ট হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রতিশ্রুতি ছিল ‘লাঙ্গল যার মাটি তার’, ‘বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই’, ‘কায়েমী স্বার্থের ধ্বংস চাই’, ‘জনগণের পাকিস্তান’, ‘কৃষক-শ্রমিকের পাকিস্তান’ প্রভৃতি। লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি সর্বাধিক গুরুত্ব পেলেও বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি কৃষকদেরকে ভালভাবেই প্রভাবিত করেছিল। অন্যদিকে জমিদার প্রভাবিত কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি। এছাড়াও কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়ন, একটি ফেডারেল সংবিধান তৈরি করে প্রতিটি প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান, সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি। নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে কংগ্রেস জনগণকে বুঝাতে চেয়েছিল যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ছাড়াও জনগণ উন্নততর জীবনযাপন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে। উল্লেখ্য, নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্তির কথা বলা হলেও সামগ্রিকভাবে দলটির ইশতেহার ছিল দুর্বল বক্তব্য নির্ভর। উপরন্তু, কৃষক প্রজা পার্টি নির্বাচনে সীমিত পরিসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করেছিল এবং নির্বাচনী প্রচারণাতেও ফজলুল হকের বক্তব্য ছিল সংযত কিন্তু লীগের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে নয়। প্রকৃতপক্ষে হক ও তাঁর কৃষক প্রজা পার্টি পরোক্ষভাবে মুসলিম লীগ ও তার নির্বাচনী ইশতেহার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। যাহোক, নির্বাচনী প্রচারণায় লীগের নেতৃবৃন্দ ভোটাধিকার প্রাপ্ত কৃষকদের আস্থা অর্জনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পেলে জমিদারি ব্যবস্থার বিলুপ্তি, কৃষকের কৃষি উন্নয়নে ভর্তুকি ও ভালো বীজ প্রদান, খাদ্য সমস্যার সমাধান, পাটের মূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতির প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রচার কৌশলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা এবং কংগ্রেস যে সর্ব-ভারতীয়দের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তা দলের নির্বাচনী প্রচারণায় গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়। সুতরাং বলা যায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকদের আস্থা অর্জনে কংগ্রেসের ভূমি ও কৃষি তথা কৃষকের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল না। এ কারণে লীগের প্রতিশ্রুতি ও প্রচারণা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের মাঝে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায় যার প্রভাব পড়েছিল নির্বাচনের ফলাফলের ওপর। এর ফলাফলে দেখা যায় যে ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১২টি এবং কংগ্রেস ৬২টি আসনে বিজয়ী হয়। অবশ্য নির্বাচনোত্তর বঙ্গীয় আইনসভায় ২৫০টি আসন বিন্যাসে দেখা যায় যে মুসলিম লীগের আসন সংখ্যা

১১৫টি। এর কারণ ছিল নির্বাচন শেষে ইমারত পার্টির ১ জন এবং স্বতন্ত্র ২ জন মোট ৩ জন মুসলিম সদস্য লীগকে সমর্থন করে বা লীগে যোগদান করে। অন্যদিকে নির্বাচনের পর আইনসভার আসন বিন্যাসে দেখা যায় যে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ৮৬টি। এর কারণ ছিল নির্বাচনে বিজয়ী তফসিলী সম্প্রদায়ের মোট ২৪ জন হিন্দু সদস্য কংগ্রেসে যোগদান করেন। তারপরও বলা যায় যে কংগ্রেসের চেয়ে মুসলিম লীগ নির্বাচনে ভালো ফল লাভ করেছিল। মূলত নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকদের আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হওয়ায় কংগ্রেস নির্বাচনে ভালো ফল পায়নি। ফলে বিজয়ী মুসলিম লীগ দল সরকার গঠন করে। সুতরাং মুসলিম লীগের জয় লাভ এবং সরকার গঠনের মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি। আর ভূমি বিরোধের রাজনীতির কারণেই নির্বাচনের পর দেশভাগ আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের সময়ে নির্বাচনে প্রতিশ্রুত দেশভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং একইসঙ্গে বাংলা ভাগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং বাংলা ভাগের প্রধান কারণ ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি।

প্রশ্ন হলো পাকিস্তান আমলের ভূমি সংস্কারের ফল কি হয়েছিল? এর উত্তরে বলা যায় যে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও ঔপনিবেশিক আমলের ভূমি বিরোধ বিদ্যমান ছিল। এমনকি, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সংঘটিত তেভাগা আন্দোলনও অব্যাহত ছিল। উল্লেখ্য, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক জমিদার শ্রেণির সদস্য থাকলেও অধিকাংশ ছিলেন জোতদার শ্রেণিভুক্ত। প্রাদেশিক পরিষদের এই জোতদার প্রতিনিধিরা মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তথা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের আইন প্রণয়নে সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। কারণ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলে জমিদারদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে লাভবান হতো জোতদাররা। অন্যদিকে ভবিষ্যৎ রাজনীতির বিবেচনায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রেও মুসলিম লীগের অভ্যন্তরীণ চাপ ছিল। এমনকি, এক সময়ের মুসলিম লীগের সক্রিয় নেতা-কর্মীদের একাংশ লীগের রাজনীতি পরিত্যাগ করে ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ তথা আওয়ামী লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। এই নব গঠিত দলটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। ফলে বলা যায় যে অনেকটা বাধ্য হয়েই মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন বা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করে। এই আইন প্রণয়নের ফলে আইনগতভাবে হলেও জমিদার শ্রেণির বিলুপ্তি ঘটে। বিলুপ্ত জমিদারদের একটি অংশ বিদ্যমান জোতদার শ্রেণিভুক্ত হয়ে যায়। ফলে জোতদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ভূমিস্বত্বের ওপর তারা এককভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে কৃষকরা ভূমিস্বত্বের ওপর যে অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ ভূমিসংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল তা আর পূরণ হয়নি। এ কারণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পরও ভূমি বিরোধের অবসান না হয়ে বরং তা অব্যাহত থাকে এবং নতুন আঙ্গিকে জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। ১৯৬১ সালের ভূমি আইনে ভূমির ঊর্ধ্ব সীমা ৩৭৫ বিঘায় বর্ধিত করায় ভূমি বিরোধ তথা জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হয়ে উঠে। উপরন্তু, মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের ফলে অধিকসংখ্যক জোতদাররা মৌলিক গণতন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষকদের ওপর পূর্বের তুলনায় আরও বেশি শোষণ ও নিপীড়ন শুরু করে। এমনকি, বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ভূমির খাজনা ও অন্যান্য কর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় কৃষকরা রাষ্ট্রীয়ভাবেও শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়। সুতরাং জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পরও ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ ও নিপীড়ন হতে কৃষকরা মুক্তি পায়নি। তবে পাকিস্তান শাসনামলে ভূমিস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়নকালে কৃষকদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একাংশ কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন

করেছিল। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের অভ্যন্তরে তীব্র ভূমি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় তারা সরকারের তীব্র সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছিল। এমনকি আইয়ুব খানের শাসনামলে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি অংশও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের তীব্র সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিল যা প্রমাণ করে ভূমি বিরোধ দেশের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করেছিল। আইন পরিষদের প্রতিনিধিদের ভূমি বিতর্কের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার ভূমি বিরোধের চিত্র সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল যা ঔপনিবেশিক শাসনামলে দেখা যায়নি। বলা যায় যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়নের পর ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হলেও আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে প্রণীত ভূমি আইনে কৃষকদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়ে জোতদারদের স্বার্থ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উপরন্তু, জোতদার কর্তৃক কৃষকরা অনেকটা ঔপনিবেশিক শাসনামলের ন্যায় শোষণ ও নিপীড়নের স্বীকার হয়েছিল। এছাড়াও পাকিস্তান আমলে ঔপনিবেশিক শাসনামলের তুলনায় শারীরিক নির্যাতন হ্রাস পেলেও জোতদাররা নারীদের সম্ভ্রমহানী করায় কৃষকরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের সঙ্গে পাকিস্তান শাসনামলের পার্থক্য ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন হলেও কেউ তাদের পাশে থাকতো না কিন্তু পাকিস্তান শাসনামলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কৃষকদের ওপর চালানো শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। এমনকি, সরকার ও জোতদার কর্তৃক কৃষকদের ওপর চালানো শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আইন পরিষদের ভিতরে ও বাইরে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই দেশের কৃষকদের মুখপত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ফলে দেশের রাজনীতি ও কৃষকের মুক্তির বিষয়টি একাকার হয়ে সরকার বিরোধী তথা পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। অর্থাৎ ভূমি বিরোধ এক পর্যায়ে সরকার বিরোধী তথা পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল দেশের কৃষকরা। এই আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

এখন প্রশ্ন হলো পূর্ব বাংলায় ভূমি বিরোধের রাজনৈতিক অর্জন কি ছিল? এর উত্তরে বলা যায় যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ সরকার বিদ্যমান ভূমি বিরোধকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং জমিদার ও জোতদার তোষণ নীতি গ্রহণ করে। এ কারণে লীগ সরকার জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করলেও প্রকৃতপক্ষে লাভবান হয়েছিল জমিদার ও জোতদাররাই। একদিকে ক্ষতিপূরণ পেয়ে জমিদাররা এবং অন্যদিকে ভূমিস্বত্বের ওপর একক প্রাধান্য বিস্তার করে লাভবান হয়েছিল জোতদাররা। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের পর জোতদাররাই জমিদারদের স্থলাভিষিক্ত হয়। ফলে কৃষকদের ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তির স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। অর্থাৎ প্রধানত মুসলিম লীগ সরকারের জমিদার ও জোতদার তোষণ নীতির কারণে ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ ও নিপীড়ন হতে কৃষকরা মুক্তি পায়নি। ফলে ভূমি বিরোধ অব্যাহত থাকে। এর ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। উল্লেখ্য, পাকিস্তান শাসনামলের সূচনায় অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষক সমাজ থেকে উদ্ভূত শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে নব গঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ তথা আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। নব গঠিত এই দলটি শুরু থেকেই ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শোষণ ও নিপীড়ন হতে কৃষকদের মুক্তির জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল যা তৎকালীন গোয়েন্দা প্রতিবেদনেও পরিলক্ষিত হয়। বলা যায় যে এই নব গঠিত রাজনৈতিক দলটি ছিল পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকদের মুখপত্র। এছাড়াও অন্য রাজনৈতিক এবং কৃষক নেতৃবৃন্দও কৃষকদের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। পাশাপাশি ১৯৫৪ এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ২১ বছর প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিক

নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার কৃষকরা রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ লাভ করায় তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। এ কারণে ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তির জন্য কৃষকরা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনেই সর্বপ্রথম ২১ বছর প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিক নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকরা নির্বাচনে বিজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই নির্বাচনে ১৬টি রাজনৈতিক দল দলীয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও মূল নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্টের মধ্যে। এই ১৬টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে একমাত্র যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কৃষক-বান্ধব নির্বাচনী ইশতেহারে পূর্ব বাংলার কৃষকদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হলে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ করবে, ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে, উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হবে, সার্টিফিকেট যোগে খাজনা আদায়ের প্রথা বাতিল করা হবে, পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করা হবে প্রভৃতি। অন্যদিকে জমিদার প্রভাবিত মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়সহ বিভিন্ন ধরনের বিষয়াদি প্রাধান্য পেলেও ভূমি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিশেষত কৃষকদের স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো বক্তব্য বা প্রতিশ্রুতি ছিল না। অর্থাৎ কৃষকদের স্বার্থে বা তাদের আস্থা অর্জনে লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করার মতো কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি পূর্ব বাংলার কৃষকদের মাঝে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে যার প্রভাব পড়ে নির্বাচনের ফলাফলের ওপর। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৩টি বা ৯৪.০৯% আসন এবং মুসলিম লীগ পায় মাত্র ১০টি বা ৪.২২% আসন। নির্বাচনে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন সভার ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। স্পষ্টতই যুক্তফ্রন্টের এই বিজয়ের মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি। অবশ্য নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলেও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের কারণে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলার কৃষকদের জন্য নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে পারেনি। কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের কারণে মাত্র চার বছরে নয় বার প্রাদেশিক সরকারের পরিবর্তন হয়। উপরন্তু, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে কৃষকদের ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ ও নিপীড়ন হ্রাস পাওয়ার যতটুকু আশা ছিল তাও নস্যাৎ হয়ে যায়। সামরিক শাসনামলে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি, জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনে সার্বজনীন তথা কৃষকদের ভোটাধিকার না থাকায় তারা ছিল আরও বেশি অবহেলিত ও উপেক্ষিত। অন্যদিকে ১৯৬১ সালের ভূমি আইনে পরিবার প্রতি ভূমির ঊর্ধ্ব সীমা ৩৭৫ বিঘায় নির্ধারণ করায় জোতদাররা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এছাড়াও মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বা ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়ে জোতদাররা ওয়ার্কস প্রোগ্রামের অর্থ আত্মসাৎ করে গ্রামীণ সমাজে প্রচণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠে। এই প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জোতদাররা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ঔপনিবেশিক শাসনামলের ন্যায় কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন চালিয়েছিল। এমনকি, অনেক সময় জোতদারদের হাত থেকে কৃষকেরা তাদের পরিবারের নারী সদস্যদের সম্ভ্রম রক্ষা করতেও ব্যর্থ হতো। এককথায় রাষ্ট্র ও সমাজে জোতদারদের অপতিরোধ্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সামরিক শাসনামলের প্রথম দিকে রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে পারেনি। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান কর্তৃক পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান কার্যকর করার পর রাজনীতির ওপর থেকে

বিধি-নিষেধ উঠে যায়। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্রসমাজ কৃষকদের ওপর সরকার এবং মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদারদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এরপর যে ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলনের সূচনা হয় সেখানে পূর্ব বাংলার কৃষকেরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। প্রধানত ভূমি বিরোধের কারণেই এই গণঅভ্যুত্থানে কৃষকরা অংশগ্রহণ করেছিল। কৃষকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণেই গণঅভ্যুত্থানও সফল হয়েছিল। অর্থাৎ '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পেছনেও ভূমি বিরোধের রাজনীতি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটলেও আরেক সামরিক স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তবে ইয়াহিয়া খান বিগত গণঅভ্যুত্থানের কথা বিবেচনা করে ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর প্রাপ্তবয়স্কদের এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ঘোষণা দেন। তাঁর এই ঘোষণার অর্থ ছিল জনসংখ্যার ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্ধারণ এবং সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটের নির্বাচন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ২১ বছর প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিক ভোটাধিকার লাভ করার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হয়। কৃষকরাই ছিল নির্বাচনে বিজয়ের মূল নিয়ামক শক্তি। এই নির্বাচনে ১৬টি রাজনৈতিক দল দলীয়ভাবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। এর মধ্যে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রাধান্য পেয়েছিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন ধরনের বিষয়াদি। একমাত্র আওয়ামী লীগ ভূমি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট তথা দেশের কৃষক সমাজের ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দলের নির্বাচনী ইশতেহারে 'কৃষক রাজ' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর ঘোষণার সারমর্ম ছিল ভূমির ওপর কৃষকের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ খাজনা-কর মুক্ত শোষণ ও নিপীড়নহীন একটি কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এমনকি, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তে অর্থাৎ কৃষক বান্ধব পূর্ণ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় কৃষক সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকেরা দীর্ঘ দিন ধরে এমন একটি কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠারই স্বপ্ন দেখে এসেছিল। বঙ্গবন্ধুর এই কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় পূর্ব বাংলার কৃষকেরা তাদের সেই বহু কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণের প্রত্যাশায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল যার প্রভাব পড়ে নির্বাচনের ফলাফলের ওপর। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে বিজয়ী হয়। নির্বাচনী ফলাফলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল ত্রিধাবিভক্ত মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনেও বিজয়ী হয়নি। নির্বাচনী ফলাফলের অপর বৈশিষ্ট্য ছিল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ভূমি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট এবং কৃষক পরিবার থেকে উদ্ভূত প্রতিনিধিত্ব ছিল সংখ্যায় ও শতকরা হারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। নিঃসন্দেহে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক বিজয়ের মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি। কিন্তু এতো বড় বিজয়ের পরও আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের কারণে সরকার গঠন করতে পারেনি। যদিও ইয়াহিয়া খান সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন, কিন্তু পিপিপি'র প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিরোধিতা এবং ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যে একান্ত বৈঠকের গভীর ষড়যন্ত্রের কারণে উক্ত অধিবেশন স্থগিত করা হয়। জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণায় প্রতিবাদের ঝড় উঠে এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারকে সকল ধরনের ট্যাক্স প্রদান বন্ধ রাখার জন্য জনগণকে নির্দেশ দেন। এছাড়াও তিনি ১৯৭১ সালের ৭

মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক জনসভায় পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সবাইকে মুক্তির সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহবান জানান। বস্তুতপক্ষে, কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে ভূমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ ও নিপীড়নহীন কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে স্বপ্ন দেখেছিল বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময় বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন দফা ভিত্তিক কর্মসূচির ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলনে কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মূলে ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার প্রধান শহরগুলোতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে নিরীহ বাঙালির ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায় যা অপারেশন সার্চলাইট হিসেবে পরিচিত। এই নির্মম ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনেরও সমাপ্তি ঘটে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে জনযুদ্ধ বা স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধে একদিকে ছিল পাকিস্তান সরকার এবং তার অনুগত ও সহযোগী মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদার শ্রেণি এবং অন্যদিকে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা কৃষকরা এবং তাদের ভোটে নির্বাচিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিরা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার ও দেশের সামরিক বাহিনীকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে মৌলিক গণতন্ত্রপন্থী জোতদাররা বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও থানায় শান্তি কমিটি গঠন করে অথবা গঠিত শান্তি কমিটির প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিরীহ কৃষকদের হত্যা, তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, তাদের ধনসম্পত্তি লণ্ঠন এবং এমনকি তাদের পরিবারের নারী সদস্যদের সম্ভ্রমহানীতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। অন্যদিকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার কৃষকদের যে কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন পূরণ অর্থাৎ কৃষকেরা নিজেদের মুক্তি ও ভূমিস্বত্বের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ শোষণ ও নিপীড়নহীন কৃষক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছিল। কৃষকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধ শেষে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় ভূমি বিরোধের চূড়ান্ত রাজনৈতিক অর্জন ছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়। সুতরাং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মূল কারণ ছিল ভূমি বিরোধের রাজনীতি। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে তা হয়তো ভবিষ্যতে ভিন্ন কোনো গবেষণায় উঠে আসতে আসবে।

পরিশিষ্ট

সারণি ১

জিডিপি ও জিএনপি'র হার ১৯৪৯-৫০ হতে ১৯৬৯-৭০ (ক এবং খ)

(ক) দেশের জিডিপি'র হার ১৯৬৯-৭০ সাল

খাত (Sector)	১৯৬৯-৭০
কৃষি (Agriculture)	৬২.৪২
শিল্প (Industry)	৮.২৫
ইমারত (Construction)	৪.৫৮
বিদ্যুৎ ও গ্যাস (Power and Gas)	০.২৪
পরিবহণ (Transport)	৪.৬৩
বাণিজ্য (Trade)	৭.৪৫
হাউজিং (Housing)	৪.৪২
প্রশাসন (Administration)	২.৪৪
ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স (Banking and Insurance)	০.৫০
অন্যান্য (Other services)	৬.০৫
মোট (Total)	১০০.০০

উৎস : *Bangladesh Economic Survey 1980-81*, Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1981), P. 2.

(খ) জিএনপি'র হার, ১৯৪৯-৫০ হতে ১৯৬৯-৭০

খাত (Sector)	১৯৪৯-৫০	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৯-৬০	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৯-৭০
কৃষি (Agriculture)	১৪,৬৬৯ (৬০.০)	১৫,৬৫৪ (৫৬.১)	১৬,৭৫৩ (৫৩.৩)	১৯,৭৬১ (৪৭.৮)	২৪,৫০১ (৪৬.৩)
শিল্প (Manufacturing)	১,৪৩৩ (৫.৯)	২,২২০ (৮.০)	২,৯৩০ (৯.৩)	৪,৭১১ (১১.৪)	৬,৮৫২ (১২.৯)
বৃহৎ (large-scale)	৩৪৬ (১.৫)	১,০০২ (৩.৬)	১,৫৬৫ (৫.০)	৩,১৫৬ (৭.৬)	৫,০৮৩ (৯.৬)
ক্ষুদ্র (small-scal)	১,০৮৭ (৪.৪)	১,২১৮ (৪.৪)	১,৩৬৫ (৪.৩)	১,৫৫৫ (৩.৮)	১,৭৬৯ (৩.৩)
অন্যান্য (Other sectors)	৮,৩৬৪ (৩৪.১)	১০,০৩৪ (৩৫.৯)	১১,৭৫৬ (৩৭.৪)	১৬,৮৯৪ (৪০.৮)	২৩,১৪৯ (৪০.৯)
মোট (Total GNP)	২৪,৪৬৬ (১০০.০)	২৭,৯০৮ (১০০.০)	৩১,৪৩৯ (১০০.০)	৪১,৩৬৬ (১০০.০)	৫২,৯৮৬ (১০০.০)
জনসংখ্যা [Population (million)]	৭৮.৮	৮৮.৩	৯৮.৯	১১২.৪	১২৮.৪
মাথাপিছু আয় [Per capita income (rupees)]	৩১১	৩১৬	৩১৮	৩৬৮	৪১৩

উৎস : Sawdesh R. Bose, "The Pakistan Economy since Independence 1947-70", Dharma Kumar (ed.), *The Cambridge Economic History of India*, Volume 2 : c. 1757-c. 1970 (Cambridge : Cambridge University Press, Reprinted 1989), p. 1000.

সারণি ২

ভূমি রাজস্ব কমিশনের প্রেরিত প্রশ্ন সম্বলিত পত্র গ্রহণ, সাক্ষাৎকার ও মতামত প্রদানকারী বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা

(ক) ভূম্যধিকারী সমিতি ও ব্যক্তি (Landholders' associations and individuals)

প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর প্রদানকারী সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা (List of associations and individuals who replied to the questionnaire)	প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর না দেওয়া সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা (List of associations and individuals who did not reply to the questionnaire)
1. Bakarganj Landholders' Associations.	1. Birbhum Landholders' Associations.
2. Bankura Landholders' Associations.	2. Bogra Landholders' Associations.
3. Bengal Landholders' Associations.	3. Dacca Landholders' Associations.
4. British Indian Association.	4. Darjeeling Landholders' Associations.
5. Burdwan Landholders' Associations.	5. Jalpaiguri Landholders' Associations.
6. Chittagong Landholders' Associations.	6. Murshidabad Landholders' Associations.
7. Dinajpur Landholders' Associations.	7. North Bengal Landholders' Associations.
8. East Bengal Landholders' Associations.	8. Pabna Landholders' Associations.
9. Faridpur Landholders' Associations.	9. 24-Parganas Landholders' Associations.
10. Hooghly Landholders' Associations.	10. Rajshahi Landholders' Associations.
11. Howrah Landholders' Associations.	11. Rangpur Landholders' Associations.
12. Jessore Landholders' Associations.	12. Tippera Landholders' Associations.
13. Khulna Landholders' Associations.	13. Manager of the Estate of Raja of Bhagyakul.
14. Malda Landholders' Associations.	14. Manager of the Estate of Raja of Dighapatia.
15. Midnapore Landholders' Associations.	15. Manager of the Estate of Maharaja of Mymensingh.
16. Midnapore Zamindari Company.	16. Manager of the Estate of Maharaja of Natore.
17. Mymensingh Landholders' Associations.	-
18. Nadia Landholders' Associations.	-
19. Noakhali Landholders' Associations.	-
20. Sundarban Landholders' Associations.	-
21. Manager, Paikpara Raj.	-
22. Manager, Tagore Raj Estate.	-
23. Additional Manager, Burdwan Raj.	-
Total = 39	

(খ) কৃষক সমিতি (Associations concerned with tenants)

প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর প্রদানকারী সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা	প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর না দেওয়া সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা
1. Bengal Provincial Kisan Sabha.	1. All-Bengal Namasudra Associations.
2. Dacca District Muslim Federation.	2. All-Bengal Scheduled Cast Federation.
3. Middle Class Peoples' Associations, Mymensingh.	3. Bengal Presidency Moslem League.
4. Peoples' Associations, Dacca.	4. Burdwan Muhammadan Association.
5. Peoples' Associations, Khulna.	5. Central National Muhammadan Association.
6. Rajshahi Muhammadan Association.	6. District Muslim Association, Midnapore.
Total = 12	

(গ) বার সমিতি (Bar Associations)

প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর প্রদানকারী সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা	প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর না দেওয়া সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা
1. Barisal Bar Association.	1. Bankura Bar Association.
2. Burdwan Bar Association.	2. Birbhum Bar Association.
3. Dacca Bar Association.	3. Bogra Bar Association.
4. Dinajpur Bar Association.	4. Chittagong Bar Association.
5. High Court Bar Association.	5. Darjeeling Bar Association.
6. Jalpaiguri Bar Association.	6. Faridpur Bar Association.
7. Khulna Bar Association.	7. Hooghly Bar Association.
8. Malda Bar Association.	8. Howrah Bar Association.
9. Midnapore Bar Association.	9. Jessore Bar Association.
10. Mymensingh Bar Association.	10. Murshidabad Bar Association.
11. Nadia Bar Association.	11. Rangpur Bar Association.
12. Noakhali Bar Association.	
13. Pabna Bar Association.	
14. 24-Parganas Bar Association.	
15. Rajshahi Bar Association.	
16. Tippera Bar Association.	
Total = 27	

(ঘ) আঞ্জুমান সমিতি (Anjuman Associations)

প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর প্রদানকারী সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা	প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর না দেওয়া সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা
1. Anjuman-E-Mikatul Islam, Hooghly.	1. Bakarganj.
2. Anjuman-E-Islamia, Mymensingh	2. Bankura.
3. Anjuman-Ettefaque-E-Islamia, Nadia.	3. Birbhum.
-	4. Bogra
-	5. Burdwan.
-	6. Chittagong.
-	7. Darjeeling.
-	8. Dinajpur.
-	9. Faridpur.
-	10. Howrah.
-	11. Jessore.
-	12. Khulna.
-	13. Malda.
-	14. Midnapore.
-	15. Murshidabad
-	16. Noakhali.
-	17. Pabna.
-	18. 24-Parganas.
-	19. Rajshahi.
-	20. Rangpur
-	21. Tippera.
Total = 24	

(ঙ) রাজনৈতিক দল (Political Parties)

প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর প্রদানকারী সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা	প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর না দেওয়া সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা
1. Bakarganj District Krishak Party.	1. Congress Party.
2. Nikhil Banga Krishak Proja Samity.	2. Depressed Class Party.
-	3. European Group.
-	4. Independent Proja Party.
-	5. Liberal Party.
-	6. Proja Party.
Total = 8	

(চ) সরকারি ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (Government and ex-Government Officers)

প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর প্রদানকারী সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা
1. Mr. W.H. Nelson, C.S.I., I.C.S., Member, Board of Revenue.
2. Mr. L. R. Fawcus, C.I.E., I.C.S., Commissioner, Dacca Division.
3. Mr. F. W. Robertson, C.I.E., (I.C.S., retired), ex-Settlement Officer and ex- Commissioner of a Division.
4. Mr. A. E. Porter, I.C.S., Collector of Tippera.
5. Mr. M. M. Stuart, I.C.S., Collector of Nadia.
6. Mr. S. K. Dey, I.C.S., Additional Collector, Dacca.
7. Khan Bahadur Md. Mahmood, Collector of Pabna.
8. Rai Rebati Mohan Chakrabatti Bahadur (retired Magistrate and Collector).
9. Rai Bijay Bihari Mukherjee Bahadur, retired Director of Land Records and Surveys, Bengal.
10. Mr. M. Carbery, D.S.G., M.C., Director of Agriculture, Bengal.
11. Mr. S. C. Majumdar, B.C.S., M.I.E., Chief Engineer, Irrigation Department.
12. Mr. S. C. Mitter, B.C.S. (Eng.), A.M.I.E. (India), Director of Industries, Bengal.
13. Babu Benoy Bhushan Das Gupta, B.C.S. (Representative of the Finance Department).
14. Khan Bahadur M. Arshad Ali, Registrar, Co-operative Societies, Bengal.
15. Khan Bahadur Ataur Rahman, retired Assistant Commissioner of Income-tax, Calcutta.
16. Rai Mahendra Nath Gupta Bahadur, retired Deputy Magistrate and Deputy Collector (drafted Bengal Tenancy Amendment Act of 1928).
17. Rai Kalipada Mitra Bahadur, Manager, the Estate of the Nawab of Murshidabad.
18. Rai Jitendra Nath Sircar Bahadur, retired Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bengal. Now Manager, Cossimbazar Raj Wards' Estate.
19. Khan Sahib Maulvi Kazi Md. Mohiuddin, ex-Khas Mahal Officer.
20. Babu Jogesh Chandra Chakrabarti, B.C.S., Khas Mahal Officer, Mymensingh.
21. Maulvi Khalil Ahmed, B.C.S., Khas Mahal Officer, Noakhali.
22. Babu Satya Chandra Halder, Khas Mahal Officer, Bakarganj.
23. Babu Prafulla Chandra Mitra, Khas Mahal Officer, Faridpur.
প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর না দেওয়া সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা
1. Mr. T. I. M. N. Chowdhury, I.C.S., Director of Rural Reconstruction, Bengal.
2. K. C. Dey, C.I.E. (I.C.S., retired), late Member, Board of Revenue, Bengal.
3. Khan Bahadur Kamaruddin Ahmed.
4. Maulvi Abdus Sadeque, Professor of Economics, Islamia College, Calcutta.
5. Mr. H. P. V. Townend, C.I.E., I.C.S., Commissioner of the Burdwan Division.
Total = 28

(ছ) বিবিধ (Miscellaneous)

প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর প্রদানকারী সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা
1. Mr. A. C. Gupta, Advocate, High Court.
2. Australian Baptist Mission, Rev. Victor J. White.
3. Bangiya Brahman Sabha.
4. Bengal Mahajan Sabha.
5. Bengal Provincial (Co-operative) Bank.
6. Hindu Sabha.
7. Dr. Naresh Chandra Sen Gupta, Advocate, High Court.
8. Sir Nalini Ranjan Chatterjee, ex-High Court Judge.
9. Dr. Radha Kamal Mukherjee.
10. Dr. Sarat Basak, Senior Government Pleader.
প্রশ্ন সম্বলিত পত্রের উত্তর না দেওয়া সংগঠন ও ব্যক্তিদের তালিকা
1. Mr. Anant Prosad (Contributor to Landholders' Journal).
2. Khan Bahadur Azizul Huq, C.I.E.
3. Bengal Chamber of Commerce.
4. Bengal National Chamber of Commerce.
5. Professor Benoy Kumar Sarkar.
6. Chittagong Chamber of Commerce.
7. Professor Humayun Kabir.
8. Indian Catholic Association.
9. Indian Tea Association.
10. Khwaja Shahabuddin, C.I.E., M.L.A., of Dacca.
11. Muslim Chamber of Commerce.
12. Narayanganj Chamber of Commerce.
13. Mr. Nausher Ali, ex-Minister.
Total = 23

উৎস : *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. II, pp. 14-18.

সারণি ৩

জমিদারদের সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত লাঠিয়াল, দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের তালিকা

অনুমোদিত এলাকা	অনুমোদনের তারিখ	জমিদারের নাম	আবাসিক ঠিকানা	লাঠিয়ালের সংখ্যা		অস্ত্রের অনুমতি	সংখ্যা
				অনুমোদন	প্রকৃত সংরক্ষণ	আগ্নেয়াস্ত্রের নাম	
কলকাতা	৭ মে, ১৯০৬	বাবু গগেন্দ্র নাথ ঠাকুর বাবু অবুনিন্দ্র নাথ নাথ ঠাকুর (সি.আই.ই) ও বাবু সমেরন্দ্র নাথ নাথ ঠাকুর (যৌথ ভাবে)	দ্বারকা নাথ ঠাকুর লেন	১০	৯	ব্রিচ লোডিং গান	৬
						মাজল লোডিং গান	২
						কম্বাইন্ড গান এন্ড রাইফেল	১
						রিভলভার	১
						বেয়নেট	২
						তরবারি	১৬
						ডেগার	১
						সোর্ড স্টিক	২
,,	৭ আগস্ট, ১৯০৫	স্যার শ্রী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর (নাইট)	দ্বারকা নাথ ঠাকুর রোড	১০	৫	ব্রিচ লোডিং গান	৫
						তরবারি	৪
						বল্লম/বর্শা	১০৮
						কিরিচ	২
,,	২০ নভেম্বর, ১৯০৮	মহারাজা স্যার প্রদ্যুৎ কুমার ঠাকুর বাহাদুর (নাইট)	ঠাকুর দুর্গ	১০০	৬৮	ব্রিচ লোডিং গান	৭২
						মাজল লোডিং গান	১৮
						ব্রিচ লোডিং রাইফেল	১৮
						মাজল লোডিং রাইফেল	২
						এয়ার রাইফেল	১
						এয়ার গান	১
						স্টিক গান	১
						রিভলভার	৮
						পিস্তল	৩
						বেয়নেট	৪৪
						তরবারি	৫০
						ডেগার	১
,,	৩১ ডিসেম্বর, ১৯১২	অরুণ চন্দ্র সিংহ	হ্যারিংটন রোড	৬	৬	ব্রিচ লোডিং গান	১
						মাজল লোডিং গান	২
						রাইফেল	১
						রিভলভার	১
						বেয়নেট	২
						তরবারি	২

,,	৫ ডিসেম্বর, ১৯১৩	কুমার প্রফুল্লহ কৃষ্ণ দেব	১০৬-১, গ্রে স্ট্রিট	১০	..	রিভলভার	১
,,	১৮ আগস্ট, ১৯০৭	বাবু প্রফুল্লহ নাথ ঠাকুর	দর্প নারায়ণ ঠাকুর রোড	১০	৫	ব্রিচ লোডিং গান রাইফেল রিভলবার পিস্তল তরবারি	৫ ২ ৪ ১ ৭
,,	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫	রাজা ঋষী কেষ (আইনজীবি, সি.আই.ই)	৯৬, আমর্হাস্ট রোড	১২	৫	রিভলভার বেয়নেট	১ ২
,,	৪ এপ্রিল, ১৯০৩	বাবু সত্যাধন ঘোষাল	ভুখাইলাস খিদীরপুর	..	..	ব্রিচ লোডিং গান রিভলভার	১ ১
প্রেসিডেন্সি বিভাগ							
২৪ পরগণা	২১ জুন, ১৯১৯	মৌলবী গোলাম হোসেন শাহ	টালিগঞ্জ	..	..	ব্রিচ লোডিং গান	৩
নদীয়া	৩০ ডিসেম্বর, ১৮৯১	বাবু নগেন্দ্র নাথ মুখার্জী	বীরনগর	..	৪	মাজল লোডিং গান	১
						ব্রিচ লোডিং রাইফেল	২
						ব্রিচ লোডিং গান	২
						বেয়নেট	৬
						ডেগার	১
						তরবারি	৪
						সোর্ড স্টিক	১
মুর্শিদাবাদ	২৩ জুলাই, ১৮৯৪	বাবু দেবেন্দ্র নাথ রায়	কুঞ্জঘাট, থানা-বেরহামপুর শহর	১০	১০	রাইফেল সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান সিঙ্গেল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং গান ডাবল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং গান পিস্তল রিভলভার বেয়নেট	১ ১ ১ ৮ ১ ১ ১ ৭
,,	৫ ডিসেম্বর, ১৯২৮	সৈয়দ মোঃ ফায়েজ আলী খান	জাফরনগর, থানা-মুর্শিদাবাদ	২৫	২৫	রাইফেল সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান সিঙ্গেল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং গান রিভলভার পিস্তল বেয়নেট	১ ২ ৫ ১১ ২৭ ২ ১ ২৫
,,	৩০ আগস্ট, ১৯০১	মহারাজা রাও জগেন্দ্র নারায়ণ রায় (সি.আই.ই)	লালগোলা, থানা-লালগোলা	১০	১০	সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান বেয়নেট	১০ ১০

,,	১৮ এপ্রিল, ১৯১৪	নবাব স্যার আসিফ কাদের সৈয়দ ওয়াসিফ আলী মীর্জা খান বাহাদুর (কে.এস.আই., কে.সি.ভি.ও.) মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর	কিল্লা নিযামত, থানা-মুর্শিদাবাদ	১০০	১০০	রাইফেল রিভলভার ও পিস্তল ব্রিচ লোডিং গান মাজল লোডিং গান বেয়নেট	৭০ ১২৮ ১০৪ ৩১৪ ২৫৪
,,	৩ এপ্রিল, ১৯০৩	ইস্কান্দার কাদের সৈয়দ নাসির আলী মীর্জা	কিল্লা নিযামত, থানা-মুর্শিদাবাদ	৫	৫	ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান পিস্তল	১ ১
যশোর	৭ মার্চ, ১৯৩১	রাজা প্রদ্যুৎ ভূষণ দেব রায় বাহাদুর	নলডাঙ্গা, যশোর	২৫	২৫	ব্রিচ লোডিং গান মাজল লোডিং গান বেয়নেট	৪ ১৪ ৬
,,	২৬ মার্চ, ১৯২০	বাবু নৃপেন্দ্র ভূষণ রায় চৌধুরী ও বাবু নগেন্দ্র ভূষণ রায় (যৌথভাবে)	নড়াইল, যশোর	..	৮	রাইফেল শ্যুট গান	১ ১
,,	৭ মার্চ, ১৯৩১	রাই হিরণ চন্দ্র রায়	নড়াইল, যশোর	৪	৪	ব্রিচ লোডিং গান রাইফেল রিভলভার	৩ ১ ১
খুলনা	১৬ জুন, ১৯১৯	বাবু শল্লাজা নাথ রায় চৌধুরী ও বাবু জতিন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী (যৌথভাবে)	সাতক্ষীরা	৬	৬	ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান সিঙ্গেল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং গান ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং রাইফেল বেয়নেট	২ ১ ১ ১ ২
বর্ধমান বিভাগ							
বর্ধমান	২১ ডিসেম্বর, ১৮৮৮	মাননীয় স্যার বিজয় চাঁদ মাহতাব (জি.সি.আই.ই., কে.সি.এস.আই., আই.ও.এম.) বর্ধমানের মহারাজা বাহাদুর	বর্ধমান	..	১০০	সিঙ্গেল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং রাইফেল ডাবল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং রাইফেল সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং রাইফেল ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং রাইফেল সিঙ্গেল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং গান ডাবল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং গান সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান ফোর ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান সিঙ্গেল ব্যারেল্ড এয়ার গান সিঙ্গেল ব্যারেল্ড স্টিক গান রিভলভার পিস্তল তরবারি	২ ১ ১২ ৬ ৩০ ২ ৪৬ ১৫ ১ ২ ৪ ২০ ৩১ ২৯৪

						পাট্টা তরবারি	৩
						গুপ্তি তরবারি	২
						ডেগার	৪৩
						ভোজালু	১৪
						কুর্কী	৩
						বিক্কহ	৮
						ছোরা	১৪
,,	৩১ জানুয়ারি, ১৯০৫	বাবু দুর্গা দাস তেওয়ারী	মুরাদাবাদ (বর্ধমান)	৪	৪	সিঙ্গেল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং গান	২
						সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	১
						রিভলভার	১
						তরবারি	৪
						ডেগার	৬
,,	১৫ ডিসেম্বর, ১৯০৬	রাজা মনি লাল সিংহ রায় (সি.আই.ই) ও রজনী লাল সিংহ রায় (যৌথভাবে)	চকদিঘী	৬	৬	সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং রাইফেল	২
						ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং রাইফেল	২
						সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	৩
						ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	৫
						রিভলভার	৪
						পিস্তল	৪
						তরবারি	১২
						ডেগার	৪
						বেয়নেট	৪
,,	১৩ জুন, ১৯১৯	রাজা প্রমথ নাথ মালিয়া	সিয়ারোল	৫	৫	সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং রাইফেল	২
						ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	৪
						রিভলভার	১
						কোষসহ তরবারি	১১
						ডেগার	৩
						বেয়নেট	৫
						তলোয়ার	৩৯
,,	২৮ আগস্ট, ১৯২৬	শ্রীমতি প্রিয়মবদা দেবী	মনিরামবতি	৬	৬	সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং রাইফেল	১
						ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং রাইফেল	১
						রিপিটিং রাইফেল	১
						সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	৩
						ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	৪
						রিপিটিং গান	১
						রিভলভার	৩
						তরবারি	২০
						ডেগার	২
মেদিনীপুর	১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯	চৌধুরী রাধা গোবিন্দ পাল	তুরকা, থানা-ডনটন	..	৪	সিঙ্গেল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং গান	২

						সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	৩
						ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	১
						উইনহেস্টার সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং রাইফেল	১
						রিভলভার	২
						বেয়নেট	৩
						তরবারি	১২
						সোর্ড স্টিক	১
হুগলী	১৩ ডিসেম্বর, ১৯২৪	বাবু ভূপেন্দ্র নাথ মুখার্জী	উত্তরপাড়া	..	৬	ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং রাইফেল	২
						ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	৩
						সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	৪
						ডাবল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং গান	১
						অটো পিস্তল	১
						তরবারি	১
,,	২ মে, ১৮৯১	বাবু মনোহর মুখার্জী	উত্তরপাড়া	..	৬	ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	৪
						সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	১
						উইনহেস্টার রিপিটিং রাইফেল	২
						রিভলভার	২
,,	১৩ মে, ১৯২১	বাবু সনৎ কুমার মুখার্জী	উত্তরপাড়া	..	৬	ডাবল ব্যারেল্ড রাইফেল	১
						ব্রিচ লোডিং গান	২
						মাজল লোডিং গান	৩
						রিভলভার	৩
						তরবারি	৬
						বেয়নেট	২
						ডেগার	৩
						সোর্ড স্টিক	১
,,	২১ এপ্রিল, ১৯২৩	বাবু তুলসী চরণ গোসাই	সিরামপুর	..	২	ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	৩
						সিঙ্গেল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং গান	৬
						রিভলভার	১
						তরবারি	৬
						ডেগার	২
,,	১১ জানুয়ারি, ১৯১৮	বাবু রাধিকা লাল গোসাই	সিরামপুর	..	২	ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	২
						রিভলভার	১
						তরবারি	২
						ডেগার	১
,,	১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫	বাবু অবনী নাথ মুখার্জী	উত্তরপাড়া	..	৩	সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং রাইফেল	২
						ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	২
						সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান	১
						তরবারি	৫

						ডেগার	৫
ঢাকা বিভাগ							
ঢাকা	৩ মে, ১৮৯৪	রাজা জানকী নাথ রায়	ভাগ্যকূল, থানা-শ্রীনগর, ঢাকা	..	১২	ব্রিচ লোডিং গান রাইফেল রিভলভার	৭ ২ ২
,,	৩১ মার্চ, ১৯১৫	মাননীয় নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ	ঢাকা	..	২৫	ব্রিচ লোডিং গান রাইফেল রিভলভার পিস্তল	৭ ৮ ২ ৪
,,	২৮ জানুয়ারি, ১৯০৫	বাবু বিজয় শঙ্কর রায় চৌধুরী, বাবু অভয় শঙ্কর রায় চৌধুরী, বাবু নর্মদা শঙ্কর রায় চৌধুরী ও বাবু মান শঙ্কর রায় চৌধুরী (যৌথভাবে)	টোটা, মানিকগঞ্জ, ঢাকা	..	৫	মাজল লোডিং গান ব্রিচ লোডিং গান রাইফেল রিভলভার বেয়নেট	৩ ২ ২ ২ ১
ময়মনসিংহ	২৪ নভেম্বর, ১৯২৮	বাবু সতেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী	ময়মনসিংহ	৪	৪	ব্রিচ লোডিং গান রাইফেল রিভলভার পিস্তল	২ ৪ ২ ১
,,	২৪ আগস্ট, ১৯২৭	মহারাজা ভূপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ, বাবু নিরোদ চন্দ্র সিংহ, শিব কৃষ্ণ সিংহ ও ধীজেন্দ্র সিংহ (যৌথভাবে)	সুসাং, ময়মনসিংহ	১০০	১০০	ব্রিচ লোডিং গান রাইফেল রিভলভার বেয়নেট	১২ ৩ ১ ৪
,,	২ ডিসেম্বর, ১৮৯৫	রাজা জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী	ময়মনসিংহ	৮	৮	মাজল লোডিং গান ব্রিচ লোডিং গান রাইফেল রিভলভার পিস্তল বেয়নেট	৯ ৬ ১০ ২ ১ ৮
,,	২৭ জানুয়ারি, ১৯৩১	মাননীয় রাজা স্যার মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী (নাইট)	সন্তোষ, ময়মনসিংহ	৯	৯	ব্রিচ লোডিং গান পিস্তল বেয়নেট	৪ ১ ২
,,	৩১ আগস্ট, ১৯১০	মহারাজা শশী কান্ত আচার্য্য চৌধুরী	ময়মনসিংহ	১৬	১৬	ব্রিচ লোডিং গান রাইফেল রিভলভার বেয়নেট	৭ ২ ২ ৮
,,	১৬ মে, ১৯২২	বাবু ব্রোজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী	গৌরীপুর, ময়মনসিংহ	৫	৫	ব্রিচ লোডিং গান	৩০

						রাইফেল	১
						রিভলভার	২
,,	৫ জুন, ১৯২৫	বাবু নগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী	রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ	৮	৮	মাজল লোডিং গান	৬
						ব্রিচ লোডিং গান	১
						রাইফেল	১
						বেয়নেট	৬
,,	২৪ জুলাই, ১৯২৫	মাননীয় আলহাজ্ব স্যার এ. কে. গজনভী (নাইট)	দেলদুয়ার, ময়মনসিংহ	৮	৮	মাজল লোডিং গান	১
						ব্রিচ লোডিং গান	৫
						রাইফেল	২
						রিভলভার	২
রাজশাহী বিভাগ							
রাজশাহী	১১ মে, ১৯২৬	মহারাজা জগীন্দ্র নাথ রায়	নাটোর	..	৫০	মাজল লোডার	২
						ব্রিচ লোডার	২৪
						ব্রিচ লোডার রাইফেল	৭
						রিভলভার	৪
						পিস্তল	৬
						তরবারি	৭৮
						সোর্ড স্টিক	৩
						বেয়নেট	২
,,	২১ এপ্রিল, ১৯২৩	বাবু বীরেন্দ্র নাথ রায়	নাটোর	..	১২	ব্রিচ লোডার	২
						ব্রিচ লোডার রাইফেল	৪
						পিস্তল	১
						তরবারি	২৯
						সোর্ড স্টিক	২
						বেয়নেট	৬
,,	২৪ অক্টোবর, ১৯১১	মহারানী .. দেবী	পুটিয়া	..	৫০	মাজল লোডার	২
						ব্রিচ লোডার	৪২
						রিভলভার	১
						তরবারি	৪
						সোর্ড স্টিক	৪
						বেয়নেট	৯
,,	১৯১৫	বাবু আনন্দ প্রসন্ন লাহিড়ী	কাশিমপুর	..	৪	মাজল লোডার	২
						ব্রিচ লোডার	৮
						ব্রিচ লোডার রাইফেল	১
						রিভলভার	১
						তরবারি	৮
						সোর্ড স্টিক	১

						বেয়নেট	৪
,,	১০ জুলাই, ১৯২৪	বাবু ক্রিঙ্করী নাথ রায় ও শ্রীমতি প্রমীলা সুন্দরী রায় (যৌথভাবে)	..	..	২৫	মাজল লোডার ব্রিচ লোডার ব্রিচ লোডার রাইফেল রিভলভার বেয়নেট	৫ ১৬ ৪ ২ ৬
,,	২৩ এপ্রিল, ১৯৩২	কুমার প্রতীভা নাথ রায়	দীঘাপাতিয়া	..	৫০	মাজল লোডার ব্রিচ লোডার ব্রিচ লোডার রাইফেল রিভলভার পিস্তল তরবারি সোর্ড স্টিক বেয়নেট	৩ ৪৫ ১০ ২ ৩ ৩৬ ২ ১৮
,,	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০	রাজা শশী শীখরেশ্বর রায় বাহাদুর	তাহিরপুর	..	৬	মাজল লোডার ব্রিচ লোডার ব্রিচ লোডার রাইফেল রিভলভার তরবারি বেয়নেট	৪ ১ ১ ৫ ১৬ ২
,,	১ অক্টোবর, ১৯২২	বাবু বিমালেন্দু নারায়ণ রায় ও পিতা-কুমার শরদিন্দু রায় (যৌথভাবে)	বাজহর	..	৫	ব্রিচ লোডার ব্রিচ লোডার রাইফেল রিভলভার তরবারি বেয়নেট	১১ ৫ ১ ১৭ ২
,,	২৬ অক্টোবর, ১৯১৪	বাবু শরৎ কুমার রায়	দয়ারামপুর	..	৫	মাজল লোডার ব্রিচ লোডার ব্রিচ লোডার রাইফেল তরবারি সোর্ড স্টিক বেয়নেট	৪ ২ ২ ১৬ ১ ১
,,	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০	বাবু নরেশ নারায়ণ রায়	..	..	৮	ব্রিচ লোডার ব্রিচ লোডার রাইফেল তরবারি বেয়নেট	৬ ২ ১৮ ৪
,,	৭ আগস্ট, ১৯০৫	স্যার রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর (নাইট)	পতিসর (বসবাস : কলকাতা)	..	১০	মাজল লোডার ব্রিচ লোডার রিভলভার	৬ ৭ ৩

						তরবারি	১৩
,,	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩	গোপেন্দ্র প্রসাদ সুকুল	..	..	৫	ব্রিচ লোডার ব্রিচ লোডার রাইফেল	৪ ২
দিনাজপুর	২১ মে, ১৯২৯	মহারাজা জগদীশ নাথ রায়	দিনাজপুর	৪৪	২৯	মাজল লোডার মাজল লোডার রাইফেল ব্রিচ লোডার রাইফেল ব্রিচ লোডার রিভলভার পিস্তল তরবারি বেয়নেট	২৫ ৮ ২২ ১১ ৫ ২ ২০ ১২
,,	২০ এপ্রিল, ১৯২৮	বাবু ভূপাল চন্দ্র রায় চৌধুরী	চূড়ামন	..	৫	ব্রিচ লোডার রিভলভার বেয়নেট	৬ ১ ৬
,,	৮ নভেম্বর, ১৯২৮	বাবু কর্ম নাথ চৌধুরী	রামগঞ্জ	৪	১	মাজল লোডার ব্রিচ লোডিং গান ব্রিচ লোডার রাইফেল রিভলভার পিস্তল	২ ৯ ৬ ১ ১
জলপাইগুড়ি	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০	কুচবিহারের মহামান্য মহারাজা	কুচবিহার	..	১০০	আগ্নেয়াস্ত্র নির্দিষ্ট ছিল না (No arms fixed)	
,,	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০	প্রসন্ন দেব রাইকাত	জলপাইগুড়ি	..	৬	ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডার রাইফেল ডাবল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং গান রিভলভার মাজল লোডিং পিস্তল	১ ১ ২ ২ ২ ১
রংপুর	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০	কাকিনার রাজা মহেন্দ্র রঞ্জন রায় চৌধুরী (এম.বি.ই)	রংপুর	..	১০	মাজল লোডিং গান ব্রিচ লোডিং গান রাইফেল ব্রিচ লোডিং গান রিভলভার পিস্তল বেয়নেট	১ ৯ ২৩ ৭ ২ ২০
,,	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০	রাজা গোপাল লাল রায় বাহাদুর	তাজহাট	..	১০	ব্রিচ লোডিং গান রাইফেল ব্রিচ লোডিং গান বেয়নেট	২ ১ ১
,,	২৫ জুন, ১৯৩০	কুমার গোপী বল্লভ সেন	..	..	৬	রাইফেল রিভলভার	১ ১

						পিস্তল	১
পাবনা	৩০ আগস্ট, ১৯১৫	রাই ক্ষীতিশ ভূষণ রায় ও রাই রাধীকা ভূষণ রায় বাহাদুর (যৌথভাবে)	বনওয়ারীনগর	..	১০	ডাবল ব্যারেল্ড গান রাইফেল ডাবল ব্যারেল্ড রিপিটিং রাইফেল ডাবল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান সিঙ্গেল ব্যারেল্ড ব্রিচ লোডিং গান ডাবল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং গান সিঙ্গেল ব্যারেল্ড মাজল লোডিং গান রিভলভার তরবারি বেয়নেট	১ ১ ৩ ১ ৪ ৪ ১ ৪০ ২
মালদাহ	১৪ আগস্ট, ১৯২০	চঞ্চলের রাজা শরৎ চন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর	চঞ্চল	৬	২	মাজল লোডিং গান মাজল লোডিং গান রাইফেল ব্রিচ লোডিং গান রিভলভার পিস্তল তরবারি সোর্ড স্টিক ডেগার বেয়নেট	৭ ৪ ৮ ৬ ৩ ১৮ ৫ ৫ ৫

দ্রষ্টব্য : উল্লেখ্য, জাতীয় আর্কাইভসে প্রাপ্ত গ্রন্থটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত থাকায় গ্রন্থের তালিকাভুক্ত ১৮ জন জমিদারের নাম, ঠিকানা, অস্ত্র ইস্যুর তারিখসহ ও অন্যান্য তথ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তা পাঠোদ্ধার করে তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি, এর মধ্যে পূর্ব বাংলার । এছাড়াও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং শঙ্করা, হাওড়া, বগুড়া ও দার্জিলিং জেলা নীল দেখানো হয়েছে।

উৎস : *List of Zamindars exempted under clause (6) (c) of Schedule of the Indian Arms Rules, 1924 in the Presidency of Bengal* (Corrected up to the 31st December, 1934), Police Department, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1936), pp. 1-21.

সারণি ৪

১৮৮৫-১৯১২ সালে কংগ্রেসের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মুসলমান জমিদারদের তালিকা

অধিবেশন	কংগ্রেস জোন	নির্বাচকমণ্ডলী বিভাগ (Electoral Division)	নাম	ঠিকানা	কিভাবে ও কখন নির্বাচিত
কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৮৮৬			সামিরুদ্দিন আহমেদ	জমিদার, রংপুর	
			মুন্সী সামসুদ্দিন আহমেদ	জমিদার ও আইনজীবী, বাকেরগঞ্জ	বরিশাল পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত
			খাজা আব্দুল আলীম	জমিদার, ঢাকা	ঢাকা পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত
			সৈয়দ আব্দুল বারী	জমিদার, ঢাকা	ঢাকা পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত
			ডা. আতহার আলী	জমিদার ও চিকিৎসক, চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া	
এলাহাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৮৮৮	কলকাতা	বাকেরগঞ্জ	মৌলভী মুহাম্মদ হাফিজ	জমিদার, কলকাতা	১৮৮৮ সালের ৯ ডিসেম্বর বাকেরগঞ্জ জনসমাবেশে নির্বাচিত
বোম্বে জাতীয় কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৮৮৯	ঢাকা	ঢাকা	সৈয়দ করিমুল্লাহ	জমিদার ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, ঢাকা	১৮৮৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা জনসমাবেশে নির্বাচিত
	ঢাকা	নদীয়া	ডা. আতহার আলী	জমিদার ও চিকিৎসক, চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া	১৮৮৯ সালের ১০ নভেম্বর কৃষ্ণনগর জনসমাবেশে নির্বাচিত
	ঢাকা	নদীয়া	সবদর আলী	জমিদার ও আইনজীবী, চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া	১৮৮৯ সালের ১০ নভেম্বর কৃষ্ণনগর জনসমাবেশে নির্বাচিত
কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বাদশতম অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৮৯৬	কলকাতা	চট্টগ্রাম	মৌলভী হামিদুর রহমান সাহেব	জমিদার, চট্টগ্রাম	১৮৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর জনসমাবেশে নির্বাচিত
লক্ষ্ণৌতে জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চদশতম অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৮৯৯	ফরিদপুর	ফরিদপুর	মৌলভী আলিমুজ্জামান চৌধুরী (বি.এ)	জমিদার ও বেলগাছি স্থানীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান, ফরিদপুর	১৮৯৯ সালের ৯ ডিসেম্বর জনসমাবেশে নির্বাচিত
লাহোরে জাতীয় কংগ্রেসের ষোড়শতম অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৯০০	ফরিদপুর	ফরিদপুর	মৌলভী আলিমুজ্জামান চৌধুরী (বি.এ)	জমিদার ও বেলগাছি স্থানীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান, ফরিদপুর	১৯০০ সালের ১৩ ডিসেম্বর ফরিদপুর পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত
কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের সপ্তদশতম অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৯০১	কলকাতা	বগুড়া	চৌধুরী হাফিজাল রহিম	জমিদার	১৯০১ সালের ২১ ডিসেম্বর হাজারিবাগ মুসলিম এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত
	কলকাতা	ফরিদপুর	মৌলভী আলিমুজ্জামান চৌধুরী (বি.এ)	জমিদার ও জেলা বোর্ডের সদস্য	১৯০১ সালের ৯ ডিসেম্বর নির্বাচিত
	কলকাতা	ফরিদপুর	চৌধুরী মোহাম্মদ ইসমাইল খান	জমিদার	১৯০১ সালের ৯ ডিসেম্বর নির্বাচিত
	কলকাতা	টাঙ্গাইল	আব্দুল হালিম গজনভী	জমিদার, আইনজীবী ও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল	১৯০১ সালের ৮ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাচিত
মাদ্রাজে জাতীয় কংগ্রেসের উনিশতম অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৯০৩	কলকাতা	ফরিদপুর	চৌধুরী মোহাম্মদ ইসমাইল খান	জমিদার	১৯০১ সালের ১১ ডিসেম্বর ফরিদপুর পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাচিত
	কলকাতা	ফরিদপুর	খন্দকার আনোয়ার আলী সাহেব	জমিদার	১৯০৩ সালের ১১ ডিসেম্বর ফরিদপুর পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাচিত
বেনারসে জাতীয় কংগ্রেসের একুশতম অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৯০৫	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	আব্দুল হালিম গজনভী	জমিদার ও আইনজীবী	১৯০৫ সালের ২১ ডিসেম্বর মুক্তাগাছা পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাচিত

কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বাইশতম অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৯০৬	ময়মনসিংহ	টাঙ্গাইল	আব্দুল হালিম গজনভী	জমিদার দিলদুয়ার, টাঙ্গাইল	১৯০৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাচিত
	ময়মনসিংহ	টাঙ্গাইল	আবু আহমেদ আব্দুল রহমান খান চৌধুরী	জমিদার দিলদুয়ার, টাঙ্গাইল	১৯০৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাচিত
	ফরিদপুর	ফরিদপুর	মৌলভী আলিমুজ্জামান চৌধুরী (বি.এ)	জমিদার, হাওড়া গোয়ালন্দ স্থানীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ফরিদপুর জেলা বোর্ডের সদস্য	১৯০৬ সালের ১২ ডিসেম্বর জনসমাবেশে নির্বাচিত
	ফরিদপুর	ফরিদপুর	চৌধুরী মোহাম্মদ ইসমাইল খান	জমিদার, কুরসি	১৯০৬ সালের ১২ ডিসেম্বর জনসমাবেশে নির্বাচিত
	ফরিদপুর	ফরিদপুর	হাজী আব্দুল আজিজ	জমিদার, গোপালপুর	১৯০৬ সালের ১২ ডিসেম্বর জনসমাবেশে নির্বাচিত

উৎস : Ahmed, *Muslim Community in Bengal*, pp. 299-319.

সারণি ৫
বিভিন্ন জেলার স্থায়ী লিজের ত্রি-বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৮৭০-১৮৯৯

জেলা	১৮৭০-৭২	১৮৭৩-৭৫	১৮৭৬-৬৮	১৮৭৯-৮১	১৮৮২-৮৪	১৮৮৫-৮৭	১৮৮৮-৮৯	১৮৯১-৯৩	১৮৯৪-৯৬	১৮৯৭-৯৯	মোট
ঢাকা	৯১৫	২৮০৩	৩৮৩৯	২৭৯১	৩০৯২	৩৭৪৭	৩৭৭২	৩১৮৬	২৪৬১	২৫৯৩	২৯১৯৯
ময়মনসিংহ	৪৯৭	৮৭৯	১৩৬১	১৪৬২	১৫১৬	১৫৬৫	১৬৩৩	১৫৫২	১৪৫১	১৪৮৭	১৩৪০৩
ফরিদপুর	১৬৫৫৪	২০১৬৬	৩১৮৩৩	২৮১৪৬	৩০৪৮৬	৩০১৫৪	২৪৭১৪	৩০৮৯৩	২৮৩০৪	৩০৯৪৫	২৭২১৯৫
চট্টগ্রাম	৩১১৯১	৫১৫২৬	৪৪৪১৯	৫৪৭৮৯	৭৬৮৭৮	৬৪০৭৪	৫৩৬৪৩	৭৮৫৮০	৬৭৪৬৩	৫২২৬৫	৫৭৪৮২৮
নোয়াখালী	৯৬৭০	১৯৩৮৯	২০৪১৩	১৭৯৪৫	১৭৫৫৫	১৫১১১	১৪৬০৬	১৮৫৯২	১৪৮৩১	১৫৩০৩	১৬৩৪১৫
ত্রিপুরা	২০৮৩	৪২৩২	৪৮৭৮	৬৭১২	৫৮৬৪	৪৬৯৫	৬১৭৭	৬১৭৪	৪৮৯০	৬০৩৭	৫১৭৪২
খুলনা	-	-	-	-	-	-	১৫০৪৫	১৪৮৪২	১৮৮৪৫	১৯৭৩০	৬৮৪৬২
যশোর	৩১৮৯৩	৪২৫০৯	৮৫০১৯	৮৭৮৫০	১৮৪৭৯	২৬৬৫০	১১৬৬১	১৫৮৪৭	২৩৮৭৪	৩৭৫৩৩	৩৮১৩১৫
বাকেরগঞ্জ	২৩৪৯০৭	২৬৩৯২	৫৪৯৯৭	৫৪৯২৪	২৬৩৭৯	২১৭৯৭	২০৭১১	২৪৭৪১	২৩৯৭১	২২১২২	৫১০৯৪১
রাজশাহী	৩৮৩	১০২৪	৯৪০	১১৫১	৯১৮	৯৪৯	৭২৭	৮৮৯	৮৭৮	১০৪১	৮৯০০
দিনাজপুর	৫৪	৬০	১৪৮	১৯৬	২৬৩	২৬৬	১৫২	২৭৫	২৭০	১৭৬	১৮৬০
রংপুর	২০২	১৫৮	২৮৫	৩০৫	৪০৩	২১৮	২৩২	২০১	২২২	২২৬	২৪৫২
বগুড়া	১১২	১২১	১৯২	১৭৭	৪৫৯	৩৪০	২৪৬	৪৬০	৩২৭	৩০৫	২৭৩৯
পাবনা	১৯৭২	২৭৮০	৪৭২৭	৬৮২০	১০৭৮	৮৯৬	৯৩২	৮৮৭	১১০২	৯০২	২২০৯৬
মোট	৩৩০৪৩৩	১৭২০৩৯	২৫৩০৫১	২৬৩২৬৮	১৮৩৩৭০	১৭০৪৬২	১৫৪২৫১	১৯৭১১৯	১৮৮৮৮৯	১৯০৬৬৫	২১০৩৫৪৭

উৎস : Islam, *Bengal Land Tenure*, p. 37.

সারণি ৬

ভূমি হস্তান্তর, ১৯১৩-১৯৪৩

সুগত বসু			বিনয় চৌধুরী			সুনীল সেন			পল আর. গ্রিনো			আজিজুল হক	
বছর	বিক্রির সংখ্য	বন্ধকের সংখ্য	বছর	বিক্রির সংখ্য	বন্ধকের সংখ্য	বছর	বিক্রির সংখ্যা	বন্ধকের সংখ্যা	বছর	বিক্রির সংখ্যা	বন্ধকের সংখ্যা	বছর	বিক্রির সংখ্যা
১৯২৯	৭৯,৯২৯	৫,৮৮,৫৫০	১৯৩০	১,২৯,১৮৪	৫,১০,৯৭৪	১৯৩০	১,২৯,১৮৪	৫,১০,৯৭৪	১৯৩৪	৩,০১, ০০০	৩,৪৯,০০০	১৯১৩	২,৫০,০০০
১৯৩০	১,২৯,১৮৪	৫,১০,৯৭৪	১৯৩১	১,০৫,৭০১	৩,৭৬,৪২২	১৯৩১	১,০৫,৭০১	৩,৭৬,৪২২	১৯৩৫	৩,২৪,০০০	৩,৫৭,০০০	১৯২৩	৩,১৪,০০০
১৯৩১	১,০৫,৭০১	৩,৭৬,১২২	১৯৩২	১,১৪,৬১৯	৩,৩৮,৯৪৫	১৯৩২	১,১৪,৬১৯	৩,৬৮,৯৪৫	১৯৩৬	৩,৪১,০০০	৩,৫২,০০০	১৯২৯	৮৫,৩৬১
১৯৩২	১,১৪,৬১৯	৩,৩৮,৯৪৫	১৯৩৩	১,২০,৪৯২	৩,১৩,৪৩১	১৯৩৩	১,২০,৪৯২	৩,১৩,৪৩১	১৯৩৭	৩,৩৪,০০০	৩,০২,০০০	১৯৩০	১,৫২,৬৩৯
১৯৩৩	১,২০,৪৯২	৩,১৩,৪৩১	১৯৩৪	১,৪৭,৬১৯	৩,৪৯,৪০০	১৯৩৪	১,৪৭,৬১৯	৩,৪৯,৪০০	১৯৩৮	৪,১২,০০০	১,৬৪,০০০	১৯৩১	১,৭৬,২৪৯
১৯৩৪	১,৪৭,৬১৯	৩,১৯,৪০০	১৯৩৫	১,৬০,৩৪১	৩,৫৭,২৯৭	১৯৩৫	১,৬০,৩৪১	৩,৫৭,২৯৭	১৯৩৯	৬,৫৪,০০০	১,৫৪,০০০	১৯৩২	১,৮৮,৭৩৭
১৯৩৫	১,৬০,৩৪১	৩,৫৭,২৯৭	১৯৩৬	১,৭২,৯৫৬	৩,৫২,৪৬৯	১৯৩৬	১,৭২,৯৫৬	৩,৫২,৪৬৯	১৯৪০	৬,৪৬,০০০	১,৬০,০০০	১৯৩৩	১,৯২,৮৯২
১৯৩৬	১,৭২,৯৫৬	৩,৫২,৪৬৯	১৯৩৭	১,৬৪,৮১৯	৩,০২,৫২৯	১৯৩৭	১,৬৪,৮১৯	৩,০২,৫২৯	১৯৪১	৭,৯৪,০০০	১,৫১,০০০	১৯৩৪	২,৩৫,১৪৭
১৯৩৭	১,৬৪,৮১৯	৩,০২,৫২৯	১৯৩৮	২,৪২,৫৮৩	১,৬৪,৮৯৫	১৯৩৮	২,৪২,৫৮৩	১,৬৪,৮৯৫	১৯৪২	৯,১৬,০০০	১,০৬,০০০	১৯৩৫	২,৬১,২৯৭
১৯৩৮	২,৪২,৫৮৩	১,৬৪,৮৯৫	১৯৩৯	৫,০০,২২৪	১,৫৪,৭৮০	১৯৩৯	৫,০০,২২৪	১,৫৪,৭৮০	১৯৪৩	১৬,৯৮,০০০	১,৮৩,০০০	১৯৩৬	২,৯৫,৩৭১
১৯৩৯	৫,০০,২২৪	১,৫৪,৭৮০	১৯৪০	৫,০২,৩৫৭	১,৬০,১৫২	১৯৪০	৫,০২,৩৫৭	১,৬০,১৫২					
১৯৪০	৫,০২,৩৫৭	১,৬০,১৫২	১৯৪১	৬,৩৪,১১৩	১,৫১,৫৫৩	১৯৪১	৬,৩৪,১১৩	১,৫১,৫৫৩					
১৯৪১	৬,৩৪,১১৩	১,৫১,৫৫৩	১৯৪২	৭,৪৯,৪৯৫	১,০৬,০৮৮	১৯৪২	৭,৪৯,৪৯৫	১,০৬,০৮৮					
১৯৪২	৭,৪৯,৪৯৫	১,০৬,০৮৮	১৯৪৩	১৫,৩২,২৪১	১,৮৩,৩৭১								
১৯৪৩	১৫,৩২,২৪১	১,৮৩,৩৭১											

উৎস : Paul R. Greenough, *Prosperity and Misery in Modern Bengal : The Famine of 1973-1944* (New York : Oxford University Press, 1982), p. 200; Chatterjee, *Bengal*, pp. 143-144; Bose, *Agrarian Bengal*, p. 151; হক, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ২৩৫; সুনীল সেন, (অনুবাদিকা : ছায়া দাশ গুপ্ত), *ভারতে কৃষি সম্পর্ক*, ১৭৯৩-১৯৪৭ (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫), পৃ. ২৭; মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, বিংশ শতাব্দী, পৃ. ৩৪।

সারণি ৭
১৮৮৫-১৯১২ সালে কংগ্রেসের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মুসলমান জোতদারদের তালিকা

অধিবেশন	কংগ্রেস জোন	নির্বাচকমণ্ডলী বিভাগ (Electoral Division)	নাম	ঠিকানা	কিভাবে ও কখন নির্বাচিত
কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৮৮৬			মৌলভী সৈয়দ বাসারাতউল্লাহ	জোতদার ও খুলনা স্থানীয় বোর্ডের সদস্য	বাগেরহাট পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাচিত
			মৌলভী নওশের আলী খান	জোতদার ও 'আহমদী' পত্রিকার সম্পাদ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ	
বোম্বে জাতীয় কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৮৮৯	ঢাকা	ঢাকা	শেখ হেদায়েত বক্স	জোতদার, ব্যবসায়ী ও ঢাকা আঞ্জুমানী ইসলামিয়ার সেক্রেটারী	১৮৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্ব জনসমাবেশে নির্বাচিত
কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের সপ্তদশতম অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৯০১	কলকাতা	যশোর	মৌলভী হাবিবুর রহমান	ভূম্যধিকারী	মুসলিম এসোসিয়েশনের জনসমাবেশে নির্বাচিত
	কলকাতা	ময়মনসিংহ	মোল্ল্যা আতাউল্লাহ	ভূম্যধিকারী	মুসলিম এসোসিয়েশনের জনসমাবেশে নির্বাচিত
	কলকাতা	টাঙ্গাইল	মৌলভী আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজাই	জোতদার	১৯০১ সালের ৮ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাচিত
বেনারসে জাতীয় কংগ্রেসের একুশতম অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৯০৫	ঢাকা	ঢাকা	শেখ হেদায়েত বক্স	জোতদার ও ব্যবসায়ী	১৯০৫ সালের ১১ ডিসেম্বর ঢাকা পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাচিত
কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বাইশতম অধিবেশন, ডিসেম্বর, ১৯০৬	ঢাকা	ঢাকা	শেখ হেদায়েত বক্স	জোতদার ও ব্যবসায়ী	১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকা পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাচিত
	ময়মনসিংহ	টাঙ্গাইল	মৌলভী আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজাই	জোতদার, টাঙ্গাইল	১৯০৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল পিপল'স এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত নির্বাচিত
	ফরিদপুর	ফরিদপুর	নাইমুদ্দিন হাওলাদার	জোতদার, কারাকান্দি	১৯০৬ সালের ১২ ডিসেম্বর জনসমাবেশে নির্বাচিত
	বরিশাল	বরিশাল	সৈয়দ মুহাম্মদ আশরাফ	জোতদার ও চিকিৎসক	১৯০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর জনসমাবেশে নির্বাচিত

* দ্রষ্টব্য : মূল গ্রন্থে জোতদার ও তালুকদার পৃথক ভাবে উল্লেখ থাকলেও এই সারণিতে তা জোতদার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

উৎস : Ahmed, *Muslim Community in Bengal*, pp. 299-319.

সারণি ৮

ভূমি রাজস্বের চাহিদা ও আদায়, ১৯২৪-২৫ থেকে ১৯৩৭-৩৮

বিভাগ	জেলা	বছর	এস্টেট সংখ্যা	এলাকা স্কয়ার মাইল	প্রতি ইউনিট (স্কয়ার মাইল)	বর্তমান চাহিদা টাকা	আদায় টাকা	হার	বকেয়া চাহিদা টাকা	আদায় টাকা	হার
প্রেসিডেন্সী	যশোর	১৯২৪-২৫	২,৭৬৩	২,৯০৩	১.০৫	৮,৮৭,০২২	৮,৭৯,৩৭০	৯৯.১৪	৮,৭৮৭	৮,৪১৬	৯৫.৭৮
		১৯২৬-২৭	২,৭৭৩	২,৬০৬	০.৯৪	৮,৯১,৩০৩	৮,৭৮,৮৩৬	৯৮.৬০	১৪,৯৪৩	১২,৩০২	৮২.৩৩
		১৯২৮-২৯	২,৭৭৩	২,৯০৭	১.০৫	৮,৯২,২৩৬	৮,৭২,৫১৯	৯৭.৭৯	২০,৭১৮	১২,৭৯৪	৬১.৭৫
		১৯২৯-৩০	২,৭৭৫	২,৯০৭	১.০৫	৮,৯২,৪২৫	৮,৭০,২৫৫	৯৭.৫২	২৭,৭০০	১৩,৬৫২	৪৯.২৯
		১৯৩০-৩১	২,৭৭৪	২,৯০৫	১.০৫	৮,৯৩,৭১৫	৮,৪০,৯৪৫	৯৪.১০	৩৬,০৫৫	২১,৫৫৮	৫৯.৭৯
		১৯৩৪-৩৫	২,৭৮৪	২,৯০৬.৫৩	১.০৪	৮,৯৪,৯০২	৭,৭৯,৫৯৪	৮৭.১২	১,৯০,৯৭২	১,১৩,৪৯৪	৫৯.৪৩
		১৯৩৭-৩৮	২,৭৭৫	২,৬১৭.২২	০.৯৪	৮,৯৯,৭৮২	৮,১৪,৫৫০	৯০.৫৩	১,৭৮,৩২৬	১,৩১,৬৩৫	৭৩.৮২
	খুলনা	১৯২৪-২৫	১,০৬৬	২,৪৪২	২.২৯	৭,৭২,৭৫০	৭,০৮,০৬৪	৯১.৬৩	৩০,৮৫৩	২৬,৪০২	৮৫.৫৭
		১৯২৬-২৭	১,০৫৭	২,৪৫৬	২.৩২	৮,৪০,৭৫৭	৭,৪৮,৪৫০	৮৯.০২	৭৩,৪১৫	৫৩,৪৭০	৭২.৮৩
		১৯২৮-২৯	১,১৩৭	২,৪৬৩	২.১৭	৮,৬৭,৯৭৪	৭,৫৮,১৫১	৮৭.৩৫	১,৩৪,৯৮৩	৯৮,৩৭২	৭২.৮৮
		১৯২৯-৩০	১,১৫৫	২,৪৬৩	২.১৩	৮,৭০,৫৭৬	৮,০১,৩১৯	৯২.০৪	১,৪৬,৩৫৬	৯২,৭৪৭	৬৩.৩৭
		১৯৩০-৩১	১,১৫৭	২,৪৬৩	২.১৩	৮,৭৩,০১৬	৭,৪১,১৯৯	৮৪.৯০	১,২৩,৮৭৩	৫০,৬৭১	৪০.৯১
		১৯৩৪-৩৫	১,২৪৯	২,৪৬৩.০৭	১.৯৭	৯,০৩,৫৯৫	৭,০৪,৯০২	৭৮.০১	৪,৮৮,৩০৯	২,৫০,১১৬	৫১.২২
		১৯৩৭-৩৮	১,২৫০	২,৪৬১.৮৪	১.৯৭	৯,২৫,০৬৮	৭,৭৯,৯৪৯	৮৪.৩১	৩,২৪,৩৭৮	১,০৫,৭৩৮	৩২.৬০
ঢাকা	ঢাকা	১৯২৪-২৫	১১,৭৫৬	২,৮৫৬	০.২৪	৬,৩৩,৬৮৪	৫,৯৬,৬০৪	৯৪.১৫	৫৮,৮৫২	৩৭,৩২৫	৬৩.৪২
		১৯২৬-২৭	১১,৭৬১	২,৮৫৩	০.২৪	৬,৩৮,৫৩৪	৬,০৩,৫৪৫	৯৪.৫২	৪৯,৭৯৭	৩৩,৬৪০	৬৭.৫৫
		১৯২৮-২৯	১১,৭৮৪	২,৮৫৩	০.২৪	৬,৩৬,১৫৪	৫,৯৯,৮৯৪	৯৪.৩০	৪৯,৩৭১	৩৭,৬৬৪	৭৬.২৯
		১৯২৯-৩০	১১,৮৬৫	২,৮৫৯	০.২৪	৬,৪৩,৪৬০	৫,৯২,৭৫৭	৯২.১২	৪২,৬৬৪	২৪,৭০৫	৫৭.৯১
		১৯৩০-৩১	১১,৮৭২	৩,২৩২	০.২৭	৬,৪৪,২০৫	৫,৫৩,৮০০	৮৫.৯৭	৬৭,২৭৮	৩৬,৭৬৮	৫৪.৬৫
		১৯৩৪-৩৫	১১,৮৬৩	৩,২২৫	০.২৭	৬,৬৩,৬৯০	৫,৬২,৯০০	৮৪.৮১	১,৪০,২৫০	৮১,৮৭৫	৫৮.৩৮
		১৯৩৭-৩৮	১১,৯৫১	৩,২২৭	০.২৭	৬,৬৬,১১৮	৬,০২,২০০	৯০.৪০	১,২১,১৮৩	৭৩,৫৩২	৬০.৬৮
	ময়মনসিংহ	১৯২৪-২৫	১০,৭৪৭	৬,৩২৪	০.৫৯	৯,৪৪,৮২৬	৮,৯৩,৮৫৫	৯৪.৬১	১,২৬,৮৮৪	৪৮,৪৪৩	৩৮.১৮
		১৯২৬-২৭	১০,৭১১	৬,৩১১	০.৫৯	৯,৩২,০১৩	৮,৯৭,৯৩৩	৯৬.৩৪	৬৭,১৬২	৩৮,৪৭১	৫৭.২৮
		১৯২৮-২৯	১০,৭৩৫	৬,৩১২	০.৫৯	৯,৩১,৮৩১	৯,০৯,২৭৭	৯৭.৫৮	৪৪,৩৬৫	৩৩,৭৫৭	৭৬.০৯
		১৯২৯-৩০	১০,৭৪৫	৬,৩১২	০.৫৯	৯,৩৩,৩১১	৮,৮৫,৮৯৩	৯৪.৯২	৩০,৯৭২	১৫,৮৯৯	৫১.৩৩
		১৯৩০-৩১	১০,৭৬১	৬,৩১২	০.৫৯	৯,৩৩,২৯০	৮,৪৭,৯৬৪	৯০.৮৬	৬১,৯২৭	২৬,৭৩৭	৪৩.১৮
		১৯৩৪-৩৫	১০,৭৫১	৬,৩০৩	০.৫৯	৯,২৬,১৯১	৮,৩৭,৬৭১	৯০.৪৪	১,৬১,২৬৪	৪৯,২২৯	৩০.৫৩
		১৯৩৭-৩৮	১০,৮১৩	৬,৩০৩	০.৫৮	৯,৪৪,৬১৪	৮,৭৩,৪৫৭	৯২.৪৭	১,৭৬,৫৮০	৮৮,৩১০	৫০.০১
	ফরিদপুর	১৯২৪-২৫	৬,৩২৮	২,৩১৪	০.৩৭	৭,২৬,৬০৯	৫,৯১,৪৪৮	৮১.৪০	২,২৩,১৭৯	১,৪৬,০৬২	৬৫.৪৫
		১৯২৬-২৭	৬,৪০৩	২,৩১৫	০.৩৬	৭,১৫,৯৫৯	৬,৪০,৫১৩	৮৯.৪৬	১,২৩,৫৯৪	৮৮,৩৬৫	৭১.৫০
		১৯২৮-২৯	৬,৪২৫	২,৩০২	০.৩৬	৭,১৬,৮৫৮	৬,১৭,৯১২	৮৬.২০	১,২০,৯৩১	১,০৭,৩৬৭	৮৮.৭৮

ঢাকা	ফরিদপুর	১৯২৯-৩০	৬,৪১৮	২,৩০১	০.৩৬	৭,১২,৯৪৬	৬,২১,৮৩৮	৮৭.২২	১,০৬,৩৬১	৯১,৯৯৩	৮৬.৪৯
		১৯৩০-৩১	৬,৪২৫	২,৩০০	০.৩৬	৭,১৩,১৮২	৫,২৩,৪৫৯	৭৩.৪০	১,০১,৪৮০	৭২,৮০৩	৭১.৭৪
		১৯৩৪-৩৫	৬,৪৯৮	২,৩০২	০.৩৫	৭,৬৮,৪০৫	৪,৫২,৫৫৫	৫৮.৯০	৪,৬১,০৮৬	৩,০৯,১৯২	৬৭.০৬
		১৯৩৭-৩৮	৬,৪৯৭	২,৩৫৪	০.৩৬	৭,৬৪,২২৮	৬,০০,৮০০	৭৮.৬২	৩,০২,৫৫৫	২,০৪,৭১৫	৬৭.৬৬
	বাকেরগঞ্জ	১৯২৪-২৫	৪,০৭৬	২,৬৫৫	০.৬৫	২৩,৯৩,১৬১	২৩,৪৯,৯৪৬	৯৮.১৯	৬৪,৪৪১	৩৮,৭৪৯	৬০.১৩
		১৯২৬-২৭	৪,১৩৯	৩,৬৫২	০.৮৮	২৪,৫১,০৯০	২৩,৭০,০৩০	৯৬.৬৯	৭৯,২৮১	৬৪,৭২৪	৮১.৬৪
		১৯২৮-২৯	৪,১৫৮	৩,৬৫১	০.৮৮	২৫,৯১,৭৬৩	২৩,৫১,৭৭৪	৯০.৭৪	১,৬১,৮০০	১,৪৩,৩৬২	৮৮.৬০
		১৯২৯-৩০	৪,১৫২	৩,৬৪৮	০.৮৮	২৬,৬০,০৭৩	২২,৫৮,৮৮২	৮৪.৯২	২,৫৬,২৫১	২,৪৪,৪৩৫	৯৫.৩৯
		১৯৩০-৩১	৪,১৭১	৩,৬৪৮	০.৮৭	২৭,৩৬,৪৬৭	১৭,৪৭,৯৮৬	৬৩.৮৮	৩,৯৮,৮৯৭	৩,৬৪,৭৭৬	৯১.৪৫
		১৯৩৪-৩৫	৪,২০৭	৩,৬৫২	০.৮৭	২৯,৭৯,৯৯৯	১০,৭৭,১০৩	৩৬.১৪	২৬,৫৬,১১৬	১৯,৩৬,৪১৫	৭২.৯০
		১৯৩৭-৩৮	৪,২১৮	৩,৬৫৪	০.৮৭	৩০,৭৪,৩৭৮	২৪,২০,১৭৬	৭৮.৭২	১০,৪৯,৬৭৪	৪,০৯,৮৭৪	৩৯.০৫
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১৯২৪-২৫	২৮,৫৮০	১,২৬৯	০.০৪	১৩,৬৭,০৪৮	১১,৪০,৭৭৯	৮৩.৪৫	২,৬৫,০৬২	১,৬৫,৫৯৯	৬২.৪৮
		১৯২৬-২৭	২৮,৫৬২	১,২৭০	০.০৪	১৩,৬১,৩৫০	১১,৩৩,৬৯২	৮৩.২৮	২,৮৪,৬৪৬	২,২২,৩১০	৭৮.১০
		১৯২৮-২৯	২৮,৫৪৭	১,২৭০	০.০৪	১৪,৯৫,০২১	১১,২৭,২০২	৭৫.৪০	৩,৯০,১৩৯	৩,০৫,৮৩৯	৭৮.৩৯
		১৯২৯-৩০	২৮,৫৪০	১,২৭০	০.০৪	১৫,৭৪,৭৪১	১১,৪০,৩০৩	৭২.৪১	৪,৫৫,৩৫৮	৩,৮০,৭৭৪	৮৩.৬২
		১৯৩০-৩১	২৮,৫৩০	১,২৭০	০.০৪	১৬,১২,৬৫৯	১০,৮৯,১৫১	৬৭.৫৪	৫,৫৪,৯১৩	৩,৯৫,৮৯০	৭১.৩৪
		১৯৩৪-৩৫	২৮,৪৬২	১,২৮০	০.০৪	১৬,৩৮,৩৫২	৮,৫৮,৮৯৩	৫২.৪২	১১,৫০,২৪৬	৬,৭৩,০৪২	৫৮.৫১
		১৯৩৭-৩৮	২৮,৩৬৭	১,২৮০	০.০৫	১৫,৩৮,৬০১	১২,৮১,৮১৪	৮৩.৩১	২,৫৮,২৭৬	১,৯৫,০৪০	৭৫.৫২
	ত্রিপুরা	১৯২৪-২৫	৩,১৫৭	২,৪০৫	০.৭৬	১১,৬৩,১৮৬	১১,২৯,৬৪৯	৯৭.১৭	৩৮,০৯৪	৩৫,৯০৩	৯৪.২৫
		১৯২৬-২৭	৩,২৯১	২,৪০৭	০.৭৩	১১,৬৬,৬৮৯	১১,২৬,১৩৯	৯৬.৫২	২২,৩৯৩	১৭,৪৪৬	৭৭.৯১
		১৯২৮-২৯	৩,৪১৮	২,৪২২	০.৭১	১১,৮৫,৮১৬	১১,২৩,৭৮৬	৯৪.৭৭	৯৩,৬১৪	৯০,০২৩	৯৬.১৬
		১৯২৯-৩০	৩,৪৩৩	২,৩৯৩	০.৭০	১১,৭৯,৩৩৭	১০,৬৯,১৯৮	৯০.৬৬	৬২,৪৫৮	৫৭,৭৮২	৯২.৫১
		১৯৩০-৩১	৩,৪৬২	২,৩৯৩.৬৪	০.৬৯	১১,৮০,৬৭৪	৯,৮২,৫৮৭	৮৩.২২	১,১৩,৩০৮	৬০,৪৪০	৫৩.৩৪
		১৯৩৪-৩৫	৩,৬৯৯	২,৩৯৫.৭৮	০.৬৫	১২,০১,৪৬০	৯,৬৭,৩৫৯	৮০.৫২	৪,২৫,৬২৭	২,৪৭,৭৫১	৫৮.২১
		১৯৩৭-৩৮	৩,৭৫৬	২,৩৬৫.৮৬	০.৬৩	১১,৯৯,২২০	১০,০৪,৪৮৭	৮৩.৭৬	৩,০৬,৯৬৫	২,১৫,৩৯৪	৭০.১৭
	নোয়াখালী	১৯২৪-২৫	১,৭৪৬	১,৭০১	০.৯৭	৯,৬৬,০০৯	৮,৬৩,৯৯২	৮৯.৪৪	১,৪১,৭০২	৯৪,২৯৬	৬৬.৫৫
		১৯২৬-২৭	১,৭৫২	১,৭০১	০.৯৭	৯,৯৩,৭৬৪	৮,৫৯,৬৫৮	৮৬.৫১	১,৪০,৯৪৯	১,০৫,২৬২	৭৪.৬৮
		১৯২৮-২৯	১,৭৬১	১,৭০১	০.৯৭	১০,৪১,৬৭৩	৮,৬৯,১৩৫	৮৩.৪৪	১,৬৭,৭৪৭	১,২৯,৭৬৯	৭৭.৩৬
		১৯২৯-৩০	১,৭৬১	১,৭০১	০.৯৭	১০,৬৭,৮১৬	৮,৩৯,৬৬৬	৭৮.৬৩	২,০৪,৩৯২	১,৯২,৫০৭	৯৪.১৯
		১৯৩০-৩১	১,৭৫৭	১,৯১৫	১.০৯	১০,৭৯,৫৭২	৭,২১,৪১১	৬৬.৮২	২,৪২,১৫২	২,৪২,১৫২	১০০.০০
		১৯৩৪-৩৫	১,৭২৫	১,৯১৫	১.১১	১২,৫৪,০৫০	৫,২৪,৪০৯	৪১.৮২	১১,৫৪,২৭৭	৭,৩৭,৬৯১	৬৩.৯১
		১৯৩৭-৩৮	১,৭৩০	১,৯১৭	১.১১	১২,২২,৩৬৯	৫,৬৯,০৪০	৪৬.৫৫	৫,৯১,২৩১	৫,৪১,২২৮	৯১.৫৪
রাজশাহী	রাজশাহী	১৯২৪-২৫	১,৬৫৯	২,৫৬৮	১.৫৫	১০,০৭,৩৭৪	১০,০৫,১৫৫	৯৯.৭৮	৩,৩১৩	৩,৩১৩	১০০.০০
		১৯২৬-২৭	১,৭৭৯	২,৬১১	১.৪৭	১০,৩৫,৩৫২	১০,৩০,৬৭১	৯৯.৫৫	৬,৬৬৯	৪,৯২০	৭৩.৭৭
		১৯২৮-২৯	১,৮০১	২,৬১০	১.৪৫	১০,৪০,৯৭৩	১০,৩১,৪৩৮	৯৯.০৮	১২,৯০২	৭,৭৪২	৬০.০১
		১৯২৯-৩০	১,৮৪১	২,৬১১	১.৪২	১০,৪৪.৩৭৯	১০,৩৩,৩৬৬	৯৮.৯৫	১৫,৭৬৯	৭,৫৮১	৪৮.০৮
		১৯৩০-৩১	১,৮৪১	২,৬১২	১.৪২	১০,৪৬,২১৫	৯,৯২,৩৮৩	৯৪.৮৫	২২,৭৫৮	৬,৪১৩	২৮.১৮
		১৯৩৪-৩৫	১,৮৯৯	২,৬০৭.৩১	১.৩৭	১০,৪২,০৩৯	৯,৫৭,৫১৪	৯১.৮৯	২,০৯,০৭২	৭৯,৭৬৩	৩৮.১৫

রাজশাহী	রাজশাহী	১৯৩৭-৩৮	১,৯১৮	২,৫৭৩.৬২	১.৩৪	১০,২৭,১৫৫	৯,৮৮,৫৭৫	৯৬.২৪	১,৭২,৮১০	৮৩,৯০৩	৪৮.৫৫
	দিনাজপুর	১৯২৪-২৫	৮৯২	৪,০৭৮	৪.৫৭	১৫,১৮,৮৬৪	১৫,১৬,৪০১	৯৯.৮৪	৫,৮০৪	৫,৭২৮	৯৮.৬৯
		১৯২৬-২৭	৯৩১	৪,০৭৯	৪.৩৮	১৫,১৮,৭৮৬	১৫,১৭,৫৬৮	৯৯.৯২	১,৬০৪	১,৬০৪	১০০.০০
		১৯২৮-২৯	৯৪৪	৪,০৮০	৪.৩২	১৫,১৮,৩৪৪	১৫,০৭,৪৮৯	৯৯.২৯	২,৮১৫	২,৮১৫	১০০.০০
		১৯২৯-৩০	৯৪৯	৪,০৮০	৪.৩০	১৫,১৮,৩৩৪	১৫,০৭,৬৪১	৯৯.৩০	১০,৮৫৫	১০,৮৫৫	১০০.০০
		১৯৩০-৩১	৯৫৮	৪,০৭৯	৪.২৬	১৫,১৮,৩৩৪	১৩,৮১,২৭৩	৯০.৯৭	১০,৬৯৩	১০,৬৯৩	১০০.০০
		১৯৩৪-৩৫	৯৮৮	৪,১৩১.৪১	৪.১৮	১৫,২৪,৩৭৩	১৩,৯৫,৪৮০	৯১.৫৪	৩,১২,৭৮৯	২,৩৭,৭১৪	৭৬.০০
		১৯৩৭-৩৮	১,০৫৩	৪,৬৩৫.৫৩	৪.৪০	১৫,৩৪,১৮০	১৩,৩২,৫৭৫	৮৬.৮৬	১,৩২,৫০৮	১,১৬,৯৩৮	৮৮.২৫
	রংপুর	১৯২৪-২৫	৬৯০	৪,০৫২	৫.৮৭	১০,১৬,০২৪	১০,১৫,২৭৭	৯৯.৯৩	৬,৮৯৭	৬,৮৯৭	১০০.০০
		১৯২৬-২৭	৬৯১	৪,০৫২	৫.৮৬	১০,১৬,০৪৮	১০,১২,১৫১	৯৯.৬২	৪৯৩	৪৯৩	১০০.০০
		১৯২৮-২৯	৭০৮	৪,১২১	৫.৮২	১০,১৬,০১৩	৯,৭৩,৫৬৬	৯৫.৮২	২৬,১৯৭	২৬,১৯৭	১০০.০০
		১৯২৯-৩০	৭০৮	৪,১২১	৫.৮২	১০,১৬,০১২	৯,৭১,৬৪৮	৯৫.৬৩	৪২,৪৪৭	৩৪,২৫৮	৮০.৭১
		১৯৩০-৩১	৭১২	৪,১২১	৫.৭৯	১০,১৬,১৭৩	৭,৪৮,৭৬৪	৭৩.৬৮	৫২,৫৫৩	৪৩,১২৩	৮২.০৬
		১৯৩৪-৩৫	৭১৬	৪,২০৪.৬৫	৫.৮৭	১০,১৬,৮৭৯	৮,৮০,৯২৪	৮৬.৬৩	৬,৫৪,৫৬৫	৩,৮৮,০৯০	৫৯.২৯
		১৯৩৭-৩৮	৭৫৩	৪,২২১.৮৮	৫.৬১	১০,৩৩,৭০২	৯,০৭,২১৯	৮৭.৭৬	৪,১৫,৫৫৩	১,৮৬,৭৩০	৪৪.৯৪
	বগুড়া	১৯২৪-২৫	৬৩৪	১,৩১১	২.০৭	৪,৮০,৯২৫	৪,৬৩,৫৭৩	৯৬.৪০	৩৪,২৩১	৩০,৮৬৩	৯০.১৬
		১৯২৬-২৭	৬৩৭	১,৩১১	২.০৬	৪,৯৯,৭৭২	৪,৯০,৯২৫	৯৮.২৩	২৩,১২৫	১৪,৬৫৫	৬৩.৩৭
		১৯২৮-২৯	৬৭২	১,৩১৩	১.৯৫	৫,০৮,০১৩	৪,৭১,৪৫৯	৯২.৮০	২৬,৯৪৪	২২,৪৬৪	৮৩.৩৭
		১৯২৯-৩০	৬৭২	১,৩১৩	১.৯৫	৫,০৫,৬৬৭	৪,৭৩,৯৯৭	৯৩.৭৪	৪০,৯৭৭	২২,৪৪২	৫৪.৭৭
		১৯৩০-৩১	৬৯৮	১,৩৩৭	১.৯২	৫,১১,৯৬৮	৪,৩৩,২৮৫	৮৪.৬৩	৫০,৪৫১	২৩,৯২২	৪৭.৪২
		১৯৩৪-৩৫	৭০১	১,৩২২	১.৮৯	৫,০৯,৭১০	৪,৩৪,২১০	৮৫.১৯	১,৪২,১৭৬	১,০৪,০০১	৭৩.১৫
		১৯৩৭-৩৮	৬৯৭	১,৩১৬	১.৮৯	৪,৯৬,৮৪৪	৪,৩৫,২১৪	৮৭.৬০	৭৭,৮৭৭	৫৪,৬৩৩	৭০.১৫
	পাবনা	১৯২৪-২৫	১,৯৯২	১,৬৯২	০.৮৫	৪,৪১,৮৮৮	৪,১৪,৮৭৫	৯৩.৮৯	৬৭,১৫৬	৪৩,৭১৮	৬৫.১০
		১৯২৬-২৭	২,০৫৫	১,৬৯২	০.৮২	৪,৫০,১৭৩	৪,১৫,২০৮	৯২.২৩	২৯,৫৭৮	১৮,৪৩৮	৬২.৩৪
		১৯২৮-২৯	২,১৬১	১,৭০২	০.৭৯	৪,৬৪,৫৮৮	৪,২৫,৭৪৫	৯১.৬৪	৪১,৮৯৭	৩১,৫৩৭	৭৫.২৭
		১৯২৯-৩০	২,১৫৭	১,৬৯৬	০.৭৯	৪,৬৯,২০৭	৪,২৬,৪৩২	৯০.৮৮	৪৮,১৬৫	৩১,৭৮২	৬৫.৯৯
		১৯৩০-৩১	২,১৬৬	১,৬৮৯	০.৭৮	৪,৮৭,০৭৭	৪,০৪,১৯০	৮২.৯৮	৬৬,৫০৪	৩১,৩৪৩	৪৭.১৩
		১৯৩৪-৩৫	২,২০৯	১,৭০১.৩৫	০.৭৭	৫,২৮,৬৫৯	৩,৮৯,৯৬৬	৭৩.৭৭	৩,১০,১৭৬	৯০,৮৮৮	২৯.৩০
		১৯৩৭-৩৮	২,২০৯	১,৭০২.৩১	০.৭৭	৫,৩৯,০৩৬	৪,০৭,৫৮২	৭৫.৬১	৩,৩৯,৬৮৮	১,০০,৪৮৮	২৯.৫৮

উৎস : *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1924-25*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1925), p. ii; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1926-27*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1927), p. 28; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1928-29*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1929), p. 32; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1929-30*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1930), p. 32; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 19230-31*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1931), p. 28; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1934-35*, Board of Revenue, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1935), p. 22; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1937-38*, Board of Revenue, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1938), pp. 20-21.

সারণি ৯

জমিদারদের খাজনা আদায়, ১৯১৪-১৫ থেকে ১৯৩৮-৩৯

বছর	মোট খাজনা
১৯১৪-১৫ থেকে ১৯১৮-১৯	১২,২৩,৮৮,০০০
১৯১৯-২০ থেকে ১৯২৩-২৪	১৩,৯৫,৫৬,০০০
১৯২৪-২৫ থেকে ১৯২৮-২৯	১৪,৮৮,৪২,০০০
১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৩৩-৩৪	১৬,১৪,৬৬,০০০
১৯৩৪-৩৫ থেকে ১৯৩৮-৩৯	১৯,৯৯,৯৬,০০০

উৎস : M. Mufakharul Islam, *Bengal Agriculture 1920-1946 : A quantitative study* (London : Cambridge University Press, 1978), p. 190.

সারণি ১০

প্রতি একরে রাজস্ব, খাজনা ও মুনাফা, ১৯৩৬-৩৭

বিভাগ	জেলা	প্রতি একরে খাজনা			প্রতি একরে রাজস্ব			খাজনা-রাজস্ব = মুনাফা		
		টাঃ	আঃ	পঃ	টাঃ	আঃ	পঃ	টাঃ	আঃ	পঃ
প্রেসিডেন্সি	যশোর	১০	২	০	১	২	০	৯	০	০
	খুলনা	১২	৭	০	১	২	০	১১	৫	০
ঢাকা	ঢাকা	৩	১১	০	০	৭	০	৩	৪	০
	ময়মনসিংহ	৪	১৫	০	০	৬	০	৪	৯	০
	ফরিদপর	৬	৩	০	০	৪	০	৫	১১	০
	বাকেরগঞ্জ	৩	১৩	০	১	১৩	০	২	০	০
চট্রগ্রাম	চট্রগ্রাম	১৪	১৫	০	২	৬	০	১২	৯	০
	ত্রিপুরা	৫	৩	০	১	০	০	৪	৩	০
	নোয়াখালী	৬	৯	০	১	১০	০	৪	১৫	০
রাজশাহী	রাজশাহী	৫	২	০	০	০	৪	৪	২	০
	দিনাজপুর	৬	১৪	০	১	৬	০	৫	৮	০
	রংপুর	৫	৩	০	০	১০	০	৪	৯	০
	বগুড়া	৯	২	০	০	১৪	০	৮	৪	০
	পাবনা	৪	১১	০	০	৯	০	৪	২	০

উৎস : হক, *বাংলার কৃষক*, পৃ. ১২৬-১৩৩।

সারণি ১১
প্রতি একরে গড় খাজনা, ১৯৪০'র দশক

বিভাগ	জেলা	মোকরারি রায়ত (Raiyat at fixed rent)			দখলি রায়ত (Settled and occupancy raiyats)			অদখলি রায়ত (Non-occupancy raiyats)		
		টাঃ	আঃ	পঃ	টাঃ	আঃ	পঃ	টাঃ	আঃ	পঃ
প্রেসিডেন্সি	যশোর	১	৫	১০	২	৭	৫	৪	৩	০
	খুলনা	২	৬	৫	৩	৫	১০	৫	১১	১০
	ঢাকা	২	২	৯	২	১৩	০	৬	১	৬
	ময়মনসিংহ	১	৮	৬	২	১৫	৩	২	৮	৭
	ফরিদপুর	২	৬	৭	২	১০	৬	৩	০	৭
ঢাকা	বাকেরগঞ্জ	৩	১	১১	৪	৮	১০	৩	১২	৮
	চট্টগ্রাম	৬	০	০	৪	১০	১১		---	
	ত্রিপুরা	৩	১২	১	৩	২	২	২	১৫	৬
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	৫	৩	২	৪	৪	৫	২	৯	৬
	রাজশাহী	২	৫	৫	৩	৩	০	২	১৪	০
	দিনাজপুর	১	৯	৩	১	১৫	৭	২	২	৬
	রংপুর	২	৬	৩	৩	২	১১	৩	২	৬
রাজশাহী	বগুড়া	২	১	১০	২	১৪	৫	৩	৬	৯
	পাবনা	১	১৩	১০	৩	১	৩	৩	২	৮

উৎস : Chatterjee, *Bengal*, p. 19.

সারণি ১২
প্রতি একরে গড় খাজনা, ১৯৩৮

জেলা	প্রতি একরে রায়তের গড় খাজন						প্রতি একরে অধীনস্ত কৃষকের গড় খাজন			
	মোকরারি কৃষক		দখলি কৃষক		অদখলি কৃষক					
	টাকা	আনা	টাকা	আনা	টাকা	আনা	টাকা	আনা	পয়সা	
যশোর	১	৫	২	৭	২	৮	৩	১৪	০	
খুলনা	২	৬	৩	৬	৩	৮	৫	০	০	
							৩	১২	৩	১ম স্তর
ফরিদপুর	২	৯	২	৯	২	১০	৪	০	০	২য় স্তর
							৪	৬	৫	৩য় স্তর
							৭	০	৯	১ম স্তর
বাকেরগঞ্জ	৩	২	৪	৯	৪	৮	৭	১৩	৪	২য় স্তর
							৯	১৪	৭	৩য় স্তর
ঢাকা	২	৩	২	১৩	২	১৩	৩	৬	০	
ময়মনসিংহ	১	১৪	২	১২	২	১২	৫	০	০	
রাজশাহী	২	৬	৩	৫	৩	৫	৫	১৩	০	
ত্রিপুরা	৩	১২	৩	২	৩	৬	৭	০	০	
নোয়াখালী	৫	৩	৪	৪	৪	৮	৬	৯	০	

উৎস : *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. III, p. 60; *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. V, p. 114.

সারণি ১৩

বিভিন্ন শ্রেণির জমির উপর উঠবন্দি রায়তের খাজনার হার

বিভিন্ন শ্রেণীর জমির স্থানীয় নাম	প্রতি একরে খাজনার পরিমাণ		
	টাঃ	আঃ	পঃ
১. নাল (Nal)	৩	৬	০
২. পচন (Pachan or Khicha)	১	১১	০
৩. পতিত Patit)	-	-	-
৪. বাস্তু (Bastu)	১৫	০	০
৫. উদ্বাস্তু (Udbastu)	৭	৮	০
৬. পালান (Palan)	৫	১০	০
৭. ডিহি (Dihi)	২২	৮	০
৮. আম বাগান (Mango groves)	২২	৮	০
৯. কাঁঠাল বাগান (Jackfruit groves)	৩০	০	০
১০. খেজুর বাগান (Date palm)	২২	৮	০
১১. বাশ বাগান (Bamboo)	৭	৮	০
১২. আখের ক্ষেত (Sugarcane)	২২	৮	০
১৩. নারিকেল বাগান (Cocoanut)	০	৬	০
১৪. আম গাছ প্রতি (Mango single tree)	০	৬	০
১৫. কাঁঠাল গাছ প্রতি (Jacjfruit single tree)	০	২	০
১৬. খেজুর গাছ প্রতি (Date palm single tree)	০	৩	০
১৭. নারিকেল গাছ প্রতি (Cocoanut single tree)	৬	০	০
১৮. পাট ক্ষেত (Jute land)	৬	০	০
১৯. ছনের বাগান (Thatching grass land)	০	১	৬
২০. আশা (Asha)	-	-	-

উৎস : Siddiquee, *Socio-Economic Development of a Bengal District*, p. 70.

সারণি ১৪

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ব্রিটিশ ভারতে ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা

প্রদেশ/ অঞ্চল	বন্দোবস্ত	দখলিস্বত্বের ধরণ (proprietary form of tenure)	দখলিস্বত্বাধিকারী (proprietors)	সরকারকে রাজস্ব প্রদানে দায়	জেলার নাম
বাংলা	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent settlements)	জমিদারি প্রথা (Zamindari or zamindar proprietary form of tenure)	জমিদার (zamindar proprietors)	জমিদার	বাংলার সকল জেলায়
	অস্থায়ী/রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত (Temporany/Ryotwari settlement)	রায়তওয়ারি প্রথা (Ryotwari or peasant proprietary form of tenure)	রায়ত/কৃষক (Peasant proprietors)	রায়ত/কৃষক	বাংলার বিভিন্ন জেলার চরাঞ্চলে (পূর্ব বাংলার ঢাকা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পাবনা, বগুড়া, ত্রিপুরা, বাকেরগঞ্জ ও সুন্দরবন এলাকার চরাঞ্চলে)
বিহার	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	জমিদারি প্রথা	জমিদার	জমিদার	
	অস্থায়ী/রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত	রায়তওয়ারি প্রথা	রায়ত/কৃষক	রায়ত/কৃষক	
উড়িষ্যা	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	জমিদারি প্রথা	জমিদার	জমিদার	
	অস্থায়ী/রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত	রায়তওয়ারি প্রথা	রায়ত/কৃষক	রায়ত/কৃষক	
পাঞ্জাব	জমিদারি বন্দোবস্ত (Zamindari settlements)	জমিদারি প্রথা	জমিদার	জমিদার	লাহোর, শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা, শেখুপুরা, অ্যাটোক, মিয়ানওয়ালী, মন্টগোমারী, লায়ল্লপুর, গুজরাট, শাহপুর, ঝিলাম, রাওয়ালপিন্ডি, মুলতান, ঝাং, মুজাফফরগড়, দেরা গাজী খান, সারগোদা
	ভাইয়াচারা বন্দোবস্ত (bhaichara settlements)	ভাইয়াচারা প্রথা	রায়ত/কৃষক	গ্রামের সকল কৃষক (village communities)	
	পাট্টাদারী বন্দোবস্ত (pattidari settlements)	পাট্টাদারী প্রথা	রায়ত/কৃষক	গ্রামের সকল কৃষক	
	অস্থায়ী/রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত	রায়তওয়ারি প্রথা	রায়ত/কৃষক	রায়ত/কৃষক	
	মহালওয়ারী বন্দোবস্ত (Mahalwari settlements)	মহালওয়ারী প্রথা	রায়ত/কৃষক	রায়ত/কৃষক একক/যৌথভাবে (by a single owner or by a community or a proprietary body)	
	মিশ্র ভাইয়াচারা ও পাট্টাদারী বন্দোবস্ত (mixed bhaichar/pattidari)	ভাইয়াচারা ও পাট্টাদারী প্রথা	রায়ত/কৃষক	রায়ত/কৃষক	
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	জমিদারি প্রথা	জমিদার	জমিদার	
	ভাইয়াচারা	ভাইয়াচারা প্রথা	রায়ত/কৃষক	গ্রামের সকল কৃষক	
	পাট্টাদারী	পাট্টাদারী প্রথা	রায়ত/কৃষক	গ্রামের সকল কৃষক	
	মহালওয়ারী	মহালওয়ারী প্রথা	রায়ত/কৃষক	রায়ত/কৃষক একক/যৌথভাবে (by a single owner or by a community	

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ				or a proprietary body)	
	মেয়াদি বন্দোবস্ত (Periodical settlements)	জমিদারি প্রথা/ভাইয়াচারা প্রথা/ পাট্টাদারী প্রথা/মহালওয়ারী প্রথা	জমিদার/কৃষক	জমিদার/কৃষক	৩০ বছর মেয়াদি বান্দোবস্ত জেলা : গোরাকপুর, বাস্তি, বুলান্দেশ্বর, শাহরানপুর, মুজাফ্‌ফরনগর, ললিতপুর (ঝাঁসি জেলা), বিজনর। ২০ বছর মেয়াদি বান্দোবস্ত জেলা : দেরাদুন (পূর্ব ও পশ্চিম দুন), ঝাঁসি (ললিতপুর বাদে)। ১৬ বছর মেয়াদি বান্দোবস্ত জেলা : ঝালুন অঞ্চলের ঝালুন জেলা।
সেন্ট্রাল প্রদেশ	জমিদারি (৩০ বছর মেয়াদি বন্দোবস্ত)	জমিদারি প্রথা	জমিদার	মালগুজাররা	সাওগোর, দামোহ, জববলপুর, মন্ডলা, সেওনী, সিন্ধওয়ারা, ওয়ার্ধাহ, নাগপুর, চান্দা, বান্দারা নরসিংহপুর, হোসাঙ্গাবাদ, নিমার, বেতুল, (বালাঘাটসহ), রায়পুর, বিলাসপুর
	মালগুজারী বন্দোবস্ত (Malguzari settlements)	জমিদারি/ রায়তওয়ারি প্রথা	জমিদার/কৃষক	মালগুজাররা	
	রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত	রায়তওয়ারি প্রথা	রায়ত/কৃষক	মালগুজাররা	সম্বলপুর
	মেয়াদি বন্দোবস্ত	জমিদারি/ রায়তওয়ারি প্রথা	জমিদার/কৃষক	মালগুজাররা	৩০ বছর মেয়াদি বান্দোবস্ত জেলা : উনাও, প্রতাবগড়, বড় বাঙ্কি, রায়বেরেলী, সুলতানপুর, লক্ষ্ণৌ, সিতাপুর, ফয়েজাবাদ
মাদ্রাজ	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	জমিদারি প্রথা	জমিদার	জমিদার	উত্তর আরকট, দক্ষিণ আরকট, কোইমবাটোর, গোদাভারী ডেল্টা, গোদাভারী, চেনগালপাত্তু, গাঞ্জাম, কিস্টনা, মসুলিপত্তম, গুন্তুর, মাদুরা, নেল্লোর, তাঞ্জোর, ত্রিনুভেলী, ভিজাগাপত্তম। এছাড়াও আহমেদাবাদ, কায়রা, পাঁচ মহল, ব্রচ, সুরাট, সালেম, থানা, কোলাবা ও রত্নাগিরি জেলায় একইসঙ্গে জমিদারি ও রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালু ছিল।
	অস্থায়ী/রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত	রায়তওয়ারি প্রথা	রায়ত/কৃষক	রায়ত/কৃষক	খান্দেশ, নাসিক, আহমেদনগর, পুণা, বেল্লারী, শোলাপুর, সাতারা, বেলগাউম, বিজাপুর, ধারওয়ার, কানাড়া। এছাড়াও আহমেদাবাদ, কায়রা, পাঁচ মহল, ব্রচ, সুরাট, সালেম, থানা, কোলাবা, রত্নাগিরি জেলায় একইসঙ্গে জমিদারি ও রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালু ছিল।
বোম্বে	অস্থায়ী/জমিদারি বন্দোবস্ত	জমিদারি প্রথা	জমিদার	জমিদার	
	অস্থায়ী/রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত	রায়তওয়ারি প্রথা	রায়ত/কৃষক	রায়ত/কৃষক	
সিন্ধু	জমিদারি বন্দোবস্ত	জমিদারি প্রথা	জমিদার	জমিদার	
	অস্থায়ী/রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত	রায়তওয়ারি প্রথা	রায়ত/কৃষক	রায়ত/কৃষক	
	জায়গিরদারি বন্দোবস্ত	জায়গিরদারি প্রথা	জায়গিরদার	জায়গিরদার	

আসাম	অস্থায়ী/রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত	রায়তওয়ারি প্রথা	রায়ত/কৃষক	রায়ত/কৃষক	
কোরগ	অস্থায়ী/রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত	রায়তওয়ারি প্রথা	রায়ত/কৃষক	রায়ত/কৃষক	
আজমীর-মারওয়ারা	মৌজাওয়ারী/রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত (mauzawar/ ryotwari settlement)	রায়তওয়ারি প্রথা	রায়ত/কৃষক	রায়ত/কৃষক	
	ইস্তিমারারী/জায়গির বন্দোবস্ত (Istimrari or jagir settlement)	ইস্তিমারারী/জায়গিরদারি প্রথা	ইস্তিমারারদার /জায়গিরদার	ইস্তিমারারদার /জায়গিরদার	
	ভূম (*Bhum* settlement)	ভূমিয়াস প্রথা (*bhumias*)	নিরাপত্তারক্ষী	নিরাপত্তারক্ষী	
যুক্ত প্রদেশ : অযোধ্যা	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	জমিদারি প্রথা	জমিদার	জমিদার	যুক্ত প্রদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত অঞ্চল : বেনারস বিভাগ ও আজমগড় জেলা
	তালুকদারি (Talukdari settlement)	তালুকদারি প্রথা	তালুকদার	তালুকদার	
যুক্ত প্রদেশ : আগ্রা	জমিদারি বন্দোবস্ত	জমিদারি প্রথা			
হায়দারাবাদ	জায়গির বন্দোবস্ত	জায়গিরদারি প্রথা	জায়গিরদার	জায়গিরদার	
বার্মা	অস্থায়ী/রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত	রায়তওয়ারি প্রথা	রায়ত/কৃষক	রায়ত/কৃষক	

উৎস : *Land Revenue Policy of the Indian Government*, Governor General of India in Council (Calcutta : Government Printing, India, 1902), pp. 5, 9, 16, 21-22, 29, 52, 54, 82, 94, 96, 98-99, 110, 112, 153-170, 193, 205-207 and 261-262; *Land Revenue Policy of the Indian Government*, Governor General of India in Council (Calcutta : Government Printing, India, 1920), p. 4, 7-8, 13, 76-77, 98, 111-112, 123-127 and 251; *Report of the Land Revenue Commission*, Bengal, Vol. II, p. 61; *Report on the Land Revenue Administration of the Province of Bihar and Orissa for the year 1923-1924* (Patna : Government Printing, Bihar and Orissa, 1924), pp. 2-3; *Report of the Banking Enquiry Committee for the Centrally Administered Areas 1929-30*, Volume I (Calcutta : Government of India, 1930), pp. 15-17; *Report of the Banking Enquiry Committee for the Centrally Administered Areas 1929-30*, Volume I (Calcutta : Government of India, 1930), pp. 15-16; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1924-25*, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1925), pp. 9-10; Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1928-29, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1929), p. 19; Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1929-30, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal secretariat Book Depot, 1930), p. 19; Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1931-32, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal secretariat Book Depot, 1932), p. 14-15; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1934-35*, Board of Revenue, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1935), pp. 14; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1937-38*, Board of Revenue, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1938), p. 12; *The First Five Year Plan 1955-60*, December, 1957, National Planning Borad, Government of Pakistan (Karachi : Government of Pakistan Press, 1957), pp. 307-308; *Six-Year Development Programme of Pakistan, July, 1951 to June 1957*, Ministry of Economic, Government of Pakistan, (Karachi : Government of Pakistan Press, 1952), p. 18; B. H. Baden-Powell, *The Land Systems of British India* (Oxford : At the Clarendon Press, 1892), p. 441; H. Martin Leake, *Land Tenure and Agricultural Production in the Tropics* (Cambridge : W. Heffer & sons Ltd., 1927), p. 14; Romesh Chunder Dutt, *Builders of Modern India*, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India (New Delhi : Government of India Press, 1967), p. 218; Khan Bahadur Mohammad Mahmud, "The Problem of Land Tenure", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950), p. 48; Shafiqur Rahman, "The Problems of Land Tenure in India and Pakistan", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950), pp. 119 and 126; Ismail Sethi, "*Land Tenures in N.W.F.P.*", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950), p. 129; Ismail Sethi, *Land Tenures in N.W.F.P.*, *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950), p. 130; M. Moqit, "Problems of Land Tenure in the Punjab", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950), p. 78; Mrs. Z. N. Ahmed, "Land Tenure Problems and Reform", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950), pp. 9-10; Manoj Kumar, "Land Tenure System and the British East India Company : a Case Study of the South East Punjab", *International Journal of Scientific Redearcch* (*IJSR*), Volume 5, Issue 2, February 2016, p. 144; DOI :10. 15373/22778179; সেন, *ভারতে কৃষি সম্পর্ক*, পৃ. ৪-৫।

দ্রষ্টব্য :

* ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারত সরকার প্রধানত দুই ধরনের ভূমি বন্দোবস্ত করে- স্থায়ী ও অস্থায়ী। স্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত এলাকা ছিল বাংলা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের কিছু অংশ, মাদ্রাজের কিছু অংশ এবং অন্য কিছু বিছিন্ন অঞ্চলে। [Land Revenue Policy of the Indian Government, Governor General of India in Council (Calcutta : Government Printing, India, 1920), p. 4.]

* ঔপনিবেশিক শাসনামলে সরকার প্রধানত দুই ধরনের ভূমি বন্দোবস্ত করে- স্থায়ী ও অস্থায়ী। অস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত এলাকা ছিল আবার জমিদারি ও রায়তওয়ারি ভিত্তিক। অস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত এলাকার মধ্যে জমিদারি এলাকা ছিল সেন্ট্রাল প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ, অযোধ্য ও পাঞ্জাব প্রদেশে। আর অস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত এলাকার মধ্যে জমিদারি এলাকা ছিল মাদ্রাজ, বোম্বে, বার্মা ও আসাম প্রদেশে। [Land Revenue Policy of the Indian Government, Governor General of India in Council (Calcutta : Government Printing, India, 1920), pp. 7-8 and 13.]

* বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় তিন ধরনের এস্টেট ছিল যথা চিরস্থায়ী এস্টেট (Permanently-settled estates), অস্থায়ী এস্টেট (Temporarily-Settled estates) ও সরকারি এস্টেট (Estates held direct by Government). [*Report on the Land Revenue Administration of the Province of Bihar and Orissa for the year 1923-1924* (Patna : Government Printing, Bihar and Orissa, 1924), pp. 2-3.]

* ১৭৯৩ সালে উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হলেও পরবর্তীকালে বন্দোবস্তকৃত ভূমি পুনঃবন্দোবস্ত করা হয় অস্থায়ী ভিত্তিতে এবং তা ছিল ৩০ বছর মেয়াদি। [*Land Revenue Policy of the Indian Government*, Governor General of India in Council (Calcutta : Government Printing, India, 1902), pp. 21-22.]

* উত্তর ভারতে জমি বন্দোবস্ত হয়েছিল জমিদারদের সঙ্গে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির বৃহত্তর অংশে জমিদারি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। [দাশগুপ্ত, ভারতে কৃষি সম্পর্ক ১৭৯৩-১৯৪৭, পৃ. ৪।]

* উত্তর ভারতের ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা জটিল আকার ধারণ করে। কারণ একই প্রদেশের একই জেলায় একই সঙ্গে চিরস্থায়ী ও অস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা, আবার একই সঙ্গে জমিদারি ও রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা, আবার একই সঙ্গে কোথাও ২০ বছর মেয়াদি আবার কোথাও ৩০ বছর মেয়াদি ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। [*Land Revenue Policy of the Indian Government,* Governor General of India in Council (Calcutta : Government Printing, India, 1902), p. 82.]

* উত্তর ভারতের মাদ্রাজে জমির ধরণ ছিল তিন প্রকার। প্রথমত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভিত্তিক এস্টেট (Permanently-settled estates), দ্বিতীয়ত, অস্থায়ী বন্দোবস্ত ভিত্তিক এলাকা (Temporarily-occupied areas) এবং তৃতীয়ত, মেয়াদি বন্দোবস্ত ভিত্তিক এলাকা (Periodical areas-periods prior to settlement). এছাড়াও ছিল সরকারি মালিকানাধীন জমি। সরকারি মালিকানাধীন জমি মেয়াদ ভিত্তিক বন্দোবস্ত প্রদান করা হতো। [Land Revenue Policy of the Indian Government, Governor General of India in Council (Calcutta : Government Printing, India, 1902), p. 205.]

* পাঞ্জাবে জমিদারি ব্যবস্থা থাকলেও জমিদার ও রায়ত বিরোধ ছিল না। [Land Revenue Policy of the Indian Government, Governor General of India in Council (Calcutta : Government Printing, India, 1902), p. 94.]

* পাঞ্জাবে মহালওয়রী অথবা যৌথ গ্রামীণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। মহাল বা গ্রামগুলিকে সরাসরি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল, যদিও রাজস্ব সংগ্রহের জন্য একজন নির্ভরযোগ্য ভূস্বামীকে নিযুক্ত করা হতো। সরকারের লক্ষ্য ছিল কৃষক মালিকানা তৈরি করা। [দাশগুপ্ত, ভারতে কৃষি সম্পর্ক ১৭৯৩-১৯৪৭, পৃ. ৫]

* সেন্ট্রাল প্রদেশে মালগুজাররা কৃষকদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করত এবং সরকার মালগুজারদের নিকট থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতো। মালগুজাররা জমিদার ও কৃষকদের খাজনা নির্ধারণ করতো। মালগুজাররা খাজনা নির্ধারণ করার সময় জমিদার ও কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতো। মালগুজারদের নির্ধারিত খাজনা সেটেলমেন্ট অফিসাররা পুনর্বিবেচনা করে খাজনা পুনঃনির্ধারণ করতে পারতো। সেটেল্টমেন্ট অফিসাররা খাজনা সংশোধন করে খাজনা পুনঃনির্ধারণ করার কারণে কৃষকদের খাজানা হ্রাস পেয়েছে এবং কৃষকরা লাভবান হয়েছে। সেন্ট্রাল প্রদেশে চিত্র ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে দেখা যায়নি। কারণ খাজনা নির্ধারণে জমিদার, রায়ত, মালগুজার এবং সর্বশেষ সেটেলমেন্ট অফিসাররা ভূমিকা পালন করতো। এই দৃষ্টান্ত ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এই ব্যবস্থা ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে আর দেখা যায়নি। প্রকৃত ও হ্রাসকৃত খাজনা তুলনা করলে দেখা যায় যে, সর্বশেষ সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত খাজনা কৃষকের জন্য অনেকটা সহনীয় ছিল। [Land Revenue Policy of the Indian Government, Governor General of India in Council (Calcutta : Government Printing, India, 1902), p. 96, 99, 110.]

* মাদ্রাজ প্রদেশে রায়তওয়ারি প্রথার সূচনায় কৃষকদেরকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হলেও পরে তা বাতিল করা হয়। [*Land Revenue Policy of the Indian Government*, Governor General of India in Council (Calcutta : Government Printing, India, 1902), pp. 54.]

* The principal form of Tenure is 'Bhaichara' under which all the owners of an estate are jointly and individually responsible for the payment of land revenue. [Ismail Sethi, "Land Tenures in N.W.F.P.", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950), p. 130.]

সারণি ১৫

ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্বের তুলনা

প্রদেশ	মোট এলাকায় প্রতি একরে				চাষাধীন এলাকায় প্রতি একরে			
	স্থায়ী বন্দোবস্তকৃত	অস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত	সরকারি পরিচালনাধীন বা রায়তওয়ারি	গড়	স্থায়ী বন্দোবস্তকৃত	অস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত	সরকারি পরিচালনাধীন বা রায়তওয়ারি	গড়
	টাঃ পঃ	টাঃ আঃ পঃ	টাঃ আঃ পঃ	টাঃ আঃ পঃ	টাঃ আঃ পঃ	টাঃ আঃ পঃ	টাঃ আঃ পঃ	টাঃ আঃ পঃ
বাংলা	৯ ২	০ ১২ ৫	১ ১৫ ১	০ ১১ ৩	০ ১৪ ৯	১ ৪ ০	৩ ১ ১০	১ ২ ০
বিহার ও উড়িষ্যা	৪ ৪	০ ১৩ ১০	..	০ ৫ ৭	০ ৭ ১০	১ ৩ ৪	..	০ ১০ ৪
বোম্বে ও সিন্ধু	..	০ ১০ ০	১ ৫ ৬	১ ৪ ৯	..	২ ৭ ০	১ ১১ ৩	১ ১১ ৬
সেন্ট্রাল প্রদেশসমূহ	..	০ ৭ ১	১ ০ ১০	০ ৯ ৮	..	০ ১৩ ৫	১ ৮ ০	১ ০ ১০
মাদ্রাজ	১০ ৮	..	১ ১৫ ০	১ ১০ ৫	০ ১৪ ৪	..	২ ৯ ০	২ ৩ ০
পাঞ্জাব	..	১ ৪ ৪	..	১ ৪ ৪	..	১ ১৩ ৫	..	১ ১৩ ৫
যুক্ত প্রদেশসমূহ	১৫ ৩	১ ২ ৭	..	১ ২ ৬	১ ৮ ৬	১ ১৩ ৫	..	১ ১৩ ৪

উৎস : *Report of the Land Revenue Commission*, Vol. II, p. 123.

সারণি ১৬

রাস্তা ও গণপূর্ত কাজের উপর কর (cesses) চাহিদা ও আদায়, ১৯২৪-২৫ থেকে ১৯৩৭-৩৮

বিভাগ	জেলা	বছর	শ্রেণী	এস্টেট সংখ্যা	চাহিদা			আদায়			চলতি চাহিদার মধ্যে আদায়ের হার
					বকেয়া	চলতি	মোট	বকেয়া	চলতি	মোট	
প্রেসিডেন্সী	যশোর	১৯২৪-২৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট (Revenue paying estates)	২,৭৬২	৩৩,৪৩৭	২,১৪,৮৩৩	২,৪৮,২৭০	২৯,৮৫০	১,৯১,৩৪৭	২,২১,১৯৭	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট (Revenue free estates)	১৯৭	২,৫০৮	৪,৯৩৪	৭,৪৪২	১,৬৩৯	৪,১৪৩	৫,৭৮২	
			খাজনা মুক্ত জমি (Rent free lands)	১,৯৯৫	৬,৪২৫	৪,৯৬৭	১১,৩৯২	৩,৯০১	১,৮৮৫	৫,৭৮৬	
			মোট	৪,৯৫৪	৪২,৩৭০	২,২৪,৭৩৪	২,৬৭,১০৪	৩৫,৩৯০	১,৯৮,৩৭৫	২,৩২,৭৬৫	১০৩.৫৭
		১৯২৬-২৭	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	২,৭৬৩	২৯,১৪৩	২,৯০,৩৬২	৩,১৯,৫০৫	২৪,১১২	২,৩৫,২৭৫	২,৫৯,৩৮৭	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২০৪	১,৮৭৫	৭,০৮৯	৮,৯৬৪	১,২১৩	৪,২৩৪	৫,৪৪৭	
			খাজনা মুক্ত জমি	১,৮৬২	৬,৭৯৩	৪,৬৪০	১১,৪৩৩	৩,০৪৫	৮৭৫	৩,৯২০	
			মোট	৪,৮২৯	৩৭,৮১১	৩,০২,০৯১	৩,৩৯,৯০২	২৮,৩৭০	২,৪০,৩৮৪	২,৬৮,৭৫৪	৮৮.৯৬
		১৯২৮-২৯	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	২,৭৭৩	১,৪৬,৪৭৫	৪,৩৪,৬৮৮	৫,৮১,১৬৩	১,২৫,৭৪৩	২,৯৯,৯৬১	৪,২৫,৭০৪	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২১৪	৬,৭৩৫	৯,৪৬৩	১৬,১৯৮	৪,২৩৫	৫,১৪৭	৯,৩৮২	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	৩,৩৭২	..	৩,৩৭২	২,৬৮৬	..	২,৬৮৬	
			মোট	২,৯৮৭	১,৫৬,৫৮২	৪,৪৪,১৫১	৬,০০,৭৩৩	১,৩২,৬৬৪	৩,০৫,১০৮	৪,৩৭,৭৭২	৯৮.৫৬
		১৯২৯-৩০	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	২,৭৭৩	১,৫৫,১২৭	৪,৪১,৪৩২	৫,৯৬,৫৫৯	১,৩৮,৮৯৭	৩,৩২,৯২৩	৪,৭১,৮২০	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২১৪	৬,৬১৬	৯,৪৬৩	১৬,০৭৯	৪,৩৭৯	৬,৪৩৬	১০,৮১৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	৫৮৮	..	৫৮৮	২৯৩	..	২৯৩	
			মোট	২,৯৮৭	১,৬২,৩৩১	৪,৫০,৮৯৫	৬,১৩,২২৬	১,৪৩,৫৬৯	৩,৩৯,৩৫৯	৪,৮২,৯২৮	১০৭.১০
		১৯৩০-৩১	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	২,৭৭৪	১,২৪,৬৮০	৪,৭৫,৫৮৬	৬,০০,২৬৬	১,১৭,৫৭৩	২,৪৩,০৫৯	৩,৬০,৬৩২	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২১৪	৫,৪৫৫	৯,৫৩৯	১৪,৯৯৪	৩,৮৬৫	৩,৭৮০	৭,৬৪৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	২৪০	..	২৪০	৫৭	..	৫৭	
			মোট	২,৯৮৮	১,৩০,৩৭৫	৪,৮৫,১২৫	৬,১৫,৫০০	১,২১,৪৯৫	২,৪৬,৮৩৯	৩,৬৮,৩৩৪	৭৫.৯৩
		১৯৩৪-৩৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	২,৫৯১	৬,৬১,৯৬২	৪,৬৯,৪৮১	১১,৩১,৪৪৩	১,৪২,৯৫১	৩,২৯,৭১২	৪,৭২,৬৬৩	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২১৪	৮,৭৮৫	৯,৫১৫	১৮,৩০০	৩,১১৩	৬,০৮২	৯,১৯৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	৪	..	৪	..	..	..	
			মোট	২,৮০৫	৬,৭০,৭৫১	৪,৭৮,৯৯৬	১১,৪৯,৭৪৭	১,৪৬,০৬৪	৩,৩৫,৭৯৪	৪,৮১,৮৫৮	১০০.৬০
		১৯৩৭-৩৮	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	২,৫৫১	৫,৯৮,০২৭	৪,৭১,৮৮৫	১০,৬৯,৯১২	১,৭৬,৬৯৮	৪,২৫,০৬৩	৬,০১,৭৬১	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২১৪	১১,০৭০	৯,৫৩৯	২০,৬০৯	৪,৯৭৮	৬,২৩৬	১১,২১৪	

প্রেসিডেন্সী	যশোর	১৯৩৭-৩৮	খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	২,৭৬৫	৬,০৯,০৯৭	৪,৮১,৪২৪	১০,৯০,৫২১	১,৮১,৬৭৬	৪,৩১,২৯৯	৬,১২,৯৭৫	১২৭.৩৩
	খুলনা	১৯২৪-২৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,০৬৪	৩৩,৪৩১	২,৪০,৮৯৩	২,৭৪,৩২৪	২১,৫২০	২,২১,৮৫৯	২,৪৩,৩৭৯	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৫৩	৯৯১	১০,২০৯	১১,২০০	৬২৫	৯,৬৩০	১০,২৫৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	৩,৯৮৪	৮,৭৮৭	৯,৪৪৯	১৮,২৩৬	৩,৬৩২	৬,০৬১	৯,৬৯৩	
			মোট	৫,১০১	৪৩,২০৯	২,৬০,৫৫১	৩,০৩,৭৬০	২৬,৭৭৭	২,৩৭,৫৫০	২,৬৩,৩২৭	১০১.০৭
		১৯২৬-২৭	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,০৫৮	৩২,৮৯১	২,৪০,৮৮৬	২,৭৩,৭৭৭	১৬,৫২১	২,০৬,৯৩৭	২,২৩,৪৫৮	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৫৩	৪৫০	১০,২০৯	১০,৬৫৯	২২৩	৯,৫৪৭	৯,৭৭০	
			খাজনা মুক্ত জমি	৩,৯৮২	৮,৬২৮	৯,৪৪৬	১৮,০৭৪	৩,৬৩০	৫,৫৯৭	৯,২২৭	
			মোট	৫,০৯৩	৪১,৯৬৯	২,৬০,৫৪১	৩,০২,৫১০	২০,৩৭৪	২,২২,০৮১	২,৪২,৪৫৫	৯৩.০৬
		১৯২৮-২৯	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,০৫৭	৫০,৮৩৯	২,৬১,৩৯৪	৩,১২,২৩৩	২২,৮২৩	২,৪২,৪৪৩	২,৬৫,২৬৬	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৫৩	১,৩৪৫	১০,৮৪৫	১২,১৯০	৫৪৩	৯,৪০২	৯,৯৪৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	৩,৯৭৭	৮,৯২৪	৯,৪৩৮	১৮,৩৬২	৩,৫২৮	৫,৬৬১	৯,১৮৯	
			মোট	৫,০৮৭	৬১,১০৮	২,৮১,৬৭৭	৩,৪২,৭৮৫	২৬,৮৯৪	২,৫৭,৫০৬	২,৮৪,৪০০	১০০.৯৭
		১৯২৯-৩০	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,০২৬	৪৬,৯৬৭	৩,৭০,৪৭২	৪,১৭,৪৩৯	২৫,৫৯২	৩,১৩,৩৯৩	৩,৩৮,৯৮৫	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৫৩	২,২৪৫	১১,৮৯৭	১৪,১৪২	৮১৭	১০,০১০	১০,৮২৭	
			খাজনা মুক্ত জমি	৩,৯৩৮	৯,১৭৩	৯,২৯৮	১৮,৪৭১	৩,৮২৫	৪,৩৩১	৮,১৫৬	
			মোট	৫,০১৭	৫৮,৩৮৫	৩,৯১,৬৬৭	৪,৫০,০৫২	৩০,২৩৪	৩,২৭,৭৩৪	৩,৫৭,৯৬৮	৯১.৪০
		১৯৩০-৩১	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,০২৮	৭৮,৪৫৪	৬,০৬,২০৮	৬,৮৪,৬৬২	৪২,৩৪৬	৪,২৫,৯৫৪	৪,৬৮,৩০০	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৬১	৩,৩১৫	১৮,০৪১	২১,৩৫৬	১,২৫৯	১৩,৪৭৬	১৪,৭৩৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	১	১০,৩১৫	২	১০,৩১৭	৪,৯৩৮	২	৪,৯৪০	
			মোট	১,০৯০	৯২,০৮৪	৬,২৪,২৫১	৭,১৬,৩৩৫	৪৮,৫৪৩	৪,৩৯,৪৩২	৪,৮৭,৯৭৫	৭৮.১৭
		১৯৩৪-৩৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৯৪৮	৫,২৩,৮৯৬	৫,৩১,৩৫৮	১০,৫৫,২৫৪	২,৯৮,৬০২	১,৮৯,৬০৮	৪,৮৮,২১০	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৬১	১০,৯০১	১৮,০৪১	২৮,৯৪২	৫,৫১০	৭,৫৮৪	১৩,০৯৪	
			খাজনা মুক্ত জমি	১	২৫১	২	২৫৩	৫৬	..	৫৬	
			মোট	১,০১০	৫,৩৫,০৪৮	৫,৪৯,৪০১	১০,৮৪,৪৪৯	৩,০৪,১৬৮	১,৯৭,১৯২	৫,০১,৩৬০	৯১.২৬
		১৯৩৭-৩৮	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,০৭৩	২,৬৯,৬৮৫	৫,৯৯,৭০২	৮,৬৯,৩৮৭	১,৪৫,২৩৬	৩,২৭,৭৪৫	৪,৭২,৯৮১	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৬১	১০,০৮৪	১৮,০৪১	২৮,১২৫	৩,৭৫১	৯,২৯২	১৩,০৪৩	
			খাজনা মুক্ত জমি	১	১২৯	২	১৩১	..	..	..	
			মোট	১,১৩৫	২,৭৯,৮৯৮	৬,১৭,৭৪৫	৮,৯৭,৬৪৩	১,৪৮,৯৮৭	৩,৩৭,০৩৭	৪,৮৬,০২৪	৭৮.৬৮
ঢাকা	ঢাকা		রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১১,৪৫৬	৬৯,৫৪০	৩,২৩,৩৩৬	৩,৯২,৮৭৬	৫৫,৭৯৬	২,৭৪,২৫৪	৩,৩০,০৫০	
		১৯২৪-২৫	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১,৯০৩	১,৮১৭	৪,৪১৫	৬,২৩২	১,৩১১	৩,০৯২	৪,৪০৩	
			খাজনা মুক্ত জমি	১	৪	৭	১১	৩	৫	৮	
		১৯২৪-২৫	মোট	১৩,৩৬০	৭১,৩৬১	৩,২৭,৭৫৮	৩,৯৯,১১৯	৫৭,১১০	২,৭৭,৩৫১	৩,৩৪,৪৬১	১০২.০৫

ঢাকা	ঢাকা	১৯২৬-২৭	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১১,৪৮৫	৫৮,১৪৪	৩,২৩,০৫১	৩,৮১,১৯৫	৪৬,৬৮১	২,৭৮,৩০০	৩,২৪,৯৮১	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১,৯০৩	১,৮০৩	৪,৪১৫	৬,২১৮	১,৩২৮	৩,১৭২	৪,৫০০	
			খাজনা মুক্ত জমি	১	৭	৭	১৪	৭	৩	১০	
			মোট	১৩,৩৮৯	৫৯,৯৫৪	৩,২৭,৪৭৩	৩,৮৭,৪২৭	৪৮,০১৬	২,৮১,৪৭৫	৩,২৯,৪৯১	১০০.৬২
		১৯২৮-২৯	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১১,৫১০	৫৭,০৩৬	৩,২৩,১২২	৩,৮০,১৫৮	৪১,৭৬৫	২,৮৪,১২৪	৩,২৫,৮৮৯	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১,৯০৩	১,৮৫০	৪,৪১৫	৬,২৬৫	১,৪৩৭	২,৭৬৬	৪,২০৩	
			খাজনা মুক্ত জমি	১	..	৭	৭	..	..	..	
			মোট	১৩,৪১৪	৫৮,৮৮৬	৩,২৭,৫৪৪	৩,৮৬,৪৩০	৪৩,২০২	২,৮৬,৮৯০	৩,৩০,০৯২	১০০.৭৮
		১৯২৯-৩০	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১১,৫৯২	৫৪,২৬৯	৩,২৩,৮৭৩	৩,৭৮,১৪২	৩১,৭৮৪	২,৮৪,১১৫	৩,১৫,৮৯৯	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১,৯০৩	২,০৬২	৪,৪১৫	৬,৪৭৭	১,২১৩	৩,৬৮২	৪,৮৯৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	১	৭	৭	১৪	৭	..	৭	
			মোট	১৩,৪৯৬	৫৬,৩৩৮	৩,২৮,২৯৫	৩,৮৪,৬৩৩	৩৩,০০৪	২,৮৭,৭৯৭	৩,২০,৮০১	৯৭.৭২
		১৯৩০-৩১	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১১,৬০৪	৬২,২৪৩	৩,২৪,৩০৬	৩,৮৬,৫৪৯	২০,৫৩৮	২,৬৭,৯৪৬	২,৮৮,৪৮৪	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১,৯০২	১,৫৮২	৪,৪১৪	৫,৯৯৬	৮১৪	৩,২০১	৪,০১৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	১	৭	৭	১৪	৭	..	৭	
			মোট	১৩,৫০৭	৬৩,৮৩২	৩,২৮,৭২৭	৩,৯২,৫৫৯	২১,৩৫৯	২,৭১,১৪৭	২,৯২,৫০৬	৮৮.৯৮
		১৯৩৪-৩৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১১,২৬১	১,৫৮,৬৮৮	৩,২৩,১১৯	৪,৮১,৮০৭	৮২,৪০৬	২,৩০,৫৯২	৩,১২,৯৯৮	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১,৯০০	২,০১৮	৪,৪০৩	৬,৪২১	৪০৬	৩,৩০৩	৩,৭০৯	
			খাজনা মুক্ত জমি	১	১৪	৭	২১	১৪	৭	২১	
			মোট	১৩,১৬২	১,৬০,৭২০	৩,২৭,৫২৯	৪,৮৮,২৪৯	৮২,৮২৬	২,৩৩,৯০২	৩,১৬,৭২৮	৯৬.৭০
		১৯৩৭-৩৮	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১১,৩০১	৯১,৫৬২	৩,২২,৬৫৭	৪,১৪,২১৯	৬১,৩৯৪	২,৬২,০১৬	৩,২৩,৪১০	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১,৮৯৯	২,৪০৫	৪,৪০২	৬,৮০৭	১,৮০০	২,৮৫০	৪,৬৫০	
			খাজনা মুক্ত জমি	১	৭	৭	১৪	৩	৪	৭	
			মোট	১৩,২০১	৯৩,৯৭৪	৩,২৭,০৬৬	৪,২১,০৪০	৬৩,১৯৭	২,৬৪,৮৭০	৩,২৮,০৬৭	১০০.৩১
	ময়মনসিংহ	১৯২৪-২৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১৭,৪২৭	১,০৭,৭৮১	৬,৭৯,৮৬৯	৭,৮৭,৬৫০	৯২,১৫৭	৫,৮৩,৯৬৩	৬,৭৬,১২০	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১,৬৮৭	৪,৭৪৩	৬,৪৮৯	১১,২৩২	২,৫৫২	৩,৮৪৩	৬,৩৯৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	৪৮	১৩৬	৯০	২২৬	..	৩৪	৩৪	
			মোট	১৯,১৬২	১,১২,৬৬০	৬,৮৬,৪৪৮	৭,৯৯,১০৮	৯৪,৭০৯	৫,৮৭,৮৪০	৬,৮২,৫৪৯	৯৯.৪৩
		১৯২৬-২৭	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১৭,৬৫৬	৮৬,৪৬৩	৬,৭৯,৭৩৪	৭,৬৬,১৯৭	৭৩,৬৯৯	৫,৯৭,৭৬৮	৬,৭১,৪৬৭	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১,৬৯৬	৫,১৫৯	৬,৩৮৬	১১,৫৪৫	১,৭২৩	৩,৫১১	৫,২৩৪	
			খাজনা মুক্ত জমি	৪৮	৯৯	৯০	১৮৯	৭০	৪৬	১১৬	
			মোট	১৯,৪০০	৯১,৭১২	৬,৮৬,২১০	৭,৭৭,৯৩২	৭৫,৪৯২	৬,০১,৩২৫	৬,৭৬,৮১৭	৯৮.৬৩
		১৯২৮-২৯	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১৭,৯০৪	১,০৩,৪৮১	৬,৭৮,১৯৭	৭,৮১,৬৭৮	৮৬,২৭৩	৫,৬৮,৮৫০	৬,৫৫,১২৩	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১,৬৯৭	৬,৫৯৪	৬,৩৮৬	১২,৯৮০	১,৫৪৩	৩,৯৩৫	৫,৪৭৮	
			খাজনা মুক্ত জমি	৪৮	৭৭	৯০	১৬৭	২৫	৬১	৮৬	
			মোট	১৯,৬৪৯	১,১০,১৫২	৬,৮৪,৬৭৩	৭,৯৪,৮২৫	৮৭,৮৪১	৫,৭২,৮৪৬	৬,৬০,৬৮৭	৯৬.৫০

ঢাকা	ময়মনসিংহ	১৯২৯-৩০	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১৮,০৩৫	১,২৫,৪২৬	৬,৮৭,৩৯০	৮,১২,৮১৬	৯১,৬২৩	৫,১৫,৮০৮	৬,০৭,৪৩১	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১,৬৯৭	৭,৫০২	৬,৩৮৮	১৩,৮৯০	১,০৫৪	৩,৩৫০	৪,৪০৪	
			খাজনা মুক্ত জমি	৪৮	৮১	৯০	১৭১	৬	৬৩	৬৯	
			মোট	১৯,৭৮০	১,৩৩,০০৯	৬,৯৩,৮৬৮	৮,২৬,৮৭৭	৯২,৬৮৩	৫,১৯,২২১	৬,১১,৯০৪	৮৮.১৯
		১৯৩০-৩১	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১৭,৭১৪	২,০৫,৩৫১	৬,৮৮,৪৯৮	৮,৯৩,৮৪৯	১,৪১,৩৫৮	৩,৭৫,৯৮৪	৫,১৭,৩৪২	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১,৬৯৬	৯,৪৮৫	৬,৩৮৮	১৫,৮৭৩	৩,১৩৪	২,৯০১	৬,০৩৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	৪৮	১০২	৯০	১৯২	৫১	৫৯	১১০	
			মোট	১৯,৪৫৮	২,১৪,৯৩৮	৬,৯৪,৯৭৬	৯,০৯,৯১৪	১,৪৪,৫৪৩	৩,৭৮,৯৪৪	৫,২৩,৪৮৭	৭৫.৩২
		১৯৩৪-৩৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১৮,২৩৩	৬,৭৭,৫৭৫	৬,৮৬,১২৬	১৩,৬৩,৭০১	৩,৭৩,৯৯৬	৪,৬৪,১৬৭	৮,৩৮,১৬৩	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১,৬৯৩	৯,৩৬২	৬,৫১৮	১৫,৮৮০	৪,৫৪৯	২,২০৬	৬,৭৫৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	৪৮	১৩৭	৯০	২২৭	৯৭	৩৯	১৩৬	
			মোট	১৯,৯৭৪	৬,৮৭,০৭৪	৬,৯২,৭৩৪	১৩,৭৯,৮০৮	৩,৭৮,৬৪২	৪,৬৬,৪১২	৮,৪৫,০৫৪	১২১.৯৯
		১৯৩৭-৩৮	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১৮,৪৮০	২,৮৪,২৮১	৬,৮৫,৬৬০	৯,৬৯,৯৪১	৫৯,০১২	৫,৮০,৬৪৬	৬,৩৯,৬৫৮	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১,৭০৫	৪,৮৪৪	৬,৫৬৪	১১,৪০৮	৩,৩২৫	২,৫৬১	৫,৮৮৬	
			খাজনা মুক্ত জমি	৪৮	৬৮	৯০	১৫৮	৫৬	১২	৬৮	
			মোট	২০,২৩৩	২,৮৯,১৯৩	৬,৯২,৩১৪	৯,৮১,৫০৭	৬২,৩৯৩	৫,৮৩,২১৯	৬,৪৫,৬১২	৯৩.২৫
	ফরিদপুর	১৯২৪-২৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬,২৪৩	৭৫,০৩৮	২,২৮,৮৯৯	৩,০৩,৯৩৭	৬৯,০০৩	১,৭৫,০০১	২,৪৪,০০৪	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১১৭	৪৯১	৮৯১	১,৩৮২	৪৪৮	৫৭৯	১,০২৭	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৬,৩৬০	৭৫,৫২৯	২,২৯,৭৯০	৩,০৫,৩১৯	৬৯,৪৫১	১,৭৫,৫৮০	২,৪৫,০৩১	১০৬.৬৩
		১৯২৬-২৭	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬,২৮৭	৫৫,৩২৬	২,২৮,১৩৭	২,৮৩,৪৬৩	৪৮,৩১৭	১,৭৫,১৭৬	২,২৩,৪৯৩	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১১৭	৫৫০	৮৯১	১,৪৪১	৪৪৬	৫৭৯	১,০২৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৬,৪০৪	৫৫,৮৭৬	২,২৯,০২৮	২,৮৪,৯০৪	৪৮,৭৬৩	১,৭৫,৭৫৫	২,২৪,৫১৮	৯৮.০৩
		১৯২৮-২৯	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬,২৯৯	৬৮,৮১০	২,৩৭,২৯৬	৩,০৬,১০৬	৬৩,৬২৬	১,৮৫,২৯৫	২,৪৮,৯২১	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১১৭	৩১১	৮৯১	১,২০২	২৮০	৬০৬	৮৮৬	
		১৯২৮-২৯	খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৬,৪১৬	৬৯,১২১	২,৩৮,১৮৭	৩,০৭,৩০৮	৬৩,৯০৬	১,৮৫,৯০১	২,৪৯,৮০৭	১০৪.৮৮
		১৯২৯-৩০	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬,২৯৯	৬১,৮৭৯	২,৩৭,৮০১	২,৯৯,৭৭০	৫৭,৭৭৭	১,৮৬,৫২২	২,৪৪,২৯৯	
		১৯২৯-৩০	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১১৭	৩২৬	৮৯১	১,২১৭	২৯৪	৬৯০	৯৮৪	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৬,৪১৬	৬২,২০৫	২,৩৮,৭৮২	৩,০০,৯৮৭	৫৮,০৭১	১,৮৭,২১২	২,৪৫,২৮৩	১০২.৭২
		১৯৩০-৩১	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬,৩৩৭	৫৭,১৬২	২,৩৯,০৮৯	২,৯৬,২৫১	৪৯,৪৪০	১,৩৪,০৭৫	১,৮৩,৫১৫	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১১৮	২৫০	৮৯২	১,১৪২	২১৬	৫১১	৭২৭	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৬,৪৫৫	৫৭,৪১২	২,৩৯,৯৮১	২,৯৭,৩৯৩	৪৯,৬৫৬	১,৩৪,৫৮৬	১,৮৪,২৪২	৭৬.৭৭

ঢাকা	ফরিদপুর	১৯৩৪-৩৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১০,১৭৩	২,২২,০৮৫	২,৮৮,৮২০	৫,১০,৯০৫	১,৩৪,১৫০	১,১৯,১৩৩	২,৫৩,২৮৩	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১১৮	৯২৪	১,১৪৯	২,০৭৩	৬৭০	৫০০	১,১৭০	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১০,২৯১	২,২৩,০০৯	২,৮৯,৯৬৯	৫,১২,৯৭৮	১,৩৪,৮২০	১,১৯,৬৩৩	২,৫৪,৪৫৩	৮৭.৭৫
		১৯৩৭-৩৮	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১০,১৭৯	২,৪৫,৬৫০	২,৮৭,৩৭৮	৫,৩৩,০২৮	১,৩৭,৭০৯	১,৬৩,৩৫১	৩,০১,০৬০	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১১৮	১,০৩১	১,১৪৯	২,১৮০	৬৬১	৩৯৯	১,০৬০	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১০,২৯৭	২,৪৬,৬৮১	২,৮৮,৫২৭	৫,৩৫,২০৮	১,৩৮,৩৭০	১,৬৩,৭৫০	৩,০২,১২০	১০৪.৭১
	বাকেরগঞ্জ	১৯২৪-২৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৩,৮০৫	১,৬৩,৪৮১	৫,০৭,০২৯	৬,৭০,৫১০	১,২০,৬০৯	৩,৯৫,৮৮২	৫,১৬,৪৯১	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৪৯	১,৭৪৪	৬,৬৭৫	৮,৪১৯	১,৭২৯	৬,১৮৬	৭,৯১৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	৬	২৬	২৫	৫১	১২	১১	২৩	
			মোট	৩,৮৬০	১,৬৫,২৫১	৫,১৩,৭২৯	৬,৭৮,৯৮০	১,২২,৩৫০	৪,০২,০৭৯	৫,২৪,৪২৯	১০২.০৮
		১৯২৬-২৭	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৩,৮৬১	১,৫১,১৪৭	৫,০৭,৩৬৬	৬,৫৮,৫১৩	১,১৯,৬২১	১,০৮,৯৬৯	৫,২৮,৫৯০	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৪৯	৭২১	৬,৬৭৫	৭,৩৯৬	৬৯১	৬,০৫৭	৬,৭৪৮	
			খাজনা মুক্ত জমি	৬	৭	২৫	৩২	৬	১৮	২৪	
			মোট	৩,৯১৬	১,৫১,৮৭৫	৫,১৪,০৬৬	৬,৬৫,৯৪১	১,২০,৩১৮	৪,১৫,০৪৪	৫,৩৫,৩৬২	১০৪.১৪
		১৯২৮-২৯	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৩,৮৮০	১,৩৭,৬৯৮	৫,০৮,৯৭৮	৬,৪৬,৬৭৬	৯৬,৬৭৮	৩,৭৭,৪৪৭	৪,৭৪,১২৩	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৪৯	৪১৭	৬,৬৭৫	৭,০৯২	৩৮৮	৬,২৪৬	৬,৬৩৪	
			খাজনা মুক্ত জমি	৬	৯	২৫	৩৪	৯	১৯	২৮	
			মোট	৩,৯৩৫	১,৩৮,১২৪	৫,১৫,৬৭৮	৬,৫৩,৮০২	৯৭,০৭৫	৩,৮৩,৭১০	৪,৮০,৭৮৫	৯৩.২৩
		১৯২৯-৩০	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৩,৮৭২	১,৭২,৫৫৩	৫,১০,৪৭২	৬,৮৩,০২৫	১,১১,৫৮৭	৩,৭৯,০৩৮	৪,৯০,৬২৫	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৪৯	৪৫৮	৬,৬৭৫	৭,১৩৩	৪৩৫	৬,১২৫	৬,৫৬০	
			খাজনা মুক্ত জমি	৬	৬	২৫	৩১	৬	১৮	২৪	
		১৯২৯-৩০	মোট	৩,৯২৭	১,৭৩,০১৭	৫,১৭,১৭২	৬,৯০,১৮৯	১,১২,০২৮	৩,৮৫,১৮১	৪,৯৭,২০৯	৯৬.১৪
			রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৩,৮৮৬	১,৯২,৪২০	৫,৩১,৮৫৯	৭,২৪,২৭৯	১,২৮,৫৯৫	৩,৬৬,২৯৮	৪,৯৪,৮৯৩	
		১৯৩০-৩১	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৪৯	৫৭৩	৬,৬৭৫	৭,২৪৮	৪২৪	৫,৮৬১	৬,২৮৫	
		১৯৩০-৩১	খাজনা মুক্ত জমি	৬	৭	২৫	৩২	৬	১৮	২৪	
			মোট	৩,৯৪১	১,৯৩,০০০	৫,৩৮,৫৫৯	৭,৩১,৫৫৯	১,২৯,০২৫	৩,৭২,১৭৭	৫,০১,২০২	৯৩.০৬
		১৯৩৪-৩৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৩,৫৩৪	৪,৩৯,৫২১	৪,৯১,৭০০	৯,৩১,২২১	২,৭২,৫২১	২,৭৪,৪৬৫	৫,৪৬,৯৮৬	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৫০	১,৮৬৫	৬,৬৯৫	৮,৫৬০	১,৪৮৬	৫,৩৬২	৬,৮৪৮	
			খাজনা মুক্ত জমি	৬	২৭	২৫	৫২	১২	১২	২৪	
			মোট	৩,৫৯০	৪,৪১,৪১৩	৪,৯৮,৪২০	৯,৩৯,৮৩৩	২,৭৪,০১৯	২,৭৯,৮৩৯	৫,৫৩,৮৫৮	১১১.১২
		১৯৩৭-৩৮	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৩,৫০৬	২,১৪,৯০০	৪,৯০,১৮০	৭,০৫,০৮০	১,৪৪,৩৪৩	৩,৪৯,৪৮৩	৪,৯৩,৮২৬	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৫০	৩,৬৭৩	৬,৭২৫	১০,৩৯৮	১,০৫০	৮,১২৩	৯,১৭৩	
			খাজনা মুক্ত জমি	৬	৮	২৫	৩৩	৮	১২	২০	
			মোট	৩,৫৬২	২,১৮,৫৮১	৪,৯৬,৯৩০	৭,১৫,৫১১	১,৪৫,৪০১	৩,৫৭,৬১৮	৫,০৩,০১৯	১০১.২৩

চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১৯২৪-২৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	২৮,৫৭৭	৪৪,৭০৮	২,২৮,৭৩৫	২,৭৩,৪৪৩	২৯,৯৫১	১,৮৭,৫৭৮	২,১৭,৫২৯	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১৯,৮৩৩	৮,৫৪১	২১,৪৮৭	৩০,০২৮	৮,২৩৯	১২,৯৮৫	২১,২২৪	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৪৮,৪১০	৫৩,২৪৯	২,৫০,২২২	৩,০৩,৪৭১	৩৮,১৯০	২,০০,৫৬৩	২,৩৮,৭৫৩	৯৫.৪২
		১৯২৬-২৭	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	২৮,৫৫৯	৫৫,৫৮০	২,২৮,৪১৬	২,৮৩,৯৯৬	৫৪,৬১০	১,৬৩,৭৪৩	২,১৮,৩৫৩	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১৯,৮৩৮	৮,৭৭৭	২১,৪৯৩	৩০,২৭০	৮,৬৬৫	১২,৪৩২	২১,০৯৭	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৪৮,৩৯৭	৬৪,৩৫৭	২,৪৯,৯০৯	৩,১৪,২৬৬	৬৩,২৭৫	১,৭৬,১৭৫	২,৩৯,৪৫০	৯৫.৮১
		১৯২৮-২৯	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	২৮,৫৪৪	৬৪,২৯১	২,৩০,৯০৫	২,৯৫,১৯৬	৬৩,৯০১	১,৬৬,৪৮০	২,৩০,৩৮১	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১৯,৮৩৯	৭,৯৯৩	২১,৪৯৩	২৯,৪৮৬	৭,৮০৭	১৪,৫৪০	২২,৩৪৭	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৪৮,৩৮৩	৭২,২৮৪	২,৫২,৩৯৮	৩,২৪,৬৮২	৭১,৭০৮	১,৮১,০২০	২,৫২,৭২৮	১০০.১৩
		১৯২৯-৩০	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	২৮,৫৩৪	৬৪,৭৫০	২,৩০,৪৭৩	২,৯৫,২২৩	৬২,৫৩০	১,৭৩,২৮১	২,৩৫,৮১১	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১৯,৮৪০	৭,১৩৯	২১,৪৯৪	২৮,৬৩৩	৭,০৯৯	১৩,৪৬৫	২০,৫৬৪	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৪৮,৩৭৪	৭১,৮৮৯	২,৫১,৯৬৭	৩,২৮,৮৫৬	৬৯,৬২৯	১,৮৬,৭৪৬	২,৫৬,৩৭৫	১০১.৭৫
		১৯৩০-৩১	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	২৮,৫২৮	৫৯,১৫৯	২,২৯,৭৭৯	২,৮৮,৯৩৮	৫২,৪০৯	১,৬৬,১৩৪	২,১৮,৫৪৩	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১৯,৯৩৮	৮,০৬৭	২১,৪৯৩	২৯,৫৬০	৬,৫৯০	১৩,৭০৮	২০,২৯৮	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৪৮,৩৬৬	৬৭,২২৬	২,৫১,২৭২	৩,১৮,৪৯৮	৫৮,৯৯৯	১,৭৯,৮৪২	২,৩৮,৮৪১	৯৫.০৫
		১৯৩৪-৩৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	২৮,৪৫৫	১,৩৬,৩৯৭	১,৮১,৬২০	৩,১৮,০১৭	১,০২,১০২	৮৬,১৪৮	১,৮৮,২৫০	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১৯,৮৩২	১৬,২৮৯	২৩,৭০৮	৩৯,৯৯৭	৯,০৫২	৮,৯৭৭	১৮,০২৯	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
		১৯৩৪-৩৫	মোট	৪৮,২৮৭	১,৫২,৬৮৬	২,০৫,৩২৮	৩,৫৮,০১৪	১,১১,১৫৪	৯৫,১২৫	২,০৬,২৭৯	১০০.৪৬
		১৯৩৭-৩৮	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	২৮,৩৬০	১,০০,১২০	১,৮২,৫১৯	২,৮২,৬৩৯	১,১৩,১১৫	৮২,১১০	১,৯৫,২২৫	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১৯,৭৮৫	১৮,২০১	২৩,৮৭৮	৪২,০৭৯	৭,৬৭০	১১,২৫৫	১৮,৯২৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৪৮,১৪৫	১,১৮,৩২১	২,০৬,৩৯৭	৩,২৪,৭১৮	১,২০,৭৮৫	৯৩,৩৬৫	২,১৪,১৫০	১০৩.৭৬
	ত্রিপুরা	১৯২৪-২৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৩,০৯৫	৩৫,৬৭৭	৩,০৩,১২৮	৩,৩৮,৮০৫	৩২,১০৯	২,৭৩,৫৯৩	৩,০৫,৭০২	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২৬৫	৬০৯	২,৪১২	৩,০২১	৫৪৮	১,৯৫৫	২,৫০৩	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৩,৩৬০	৩৬,২৮৬	৩,০৫,৫৪০	৩,৪১,৮২৬	৩২,৬৫৭	২,৭৫,৫৪৮	৩,০৮,২০৫	১০০.৮৭
		১৯২৬-২৭	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৩,২৪৩	২৮,২৬০	৩,২৯,৪৪৪	৩,৫৭,৭০৪	২৫,৪৩৪	৩,১১,৬০০	৩,৩৭,০৩৪	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২৬৫	৭০৬	২,৮৩১	৩,৫৩৭	৬৩৫	২,১৮২	২,৮১৭	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৩,৫০৮	২৮,৯৬৬	৩,৩২,২৭৫	৩,৬১,২৪১	২৬,০৬৯	৩,১৩,৭৮২	৩,৩৯,৮৫১	১০২.২৮

চট্টগ্রাম	ত্রিপুরা	১৯২৮-২৯	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৩,৩৫৮	৩১,৬৮৭	৩,২৯,১৪১	৩,৬০,৮২৮	২৮,৫১৮	২,৯৫,১৪৮	৩,২৩,৬৬৬	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২৬৫	৮৯৪	২,৮৩১	৩,৭২৫	৮০৫	২,১৬২	২,৯৬৭	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৩,৬২৩	৩২,৫৮১	৩,৩১,৯৭২	৩,৬৪,৫৫৩	২৯,৩২৩	২,৯৭,৩১০	৩,২৬,৬৩৩	৯৮.৩৯
		১৯২৯-৩০	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৩,৩৭১	৩৮,১১৬	৩,২৮,২৫৩	৩,৬৬,৩৬৯	৩৪,৩০৪	২,৭৪,৬৫৯	৩,০৮,৯৬৩	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২৬৫	৭৭২	২,৮৩১	৩,৬০৩	৬৯৪	১,৭৯৩	২,৪৮৭	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৩,৬৩৬	৩৮,৮৮৮	৩,৩১,০৮৪	৩,৬৯,৯৭২	৩৪,৯৯৮	২,৭৬,৪৫২	৩,১১,৪৫০	৯৪.০৭
		১৯৩০-৩১	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৩,৪০০	৫৮,৬৩৯	৩,২৮,১৭৫	৩,৮৬,৮১৪	৫২,৭৭৫	২,২১,৪১৫	২,৭৪,১৯০	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২৬৫	১,১২৬	২,৮৩১	৩,৯৫৭	১,০১৩	১,৩১৩	২,৩২৬	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	২,৬৬৫	৫৯,৭৬৫	৩,৩১,০০৬	৩,৯০,৭৭১	৫৩,৭৮৮	২,২২,৭২৮	২,৭৬,৫১৬	৮৩.৫৪
		১৯৩৪-৩৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৩,৩৮৪	১,৫২,৮৪৮	৩,১৮,১৫৮	৪,৭১,০০৬	৩৮,২১২	৩,৬২,১৩৮	৪,০০,৩৫০	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২৭৪	৩,২৬২	২,৮৪০	৬,১০২	৮১৬	৩,০৫১	৩,৮৬৭	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৩,৬৫৮	১,৫৬,১১০	৩,২০,৯৯৮	৪,৭৭,১০৮	৩৯,০২৮	৩,৬৫,১৮৯	৪,০৪,২১৭	১২৫.৯৩
		১৯৩৭-৩৮	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৩,৪৩১	২৫,৫২৭	৩,১৭,৭৫৬	৩,৪৩,২৮৩	২২,৯৭৪	২,৮৮,১৩৫	৩,১১,১০৯	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২৭৪	৯৯৬	২,৮৪০	৩,৮৩৬	৮৯৬	১,৯০৫	২,৮০১	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
		১৯৩৭-৩৮	মোট	৩,৭০৫	২৬,৫২৩	৩,২০,৫৯৬	৩,৪৭,১১৯	২৩,৮৭০	২,৯০,০৪০	৩,১৩,৯১০	৯৭.৯১
	নোয়াখালী	১৯২৪-২৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৬৯২	৩৯,৬০৩	২,৩০,৭৮১	২,৭০,৩৮৪	২৮,৩৫২	২,০৮,১৫৯	২,৩৬,৫১১	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১০২	৫০৭	২,০৩৭	২,৫৪৪	২৮৩	১,৮৭৯	২,১৬২	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,৭৯৪	৪০,১১০	২,৩২,৮১৮	২,৭২,৯২৮	২৮,৬৩৫	২,১০,০৩৮	২,৩৮,৬৭৩	১০২.৫১
		১৯২৬-২৭	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৬৯৯	২২,৩১৫	২,৪২,১৮১	২,৬৪,৪৯৬	১৩,৩১৮	২,০৫,৬৬১	২,১৮,৯৭৯	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১০২	২১৪	২,০৩৭	২,২৫১	২১৪	১,৬৩৮	১,৮৫২	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,৮০১	২২,৫২৯	২,৪৪,২১৮	২,৬৬,৭৪৭	১৩,৫৩২	২,০৭,২৯৯	২,২০,৮৩১	৯০.৪২
		১৯২৮-২৯	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৬৯৯	৩১,২৫৭	২,৪৪,৫৮৪	২,৭৫,৮৪১	৩০,১০১	২,০২,৫৭৫	২,৩২,৬৭৬	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১০২	৫৪৮	২,০৯৪	২,৬৪২	..	২,০৯২	২,০৯২	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,৮০১	৩১,৮০৫	২,৪৬,৬৭৮	২,৭৮,৪৮৩	৩০,১০১	২,০৪,৬৬৭	২,৩৪,৭৬৮	৯৫.১৭
		১৯২৯-৩০	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৬৯৯	৪৩,৩৪২	২,৫২,৩৮০	২,৯৫,৭২২	১২,৮৮৮	২,৩৬,২৮৮	২,৪৯,১৭৬	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১০২	৫৫০	২,১০৭	২,৬৫৭	৫৫০	১,৮৭৩	২,৪২৩	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,৮০১	৪৩,৮৯২	২,৫৪,৪৮৭	২,৯৮,৩৭৯	১৩,৪৩৮	২,৩৮,১৬১	২,৫১,৫৯৯	৯৮.৮৭

চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	১৯৩০-৩১	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৬৯৯	৪৬,০০৮	২,৮৫,৪৭১	৩,৩১,৪৭৯	২২,৩০০	২,৩৬,৩২৯	২,৫৮,৬২৯	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১০২	২৩৪	২,৩৭০	২,৬০৪	১০০	১,৯০২	২,০০২	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,৮০১	৪৬,২৪২	২,৮৭,৮৪১	৩,৩৪,০৮৩	২২,৪০০	২,৩৮,২৩১	২,৬০,৬৩১	৯০.৫৫
		১৯৩৪-৩৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৬২৬	১,২৩,৮৫৯	২,৪১,৮৪০	৩,৬৫,৬৯৯	১,২৩,৮৫৯	১,৮১,৮৫৩	৩,০৫,৭১২	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২৭৬	২,৩১৫	২,৯৩৮	৫,২৫৩	২,২৭৩	..	২,২৭৩	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,৯০২	১,২৬,১৭৪	২,৪৪,৭৭৮	৩,৭০,৯৫২	১,২৬,১৩২	১,৮১,৮৫৩	৩,০৭,৯৮৫	১২৫.৮২
		১৯৩৭-৩৮	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৬২৯	৩২,৭৩৭	২,৩৯,৬৯৮	২,৭২,৪৩৫	৩২,৭৩৭	২,০০,৪২৭	২,৩৩,১৬৪	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	২৭৭	২,৩০৯	২,৯৩৮	৫,২৪৭	২,২৪৪	..	২,২৪৪	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,৯০৬	৩৫,০৪৬	২,৪২,৬৩৬	২,৭৭,৬৮২	৩৪,৯৮১	২,০০,৪২৭	২,৩৫,৪০৮	৯৭.০২
রাজশাহী	রাজশাহী	১৯২৪-২৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৬৮৪	৫৫,৬৬৮	৩,২৫,৫৬০	৩,৮১,২২৮	৫৪,৮৩৭	২,৭০,৮৯৬	৩,২৫,৭৩৩	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৮৩	২,৩৯৪	৯,৫৫২	১১,৯৪৬	২,৩৫৫	৭,১১৮	৯,৪৭৩	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	১৫	..	১৫	..	..	..	
			মোট	১,৭৬৭	৫৮,০৭৭	৩,৩৫,১১২	৩,৯৩,১৮৯	৫৭,১৯২	২,৭৮,০১৪	৩,৩৫,২০৬	১০০.০৩
		১৯২৬-২৭	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৬৮০	২৫,৪০২	৩,২৫,৪১৪	৩,৫০,৮১৬	২৪,৮৬৭	২,৮৯,০৮০	৩,১৩,৯৪৭	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৮৩	২,৪৩৭	৯,৫৫২	১১,৯৮৯	২,৪২১	৭,১৩৪	৯,৫৫৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,৭৬৩	২৭,৮৩৯	৩,৩৪,৯৬৬	৩,৬২,৮০৫	২৭,২৮৮	২,৯৬,২১৪	৩,২৩,৫০২	৯৬.৫৮
		১৯২৮-২৯	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৭২৩	৪১,৩৫২	৩,২৭,১৩৬	৩,৬৮,৪৮৮	৪০,৬২৭	২,৯৪,১০৩	৩,৩৪,৭৩০	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১০৮	২,৬৬২	৯,৫৭৭	১২,২৩৯	২,৬২৩	৭,০৫২	৯,৬৭৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,৮২১	৪৪,০১৪	৩,৩৬,৭১৩	৩,৮০,৭২৭	৪৩,২৫০	৩,০১,১৫৫	৩,৪৪,৪০৫	১০২.২৮
		১৯২৯-৩০	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৭৫৩	৩৩,৭৬০	৩,২৭,৩৪৪	৩,৬১,১০৪	৩১,৫৬৮	২,৯০,১২৯	৩,২১,৬৯৭	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১০৮	২,৫৬৮	৯,৫৭৭	১২,১৪৫	২,৪৪৪	৫,৯৩৪	৮,৩৭৮	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,৮৬১	৩৬,৩২৮	৩,৩৬,৯২১	৩,৭৩,২৪৯	৩৪,০১২	২,৯৬,০৬৩	৩,৩০,০৭৫	৯৭.৯৭
		১৯৩০-৩১	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৭৫৩	৩৯,৪০৩	৩,৩১,০৬৪	৩,৭০,৪৬৭	৩৭,৮৩২	২,২৬,৯৯৬	২,৬৪,৮২৮	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১০৮	৩,৭৬৭	৯,৭৫৪	১৩,৫২১	২,৬৬৩	৬,৬০৪	৯,২৬৭	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,৮৬১	৪৩,১৭০	৩,৪০,৮১৮	৩,৮৩,৯৮৮	৪০,৪৯৫	২,৩৩,৬০০	২,৭৪,০৯৫	৮০.৪২
		১৯৩৪-৩৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৭৯৯	১,৯৩,৭৫৪	৩,২৯,৭৫৬	৫,২৩,৫১০	১,৪১,৩০৪	২,০০,৫৪১	৩,৪১,৮৪৫	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১০৭	৮,৫০৮	৯,৯৩০	১৮,৪৩৮	৪,৩০৮	৪,১৬৫	৮,৪৭৩	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,৯০৬	২,০২,২৬২	৩,৩৯,৬৮৬	৫,৪১,৯৪৮	১,৪৫,৬১২	২,০৪,৭০৬	৩,৫০,৩১৮	১০৩.১৩

রাজশাহী	রাজশাহী		রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৮১০	৭৬,২৭৩	৩,২৭,৪৫৭	৪,০৩,৭৩০	৭০,৮৮৯	২,৮০,৫০১	৩,৫১,৩৯০	
		১৯৩৭-৩৮	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১১০	৩,১৩৪	১০,২০৫	১৩,৩৩৯	২,৩৯৭	৭,৭৬৪	১০,১৬১	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,৯২০	৭৯,৪০৭	৩,৩৭,৬৬২	৪,১৭,০৬৯	৭৩,২৮৬	২,৮৮,২৬৫	৩,৬১,৫৫১	১০৭.০৭
	দিনাজপুর		রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৮৯২	৩৬,৫০২	৩,০২,৪৩৭	৩,৩৮,৯৩৯	৩৫,১৬৮	২,৭৮,৯৩৯	৩,১৪,১০৭	
		১৯২৪-২৫	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১৭৭	৫৮০	৫,৭২০	৬,৩০০	৫৭৭	৫,২১৯	৫,৭৯৬	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,০৬৯	৩৭,০৮২	৩,০৮,১৫৭	৩,৪৫,২৩৯	৩৫,৭৪৫	২,৮৪,১৫৮	৩,১৯,৯০৩	১০৩.৮১
			রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৯৩১	২৫,২৪৭	৩,০২,৪৩৯	৩,২৭,৬৮৬	২৫,২৪০	২,৭৫,৬০৩	৩,০০,৮৪৩	
		১৯২৬-২৭	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১৭৭	৫৭৯	৫,৭২০	৬,২৯৯	৫৭৬	৫,১৪৭	৫,৭২৩	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
		১৯২৬-২৭	মোট	১,১০৮	২৫,৮২৬	৩,০৮,১৫৯	৩,৩৩,৯৮৫	২৫,৮১৬	২,৮০,৭৫০	৩,০৬,৫৬৬	৯৯.৪৮
		১৯২৮-২৯	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৯৪৪	৪৩,২১৫	৩,০৪,১৯৫	৩,৪৭,৪১০	৪২,৫৯৩	২,৬৭,৭১৮	৩,১০,৩১১	
		১৯২৮-২৯	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১৭৭	৩২৮	৫,৭২০	৬,০৪৮	৩০৮	৫,৪২৬	৫,৭৩৪	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,১২১	৪৩,৫৪৩	৩,০৯,৯১৫	৩,৫৩,৪৫৮	৪২,৯০১	২,৭৩,১৪৪	৩,১৬,০৪৫	১০১.৯৮
			রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৯৪৯	৩৭,০৯৯	৩,০৪,২২৩	৩,৪১,৩২২	৩৬,১৪৩	২,৫৩,০৬৭	২,৮৯,২১০	
		১৯২৯-৩০	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১৭৭	৩১৪	৫,৭২০	৬,০৩৪	৩১৪	৫,৩৭১	৫,৬৮৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,১২৬	৩৭,৪১৩	৩,০৯,৯৪৩	৩,৪৭,৩৫৬	৩৬,৪৫৭	২,৫৮,৪৩৮	২,৯৪,৮৯৫	৯৫.১৪
			রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৯৫৮	৫২,১১২	৩,০৭,৭৬৪	৩,৫৯,৮৭৬	৪৯,৮৯৪	২,১১,৭৮০	২,৬১,৬৭৪	
		১৯৩০-৩১	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১৭৭	৩৪৯	৬,৭২৬	৭,০৭৫	৩৩৭	৫,৭৮৬	৬,১২৩	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,১৩৫	৫২,৪৬১	৩,১৪,৪৯০	৩,৬৬,৯৫১	৫০,২৩১	২,১৭,৫৬৬	২,৬৭,৭৯৭	৮৫.১৫
			রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৯৮৪	২,৪৬,৫১১	৪,২২,৫১৩	৬,৬৯,০২৪	১,৯৭,৪৪১	২,৬০,৬০১	৪,৫৮,০৪২	
		১৯৩৪-৩৫	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১৭৯	৪,৭৪৮	৮,১৯৬	১২,৯৪৪	৩,০০৬	৪,৬২৯	৭,৬৩৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,১৬৩	২,৫১,২৫৯	৪,৩০,৭০৯	৬,৮১,৯৬৮	২,০০,৪৪৭	২,৬৫,২৩০	৪,৬৫,৬৭৭	১০৮.১২
			রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,০৫০	১,২৩,০৩০	৪,২৮,৬৮৬	৫,৫১,৭১৬	১,০৩,৫২১	২,৮৪,৭৬৬	৩,৮৮,২৮৭	
		১৯৩৭-৩৮	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	১৭৯	৩,৬২২	৮,১৯৬	১১,৮১৮	২,০৪৬	৫,৮৭৪	৭,৯২০	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	১,২২৯	১,২৬,৬৫২	৪,৩৬,৮৮২	৫,৬৩,৫৩৪	১,০৫,৫৬৭	২,৯০,৬৪০	৩,৯৬,২০৭	৯০.৬৯
	রংপুর		রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬৮৫	৫৪,৪৭৮	৩,৮৪,৮১০	৪,৩৯,২৮৮	৫৩,২৮৯	৩,২৩,৭৩০	৩,৭৭,০১৯	
		১৯২৪-২৫	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৩৭০	৭০৪	৫,০৪০	৫,৭৪৪	৪৯০	৪,৪৫৮	৪,৯৪৮	
			খাজনা মুক্ত জমি	৩,৩৪৩	৪,৮৭৭	১১,৮০৬	১৬,৬৮৩	৩,৮৬৮	৮,৪৩০	১২,২৯৮	
			মোট	৪,৩৯৮	৬০,০৫৯	৪,০১,৬৫৬	৪,৬১,৭১৫	৫৭,৬৪৭	৩,৩৬,৬১৮	৩,৯৪,২৬৫	৯৮.১৬

রাজশাহী	রংপুর		রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬৮৫	৫৫,৮১৭	৩,৮৬,২২৪	৪,৪২,০৪১	৭৬,৭৮৭	৩,১৭,২৫৮	৩,৯৪,০৪৫	
		১৯২৬-২৭	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৩৭৩	৫৯২	৫,৫৪৭	৬,১৩৯	২,০৫৯	৩,৩৯৯	৫,৪৫৮	
			খাজনা মুক্ত জমি	৩,৩৩৭	৪,৩৫৪	১২,০২৯	১৬,৩৮৩	৬,৩৫০	৫,৪৬৬	১১,৮১৬	
			মোট	৪,৩৯৫	৬০,৭৬৩	৪,০৩,৮০০	৪,৬৪,৫৬৩	৮৫,১৯৬	৩,২৬,১২৩	৪,১১,৩১৯	১০১.৮৬
			রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৭০১	৯৭,৭৬৬	৫,০৯,৯১৩	৬,০৭,৬৭৯	৭০,৭৬৬	৩,৯৬,৪৭৩	৪,৬৭,২৩৯	
		১৯২৮-২৯	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৩০৮	১,৪৭৯	৬,৫০৮	৮,০৭৭	১,০৭৯	৬,৩৪৫	৭,৪২৪	
			খাজনা মুক্ত জমি	১৭২	২,১২৬	২,৬০২	৪,৭২৮	১,৯২৬	২,৭০৯	৪,৬৩৫	
			মোট	১,২৫৩	১,০১,৩৭১	৫,১৯,১১৩	৬,২০,৪৮৪	৭৩,৭৭১	৪,০৫,৫২৭	৪,৭৯,২৯৮	৯২.৩৩
			রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৭০২	১,৩৮,৯২৫	৫,০৯,২৩২	৬,৪৮,১৫৭	১,০৬,০৩০	৪,১০,৩৪৮	৫,১৬,৩৭৮	
		১৯২৯-৩০	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৩৮১	৬৫৩	৬,৫৮৮	৭,২৪১	৫০২	৬,৫০৯	৭,০১১	
		১৯২৯-৩০	খাজনা মুক্ত জমি	২০৯	৯৩	২,৬৬২	২,৭৫৫	৮০	২,৬৬২	২,৭৪২	
			মোট	১,২৯২	১,৩৯,৬৭১	৫,১৮,৪৮২	৬,৫৮,১৫৩	১,০৬,৬১২	৪,১৯,৫১৯	৫,২৬,১৩১	১০১.৪৮
			রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬৯৭	১,৩১,৭৭৯	৫,০৯,২১২	৬,৪০,৯৯১	৭০,৬৩১	২,৪৯,৫১৭	৩,২০,১৪৮	
		১৯৩০-৩১	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৩৮১	২৩০	৬,৫৮৮	৬,৮১৮	২২৮	৬,০৭৪	৬,৩০২	
			খাজনা মুক্ত জমি	২২২	৫৯	২,৬৭৫	২,৭৩৪	১৩	২,৩২১	২,৩৩৪	
			মোট	১,৩০০	১,৩২,০৬৮	৫,১৮,৪৭৫	৬,৫০,৫৪৩	৭০,৮৭২	২,৫৭,৯১২	৩,২৮,৭৮৪	১০৩.২৪
			রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬৯৯	৬,৮১,৭১১	৫,৩৭,৭৯৪	১২,১৯,৫০৫	৫,০২,০২১	২,২৭,৫১৯	৭,২৯,৫৪০	
		১৯৩৪-৩৫	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৩৮৫	৪,২৮৮	৪,৬৪১	১০,৯২৯	২,০৯৬	৪,৫০৮	৬,৬০৪	
			খাজনা মুক্ত জমি	৩৫০	২,৭৮৯	২,৮২৪	৫,৬১৩	৭১১	১,০৩৯	১,৭৫০	
			মোট	১,৪৩৪	৬,৮৮,৭৮ ৮	৫,৪৭,২৫৯	১২,৩৬,০৪৭	৫,০৪,৮২৮	২,৩৩,০৬৬	৭,৩৭,৮৯৪	১৩৪.৮৩
			রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৭০০	৩,২৪,৪৪২	৫,৪৩,২১৪	৮,৬৭,৬৫৬	১,৯৬,৭৯৯	৪,৩০,৬৮৫	৬,২৭,৪৬৪	
		১৯৩৭-৩৮	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৩৮৫	৫,০০৫	৬,৬৪১	১১,৬৪৬	৩,২৯৭	২,৭৯৩	৬,০৯০	
			খাজনা মুক্ত জমি	৩৫১	৫,৮১৭	২,৯৩০	৮,৭৪৭	১,৪৬৯	৭৭৮	২,২৪৭	
			মোট	১,৪৩৬	৩,৩৫,২৬৪	৫,৫২,৭৮৫	৮,৮৮,০৪৯	২,০১,৫৪৫	৪,৩৪,২৫৬	৬,৩৫,৮০১	১১৫.০২
	বগুড়া		রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬৩৪	৬,৮৯৭	১,৩০,২৮০	১,৩৭,১৭৭	৬,৬১৪	১,২৭,৯৪৮	১,৩৪,৫৬২	
		১৯২৪-২৫	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৩৯	২৩৩	৯৪১	১,১৭৪	২২৮	৭২৬	৯৫৪	
			খাজনা মুক্ত জমি	৩৪	৫৪	১৪২	১৯৬	৩৯	১১৮	১৫৭	
			মোট	৭০৭	৭,১৮৪	১,৩১,৩৬৩	১,৩৮,৫৪৭	৬,৮৮১	১,২৮,৭৯২	১,৩৫,৬৭৩	১০৩.২৮
			রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬৩৭	৩,০৭২	১,৩০,৩৩১	১,৩৩,৪০৩	২,৪৩১	১,২৪,১৭১	১,২৬,৬০২	
		১৯২৬-২৭	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৩৯	৯১	৯৪১	১,০৩২	১৭	৮৬২	৮৭৯	
			খাজনা মুক্ত জমি	৩৪	৪৪	১৪২	১৮৬	২৪	৯৫	১১৯	
			মোট	৭১০	৩,২০৭	১,৩১,৪১৪	১,৩৪,৬২১	২,৪৭২	১,২৫,১২৮	১,২৭,৬০০	৯৮.০০
			রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬৩৭	৬,৯২৮	১,৩০,৬৯৯	১,৩৭,৬২৭	৬,৭৮৪	১,২৫,০৭৩	১,৩১,৮৫৭	
		১৯২৮-২৯	রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৪০	৫০	৯৫৪	১,০০৪	৫০	৯২১	৯৭১	
			খাজনা মুক্ত জমি	৩৪	৩৫	১৪২	১৭৭	১৯	৯৮	১১৭	

রাজশাহী	বগুড়া		মোট	৭১১	৭,০১৩	১,৩১,৭৯৫	১,৩৮,৮০৮	৬,৮৫৩	১,২৬,০৯২	১,৩২,৯৪৫	১০০.৮৭
		১৯২৯-৩০	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬৩৭	৫,৭৭০	১,৪৯,৪৮৩	১,৫৫,২৫৩	৫,৫৭২	১,৩৭,১৬২	১,৪২,৭৩৪	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৪০	৩৩	১,২৬২	১,২৯৫	৩১	৯৭৮	১,০০৯	
			খাজনা মুক্ত জমি	৩৪	৬০	১৪২	২০২	১৫	১২৩	১৩৮	
			মোট	৭১১	৫,৮৬৩	১,৫০,৮৮৭	১,৫৬,৭৫০	৫,৬১৮	১,৩৮,২৬৩	১,৪৩,৮৮১	৯৫.৩৬
		১৯৩০-৩১	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬৪০	১২,৫৮৩	২,১৭,০৯৬	২,২৯,৬৭৯	১২,১৬৭	১,৪৮,১৭৫	১,৬০,৩৪২	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৪১	২৮৬	১,৫৯৫	১,৮৮১	২২৮	৮৫৭	১,০৮৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
		১৯৩০-৩১	মোট	৬৮১	১২,৮৬৯	২,১৮,৬৯১	২,৩১,৫৬০	১২,৩৯৫	১,৪৯,০৩২	১,৬১,৪২৭	৭৩.৮২
		১৯৩৪-৩৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬৮৪	৮১,৮৯১	১,৯০,৫৩১	২,৭২,৪২২	৭৬,৬১৩	১,৪৩,১৭১	২,১৯,৭৮৪	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৩৯	১,২১০	১,১০১	২,৩১১	১,০৮২	৪৮১	১,৫৬৩	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৭২৩	৮৩,১০১	১,৯১,৬৩২	২,৭৪,৭৩৩	৭৭,৬৯৫	১,৪৩,৬৫২	২,২১,৩৪৭	১১৫.৫১
		১৯৩৭-৩৮	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	৬৭৮	৪০,৯৭২	২,৪৮,৫৮৫	২,৮৯,৫৫৭	৩৭,৬৮৯	২,০২,৫৯৫	২,৪০,২৮৪	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৩৯	৯৩০	১,৪৬৫	২,৩৯৫	৯২৮	৬১৩	১,৫৪১	
			খাজনা মুক্ত জমি	..	..	..	..	..	..	..	
			মোট	৭১৭	৪১,৯০২	২,৫০,০৫০	২,৯১,৯৫২	৩৮,৬১৭	২,০৩,২০৮	২,৪১,৮২৫	৯৬.৭১
	পাবনা	১৯২৪-২৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৯৫১	৩০,০২১	১,৬০,৩২৮	১,৯০,৩৪৯	২৫,৬৫০	১,৩৮,৬৪৪	১,৬৪,২৯৪	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৪৫	২৩৮	৩২৭	৫৬৫	১৮৪	৮৫	২৬৯	
			খাজনা মুক্ত জমি	১৭	১৬	৩০৯	৩২৫	৮	২৯৯	৩০৭	
			মোট	২,০১৩	৩০,২৭৫	১,৬০,৯৬৪	১,৯১,২৩৯	২৫,৮৪২	১,৩৯,০২৮	১,৬৪,৮৭০	১০২.৪৩
		১৯২৬-২৭	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৯৫৫	২৪,১৮৯	১,৫৯,৮৮১	১,৮৪,০৭০	২০,৩৫০	১,৩৪,০১০	১,৫৪,৩৬০	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৪৫	২৪৯	৩২৭	৫৭৬	২০৪	১২১	৩২৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	১৭	২২	৩০৯	৩৩১	১	২৯৯	৩০০	
			মোট	২,০১৭	২৪,৪৬০	১,৬০,৫১৭	১,৮৪,৯৭৭	২০,৫৫৫	১,৩৪,৪৩০	১,৫৪,৯৮৫	৯৬.৫৫
		১৯২৮-২৯	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৯৪৪	৩৫,০৮০	১,৬৭,১০৫	২,০২,১৮৫	৩০,২৩৪	১,৪০,০৫৫	১,৭০,২৮৯	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৪৫	১৬০	৩৭৩	৫৩৩	১২৯	২৪৭	৩৭৬	
			খাজনা মুক্ত জমি	১৭	১৯	৩০৯	৩২৮	১৩	২৯৮	৩১১	
			মোট	২,০০৬	৩৫,২৫৯	১,৬৭,৭৮৭	২,০৩,০৪৬	৩০,৩৭৬	১,৪০,৬০০	১,৭০,৯৭৬	১০১.৯০
		১৯২৯-৩০	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৯৪২	৩৩,৫১২	২,৭১,৮৯৫	৩,০৫,৪০৭	৩৩,৫১২	১,৮৮,৯৯৬	২,২২,৫০৮	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৪৫	১৭৩	৫৪৫	৭১৮	১৭৩	১২৫	২৯৮	
			খাজনা মুক্ত জমি	১৮	২৬৪	৪৩৩	৬৯৭	২২৮	৩৬১	৫৮৯	
			মোট	২,০০৫	৩৩,৯৪৯	২,৭২,৮৭৩	৩,০৬,৮২২	৩৩,৯১৩	১,৮৯,৪৮২	২,২৩,৩৯৫	৮১.৮৭
		১৯৩০-৩১	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৯৪৫	৮১,১৯৮	২,৭১,৮৬৯	২,৫৩,০৬৭	৮১,১৯৮	১,২১,৮১১	২,০৩,০০৯	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৫৯	৪২৫	৮৯৭	১,৩২২	১০০	১০২	২০২	
			খাজনা মুক্ত জমি	১৮	১০৮	৪৩৩	৫৪১	২৭	২৯৯	৩২৬	

রাজশাহী	পাবনা		মোট	২,০২২	৮১,৭৩১	২,৭৩,১৯৯	৩,৫৪,৯৩০	৮১,৩২৫	১,২২,২১২	২,০৩,৫৩৭	৭৪.৫০
		১৯৩৪-৩৫	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৯৩৩	৩,৭০,২১১	২,০৭,০৭৮	৫,৭৭,২৮৯	১,৯৪,৪১২	১,০৪,৮০৭	২,৯৯,২১৯	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৬২	২,৭৩৮	৬৮৯	৩,৪২৭	৩৯১	৫	৩৯৬	
			খাজনা মুক্ত জমি	১৮	৭০৬	৩২৪	১,০৩০	২১	..	২১	
			মোট	২,০১৩	৩,৭৩,৬৫৫	২,০৮,০৯১	৫,৮১,৭৪৬	১,৯৪,৮২৪	১,০৪,৮১২	২,৯৯,৬৩৬	১৪৩.৯৯
		১৯৩৭-৩৮	রাজস্ব প্রদেয় এস্টেট	১,৯৩৭	১,৩০,৫৮৩	২,৭০,০২২	৪,০০,৬০৫	৮১,৩৩৬	২,১০,১৫৯	২,৯১,৪৯৫	
			রাজস্ব মুক্ত এস্টেট	৬২	১,৪০৮	৯০৭	২,৩১৫	৩৬৪	৫৩১	৮৯৫	
			খাজনা মুক্ত জমি	১	৩৫৭	১২৪	৪৮১	৩৫৭	৬২	৪১৯	
			মোট	২,০০০	১,৩২,৩৪৮	২,৭১,০৫৩	৪,০৩,৪০১	৮২,০৫৭	২,১০,৭৫২	২,৯২,৮০৯	১০৮.০৩

উৎস : *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1924-25*, pp. xxxviii-xli; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1926-27*, pp. 62-65; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1928-29*, pp. 68-71; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1929-30*, pp. 68-71; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1930-31*, pp. 64-67; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1934-35*, pp. 53-56; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1937-38*, pp. 56-58.

সারণি ১৭

আবওয়াব আদায়ের তালিকা

আবওয়াবের খাত	আবওয়াবের পরিমাণ	
	টাকা	আনা
১. নায়েবের পুণ্যাহের নজর	৬	-
২. জমীদারদিগের পাঁচ শরীকের নজর	৫	-
৩. গোমস্তাদিগের নজর	২	-
৪. পুণ্যাহের পিয়াদার তলবানা	১	-
৫. গোপালনগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ	১	-
৬. আষাঢ় কিস্তির পিয়াদার তলবানা	০	১৪
৭. ভাদ্রের কিস্তির পিয়াদার তলবানা	১	৪
৮. নৌকা ভাড়া	১	৮
৯. সদর আমলার পুজার পার্ব্বণী	৬	৮
১০. কাছারির জমাদার	১	-
১১. ঐ হালসাহানা	১	-
১২. পাঁচ শরীকের পুজার পার্ব্বণী	৫	-
১৩. শ্রীরাম সেন হেড মুহুরি	১	-
১৪. জমীদারের পুরোহিতের ভিক্ষা	২	-
১৫. গোমস্তাদের ভিক্ষা	১২	-
১৬. মুহুরিদের ভিক্ষা	৩	-
১৭. বরকন্দাজদিগের দোলের পার্ব্বণী	১	-
১৮. ডাকটেক্স	৩	-
মোট	৫৪	২

উৎস : চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্গদেশের কৃষক*, পৃ. ২৯৬।

সারণি ১৮

১৯১৩ সালের আইনে ভূমি রাজস্ব সম্পর্কিত মামলা, ১৯২৪-২৫ থেকে ১৯৩৭-৩৮

বিভাগ	জেলা	বছর	১৯১৩ সালের আইনের অধীনে মামলা (Of all kinds under items 1 & 2 of Schedule I of Bengal Act III of 1913)			১৯১৩ সালের আইনের অধীনে বাকেয়া খাজনার জন্য মামলা (To realize arrears of rent due to Govt. item No. 7 of Schedule I of Bengal Act III of 1913)			১৯১৩ সালের আইনের অধীনে অন্যান্য মামলা (All other certificates made under Schedule I of Bengal Act III of 1913)			বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে মামলা (Certificates filed under section 158A of the Bengal Tenancy Act)			সর্বমোট (Grand Total)				
			গত বছরের অমীমাংসীত মামলা	চলতি বছরে দায়েরকৃত মামলা	চলতি বছরে মীমাংসীত মামলা	গত বছরের অমীমাংসীত মামলা	চলতি বছরে দায়েরকৃত মামলা	চলতি বছরে মীমাংসীত মামলা	গত বছরের অমীমাংসীত মামলা	চলতি বছরে দায়েরকৃত মামলা	চলতি বছরে মীমাংসীত মামলা	গত বছরের অমীমাংসীত মামলা	চলতি বছরে দায়েরকৃত মামলা	চলতি বছরে মীমাংসীত মামলা	গত বছরের অমীমাংসীত মামলা	চলতি বছরে দায়েরকৃত মামলা	মোট	চলতি বছরে মীমাংসীত মামলা	অমীমাংসীত মামলা
প্রেসিডেন্সী	যশোর	১৯২৪-২৫	১	৩০	৩১	৩৩	৭৭	১০১	২৪৭	৬৪৫	৭৮৯	..	..	..	২৮১	৭৫২	১,০৩৩	৯২১	১১২
		১৯২৬-২৭	৯	২৪	৩২	২২	৪৭	৬৩	২২৫	৫৫৭	৬০০	..	..	..	২৫৬	৬২৮	৮৮৪	৬৯৫	১৮৯
		১৯২৮-২৯	৩	১৫	১৪	৩	৬৮	৬৩	১৬১	৬৯৮	৬৪৬	..	..	..	১৬৭	৭৮১	৯৪৮	৭২৩	২২৫
		১৯২৯-৩০	৪	৩৬	৩১	৮	৪৬	৩৯	২১৩	৬৪০	৬৩৮	..	..	..	২২৫	৭২২	৯৪৭	৭০৮	২৩৯
		১৯৩০-৩১	৯	১৬	১১	১৫	১৩৩	৭৩	২১৫	৬৬৪	৪০৬	..	..	..	২৩৯	৮১৩	১,০৫২	৪৯০	৫৬২
		১৯৩৪-৩৫	১৭২	২২৯	২১৪	৮০	৫০০	৩৬৯	৪,৩০৮	৬,৮৬০	৩,৪৬৪	১৯৮	১৬০	১৯৭	৪,৭৫৮	৭,৭৪৯	১২,৫০৭	৪,২৪৪	৮,২৬৩
		১৯৩৭-৩৮	৫৭	৯৩	৯৩	১৫৯	২৯৬	২৪২	৮,৭৯৭	৪,৩৪৫	৫,২৯৪	৩১৬	৩৫৬	২৩৮	৯,৩২৯	৫,০৯০	১৪,৪১৯	৫,৮৬৭	৮,৫৫২
	খুলনা	১৯২৪-২৫	৫	৩১	৩২	২২২	৪৮৯	৬৩৬	২৬	১৩৮	১৪৫	..	..	..	২৫৩	৬৫৮	৯১১	৮১৩	৯৮
		১৯২৬-২৭	২	২২	২৩	৮৫	৬৩৬	৫৬২	১৯৪	৪৬৫	৫৪২	..	..	..	২৮১	১,০২৩	১,৩০৪	১,১২৭	১৭৭
		১৯২৮-২৯	১	৪০	৩১	১৩৬	৬০০	৫৯৮	১,০২৩	১,২৩৮	১,৮৯৪	..	..	..	১,১৬০	১,৮৭৮	৩,০৩৮	২,৫২৩	৫১৫
		১৯২৯-৩০	১০	৩৭	৪৩	১৩৮	৬১৩	৫৮৯	৩৬৭	৭২৪	৯৪৯	..	..	..	৫১৫	১,৩৭৪	১,৮৮৯	১,৫৮১	৩০৪
		১৯৩০-৩১	২৪	২১১	১৮৬	১৬২	২৫২	৩৪০	২১৪	১,২৫১	৮৮১	..	৪১	২১	৪০০	১,৭৫৫	২,১৫৫	১,৪২৮	৭২৭
		১৯৩৪-৩৫	১৪২	৩৪৪	১৪১	৬৬৩	১,২৪৭	৯৩২	২,৬০৪	৫,৪৫৫	৩,৩৫৮	৫১৯	১,৯৯৩	১,০১০	৩,৯২৮	৯,০৩৯	১২,৯৬৭	৫,৪৪১	৭,৫২৬
		১৯৩৭-৩৮	৬১৯	৯৪০	৮৩৮	৯৩৭	৬১৭	১,০৩০	১,৩৭৩	২,১০৪	২,৩৫২	৭৫৮	৩০১	৮৬৪	৩,৬৮৭	৩,৯৬২	৭,৬৪৯	৫,০৮৪	২,৫৬৫
ঢাকা	ঢাকা	১৯২৪-২৫	৩৯	৯৩	৯৫	৫২১	৮৮২	১,০১৭	২,৫৫৭	৮,১৭৫	৭,৬৪৫	২,০৯৯	৬,৭৯৬	৭,০১০	৫,২১৬	১৫,৯৪৬	২১,১৬২	১৫,৭৬৭	৫.৩৯৫
		১৯২৬-২৭	৩৪	৭৬	৮০	৩৩২	১,৩৫০	১,২৮৭	১,৭২৭	৬,৭০০	৭,৫১১	৫৯০	৪,৪১৯	৪,৫৯৫	২,৬৮৩	১২,৫৪৫	১৫,২২৮	১৩,৪৭৩	১,৭৫৫
		১৯২৮-২৯	১৫	৭৭	৮১	১৯০	১,২২৫	১,১৯৭	১,০৯৪	৫,০৩৩	৪,৬৮১	৭২১	৩,১৯৯	২,৭৩০	২,০২০	৯,৫৩৪	১১,৫৫৪	৮,৬৮৯	২,৮৬৫
		১৯২৯-৩০	১১	৬৫	৪৯	২১৮	১,০৭৭	৯২৩	১,৪৪৬	১০,৮১৮	৬,১১৫	১,১৯০	৮,৩৪৬	৪,১০৪	২,৮৬৫	২০,৩০৬	২৩,১৭১	১১,১৯১	১১,৯৮০
		১৯৩০-৩১	২৭	৫১	৪৯	৩৭২	২,০৩১	১,৩৯৪	৬,১৪৯	৬,৩৮২	৯,০১০	৫,৪৩২	৪,১৩৪	৬,৫৭২	১১,৯৮০	১২,৫৯৮	২৪,৫৭৮	১৭,০২৫	৭,৫৫৩
		১৯৩৪-৩৫	৪৬	৫১	৮১	১,০৯৯	১,৯৭৫	২,১২৯	৫,৩১০	৯,৬৭৪	৯,৮৫২	৪৫৩	৪৭০	৬৩৯	৬,৯০৮	১২,১৭০	১৯,০৭৮	১২,৭০১	৬,৩৭৭
		১৯৩৭-৩৮	৭	১৬	১৩	৫১২	২,১৯২	২,৩০৫	৪,১৬৩	৬,৫০০	৮,৮৪৩	১৩১	৬৭১	৪৫৩	৪,৮১৩	৯,৩৭৯	১৪,১৯২	১১,৬১৪	২,৫৭৮
	ময়মনসিংহ	১৯২৪-২৫	৪	৯৩	৯২	১,৩৯৮	১,৮২২	১,৭৫৫	১,৩৭৭	৪,৪৩৫	৪,১১৮	৪৪৪	২,৫৭৮	১,৮১২	৩,২২৩	৮,৯২৮	১২,১৫১	৭,৭৭৭	৪,৩৭৪
		১৯২৬-২৭	৩৩	৭০	৯২	৭২৫	১,০৩৬	১,১৯২	৯৭৯	৩,৮৪৪	৩,৩৪৭	৩০৬	৮৮৯	৯৫৩	২,০৪৩	৫,৮৩৯	৭,৮৮২	৫,৫৮৪	২,২৯৮
		১৯২৮-২৯	১৭	২৫	২৮	৯১৯	১,৫৮০	২০৬০	১,১০২	৩,৫২৭	৩,৩৫৫	২০৩	১,০৪১	১,০২৬	২,২৪১	৬,১৭৩	৮,৪১৪	৬,৪৬৯	১,৯৪৫
		১৯২৯-৩০	১৪	৫৪	৩৫	৪৩৯	১,৪৪৪	১,৩৪৩	১,২৭৪	৫,৩৮৮	৩,৪২৪	২১৮	২,৫৬৭	১,১১৩	১,৯৪৫	৯,৪৫৩	১১,৩৯৮	৫,৯১৫	৫,৪৮৩
		১৯৩০-৩১	৩৩	৬২	১৪	৫৪০	১,৩৪৮	৫৭১	৩,২৩৮	৪,৯৬৫	৩,৯৪৯	১,৬৭২	৫,৬৫৭	৩,৬৯৬	৫,৪৮৩	১২,০৩২	১৭,৫১৫	৮,২৩০	৯,২৮৫
		১৯৩৪-৩৫	১৭২	৮৮	৮৮	১,২৭৩	১,১৭৬	১,৪২৫	১১,৬৩১	১০,৪৪৩	১২,৩১৮	৫,৪৯৩	৪,২৫৮	৬,৭৮১	১৮,৫৬৯	১৫,৯৬৫	৩৪,৫৩৪	২০,৬১২	১৩,৯২২
		১৯৩৭-৩৮	২৭০	৩৭৫	৩৮৪	৮০১	১,২৫৯	১,০৭৪	২,৯৫৯	৮,৩২৩	৫,৯৫২	৬৪৭	২,০৬৭	১,৫০১	৪,৬৭৭	১২,০২৪	১৬,৭০১	৮,৯১১	৭,৭৯০

ঢাকা	ফরিদপুর	১৯২৪-২৫	৭	১২	১৬	৬২২	৪,৫২০	৩,০০৫	৪,১০৬	৫০১	২,০৭৬	২০	১৯	৩৪	৪,৭৫৫	৫,০৫২	৯,৮০৭	৫,১৩১	৪,৬৭৬
		১৯২৬-২৭	২	৯	৮	১,৬৪৬	৩,৮২৯	৪,৪৫৪	৬১৩	৯৮৪	১,২০১	১৪	৩০	৩৯	২,২৭৫	৪,৮৫২	৭,১২৭	৫,৭০২	১,৪২৫
		১৯২৮-২৯	৭	৩৪	৩৩	১,২৬৭	২,১৭৩	২,৪৪৪	২৭৮	৯৪৯	১,০০৬	৩	১৬	১৯	১,৫৫৫	৩,১৭২	৪,৭২৭	৩,৫০২	১,২২৫
		১৯২৯-৩০	৮	২০	১৭	৯৯৬	২,০৯৬	২,৩৬৯	২২১	১,২৭৫	১,১৫৮	৩	৩	৬	১,২২৮	৩,৩৯৪	৪,৬২২	৩,৫৪৪	১,০৭৮
		১৯৩০-৩১	১১	২৪	১৫	৭২৩	১,৭৮৪	১,৪৯৪	৩৩৮	১,৫২৪	১,৫১০	..	১৮০	১৫১	১,০৭২	৩,৫১২	৪,৫৮৪	৩,১৭০	১,৪১৪
		১৯৩৪-৩৫	২৬	৬৮	৩২	২,১৫৬	৫,৯৪৭	৪,৬০৩	১,৬৪৭	৬,৪৫০	৪,৭৭৭	২৯	৩৬৭	১৩৮	৩,৮৫৮	১২,৮৩২	১৬,৬৯০	৯,৪৫০	৭,২৪০
		১৯৩৭-৩৮	৭৯	৩৪	৫৫	৩,৫৯৯	৩,৮১০	৫,৫১১	২,৬৮৯	৪,০৯৪	৪,১৭৬	২৩০	৫৪৫	৪৬৫	৬,৫৯৭	৮,৪৮৩	১৫,০৮০	১০,২০৭	৪,৮৭৩
	বাকেরগঞ্জ	১৯২৪-২৫	২৮	৫৬	৫৬	৬৮	৮২৮	৮২৮	৪৭০	৯৪৩	১,২০৩	৭৯	১৭৫	২০১	৬৮৫	২,০০২	২,৬৪৭	২,২৮৮	৩৫৯
		১৯২৬-২৭	১৭	৩৬	৩৫	৯৭	১,৩০১	১,১৭০	৩৮৯	১,৯৭৭	১,৭৯৭	৪১	১৭	৪২	৫৪৪	৩,৩৩১	৩,৮৭৫	৩,০৪৪	৮৩১
		১৯২৮-২৯	৩৩	৫১	৪৪	১২৭	২,০৮৬	১,৯৩১	১,১২৩	২,৮৩২	২,৪৬৮	৮	২	৮	১,২৯১	৪,৯৭১	৬,২৬২	৪,৪৫১	১,৮১১
		১৯২৯-৩০	৪০	৪৭	৪২	২৮২	৩,৪০৩	২,৭৩৮	১,৪৮৭	৩,৭৬৬	২,৮৪৩	২	২৬	২৮	১,৮১১	৭,২৪২	৯,০৫৩	৫,৬৫১	৩,৪০২
		১৯৩০-৩১	৪৫	৩৯	২৮	৯৪৭	৬,৫০০	৫,৪৩১	২,৪১০	৪,৩০১	৪,০২৭	..	২২	২১	৩,৪০২	১০,৮৬২	১৪,২৬৪	৯,৫০৭	৪,৭৫৭
		১৯৩৪-৩৫	৭৭	১৯২	১৮৭	৬,৫২৯	৯,৪২৮	১১,০৯৫	৪,৫৩৪	৬,৭৩৪	৬,৪৩১	১৮৩	৬৪০	৪৯৫	১১,৩২৩	১৬,৯৯৪	২৮,৩১৭	১৮,২০৮	১০,১০৯
		১৯৩৭-৩৮	৬০	..	৫২	৪,৭৬৬	১৭,৯০০	১৬,৭৭৯	৩,৯২৬	৬,৬৯৪	৬,৬৯৯	৮৪৬	৮২৪	১,১৪০	৯,৫৯৮	২৫,৪১৮	৩৫,০১৬	২৪,৬৭০	১০,৩৪৬
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১৯২৪-২৫	২৩	১৫	৩৬	১,৭০৩	৯,৭৫৭	১০,৫৫৮	১,১৫৯	২,৫৫০	২,৩৭২	..	..	..	২,৮৮৫	১২,৩২২	১৫,২০৭	১২,৯৬৬	২,২৪১
		১৯২৬-২৭	..	১	১	৮২৬	৯,৫৯১	৯,৭১৮	১,২৮৯	২,৭৯৪	২,২৯০	..	..	..	২,১১৫	১২,৩৮৬	১৪,৫০১	১২,০০৯	২,৪৯২
		১৯২৮-২৯	৬১	১১৩	৮৬	১,০১৭	১২,৪১৮	১১,৯৬৩	১,১৩৮	৩,২৬১	২,৬৪৩	..	..	..	২,২১৬	১৫,৭৯২	১৮,০০৮	১৪,৬৯২	৩,৩১৬
		১৯২৯-৩০	৮৮	২৭২	২৮৩	১,৪৭২	১২,৫৬০	১২,৭৯৬	১,৭৫৬	৩,০৮৬	২,৮০০	..	..	..	৩,৩১৬	১৫,৯১৮	১৯,২৩৪	১৫,৮৭৯	৩,৩৫৫
		১৯৩০-৩১	৭৫	৫০	১১৬	১,২৩৬	১২,৯১৪	১২,১৮৮	২,০৪২	২,৬৪৪	২,৯৫১	..	..	..	৩,৩৫৫	১৫,৬০৮	১৮,৯৬৩	১৫,২৫৫	৩,৭০৮
		১৯৩৪-৩৫	১	২৬	১৬	৫,১৫৩	১৬,০০৬	১৫,৮২৩	৭,২২৩	৯,৭৭২	১১,২৮৪	১,২৪৩	১,৯৮১	২,৪৪২	১৩,৬২০	২৭,৭৮৫	৪১,৪০৫	২৯,৫৬৫	১১,৮৪০
		১৯৩৭-৩৮	৩৬০	১,২১১	৯০১	২,৮৫৫	১১,১৩০	১১,১৭০	১,৬৬১	২,৭৬৬	২,৬৩২	৭৩৪	২,০৮৯	১,৬৩০	৫,৬১০	১৭,১৯৬	২২,৮০৬	১৬,৩৩৩	৬,৪৭৩
	ত্রিপুরা	১৯২৪-২৫	..	..	..	৫৪	৫৩২	৫৩৯	২,৩৯২	৬,৫৪৬	৬,৫৯২	..	..	..	২,৪৪৬	৭,০৭৮	৯,৫২৪	৭,১৩১	২,৩৯৩
		১৯২৬-২৭	..	..	..	৫১	৫৯৩	৫৯২	১,৩২২	৫,৫৯৯	৫,১২০	..	..	..	১,৩৭৩	৬,১৯২	৭,৫৬৫	৫,৭১২	১,৮৫৩
		১৯২৮-২৯	..	..	..	৫৩	৪২২	৩৯৬	১,১৫২	২,২১৬	২,৭৮২	..	..	..	১,২০৫	২,৬৩৮	৩,৮৪৩	৩,১৭৮	৬৬৫
		১৯২৯-৩০	..	..	..	৭৯	৪২৪	২৫৮	৫৮৬	২,৪৯১	২,২৩২	..	২,৩৩৬	৭৯৭	৬৬৫	৫,২৫১	৫,৯১৬	৩,২৮৭	২,৬২৯
		১৯৩০-৩১	..	..	..	২৪৫	১,০১৪	৪৭৫	২,৩৮৬	১১,৩৯০	৪,৬৭৩	১,৫৩৯	৭,৯১১	২,৫০৬	৪,১৭০	২০,৩১৫	২৪,৪৮৫	৭,৬৫৪	১৬,৮৩১
		১৯৩৪-৩৫	..	..	..	১,৫৪৮	২,৫৫৪	২,৪৯৩	১২,৯৭৭	৭,৪৭৯	১৫,১৭৫	৩,৭০৭	৩,০৬৬	৩,৬৮০	১৮,২৩২	১৩,০৯৯	৩১,৩৩১	২১,৩৪৮	৯,৯৮৩
		১৯৩৭-৩৮	..	..	..	১,১৯৬	১,৯২৬	২,৪২৮	১,১২৬	৩,০৭৪	৩,৪৪৭	৯২১	১,৭৩৫	২,২৩১	৩,২৪৩	৬,৭৩৫	৯,৯৭৮	৮,১০৬	১,৮৭২
	নোয়াখালী	১৯২৪-২৫	..	৪	৩	৬১৯	১,৫৮৭	১,৪২৮	৬৮০	১,২৮৯	১,৫৩৯	..	..	..	১,২৯৯	২,৮৮০	৪,১৭৯	২,৯৭০	১,২০৯
		১৯২৬-২৭	১	৭	২	৫৫০	১,৪৩০	১,৫৫০	১৬৫	৯০০	৭৮০	..	..	..	৭১৬	২,৩৩৭	৩,০৫৩	২,৩৩২	৭২১
		১৯২৮-২৯	..	..	..	৬১০	১,৯৫২	১,৯২০	২২৭	১,১৬৪	৯৯১	..	..	..	৮৩৭	৩,১১৬	৩,৯৫৩	২,৯১১	১,০৪২
		১৯২৯-৩০	..	..	..	৬৫৩	১,৬৯৭	১,৬৫৭	৩৮৯	৭১৬	৮০২	..	..	..	১,০৪২	২,৪১৩	৩,৪৫৫	২,৪৫৯	৯৯৬
		১৯৩০-৩১	..	..	..	৬৯৩	২,৯৫১	১,৭৮৬	৩০৩	১,২৮২	১,১৫৮	..	..	..	৯৯৬	৪,২৩৩	৫,২২৯	২,৯৪৪	২,২৮৫
		১৯৩৪-৩৫	..	..	..	৮,৩০৬	৫,২৪৩	৬,৬২৩	১,৩০৭	২,২৪৭	১,৭৩১	৭৮	১,৩৬৭	৭৮৫	৯,৬৯১	৮,৮৫৭	১৮,৫৪৮	৯,১৩৯	৯,৪০৯
		১৯৩৭-৩৮	..	..	..	৮,৩২৮	৮,৪৭৩	১০,৬০৬	৫৮৯	৫৮৫	৪৮৪	৭১৯	২,৩৮৬	২,২৫৭	৯,৬৩৬	১১,৪৪৪	২১,০৮০	১৩,৭৪৭	৭,৩৩৩
রাজশাহী	রাজশাহী	১৯২৪-২৫	৬	২৫	২৮	৩	১৪৬	১১১	৭	৩০	২৮	..	..	..	১৬	২০১	২১৭	১৬৭	৫০
		১৯২৬-২৭	৩৬	৪০	৬৫	৫৫	১৪৪	১২৩	৩৫	৩৭	৫৪	..	..	..	১২৬	২২১	৩৪৭	২৪২	১০৫
		১৯২৮-২৯	১৮	২৬৮	২৩৯	২৯৫	৩৬৬	৬১৩	১৯	৯২	৮৫	..	..	..	৩৩২	৭২৬	১,০৫৮	৯৩৭	১২১
		১৯২৯-৩০	৪৭	১৫০	১২৬	৪৮	৬০	৫০	২৬	১৪৮	১০১	..	৫৭	৪৭	১২১	৪১৫	৫৩৬	৩২৪	২১২
		১৯৩০-৩১	৭১	১৫৩	১৫১	৫৮	৮৬	৭২	৭৩	৪০০	২০৪	১০	৪৫	৬	২১২	৬৮৪	৮৯৬	৪৩৩	৪৬৩
	রাজশাহী	১৯৩৪-৩৫	২২০	১৫০	২০০	৩০৭	৫৮১	১১৫	৫৬৮	৮১০	৩২৯	২৪৫	৩৪	১২৭	১,৩৪০	১,৫৭৫	২,৯১৫	৭৭১	২,১৪৪
		১৯৩৭-৩৮	১৮০	১৭৮	২৮০	৩৪৯	৪৬৩	৫৭৫	৭৬৯	১,০৫০	১,৪২৬	৭	৭	১১	১,৩০৫	১,৬৯৮	৩,০০৩	২,২৯২	৭১১
	দিনাজপুর	১৯২৪-২৫	..	..	..	..	১	..	১৬	১৮৮	১৫৪	২৩	১৭১	১০১	৩৯	৩৬০	৩৯৯	২৫৫	১৪৪

রাজশাহী	দিনাজপুর	১৯২৬-২৭	..	..	..	..	..	..	৮৯	২৬৯	২২৬	২৭	১৭৩	১২১	১১৬	৪৪২	৫৫৮	৩৪৭	২১১
		১৯২৮-২৯	..	..	..	..	..	..	১১৮	৩৯২	৪১৩	২৫	১৬৯	১৮৮	১৪৩	৫৬১	৭০৪	৬০১	১০৩
		১৯২৯-৩০	..	..	..	..	..	..	৯৭	৪৬৭	৩৯৭	৬	১৮১	১৫৬	১০৩	৬৪৮	৭৫১	৫৫৩	১৯৮
		১৯৩০-৩১	..	..	..	..	..	..	১৯৮	২,২৫৩	১,৪৪৬	..	..	..	১৯৮	২,২৫৩	২,৪৫১	১,৪৪৬	১,০০৫
		১৯৩৪-৩৫	..	..	..	..	..	..	২,৫১৮	১,৮২৯	২,৪৬৪	..	..	..	২,৫১৮	১,৮২৯	৪,৩৪৭	২,৪৬৪	১,৮৮৩
		১৯৩৭-৩৮	..	..	..	..	..	..	১,১১৭	২,০৭৮	১,৯৭২	..	..	..	১,১১৭	২,০৭৮	৩,১৯৫	১,৯৭২	১,২২৩
	রংপুর	১৯২৪-২৫	..	..	..	..	২	২	৫১	১৬৬	১৮৭	..	..	..	৫১	১৬৮	২১৯	১৮৯	৩০
		১৯২৬-২৭	..	..	..	..	..	..	১২৭	১,২৮৪	১,০৭৩	..	..	..	১২৭	১,২৮৪	১,৪১১	১,০৭৩	৩৩৮
		১৯২৮-২৯	..	..	..	..	..	..	৩৩১	১,৩৭৯	১,০৩৮	..	..	..	৩৩১	১৩৭৯	১,৭১০	১০৮৮	৬২২
		১৯২৯-৩০	..	..	..	..	২৫২	২৪১	৬৭২	৩,০১৩	২,৩৪৯	..	..	..	৬৭২	৩,২৬৫	৩,৯৩৭	২,৫৯০	১,৩৪৭
		১৯৩০-৩১	..	..	..	৩	..	৩	১,৩৩৬	৫,৪২৭	২,৯২২	..	..	..	১,৩৩৯	৫,৪২৭	৬,৭৬৬	২,৯২৫	৩,৮৪১
		১৯৩৪-৩৫	২১	১৮	২৫	২	..	১	১৩,৬৪৮	১৩,৪৭০	১০,৫৫০	..	..	..	১৩,৬৭১	১৩,৪৮৮	২৭,১৫৯	১০,৫৭৬	১৬,৫৮৩
		১৯৩৭-৩৮	৪২	১১২	৩৩	২	..	২	৭৭	১,৩০৪	৬২২	২২১	৯৪৬	৪৩৯	৩৪২	২,৩৬২	২,৭০৪	১,০৯৬	১,৬০৮
	বগুড়া	১৯২৪-২৫	..	..	..	৪১১	৬৬	৪৬৩	৩২	২১৬	২২৫	..	..	..	৪৪৩	২৮২	৭২৫	৬৮৮	৩৭
		১৯২৬-২৭	..	..	..	৮	১৬৪	১৭১	৭৮	১৯৮	২৬৫	..	..	..	৮৬	৩৬২	৪৪৮	৪৩৬	১২
		১৯২৮-২৯	..	..	..	৩	১৮৯	১৯২	৩	২৯১	২৩৬	..	..	..	৬	৪৮০	৪৮৬	৪২৮	৫৮
		১৯২৯-৩০	৩৩	৫৩	৬১	১৮১	৬২৩	৬০৯	২৫	২৮২	২১৭	..	..	..	২৩৯	৯৫৮	১,১৯৭	৮৮৭	৩১০
		১৯৩০-৩১	২৫	৯৩	৩২	১১	১৭৯	১৫৩	৯০	২১০	১৬৮	..	..	..	১২৬	৪৮২	৬০৮	৩৫৩	২৫৫
		১৯৩৪-৩৫	৭১	২৬১	১৬২	৬৭	১,২৬৪	৯৩৩	৩০৮	৩৬৮	৬১৭	২৮০	১৯৫	৪৫৫	৭২৬	২.০৮৮	২,৮১৪	২,১৬৭	৬৪৭
		১৯৩৭-৩৮	৯৬	২১১	২৮০	৪৫	২৬৩	২৮৪	৪,৪৮০	৩,৯৫৫	৪,১৯৭	৪৪	৩৫৮	৩১৪	৪,৬৬৫	৪,৭৮৭	৯,৪৫২	৫,০৭৫	৪,৩৭৭
	পাবনা	১৯২৪-২৫	২১	২৫	৩৯	২৩৪	১৩৫৪	১১৩০	১০৭	৫৮৯	৫১২	..	..	..	৩৬২	১,৯৬৮	২,৩৩০	১,৬৮১	৬৪৯
		১৯২৬-২৭	৪১	৬১	৯২	৬৫	৬৩৯	৫৩৮	১৩৬	৬৪৪	৫২৭	..	..	..	২৪২	১,৩৪৪	১,৫৮৬	১,১৫৭	৪২৯
		১৯২৮-২৯	৭	৪৩	৩৫	২৬	৯৯০	৮৩৫	২৭৮	৩১৮	৪৩৬	..	..	..	৩১১	১,৩৫১	১,৬৬২	১,৩০৬	৩৫৬
		১৯২৯-৩০	১৫	৩২	৩৬	..	৪৯	৪৩	১৬০	৯৬২	৫২১	..	..	..	১৭৫	১,০৪৩	১,২১৮	৬০০	৬১৮
		১৯৩০-৩১	১১	৩০	১৭	১৯৫	১,০০১	৬৮৭	৬০১	১,০৮৩	৭২৭	..	..	..	৮০৭	২,০৭৪	২,৮৮১	১,৪৩১	১,৪৫০
		১৯৩৪-৩৫	১০৬	১,৭১১	২০৯	২,৮৬৩	৩,৯৬৭	২,২৬৬	৩,১১৫	৩,৪২১	২,৩১১	৩২৭	১১৮	২৪৬	৬,৪১১	৯,২১৭	১৫,৬২৮	৫,০৩২	১০,৫৯৬
		১৯৩৭-৩৮	৫৯১	১৭	৪০৭	৩,৮৭৭	২,৪৪৮	২,৭৪৩	১,৫৯১	৪,৫৩০	৩,৪৯১	৫২০	৫৭৪	৪৪৯	৬,৫৭৯	৭,৫৬৯	১৪,১৪৮	৭,০৯০	৭,০৫৮

উৎস : *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1924-25*, pp. xvi-xviii; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1926-27*, pp. 42-44; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1928-29*, pp. 46-48; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1929-30*, pp. 46-48; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1930-31*, pp. 42-44; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1934-35*, pp. 40-42; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1934-35*, pp. 42-44; *Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1937-38*, pp. 42-44.

সারণি ১৯

প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের অধিবেশন, ১৯৩৭-১৯৪৭

অধিবেশন	অধিবেশনের স্থান	সময়কাল	প্রাথমিক সদস্য
প্রথম	পাত্রসায়ের (বাঁকুড়া)	২৭-২৮ মার্চ ১৯৩৭	১১,০৮০
দ্বিতীয়	বড়া (হুগলী)	২-৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮	৩৫,৫০৬
তৃতীয়	নঘরিয়া (মালদাহ)	৪-৬ মে ১৯৩৯	৫০,০০০
চতুর্থ	পাজিয়া (যশোর)	৭-৮ জুন ১৯৪০	৩৪,০০০
পঞ্চম	ডোমার (রংপুর)	জুন ১৯৪২	৩৫,০০০
ষষ্ঠ	নালিতাবাড়ি (ময়মনসিংহ)	১০-১২ মে ১৯৪৩	১,২৪,৮৭২
সপ্তম	ফুলবাড়ি (দিনাজপুর)	২৯ ফেব্রুয়ারি-২মার্চ ১৯৪৪	১,৭৮,৫০০
অষ্টম	হাটগোবিন্দপুর (বর্ধমান)	১৩-১৪ মার্চ ১৯৪৫	২,৫৫,০০০
নবম	মৌভোগ (খুলনা)	২১-২৪ মে ১৯৪৬	২,১৭,৩০৪
দশম	পাঁচখুরি (মেদিনীপুর)	২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি-১মার্চ ১৯৪৭	২,০৩,৩৮২

উৎস : রসুল, *কৃষক সভার ইতিহাস*, পৃ. ৩৪৬।

সারণি ২০

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় আইনসভার ২৫০টি আসনের ফলাফল

দলের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ আসন সংখ্যা				প্রাপ্ত আসন সংখ্যা[ক]				প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার[খ]		
	বিশেষ আসন	শহর (৬)	পল্লী (১১১)	মোট	বিশেষ আসন (৩)	শহর (৬)	পল্লী (১১১)	মোট	শহর	পল্লী	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মুসলমান সম্প্রদায় :১১৯											
কৃষক প্রজা পার্টি	-	৩	৭২	৭৫	-	-	৩৬ (১)	৩৬ (১)	১৫.৩৯	৩১.৭৮	৩১.৫১
মুসলিম লীগ	৪[গ]	৬	৭২	৮২	৪ (১)	৬ (১)	২৯ (৪)	৩৯ (৫)	৬১.৬৭	২৬.৫২	২৭.১০
ত্রিপুরা কৃষক সমিতি	-	-	১০	১০	-	-	৫	৫	-	৩.৮৩	৩.৭৭
স্বতন্ত্র	৪	৬	৮৭	৯৭	২	২	৪১ (৫)	৪৩ (৫)	২৩.১৪	৩৭.৮৭	৩৭.৬২
মোট								**১১৯**			
হিন্দু সম্প্রদায় :১০৪											
কংগ্রেস								৬০			
তফসিলী সম্প্রদায়								২৩			
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান								৫			
স্বতন্ত্র হিন্দু								১৩			
সাধারণ মহিলা ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা (হিন্দু)								৩			
মোট								**১০৪**			
অন্যান্য : ২৭											
ভারতীয় খ্রিস্টান								২			
ইউরোপীয়								২৫			
মোট								২৭			
সর্বমোট								**২৫০**			

ক. বন্ধনীর মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী আসন।

খ. বিশেষ আসন বর্হিভূত।

গ. ৩টি বিশেষ আসনসহ ৪টি সংরক্ষিত আসন (২টি মহিলা আসন, ১টি মুসলিম চেম্বার অব কমার্স ও ১টি সাধারণ আসন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদীয় আসন)।

উৎস : Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, pp. 74-75 and 77; Sen, *Muslim Politics in Bengal*, pp. 88-89; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২২।

সারণি ২১

১৯৩২ সালের সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের ভিত্তিতে বঙ্গীয় আইনসভার আসন বণ্টন (ক এবং খ)

(ক) সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের ভিত্তিতে বঙ্গীয় আইনসভার ২৫০টি আসনে সম্প্রদায় ভিত্তিক বণ্টন, ১৯৩২

নির্বাচনী এলাকা	আসন সংখ্যা
মুসলমান	১১৭
মুসলিম মহিলা	২
সাধারণ	৭০
অনুন্নত শ্রেণী (তফসিলী হিন্দুসহ)	১০[ক]
সাধারণ মহিলা	২
ইউরোপীয়	১১
ইউরোপীয় ব্যবসায়ী	১৪
ভারতীয় ব্যবসায়ী	৫
জমিদার	৫
বিশ্ববিদ্যালয়	২
শ্রমিক	৮
অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান	৩
অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান মহিলা	১
সর্বমোট	২৫০

ক. মোট 'সাধারণ' আসনের মধ্যে কমপক্ষে ১০টি আসন অনুন্নত শ্রেণীর (২টি খ্রিস্টান আসনসহ) জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

উৎস : চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো*, পৃ. ২৫।

(খ) সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের ভিত্তিতে বঙ্গীয় আইন সভায় ২৫০টি আসনের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় ভিত্তিক বণ্টন, ১৯৩২

সম্প্রদায়গত প্রকৃত আসন	আসন ভিত্তিক বণ্টন	আসন সংখ্যা	মোট আসন
মুসলমান সম্প্রদায়ের মোট আসন	মুসলমান	১১৭	১১৯
	মুসলিম মহিলা	২	
হিন্দু সম্প্রদায়ের মোট আসন	সাধারণ	৭০	১০৪
	অনুন্নত শ্রেণী (তফসিলী হিন্দু)	৮	
	সাধারণ মহিলা	২	
	ভারতীয় ব্যবসায়ী	৫	
	জমিদার	৫	
	বিশ্ববিদ্যালয়	২	
	শ্রমিক	৮	
	অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান	৩	
	অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান মহিলা	১	
ভারতীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মোট আসন	অনুন্নত শ্রেণী হিসেবে খ্রিস্টানদের জন্য সংরক্ষিত	২	২
ইউরোপীয়ানদের মোট আসন	ইউরোপীয়	১১	২৫
	ইউরোপীয় ব্যবসায়ী	১৪	
মোট			২৫০

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক নির্মিত

সারণি ২২

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় আইনসভার ২৫০টি আসনের ফলাফল

দল/স্বতন্ত্র	প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থী	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট (বিশেষ আসন ব্যতিত)[খ]	প্রাপ্ত ভোটের হার (%)
মুসলমান সম্প্রদায় : ১১৯				
মুসলিম লীগ	১২১	১১২[ক]	২০,৩৬,০৪৯	৮৩.৬৪
কৃষক প্রজা পার্টি	৪৩	৪	১,৩১,১৯১	৫.৩৯
ইমারত পার্টি	৩	১[ক]	১৬,৯৪১	০.৬৯
জামাতে উলামায়ে হিন্দ	১২	-	২৭,৭৫৬	১.১৪
মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ড	১০	-	১৫,৮১৬	০.৬৫
কংগ্রেস	৬	-	১১,৭৬৯	০.৪৮
ন্যাশনালিস্ট মুসলিম	৫	-	৪,৪২৬	০.১৮
কমিউনিস্ট পার্টি	২	-	৩,২৪৪	০.১৩
র‍্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	৩	-	৬৬৯	০.০৩
স্বতন্ত্র	১৪৩	২[ক]	১,৮৬,২৫৫	৭.৬৫
মোট	**৩৪৩**	**১১৯**	**২৪,৩৪,১০৬**	**৯৯.৯৮**
হিন্দু সম্প্রদায় : ১০৪				
কংগ্রেস		৬২[ক]		
তফসিলী সম্প্রদায়		২৪[ক]		
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান		৪		
ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই)	১৩	৩	১,৫৭,১৯৭	
হিন্দু মহাসভা		১	৭৮,৯৮১	
ক্ষত্রিয় সমিতি		১		
তফসিলী ফেডারেশন		১		
স্বতন্ত্র তফসিলী হিন্দু		৫		
স্বতন্ত্র হিন্দু		১		
সাধারণ মহিলা ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা (হিন্দু)		২		
মোট		**১০৪**		
অন্যান্য : ২৭				
ভারতীয় খ্রিস্টান		২		
ইউরোপীয়		২৫		
মোট		**২৭**		

ক. নির্বাচনের পর বঙ্গীয় আইনসভায় ২৫০টি আসন বিন্যাসে দেখা যায় যে মুসলিম লীগের আসন সংখ্যা ১১৫টি। এর কারণ ছিল নির্বাচনের পর ইমারত পার্টির ১ জন এবং স্বতন্ত্র ২জন মোট ৩ জন মুসলিম সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করেন। অন্যদিকে নির্বাচনের পর বঙ্গীয় আইনসভায় ২৫০টি আসন বিন্যাসে দেখা যায় যে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ৮৬টি। এর কারণ ছিল নির্বাচনের পর তফসিলী সম্প্রদায়ের মোট ২৪ জন হিন্দু সদস্য কংগ্রেসে যোগদান করেন।

খ. বিশেষ আসন ব্যতিত (৩টি বিশেষ আসনসহ ৪টি সংরক্ষিত আসন, ২টি মহিলা আসন, ১টি মুসলিম চেম্বার অব কমার্স ও ১টি সাধারণ আসন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদীয় আসন)।

উৎস : Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, p. 214-215; Rahim and Rahim, *Bengal Politics : Documents of the Raj*, pp. 137-138 and 171; Jalal, *The Sole Spokesman*, p. 161; ইসলাম, *"বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ"*, পৃ. ২২৪; করিম, *"১৯৪৬ সালের নির্বাচন"*, পৃ. ১১৩।

সারণি ২৩

১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের অধীনে জমিদারি ও জমিদারি এস্টেটসমূহ অধিগ্রহণ

জেলা	জমিদারি ও জমিদারি এস্টেটসের নাম	আনুমানিক গড় আয় (টাকা)
	ব্যক্তিগত এস্টেট (Private Estate)	
ঢাকা	১. ভাগ্যকুল রাজ এস্টেট (Bhagyakul Raj Estate)	১৫,৪৪,৭৭৫
ময়মনসিংহ	২. ময়মনসিংহ রাজ এস্টেট (Mymensingh Raj Estate)	১০,৫৮,৮৭৪
	৩. সুসাং এস্টেট (Shusang Estate)	৩,৫৫,০০০
	৪. গৌরীপুর এস্টেট (Gouripur Estate)	৫,৬১,৯১৮
ফরিদপুর	৫. নড়াইল এস্টেট (Narail Estate)	৮,৬৬,২৩৩
বাকেরগঞ্জ	৬. ঠাকুর এস্টেট (Tagore Raj Estate)	৭,৭০,০২০
ত্রিপুরা	৭. সরাইল এস্টেট (Sarail Estate)	৪,০৪,৩২০
	৮. চাকলা রোসনাবাদ এস্টেট (Chakla Rashnabad Estate)	১০,৫৫,৩২৯
নোয়াখালী	৯. ভুলুয়া ১১ আনা এস্টেট (Bhulua 11 annas Estate)	৪,৮৫,৩৫৫
রাজশাহী	১০. নাটোর রাজ এস্টেট (Natore Raj Estate)	৯,১৭,১৯৩
	১১. পুটিয়া এস্টেট (Puthia Estate)	৬,৩৭,৫১৪
রংপুর	১২. চশিম বাজার রাজ এস্টেট (Cashim Bazar Raj Estate)	১২,০৪,৫৮৩
	১৩. ঠাকুর এস্টেট (Tagore Estate)	১০,১৯,২৩৬
	১৪. মুর্শিদাবাদ নবাব স্টেট (Murshidabad Nawab's Estate)	১,৫২,২৭৬
	১৫. ডিমলা রাজ এস্টেট (Dimla Raj Estate)	৩,১৫,৯৮৫
দিনাজপুর	১৬. চাকলাজাত এস্টেট (Chaklajat Estate)	৫,৯৪,৬৫১
	১৭. দিনাজপুর রাজ এস্টেট (Dinajpur Raj Estate)	৫,৭২,৯৭১
কুষ্টিয়া	১৮. মেদিনীপুর জমিদারি কোঃ লিঃ (Midnapur Zamindari Co. Ltd.)	১৩,০০,০০০
খুলনা	১৯. ল এস্টেট (Law Estate)	৩,৩০,০১৯
	কোর্ট অব ওয়ার্ডস এস্টেট (Court of Wards Estate)	
ঢাকা	১. ঢাকা নবাব এস্টেট Dacca Nawab Estate)	১৫,৪৮,০৬১
	২. ধানকোরা এস্টেট (Dhankora Estate)	১,১৮,০৩৬
	৩. কাশিমপুর ৯ আনা এস্টেট (Kassimpur Estate- As. 9)	৫১,২৯৫
	৪.কাজী আলাউদ্দিন এস্টেট (Kazi Alauddin Estate)	৭৩,৫৯৩
	৫. ভাওয়াল রাজ এস্টেট (Bhawal Raj Estate)	৭,৯১,৮২১
	৬. বাংলাবাজার এস্টেট (Bangla Bazar Estate)	৯৬৪
	৭. রওয়ালী এস্টেট (Rowali Estate)	৭২,২৭২
	৮. স্বর্ণময়ী এস্টেট (Swarnomayee Estate)•	২৭,৯১৯
	৯. সুত্রাপুর এস্টেট (Sutrapur Estate)	৭১,৩০৯
	১০. শ্রীনগর এস্টেট (Sreenagar Estate)	২৬,১৭৬
	১১. এস. এম. বৃন্দা রাণী এস্টেট (S. M. Brinda Rani Estate)•	২৯,৬৪৫
	১২. রূপাল এস্টেট (Ruplal Estate)	৭৬,৬০৯
	১৩. রামনাথ দাশ এস্টেট (Ramanath Das Estate)	৮৯,৮৬১
ময়মনসিংহ	১৪. হায়বাতনগর এস্টেট (Hybatnagar Estate)	১,৩৪,০৬৫
	১৫. রাম গোপাল বড় তরফ, মধ্য তরফ, নাতারফ, ছোট ও যৌথ এস্টেট (Ramgopal Barataraf, Madhyam Taraf, Nataraf, Chhota and Exmali Estate)	৩,৮৫,৬৯৯
	১৬. আচার্স্ব চৌধুরী ২ নং এস্টেট (Acharjee Chaudhury Estate No. II)	৩১,৯৬২
	১৭. আচার্স্ব চৌধুরী ৩ নং এস্টেট (Acharjee Chaudhury Estate No. III)	৩১,৮০৮
	১৮. শেরপুর ১ নং এস্টেট (Sherpur Estate No. I)	৩২,৬৭২
	১৯. শেরপুর ২ নং এস্টেট (Sherpur Estate No. II)	১,৫৭,৯৮৩
	২০. শেরপুর ৩ নং এস্টেট (Sherpur Estate No. III)	১,৪৪,৭৪১
	২১. সন্তোষ ১ নং এস্টেট (Santosh Estate No. I)	১,০৮,৮১১
	২২. সন্তোষ ২ নং এস্টেট (Santosh Estate No. II)	১,০৭,৬৩৬
	২৩. গয়হাট্টা এস্টেট (Goyhatta Estate)	৪০,১৩৭
	২৪. আমবাড়িয়া এস্টেট (Ambaria Estate)	৩,২৩,১৮৮
	২৫. সুসাং বারতাহাবিল এস্টেট (Shusang Baratahabil Estate)	১,৭৫,০০০
	২৬. নারায়ণধর ১ নং এস্টেট (Narayandhar Estate No. I)	২৪,৩২০
	২৭. নারায়ণধর ২ নং এস্টেট (Narayandhar Estate No. II)	১২,২৬০
	২৮. দূর্গাপুর এস্টেট (Durgapur Estate)	১৮,৯০০
	২৯. ঘাগরা এস্টেট (Ghagra Estate)	৬,৪৮০
ফরিদপুর	৩০. হবিগঞ্জ এস্টেট (Habiganj Estate)	৭৯,৫৪৮
	৩১. রাজিয়া বেগম ও অন্যান্য এস্টেট (Razia Begum and others Estate)•	১৩,৪৭৮
বাকেরগঞ্জ	৩২. মেসার্স লুকাস এস্টেট (Mrs. Lucus Harney Estate)*	১১,২৯৭

বাকেরগঞ্জ	৩৩. মেসার্স এইচ. এ. লুকাস এস্টেট (Mrs. H. A. Lucus Estate)*	২৫,২৯০
	৩৪. শ্রীমতি এ. কে. দেবী এস্টেট (Sm. A. K. Debi Estate)•	৩০,৫৪১
	৩৫. বি. এল রায় ও অন্যান্য এস্টেট (B. L. Roy and others Estate)	৩২,৭৪৬
	৩৬. এস. পি. ঘোষাল এস্টেট (S. P. Ghosal Estate)	৫৬,১২৯
	৩৭. এস. বি ঘোষাল এস্টেট (S. B. Ghosal Estate)	৩১,৬৪৭
	৩৮. এস. ঘোষাল এস্টেট (S. Ghosal Estate)	৪৭,০১৬
	৩৯. এস. এস. ঘোষাল এস্টেট (S. S. Ghosal Estate)	৭৬,৫২৮
	৪০. আর. এন. দত্ত এস্টেট (R. N. Dutta Estate)	৫১,৫৯৪
	৪১. মেসার্স এম. টি. ব্রাউন এস্টেট (Mrs. M. T. Brown Estate)*	১,৪১,৪৭১
	৪২. বাবু আর. কে. রায় ও অন্যান্য এস্টেট (Babu R. K. Roy and others Estate)	২,১০,৬৯০
	৪৩. ডি. সি. রায় ও অন্যান্য এস্টেট (D. C. Roy and others Estate)	
চট্টগ্রাম	৪৪. খাঁন সাহেব মজাফফর আহমেদ চৌধুরী এস্টেট (Khan Sahib Mazaffar Ahmed Chaudhury Estate)	৩৪,৫৬১
	৪৫. নোয়াপাড়া এস্টেট (Noapara Estate)	২,৮৭৬
	৪৬. এল. কে. সেন এস্টেট (L. K. Sen Estate)	৩,৯৬৪
	৪৭. মোসাম্মৎ করিমুন্নেসা বেগম এস্টেট (Mt. Karimunnessa Begum Estate)•	৬২,৬৩৫
	৪৮. জে. এম. সেন গুপ্ত এস্টেট (J. M. Sen Gupta Estate)	৫,০৬৯
	৪৯. জে. সি. রায় এস্টেট (J. C. Roy Estate)	৫৬,৯০৫
	৫০. পাদুয়া গুপ্ত এস্টেট (Padua Gupta Estate)	৫০,৬০৪
ত্রিপুরা	৫১. দে-লাউনী এস্টেট (De-Launey Estate)*	১,০৬,০৩১
	৫২. কুমিল্লা নবাব এস্টেট (Comilla Nawab Estate)	১,৫৩,৪৭৬
	৫৩. সাচর এস্টেট (Sachar Estate)	১৮,৫৮৮
	৫৪. বদরুন্নেসা এস্টেট (Badrunnessa Estate)•	১,৩২,৪৯০
নোয়াখালী	৫৫. ভুলুয়া ৫ আনা এস্টেট (Bhulua 5 annas Estate)	১,৪২,২৮৪
	৫৬. শায়েস্তানগর ১২ আনা এস্টেট (Shaistanagar 12 annas Estate)	৫৫,৯৩২
রাজশাহী	৫৭. মহাদেবপুর ১ নং এস্টেট (Mahadebpur Estate No. I)	২৬,১৮৯
	৫৮. মহাদেবপুর ২ নং এস্টেট (Mahadebpur Estate No. II)	২৪,০২৬
	৫৯. বলিহার এস্টেট (Balihar Estate)	৩,২৪,৬৭১
	৬০. আশরাফ এস্টেট (Ashraf Estate)	৫৪,০৪৭
	৬১. মালঞ্চি এস্টেট (Malanchi Estate)	১৮,৮৯৫
	৬২. চৌগ্রাম এস্টেট (Chowgram Estate)	১,৭৩,৩৬৮
	৬৩. পুটিয়া ৪ আনা এস্টেট (Puthia 4 annas Estate)	৩,৯২,৭৬৭
রংপুর	৬৪. পায়দা এস্টেট (Payda Estate)	৫২,৭৭৯
	৬৫. মহিপুর এস্টেট (Mohipur Estate)	১৮,২২১
	৬৬. কমরপুর এস্টেট (Camarpur Estate)	১২,৪৬৫
	৬৭. বর্ধন কুটি এস্টেট (Bhardhan Kuti Estate)	৬১,৩১৬
	৬৮. কাকিনা এস্টেট (Kakina Estate)	৩,০১,০৭২
	৬৯. তুষভান্ডার এস্টেট (Tushbhandar Estate)	৮৯,০৯৯
	৭০. তাজহাট এস্টেট (Tajhat Estate)	২,৯৭,৩৭৬
দিনাজপুর	৭১. জানবাজার ২ নং এস্টেট (Janbazar Estate No. II)	১,১৬,৬৮২
	৭২. আর. আই. পি. এন. দেববর্মণ বাহাদুর এস্টেট (R. I. P. N. Deb Barma Bahadur Estate)	৩,৩২,০১০
	৭৩. এস. এন. রায় এস্টেট (S. N. Roy Estate)	
	৭৪. ইন্দু নলিনী দেবী এস্টেট (Indu Nalini Debi Estate)•	
পাবনা	৭৫. মুরাপাড়া বড় তরফ এস্টেট (Murapara Barataraf Estate)	১,০২,১১১
	৭৬. মুরাপাড়া মেজ তরফ ১ নং এস্টেট (Murapara Mejotaraf Estate No. I)	৮৫,৫২১
	৭৭. মুরাপাড়া মেজ তরফ ২ নং এস্টেট (Murapara Mejotaraf Estate No. II)	৯৩,৫৬৯
	৭৮. মুরাপাড়া ছোট তরফ এস্টেট (Murapara Chhotataraf Estate)	২৯,৩৭১
	৭৯. ঠাকুর এস্টেট (Tagore Estate)	১,৪১,৬৭৯
	৮০. তাড়াশ এস্টেট (Tarash Estate)	৩,৯৩,২৯৩
যশোর	৮১. পাইকপাড়া এস্টেট (Paikpara Estate)	৩,০৩,৯০৮
খুলনা	৮২. খাড়ারিয়া এস্টেটস (Kհararia Estates)	৯৯,৩৯২
	৮৩. ভবানীপুর বড় তহবিল এস্টেট (Bhowanipur Baratahabil Estate)	১,০৬,৭৩২
	৮৪. ভবানীপুর ছোট তহবিল এস্টেট (Bhowanipur Chhotataraf Estate)	২৩,০০০
	৮৫. তাকি এস্টেট (Taki Estate)	১,২৮,৯৯২

* ইউরোপিয়ান স্বত্বাধিকারী

• নারী স্বত্বাধিকারী

উৎস : *Assembly Proceedings*, Vol. IX- No. 2, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Ninth Session, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 28th, 29th, 30th, 31st October and 1st November, 1952 (Dacca : East Bengal Government Press, 1954), pp. 343-347.

সারণি ২৪

১৯৪৯-৫০ সালে ত্রিপুরা জেলায় সরকারের ক্রয়কৃত ১৮৩টি এস্টেট

বিক্রির তারিখ	সরকারের ক্রয়কৃত এস্টেটস	বকেয়া রাস্তা ও পি.ডব্লিউ সেস			বকেয়া শিক্ষা সেস		
		টাকা	আনা	পয়সা	টাকা	আনা	পয়সা
২৫-৬-১৯৪৯	১১	৭৭৫	১	১০	৮২৩	৮	৩
২৬-৬-১৯৪৯	১৫	৭,২৪৬	১	৫	৯,১৯১	৮	৭
১০-১-১৯৫০	১২	৭,৯২৬	৩	৩	৮,৮৬১	১৫	৯
১১-১-১৯৫০	৪৩	১১,৬৪১	৬	০	১১,৯৫২	১১	৬
২৫-৩-১৯৫০	৪৯	৩,০৭৬	৫	২	৫,১২৪	৯	১
২৭-৩-১৯৫০	৫৩	৩,৬৫৪	১২	১১	৪,৮৮১	৬	১১

উৎস : *Assembly Proceedings*, Vol. VI, No. 2, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Sixth Session, 1951, 30th, 31st October, 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th, 8th, 9th, 10th and 12th November, 1951 (Dacca : East Bengal Government Press, 1953), p. 33.

সারণি ২৫

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ মামলা শুনানীর জন্য আইনজীবীদের সরকারি রাজস্ব থেকে অর্থ প্রদান

আইনজীবীদের নাম	ফি
ডি. এন. প্রীট, কিউ.সি (D. N. Pritt, Q.C)	৩৯,৯৩৮
এ. কে. ব্রোহী (A. K. Brohi)	৪২,০০০ (including fees for a junior)
এ. কে. এম. বাকের (A. K. M. Baker)	নির্ধারিত হয়নি (Not yet settled)
এম. আসির (M. Asir)	২,৭৫০
এস. আর. পাল (S. R. Pal)	১,১০০
এম. আব্দুল্লাহ (M. Abdullah)	১,১০০
মীর্জ গোলাম হাফিজ (Mirza Gholam Hafez)	১,১০০
এ. গনি (A. Gani)	১,১০০
আসরারুল হোসাইন (Asrarul Husain)	১,০০০
মোট	৯০,১৮৮

উৎস : *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XV, No. 3, Third Session, 1956, The 28th September to 2nd October, 1956 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1957), pp. 244-246.

সারণি ২৬

১৯৫৬-৫৭ সালে অধিগ্রহণকৃত জমিদারি এস্টেটের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দকৃত সরকারি অনুদানের পরিমাণ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অধিগ্রহণকৃত এস্টেট	মাসিক ভাতার পরিমাণ	সময়	অনুমোদিত মোট টাকার পরিমাণ
১. ভাদুন এইচ.ই স্কুল	ভাওয়াল স্টেট	২০ টাকা	সেপ্টেম্বর '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ৬ মাস	১২০ টাকা
২. কাপাসিয়া এইচ.ই স্কুল	ভাওয়াল স্টেট	৭৫ টাকা	সেপ্টেম্বর '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ৬ মাস	৪৫০ টাকা
৩. সারাজুবালা গার্লর্স স্কুল	ভাওয়াল স্টেট	৫ টাকা	মার্চ '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ১২ মাস	৬০ টাকা
৪. চন্দনা জুনিয়র মাদ্রাসা	ভাওয়াল স্টেট	৫ টাকা	মার্চ '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ১২ মাস	৬০ টাকা
৫. কামারিয়া ওল্ড স্কীম জুনিয়র মাদ্রাসা	ভাওয়াল স্টেট	৫ টাকা	সেপ্টেম্বর '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ৬ মাস	৬০ টাকা
৬. আর.এম.এইচ.ই স্কুল	ভাওয়াল স্টেট	৫ টাকা	সেপ্টেম্বর '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ৬ মাস	৬০ টাকা
৭. শ্রীপুর এইচ.ই স্কুল	ভাওয়াল স্টেট	১০ টাকা	মার্চ '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ১২ মাস	১২০ টাকা
৮.বারিয়া প্রাইমারী গার্লর্স স্কুল	ভাওয়াল স্টেট	১০ টাকা	সেপ্টেম্বর '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ৬ মাস	৬০ টাকা
৯. দুর্বাতি ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা	ভাওয়াল স্টেট	১০ টাকা	সেপ্টেম্বর '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ৬ মাস	৬০ টাকা
১০. খিরাতি জে.এম জুনিয়র মাদ্রাসা	ভাওয়াল স্টেট	১০ টাকা	সেপ্টেম্বর '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ৬ মাস	৬০ টাকা
১১. ইসারকান্দি এইচ.ই স্কুল	ভাওয়াল স্টেট	১০ টাকা	সেপ্টেম্বর '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ৬ মাস	৬০ টাকা
১২. আরালিয়া কেরামাতিয়া জুনিয়র মাদ্রাসা	ভাওয়াল স্টেট	৩ টাকা	সেপ্টেম্বর '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ৬ মাস	১৮ টাকা
১৩. আড়িয়াল জুনিয়র মাদ্রাসা	ভাওয়াল স্টেট	৫ টাকা	সেপ্টেম্বর '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ৬ মাস	৩০ টাকা
১৪. বড়ছাপা এইচ.ই স্কুল	ভাওয়াল স্টেট	১৩ টাকা	সেপ্টেম্বর '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ৬ মাস	৭৮ টাকা
১৫. পাশী গার্লর্স স্কুল	ভাওয়াল স্টেট	৫ টাকা	ডিসেম্বর '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ৩ মাস	১৫ টাকা
১৬. বিন্নাবাইদ জুনিয়র মাদ্রাসা	ভাওয়াল স্টেট	১০ টাকা	মার্চ '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ১২ মাস	১২০ টাকা
১৭. দুলালপুর এইচ.ই স্কুল	ভাওয়াল স্টেট	১০ টাকা	মার্চ '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ১২ মাস	১২০ টাকা
১৮. রহিতপুর ফিশারী স্কুল	ভাওয়াল স্টেট	৫ টাকা	সেপ্টেম্বর '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ৬ মাস	৩০ টাকা
১৯. হযরতপুর কে.এম.এইচ.ই স্কুল	ভাওয়াল স্টেট	৩৫ টাকা	সেপ্টেম্বর '৫৬ থেকে ফেব্রুয়ারি '৫৭ = ৬ মাস	২১০ টাকা
২০. হযরতপুর কে.এম.এইচ.ই স্কুল	বাংলাবাজার স্টেট	৫০ টাকা বার্ষিক	১৯৫৬-৫৭, বার্ষিক	৫০ টাকা
২১. রূপগঞ্জ জে.সি চ্যারিটেবল ডিস্পেনসারী	মুরাপাড়া স্টেট	-	ফেব্রুয়ারি '৫৭	২০০ টাকা
সর্বমোট				২০৪১ টাকা

সূত্র : File No. 18S-1/58, Bundle No. 237, BNA Serial No. 224.

সারণি ২৭

১৯৫১ সালের ঢাকা জেলা জুরি বোর্ডের বিশেষ ও সাধারণ সদস্য তালিকা, ঢাকা দেওয়ানি আদালত, ১৯৫১

পেশা ভিত্তিক বন্টন	সদস্য
জোতদার (Jotdar)*	১৮৭
তালুকদার (Takukdar)*	২৪৫
জমিদার (Zamindar)	২৭
বণিক-ব্যবসায়ী (Merchant and Business man)	৮৮
কলেজ শিক্ষক (Teacher, College)	১৯
হাইস্কুল শিক্ষক (Teacher, High School)	১৮৩
প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক (Teacher, primary School)	১২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক (Teacher, Dacca University)	৪
ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি (President, Union Board)	৮১
ইউনিয়ন সহ-সভাপতি (Vice-president, Union Board)	২২
ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য (Member, Union Board)	১৭০
ভূস্বামী (Landlord)	৩
ভূম্যধিকারী (Land-holder)	১২
ভূমির মালিক (Landowner)	১
পরোহিত (Priest)	১

মাদ্রাসা শিক্ষক (Teacher, Madrasha)	১৭
নায়েব (Naib)	২
অন্যান্য (Others)	৯৭
সর্বমোট সদস্য সংখ্যা	১১৭১ জন

* জোতদার পদাধিকারী ছিলেন ১৮৭ জন এবং তালুকদার পদাধিকারী ছিলেন ২৪৫ জন। যেহেতু তালুকদাররাও জোতদার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাই মোট জোতদারের সংখ্যা ছিল ৪৩২ জন।

দ্রষ্টব্য : উপরিউক্ত সারণিতে জোতদার ৪৩২ জন, জমিদার ২৭ জন, ভূম্যধিকারী ১২ জন, ভূস্বামী ৩ জন এবং ভূমির মালিক ১ জন অর্থাৎ মোট ৪৭৫ জন ভূমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জুরিবোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯৫১ সালে ঢাকা জেলার জুরি বোর্ডের সর্বমোট ১১৭১ জন সদস্যের মধ্যে সরাসরি ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট সদস্য ছিলেন ৪৭৫ জন বা ৪০.৪৬%। ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের পেশাভিত্তিক বন্টন ছিল নিম্নরূপ :

জমিদার	ভূম্যধিকারী	তালুকদার	জোতদার
৬ জন জমিদার ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন	১ জন ভূম্যধিকারী হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন	৯ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন	৮ জন জোতদার ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন
১ জন জমিদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ছিলেন	১ জন ভূম্যধিকারী শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৫১ সালে ঢাকা জেলার জুরি বোর্ডের সর্বমোট ১১৭১ জন সদস্যের মধ্যে ১২ ছিলেন ভূম্যধিকারী সদস্য। এই ১২ ভূম্যধিকারীর মধ্যে ১ জন বা ৮.৩৩% ভূম্যধিকারী অন্য পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।	১ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও মহাজনি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন	৪ জন জোতাদার ইউনিয়ন বোর্ডের সহ-সভাপতি ছিলেন
১ জন জমিদার ব্যবসায়ী ছিলেন		২ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের সহ-সভাপতি ছিলেন	২৩ জন জোতাদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ছিলেন
৮ জন জমিদার ইউনিয়ন বোর্ড ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৫১ সালে ঢাকা জেলার জুরি বোর্ডের সর্বমোট ১১৭১ জন সদস্যের মধ্যে ২৭ ছিলেন জমিদার সদস্য। এই ২৭ জমিদারের মধ্যে ৮ জন বা ২৯.৬৩% জমিদার অন্যান্য কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন।		১ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের সহ-সভাপতি ও সদর লোকাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন	১ জন জোতাদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও ব্যবসায়ী ছিলেন
		৪০ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ছিলেন	১ জন জোতাদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও ঋণ সালিশি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন
		২ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও ঋণ সালিশি বোর্ডের সদস্য ছিলেন	১ জন জোতাদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও ঋণ সালিশি বোর্ডের সদস্য ছিলেন
		৪ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও ব্যবসায়ী ছিলেন	১ জন জোতাদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন
		৩ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন	৩ জন জোতাদার হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন
		৭ জন তালুকদার ব্যবসায়ী ছিলেন	১ জন জোতাদার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন
		৩ জন তালুকদার ঋণ সালিশি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন	১ জন জোতাদার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন
		৪ জন তালুকদার ঋণ সালিশি বোর্ডের সদস্য ছিলেন	১ জন জোতাদার ঋণ সালিশি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন
		২ জন তালুকদার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন	২ জন জোতাদার ঋণ সালিশি বোর্ডের সদস্য ছিলেন
		৪ জন তালুকদার হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন	২ জন জোতাদার কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তহশিলদার ছিলেন
		১ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ড জুট কমিটির সদস্য ছিলেন	১ জন জোতাদার মহাজন বা কুসীদজীবী ছিলেন
		১ জন তালুকদার ঋণ সালিশি বোর্ডের সভাপতি এবং নরসিংদী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কাচারীর নায়েব ছিলেন	১ জন জোতাদার হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন

		৪ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন	১ জন জোতাদার ব্যবসায়ী ছিলেন
		১ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি ও ঋণ সালিশি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন	১ জন জোতাদার চিকিৎসক ছিলেন
		১ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য ছিলেন	১ জন জোতাদার হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক ছিলেন
		১ জন তালুকদার গণপূর্ত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মহাকুমা কর্মকর্তা ছিলেন	মোট ৫৩ জন জোতদার অন্যান্য পদ বা পেশায় নিয়ুক্ত ছিলেন। ১৯৫১ সালে ঢাকা জেলার জুরি বোর্ডের সর্বমোট ১১৭১ জন সদস্যের মধ্যে ১৮৭ ছিলেন জোতদার সদস্য। এই ১৮৭ জোতদারের মধ্যে ৫৩ জন বা ২৮.৩৪% জোতদার অন্যান্য কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন।
		মোট ৯১ জন তালুকদার অন্যান্য পদ বা পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫১ সালে ঢাকা জেলার জুরি বোর্ডের সর্বমোট ১১৭১ জন সদস্যের মধ্যে ২৪৫ ছিলেন তালুকদার সদস্য। এই ২৪৫ তালুকদারের মধ্যে ৯১ জন বা ৩৭.১৪% তালুকদার অন্যান্য কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন।	

উৎস : *Jury List for the year 1950 in the District of Dacca*, Appendix-List of special and common jurors, The Dacca Gazette, April 12, 1951.

সারণি ২৮
১৯৫৩ সালে ঢাকা জেলার জুরি বোর্ডের বিশেষ ও সাধারণ সদস্য তালিকা, ঢাকা দেওয়ানি আদালত, ১৯৫৩

পেশা ভিত্তিক বন্টন	সদস্য
জোতদার (Jotdar)	৪১৬
তালুকদার (Takukdar)	২১১
জমিদার (Zamindar)	২২
বণিক-ব্যবসায়ী (Merchant and Business man)	৯৯
কলেজ শিক্ষক (Teacher, College)	১১
হাইস্কুল শিক্ষক (Teacher, High School)	১৮৩
প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক (Teacher, primary School)	৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক (Teacher, Dacca University)	৩
ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি (President, Union Board)	১০৪
ইউনিয়ন সহ-সভাপতি (Vice-president, Union Board)	২০
ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য (Member, Union Board)	১৭৩
ভূম্যধিকারী (Land-holder)	১৩
ভূস্বামী (Landlord)	১০
পরোহিত (Priest)	১
মাদ্রাসা শিক্ষক (Teacher, Madrasha)	৭
অন্যান্য (Others)	৭৫
সর্বমোট সদস্য সংখ্যা	১১৪৬

* জোতদার পদাধিকারী ছিলেন ২০৫ জন এবং তালুকদার পদাধিকারী ছিলেন ২১১ জন। যেহেতু তালুকদাররাও জোতদার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাই মোট জোতদারের সংখ্যা ছিল ৪১৬ জন।

দ্রষ্টব্য : উপরিউক্ত সারণিতে দেখা যায় যে, জোতদার ২০৫ জন, তালুকদার ২১১ জন, জমিদার ২২ জন, ভূম্যধিকারী ১৩ জন এবং ভূস্বামী ১০ জন ভূমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জুরিবোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা জেলার জুরি বোর্ডের সর্বমোট ১১৪৬ জন সদস্যের মধ্যে সরাসরি ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট সদস্য ছিলেন ৪৬১ জন বা ৪০.২৩%। ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের পেশাভিত্তিক বন্টন ছিল নিম্নরূপ :

জমিদার	তালুকদার	জোতদার
৫ জন জমিদার ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন	১২ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন	৭ জন জোতদার ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন
২ জন জমিদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ছিলেন	৩ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের সহ-সভাপতি ছিলেন	১ জন জোতাদার ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি এবং ঋণ সালিশি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন
৭ জন জমিদার ইউনিয়ন বোর্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা জেলার জুরি বোর্ডের সর্বমোট ১১৪৬ জন সদস্যের মধ্যে ২২ ছিলেন জমিদার সদস্য। এই ২২ জমিদারের মধ্যে ৭ জন বা ৩১.৮২% জমিদার ইউনিয়ন বোর্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।	১ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের সহ-সভাপতি এবং সদর লোকাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন	৩ জন জোতদার ইউনিয়ন বোর্ডের সহ-সভাপতি ছিলেন
	৩৬ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ছিলেন	২১ জন জোতদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ছিলেন
	২ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য এবং ব্যবসায়ী ছিলেন	১ জন জোতদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও ব্যবসায়ী ছিলেন
	৩ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য এবং হাইস্কলের শিক্ষক ছিলেন	১ জন জোতদার ঋণ সালিশি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন
	৫ জন তালুকদার ব্যবসায়ী ছিলেন	২ জন জোতদার ঋণ সালিশি বোর্ডের সদস্য ছিলেন
	৩ জন তালুকদার হাইস্কলের শিক্ষক ছিলেন	১ জন জোতদার ব্যবসায়ী ছিলেন
	৪ জন তালুকদার ঋণ সালিশি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন	১ জন জোতদার ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন
	১ জন তালুকদার ঋণ সালিশি বোর্ডের সভাপতি এবং নরসিংদী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কাচারীর নায়েব ছিলেন	১ জন জোতদার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন
	৩ জন তালুকদার ঋন সালিশি বোর্ডের সদস্য ছিলেন	১ জন জোতদার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন
	১ জন তালুকদার গণপূর্ত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মহাকুমা কর্মকর্তা ছিলেন	১ জন জোতদার হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন
	১ জন তালুকদার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন	১ জন জোতদার হাইস্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন
	১ জন তালুকদার ইউনিয়ন বোর্ড জুট কমিটির সদস্য ছিলেন	১ জন জোতদার কোর্ট ওয়ার্ডসের তহশিলদার ছিলেন
	মোট ৭৬ জন তালুকদার অন্যান্য পদ বা পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা জেলার জুরি বোর্ডের সর্বমোট ১১৪৬ জন সদস্যের মধ্যে ২১১ ছিলেন তালুকদার সদস্য। এই ২১১ তালুকদারের মধ্যে ৭৬ জন বা ৩৬.০২% তালুকদার অন্যান্য কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন।	১ জন জোতদার মহাজন বা কুসীদজীবী ছিলেন
		মোট ৪৪ জন জোতদার অন্যান্য পদ বা পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা জেলার জুরি বোর্ডের সর্বমোট ১১৪৬ জন সদস্যের মধ্যে ২০৫ ছিলেন জোতদার সদস্য। এই ২০৫ জোতদারের মধ্যে ৪৪ জন বা ২১.৪৬% জোতদার অন্যান্য কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন।

উৎস : *Jury List for the year 1953 in the District of Dacca*, Appendix- List of Special and Common Jurors, The Dacca Gazette, July 16, 1953.

সারণি ২৯
১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের ফলাফল

দল/স্বতন্ত্র	আসন
ক. ২৩৭টি মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত আসন	
যুক্তফ্রন্ট	২২৩
মুসলিম লীগ	১০
খেলাফতে রব্বানী	১
স্বতন্ত্র	৩
মোট	২৩৭
খ. ৭২টি হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত আসন	
কংগ্রেস	২৪
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	১০
তফসিলি জাতি ফেডারেশনের (রসরাজ মণ্ডল গ্রুপ)	২৭
কমিউনিস্ট	৪
গণতন্ত্রী দল	৩
বৌদ্ধ	২
খ্রিস্টান	১
স্বতন্ত্র	১
মোট	৭২
সর্বমোট	৩০৯

উৎস : হোসেন ও করিম, "*১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার*", পৃ. ৭২।

সারণি ৩০
১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের অবস্থান

নির্বাচনী এলাকা	মুসলিম লীগ			যুক্তফ্রন্ট		ভোটের ব্যবধান
	প্রার্থীর পদ-মর্যাদা	প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট	প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট	
১. মোমেনশাহী সদর দক্ষিণ-পূর্ব	পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী	নূরুল আমিন	১১,৪৭৯	খালেক নওয়াজ	১৮,০৮৬	৬,৬০৭
২. দিনাজপুর সদর পশ্চিম	প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী	হাসান আলী	৭,১৩৩	ফজলে হক	২০,৯২৫	১৩,৭৯২
৩. উত্তর সিলেট মধ্য-পশ্চিম	প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী	আবদুল হামিদ	জানা যায়নি	মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ	জানা যায়নি	১৫,৭২৪
৪. পিরোজপুর পশ্চিম	প্রাক্তন সরবরাহ মন্ত্রী	সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল	৩,৯৭৩	এ কে ফজলুল হক	১৬,০৯১	১২,১১৮
৫. ত্রিপুরা সদর মধ্য-উত্তর	প্রাক্তন মোহাজের পুনর্বাসন মন্ত্রী	মফিজউদ্দীন আহমদ	১০,৬৮০	মোজাফফর আহমদ	১৫,৬৯৮	৫,০১৮
৬. নারায়ণগঞ্জ উত্তর-পূর্ব	প্রাক্তন বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প মন্ত্রী	সৈয়দ আব্দুস সলিম	২,৪৪৭ (জামানত বাজেয়াপ্ত)	আফতাব উদ্দীন ভূইয়া	২৩,৫১৪	২১,০৬৭
৭. ফরিদপুর উত্তর-পূর্ব	প্রাক্তন সমবায় ও রিলিফ মন্ত্রী	দ্বারকানাথ বারৈই	১,৯৪৯ (জামানত বাজেয়াপ্ত)	গৌরচন্দ্র পাল	১৬,৮৬৪	১৪,৯১৫
৮. জামালপুর উত্তর-পশ্চিম	প্রাদেশিক আইন পরিষদের প্রাক্তন স্পীকার	আবদুল করিম	৩,৬৯০	রফিকউদ্দীন আহমদ	১৩,৩৭৩	৯,৬৮৩
৯. জামালপুর মধ্য	প্রাক্তন চীফ হুইফ	ফজলুর রহমান	৬,০৫৮	খোন্দকার আব্দুল হামিদ	২১,৫০৪	১৫,৪৪৬
১০. ঢাকা সদর উত্তর-পূর্ব	পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী	ফকির আব্দুল মান্নান	৫,৯৭৯	তাজুদ্দীন আহমেদ	১৯,০৩৯	১৩,০৬০
১১. খুলনা মধ্য-পশ্চিম	পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক	আব্দুস সবুর খান	৭,৭৮৩	আব্দুল গণি খান	১৪,১৬২	৬,৩৭৯
১২. টাঙ্গাইল উত্তর-পূর্ব	কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের সভাপতি ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর চাচা	সৈয়দ হাসান আলী	১১,২৩৮	চৌধুরী আজহারুল এছলাম	১৩,১৯৬	১,৯৫৮

উৎস : হোসেন ও করিম, "*১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার*", পৃ. ৭৪।

সারণি ৩১
নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের পেশাগত অবস্থান (শতকরা হার)

পেশা	সদস্য					চেয়ারম্যান
	১৯৫৭	১৯৫৯	১৯৬১	১৯৬৪	১৯৬৬	১৯৬৬
কৃষক	৭২.৩২	৮২.৪৬	৮২.৪৬	৭৭.৭৮	৭৭.৭৮	৭০.৩৫
ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারী	১০.৭৬	১৫.৬০	১৫.৬০	১৬.৯৬	১৬.৯৬	২৩.৯৭
আইনজীবী, শিক্ষক, ডাক্তার	১০.১০	০.৬৫	০.৬৫	২.৭৮	২.৭৮	৪.৩৬
অন্যান্য	১.৮২	১.২৯	১.২০	২.৪৮	২.৪৮	১.৩২

উৎস : Sobhan, *Basic Democracies*, p. 82; Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, p. 37.

সারণি ৩২
মৌলিক গণতন্ত্রীদের অধীনে জমির পরিমাণ (১৯৬০-৬৫)

মালিকানাস্বত্ব (একর)	সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে	১২৯ ইউনিয়ন কাউন্সিলের মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য (%)	
০.৫ একরের নিচে	১৩.০	-	-
০.৫ একর হতে ১ একরের নিচে	১১.০	-	-
১ একর হতে ২.৫ একরের নিচে	২৭.০	২.২৯	১৫.৫৫
২.৫ একর হতে ৫ একরের নিচে	২৬.০	১৩.২৬	
৫ একর হতে ৭.৫ একরের নিচে	১২.০	২১.১৭	৪১.৫৮
৭.৫ একর হতে ১২.৫ একরের নিচে	৭.০	২০.৪১	
১২.৫ একর হতে ২৫ একরের নিচে	৩.০	২৩.৪৭	৪২.৪০
২৫ একর হতে ৪০ একরের নিচে	-	১২.৫	
৪০ একর এবং উপরে	-	৬.৮৮	

উৎস : Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, p. 43.

সারণি ৩৩
ইউনিয়ন বোর্ড ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের আর্থিক অবস্থান (শতকরা হার)

আর্থিক অবস্থান (টাকা)	১৯৫৭ (১২৯ ইউনিয়ন বোর্ড)	১৯৬১ (১২৯ ইউনিয়ন কাউন্সিল)	১৯৬৬
বার্ষিক আয় ১০০০ টাকার নিচে	৩.৭৩	১.৮৮	১০.১৯
বার্ষিক আয় ১০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ২০০০ টাকার নিচে	১৫.৭৩	১২.৭৬	২১.২৪
বার্ষিক আয় ২০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ৩০০০ টাকার নিচে	২৬.৬৫	২৪.০৩	২১.৩৫
বার্ষিক আয় ৪০০০ টাকা এবং তার উপরে	৩৪.৮৫	৩৮.৭৮	৩০.৪৪

উৎস : Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, p. 40.

সারণি ৩৪
ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের আর্থিক অবস্থান

চেয়ারম্যানের সংখ্যা	বার্ষিক আয় ১০০০ টাকার নিচে	বার্ষিক আয় ১০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ২০০০ টাকার নিচে	বার্ষিক আয় ২০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ৩০০০ টাকার নিচে	বার্ষিক আয় ৩০০০ টাকা এবং তার উপরে কিন্তু ৪০০০ টাকার নিচে	বার্ষিক আয় ৪০০০ টাকা এবং তার উপরে
৮৪ জন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান (১৯৬১ সালে কুমিল্লা একাডেমিতে উপস্থিত চেয়ারম্যানদের উপর জরিপকৃত)	৭৬.৯০	১২.২০	৭.৩০	১.২০	২.৪০
৩,৬৭৫ জন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান (১৯৬৫ সালে নির্বাচিত)	২.১৮	৭.৫১	১৪.২৮	১৪.৯১	৬১.১২

উৎস : Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, p. 41.

সারণি ৩৫
ইউনিয়ন বোর্ড ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের শিক্ষাগত অবস্থান (শতকরা হার)

শিক্ষাগত অবস্থান	১৯৫৭ (১২৯ ইউনিয়ন বোর্ডের উপর জরিপকৃত)	১৯৫৯ (২১৪ ইউনিয়ন কাউন্সিলের উপর জরিপকৃত)	১৯৬১ (১২৯ ইউনিয়ন কাউন্সিলের উপর জরিপকৃত)	১৯৬৪ (২১৪ ইউনিয়ন কাউন্সিলের উপর জরিপকৃত)	১৯৬৬ (১২৯ ইউনিয়ন কাউন্সিলের উপর জরিপকৃত)
নিরক্ষর	৫.৭৯	২.২	৫.৫৮	১.০৮	১.০৮
প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত	৩৬.৭৫	৮৭.২৪	৩৩.৩২	৮২.৩৩	৮২.২৩
মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত	৪৪.৬২		৪৬.৯২		
ম্যাট্রিকুলেশন এবং উপরে	১২.৮৪	১০.৭৪	১৪.১৮	১৬.৫৯	১৬.৫৯

উৎস : Sobhan, *Basic Democracies*, p. 80; Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, p. 34.

সারণি ৩৬
ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের শিক্ষাগত অবস্থান (শতকরা হার)

বছর	নিরক্ষর	প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত	ম্যাট্রিকুলেশনসহ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত	কলেজ শিক্ষা পর্যন্ত	স্নাতক
১৯৬১ (৮৪ জন চেয়ারম্যানের উপর জরিপকৃত)	-	১৩.৪০	৬৭.১০	১২.২০	৭.৩০
১৯৬৫ সালে নির্বাচিত চেয়ারম্যানবৃন্দ	০.৩৯	৯.৪৮	৭৮.৯০	৫.১৯	৬.০৪

উৎস : Rashiduzzaman, *Politics and Administration in the Local Council*, p. 35.

সারণি ৩৭

জেলাভিত্তিক সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান হতে ধান-চাল সংগ্রহ, ১৯৬৬

(মণ-সের-ছটাক হিসেবে)

জেলার নাম	ক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা	বাধ্যতামূলক লেভি সংগ্রহের পরিমাণ		
		মণ	সের	ছটাক
১. ঢাকা	২৩	৩০,১৪৭	২৬	০
২. ময়মনসিংহ	৪৬	৪,০০,৬২২	১১	৮
৩. ফরিদপুর	১৭	২৭,৫৯৯	২৫	০
৪. চট্টগ্রাম	১৫	৩১,৪৩৭	০	০
৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম	৯	২৬,১৬৭	২৮	০
৬. নোয়াখালী	১৯	১,০১,৭৬৪	১৮	০
৭. কুমিল্লা	২৩	৬৯,২৩২	২৩	০
৮. সিলেট	৩৮	৩,৮০,৮২৪	০	০
৯. যশোর	১৯	১৭,১৪১	০	০
১০. খুলনা	২৬	৩,৯২,০৭৫	৩৯	০
১১. বরিশাল	৩৪	২,৮৯,৮০২	০	০
১২. কুষ্টিয়া	১৩	১৯,৬৯১	১২	০
১৩. রাজশাহী	২৬	৪,৮০,১০৬	৩৯	৮
১৪. রংপুর	২৯	২,৩২,৩২০	০	০
১৫. দিনাজপুর	২৮	৭,৫০,৫৫৩	২৯	৮
১৬. বগুড়া	১৬	১,১৯,০৮৭	১	০
১৭. পাবনা	৭	৩৩,০৬৭	৩১	০
সর্বমোট	৩৮৮	৩৪,০১,৬৪১	৩	৮

বিস্তারিত বিবরণ

জেলার নাম	ক্রয় কেন্দ্রের নাম	বাধ্যতামূলক লেভি সংগ্রহের পরিমাণ		
		মণ	সের	ছটাক
১. ঢাকা	১. ধামরাই	৭৫০	০	০
	২. নারিষা	২৩০	০	০
	৩. জয়দেবপুর	৪,৮৩০	০	০
	৪. ঘোড়াশাল	৬৩৪	০	০
	৫. শ্রীপুর	৩,০৩৪	০	০
	৬. বর্মী	২,৫৮০	০	০
	৭. সাভার	৩৩৩	০	০
	৮. কলাকোপা	৬৯৯	০	০
	৯. কাপাসিয়া	১,১৯০	০	০
	১০. নারায়ণগঞ্জ	২,৫১২	১০	০
	১১. কালিয়াকৈর	৮৪৭	০	০
	১২. নরসিংদী	৪০৩	৩৫	০
	১৩. রায়পুরা	৩৭৩	৪	০
	১৪. ঘোড়াশাল	৪৪	০	০
	১৫. লোহজং	১,৪১০	০	০
	১৬. সৈয়দপুর	৬৯৫	০	০
	১৭. রসুলপুর	৯১	০	০
	১৮. কাটাখালী	৬০	০	০
	১৯. মীরকাদিম	৫৪৮	৬	০
	২০. মানিকগঞ্জ	৪,৬৭৯	৬	০
	২১. সাটুরিয়া	১৩৩	০	০

১. ঢাকা	২২. উথলী	২,২৫৭	৩৫	০
	২৩. বালিরটেক	১,৮১৩	১০	০
	জেলার সর্বমোট	৩০,১৪৭	২৬	০
২. ময়মনসিংহ	১. হালুয়াঘাট	৫৯,৯৭৫	৩	০
	২. মুন্সিরহাট	২৯,১৬২	৩২	০
	৩. ফুলপুর	১০,২৬২	২০	০
	৪. ঈশ্বরগঞ্জ	২,৭১৯	১৩	০
	৫. আতাহারাব্রী	৪,২১২	১৩	০
	৬. শ্যামগঞ্জ	২,৮৮০	৮	০
	৭. গৌরিপুর	২,৪৭২	২৮	০
	৮. সিএসডি, ময়মনসিংহ	১,৭৩৭	১	০
	৯. মুক্তাগাছা	৪,১২৮	৩৮	০
	১০. ধল্লা	৫,৪৫০	১২	০
	১১. গায়েশপুর	৯৬৬	২৬	০
	১২. ফুলবাড়িয়া	২,৯৮২	৩২	৮
	১৩. ভালুকা	২,১৪৯	১	০
	১৪. শম্ভুগঞ্জ	৬,৫৭২	৩৩	০
	১৫. দুর্গাপুর	৫২,৯৫২	৩০	০
	১৬. কালমাকান্দা	২৬,৭১৫	১	৮
	১৭. বড়ুয়াকোনা	১,৮৬৯	৭	০
	১৮. পূর্বধল্লা	৭,০৯৩	১৯	০
	১৯. নেত্রকোনা	৭,৩৪৮	১	০
	২০. জড়িয়া	৪,৩০১	৫	০
	২১. মহনগঞ্জ	২,৫৮৪	২৮	০
	২২. বারহাট্টা	৫,৬৭৭	৬	০
	২৩. বুর্জেরবাজার	১,০৭৩	২২	০
	২৪. ঠাকুরাকোনা	২,৬৯১	৮	০
	২৫. কেন্দুয়া	২,৪৭১	৮	০
	২৬. কালসিন্দুর	৫০,২৪৪	৬	০
	২৭. সুনামগঞ্জ	..	..	..
	২৮. নলিতাবাড়ী	৩০,০৯৬	২	৮
	২৯. বক্সিগঞ্জ	১১,৪৬০	৩৫	০
	৩০. আহমেদ নগর	১২,৪৭৮	৩৫	০
	৩১. সিংজানী	৪,২০৩	০	০
	৩২. বাউশী	১,১৭৭	২০	০
	৩৩. দেওয়ানগঞ্জ	২,০০১	১০	০
	৩৪. সরিষাবাড়ী	১,৭৮০	৩০	০
	৩৫. শেরপুর	৭,৮৭৩	১০	০
	৩৬. পীয়ারপুর	১,৬০৫	৫	০
	৩৭. টাঙ্গাইল	২,৪৪৮	২০	০
	৩৮. মীর্জাপুর	২,৭১২	১৫	০
	৩৯. কালিহাতী	৬,৩৭৫	২০	০
	৪০. গোপালপুর	১,৫৯২	০	০
	৪১. মধুপুর	৩,০৯২	০	০
	৪২. নাগরপুর	৮১১	৫	০
	৪৩. কিশোরগঞ্জ	৬,০৩১	২৭	০
	৪৪. সরারচর	২,৪৮২	২০	০
	৪৫. কুলিয়ারচর	৬৩৮	০	০
	৪৬. ভৈরব	১,০৬৭	৩৫	০
	জেলার সর্বমোট	৪,০০,৬২২	১১	৮

৩. ফরিদপুর	১. অম্বিকাপুর	২,২৭৭	১৭	০
	২. ভাঙ্গা	১,১০২	০	০
	৩. বোয়ালমারী	৩,৭৭৭	১	০
	৪. সদরপুর	৬৮৮	১৭	০
	৫. মাদারীপুর	..	..	..
	৬. চরমুগুরিয়া	২,৬০৯	০	০
	৭. শিবচর	৭০৫	০	০
	৮. আঙ্গুরীয়া	১,৭৩০	০	০
	৯. ডামুড্ডা	১,৫৪৭	৩০	০
	১০. নড়িয়া	৬৮৭	০	০
	১১. গোপালগঞ্জ	৩,৪৯৯	০	০
	১২. ভাটিয়াপাড়া	১,০২৩	০	০
	১৩. সিন্দিয়াঘাট	৪৮৫	০	০
	১৪. কোটালিপাড়া	১৬৪	২০	০
	১৫. রাজবাড়ী	১,৭১৫	২০	০
	১৬. পাংশা	৩,০৩২	০	০
	১৭. নলিয়াগ্রাম	২,৫৫৭	০	০
	জেলার সর্বমোট	২৭,৫৯৯	২৫	০
৪. চট্টগ্রাম	১. মীরসরাই	৪,১৯৩	০	০
	২. সীতাকুন্ড	১,৪১৪	০	০
	৩. দোহাজারী	২,০৮৮	০	০
	৪. ফাতেহপুর	১,৭৪৫	০	০
	৫. রাঙ্গুনিয়া	৪,৪৪২	০	০
	৬. ফকিরহাট	৩,১৬৮	০	০
	৭. পটিয়া	১,৩৯০	০	০
	৮. নাজিরহাট	৪,৫১৮	০	০
	৯. অধুনগর	৮২২	০	০
	১০. কালিরহাট	৩,২৭৭	০	০
	১১. সন্দ্বীপ	১,০৬৪	০	০
	১২. দেওয়ানহাট	৪৭৯	০	০
	১৩. করেরহাট	২,৩৩২	০	০
	১৪. রামগড়	৫০৫	০	০
	জেলার সর্বমোট	৩১,৪৩৭	০	০
৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম	১. রামগড়	৩,৫৭৬	১৮	০
	২. তবলছড়ি	৮,৯২৬	৩০	০
	৩. পানছড়ি	২,৯৮২	২০	০
	৪. খাগড়াছড়ি	৪,১৩৯	০	০
	৫. দিঘিনালা	২,৬৮৯	০	০
	৬. মহালছড়ি	২৬৯	০	০
	৭. মানিকছড়ি	১,৯৮৮	১০	০
	৮. গুইমারা	১,৫৪৬	৩০	০
	৯. নাজির হাট, চট্টগ্রাম	৫৩	০	০
	জেলার সর্বমোট সংগ্রহ	২৬,১৬৭	২৮	০
৬. নোয়াখালী	১. সোনাপুর	৫,৩১৬	১০	০
	২. চৌমুহনী	২,১৭০	১৫	০
	৩. লক্ষীপুর	৪,৯২৫	৩৭	০
	৪. সোনাইমুড়ী	১,৮১১	০	০
	৫. রাইপুর	১,৭৯৪	০	০
	৬. রামগঞ্জ	১,০৩০	০	০
	৭. সেনবাগ	১,৩৭৪	১	০

৬. নোয়াখালী	৮. বসুরহাট	২,৭৭৪	৩০	০
	৯. হাজিরহাট	৪,৪২৪	২০	০
	১০. চর আলেকজান্ডার	৫,৫০২	০	০
	১১. রামগতি	৫,৩৯৩	০	০
	১২. হাতিয়া	৪,৯৪৭	১০	০
	১৩. তামারুদ্দী	৭,৩৮২	০	০
	১৪. আফাজিয়া	১১,৪৮১	০	০
	১৫. হরিশ চৌধুরী হাট	৪,৭৫১	০	০
	১৬. ফেনী	৫,২৯৩	৩৭	০
	১৭. ছাগল নাইয়া	১৩,৫৩৪	১৮	০
	১৮. সোনাগাজী	২,৫২৯	০	০
	১৯. ফুলগাজী	১৫,৩৩০	০	০
	জেলার সর্বমোট	১,০১,৭৬৪	১৮	০
৭. কুমিল্লা	১. গুনাবতি	১,৪৪৩	১০	০
	২. ধর্মপুর	১,৩৩৮	১৯	০
	৩. কোম্পানীগঞ্জ	৪,১৪৯	২৪	০
	৪. সালদানদী	২,৭৩৪	৩৯	০
	৫. চকবাজার	২,০৯৭	২২	০
	৬. চৌদ্দগ্রাম	৫,৫৯২	৩০	০
	৭. বি.বাড়িয়া	৪,৬৫৬	০	০
	৮. আশুগঞ্জ	৮,৩২৮	০	০
	৯. চান্দুনা	৩,৪৯৬	০	০
	১০. নবিনগর	২,২০৯	০	০
	১১. নাসিরনগর	৫,০১৯	০	০
	১২. কুটী	১,০০০	২০	০
	১৩. আখাউড়া	২,১৫৩	০	০
	১৪. চান্দিনা	৩,৫৭৪	০	০
	১৫. দৌলতগঞ্জ	৭,৮০৫	১৩	০
	১৬. বড়ুড়া	২,১৫৭	৩৩	০
	১৭. দাউদকান্দি	১,২১২	২৮	০
	১৮. উজানচর	৮৬১	২৫	০
	১৯. হাজীগঞ্জ	৩,৮২৫	০	০
	২০. মতলব	২,৫১৮	০	০
	২১. ফরিদগঞ্জ	৩৭৪	০	০
	২২. চাঁদপুর	৫১৫	০	০
	২৩. কচুয়া	২,১৭১	০	০
	জেলার সর্বমোট	৬৯,২৩২	২৩	০
৮. সিলেট	১. সিলেট	৩,৯৪৭	০	০
	২. জাকিগঞ্জ	১৯,১৪০	০	০
	৩. বি.বাজার (শেওলা)	৪,১০৮	০	০
	৪. কালিগঞ্জ	৪০,৮১৬	০	০
	৫. রতনগঞ্জ	৪,০০২	০	০
	৬. কানাইঘাট	১৯,৫১৩	০	০
	৭. গোপালগঞ্জ	১,৯৬৭	০	০
	৮. দারবোস্ট	৪৭,৭৫২	০	০
	৯. গোয়াইনঘাট	৮,০২০	০	০
	১০. বিশ্বনাথ	১,৯০৫	০	০
	১১. গোয়ালবাজার	৩,১০৩	০	০
	১২. ফেঞ্চুগঞ্জ	১,৯৮৮	০	০
	১৩. শ্রীমঙ্গল	১৪,৩১১	০	০

৮. সিলেট	১৪. শেরপুর	৯৮০	০	০
	১৫. মৌলভীবাজার	৭,১৯৯	০	০
	১৬. শামসের নগর	১১,৮০০	০	০
	১৭. কুলাউড়া	১০,৫৬০	০	০
	১৮. জুরী	১২,৬৮৬	০	০
	১৯. টেংরাবাজার	২,৮৫৩	০	০
	২০. ছাতক	২০,৪৯৩	০	০
	২১. সুনামগঞ্জ	১৮,৭১১	০	০
	২২. সাচনা	৯,৬১৭	০	০
	২৩. দেরাই	৭,৩৬	০	০
	২৪. ধর্মপাশা	৮৭৮	০	০
	২৫. বাদাঘাট	৭,২২২	০	০
	২৬. জগন্নাথপুর	৩,৮৩২	০	০
	২৭. পাগলা	৩,৮৩১	০	০
	২৮. কালাসাদাক	৫,৩৩৩	০	০
	২৯. মোনতোলা	১১,৪৮৪	০	০
	৩০. হবিগঞ্জ	৫,৪৯৯	০	০
	৩১. আজমিরীগঞ্জ	২,৫৩২	০	০
	৩২. লাখাই	১,৯৩৪	০	০
	৩৩. বানিয়াচং	১২,৫৮৮	০	০
	৩৪. বাহুবল	৬,৩০১	০	০
	৩৫. নবিগঞ্জ	৬,০৬৪	০	০
	৩৬. শায়েস্তাগঞ্জ	১২,১৭৬	০	০
	৩৭. আমুরোড	১৫,৬৪৭	০	০
	৩৮. নয়াপাড়া	১৯,২৯৬	০	০
	জেলার সর্বমোট	৩,৮০,৮২৪	০	০
৯. যশোর	১. যশোর	৬৭৯	০	০
	২. নোয়াপাড়া	৬০০	০	০
	৩. ঝিকরগাছা	৩৮৫	০	০
	৪. নাভারণ	১,০৯০	০	০
	৫. খাজুরা	২০২	০	০
	৬. বাগাচরা	৪৪৮	০	০
	৭. চৌগাছা	২৯১	০	০
	৮. মনিরামপুর	৯৭২	০	০
	৯. ঝিনাইদাহ	৭৩৭	০	০
	১০. কালিগঞ্জ	১,১১৯	০	০
	১১. কোটচাঁদপুর	৭২৮	০	০
	১২. খালিশপুর	৩৪৮	০	০
	১৩. মহেশপুর	১,৯৮৪	০	০
	১৪. মাগুরা	১,৬২৯	০	০
	১৫. বিনোদপুর	৯২৮	০	০
	১৬. নড়াইল	২,৯১৯	০	০
	১৭. বড়দিয়া	২০৯	০	০
	১৮. লোহাগাড়া	৬১৭	০	০
	১৯. পেরুইল	১,২৫৬	০	০
	জেলার সর্বমোট	১৭,১৪১	০	০
১০. খুলনা	১. বটিয়াঘাটা	১৯,১৮৪	২০	০
	২. পাইকগাছা	১৯,৪৬৯	০	০
	৩. ডুমুরিয়া	১৬,৯৩৯	৩৮	০
	৪. চালনা	৩৩,৫৬৮	২০	০

১০. খুলনা	৫. রাজাপুর	১,১৫২	০	০
	৬. গড়াইখালী	১৮,৭০৭	০	০
	৭. ঘুঘরকাটি	৫,০৫৬	২৬	০
	৮. ফুলতলা	২,৪৩৪	২১	০
	৯. চন্ডীমহল	৪১৯	০	০
	১০. খুলনা	৬৭৫	০	০
	১১. মহেশ্বরপাশা	২,০২৯	০	০
	১২. বাগেরহাট	২২,১৪১	৩৪	০
	১৩. মোড়েলগঞ্জ	৮১,২০৮	৫	০
	১৪. রামপাল	৫১,৬৫৮	৩৫	০
	১৫. গৌরামবাহা	৮,৩৮৪	৩৩	০
	১৬. রায়েনদা	৯,১৫৩	২০	০
	১৭. ফকিরহাট	২,০৮১	২০	০
	১৮. সাতক্ষীরা	১৫,৭৬৬	২	০
	১৯. কলারোয়া	১,১৬৮	২৪	০
	২০. বসন্তপুর	১৬,৩৮৯	২০	০
	২১. সঙ্করা	১০,০৬৩	৩১	০
	২২. পারুলিয়া	৭,৩২৯	১৬	০
	২৩. হরিনগর	৪,৮৫৬	৩০	০
	২৪. পাটকেলঘাটা	৯,৬৯২	১০	০
	২৫. নওবানকি	১,১১৭	১০	০
	২৬. বারদাল	৩১,৪২৮	২৪	০
	জেলার সর্বমোট	৩,৯২,০৭৫	৩৯	০
১১. বরিশাল	১. বরিশাল	৪,৬০৪	০	০
	২. ঝালকাঠি	৬,০৮৭	০	০
	৩. কলসকাঠি	৮,৩৪২	০	০
	৪. গৌরনদী	২,৬০৩	০	০
	৫. সোনাপুর	৪,৪১৬	০	০
	৬. মুলাদি	১,৩৬২	০	০
	৭. নলছিটি	৩,২০৮	০	০
	৮. পটুয়াখালী	১৬,০৯২	০	০
	৯. বগা	৭,৫৯৩	০	০
	১০. কালাইয়া	১৫,৭৭৪	০	০
	১১. গলাচীপা	২১,৯৮৯	০	০
	১২. খেপুপাড়া	১০,১৬১	০	০
	১৩. আমতলী	১৭,৬৩৫	০	০
	১৪. বরগুনা	৬,০৮৮	০	০
	১৫. বেতাগী	৪,১৫৯	০	০
	১৬. ফুলঝুরী	৪,২৮৪	০	০
	১৭. রাঙ্গাবালী	৪,৫৮২	০	০
	১৮. তালতলী	৪,৫৩৩	০	০
	১৯. সুবিদ আলী (অস্থায়ী সংগ্রহ কেন্দ্র)	৩,৮০৬	০	০
	২০. পিরোজপুর	১০,৩২৯	০	০
	২১. কাউখালী	১,৯৮৩	০	০
	২২. ভাণ্ডারিয়া	৭,৭১৮	০	০
	২৩. তুষখালী	১৯,৭৬৩	০	০
	২৪. পাথরঘাটা	৭,৬১১	০	০
	২৫. ইন্দারহাট	৪,৪৬০	০	০
	২৬. শ্রীরামকাঠি	৪,৩০৮	০	০
	২৭. আমুয়া	১১,৯৩৯	০	০

১১. বরিশাল	২৮. কাকছিড়া (অস্থায়ী সংগ্রহ কেন্দ্র)	৫,১৬৫	০	০
	২৯. ভোলা	৪,৫৮৫	০	০
	৩০. লালমোহন	২৩,৫৩১	০	০
	৩১. চরফ্যাশন	৭,৮৭৫	০	০
	৩২. বোরহানউদ্দিন	১৫,০৬৭	০	০
	৩৩. চর-শশীভূষণ	১২,৪০৮	০	০
	৩৪. হাট-শশীগঞ্জ	৫,৭৪২	০	০
	জেলার সর্বমোট	২,৮৯,৮০২	০	০
১২. কুষ্টিয়া	১. কুষ্টিয়া	৩০৬	০	০
	২. জগতি	৬৪০	০	০
	৩. কুমারখালী	৫১০	০	০
	৪. হালসা	৪৩৬	০	০
	৫. খোকসা	৯১৮	০	০
	৬. ভেড়ামারা	২,১৪২	০	০
	৭. চুয়াডাঙ্গা	৮৭৯	৭	০
	৮. আলমডাঙ্গা	৪৭৯	১২	০
	৯. দর্শনা	২,৪১০	১৩	০
	১০. দৌলতগঞ্জ	৫,১৮৩	২৫	০
	১১. মেহেরপুর	২,৫৭৫	৫	০
	১২. গাংনী	১,৪৭৯	৩০	০
	১৩. আল্লারদরগা	১,৭৩২	০	০
	জেলার সর্বমোট	১৯,৬৯১	১২	০
১৩. রাজশাহী	১. রাজশাহী	২,০৩৫	২৭	০
	২. গোদাগাড়ী	১৪,৭৪৪	১২	০
	৩. খেতুররোড	১২,১১৫	২৪	৮
	৪. তানোর	১৪,০৩৬	২৪	৮
	৫. চৌবাড়িয়া	৩,৮৯২	৩০	০
	৬. বামেশ্বর	১,১৫০	১৫	৮
	৭. নাটোর	১,৩৩০	১৫	০
	৮. সিঙ্গড়া	১২,১০৯	৩	০
	৯. গুরুদাসপুর	৩৩৬	২১	০
	১০. গোপালপুর	৯৬৬	২০	০
	১১. রাঙ্গামাটি	৩১,৫৩৬	৯	০
	১২. নাজিরপুর	২৮,৯৫৭	২৮	০
	১৩. নওগাঁ	৩,০৭৫	১৫	০
	১৪. মাতাজিরহাট	২৪,১৩৩	৫	০
	১৫. প্রসাদপুর	৮,৩৯৭	৩০	০
	১৬. মহিষাবাতান	১৩,৪০৯	১৫	০
	১৭. নিয়ামতপুর	৩১,৯৬২	৩০	০
	১৮. রানিনগর	৯,৫৬৭	১৯	০
	১৯. আত্রাই	৯,৩০৬	৬	০
	২০. নওয়াবগঞ্জ	২৫,১৯২	১০	০
	২১. আমনুড়া	১২,৮০২	২৪	০
	২২. রোহনপুর	৬৯,৪৪৫	৩৯	০
	২৩. নীতপুর	৪১,৪৯৭	৩০	০
	২৪. সাপাহার	৬৩,৬৬১	৬	০
	২৫. আশারানডা	৭,৫৯৫	০	০
	২৬. নাচোল	৩৬,৮৪৮	২১	০
	জেলার সর্বমোট	৪,৮০,১০৬	৩৯	৮
১৪. রংপুর	১. রংপুর	৬,৫০০	০	০

১৪. রংপুর	২. বদরগঞ্জ	১৬,৫১৫	০	০
	৩. পাটগ্রাম	২২,৫৫৭	০	০
	৪. হাতীবান্ধা	৮,৬০০	০	০
	৫. সাথীবাড়ী	৬,৭০২	০	০
	৬. বালুয়াহাট	৩,৯১৯	০	০
	৭. ভেন্দাবাড়ী	৪,৫৫০	০	০
	৮. পীরগাছা	২,৫২৬	০	০
	৯. কাকিনা	৫,৭৮৫	০	০
	১০. বাউড়া	১,২৪৬	০	০
	১১. চিলাহাটি	৩৬,০৩৭	০	০
	১২. ডোমার	২০,৫৭২	০	০
	১৩. ডিমলা	১৭,৪২৬	০	০
	১৪. নীলফামারী	২০,৯৬৬	০	০
	১৫. সৈয়দপুর	১১,৪১৭	০	০
	১৬. কিশোরগঞ্জ	৫,৭৮৭	০	০
	১৭. জলঢাকা	৬,৭২০	০	০
	১৮. গাইবান্ধা	৬,৪৪৯	০	০
	১৯. বামনডাঙ্গা	৩,২৬৩	০	০
	২০. গোবিন্দগঞ্জ	৬,২৮৫	০	০
	২১. মহিমগঞ্জ	৩৩৫	০	০
	২২. বোনারপাড়া	১,৯৪২	০	০
	২৩. কুড়িগ্রাম	১,৫৫১	০	০
	২৪. পলাশবাড়ী	২,১৯৩	০	০
	২৫. লালমনিরহাট	৩,০৩০	০	০
	২৬. উলিপুর	৩,৩৬২	০	০
	২৭. নাগেশ্বরী	২,১৩৮	২০	০
	২৮. জয়মনিরহাট	২,৮৯১	০	০
	২৯. চিলমারী	১,০৫৫	২০	০
	জেলার সর্বমোট	২,৩২,৩২০	০	০
১৫. দিনাজপুর	১. দিনাজপুর	৬৬,৫৪১	৮	০
	২. বিরাল	৪৩,৪২৯	১৭	৮
	৩. সেতাবগঞ্জ	৩৯,১০৬	১৪	৮
	৪. চিরিরবন্দর	৭০,১০৪	৬	৮
	৫. মনমথপুর	৭,৭২৭	৩৮	০
	৬. পার্বতীপুর	১৫,৬৩৬	৩০	৮
	৭. ফুলবাড়ী	৩৮,৮২০	১৭	০
	৮. চরকাই	৩৬,০৪৫	২৫	৮
	৯. হিলি	২১,১৯৭	২৯	০
	১০. বীরগঞ্জ	২৭,৬৩৩	২৩	০
	১১. কাহারোল	১১,০২১	২৬	৮
	১২. খানসামা	১৪,৪৪৫	৩০	০
	১৩. রাণীগঞ্জ	১২,৫৩৫	১৪	০
	১৪. ঠাকুরগাঁও	৯,০৪৪	১৫	০
	১৫. গরিয়াহাট	১০,৯৮৬	১০	০
	১৬. শিবগঞ্জ	৪,৫১৫	৩৩	০
	১৭. রুহিয়া	১৭,৩৭০	১২	০
	১৮. আত্রী	২৫,৫৬১	৫	০
	১৯. লাহিড়ীহাট	৩৩,২৫৮	২০	০
	২০. রাণীশংকল	৩২,৭২৭	২৯	৮
	২১. হরিপুর	২৪,৪৯৮	৩	০

১৫. দিনাজপুর	২২. পীরগঞ্জ	১৬,৮২২	৭	০
	২৩. বোদা	২৩,৮৮৫	৩৫	০
	২৪. দেবিগঞ্জ	১৪,৫৭৭	৫	০
	২৫. ভাওলাগঞ্জ	৯,৭৬৯	৫	০
	২৬. পঞ্চগড়	৭৪,৩৬৫	৩০	০
	২৭. ভজনপুর	২৩,০৫৫	৩০	০
	২৮. তেতুলিয়া	২৫,৮৬৯	৩০	০
	জেলার সর্বমোট	৭,৫০,৫৫৩	২৯	৮
১৬.বগুড়া	১. বগুড়া	৬,৭১২	২০	০
	২. কাহালু	১০,৭৯২	২১	০
	৩. তাবড়া	১৪,০২৮	০	০
	৪. কুন্ডুরহাট	১৮,০৭৮	২০	০
	৫. কালাই	১৭,৬০০	০	০
	৬. মির্জাপুর	১৬,৫৫৭	০	০
	৭. আক্কেলপুর	৪,৬৩০	৩০	০
	৮. জামালগঞ্জ	১,৪১৭	০	০
	৯. পাঁচবিবি	১০,০৮৭	৩	০
	১০. জয়পুরহাট	৫,৭৮৩	৫	০
	১১. মোকামতলা	৭,৩১৩	২	০
	১২. চন্দনবাইশা	২০৪	২০	০
	১৩. গোসাইবাড়ী	৬২০	৩০	০
	১৪. শান্তাহার	৩,৬২১	২০	০
	১৫. সুকানপুকুর	১,৩৫৩	৩০	০
	১৬. সরিয়াকান্দি	২৮৭	০	০
	জেলার সর্বমোট	১,১৯,০৮৭	১	০
১৭. পাবনা	১. পাবনা	২,২৭৫	৩৫	০
	২. ঈশ্বরদী	১২৯	৩৭	০
	৩. ভাঙ্গুরা	৭,৫৮১	১০	০
	৪. বেড়া	৩,২১০	১০	০
	৫. সিরাজগঞ্জ	৯১৩	৩৭	০
	৬. উল্লাপাড়া	১৫,৫৪৭	১০	০
	৭. শাহজাদপুর	৩,৪০৯	১২	০
	জেলার সর্বমোট	৩৩,০৬৭	৩১	০
প্রদেশের সর্বমোট		৩৪,০১,৬৪১	৩	৮

উৎস : *Assembly Proceedings*, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXI, No. 2, First Session, 1967, 18th January, 1967 (Dacca : East Pakistan Governement Press, 1967), pp. 92-106.

সারণি ৩৮

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সেকশন ৪(১১)/৪(১২) অনুযায়ী বিভিন্ন বছরে মোট অর্থ জড়িত ও সার্টিফিকেট মামলার মাধ্যমে আদায়ের পরিমাণ

বছর	অর্থ জড়িত	অর্থ আদায়	শতকরা হার
১৯৫৯-৬০	১০,৪১,৯৪,৯২৯	৮১,৮৮,০৫৯	৭.৮৬
১৯৬০-৬১	১২,০৫,৭৪,৫৮২	২,৩৬,৬১,১৬৯	১৯.৬২
১৯৬১-৬২	১১,১২,৩৮,৯৬৮	২,২১,৯৫,১৩৩	১৯.৯৫
১৯৬২-৬৩	১৩,৯৩,৩৫,৬৯১	২,০৪,৯৮,৭২৮	১৪.৭১
১৯৬৩-৬৪	১৪,৮৩,৯০,০৩৪	৩,০২,৬২,৮৮৬	২০.৩৯
১৯৬৫-৬৬	১৯,৪৪,২০,৯৪৭	৩,৮৬,৯০,২৯২	১৯.৯০
১৯৬৬-৬৭	১৮,২৪,২২,৭৪২	৪,১৯,৩৭,৯৮৭	২২.৯৯
১৯৬৭-৬৮	২১,৭৩,১৮,০৫০	৭,০১,৫৪,৮৭৮	৩২.২৮

পূর্ব পাকিস্তানের ১৬টি জেলার মোট অর্থ জড়িত ও সার্টিফিকেট মামলার মাধ্যমে আদায়ের পরিমাণ

বিভাগ*	জেলা	বছর	অর্থ জড়িত	অর্থ আদায়	শতকরা হার
ঢাকা	ঢাকা	১৯৫৯-৬০	২,৩০,৮৮,৩১৬	১৬,০৩,৮৬১	৬.৯৫
		১৯৬০-৬১	২৪,৩০,০৯৬	৩,৫৫,৯২৫	১৪.৬৫
		১৯৬১-৬২	২৮,৮৩,২৪২	৪,৬৭,৫৪৫	১৬.২২
		১৯৬২-৬৩	২৬,৩৩,০৫৯	৫,৬৮,১৭২	৬.৩৯
		১৯৬৩-৬৪	৫৪,৩১,১৯৫	১১,০৭,৪৩৭	২০.৩৯
		১৯৬৫-৬৬	৬২,২৯,১৮৮	১১,৪৪,০১০	১৮.৩৭
		১৯৬৬-৬৭	৯১,০৪,২৬৯	১৫,০১,৩৮১	১৬.৪৯
		১৯৬৭-৬৮	৯৮,৯০,৮৬৩	১৯,৭৩,৪০৫	১৯.৯৫
	ময়মনসিংহ	১৯৫৯-৬০	১,১৩,১৭,৬৩৩	৬,১৫,২৪৩	৫.৪৪
		১৯৬০-৬১	১,৩৭,১৩,৯৬৪	২৬,০৭,২৯৩	১৯.০১
		১৯৬১-৬২	১,৩৪,৪০,৯১২	৩৪,৯০,০৮৪	২৫.৯৭
		১৯৬২-৬৩	১,৪৯,০১,০৮৮	১৯,০৫,৮০৩	১২.৭৯
		১৯৬৩-৬৪	১,৮১,৬৭,৪৮৭	৫৫,১৯,২৪১	৩০.৩৮
		১৯৬৫-৬৬	৪,০৩,২৫,১৬৪	১,১২,৭৫,৭৭০	২৭.৯৬
		১৯৬৬-৬৭	৩,৩৯,৭৯,৫১৬	১,১৯,৯৩,২৩৯	৩৫.৩০
		১৯৬৭-৬৮	৩,৯৬,৩৩,৩৮১	১,৮৩,৪০,৭৬৪	৪৬.২৮
	ফরিদপুর	১৯৫৯-৬০	৫১,৪৩,০৫৪	৬,০২,১৪৪	০.১২
		১৯৬০-৬১	৭০,৩১,০২০	৬,০৬,১৫১	৮.৬২
		১৯৬১-৬২	৯৪,৫২,৩৯৭	২৭,৩৭,০৯২	২৮.৯৬
		১৯৬২-৬৩	১,০০,৫২,৩৬৮	১৬,৬৮,৫৫৭	১৬.৬০
		১৯৬৩-৬৪	১,১০,৯৫,৩৪৫	১৯,৩৯,৮২৯	১৭.৪৮
		১৯৬৫-৬৬	১,২২,৬০,০৮৯	২৬,১৪,৫২১	২১.৩৩
		১৯৬৬-৬৭	১,২১,৫১,৭৫২	৩২,৭১,৩৬৮	২৬.৯২
		১৯৬৭-৬৮	১,১৪,৮৬,১৬৯	২০,৬৮,৭১৬	১৮.০১
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১৯৫৯-৬০	১৯,৯৩,৪০০	২,৮০,৬৬৮	১৪.০৮
		১৯৬০-৬১	৪০,০৯,৯৮৭	৩,৮৬,৩৭৯	৯.৬৪
		১৯৬১-৬২	৪৪,৯৩,৯০৩	৮,৫৯,৪৮৫	১৯.১৩
		১৯৬২-৬৩	৪৬,৫৮,৬৬১	৬,৯৬,৮০৬	১৪.৯৬
		১৯৬৩-৬৪	৪৬,০৮,০৩৬	৬,৩৩,২০১	১৩.৭৪
		১৯৬৫-৬৬	৪৯,৬৫,৫০৬	১০,৪৭,৬২৮	২১.১০
		১৯৬৬-৬৭	৬১,৭৬,১৯৬	৬,৬৮,৪৩৯	১০.৮২
		১৯৬৭-৬৮	৬৪,৫৮,৭৫২	৯,৯০,৮৮৫	১৫.৩৪
	কুমিল্লা	১৯৫৯-৬০	৫২,৪৮,৪১৫	৩,৫৮,০১৯	৬.৮২
		১৯৬০-৬১	১,৪২,৮৬,০৭৭	২০,৯৯,৫৮৫	১৪.৭০
		১৯৬১-৬২	১,৫৭,৮১,৮৩৯	১৬,২১,৫৩৬	১০.২৭
		১৯৬২-৬৩	১,৮১,০৮,৪২৭	২১,৮৭,৪২০	১২.০৮
		১৯৬৩-৬৪	৯৭,২৮,৭৩১	২১,৩০,১৫৯	২১.৯০
		১৯৬৫-৬৬	৯৮,২৮,১৪৭	২৭,১৭,৩২৮	২৭.৬৫
		১৯৬৬-৬৭	৭৪,৮৬,০২৩	১১,৮৮,৭৬৫	১৫.৮৮
		১৯৬৭-৬৮	১,৩১,৬০,১৩২	৩৪,৪৫,২৫৭	২৬.১৮
	নোয়াখালী	১৯৫৯-৬০	২৫,৮৫,০৭৩	২,০৩,১৩৮	৭.৮৬

চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	১৯৬০-৬১	৩০,৩২,৯১১	৬,৪০,১৯১	২১.১১
		১৯৬১-৬২	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	৫০,৫৭,৬৭০	১৬,০২,৪৮০	৩১.৬৮
		১৯৬৩-৬৪	৪৩,২৮,৫৪০	২৩,১০,২৫০	৫৩.৩৭
		১৯৬৫-৬৬	৫৩,৩৮,০৭১	৫,৪০,১৮০	১০.১২
		১৯৬৬-৬৭	৮৬,৬৭,৮২৪	২৪,৪২,৮৭০	২৮.১৮
		১৯৬৭-৬৮	৮২,৩৭,৫৭৫	৩৮,২২,২৫০	৪৬.৪০
	সিলেট	১৯৫৯-৬০	৫২,৪০,৯৮৪	১,৯০,০৪১	৩.৬৩
		১৯৬০-৬১	১,৩৩,৫৩,২৯৭	১১,৬০,১২৪	৮.৬৯
		১৯৬১-৬২	৪৬,০৭,৮৬১	৭,১৮,৫২৮	১৫.৫৯
		১৯৬২-৬৩	১,১২,৩৫,৬৯২	১৬,৮৫,৯৩১	১৫.০১
		১৯৬৩-৬৪	৬৫,৫৫,৮৫২	২১,৪৩,৯৪৯	৩২.৭০
		১৯৬৫-৬৬	৮৫,৭২,৮৫৩	২৭,১৫,৬৭৩	৩১.৬৮
		১৯৬৬-৬৭	৯২,৭৫,৯২৫	৫৫,৯২,৯০৪	৬০.২৯
		১৯৬৭-৬৮	১,১৭,১৫,০৯৪	৪,০১,৪১১	৩.৪৩
খুলনা	খুলনা	১৯৫৯-৬০	৩৭,৯৬,৮৪৫	১৫,১৪,৩৭৪	৩৯.৮৯
		১৯৬০-৬১	৫৭,৪০,৬৩৭	২৫,৯৫,৬৪৪	৪৫.২২
		১৯৬১-৬২	৭৭,১৫,৬৩১	৩১,৭১,৪৮৮	৪১.১০
		১৯৬২-৬৩	৪১,০২,৫১৭	৪,৬৭,২২৪	১১.৩৯
		১৯৬৩-৬৪	৬০,৩২,২১৮	২৪,৩৩,১৯৯	৪০.৩৪
		১৯৬৫-৬৬	৫১,৪৮,৪১৫	১৫,৭৫,০০৭	৩০.৫৯
		১৯৬৬-৬৭	৫৬,৮৪,৫৭৬	১৪,৫৩,১৩৩	২৫.৫৬
		১৯৬৭-৬৮	৫৮,৫৪,৩৫৬	২১,৩০,২১৯	৩৬.৩৯
	যশোর	১৯৫৯-৬০	২২,২০,৪৩৭	১,৭৭,৩৩৬	৭.৯৯
		১৯৬০-৬১	৪৩,৮৮,১৬২	৬,৩২,০৮৬	১৪.৪০
		১৯৬১-৬২	৪৭,৮৫,৯০৯	২৪,৭২,৬৯৬	৫১.৬৭
		১৯৬২-৬৩	৪৮,৮৮,৮০৩	৮,৪৫,৮৩৯	১৭.৩০
		১৯৬৩-৬৪	৫৩,০৫,০২৭	১১,৭৩,৯৩২	২২.১৩
		১৯৬৫-৬৬	৩৬,৭৪,৬৪৪	১১,৫০,৪৭৬	৩১.৩১
		১৯৬৬-৬৭	৩৪,৮৭,১২৭	১৮,৬৭,৬৫৭	৫৩.৫৬
		১৯৬৭-৬৮	৪১,৯৩,৫২১	৩২,২৮,৭২৪	৭৬.৯৯
	কুষ্টিয়া	১৯৫৯-৬০	২৯,৫৪,৯৮৩	১,৯৫,০৪৬	৬.৬০
		১৯৬০-৬১	২৯,৭৮,০১৩	৫,৫৩,৯৮৩	১৮.৬০
		১৯৬১-৬২	৩৫,৮২,৩০৩	৫,১৬,০৫৪	১৪.৪১
		১৯৬২-৬৩	৩৫,২৪,৪৩৯	৬,৬০,৯৩০	১৮.৭৫
		১৯৬৩-৬৪	৩২,২১,২০৪	৫,০৬,৮৮৮	১৫.৭৪
		১৯৬৫-৬৬	৩০,২১,৭৩১	৮,২৫,৪২৮	২৭.৩২
		১৯৬৬-৬৭	৩৪,৩১,০৮৫	৭,৭৮,০৯৫	২২.৬৮
		১৯৬৭-৬৮	৩৯,৭১,২৯১	১৭,৮৪,৯৫৫	৪৪.৯৫
	বাকেরগঞ্জ	১৯৫৯-৬০	১,২৯,১১,৫৭২	৬,৮৮,৬০০	৫.৩৩
		১৯৬০-৬১	১,৭৬,০৩,৭৬৬	৯০,১৫,৩৯৫	৫১.২১
		১৯৬১-৬২	১,১৩,২৫,৪০৮	১৯,৩৬,৩১৯	১৭.১০
		১৯৬২-৬৩	১,৮২,৬৫,১৩২	২৭,৪৪,১০১	১৫.০২
		১৯৬৩-৬৪	২,৩৪,২০,৪৩৭	৪০,১৯,৮৫৪	১৭.১৬
		১৯৬৫-৬৬	২,৮৫,৮৪,৭০৯	৪০,৯১,৮০৫	১৪.৩১
		১৯৬৬-৬৭	২,৭৬,৪৬,৬২৮	২৯,৪১,৮৩৮	১০.৬৪
		১৯৬৭-৬৮	৩,০৬,২৮,৪৮১	১,৭৮,৩২,৫৯০	৫৮.২২
রাজশাহী	রাজশাহী	১৯৫৯-৬০	৭৯,৫৮,২০৮	৩,৭৮,৬০৫	৪.৭৬
		১৯৬০-৬১	৯৩,৩৫,৩৫৫	৬,৮৯,৫৯২	৭.৩৯
		১৯৬১-৬২	৯৮,৪৮,২০৯	৯,৪৩,০৬১	৯.৫৮
		১৯৬২-৬৩	১,০৮,২৫,৯২৩	৭,৮২,১১৪	৭.২২
		১৯৬৩-৬৪	১,১৬,৩১,১২৭	১০,৮১,০০৮	৯.২৯
		১৯৬৫-৬৬	১,২৬,৪১,৩৫৮	১৯,৪৮,৭১৯	১৫.৪২
		১৯৬৬-৬৭	১,৩৩,২১,৪৭৬	১৫,৬২,৬৩২	১১.৭৩
		১৯৬৭-৬৮	১,২৬,২৪,৫৭২	৬,৯৮,২৫০	৫.৫৩
	দিনাজপুর	১৯৫৯-৬০	৪,৮৩,৫৮১	২,১১,৪০৮	৪৩.৭২
		১৯৬০-৬১	৯,৪৯,৮১৮	২,৫৯,৮৫৬	২৭.৩৬
		১৯৬১-৬২	১৯,৮৪,০৫১	৩,০৭,০৬৫	১৫.৪৮
		১৯৬২-৬৩	২৭,১২,৮০৩	৪,৪২,২৭০	১৬.৩০
		১৯৬৩-৬৪	৩২,৬২,১৪৬	৯,৩৯,০৩৫	২৮.৭৯

রাজশাহী	দিনাজপুর	১৯৬৫-৬৬	৩৭,২৬,০০০	১৪,৫৫,০০০	৩৯.০৫
		১৯৬৬-৬৭	৩৩,৮১,০০০	৯,৫০,০০০	২৮.১০
		১৯৬৭-৬৮	৩৮,৫৯,২৯৪	১২,১৬,৩৩৭	৩১.৫২
	রংপুর	১৯৫৯-৬০	১,২৫,৯৯,৪৪৯	৩,২৪,৩৪৭	২.৫৭
		১৯৬০-৬১	১,৫৫,৪৯,৯৫০	১৩,৭৮,৫৩৮	৮.৮৭
		১৯৬১-৬২	১,৯০,২১,৭১৫	১৬,৫৯,১৯২	৮.৭২
		১৯৬২-৬৩	২,০১,৩৪,৯৬৭	৩৪,৩১,৭৩৪	১৭.০৪
		১৯৬৩-৬৪	২,৭৪,২২,১৩৩	৩৪,৮৫,১৬০	১২.৭১
		১৯৬৫-৬৬	৩,৮৫,৪৬,৭২২	৩৫,৬৭,১৬১	৯.২৫
		১৯৬৬-৬৭	৪,০১,৫১,৩৪১	৪৬,৯৬,৩৬২	১১.৭০
		১৯৬৭-৬৮	৪,২০,২২,৭৩৫	৮১,৭৩,১৩৩	১৯.৪৫
	বগুড়া	১৯৫৯-৬০	১০,৫৯,৯৮২	১৯,৬৫৪	১.৮৫
		১৯৬০-৬১	২৫,২৩,৮২২	২,৮৩,১৪৪	১১.২২
		১৯৬১-৬২	৩৩,৩৪,১০৩	৪,০০,৩২৯	১২.০১
		১৯৬২-৬৩	৩৮,৪৭,০৮২	৩,৬৮,৯৭৭	৯.৫৯
		১৯৬৩-৬৪	৩৫,৬৫,৭৯২	৪,১০,৫১১	১১.৫১
		১৯৬৫-৬৬	৫৫,৩৮,৬৬৫	৯,৯৫,৭২২	১৭.৯৮
		১৯৬৬-৬৭	১৫,৫৩,৬৩৯	৪,৯১,০৩৩	৩১.৬১
		১৯৬৭-৬৮	৫৭,১৩,৫০৪	১২,০৮,২৩২	২১.১৫
	পাবনা	১৯৫৯-৬০	৫৫,৯২,৯৯৭	৮,২৫,৫৭৫	১৪.৭৬
		১৯৬০-৬১	৩৬,৪৭,৭০৭	৩,৯৭,২৮৩	১০.৮৯
		১৯৬১-৬২	৩৯,৮১,৪৮৫	৮,৯৪,৬৫৯	২২.৪৭
		১৯৬২-৬৩	৪৩,৮৭,০৬০	৪,৪০,২৮০	১০.০৪
		১৯৬৩-৬৪	৫৫,৯৮,৭৬৪	৪,২৯,২৩৩	৭.৬৭
		১৯৬৫-৬৬	৬৫,১৯,৬৮৫	১০,২৫,৮১৪	১৫.৭৩
		১৯৬৬-৬৭	৬৯,২৪,৩৬৫	৫,৩৮,২৭১	৭.৭৭
		১৯৬৭-৬৮	৭৮,৬৮,৩৩০	২৮,৩৯,৭৫০	৩৬.০৯

* ১৯৫৯-৬০ এবং ১৯৬০-৬১ সালের বার্ষিক ভূমি রাজস্ব প্রশাসন রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬টি জেলাকে চারটি বিভাগে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছে।

উৎস : *Report on the Land Revenue Administration of East Pakistan for the Year 1959-60*, Board of Revenue, Government of East Pakistan, (Dacca : East Pakistan Government Press, 1967), P. 32; *Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1960-61*, Board of Revenue, Government of East Pakistan, (Dacca : East Pakistan Government Press, 1969), P. 37; *Annual Land Revenue Administration Reports for the Year 1961-62*, Board of Revenue, Government of East Pakistan, (Dacca : East Pakistan Government Press, 1967), P. 42; *Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1962-63*, Board of Revenue, Government of East Pakistan, (Dacca : East Pakistan Government Press, 1968), P. 36; *Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1963-64*, Board of Revenue, Government of East Pakistan, (Dacca : East Pakistan Government Press, 1969), P. 31; *Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1965-66*, Board of Revenue, Government of East Pakistan, (Dacca : East Pakistan Government Press, 1971), P. 33; *Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1966-67*, Board of Revenue, Ministry of Revenue, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1973), P. 34; *Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1967-68*, Board of Revenue, Ministry of Revenue, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1973), P. 32.

সারণি ৩৯

পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের সেকশন ৪(৩) অনুযায়ী ১৯৫৯-৬০ হতে ১৯৬৭-৬৮ সময়ে বিভিন্ন বছরে ভূমি রাজস্ব দাবি ও সংগ্রহ

বছর	দাবি			সংগ্রহ			সুদ	চলতি দাবির উপর মোট সংগ্রহের শতকরা হার	পূর্বের বছরের দাবি থেকে হ্রাস-বৃদ্ধি	হ্রাস-বৃদ্ধির হার (%)
	বকেয়া	চলতি	মোট	বকেয়া	চলতি	মোট				
১৯৫৯-৬০	১০,৭৮,৬৩,৭২৬	৯,২৫,৫১,৯৮৯	২০,০৪,১৫,৭১৫	৪,১৫,৬১,০৭৫	৩,৫০,৭৮,২০০	৭,৬৬,৩৯,২৭৫	..	৮২.৮১	..	..
১৯৬০-৬১	১২,৬২,২৩,৩৯৩	১১,০১,৯৭,৭২৫	২৩,৬৪,২১,১১৮	৪,৫৩,৭৫,৪৪৩	৩,৭৪,৯৯,১১৮	৯,১৩,৫৭,০৮১	..	৮২.৯০	১,৭৬,৪৫,৭৩৬	১৯.০৭
১৯৬১-৬২	১২,০০,৯১,৩৭২	৮,৬৫,২৫,১১৬	২০,৬৬,১৬,৪৮৮	৬,০৯,১২,৬৩৬	৪,৩২,৫১,০৫৭	১০,৪১,৬৩,৬৯৩	৮৪,৪৫,১৩৬	১২০.৩৯	-২,৩৬,৭২,৬০৯	- ২১.৪৮
১৯৬২-৬৩	১০,৫০,১৪,৯৩৭	৮,৬৫,৮২,০৩৮	১৯,১৫,৯৬,৯৭৫	২,৭০,৯৯,৬০০	২,১৮,৯৫,৩২৯	৪,৮৯,৯৪,৯২৯	৪১,৬৯,৪২৫	৫৬.৫৯	৫৬,৯২২	০.০৭
১৯৬৩-৬৪	১৩,৭৪,৯৩,৪৩২	৮,৬৫,২১,৩৯১	২২,৪০,১৪,৮২৩	৫,৬৮,৮৬,২৯১	৩,৩৭,১৯,৩৭৫	৯,০৬,০৫,৬৬৬	..	১০৪.৭২	-৬০,৬৪৭	-০.০৭
১৯৬৫-৬৬	১৩,৬৮,৭৯,৭১০	৯,০৫,৮৮,৭৯০	২২,৭৪,৬৮,৫০০	৫,৮৮,৮৬,০১৫	৩,৫৭,৯৪,৮৩০	৯,৪৩,৯৫,৪৭৪	..	১০৪.২০	৪০,৬৭,৩৯৯	৪.৭০
১৯৬৬-৬৭	১৪,০৮,৪০,৯৮৪	৮,৮৯,৯০,৯৭২	২২,৯৮,৩১,৯৫৬	৬,৫৩,৫২,৫১২	৪,৪৬,৭৪,২৭২	১১,০০,২৬,৭৮৪	..	১২৩.৬৪	-১৫,৯৭,৮১৮	-১.৭৬
১৯৬৭-৬৮	১৩,২০,৭৫,৭৪৭	৮,৭৫,৯০,৪৩১	২১,৯৬,৬৬,১৭৮	৬,৭২,৩৫,৮১৪	৪,২৯,৪৮,৭২৯	১১,০১,৮৪,৫৪৩	..	১২৫.৮০	-১৪,০০,৫৪১	-১.৫৭

জেলাওয়ারী ভূমি রাজস্ব চাহিদা ও সংগ্রহ

বিভাগ*	জেলা	বছর	চাহিদা			আদায়			সুদ	চলতি চাহিদার আদায়ের হার (%)
			বকেয়া টাকা	চলতি টাকা	মোট টাকা	বকেয়া টাকা	চলতি টাকা	মোট টাকা	টাকা	
ঢাকা	ঢাকা	১৯৫৯-৬০	৪৭,০০,৩৮১	২১,৭৫,৩৫১	৬৮,৭৫,৭৩২	২২,৪০,৫৫৪	১৭,৪৬,১০৩	৩৯,৮৬,৬৫৭	..	১৮৩.২৭
		১৯৬০-৬১	৩০,১৫,০৮৪	৪৬,৩১,৯৮৫	৭৬,৪৭,০৬৯	২০,৭১,৯৭২	২২,৫৩,২১৫	৪৩,২৫,১৮৭	..	৯৩.৩৮
		১৯৬১-৬২	২৯,৯০,৯৫২	৪৫,৮৬,৭৮৮	৭৫,৭৭,৭৪০	২৬,১২,৪০৬	৩২,৩৪,৫৫০	৫৮,৪৬,৯৫৬	৩,১৯,১৭৬	১২৭.৪৭
		১৯৬২-৬৩	২৩,৮৫,৯১৮	৪৬,৩৪,৬২৫	৭০,২০,৫৪৩	১৩,৫০,৭৩৩	১৬,৮৯,৪৭১	৩০,৪০,২০৪	১,৬৭,৭২০	৬৫.৬০
		১৯৬৩-৬৪	৩৯,৮৭,৮৬৩	৪৬,৩২,৬২৫	৮৬,২২,৪৮৮	২৯,৯৭,৪৭৩	২৬,৫৯,৬৪৩	৫৬,৫৭,১১৬	..	১২২.১১
		১৯৬৫-৬৬	৩৪,৯৪,০০০	৪৫,৬১,৯৬৫	৮০,৫৫,৯৬৫	২৫,৯৭,২৮৮	২৬,৫৭,৫১২	৫২,৫৪,৮০০	..	১১৫.১৯
		১৯৬৬-৬৭	২৫,৩৪,২৩৩	৪৪,৫২,৬২০	৬৯,৮৬,৮৫৩	১৭,৪৪,০২৬	২৭,২৬,৯৬১	৪৪,৭০,৯৮৭	..	১০০.৪১
		১৯৬৭-৬৮	২৪,৯৭,৪২১	৪৪,৫২,৬২০	৬৯,৫০,০৪১	২৯,৫০,০৩৭	২৭,২৬,৯৭৩	৫৬,৭৭,০১০	..	১২৭.৫০
	ময়মনসিংহ	১৯৫৯-৬০	১,২৭,৬৭,২৫৫	১,৩১,৫১,৯০৭	২,৫৯,১৯,১৬২	৫৫,৪৮,৫৮০	৪৯,১০,৭৯৭	১,০৪,৫৯,৩৭৭	..	৭৯.৫৩
		১৯৬০-৬১	১,১২,৭২,৫৭২	১,২৫,৭৪,৪৩২	২,৩৮,৪৭,০০৪	৭৬,৬৯,৯৬০	৫৮,৯৩,২৬৭	১,৩৫,৬৩,২২৭	..	১০৭.৮৬
		১৯৬১-৬২	৮০,৬৩,০৭২	৯৫,৫৩,৯৫৮	১,৭৬,১৭,০৩০	৬৭,৫৪,০৮৮	৬০,১৩,০৭৭	১,২৭,৬৭,১৬৫	৮,৬৬,০৪১	১৩৩.৬৩
		১৯৬২-৬৩	৫৪,৩১,৭৬১	৯৫,৪৮,৭৭৫	১,১৪,৮০,৫৩৬	২১,১৭,৭৬৩	২০,৩৩,৮১৯	৪১,৫১,৫৮২	২,৪২,৯৭১	৪৩.৪৮
		১৯৬৩-৬৪	১,০৫,৫৭,৭১৫	৯৫,২৬,৯১৪	২,০০,৮৪,৬২৯	৬২,৩৬,০৪৬	৩৬,৩৬,৮০৮	৯৮,৭২,৮৫৪	..	১০৩.৬৩
		১৯৬৫-৬৬	১,০৬,৮৮,৩৮৬	৯৫,৯১,৭৮৬	২,০২,৮০,১৭২	৭০,৬৩,৩৩০	৪২,৯৪,৫৬১	১,১৩,৫৭,৮৯১	..	১১৮.৪১
		১৯৬৬-৬৭	১,৬০,৮৯,৪৮৬	৯৯,৭৮,৪০৮	২,৬০,৬৭,৮৯৪	৯০,৩৩,৯৮৯	৪৭,৬০,৭১০	১,৩৭,৯৪,৬৯৯	..	১৩৮.২৫
		১৯৬৭-৬৮	১,০৯,১৫,১২৬	৯৭,৬৪,৭১৫	২,০৬,৭৯,৮৪১	৬০,৪২,০০৪	৩৫,৯৪,৫৩৫	৯৬,৩৬,৫৩৯	..	৯৮.৬৯

ঢাকা	ফরিদপুর	১৯৫৯-৬০	১,১২,৬৭,৪২৬	৬০,৮৯,১২৯	১,৭৩,৫৬,৫৫৫	৩২,৫৫,৫১৩	১৯,৫৭,৮৭৮	৫২,১৩,৩৯১	..	৮৫.৬২
		১৯৬০-৬১	১,২১,৬০,০৫৩	৬৫,০১,৮৩৮	১,৮৬,৬১,৮৯১	৩৬,৫২,৯৩১	২০,১০,৩২২	৫৬,৬৩,২৫৩	..	৮৭.১০
		১৯৬১-৬২	৯৯,৬০,৭০৮	৪৪,৭৮,৩১৫	১,৪৪,৩৯,০২৩	৪১,৭৬,২২২	১৫,২২,৩৫৫	৫৬,৯৮,৫৭৭	৬,৮০,৩৫০	১২৭.২৫
		১৯৬২-৬৩	৮৭,৪০,৪৪৬	৪৪,৭৮,৩১৫	১,৩২,১৮,৭৬১	১৪,০৮,৭৭৪	৪,১৮,৯০৬	১৮,২৭,৬৮০	২,৬৮,১০১	৪০.৮১
		১৯৬৩-৬৪	১,১৩,৯১,০৮১	৪৪,৭৮,৩১৫	১,৫৮,৬৯,৩৯৬	৩৪,৪০,৯৯৫	১১,১৯,৫৯৯	৪৫,৬০,৫৯৪	..	১০১.৮৪
		১৯৬৫-৬৬	১,১৬,০২,৭০৩	৪৪,০০,১৭৭	১,৬০,০২,৮৮০	৩৫,৬৯,১৬৭	৯,৬৯,৬১৯	৪৫,৩৮,৭৮৬	..	১০৩.১৫
		১৯৬৬-৬৭	৯২,২০,৭১৪	৪১,২৪,৬৫২	১,৩৩,৪৫,৩৬৬	৩৮,৮৭,২৯৪	১৩,০৩,৫৩২	৫১,৯০,৮২৬	..	১২৫.৮৫
		১৯৬৭-৬৮	৮১,৫৪,৫৪০	৪১,২৪,৬৫২	১,২২,৭৯,১৯২	৩৫,৭৭,১৫৭	১২,৪৬,৯৩৯	৪৮,২৪,০৯৬	..	১১৬.৯৬
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১৯৫৯-৬০	১৯,৯৬,১০২	৪১,৩৫,৮৮৮	৬১,৩১,৯৯০	১৬,৪২,৮২৬	২৪,৬০,৪০৮	৪১,০৩,২৩৪	..	৯৯.২১
		১৯৬০-৬১	৩৭,৮৮,৮২৫	৬১,৪৫,৯৮৭	৯৯,৩৪,৮১২	১৬,৫০,৫৪৬	১৭,৯২,২০৮	৩৪,৪২,৭৫৪	..	৫৬.০২
		১৯৬১-৬২	৪৩,৮০,৪০১	৪৪,৬১,৩৮২	৮৮,৪১,৭৮৩	৩৬,৪৩,৪৯০	২৫,৭৩,৩৫৯	৬২,১৬,৮৪৯	৫,৮৩,২৮২	১৩৯.৩৫
		১৯৬২-৬৩	৪২,৫৭,৩৪৬	৪৬,২৭,২০৬	৮৮,৮৪,৫৫২	১৭,৪০,৮৪৮	১৪,৮২,৬৫৪	৩২,২৩,৫০২	২,৯৩,৭৬৬	৬৯.৬৬
		১৯৬৩-৬৪	৫৭,৪৮,৬১৫	৪৬,২৫,৭৩৭	১,০১,৭৪,৩৫২	৩২,৯৭,০৪১	২৪,২৮,২৬৫	৫৭,২৫,৩০৬	..	১২৩.৭৭
		১৯৬৫-৬৬	৩২,৭৪,৪৫১	৪২,৮৭,৯৯৮	৭৫,৬২,৪৪৯	২১,৭৫,৩৬৭	১৪,১১,১২৬	৩৫,৮৬,৪৯৩	..	৮৩.৬৪
		১৯৬৬-৬৭	৪৫,০০,১১৯	৫০,১৭,০০৪	৯৫,১৭,১২৩	২৫,৫০,৩৫৪	২২,৫৫,৩৮২	৪৮,০৫,৭৩৬	..	৯৫.৭৯
		১৯৬৭-৬৮	৩৭,৬০,৮৫৭	৪২,৮৭,৯৯৮	৮০,৪৮,৮৫৫	২৩,৭৮,৯০৪	১৮,৯৭,৬৭৮	৪২,৭৬,৫৮২	..	৯৯.৭৩
	কুমিল্লা	১৯৫৯-৬০	৮৩,৬৮,৩৬৯	৫০,৩৫,৫৩৫	১,৩৪,০৩,৯০৪	২৭,১৪,৮৪২	১৩,৪৪,৯১৮	৪০,৫৯,৭৬০	..	৮০.৬২
		১৯৬০-৬১	৯৩,৪৪,১৪৪	৫০,৩৫,৩৮৫	১,৪৩,৭৯,৫২৯	৩০,১০,৯৬৯	১৪,৩৪,৩৫৭	৪৪,৪৫,৩২৬	..	৮৮.২৮
		১৯৬১-৬২	৯৯,৩৪,২০৩	৫০,৩৩,১৫৫	১,৪৯,৬৭,৩৫৮	৩৯,২৩,৭৮৮	১৮,০৬,০৪৯	৫৭,২৯,৮৩৭	৫,৫৭,১৫৯	১১৩.৮৪
		১৯৬২-৬৩	৯২,৩৭,৫২১	৫০,৩০,৯২৫	১,৪২,৬৮,৪৪৬	১৯,৩১,৮৬৩	৯,৫৬,৭২০	২৮,৮৮,৫৮৩	৩,৩২,৪৫৫	৫৭.৪২
		১৯৬৩-৬৪	১,১৩,৭৯,৮৬৩	৫০,৩০,৯০৮	১,৬৪,১০,৭৭১	৪৪,৬৮,৩৬৬	২০,৭৩,৪৮১	৬৫,৪১,৮৪৭	..	১৩০.০৩
		১৯৬৫-৬৬	১,০৭,৩০,৪১৫	৫০,৩০,৩৭৫	১,৫৭,৬০,৭৯০	৪০,১৭,৯১৫	১২,৪৭,১০২	৫২,৬৫,০১৭	..	১০৪.৬৬
		১৯৬৬-৬৭	১,৩১,৩৪,৫১৭	৫১,২৮,৩২০	১,৮২,৬২,৮৩৭	৪৮,৫৮,১৮০	১৯,১৬,৮৮৩	৬৭,৭৫,০৬৩	..	১৩২.১১
		১৯৬৭-৬৮	১,১৩,৭১,০৮২	৪৯,৭৮,৫৩৬	১,৬৩,৪৯,৬১৮	৪২,৩০,৪৮২	১৬,০৫,৮১৭	৫৮,৩৬,২৯৯	..	১১৭.২৩
	নোয়াখালী	১৯৫৯-৬০	৩০,১৬,৪১৭	৩১,৭৯,৩৭০	৬১,৯৫,৭৮৭	১৩,২৯,১৫২	১২,০৮,০৯০	২৫,৩৭,২৪২	..	৭৯.৮০
		১৯৬০-৬১	৩৬,৫৮,৫৪৫	৩১,৭৯,৩৭০	৬৮,৩৭,৯১৫	১৩,৭৩,০৩৮	৬,৭৪,৬৫৯	২০,৪৭,৬৯৭	..	৬৪.৪১
		১৯৬১-৬২	৪৫,৯১,৯৭২	৩১,৭৯,৩৭০	৭৭,৭১,৩৪২	৩৩,৬৬,২৬১	১৬,২২,৬৮০	৪৯,৮৮,৯৪১	৪,৬৫,৮০২	১৫৬.৯২
		১৯৬২-৬৩	২৭,৮২,৪০১	৩১,৭৯,৩৭০	৫৯,৬১,৭৭১	১৬,৯২,৬৬০	৯,৫৪,৪৭০	২৬,৪৭,১৩০	২,৮৭,৩২১	৮৩.২৬
		১৯৬৩-৬৪	২৭,১১,২৮৩	৩১,৩৮,৭৮৮	৫৮,৫০,০৭১	২৭,২১,২৬১	২০,২২,২২৭	৪৭,৪৩,৪৮৮	..	১৫১.১২
		১৯৬৫-৬৬	১২,৯৩,৪৬৫	৩১,৩৮,৭৮৮	৪৪,৩২,২৫৩	১৯,০৫,৫৬৭	১৭,২৮,৪০৩	৩৬,৩৩,৯৭০	..	১১৫.৭৮
		১৯৬৬-৬৭	১৩,৭৪,৬৭৬	৩২,৬৬,৮৬৫	৪৬,৪১,৫৪১	১৮,১৯,৬২৭	১৭,৭৬,৩৫৭	৩৫,৯৫,৯৮৪	..	১১০.০৭
		১৯৬৭-৬৮	৯৫,৪৩,২০৬	৩৬,৬৫,৮১৭	১,৩২,০৯,০২৩	৪৪,৭৭,৬৪৬	১৫,২৮,৭৮৪	৬০,০৬,৪৩০	..	১৬৩.৮৫
	সিলেট	১৯৫৯-৬০	১,১২,৬৭,৪১৬	৭৩,৮৯,৩১৯	১,৮৬,৫৬,৭৩৫	৪২,৩৬,৮৭১	৯,৯৩,৬৯৪	৫২,৩০,৫৬৫	..	৭০.৭৯
		১৯৬০-৬১	১,৩৮,১৭,৮৫৪	৭৪,৭৫,৩৬৮	২,১২,৯৩,২২২	ঘড়ঃ ৎবঢ়ড়ৎঃবফ	ঘড়ঃ ৎবঢ়ড়ৎঃবফ	১,৫০,৩৯,৭৬৬	..	২০১.১৯
		১৯৬১-৬২	১,৭০,৯২,২৪৪	৭৯,৪৫,৪০৫	২,৫০,৩৭,৬৪৯	৪৭,৬০,০৪৩	১৬,১৪,০২৯	৬৩,৭৪,০৭২	৫,৯০,২৬৬	৮০.২২
		১৯৬২-৬৩	১,৮৬,৬৩,৫৭৭	৭৯,৪৫,৪০৫	২,৬৬,০৮,৯৮২	২০,৬৮,৭৮০	১০,২৬,৩৩৩	৩০,৯৫,১১৩	৩,০৪,৭৮৫	৩৮.৯৫

চট্টগ্রাম	সিলেট	১৯৬৩-৬৪	১,৭০,৯২,২৪৩	৭৯,৪৫,৪০৪	২,৫০,৩৭,৬৪৭	৪০,৮৪,১৪০	১৫,৯৮,৩১৩	৫৬,৭৭,৪৫৩	..	৭১.৪৬
		১৯৬৫-৬৬	১,১৬,৭১,২৭৬	৫৭,১২,১৪৩	১,৭৩,৮৩,৪১৯	৩১,৯৮,৭৬৮	১২,৩০,৭২৮	৪৪,২৯,৪৯৬	..	৭৭.৫৫
		১৯৬৬-৬৭	১,১৬,৪০,৬৭৫	৫৭,৯৯,৬০৭	১,৭৪,৩৩,২৮২	৪৫,২৭,৮৬০	১৯,০১,২০৬	৬৪,২৯,০৬৬	..	১১০.৮৫
		১৯৬৭-৬৮	১,০৪,০০,৫৮৮	৫৪,৭১,০৪৮	১,৫৮,৭১,৬৩৬	৬২,২৭,০১৮	১৯,১৪,০২১	৮১,৪১,০৩৯	..	১৪৮.৮০
খুলনা	খুলনা	১৯৫৯-৬০	৩০,৫৮,৫৬২	৫৪,২০,৯৮৫	৮৪,৭৯,৫৪৭	১৩,২৮,১৬৪	২৩,৪০,১৯৫	৩৬,৬৮,৩৫৯	..	৬৭.৬৭
		১৯৬০-৬১	৪৮,১১,১৮৮	৫৪,২০,৯৮৫	১,০২,৩২,১৭৩	২৮,৩৩,৯৮৫	৩৫,১৭,৬৬১	৬৩,৫১,৬৪৬	..	১১৭.১৭
		১৯৬১-৬২	৩৮,৮০,৫২৭	৫৪,২০,৯৮৫	৯৩,০১,৫১২	৩৪,১৮,৮৫৯	৪৩,৯৮,৪২৭	৭৮,১৭,২৮৬	৫,৩৪,৪২১	১৪৪.২০
		১৯৬২-৬৩	১৪,৮৪,২২৬	৫৪,২০,৯৮৫	৬৯,০৫,২১১	১৪,৮৪,২২৬	২৯,৫৭,২১৭	৪৪,৫১,৪৪৩	২,৫৮,৮২৮	৮২.১২
		১৯৬৩-৬৪	৩৫,৯৯,৩৭৯	৫৪,১৩,৭৮২	৯০,১৩,১৬১	২৫,৬৫,২৭৭	২৯,২৬,৮৭০	৫৪,৯২,১৪৭	..	১০১.৪৫
		১৯৬৫-৬৬	২৩,৫৬,৯৯৯	৫১,৭২,০৩৯	৭৫,২৯,০৩৮	২০,৬১,৮৬৩	২৯,০০,১৯০	৪৯,৬২,০৫৩	..	৯৫.৯৪
		১৯৬৬-৬৭	২৫,৬৫,৯৮৫	৫১,৭২,০৩৯	৭৭,৩৮,০২৪	২৫,৫১,১৭২	৩৮,৩৫,৯৩৫	৬৩,৮৭,১০৭	..	১২৩.৪৯
		১৯৬৭-৬৮	৩৭,৬১,০০৯	৭৫,২২,৪৯১	১,১২,৮৩,৫০০	৩৭,১৯,৪২২	৫৮,৭৪,৬০৮	৯৫,৯৪,০৩০	..	১২৭.৫৪
	যশোর	১৯৫৯-৬০	৬২,১১,৭০৬	৪৯,৬৬,৩৩৩	১,১১,৭৮,০৩৯	২৪,৫৪,৭৮৭	১৮,০৮,৭১২	৪২,৬৩,৪৯৯	..	৮৫.৮৫
		১৯৬০-৬১	৫২,৩০,১৬৪	৪৫,২৫,১৯৬	৯৭,৫৫,৩৬০	২৪,৭০,৭৪৬	১৮,৬৭,৮৬৭	৪৩,৩৮,৬১৩	..	৯৫.৮৮
		১৯৬১-৬২	৫৪,১৬,৭৪৭	৪৫,২৫,১৯৬	৯৯,৪১,৯৪৩	৩৮,৩৮,৩৩৯	২৬,১৩,৫৬৭	৬৪,৫১,৯০৬	৫,৫২,৫৬৬	১৪২.৫৮
		১৯৬২-৬৩	৩৫,৫৬,১৪১	৪৫,২৫,১৯৬	৮০,৮১,৩৩৭	১৩,০৩,৭১৫	১০,৮৪,৪০০	২৩,৮৮,১১৫	২,১১,৬৬৬	৫২.৭৭
		১৯৬৩-৬৪	৫৭,১০,৬৯৫	৪৫,২৫,১৯৬	১,০২,৩৫,৮৯১	৩২,৫৪,৫৯০	১৯,১২,৯৭৩	৫১,৬৭,৫৬৩	..	১১৪.২০
		১৯৬৫-৬৬	৪১,৩৮,৮০৫	৪৫,২৫,১৯৬	৮৬,৬৪,০০১	২৯,০৯,৬৬৮	১৯,৭৭,৬৬৪	৪৮,৮৭,৩৩২	..	১০৮.০০
		১৯৬৬-৬৭	৩৭,৭৬,৬৬৯	৪৫,২৫,১৯৬	৮৩,০১,৮৬৫	২৮,৭৮,৬৩৫	২০,৬৭,৭৯৫	৪৯,৪৬,৪৩০	..	১০৯.৩১
		১৯৬৭-৬৮	৩৩,৫৫,৪৩৫	৪৫,২৫,১৯৬	৭৮,৮০,৬৩১	৩১,৮৬,৬৩২	২৭,৪৬,৯৯৭	৫৯,৩৩,৬২৯	..	১৩১.১২
	কুষ্টিয়া	১৯৫৯-৬০	২৯,৩৮,০৫৬	২৪,৩৪,১৯৪	৫৩,৭২,২৫০	১০,৯৪,৭১০	৭,৩২,০২২	১৮,২৬,৭৩২	..	৭৫.০৪
		১৯৬০-৬১	৪৩,৪৫,২৩৬	৩৪,৯০,৭৪৭	৭৮,৩৫,৯৮৩	২১,৮৩,০১৯	১৭,১১,১৫৫	৩৮,৯৪,১৭৪	..	১১১.৫৬
		১৯৬১-৬২	৩৪,১৭,৭৮৮	২৩,৭৯,৮২০	৫৭,৯৭,৬০৮	২১,৪১,০০৫	১৪,২৭,৪৩১	৩৫,৬৮,৪৩৬	২,১২,২৮১	১৪৯.৯৫
		১৯৬২-৬৩	২২,২৯,১৭২	২৩,৬৫,৪৬৩	৪৫,৯৪,৬৩৫	৯,৫৫,৯১৪	৮,০৩,৪১৭	১৭,৫৯,৩৩১	১,০১,৪৬০	৭৪.৩৮
		১৯৬৩-৬৪	২২,৯৪,৮৮০	২২,৭৩,৮০২	৪৫,৬৮,৬৮২	১৮,৪৮,৪৪৩	১১,১৪,৮৫৫	২৯,৬৩,২৯৮	..	১৩০.৩২
		১৯৬৫-৬৬	২৫,৮১,৬২২	২৮,৩৯,৯৪০	৫৪,২১,৫৬২	২২,৮৮,৭৭৬	২০,৪৬,৫৯২	৪৩,৩৫,৩৬৮	..	১৫২.৬৬
		১৯৬৬-৬৭	২৫,২৪,০৪৫	৩৩,৭৩,৯৫৭	৫৮,৯৮,০০২	২২,৭২,৭৩২	২৯,২৩,৪৮১	৫১,৯৬,২১৩	..	১৫৪.০১
		১৯৬৭-৬৮	১৯,৭৯,৪৬৭	২৮,৯৬,৮১৯	৪৮,৭৬,২৮৬	২৩,২১,১০৯	৩১,৩০,৮১৯	৫৪,৫১,৯২৮	..	১৮৮.২০
	বাকেরগঞ্জ	১৯৫৯-৬০	১,০২,৩৮,৫৫০	১,১০,৯২,৬৫০	২,১৩,৩১,২০০	৩৩,২৮,৩০৩	৩৫,৯৮,৩৪৬	৬৯,২৬,৬৪৯	..	৬২.৪৪
		১৯৬০-৬১	১,৯৪,৮০,৯১২	১,৯৭,৩১,৮৮১	৩,৯৩,১২,৭৯৩	৬৯,৭৩,৫৭১	২২,০৯,৫২৩	১,২১,৮৩,০৯৪	..	৬১.৭৪
		১৯৬১-৬২	১,৭৩,১৮,১৪৯	১,০৯,৭৭,২৬৫	২,৮২,৯৫,৪১৪	৮২,৭১,৪১৫	৪৫,৭৭,১৭৯	১,২৮,৪৮,৫৯৪	৯,৫৩,৪০১	১১৭.০৫
		১৯৬২-৬৩	১,৫৪,৪৬,৮২০	১,০৯,৭৭,২৬৪	২,৬৪,২৪,০৮৪	৪৪,৪৫,৭২৬	২৩,৯৫,৬৭২	৬৮,৪১,৩৯৮	৫,৭১,৩৬৩	৬২.৩২
		১৯৬৩-৬৪	১,৯৫,৮২,৬৮৭	১,০৯,৭৭,২৬৫	৩,০৫,৫৯,৯৫২	৬২,৯৩,৫৬৯	২৯,০৬,৬৩৮	৯২,০০,২০৭	..	৮৩.৮১
		১৯৬৫-৬৬	২,১৩,৮৯,৪৫২	১,০৯,৭৫,৭২৪	৩,২৩,৬৫,১৬৬	১,০২,৯০,৭৯৫	৪৪,২৬,৭৮৮	১,৪৭,১৭,৫৮৩	..	১৩৪.০৯
		১৯৬৬-৬৭	১,৮৯,১৯,৫১৪	১,০৯,৭৩,৫২৬	২,৯৮,৯৩,০৪০	৭৩,২২,৭৭১	৩৯,৪২,৪৩৮	১,১২,৬৫,২০৯	..	১০২.৬৬
		১৯৬৭-৬৮	১,৮৬,২৪,৭৯৮	১,০৯,৭৩,১৫২	২,৯৫,৯৭,৯৫০	১,২১,৬৬,৭৪৭	৬৯,২৮,৪৭৬	১,৯০,৯৫,২২৩	..	১৭৪.০২

রাজশাহী	রাজশাহী	১৯৫৯-৬০	১,৩৭,৭৬,৯৬০	৯৫,২০,৮৭৯	২,৩২,৯৭,৮৩৯	৪৩,৩২,৬৮০	৩০,৮৫,৩১৪	৭৪,১৭,৯৯৪	..	৭৭.৯১
		১৯৬০-৬১	১,৫৮,৭৯,৮৪৫	১,০১,০৫,৪৯১	২,৫৯,৮৫,৩৩৬	৪২,৪১,২০৯	৩৬,৭৭,২৫৬	৭৯,১৮,৪৬৫	..	৭৮.৩৬
		১৯৬১-৬২	১,৩৮,৮০,৬৫১	৭২,০০,৮৭৪	২,১০,৮১,৫২৫	৪২,৬৬,৫২১	৩৩,২৯,৬৬৪	৭৫,৯৬,১৮৫	৬,৭৩,৮১৮	১০৫.৪৯
		১৯৬২-৬৩	১,৩৪,৮৫,৩৪০	৭২,০০,৮৭৪	২,০৬,৮৬,২১৪	২০,৭৯,০৯৬	২১,২০,১০৭	৪১,৯৯,২০৩	৩,৪৫,৩১৪	৫৮.৩২
		১৯৬৩-৬৪	১,৬৪,৮৭,০১১	৭২,০০,৮৭৪	২,৮৬,৮৭,৮৮৫	৪৩,৬৮,৮৭৬	২৯,১৯,৬৫৭	৭২,৮৮,৫৩৩	..	১০১.২২
		১৯৬৫-৬৬	২,৪১,৭৪,০৭৬	১,১১,১৫,১৭৪	৩,৫২,৮৯,২৫০	৪৯,৬২,৮৩৬	৩৬,১৪,৭৬৪	৮৫,৭৭,৬০০	..	৭৭.১৭
		১৯৬৬-৬৭	১,৮৯,৮২,২৫৩	৭২,৬০,৮৭৪	২,৬১,৮৩,১২৭	৬৫,০৪,৭৩১	৩৮,৬৪,৯৫৮	১,০৩,৬৯,৬৮৯	..	১৪২.৮২
		১৯৬৭-৬৮	১,৫৮,১৩,৪৩৮	৭২,০০,৮৭৪	২,৩০,১৪,৩১২	৩৭,০৭,৭০১	২৮,০৮,১৫৭	৬৫,১৫,৮৫৮	..	৯০.৪৯
	দিনাজপুর	১৯৫৯-৬০	১৩,৯৮,৪৮৮	৩৪,৪২,০৩২	৪৮,৪০,৫২০	৮,৪৬,৫৪৯	২১,০১,১৯৯	২৯,৪৭,৭৪৮	..	৮৫.৬৪
		১৯৬০-৬১	২০,৪৪,৫৬৪	৫৫,৮৪,৩১৭	৭৬,২৮,৮৮১	১২,৭০,০৭৫	৩১,১১,৯৩৫	৪৩,৮২,০১০	..	৭৮.৪৭
		১৯৬১-৬২	২২,২৭,৮১৬	৩৪,৪২,০৩২	৫৬,৬৯,৮৪৮	১৭,৬৮,৯৭৫	২৩,৭২,৫৩৮	৪১,৪১,৫১৩	২,৫৪,৩৬৭	১২০.৩২
		১৯৬২-৬৩	১১,১৯,৭৭৩	৩২,৬৮,৪২৪	৪৩,৮৮,১৯৭	৮,০৯,৮১৩	১৪,৬৬,১৩০	২২,৭৫,৯৪৩	১,৩৬,৫৪৮	৬৯.৬৩
		১৯৬৩-৬৪	১৯,৮০,১২৬	৩২,৫৮,০৫৬	৫২,৩৮,১৮২	১৫,১৫,৪৩৫	১৭,৪৯,৩১১	৩২,৬৪,৭৪৬	..	১০০.২১
		১৯৬৫-৬৬	৪৫,১২,৭৩৪	৫১,৭০,৪৬৮	৯৬,৮৩,২০২	৩৫,৪৪,২৮৮	৩২,২২,৩৯৯	৬৭,৬৬,৬৮৭	..	১৩০.৮৭
		১৯৬৬-৬৭	৩৫,৪১,৬৭০	৪৩,২৯,৮৭৬	৭৮,১৭,৫৪৬	২৮,৩৫,০০৮	৩৪,৬৬,৩৪০	৬৩,০১,৩৪৮	..	১৪৫.৫৩
		১৯৬৭-৬৮	৪১,৪১,৪৬১	৪৫,৪০,৭৯৯	৮৬,৮২,২৬০	২৩,৭৩,১১০	২০,০৮,৪৮৩	৪৩,৮১,৫৯৩	..	৯৬.৪৯
	রংপুর	১৯৫৯-৬০	৮৮,৩০,২২০	৮৭,৬০,৪৭২	১,৭৫,৯০,৬৯২	৩০,২০,২৫৪	২২,৮০,৩৮১	৫৩,০০,৬৩৫	..	৬০.৫১
		১৯৬০-৬১	১,২২,৯০,০৫৭	৮৭,৬০,৪৭২	২,১০,৫০,৫২৯	৪৩,৪৩,৫৮৮	২৬,৭০,০০০	৭০,১৩,৫৮৮	..	৮০.০৬
		১৯৬১-৬২	১,২২,০১,৮২৭	৭৮,২৯,২৮২	২,০০,৩১,১০৯	৪০,৩৬,৫৯৪	২২,৯০,৭৮৯	৬৩,২৭,৩৮৩	৬,১৪,৫৫৫	৮০.৮২
		১৯৬২-৬৩	১,৩৭,৩৮,৮৮৪	৭৮,২৯,২৮২	২,১৫,৬৮,১৬৬	২৯,০৪,৩৫৩	১৩,১৯,৩৮৩	৪২,২৩,৭৩৬	৫,১৬,৮৬৯	৫৩.৯৫
		১৯৬৩-৬৪	১,৭৩,৪৪,৪৩০	৭৮,২৯,২৮২	২,৫১,৭৩,৭১২	৪৫,৪৬,৯৩৮	১৯,৬০,২২৯	৭৫,০৭,১৬৭	..	৯৫.৮৯
		১৯৬৫-৬৬	১,৭৯,৪৭,৪৮২	৭৮,২৯,২৮২	২,৫৭,৭৬,৭৬৪	৩৮,৫৫,৮৩৯	১৪,০২,১৩৮	৫২,৯৭,৯৭৭	..	৬৭.৬৭
		১৯৬৬-৬৭	২,৬১,২৬,৬১৭	১,০৩,৭৩,৮০০	৩,৬৫,০০,৪১৭	৮৫,৭৬,৭৫৬	৪৯,১৯,২৯৯	১,৩৪,৯৬,০৫৫	..	১৩০.১০
		১৯৬৭-৬৮	২,৩৫,৭২,৬৫২	৭৮,৭২,২১০	৩,১৪,৪৪,৮৬২	৬৩,৮৫,১১৭	২০,৪০,৪৩৮	৮৪,২৫,৫৫৫	..	১০৭.০৩
	বগুড়া	১৯৫৯-৬০	৩৯,৭১,৮৬২	২৪,৭৮,১২৮	৬৪,৪৯,৯৯০	২০,৭১,৩৫০	৩৬,৮৯,৯১৪	৫৭,৬১,২৬৪	..	২৩২.৪৮
		১৯৬০-৬১	৬,৮৮,৭২৬	৩১,৬৪,২৫৯	৩৮,৫২,৯৯৫	৬,৩৩,২৪৬	২৪,৫০,১৭৪	৩০,৮৩,৪২০	..	৯৭.৪৫
		১৯৬১-৬২	১০,৬২,৭০৪	২৪,৭৫,৭৪৭	৩৫,৩৮,৪৫১	৮,২২,৭৯১	২২,৪৪,৫৬৭	৩০,৬৭,৩৫৮	১,০২,১১৮	১২৩.৯০
		১৯৬২-৬৩	৪,৭১,০৯৩	২৫,১৪,৩৮৭	২৯,৮৫,৪৮০	৪,৩৯,২৮৬	৯,৮৩,৭১০	১৪,২২,৯৯৬	৫৫,৬২২	৫৬.৫৯
		১৯৬৩-৬৪	৩০,২৬,৩৭২	২৬,২৮,৯০১	৫৬,৫৫,২৭২	১৭,৯৪,৩৬৮	১৬,৪৭,৩৩০	৩৪,৪১,৬৯৮	..	১৩০.৯২
		১৯৬৫-৬৬	২৬,৪০,৪৮৩	৩২,৫৫,৬১৪	৫৮,৯৭,০৯৭	১৮,৮৫,২১৩	১৮,৮৭,২৯৯	৩৭,৭২,৫১২	..	১১৫.৮৮
		১৯৬৬-৬৭	১৭,০৪,৪৬৬	২৪,৯৯,৪৪৫	৪২,৬৩,৯১১	১৪,৪০,০৮৫	১৮,৪১,৭৯৩	৩২,৮১,৮৭৮	..	১৩১.৩০
		১৯৬৭-৬৮	৯,২৫,০৩৩	২৫,৫৬,২৫৫	৩৪,৮১,২৮৮	৭,০৫,৯৪৩	১৭,৬৯,২৬২	২৪,৭৫,২০৫	..	৯৬.৮৩
	পাবনা	১৯৫৯-৬০	৪০,৫৫,৯৫৬	৩২,৭৯,৮১৭	৭৩,৩৫,৭৭৩	২১,১৫,৯৪০	৮,২০,২২৯	২৯,৩৬,১৬৯	..	৮৯.৫২
		১৯৬০-৬১	৪৩,৯৫,৬২৪	৩৮,৭০,০০২	৮২,৬৫,৬২৬	২৬,৪৭,১৩৪	১০,১৭,৭২৭	৩৬,৬৪,৮৬১	..	৯৪.৭০
		১৯৬১-৬২	৩৬,৭১,৬১১	৩০,৩৫,৫৪২	৬৭,০৭,১৫৩	৩১,১১,৮৩৯	১৬,১০,৭৯৬	৪৭,২২,৬৩৫	৪,৮৫,৫৩৩	১৫৫.৫৮
		১৯৬২-৬৩	১৯,৮৪,৫১৮	৩০,৩৫,৫৪২	৫০,২০,০৬০	৩,৬৬,০৫০	১,৯২,৯২০	৫,৫৮,৯৭০	৭০,৬৩৬	১৮.৪১

রাজশাহী	পাবনা	১৯৬৩-৬৪	৪৫,২৯,১৮৯	৩০,৩৫,৫৪২	৭৫,৬৪,৭৩১	২৪,৫৩,৪৭৩	১০,৪৮,১৭৬	৩৫,০১,৬৪৯	..	১১৫.৩৫
		১৯৬৫-৬৬	৪৩,৮২,৩৬১	২৯,৮২,১৩১	৭৩,৬৪,৪৯২	২২,৩৩,৯৬৪	৭,৭৭,৯৪৫	৩০,১১,৯০৯	..	১০১.০০
		১৯৬৬-৬৭	৪২,৬৫,৩৪৫	২৭,৭৪,৭৮৩	৬৯,৮০,১২৮	২৫,৪৯,২৯২	১১,৭১,২০২	৩৭,২০,৪৯৪	..	১৩৪.০৮
		১৯৬৭-৬৮	৩২,৫৯,৬৩৪	২৭,৫৭,২৪৯	৬০,১৬,৮৮৩	২৭,৮৬,৭৮৫	১১,২৬,৭৪২	৩৯,১৩,৫২৭	..	১৪১.৯৪

* ১৯৫৯-৬০ এবং ১৯৬০-৬১ সালের বার্ষিক ভূমি রাজস্ব প্রশাসন রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬টি জেলাকে চারটি বিভাগে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছে।

† ১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৫-৬৬ সালের বার্ষিক ভূমি রাজস্ব প্রশাসন রিপোর্টে ময়মনসিংহ জেলাকে পূর্ব জোন ও পশ্চিম জোন হিসেবে বিভক্ত করে দেখানো হয় এবং ক পূর্ব জোন ও পশ্চিম জোনের বকেয়া চাহিদা, চলতি চাহিদা ও মোট চাহিদা পৃথকভাবে দেখানো হয়, হিসেবের সুবিধার্থে এখানে একত্রে দেখানো হয়েছে।

◘ বিবিধ সংগ্রহসহ।

উৎস : *Report on the Land Revenue Administration of East Pakistan for the year 1959-60*, p. 28; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1960-61*, p. 33; *Annual Land Revenue Administration Reports for the year 1961-62*, p. 36; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1962-63*, p. 30; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1963-64*, p. 24; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1965-66*, p. 27; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1966-67*, p. 26-27; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1967-68*, p. 24.

সারণি ৪০

১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭ সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য কর আদায়

রাজস্বের ক্ষেত্র	১৯৬৩-৬৪		১৯৬৪-৬৫		১৯৬৫-৬৬		১৯৬৬-৬৭*	
	টাকা	হার	টাকা	হার	টাকা	হার	টাকা	হার
ভূমি রাজস্ব	৯,৬৯,২১,৮৫৯	৬২.০৩	৮,১৪,৩৮,৪৭৪	৫৮.৫৩	৮,৪১,৬০,৯৮৮	৫৪.২৮	৫৫,৫৯,১৫১	৫৩.০৮
ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য কর*	৫,৯৩,৩২,৮৩৩	৩৭.৯৭	৫,৭৭,০৪,৪৮৬	৪১.৪৭	৭,০৯,০২,৪৪৮	৪৫.৭২	৪৯,১৩,৪৪৫	৪৬.৯২
সর্বমোট	১৫,৬২,৫৪,৬৯২	১০০%	১৩,৯১,৪২,৯৬০	১০০%	১৫,৫০,৬৩,৪৩৬	১০০%	১,০৪,৭২,৫৯৬	১০০%

*৩০-০৯-১৯৬৬ তারিখ পর্যন্ত আদায়।

* ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭ সময়কালের ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য কর আদায়

বছর	ক্ষেত্র	রাজস্ব
		টাকা
১৯৬৩-৬৪	রাস্তা ও পুর্ত কর (Rd. and P.W. cess)	৬,৩৬,৩৮০
	শিক্ষা কর (Education cess)	১,০০,৫৯,৩৫৬
	স্থানীয় কর (Local Rate)	৮৭,০৮,০৮৭
	উন্নয়ন কর (D.R. Tax)	২,০৪,৩০,৯৮৫
	বিবিধ (হাট ও বাজার, সেলামি, মৎস্য ইত্যাদি) [Misc. (Hats and Bazars, Fisheries, selmi, etc.)]	১,৯৪,৯৮,০২৫
	সর্বমোট	৫,৯৩,৩২,৮৩৩
১৯৬৪-৬৫	রাস্তা ও পুর্ত কর (Rd. and P.W. cess)	৩,৫৪,৫৪১
	শিক্ষা কর (Education cess)	১,০৭,৮৪,০৬৩
	স্থানীয় কর (Local Rate)	৯৩,১৫,৭৫৬
	উন্নয়ন কর (D.R. Tax)	১,৯২,১৯,৪৭০
	বিবিধ (হাট ও বাজার, সেলামি, মৎস্য ইত্যাদি) [Misc. (Hats and Bazars, Fisheries, selmi, etc.)]	১,৮০,৩০,৬৫৬
	সর্বমোট	৫,৭৭,০৪,৪৮৬
১৯৬৫-৬৬	রাস্তা ও পুর্ত কর (Rd. and P.W. cess)	২,৭২,০৯২
	শিক্ষা কর (Education cess)	১,২৫,২৩,৮২১
	স্থানীয় কর (Local Rate)	৯৮,০৪,৩৮৪
	উন্নয়ন কর (D.R. Tax)	১,৯৮,৪১,১৮২
	বিবিধ (হাট ও বাজার, সেলামি, মৎস্য ইত্যাদি) [Misc. (Hats and Bazars, Fisheries, selmi, etc.)]	২,৮৪,৬০,৯৬৯
	সর্বমোট	৭,০৯,০২,৪৪৮
১৯৬৬-৬৭*	রাস্তা ও পুর্ত কর (Rd. and P.W. cess)	২৩,৬৫৩
	শিক্ষা কর (Education cess)	৭,৯০,০৫৩
	স্থানীয় কর (Local Rate)	৬,৩৩,২১৪
	উন্নয়ন কর (D.R. Tax)	১৩,০০,২৬১
	বিবিধ (হাট ও বাজার, সেলামি, মৎস্য ইত্যাদি) [Misc. (Hats and Bazars, Fisheries, selmi, etc.)]	২১,৬৬,২৬৪
	সর্বমোট	৪৯,১৩,৪৪৫

*৩০-০৯-১৯৬৬ তারিখ পর্যন্ত আদায়।

উৎস : *Assembly Proceedings*, Vol. XXXI, No. 1, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, First Session, 1967, The 3rd, 4th, 5th, 7th, and 9th January, 1967 (Dacca : East Pakistan Governement Press, 1967), pp. 214-215.

সারণি ৪১

পাকিস্তান শাসনামলে খাস জমির পরিমাণ (অক্টোবর, ১৯৬২)

(একর হিসেবে)

জমির প্রকারভেদ	খাস জমি (Khas Land)	বন্দোবস্ত (Area Settled)	স্থিতি (Balance)
চাষযোগ্য (Arable Land)	৪,৭৮,১৭৯	৩,৩২৫	৪,৭৪,৮৫৪
পতিত জমি (Waste Land)	১,০৭,৬৬৪	৩০	১,০৭,৬৩৪
পার্বত্য এলাকার জমি (Hillside Land)	৩০,৮০০	-	৩০,৮০০
উপকূলীয় এলাকার জমি (Coastal Land)	১,৫৫০	-	১,৫৫০
দাবিকৃত জমি (Land which are subject to claims)	১২,১৭৮	১,০৪৭	১১,১৩১
মোট	৬,৩০,৩৭১	৪,৪০২	৬,২৫,৯৬৯

উৎস : Ali, "*Land Reform Measures and Their Implementation in Bangladesh*", p. 165.

সারণি ৪২

সেকশন ৬(৪) ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন বছরে দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম

বছর	পূর্বের বছরের অপেক্ষমান মামলা	চলতি বছরের দায়েরকৃত মামলা	মোট মামলা	মীমাংসিত মামলা	অপেক্ষমান মামলা	বাতিল মামলা	প্রমাণিত মামলা	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি	সতর্ককরণ/ সাময়িক বরখাস্তকরণ/ পদাবনতি/ ইনক্রিমেন্ট বন্ধ	জেলা থেকে বদলী/ প্রত্যাহার	চাকুরিচ্যুত
১৯৫৯-৬০	..	৩৩	২৩	১৬	৭	..	..	..	১৪	..	২
১৯৬০-৬১	..	২৫	২৫	১২	১৩	..	..	১	৯	..	৩
১৯৬১-৬২	..	২১	২১	৯	১২	..	..	..	৬	..	৩
১৯৬২-৬৩	..	৬৩	৬৩	১৩	৫০	..	১	২০	৯	..	৩
১৯৬৩-৬৪	..	১৪২	১৪২	১৫	১২৭	..	..	..	..	..	..
১৯৬৫-৬৬	..	১৬৮	১৬৮	১৫৩	১৫	..	২	৩	..	..	১
১৯৬৬-৬৭	..	৪	৪	১	৩	..	..	..	১	..	..
১৯৬৭-৬৮	১	৮	৯		৯	..	..	..	..	..	..

দ্রষ্টব্য : প্রাপ্ত হিসেব আংশিক, কারণ সকল জেলার সম্পূর্ণ হিসেব পাওয় যায়নি।

সেকশন ৬(৪) ধারা অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন বছরে দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম

বিভাগ	জেলা	বছর	পূর্বের বছরের অপেক্ষমান মামলা	চলতি বছরের দায়েরকৃত মামলা	মোট মামলা	মীমাংসিত মামলা	অপেক্ষমান মামলা	বাতিল মামলা	প্রমাণিত মামলা	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি	সতর্ককরণ/ সাময়িক বরখাস্তকরণ/ পদাবনতি/ ইনক্রিমেন্ট বন্ধ	জেলা থেকে বদলী/ প্রত্যাহার	চাকুরিচ্যুত
ঢাকা	ঢাকা	১৯৫৯-৬০	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬০-৬১	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬১-৬২	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	১৪৮	১৪৮	১৪৪	৪	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৭-৬৮	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	ময়মনসিংহ	১৯৫৯-৬০	..	৩	৩	৩	..	৩	..	..	..	..	..
		১৯৬০-৬১	..	২	২	..	২	..	..	..	..	..	..
		১৯৬১-৬২	..	১	১	..	১	..	..	১	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৭-৬৮	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	ফরিদপুর	১৯৫৯-৬০	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬০-৬১	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬১-৬২	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	১১৫	১১৫	..	১১৫	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	১২	১২	৫	৭	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৭-৬৮	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১৯৫৯-৬০	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬০-৬১	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬১-৬২	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৭-৬৮	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	কুমিল্লা	১৯৫৯-৬০	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬০-৬১	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬১-৬২	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৭-৬৮	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	১৯৫৯-৬০	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬০-৬১	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬১-৬২	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	..[X]	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	১	১	১	..	..	..	..	১[ш]	..	..
		১৯৬৭-৬৮	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	সিলেট	১৯৫৯-৬০	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬০-৬১	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬১-৬২	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৭-৬৮	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
খুলনা	খুলনা	১৯৫৯-৬০	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬০-৬১	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬১-৬২	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	..	১	১	১	..	..	১[H]	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	..[X]	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৭-৬৮	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	যশোর	১৯৫৯-৬০	..	১০	১০	৬	৪	..	..	..	৪[ƒ]	..	২
		১৯৬০-৬১	..	১৩	১৩	৩	১০	..	..	..	১	..	২
		১৯৬১-৬২	..	১৫	১৫	৩	১২	..	..	..	১	..	২
		১৯৬২-৬৩	..	২০	২০	১২	৮	..	..	২০	৯[ṫ]	..	৩
		১৯৬৩-৬৪	..	২০	২০	১৫	৫	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	৫	২	৩	..	..	..	..	..	..	১
		১৯৬৬-৬৭	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৭-৬৮	১	৫[Ȁ]	৬	..	৬	..	..	..	..	..	..
	কুষ্টিয়া	১৯৫৯-৬০	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬০-৬১	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬১-৬২	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৭-৬৮	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	বাকেরগঞ্জ	১৯৫৯-৬০	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬০-৬১	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬১-৬২	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৭-৬৮	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
রাজশাহী	রাজশাহী	১৯৫৯-৬০	..	১০	১০	১০	..	..	..	..	১০	..	..
		১৯৬০-৬১	..	৬	৬	৬	..	..	..	..	৫	..	১
		১৯৬১-৬২	..	৯	৯	৯	..	..	..	..	৮[Ŝ]	..	১
		১৯৬২-৬৩	..	৪২[ʲ]	৪২	..	৪২	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	৭	৭	..	৭	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	৩	২	১	..	..	২[Ṗ]	৩	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	২	২	..	২	..	..	..	..	..	..
	দিনাজপুর	১৯৬৭-৬৮	..	১[Ṗ]	১	..	১	..	..	..	..	..	..
		১৯৫৯-৬০	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬০-৬১	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬১-৬২	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৭-৬৮	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	রংপুর	১৯৫৯-৬০	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬০-৬১	..	৬	৬	৬	..	..	..	..	..	..	৬
		১৯৬১-৬২	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	১	১	..	১	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৭-৬৮	..	২[Ḣ]	২	..	২	..	..	..	..	..	..
	বগুড়া	১৯৫৯-৬০	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

রাজশাহী	বগুড়া	১৯৬০-৬১	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬১-৬২	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৭-৬৮	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	পাবনা	১৯৫৯-৬০	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬০-৬১	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬১-৬২	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬২-৬৩	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৩-৬৪	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৫-৬৬	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৬-৬৭	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		১৯৬৭-৬৮	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

উৎস : *Report on the Land Revenue Administration of East Pakistan for the year 1959-60*, p. 20; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1960-61*, p. 25; *Annual Land Revenue Administration Reports for the year 1961-62*, p. 28; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1962-63*, p. 23; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1963-64*, p. 16-17; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1965-6*6, p. 20; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1966-67*, p. 18-19; *Annual Land Revenue Administration Report for the year 1967-68*, p. 17.

সারণি ৪৩

১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্প্রদায় ভিত্তিক জনসংখ্যা

	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হার	মুসলমান	শতকরা হার	হিন্দু	শতকরা হার	অন্যান্য	শতকরা হার
পূর্ব পাকিস্তান	৪,১৯,৩২,৩২৯	৫৫.৪১	৩,২২,২৬,৬৩৯	৭৬.৮৫	৯২,৩৯,৬০৩	২২.০৪	৪,৬৬,০৮৭	১.১১
পশ্চিম পাকিস্তান	৩,৩৭,৪০,১৬৭	৪৪.৫৯	৩,২৭,৬৯,১৬৭	৯৭.১২	৫,৩১,০০০	১.৫৮	৪,৪০,০০০	১.৩০
পাকিস্তান	৭,৫৬,৭২,৪৯৬	১০০						

উৎস : *Census of Pakistan Population, 1951*, East Bengal, Vol. 3, (Karachi : Government of Pakistan, 1952), p. 6-2; *Census of Pakistan Population, 1961*, Vol. I, Pakistan (Karachi : Ministry of Home and Kashmir Affairs, 1964), p. II-24.

সারণি ৪৪

১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্প্রদায় ভিত্তিক জনসংখ্যা

	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হার	মুসলমান	শতকরা হার	হিন্দু	শতকরা হার	অন্যান্য	শতকরা হার
পূর্ব পাকিস্তান	৫,০৮,৪০,২৩৫	৫৪.১৮	৪,০৮,৯০,৮০১	৮০.৪৩	৯৩,৮০,০২৩	১৮.৪৫	৫,৬৯,৪১১	১.১২
পশ্চিম পাকিস্তান	৪,২৯,৯১,৭৬৫	৪৫.৮২	৪,১৭,৭৭,৭৬৫	৯৭.১৮	৬,২২,০০০	১.৪৫	৫,৯২,০০০	১.৩৭
পাকিস্তান	৯,৩৮,৩২,০০০	১০০						

* নন-পাকিস্তানীসহ পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ছিল ৫,০৮,৫৪,০০০ জন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৫,০৮,৪০,২৩৫ জন।

উৎস : *Census of Pakistan Population, 1961*, Vol. I, pp. II-2, II-14 and II-24.

সারণি ৪৫
১৯৭০ সালের নির্বাচনে আইন কাঠামো অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসন বণ্টন

জাতীয় পরিষদ					
	প্রদেশ	সাধারণ আসন	মহিলা আসন	মোট	সর্বমোট
পূর্ব পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭	১৬৯	১৬৯
পশ্চিম পাকিস্তান	পাঞ্জাব	৮২	৩	৮৫	১৪৪
	সিন্ধু	২৭	১	২৮	
	বেলুচিস্তান	৪	১	৫	
	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	১	১৯	
	কেন্দ্র শাসিত উপজাতি এলাকা	৭	-	৭	
	সর্বমোট				৩১৩
প্রাদেশিক পরিষদ					
পূর্ব পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০	৩১০	৩১০
পশ্চিম পাকিস্তান	পাঞ্জাব	১৮০	৬	১৮৬	৩১১
	সিন্ধু	৬০	২	৬২	
	বেলুচিস্তান	২০	১	২১	
	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২	৪২	
	কেন্দ্র শাসিত উপজাতি এলাকা				৬২১
	সর্বমোট				

উৎস : রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২১১; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৭৯।

সারণি ৪৬
১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী প্রতিক, প্রার্থী সংখ্যা, প্রাপ্ত আসন, প্রাপ্ত ভোট ও প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ

রাজনৈতিক দল	নির্বাচনী প্রতীক	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ
১. আওয়ামী লীগ	নৌকা	১৬২	১৬০	১,২৩,৩৮,৯২১	৭৪.৯
২. মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	সাইকেল	৯৩		৪,৬৪,১৮৫	২.৮
৩. পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)	ছাতা	৮১	১	৪,৮৩,৫৭১	২.৯
৪. জামায়াতে ইসলামী	দাঁড়িপাল্লা	৭০		৯,৯১,৯০৮	৬.০
৫. মুসলিম লীগ (কাইয়ুম গ্রুপ)	বাঘ	৬৫		১,৭৫,৮২২	১.০
৬. মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	হারিকেন	৫০		২,৭৪,৪৫৩	১.৬
৭. জমিয়াতুল উলামা-ই-ইসলাম ও নেজামে ইসলাম	বই	৪৫			
৮. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী গ্রুপ)	কুঁড়েঘর	৩৯		৩,১০,৯৮৬	১.৮
৯. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী গ্রুপ)	ধানের শীষ	১৫			
১০. পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ	লাঙ্গল	১৩			
১১. জামায়াতে-উল-উলামায়ে ইসলাম	খেজুর গাছ	১৩			
১২. ইসলামী গণতান্ত্রিক দল (শর্ষিণা পীরের দল)	গাভী	৫			
১৩. সংখ্যালঘুদের জাতীয় কংগ্রেস	কলম	৪			
১৪. সংখ্যালঘুদের জাতীয় গণমুক্তি দল	মোমবাতি	৪			
১৫. কৃষক শ্রমিক পার্টি	হুক্কা	৩			
১৬. পাকিস্তান দরদী সংঘ	গরুরগাড়ী	১			
১৭. বেলুচিস্তান যুক্তফ্রন্ট	চেয়ার	১			
১৮. স্বতন্ত্র প্রার্থী	বিভিন্ন ধরনের প্রতীক	১৩৯	১	৫,৬১,০৮৩	৩.৪
সর্বমোট		৮০৩	১৬২		

উৎস : আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন*, পৃ. ২৩; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২২০; রশিদ, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা*, পৃ. ৭২; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৮২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০।

সারণি ৪৭
১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	বেলুচিস্তান	কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	মহিলা	মোট
আওয়ামী লীগ	১৬০						৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি		৬৪	১৮	১			৫	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)		১	১	৭				৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)		৭						৭
জমিয়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম (হাজারভী গ্রুপ)				৬	১			৭
মারকায-ই-জমিয়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম		৪	৩					৭
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)				৩	৩		১	৭
জামায়াতে ইসলামী		১	২	১				৪
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)		২						২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১							১
স্বতন্ত্র	১	৩	৩			৭		১৪
সর্বমোট	১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

উৎস : এ এস এম সামছুল আরেফিন (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নির্বাচন, ১৯৭০-২০০১* (ঢাকা : বাংলাদেশ রির্সাচ এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩), পৃ. ২৩; হারুন-অর-রশিদ, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা* (ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, ২০২০), পৃ. ৭২; মোশারফ হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন : বাংলাদেশের অভ্যুদয়* (ঢাকা : দ্যু প্রকাশন, ২০২০), পৃ. ১৮৪-১৮৫; রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২২৪; রশিদ, *বাংলাদেশ*, পৃ. ২৮২-২৮৩।

সারণি ৪৮
১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	সাধারণ আসন		মহিলা আসন	মোট প্রাপ্ত আসন	সাধারণ আসনে প্রাপ্ত ভোট (%)
	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন			
১. আওয়ামী লীগ	৩০০	২৮৮	১০	২৯৮	৭০.৪৫
২. পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১৪৪	২		২	১.৯৮
৩. জামায়াতে ইসলামী	১৭৪	১		১	৪.৫০
৪. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ওয়ালী-মস্কোপন্থী)	১০৭	১		১	৩.২৭
৭. মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	২০৮				৩.৫৪
৮. মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	১১৬				১.২২
৯. মুসলিম লীগ (কাইয়ুম গ্রুপ)	১২৮				১.১১
১০. জামিয়াত-ই-উলামায়ে ইসলাম	২৩				০.৫১
৫. মারকাযে জমিয়তে-ই-উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম	৬৩				১.৪৮
৬. পাকিস্তান পিপলস পার্টি	৩				০.০২
১২. অন্যান্য দল	১০৪				১.১৬
১৪. স্বতন্ত্র	৪৮০	৮		৮	১০.৭৬
সর্বমোট	১৮৫০	৩০০	১০	৩১০	১০০.০০

উৎস : রশিদ, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা*, পৃ. ৭৩।

সারণি ৪৯
১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান হতে জাতীয় পরিষদের ১৬২ জন নির্বাচিত সদস্যের পেশা

পেশা	শতকরা হার	সংখ্যা
১. আইনজীবী	৩৫.৮০	৫৮
২. শিক্ষাবিদ	৯.২৬	১৫
৩. রাজনীতি	৮.৬৪	১৪
৪. কৃষিজীবী	৬.৭৯	১১
৫. ব্যবসায়ী	৬.৭৯	১১
৬. চিকিৎসক	৩.০৯	৫
৭. সমাজসেবা	২.৪৭	৪
৮. সামরিক কর্মকর্ত	১.৮৫	৩
৯. সাংবাদিকতা	০.৬২	১
১০. রাজা (চাকমা)	০.৬২	১
১১. পেশার উল্লেখ নেই	২৪.০৭	৩৯
সর্বমোট		১৬২

বসবাসের দিক থেকে :

- ১০৮ জন (৬৬.৬৭%) গ্রাম তথা মফস্বলে বসবাস করতেন।
- ৪২ জন (২৫.৯৩%) বিভাগ, জেলা ও মহাকুমা শহরে বসবাস করতেন।
- ১২ জন (৭.৪১%) ঢাকা শহরে বসবাস করতেন। উল্লেখ্য, ঢাকা জেলায় জাতীয় পরিষদের ১৬টি আসন ছিল।

উৎস : আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন*, পৃ. ৫০২-৫০৭।

সারণি ৫০
১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ জন নির্বাচিত সদস্যের পেশা

পেশা	শতকরা হার	শতকরা হার
১. আইনজীবী	১৮.৩৩	সংখ্যা
২. ব্যবসায়ী	১১.৩৩	৫৫
৩. কৃষিজীবী	১০.৩৩	৩৪
৪. চিকিৎসক	৮.৬৭	৩১
৫. শিক্ষাবিদ	৬.৬৭	২৬
৬. রাজনীতিবিদ	৪.৬৭	২০
৭. সামরিক কর্মকর্তা	২.০০	১৪
৮. সমাজসেবী	১.৩৩	৬
৯. প্রকৌশলী	১.০০	৪
১০. সরকারি কর্মকর্তা	০.৬৭	৩
১১. সাংবাদিক	০.৩৩	২
১১. পেশার উল্লেখ নেই	৩৪.৬৭	১
সর্বমোট		৩০০

বসবাসের দিক থেকে :

২৩১ জন (৭৭%) গ্রাম তথা মফস্বলে বসবাস করতেন।

৬৩ জন (২১%) বিভাগ, জেলা ও মহাকুমা শহরে বসবাস করতেন।

৬ জন (২%) ঢাকা শহরে বসবাস করতেন। উল্লেখ্য, ঢাকা জেলায় প্রাদেশিক পরিষদের ৩০টি আসন ছিল।

উৎস : আরেফিন, *বাংলাদেশের নির্বাচন*, পৃ. ৫০৮-৫১৭।

গ্রন্থপঞ্জী

প্রাথমিক উৎস (PRIMARY SOURCES)

১. NATIONAL ARCHIVES

‘B’ Proceedings : Revenue Department, Land Revenue Brabch

Revenue Bundle No. 231, SL. No. 218; Revenue Bundle No. 232, SL. No. 219; Revenue Bundle No. 233, SL. No. 220; Revenue Bundle No. 234, SL. No. 221; Revenue Bundle No. 235, SL. No. 222; Revenue Bundle No. 236, SL. No. 223; Revenue Bundle No. 237, SL. No. 224; Revenue Bundle No. 238, SL. No. 225.

২. PERLAMENTARY PROCEEDINGS

Assembly Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Assembly, Vol. LVI, No. 4, Seventh Session, 1940, The 13th, 14th, 15th, 18th, 19th, and 20th March, 1940 (Alipore : Bengal Government Press, 1940).

Assembly Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Assembly, Vol. LXIX, No. 2, Twenty Session, 1945, The 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 27th, 28th and 29th March, 1945 (Alipore : Bengal Goverment Press, 1945).

Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. III, No. 3, Third Session, 1949, The 26th, 28th, 29th, 30th, 31st March and 1st April, 1949 (Dacca : East Bengal Government Press, 1952).

Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. III, No. 4, Third session, 1949, The 2nd, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 11th April, 1949 (Dacca : East Bengal Government Press, 1952).

Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. IV, No. 5, Fourth Session, 1949-50, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th and 19th December, 1949 (Dacca : East Bengal Government Press, 1952).

Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. IV, No. 6, Fourth Session, 1949-50, The 6th, 7th, 9th, 10th, 13th, 14th, 15th and 16th February, 1950 (Dacca : East Bengal Government Press, 1952).

Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. IV, No. 7, Fourth Session, 1949-50, The 25th, 27th, 28th, February, 1st and 2nd March, 1950 (Dacca : East Bengal Government Press, 1952).

Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. V, No. 1, Fifth Session, 1951, The 15th, 16th, 17th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 26th, 27th and 28th February, 1951 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1953).

Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. V, No. 2, Fifth Session, 1951, The 1st, 2nd, 3rd, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th, and 13th March, 1951 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1953).

Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. VI, No. 1, Sixth Session, 1951, 17th, 19th, 20th, 22nd, 23rd, 24th, 25th and 26th October, 1951 (Dacca : East Bengal Government Press, 1953).

Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. VI, No. 2, Sixth Session, 1951, 30th, 31st October, 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th, 8th, 9th, 10th and 12th November, 1951 (Dacca : East Bengal Government Press, 1953).

Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. IX, No. 1, Ninth Session, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 13th, 14th, 17th, 20th and 21st October, 1952 (Dacca : East Bengal Government Press, 1954).

Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. IX, No. 2, Ninth Session, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 28th, 29th, 30th, 31st October and 1st November, 1952 (Dacca : East Bengal Government Press, 1954).

Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. X, No. 1, Tenth Session, 25th, 26th and 27th February, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 14th, 16th, 17th, 18th, 19th and 20th March, 1953 (Dacca : East Bengal Government Press, 1954).

Assmbly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. X, No. 2, Tenth Session, 21st, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 30th and 31st March and 1st April, 1953 (Dacca : East Bengal Government Press, 1954).

Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, Vol. XI, No. 1, Eleventh Session, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 31st August and 2nd September, 1953 (Dacca : East Bengal Government Press, 1954).

Assembly Proceeding, Official Report, East Pakistan Provincial Legislative Assembly, Vol. XV, No. 1, Third Session, 1956, 17th to 23rd September, 1956 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1957).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XV, No. 2, Third Session, 1956, The 24th to 27th September, 1956 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1957).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XV, No. 3, Third Session, 1956, The 28th September to 2nd October, 1956 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1957).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Assembly, Vol. XVIII, No. 3, First Session, 1958, 20th to 22nd March, 1958 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1958).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Assembly, Vol. XVIII, No. 4, First Session, 1958, 26th March, 1958 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1958).

Dhaka University Institutional Repository

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXI, No. 1, First Session, 1962, 9th, 11th, 12th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th and 20th June, 1962 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1963).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXI, No. 2, First Session, 1962, The 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th and 30th June, 1962 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1963).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXIX, No. 2, Second Session, 1965, The 10th, 11th and 13th December, 1965 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1965).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXIX, No. 3, Second Session, 1965, The 14th, 15th, 16th, and 17th December, 1965 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1967).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXX, No. 1, Budget Session, 1966-67, The 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and 13th June, 1966 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1967).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXX, No. 3, Budget Session, 1966-67, The 20th and 21th June, 1966 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1967).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXI, No. 1, First Session, 1967, The 3rd, 4th, 5th, 7th, and 9th January, 1967 (Dacca : East Pakistan Governement Press, 1967).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXI, No. 2, First Session, 1967, 18th January, 1967 (Dacca : East Pakistan Governement Press, 1967).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXI, No. 5, First Session, 1967, The 1st, 2nd, 3rd, and 6th February, 1967 (Dacca : East Pakistan Governement Press, 1968).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXII, No. 6, Budget Session, 1967-68, The 28th and 29th June, 1967 (Dacca : East Pakistan Governement Press, 1969).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXII, No. 7, Budget Session, 1967-68, The 30th June, 1st and 8th July, 1967 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1969).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXIII, No. 2, First Session, 1968-69, The 18th, 19th, 20th, 22nd and 23rd January, 1968 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1969).

Assembly Proceedings, Official Report, East Pakistan Provincial Assembly, Vol. XXXIII, No. 4, Winter Session, 1968-69, The 26th and 29th January, 1969 (Dacca : East Pakistan Government Press, 1971).

Dhaka University Institutional Repository

৩. REPORT

Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. I, With Minutes Dissent, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1940).

Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. II, Appendices (I to IX) and Indian Land System Ancient, Mediaeval and Modern, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1940).

Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. III, Landholders' replies to the questionnaire issued by the Land Revenue Commission, and their oral evidence, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1940).

Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. IV, Landholders' replies to the questionnaire issued by the Land Revenue Commission, and their oral evidence, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1940).

Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. V, Replies to the Commission's questionnaire by Government Officers and their oral evidence, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1941).

Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. VI, Replies to the Commission's questionnaire by the Associations concerned with tenants, Bar Associations, etc., and their oral evidence, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1941).

Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30, Volume I (Calcutta : Bengal Government Press, 1930).

Report of the Banking Enquiry Committee for the Centrally Administered Areas 1929-30, Volume I, Central Publication Branch (Calcutta : Government of India, 1930).

৪. SURVEY AND SETTLEMENT REPORT

Jack, J. C., *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Bakarganj District 1900 to 1908* (Alipore : Bengal Secretariat Book Depot, 1915).

৫. SURVEY OF BANGLADESH

Bangladesh Economic Survey 1980-81, Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1981).

৬. CENSUS REPORT

Census of India, 1921, Bengal, Report, Vol. V, Part II (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1923).

Census of India, 1931, Bengal & Sikkim, Report, Vol. V, Part II (Calcutta : Central Publication Branch, 1932).

Census of India, 1941, Bengal, Vol. IV (Simla : Government of India Press, 1942).

Dhaka University Institutional Repository

Census of Pakistan Population, 1951, East Bengal, Vol. 3 (Karachi : Government of Pakistan, 1952).

Census of Pakistan Population, 1961, Vol. I, Pakistan (Karachi : Ministry of Home and Kashmir Affairs, 1964).

৭. GOVERNMENT OF INDIA

Land Revenue Policy of the Indian Government, Government of India (Calcutta : Government Printing, 1902).

Land Revenue Policy of the Indian Government, Government of India (Calcutta : Government Printing, 1920).

৮. GOVERNMENT OF BENGAL

List of Zamindars exempted under clause (6) (c) of Schedule of the Indian Arms Rules, 1924 in the Presidency of Bengal (Corrected up to the 31st December, 1934), Police Department, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1936).

Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1914-1915, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1915).

Report on the Land Revenue Administration of the Province of Bihar and Orissa for the Year 1923-24 (Patna : Government Printing, Bihar and Orissa, 1924).

Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1924-25, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1925).

Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1926-27, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1927).

Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1928-29, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1929).

Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1929-30, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1930).

Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1930-31, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1931).

Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1931-32, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1932).

Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1932-33, Board of Revenue, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1932).

Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1934-35, Board of Revenue, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1935).

Dhaka University Institutional Repository

Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the Year 1937-38, Board of Revenue, Government of Bengal (Alipore : Bengal Government Press, 1938).

৯. GOVERNMENT OF PAKISTAN

Six-Year Development Programme of Pakistan, July, 1951 to June 1957, Ministry of Economic, Government of Pakistan (Karachi : Government of Pakistan Press, 1952).

The First Five Year Plan 1955-60, December, 1957, National Planning Board, Government of Pakistan (Karachi : Government of Pakistan Press, 1957).

The Second Five Year Plan 1960-65, June, 1960, Planning Commission, Government of Pakistan (Karachi : Government of Pakistan Press, 1960).

১০. GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN

Report on the Land Revenue Administration of East Pakistan for the Year 1959-60, Board of Revenue, Government of East Pakistan (Dacca : East Pakistan Government Press, 1967).

Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1960-61, Board of Revenue, Government of East Pakistan (Dacca : East Pakistan Government Press, 1969).

Annual Land Revenue Administration Reports for the Year 1961-62, Board of Revenue, Government of East Pakistan (Dacca : East Pakistan Government Press, 1967).

Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1962-63, Board of Revenue, Government of East Pakistan (Dacca : East Pakistan Government Press, 1968).

Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1963-64, Board of Revenue, Government of East Pakistan (Dacca : East Pakistan Government Press, 1969).

Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1965-66, Board of Revenue, Government of East Pakistan (Dacca : East Pakistan Government Press, 1971).

Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1966-67, Board of Revenue, Ministry of Revenue, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1973).

Annual Land Revenue Administration Report for the Year 1967-68, Board of Revenue, Ministry of Revenue, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1973).

১১. BENGAL DISTRICT GAZETTEERS

Sachse, F. A., Bengal District Gazetteers : Mymensingh, Government of Bengal (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1917).

Dhaka University Institutional Repository

১২. EAST PAKISTAN DISTRICT GAZETTEERS

Rizvi, S. N. H (General Editor), East Pakistan District Gazetteers : Dacca, Services and General Administration Department, Government of East Pakistan (Dacca : East Pakistan Government Press, 1969).

১৩. BANGLADESH DISTRICT GAZETTEERS

Bari, K. G. M. Latiful (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Bogra*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dacca : Bangladesh Government Press, 1979).

........., *Bangladesh District Gazetteers : Jessore*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dacca : Bangladesh Government Press, 1979).

........., *Bangladesh District Gazetteers : Khulna*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, Bangladesh Government Press, Dacca, 1978.

Khan, Nurul Islam (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Mymensingh*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, Bangladesh Government Press, Dacca, 1978.

........., *Bangladesh District Gazetteers : Noakhali*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dacca : Bangladesh Government Press, 1977).

........., *Bangladesh District Gazetteers : Pabna*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dacca : Bangladesh Government Press, 1978).

........., *Bangladesh District Gazetteers : Rangpur*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, (Dacca : Bangladesh Government Press, 1977).

Latif, Major General (Rt.) M. A (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Patuakhali*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1982).

........., *Bangladesh District Gazetteers : Tangail*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (Dhaka : Bangladesh Government Press, 1983).

Rashid, Md. Habibur (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Bakerganj*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, (Dacca : Bangladesh Government Press, 1981).

Siddiqui, Ashraf (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers : Dinajpur*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, Bangladesh Government Press, Dacca, 1972.

Dhaka University Institutional Repository

........., *Bangladesh District Gazetteers : Kushtia*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, Bangladesh Government Press, Dacca, 1976.

........., *Bangladesh District Gazetteers : Rajshahi*, Cabinet Secretariat Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, Bangladesh Government Press, Dacca, 1976.

১৪. DACCA GAGETTE

Jury List for the year 1950 in the District of Dacca, Appendix-List of special and common jurors, The Dacca Gazette, April 12, 1951.

Jury List for the year 1953 in the District of Dacca, Appendix-List of Special and Common Jurors, The Dacca Gazette, July 16, 1953.

১৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থা মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট, ৩১ জুলাই ১৯৮৯, ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ১৯৮৯)।

১৬. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার

খান, নুরুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : পাবনা-বর্তমান পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার গেজেটীয়ারবদ্ধ ইতিবৃত্ত*, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯০)।

..........., *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : রংপুর-বর্তমান রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার গেজেটীয়ারবদ্ধ বিবরণ*, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯০)।

তালুকদার, মাহবুব (সাধারণ সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর যশোর-প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক ইতিহাস*, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯৮)।

১৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : দি প্রিন্টার্স, ১৯৮২)।

..........., *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, মুজিবনগর : প্রশাসন, তৃতীয় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : দি প্রিন্টার্স, ১৯৮২)।

..........., *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, চতুর্থ খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : দি প্রিন্টার্স, ১৯৮২)।

Dhaka University Institutional Repository

.........., *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, দলিলপত্র, মুজিবনগর : গণমাধ্যম, ষষ্ঠ খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা : দি প্রিন্টার্স, ১৯৮২)।

১৮. পত্র-পত্রিকাসমূহ

The Pakistan Observer : ১৯৭০ সাল।

Morning News : ১৯৭০ সাল।

ঢাকা প্রকাশ : ১৮৭৪, ১৯০০ ও ১৯০১ সাল।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা : ১৯২২ সাল।

দৈনিক আজাদ : ১৯৭০ সাল।

দৈনিক ইত্তেফাক : ১৯৫৬, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬৯, ১৯৭০ ও ২০২১ সাল।

দৈনিক ইত্তেহাদ : ১৯৪৮ ও ১৯৫৮ সাল।

দৈনিক নাজাত : ১৯৫৯ সাল।

মিল্লাত : ১৯৫৭ সাল।

লোক সেবক : ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সাল।

দৈনিক পাকিস্তান : ১৯৬৯ সাল।

দৈনিক বাংলা : ১৯৭৩ ও ১৯৮৪ সাল।

সংবাদ : ১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৭৫ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বৈতীয়িক উৎস (SECONDARY SOURCES)

১৯. PRINTED BOOKS

Ahmed, Rafiuddin, *The Bengal Muslims 1871-1906 : A Quest for Identity* (New Delhi : Oxford University Press, 1981).

Ahmed, Sufia, *Muslim Community in Bengal 1884-1912* (Dhaka : The University Press Limited, 1996).

Alamgir, Muhiuddin Khan, *Land Reform in Bangladesh* (Dacca : Centre for Social Studies-CSS, 1981).

Alamgir, Muhiuddin Khan, (ed.), *Land System Bangladesh : Crisis and Solution* (Dacca : Centre for Social Studies-CSS, 1981).

Ali, Muhammad Mohar, *History of the Muslims of Bengal*, Muslim Rule in Bengal (600-1170/1203-1757), Volume I A (Riyadh : Department of Culture and Publication, Imam Muhammad IBN Sa'ud Islamic University, 1985).

Ali, Shaikh Maqsood, *From East Bengal to Bangladesh : Dynamics and Perspectives* (Dhaka : The University Press Limited, 2009).

Alim, A., *Land Reforms in Bangladesh : Social Changes, Agricultural Development and Eradication of Poverty* (Dacca : Associated Printers Limited, 1979).

Ascoli, F. D., *Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report, 1812* (Oxford : At the Clarendon Press, 1917).

Bose, Sugata, *Agrarian Bengal : Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947*, (Bombay : Orient Longman Limited, 1987).

Chatterjee, Partha, *Bengal 1920-1947 : The Land Question*, Volume One, CSSSC Monograph 4 (Calcutta : K P Bagchi & Company, 1984).

Chatterji, Joya, *Bengal divided : Hindu communalism and partion, 1932-1947*, Cambridge South Asian Studies no. 57 (Cambridge : Cambridge University Press, 1994).

Choudhury, G. W., *Democracy in Pakistan* (Dacca : Green Book House, 1963).

Choudhury, Nurul H., *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal : The Faraizi, Indigo and Pabna Movements* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 2001).

De, Dhurjati Prasad, *Bengal Muslims in Search of Social Identity 1905-47* (Dhaka : The University Press Limited, 1998).

Dutt, Romesh Chunder, *Builders of Modern India, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India* (New Delhi : Government of India Press, 1967).

Greenough, Paul R., *Prosperity and Misery in Modern Bengal : The Famine of 1973-1944* (New York : Oxford University Press, 1982).

Dhaka University Institutional Repository

Guha, Ramachandra (ed.), *Makers of Modern India* (Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, United States of America, 2011).

Guha, Ranajit, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India* (New Delhi : Oxford University Press, Oxford India Paperbacks, 2002).

Hasan, Mushirul, *Legacy of a Divided Nation : India's Muslims since Independence* (Delhi : Oxford University Press, Second Impression 1997).

Hasan, Mushirul (ed.), *India's Partition : Process, Strategy and Mobilization* (Delhi : Oxford University Press, Second Impression 1996).

Hashmi, Taj ul-Islam, *Peasant Utopia : The Communalization of Class Politics in East Bengal 1920-1947* (Dhaka : University Press Limited, 1994).

Hasina, Sheikh (ed.), *Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, 1948-71*, Declassified Documents, Vol-I, 1948-1950 (Dhaka : Hakkani Publishers, 2018).

Hunter, W. W., *A Statistical Account of Bengal : District of Nadia and Jessore*, Volume II (London : Trubner & Co., 1877).

............, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Rajshahi and Bogra*, Volume VIII (London : Trubner & Co., 1876).

............, *A Statistical Account of Bengal : Districts of Dacca, Bakarganj, Faridpur, and Maimansinh*, Volume V (London : Trubner & Co., 1873).

Huq, A.K. Fazlul, *Bengal Today* (Dacca : East Bengal Government Press, 1956).

Huq, M. Mahfuzul, *Electoral Problems in Pakistan* (Dacca : Asiatic Society of Pakistan Publication, 1966).

Hussain,T., *Land Rights in Bangladesh : Problems of Management* (Dhaka : University Press Limited, 1995).

........., *A Study on the Legal Aspects of Land Use Regulation in Bangladesh* (Dacca : Ministry of Agriculture and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh, 1982).

Islam, M. Mufakharul, *An Economic History of Bengal 1757-1947* (Dhaka : Adorn Publication, 2012).

………., *Bengal Agriculture 1920-1946 : A quantitative study* (London : Cambridge University Press, 1978).

Islam, Sirajul, *Bengal Land Tenure : The Origin and Growth of Intermediate Interests in the 19th Century, CASP13* (Rotterdam : Erasmus University, Netherlands, 1985).

………., *The Permanent Settlement in Bengal : A Study of Its Operation 1790-1819* (Dacca : Bangla Academy, 1979).

Jahan, Rounaq, *Pakistan : Failure in National Integration* (London : Columbia University Press, 1972).

Dhaka University Institutional Repository

Jalal, Ayesha, *The Sole Spokesman : Jinnah, the Muslim League and the demand for Pakistan*, (Cambridge : Cambridge Ubiversity Press,1994).

Kabir, Lutful, *The Rights and Liabilities of the Raiyats under the Bengal Tenancy Act, 1885 and the State Acquisition and Tenancy Act, 1950* with amendment (Dacca : Law House Publication, 1972).

Kamal, Ahmed, *State Against the Nation : The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-54* (Dhaka : The University Press Limited, 2009).

Khan, Bazlur Rahman, *Politics in Bengal, 1927-1936* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1987).

Khan, R Zillur, *The Third World Charismat : Sheikh Mujib and the Struggle for Freedom* (Dhaka : The University Press Limited, 1996).

Leake, H. Martin, *Land Tenure and Agricultural Production in the Tropics* (Cambridge : W. Heffer & sons Ltd., 1927).

Majumdar, R.C., H.C. Raychaudhuri and Kalikinkar Datta, *An Advanced History of India* (London : Macmillan & co. Ltd., 1963).

Maniruzzaman, Talukder, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath* (Dhaka : The University Press Limited, Second impression, 2003).

Maniruzzaman, Talukder, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh* (Dhaka : Bangladesh Books International, 1975).

Marx, Karl, *Capital : The Communist Manifesto and other writings* (New York : Carlton House, 1932).

………., *A Contribution to the Critique of Political Economy* (Moscow : Progress Publishers, Second printing, 1977).

Muhith, A. M. A., *Bangladesh : Emergence of a Nation* (Dhaka : The University Press Limited, 1978).

Mukerji, Karunamoy, *The Problems of Land Transfer : A Study of the Problems of Land Alienation in Bengal* (Birbhum : Santiniketan Press, 1957).

Mukherjee, Nilmani, *A Bengal Zamindar : Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and his times 1808-1888* (Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1975).

Powell, B. H. Baden, *The Land Systems of British India* (Oxford : At the Clarendon Press, 1892).

Rahim, Aminur, *Politics and National Formation in Bangladesh* (Dhaka : The University Press Limited, 1997).

Rahim, Enayetur and Joyce L. Rahim, *Bengal Politics : Documents of the Raj 1944-1947,* Volume III (Dhaka : The University Press Limited, 2000).

Rashid, Harun-or, *The Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muskim Politics 1936-1947* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1987).

Dhaka University Institutional Repository

Rashiduzzaman, M., *Politics and Administration in the Local Council : A Study of Union and District Councils in East Pakistan* (Dacca : Oxford University Press, 1968).

Razzaque, Rana, *Bengali Muslims : Social and Political Thought, 1918-1947* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 2019).

Reeve, Andrew (ed.), *Modern Theories of Exploitation*, SAGE Modern Politics Series, Volume 14, ECPR (New Delhi : SAGE Publicatins, 1987).

Rothermund, Dietmar, *The Indian Peasant in the Great Depression, 1929-1939*, Bisheshwar Prasad Memorial Lecture 1988 (Bhagalpur : University of Bhagalpur, 1988).

Roy, J. N., *The Law of Revenue Sales (The Revenue Sale Law being Act XI of 1859 and Act VII of 1868 as modified up-to-date) with notes*, Part II (Calcutta : Thacker, Spink & Co., 1917).

Shamsuddin, Abu Jafar, *Sociology of Bengal Politics and Other essays* (Dacca : Bangla Academy, 1973).

Sarkar, Chandiprasad, *The Bengali Muslims : a study in their politicization, 1912-1929* (New Delhi : K P Bagchi & Company, 1991).

Sayeed, Khalid Bin, *Politics in Pakistan : The Nature and Direction of Change* (New York : Praeger Publications, 1980).

Schendel, Willem Van, *A History of Bangladesh* (New Delhi : Cambridge University Press, 2009).

………., *Peasant Mobility : The odds of life in rural Bangladesh* (New Delhi : Manohar Publications, 1982).

Sen, Shila, *Muslim Politics in Bengal, 1937-1947* (New Delhi : Impex India, 1976).

Siddiquee, Mohammad Mohibullah, *Socio-Economic Development of a Bengal District : A Study of Jessore, 1883-1925* (Rajshahi : Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 1997).

Sinha, Narendra Krishna, *The Economic History of Bengal : From Plassey to the Permanent Settlement*, Volume II (Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1968).

Sobhan, Rehman, *Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan* (Dacca : Bureau of Economic research, 1968).

Taylor, James, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Volume I (Calcutta : Mann, Military Orphan Press, 1840).

Umar, Badruddin, *The Emergence of Bangladesh : Class Struggle in East Pakistan, 1947-58* (Oxford : Oxford University, 2004).

Dhaka University Institutional Repository

২০. ARTICLES

Ahmed, Mrs. Z. N., "Land Tenure Problems and Reform", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II, No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950).

Ahmad, Syed, "Subinfeudation in the Land System of East Bengal", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950).

Alavi, Hamza, "Peasantry and Capitalism : A Marxist Discourse", Teodor Shanin (ed.), *Peasants and Peasant Societies*, Selected Readings (London : Penguin Books, Second Edition, 1988).

Ali, Shawkat, "Land Reform Measures and Their Implementation in Bangladesh", Muhiuddin Khan Alamgir (ed.), *Land Reform in Bangladesh* (Dacca : Centre For Social Studies-CSS,1981).

Bose, Sawdesh R., "The Pakistan Economy since Independence 1947-70", Dharma Kumar (ed.), *The Cambridge Economic History of India*, Volume 2 : c. 1757-c. 1970 (Cambridge : Cambridge University Press, Reprinted 1989).

Huda, Mirza Nurul, "Land Tenure and Agricultural Production", *Pakistan Economic Journal*, December 1950, Quarterly, Volume II, No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950).

Islam, A. B. M. Azizul, "Land Reform in Bangladesh-A Skeptical View", Muhiuddin Khan Alamgir (ed.), *Land Reform in Bangladesh* (Dacca : Centre For Social Studies-CSS,1981).

Kumar, Manoj, "Land Tenure System and the British East India Company : a Case Study of the South East Punjab", *International Journal of Scientific Redearcch* (*IJSR*), Volume 5, Issue 2, February 2016.

Mahmud, Khan Bahadur Mohammad, "The Problem of Land Tenure", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II, No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950).

Moqit, M., "Problems of Land Tenure in the Punjab", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II, No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950).

Narayan, Jayaprakash, "The Grassroots Socialist", Ramachandra Guha (ed.), *Makers of Modern India* (Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, United States of America, 2011).

Rahman, Shafiqur, "The Problems of Land Tenure in India and Pakistan", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II, No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950).

Roy, Asim, "The High Politics of India's Partition : The Revisionist Perspective", Mushirul Hasan (ed.), *India's Partition : Process, Strategy and Mobilization* (Delhi : Oxford University Press, Second Impression 1996)

Sethi, Ismail , "Land Tenures in N.W.F.P.", *Pakistan Economic Journal*, August 1950, Quarterly, Volume II, No. 1 (Lahore : Pakistan Economic Association, 1950).

Shaikh, Farzana, "Muslims and Political Representation in Colonial India : The Making of Pakistan", Mushirul Hasan (ed.), *India's Partition : Process, Strategy and Mobilization* (Delhi : Oxford University Press, Second Impression 1996).

Dhaka University Institutional Repository

Wilson, Jon E., "A Thousand Countries to go to : Peasants and Rulers in late eighteenth-century Bengal", *Past & Present*, a journal of historical studies, Number 189, November 2005 (Oxford : The Past & Present Society, 2005).

২১. অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ

ইসলাম, নুরুল, *ঔপনিবেশিক শাসনকালে চট্টগ্রামের ভূমিব্যবস্থা ঃ ভূমি বন্দোবস্ত ও ভূমি জরীপের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৭৬১-১৮৪৮)*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (কলকাতা : ইতিহাস বিভাগ, ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস, ২০১৮)।

করিম, মোঃ রেজাউল, *যশোর জেলায় নীল আন্দোলন, ১৮৫৯-৬২ ঃ একটি সমীক্ষা*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (রাজশাহী : ইতিহাস ভিাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১)।

বাছির, আবদুল, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী (১৭৫৭-১৮৫৭)*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (ঢাকা : ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮)।

ভূঞা, মোঃ হাফিজুর রহমান, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব ১৮৫৪-১৯৬০*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (ঢাকা : ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯)।

মামুন, মুনতাসীর উদ্দিন খান, *পূর্ববঙেগর সমাজ জীবনের কয়েকটি দিক : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৮৫৭-১৯০৫)*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (ঢাকা : ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২)।

২২. অপ্রকাশিত এম. ফিল অভিসন্দর্ভ

করিম, এস. এম. রেজাউল, *বাংলায় পাট চাষ ১৮৫৫-১৯৪৭*, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ (ঢাকা : ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫)।

২৩. প্রকাশিত গ্রন্থ

আজাদ, আবদুর রহিম ও শাহ আহমদ রেজা, *বাংলাদেশের রাজনীতি : প্রকৃতি ও প্রবণতা, ২১-দফা থেকে ৫-দফা* (ঢাকা : সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭)।

আজাদ, লেনিন, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭)।

আনিসুজ্জামান, *স্বরূপের সন্ধানে* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯)।

আরেফিন, এ এস এম সামছুল (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নির্বাচন, ১৯৭০-২০০১* (ঢাকা : বাংলাদেশ রির্সাচ এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩)।

আলি, নওয়াজ, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি সংস্কার, ঐতিহাসিক পর্যালোচনা* (ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ২০১৪)।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, দশম সংস্করণ, ২০০২)।

আহমদ, ওয়াকিল, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩)।

আহ্মদ, কামরুদ্দীন, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা : ইনসাইড লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ-সংশোধিত, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ)।

আহমদ, মওদুদ, *বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৩)।

আহমদ, মৌলবি মাহাম্মদ, *শ্রীহট্ট দর্পণ* (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ২০০২)।

আহ্মদ, সালাহ্উদ্দীন, *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২)।

ইসলাম, কাবেদুল, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা (প্রাচীন যুগ থেকে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১)।

........, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ১৭৬৫ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২)।

........, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ১৯৪৭ থেকে ২০০০*, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩)।

ইসলাম, সিরাজুল, *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৯)।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

........, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

........, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

ইসলাম, সিরাজুল (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ১ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)

........, *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ২ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)।

........, *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৩ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)।

........, *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৪ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)।

........, *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৫ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)।

Dhaka University Institutional Repository

........, *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৬ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)।

........, *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৭ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)।

........, *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৮ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)।

........, *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ১০ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)।

উমর, বদরুদ্দীন, *বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৫)।

......., *চিরস্থায়ী* বন্দোবস্তে *বাঙলাদেশের কৃষক* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৩)।

কর্মকর, সুমা, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ*, নাটোর জেলা, জরিপ গ্রন্থমালা ৪ (খুলনা : ১৯৭১-গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৮)।

করিম, আবদুল, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন* (ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ ও সংস্করণ, ২০০১)।

কামাল, আহমেদ, *কালের কল্লোল : ইতিহাস, উন্নয়ন ও রাজনীতি* (ঢাকা : সংহতি প্রকাশন, ২০০৮)।

কামাল, মেসবাহ ও ঈশানী চক্রবর্তী, *নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ : সমকালীন রাজনীতি ও ইলামিত্র* (ঢাকা : মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১)।

ঘোষ, সুনীতি কুমার, *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১২)।

চন্দ, পুলক, *নীল বিদ্রোহ* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫)।

চক্রবর্তী, অমিতাভ, *বাংলার কৃষক কালে কালোত্তরে* (কোলকাতা : উবুদশ, ২০১৪)।

চক্রবর্তী, রতন লাল, *সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪)।

চট্টপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বঙ্গদেশের কৃষক*, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৮৪)।

চৌধুরী, আনোয়ারউল্লাহ (অনুবাদক : মুহম্মদ হাবিবুর রহমান ও মোহাম্মদ ইমদাদুল হক), *বাংলাদেশের একটি গ্রাম : সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি সমীক্ষা*, (ঢাকা : মৌলি প্রকাশনী, ২০০৩)।

চৌধুরী, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন, *সিলেট বিভাগের ইতিহাস* (ঢাকা : সৈয়দা তাহেরা বেগম, ২০০৬)।

চ্যাটার্জী, জয়া (অনুবাদ : আবু জাফর), *বাঙলা ভাগ হল : হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৩।

......., *দেশ ভাগের অর্জন : বাঙলা ও ভারত ১৯৪৭-১৯৬৭*, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৬)।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দশম খণ্ড (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ, ১৮৯৩)।

Dhaka University Institutional Repository

দারাক, পিয়ের পল ও ভেলাম ভান সেন্দেল (অনুবাদক : ফওজুল করিম), *নীলের বিশ্বায়ন : নীল ও ঔপনিবেশিক বাংলায় গোয়েন্দাগিরি* (ঢাকা : জার্নিম্যান বুকস, ২০১৫)।

দে, অমলেন্দু, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১)।

দেবনাথ, নারায়ণ চন্দ্র, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা*, (ঢাকা ঃ সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০)।

দেশাই, এ. আর., *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি* (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯২)।

নাকাজাতো, নারিয়াকি (অনুবাদ : স্বরোচিষ সরকার), *পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্থা ১৮৭০-১৯১০* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৪)।

ফারুখ, আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৩)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল, *ভূমি ও ভূমি সংস্কার : সেকাল একাল* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী কালীপ্রসন্ন, *বাঙ্গালার ইতিহাস : নবাবী আমল*, অষ্টাদশ শতাব্দী (কলিকাতা : শ্রী ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৫ সন)।

বারকাত, আবুল, *বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি* (ঢাকা : মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৬)।

বাহার, মোঃ হাবিবুল্লাহ, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য ১৯৪৭-১৯৬৯ : পার্লামেন্টের ভাষ্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৭)।

মল্লিক, সমর কুমার, *আধুনিক ভারতের রূপান্তর : রাজ থেকে স্বরাজ, ১৮৫৭-১৯৪৭* (কলিকাতা : ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ষষ্ঠ প্রকাশ, ২০০৬-২০০৭)।

মানিক, আখতার উদ্দিন, *শাহজাদপুর কৃষক বিদ্রোহ ও ঠাকুর জমিদার* (ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৪)।

মামুন, মুনতাসির, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ* (ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৬)।

মামুন, মুনতাসির, *শান্তিকমিটি ১৯৭১* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২)।

মজুমদার, শ্রী রমেশচন্দ্র, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, আধুনিক যুগ, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮১)।

মিছের, কাজী মোহাম্মদ, *রাজশাহীর ইতিহাস*, ২য় খন্ড (ঢাকা : সৈয়দা হোসনে আরা বেগম, ১৯৬৫)।

মিয়া, মোঃ আবদুল কাদের, *ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা* (ঢাকা ঃ এ. কে. প্রকাশনী, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৩)।

মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ, *পঞ্চাশের মন্বন্তর* (কলিকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ)।

Dhaka University Institutional Repository

মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, ঊনবিংশ শতাব্দী (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০)।

........., *বাংলার আর্থিক ইতিহাস ১৯০০-১৯৪৭*, বিংশ শতাব্দী (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১১)।

রফিক, শেখ (সংকলিত), *তেভাগা আন্দোলন* (ঢাকা : বিপ্লবীদের কথা প্রকাশন, ২০১৫)।

রহমান, আতিউর, *জনমানুষের মুক্তিযুদ্ধ*, অখণ্ড সংস্করণ (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৮)।

........., *মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭)।

রহমান, মো. মাহবুবর, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা : সময় প্রকাশন, তৃতীয় বর্ধিত সংস্করণ, ২০০৩)।

........., (সম্পাদিত), *মোঃ বশারত আলীর ডায়েরি (১৯২৩-৪৩) : কুমিল্লা জেলার এক জোতদার পরিবারের ইতিহাস ও তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা* (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১)।

রহমান, শেখ মুজিবুর, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২)।

........., *কারাগারের রোজনামচা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৮)।

রহমান, সাঈদ-উর, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩)।

রশিদ, হারুন-অর, *৭ই মার্চ থেকে স্বাধীনতা* (ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, ২০২০)।

রশিদ, হারুন-অর, *বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০* (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০১)।

রসুল, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *কৃষক সভার ইতিহাস* (কলিকাতা : নবজাতক প্রকাশন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮২)।

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০ বঙ্গাব্দ)।

রায়, শ্রীআনন্দনাথ, *ফরিপুরের ইতিহাস : ভৌগোলিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ)।

রায়, সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* (কলকাতা : র‍্যাডিক্যাল, প্রথম র‍্যাডিক্যাল সংস্করণ, ২০১২)।

শর্মা, রামশরণ (অনুবাদ : অঞ্জন গোস্বামী), *প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস* (কলকাতা : ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩)।

শরীফ, আহম্মেদ, *নীলফামারী ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন* (ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১৫)।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার, জনেন্দ্র নাথ, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি আইন* (ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৫)।

সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭* (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫)।

সরকার, স্বরোচিষ, *একাত্তরে বাগেরহাট : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস* (ঢাকা : সাহিত্য বিলাস, ২০০৬)।

সিদ্দিকী, কামাল, *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি* (ঢাকা : শোভা প্রকাশ, ২০০২)।

সেন, প্রভাত, *বগুড়ার ইতিহাস* (বগুড়া : বগুড়া কমার্শিয়াল সিন্ডিকেট লিমিটেড, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ)।

সেন, সুনীল (অনুবাদিকা : ছায়া দাশ গুপ্ত), *ভারতে কৃষি সম্পর্ক, ১৭৯৩-১৯৪৭* (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫)।

সোবহান, রেহমান, *উতল রোমন্থন : পূর্ণতার সেই বছরগুলো* (*Untranquil Recollections : The Years of Fulfillment*, Bengali Translator : Amitava Sengupta) (New Delhi : SAGE Pblications India Pvt. Ltd., 2018).

হক, আবদুল (সাধারণ সম্পাদক), *পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি*, ১৯৬৭ সালের ৮-৯ এপ্রিল (২৬-২৭ চৈত্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ), কুলাউড়ায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির প্রাদেশিক কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাববলী (ঢাকা : আরফান প্রেস, ১৯৬৭)।

হক, এম. আজিজুল (অনুবাদ : ওসমান গনি), *বাংলার কৃষক* (ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০৪)।

হক, মুহাম্মদ ইনাম-উল, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন ১৭০৭-১৯৪৭* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৫)।

হক, মোহাম্মদ মোজাম্মেল (সম্পাদিত), *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, ত্রৈমাসিক, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র, পঞ্চম বর্ষ-১৩২৯ (১৯২২), ৩য় সংখ্যা, (কলিকাতা : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি, ১৯২২)।

হক, মোজাম্মেল, *বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ১৮৫৭-১৯৪৭* (ঢাকা : বুক হাউস, ১৯৭৬)।

হাবিব, ইরফান, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, ১৫৫৬-১৭০৭* (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৫)।

হোসেন, আবু মোঃ দেলোয়ার, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস* (ঢাকা : বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০১৪)।

হোসেন, তফাজ্জল (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর* (ঢাকা : বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল ১৯৮১)।

হোসেন, মোল্লা আমীর, *হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ, ১৯৪১-৭১ : খুলনা* (ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১৮)।

হোসেন, মোশারফ, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন : বাংলাদেশের অভ্যুদয়* (ঢাকা : দ্যু প্রকাশন, ২০২০)।

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন, শওকত আরা, *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯২১-১৯৩৬ : অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০)।

২৪. প্রকাশিত প্রবন্ধ

আহমেদ, কামাল উদ্দিন, “স্বায়ত্তশাসনের সন্ধানে”, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

ইসলাম, সিরাজুল, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কৃষক অর্থনীতি”, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল, “বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসতান্ত্রিক বিকাশ”, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

উমর, বদরুদ্দীন, “ভাষা আন্দোলন”, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

কাউসার, এম. এ., “সিপাহী বিদ্রোহে পূর্ববঙ্গের জমিদারদের সরকার পক্ষাবলম্বনের কারণ অনুসন্ধান-একটি পর্যালোচনা”, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, খণ্ড ৩, সংখ্যা ৪ ও ৫, জুলাই ২০০৮-জুন ২০১০ (ঢাকা : কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০)।

করিম, আবদুল, “মুগল রাজস্ব ব্যবস্থা”, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

করিম, এস. এম. রেজাউল, “১৯৪৬ সালের নির্বাচন : পূর্ব বাংলার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি”, *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৭-২৮, ১৪০৯-১৪১১/২০০২-২০০৪ (ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ২০০৫)।

তরফদার, মমতাজুর রহমান, “বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা”, মোঃ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭)।

দত্ত, শেখর, “অনন্যসাধারণ তেভাগা সংগ্রাম”, নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পাদিত), *তেভাগা সংগ্রাম*, ৪০তম বর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ (ঢাকা : বাংলাদেশ কৃষক সমিতি, ১৯৮৮)।

বর্মন, ডালেম চন্দ্র, “স্থানীয় সরকার”, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

মুক্তি, ঈশিতা আক্তার, “৭০-এর নির্বাচন : জনসংখ্যাভিত্তিক আসন বন্টন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতা অর্জনে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য”, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, সাঁইত্রিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জুন ২০১৯ (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০১৯)।

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাকলেন, জন আর., "বঙ্গবিভাগ, ১৯০৫ : রাজনৈতিক বিশ্লেষণ", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

রশিদ, হারুন-অর, "বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা ১৯৩৭-১৯৪৭", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

লেনিন, নূহ-উল-আলম, "বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন", শেখ রফিক (সংকলিত), *তেভাগা আন্দোলন* (ঢাকা : বিপ্লবীদের কথা প্রকাশন, ২০১৫)।

শাহ, মোহাম্মদ, "বাঙালি জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি" সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ -১৯৭১*, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

সোবহান, রেহমান, "বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ -১৯৭১*, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭)।

হোসেন, আবু মোঃ দেলোয়ার ও এস. এম. রেজাউল করিম, "১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতাহার ও পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া", *সমাজ নিরীক্ষণ*, নং ৮৭, মে-আগস্ট ২০০৩ (ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ২০০৩)।

২৫. রাজনৈতিক ও সামাজিক সভা সমিতি

পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি : ঘোষণাপত্র, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী এবং গঠনতন্ত্র, ১৯৬৭ সালের ২৯ নভেম্বর রংপুরে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত ঘোষণাপত্র, কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্র (ঢাকা : জাগৃতি মুদ্রায়ণ, ১৯৬৭)।

পূর্ব পাকিস্তান পাটচাষী কনফারেন্স, সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অভিভাষণ, ১৩ মাঘ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৭, বিন্যাফইর, টাঙ্গইল (ঢাকা : আরফান প্রেস, ১৯৬৭)।